হর্ণ, বাড়ীর দরজার সামনে বাজছে শুনে আমার পিলে চমকে দিলো। অম্বলের চোঁয়া ঢেকুর ওঠা মুখ করে, অরুণকে ডেকে বললাম, 'দেখো তো কে?' একে অন্যের বাড়ী, তার বাড়ীতে বাচ্চা আছে, তাই অতি কষ্টে বাবার এই অভিব্যঞ্জনা যেটা শুনতে শুনতে বলার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সম্বরণ করলাম। একটু অসাবধান হলেই বেরিয়ে পড়েছিল আর কি, 'আরে কোন রে শুয়ার কি বচ্চে, 'শ্রী' কে বিশ্রী কর দিয়া!' বেশীক্ষণ গজগজ করার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই অরুণ এসে বলল, 'তোমার রবিশঙ্করের একান্ত সচিব, কাশীর কোন এক অরুণানন্দ দুবে এসেছে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'রবিদূত কি বার্তা এনেছে?' অরুণ বলল, 'রবিশঙ্কর দেখা করতে চায় তাই ডেকেছে।'

যাবার জন্য তৈরী হলাম। কোথাকার জল কতদূর গড়াবে জানি না, তাই বন্ধুকে বললাম, 'তোমরা সব খেয়ে নিও।' গাড়ীতে বসতেই দুবে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'এইমাত্র বাড়ীতে এসে গুরুজী যে মুহূর্তে শুনেছেন আপনি এসেছেন, গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।' মাথায় তখন চিন্তার ঝড় বইছে তাই কিছু বললাম না।

বাড়ীতে ঢুকেই দেখলাম, রবিশঙ্কর গরম জল দিয়ে হাত পা ধুচ্ছে। আলিআকবর ও জুবেদা বেগম কলের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম রবিশঙ্কর এসে আলিআকবরের কাছে সব শুনবার পরই আমাকে ডেকেছে। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই বলল, 'মৈহারে এসেই আলুভাই-এর কাছে শুনলাম, তুমি নাকি আমার উপর খুব চটে গেছ? আমি কয়েকটা দিন মৈহারে একান্তে থাকব বলে লিখেছিলাম, 'মৈহারের কোন লোকের সঙ্গে দেখা করব না। তাই বলে তোমার সঙ্গে দেখা করব না, এ কথা তুমি কি করে ভাবলে?' বললাম, 'আমি মোটেই সে কথা ভাবিনি। আলিআকবরকেই জিজ্ঞাসা করুন কি বলেছে আমাকে?' সঙ্গে সঙ্গেই রবিশঙ্কর বলল, 'আলু ভাই এর কথা ছেড়ে দাও। আসলে আমাদের মধ্যে লড়িয়ে দিতে চায়।' এই কথা বলেই হো হো করে হেসে উঠল। জুবেদা বেগমকে দেখেই রবিশঙ্কর বলল, 'আমাদের জন্য প্লিজ একটু চা করে উপরে নিয়ে এসো। ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছি।' খাবার পর বাবার উপর কেন বই লিখছি বিস্তারপূর্বক বললাম। মনযোগ দিয়ে সব কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'এ তো খুব ভাল কথা। নিশ্চয়ই লেখো। তবে বাবার বিষয় লিখতে গিয়ে আমাদের বেশী টেনো না।' বুঝলাম রবিশঙ্কর কি বলতে চাইছে। তাই বললাম, 'ভয় নেই। বাবার জীবনী লিখছি। আপনাদের কেচ্ছা লিখব না। তবে যেটুকু না লিখলে নয়, সেটুকু নিশ্চয়ই লিখব। বাবার উপর বই লেখাটা আমার জন্য কঠিন পরীক্ষা। বহু ঘটনার আমি সাক্ষী। সেটা আমার আত্মজীবনী হয়ে যাবে। আত্মজীবনী লেখাও সহজ নয়। কেবল আমি করে লিখলে নিজের ঢাক পিটানো হয়। সেটা বিরক্তিকর। সেইজন্য বেশীর ভাগ আত্মজীবনী সুখপাঠ্য হয় না, আবার বলছি, আপনাদের জীবনী লিখছি না। আপনাদের ভয়ের কিছু নাই।' রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আরে ছি ছি। এ কথা কেন বারবার বলছ? ঠিক আছে, কয়েকদিন তো এখন আছি। এর মধ্যে একদিন বসে তুমি যা জানতে চাও, সব কথা আমি ও আলু ভাই বলবো।' হেসে বললাম, 'আলিআকবর আমায় কি বলেছেন জানেন?' আলিআকবর আমাকে যা বলেছিলো সব বললাম। রবিশঙ্কর হেসে

বলল, 'আলু ভাই তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করেছে। আলু ভাই তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবে।' কথা বলতে বলতে কখন যে দশটা বেজে গেছে বুঝতে পারি নি। রবিশঙ্কর ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত্রি হয়ে গিয়েছে, চল খেয়ে নেওয়া যাক।' বললাম, 'আপনারা খান, আমি আমার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে খাব।'

পরের দিন সকালে অরুণ, ইলা ও তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাবার বাড়ী গেলাম। রবিশঙ্কর, অরুণ এবং তার পরিবারবর্গের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। বলল, 'আপনারা আছেন বলে আমরা নিশ্চিন্তে আছি। আপনারা বাবাকে যে ভাবে সেবা করেন তাও শুনেছি। দুইদিন পরে প্রোগ্রাম আছে তাই বাধ্য হয়ে চলে যেতে হবে। তবে যাবার আগে আপনাদের বাড়ী একদিন নিশ্চয় যাব। অরণ বলল, 'আপনি যদি আমার বাড়ী যান তাহলে সেটা আমাদের সৌভাগ্য।' রবিশঙ্কর বলল, 'না, না, আমরা আপনাদের কাছে অত্যন্ত ঋণী। আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না। আপনারা এসে অবধি বাবার জন্য যা করেছেন শুনে অভিভূত হয়েছি। বাবা চিরকাল সাত্ত্বিক ভাবে থেকেছেন বলে বরাবর দেখেছি বাবার সঙ্কটের সময়ে কেউ না কেউ ঠিক উপস্থিত থাকে। তাই বোধহয় আপনারা এই সময়ে মৈহারে এসে গেছেন।' রবিশঙ্কর, আলিআকবর এবং আমাকে বলল, 'তোমরা উপরে গিয়ে বসো। আমি একটু পরেই আসছি। আজ সকালে বাবা প্রথমে আমাকে চিনতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পরে চিনেছেন। বাবা এঁদের খুব ভালবাসেন তাই এঁদের সঙ্গে বাবার কাছে কিছুক্ষণ বসেই উপরে আসছি।'

রবিশঙ্করের কথা শুনে ভাবলাম, ভালই হোল। আলিআকবরকে নিয়ে উপরের ঘরে গিয়ে বললাম, 'দেখুন গর্গ-এর চিঠিটা আমি নিয়ে এসেছি। আবার আপনাকে বলছি, আপনার বলা এবং আমার বলায় অনেক তফাৎ। আপনি বললে, 'রবিশঙ্কর সহজ ভাবে কথাটা নেবে, কিন্তু আমি বললে ব্যাপারটা অপ্রিয় হয়ে যাবে।' যুক্তি দিয়ে নানা ভাবে বোঝালেও আলিআকবরের সেই এক উত্তর, 'গর্গ তোমাকে চিঠি লিখেছে, সুতারং তুমিই রবিশঙ্করকে বলো।' আলিআকবরের সঙ্গে কথা বলছি, ইতিমধ্যে রবিশঙ্কর উপরে এসে গেল। রবিশঙ্কর উপরে এসেই আলিআকবরকে বলল, 'আলু ভাই, ধ্যানেশকে একটু উপরে ডাকো তো।' আলিআকবর ধ্যানেশকে ডাকল। ধ্যানেশ আসতেই রবিশঙ্কর আমাদের বলল, 'প্লিজ তোমরা পাশের ঘরে যাও। আমি ধ্যানেশের সঙ্গে একটু কথা বলব।' অবাক হলাম। এমন কি ব্যাপার যা কি আমাদের সামনে বলা চলে না ধ্যানেশকে। পাশের ঘরে গেলেও দরজা খোলা। আমরা রবিশঙ্কর এবং ধ্যানেশকে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ শুনলাম, রবিশঙ্কর ধ্যানেশকে বলছে, 'কিরে, তুই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করিস? নিজের গলা নকল করে বম্বেতে যা বললি, ভেবেছিস আমি বুঝতে পারি নি তুই বলছিস। তোর এত বড় সাহস হোল কি করে?' ধ্যানেশ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি আপনাকে কি বলেছি?' রবিশঙ্কর বলল, 'আবার মিথ্যে ভান করে বলছিস, কি বলেছি? আমি তোর গলার আওয়াজ বুঝব না। ঠিক আছে যা নীচে।' ধ্যানেশ কোন কথা না বলে নীচে চলে গেল। ব্যাপারটা বোধগম্য হোল না।

রবিশঙ্কর এবার আমাদের ডাকল। রবিশঙ্কর আলিআকবরকে বলল, 'দেখ ধ্যানেশ কত

বড় ইডিয়েট। বম্বেতে টেলিফোনে নিজের গলার আওয়াজ বদলিয়ে, আমাকে বলছে, 'কিরে রবিশঙ্কর, তুই অন্নপূর্ণার প্রতি নজর রাখিস না। তাঁর জন্য তোকে দেখে নেব।' এই ধরনের আরও কথা বলে টেলিফোন রেখে দিয়েছে। এখন ব্যাপারটা আমার কাছে সহজ হয়ে এল। বুঝলাম, ধ্যানেশ বম্বেতে গিয়ে বোধ হয় শুনেছে যে, তার পিসিমা অনিয়মিত টাকা পায়, সেইজন্য রবিশঙ্করকে গলা বদলিয়ে শাসিয়েছে। রবিশঙ্করের কথা শুনে আলিআকবর বলল, 'ওটা একটা গাধা। তা না হলে এই ধরনের কথা তোমায় বলে?' এই কথা বলেই, হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে আলিআকবর বলল, 'তুমি রবুকে কি বলবে বলেছিলে সেটা বলো। আমি এখুনি আসছি।' এই কথা বলেই এবাউট টারন্ হয়ে নীচে চলে গেল। রবিশঙ্করও একটু হকচকিয়ে গেল এবং আমিও আলিআকবরের ব্যাপার দেখে অবাক হলাম। রবিশঙ্কর বলল, 'কি ব্যাপার বল তো? আলু ভাই কেন নীচে চলে গেলো? এমন কি কথা তুমি বলবে, যা আলু ভাইএর সামনে বলা চলে না?' মনে মনে ভাবলাম দি 'ওয়ারলড ডাজ নট টরালেট এবসলিউট ট্রুথ।' অপ্রিয় সত্যটা আমাকেই বলতে হবে। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রবিশঙ্কর বলল, 'কি ব্যাপার বলো তো?' বললাম, 'আলিআকবরের কথা আর কি বলব? আলিআকবর এসেছে বাড়ীর উইল খুঁজতে।' এর পর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাটা বললাম। রবিশঙ্কর বেশ মজাই পেল। আলিআকবর সেই যে গেল আর আসবার নাম নেই। আলিআকবর না বললেও, যদি কাছে থাকত। তাহলেও ব্যাপারটা সহজ হ'তো। কিন্তু আলিআকবর এলো না দেখে, এবারে বললাম, 'একটা কথা আলিআকবরকে বলেছিলাম আপনাকে বলতে, কিন্তু সে বলতে নারাজ বলেই আমার উপর ভার দিয়ে নীচে জলে গেছে। যাক। যখন আমাকেই বলতে হবে তখন ভনিতা করে লাভ নেই।' এই বলে গর্গ-এর চিঠিটা পকেট থেকে বার করে রবিশঙ্করকে দিয়ে বললাম, 'আগে এই চিঠিটা পড়ুন, তারপর আমার যা বলবার তা বলব।' রবিশঙ্কর চিঠিটা পড়তে লাগল। মুখের পরিবর্তন দেখলাম। চিঠিটা পড়ে আমার দিকে তাকাতেই চিঠিটা নিয়ে নিলাম। আলিআকবরের সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হয়েছিলো, সেই কথাগুলো বলে বললাম, 'যখন আমাকেই বলতে হবে, প্রথমে একটা কথাই বলব। আজ যে সারাভারত এবং পৃথিবী আপনাকে চিনেছে তার জন্য কেউ জানুক বা না জানুক, আপনি খুব ভাল করেই জানেন তার জন্য অন্নপূর্ণাদেবীর অবদান কতটা? আপনি দীর্ঘদিন কেন দেখা করছেন না, তার কারণ আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি। ঠিক আছে সে বিষয়ে আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু যার সঙ্গে এতদিন ঘর করেছেন, তাঁকে কি এতদিনেও চিনতে পারলেন না যে টাকার মোহ তাঁর কোনদিনই নাই। কিন্তু তাই বলে কি তাঁকে টাকার জন্য বারবার লোক পাঠাতে হবে? এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে? এ ছাড়া আপনি আগে তিনহাজার টাকা দিতেন অথচ উপস্থিত আপনার কি এতই অর্থাভাব হয়েছে, যার জন্য দুই হাজার টাকা দিচ্ছেন।' এক নাগাড়ে যা মনে এল সব বলে গেলাম। বুঝতে পারি নি কখন আমার গলাটা তার সপ্তকে পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্কর বলল, 'যতীন, তুমি অযথা রেগে গেছ। জানি না তুমি বিশ্বাস করবে কি না, আসলে এ সব কথা আমি জানতাম না। ঠিক আছে প্রতি মাসে আমি তিনহাজার টাকাই দেব এবং যাতে মাসের

পয়লা তারিখে অন্নপূর্ণা টাকাটা পেয়ে যায়, তার জন্য বাটলিওয়ালাকে নির্দেশ দিয়ে দেব।' এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেলাম। বললাম আমার আর কিছু বলবার নাই। এই কথা বলেই আলিআকবরকে ডাকলাম। আলিআকবর সঙ্গে সঙ্গে অরুণকে নিয়ে উপরে এলো। এতক্ষণ যে নাটকটি হোল তার চিহ্নও নাই। রবিশঙ্কর অরুণকে দেখেই অভ্যর্থনা করল। অরুণ আমাকে বলল, 'কটা বেজেছে খেয়াল আছে? চলো বাড়ী এবং ওঁদের খেতে দাও।' রবিশঙ্কর বলল, 'সকলেই আজ এখানে খাব।' অরুণ বলল, 'আমার বাড়ীর রান্না খারাপ হবে সুতরাং এখন আমরা যাব।' আমি রবিশঙ্করকে বললাম, 'ইন্টারভিউ নেবার জন্য কখন আসব?' উত্তরে বলল, 'সন্ধের সময় এসো এঁদের সকলকে নিয়ে।' বললাম, 'ঠিক আছে।' মনে মনে ভাবলাম সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চারটে রূপ দেখলাম। একেই বলে দুনিয়াদারী। বুঝলাম এক কথায় টোটালম্যান। ভেতরের রূপটা লুকিয়ে রেখে, বাইরের অমায়িক ভাব দেখাবার আঁটঘাট সব জানে।

গাড়ী করে বাড়ীতে যাবার সময় অরুণ আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার হোল? তোমার গলার জোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম।' অরুণকে সংক্ষেপে সব কথা বললাম। সব শুনে অরুণ বলল, 'আজ সন্ধ্যার সময় আমরা যাবো না। এতদিন এঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিলো, এঁরা কি প্রকৃতির লোক? আজ সন্ধ্যায় তুমি একাই যাও। ইন্টারভিউ একান্তে নিতে পারবে। বাবার কথা ভেবে আগামী কাল আমরা সকলে যাব।' ইতিমধ্যে বাড়ী এসে গেছি। বাড়ীতে এসে দেখলাম, রজত অরোরা বাবার বিষয়ে লিখবার জন্য একটা খাতা নিয়ে এসেছে। বললাম, 'একটু বসুন।' অরোরার সঙ্গে কথা বলার জন্য উপরের ঘরে দীপচন্দ সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অরোরা উপরে গিয়ে বসল।

খাবার খেয়ে উপরের ঘরে গিয়ে বললাম, 'কাল বিকেলে বাবার বাড়ী গিয়ে একটা ফটো ওঠান। উপস্থিত আজ গিয়ে শুনলাম, বাবার কোমা স্টেজ চলছে। ঠিক ম'তো নিজের লোককেও কখনও কখনও চিনতে পারছেন না। উপস্থিত আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর এসেছে। দরকার হলে তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। কেননা তাঁরা পরশু চলে যাবে।' আমার কথা শুনে অরোরা বলল, 'বাবার যখন এইরকম সঙ্গীন অবস্থা, তাহলে তো খাঁ সাহেব এবং পণ্ডিতজীর এই সময় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। দুই তিন দিনের জন্য দেখতে আসার কি প্রয়োজন বুঝি না।' নিজের ঘরের কথা আর কি বলব। তাই বললাম, 'উপস্থিত তাঁদের প্রোগ্রাম আছে বলে চলে যাচ্ছেন।' অরোরা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, প্রোগ্রামটা বড়, না গুরু বড়? যাঁর জন্য এঁরা এত নাম করেছেন, এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন থাকাটাই তো একান্ত প্রয়োজন। হয়ত টাকার লোকসান হবে, কিন্তু বাবার কিছু হয়ে গেলে নিজেদের যে সারাজীবনের জন্য আপশোষ করতে হবে। অবাক হলাম, আপনার কথা শুনে, বাবার এই অবস্থা দেখে, চারদিন থেকেই ছেলে এবং জামাই কি করে চলে যাচ্ছে? এঁদের কাছে গুরুর চেয়ে টাকাটাই বড়? বুঝতে পারি না, এঁরা এত বড় সঙ্গীতজ্ঞ হয়েও কেন বুঝতে পারে না, টাকায় মানুষ বড় হয় না। মানুষ বড় হয় মনুষ্যত্বে। কিন্তু আজকালকার নীতি ঠিক উল্টো। এঁদের কাছে মুখ্য হয়েছে এখন টাকা। টাকার জন্য ছেলেরা আজকাল

বাবা মাকে ভক্তি করে না। ভক্তি ভালবাসার জায়গাটা, আজ টাকাই জবরদখল করে নিয়েছে। আজকাল কেউ কি আর বলে, তাঁর সময় আছে? সময় যার থাকে সে তো বেকার। যাঁর সময় আছে সেও বলে, তাঁর সময় নাই, আর যাঁর সত্যিই সময় নাই, সেও বলে তাঁর সামনে সময় নাই। আর তা ছাড়া সবাই তো সামনের দিকে চেয়ে থাকে। পেছনের দিকে চেয়ে থাকবার কথা কেউ ভাবে না। কিন্তু লোকে বোঝে না, পেছনের দিকে চেয়ে দেখাটাই স্বাস্থ্যকর। পেছন মানে ইতিহাস। যে পেছন জানবে না, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যদি কেউ নিজের পেছন না দেখে, তাহলে তাঁরা আশা করবে কি করে, যে তাঁদের কথা কেউ ভাববে। কবির কথায় বলি,

আই স্লেপ্ট এনড ড্রেমট দ্যাট
লাইফ ওয়াজ বিউটি
আই ওক এনড ফাউণ্ড দ্যাট
লাইফ ওয়াজ ডিউটি।

আসলে কি জানেন, নাম, যশ, প্রতিপত্তি হবার পরই, দেখি লোকে স্বার্থপর হয়ে যায়। স্বার্থপর হতে হতে শেষে মানুষ এত বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে যে নিজের পরম আত্মীয়কে অবধি পর বলে মনে হয় তাঁর কাছে। তাঁদেরও যে আত্মা রয়েছে, প্রাণ রয়েছে, একথা তাঁরা ভুলে যান। তাঁদের আত্মা, তাঁদের দেহ, তাঁদের গৌরব ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে সম্পদ, সম্মান প্রতিপত্তি আর নিরাপত্তা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় যখন মানুষ পৌঁছায়, তখন তাঁর সঙ্গে পার্থক্য থাকে শুধু চেহারায়।' অরোরার কথা শুনে মনে হোল, সত্যই সে দার্শনিকের মতই কথা বলছে। কথাটা ফেলনা নয়। অরোরা বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমি নিশ্চয়ই বিকেলে গিয়ে বাবাকে দর্শন করব, কিন্তু আপনার আসবার আগে মৈহারে এসে একটা দিন থেকে অনেক কিছুই শুনেছি। জব্বলপুর থেকে এসেও অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি।' দেখলাম, হাওয়া উল্টো দিকে চলছে। তাই বললাম, 'আজ সন্ধ্যায় এবং আগামীকাল আমাকে দুজনের ইন্টারভিউ নিতে হবে। এঁরা চলে যাবার পর আপনি যা জানতে চাইবেন তা বলব। তারপর বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আশা করি আপনার ফিচার লেখার সামগ্রি কিছুটা দিতে পারব।। তারপর আপনি দিল্লী চলে যাবেন।' এর ফাঁকে কিছুক্ষণ থেকে, অরোরার প্রশ্নের কিছু জবাব দিলাম। অরোরা চলে গেল। বিকেলে একলাই বাবার বাড়ী একটা খাতা সঙ্গে নিয়ে গেলাম। আলিআকবর এবং রবিশঙ্করকে কি কি প্রশ্ন করব, তার একটা তালিকা আগেই লিখে রেখেছিলাম।

আলিআকবর এবং রবিশঙ্করকে বললাম, 'আলাদা আলাদা একজনের সাক্ষাৎকার নেব।' আলিআকবর বলল, 'আগে রবিশঙ্করের সঙ্গেই কথা বলো। পরে তোমার প্রশ্নের জবাব আমি দেব।' এই কথা বলে আলিআকবর চলে গেল। ইতিমধ্যে জুবেদা বেগম চা দিয়ে গেল। রবিশঙ্কর জুবেদা বেগমকে বলল, 'বৌ, যতীন বাবার সম্বন্ধে বই লিখছে। আমাদের কোথায় বসাবে ও জানে।' আচমকা গ্রাম্যতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জুবেদা বেগমের তীর্যক উক্তি, বাবার পট্টশিষ্য, সেক্রেটারি! পণ্ডিত এখন দেখ কি লেখে?' জুবেদা বেগমকে

বললাম, 'যা বললেন, তাতে কি সন্দেহ আছে? পণ্ডিত না হলেও কলেজের ডিগ্রি আছে। এ ছাড়া পণ্ডিত উপাধিও পেয়েছি। রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'বৌ, এতদিন যতীনকে দেখেও চেন নি? একেবারে বাবার মেজাজ পেয়েছে। ওকে রাগিয়ে দিও না।' এ কথার পরও যখন দেখলাম জুবেদা বেগম দাঁড়িয়ে আছে, বললাম, 'দয়া করে যদি যান তাহলে একটু নিজের কাজ করতে পারি।' উত্তরে বলল, 'কতদিন পরে রবুকে দেখছি। আমারও তো কথা বলতে ইচ্ছে করে।' বললাম, 'কথা বলতে ইচ্ছে করলে রাত ভোর গল্প করবেন। উপস্থিত কাজের সময় অসুবিধা সৃষ্টি না করে দয়া করে যান।' কথা বেড়ে যাচ্ছে দেখে, রবিশঙ্কর বলল, 'বৌ, একদিনে তো সব কথা হবে না, কিছুক্ষণ কথা বলব। কাল সারাদিন আছি। তার মধ্যে আলু ভাই ও আমি যতীনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব।' জুবেদা বেগম চলে গেল। আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই কিন্তু পেলাম না। সেই কথাই এবারে বলি। প্রথমেই রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি যন্ত্রবাদক ঠেকা বলে দেওয়া সত্ত্বেও তবলাবাদক না বাজাতে পারে তাহলে তবলাবাদকের তাতে অপমানিত বোধ করা উচিত?' এ প্রশ্নটা করার আমার একটা কারণ ছিলো। রবিশঙ্কর বোধ হয় সেটা বুঝেই বলল, 'তবলাবাদকের হাত বন্ধ করা তো দুমিনিটের ব্যাপার। এই কথা বলে তিনি আবৃত্তির একটা গৎ গেয়ে বললেন, হঠাৎ যদি এটা বাজাই, কোন তবলাবাদক বাজাতে পারবে?' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'এটা তো রূপক।' উত্তরে বলল, 'তুমি শিখেছ বলে বলতে পারলে।' মাথায় কি হোল, সঙ্গে সঙ্গে চার আবৃত্তির একটা গৎ গেয়ে বললাম এই গৎ যদি বাজাই, তাহলে কি কোন তবলাবাদক বুঝতে পারবে?' পঞ্চাশবার বাজালেও কেউ ধরতে পারবে না। এ ছাড়া নানা তালে এবং ত্রিতালেই অনেক বন্দিস বাজালে, না বলে দিলে কেউ ধরতে পারবে না।' রবিশঙ্কর বলল, 'তুমি শিখেছ, এ কথা তো সত্যই, না বলে দিলে কোন তবলা বাদক ধরতে পারবে না।' বললাম, 'দেখুন আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আপনি অন্য দিকে ঘুরে গেছেন। আমার প্রশ্নটা হোল, যদি যন্ত্রবাদক ঠেকা বলে দেওয়া সত্ত্বেও তবলাবাদক না বাজাতে পারে, তাহলে কি তবলাবাদকের তাতে অপমানিত বোধ করা উচিত?' আমার প্রশ্নটা শুনেই ঘড়ি দেখে বলল, 'কোথা দিয়ে রাত্রি আটটা বেজে গেল? আচ্ছা একটা কথা বলো তো? তোমার বন্ধু আজ কেন এলো না?' বললাম, 'আজ ব্যস্ত আছে। কাল সকালে আসবে।' হঠাৎ রবিশঙ্কর বলল, 'চল তোমার বন্ধুর বাড়ী। একটু ঘুরে আসি। তোমার ভয় নাই, আগামীকাল সকালে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব।' এই কথা বলেই জামা পায়জামা পালটিয়ে, একটা ব্যাগ নিয়ে আমার সঙ্গে বেরোল। আলিআকবরকে দেখে বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসছি যতীনের সঙ্গে।' ব্যাগ দেখে বললাম, 'এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?' রবিশঙ্কর বলল, 'চলই না। পরে দেখবে ব্যাগে কি আছে।' এই বলে গাড়ী চড়ে, অরুণের বাড়ী যেতে বলল।

রবিশঙ্কর ও আমাকে আসতে দেখেই অরুণ ও ইলা অবাক হয়ে গিয়েছে। রবিশঙ্কর বলল, 'তোমরা আজ এলে না বলেই আমি এলাম তোমাদের কাছে।' ইলা বলল, 'আপনারা এসেছেন বাবার সেবা করতে—তাই যাই নি।' কথার মাঝখানেই রবিশঙ্কর বলল, 'দেখ তোমাদের তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। যতীনের বন্ধু হোল তোমার স্বামী

এবং তুমি হোলে তাঁর স্ত্রী।' ইলাও বলল, 'জানেন তো, বাবা আমাকে মা বলে ডাকেন। সেইজন্য আমার স্বামীর বন্ধু হলেও আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আমাকে ঠাকুমা বলে ডাকে।' এ কথা শুনে রবিশঙ্কর বলল, 'তুমি তো দারুণ কথা বলতে পারো।' এই কথাটা বলে ব্যাগটা খুলে একটা রেকর্ডপ্লেয়ার বার করে বলল, 'তোমার জন্য রেডিও কাম রেকর্ড প্লেয়ার এনেছি। আমার একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড এবং কিছু ক্যাসেট এনেছি। এগুলো তোমরা শুনো। পরের বার আরো রেকর্ড দেবো। তুমি ও তোমার স্বামী বাবার জন্য এত করো, সত্যি ভাবা যায় না। তোমাদের ঋণ শোধ করা যায় না। এটা কেবল আমার চিহ্ন স্বরূপ দিলাম।' ইলা মেসিন দেখে বলল, 'দেখুন, যখন খুব ছোট ছিলাম সেই সময় বাবা আমাদের স্কুলে বাজিয়েছেন। সেই সময় বাবা আমার অটোগ্রাফ খাতায় সই করে একটা কবিতা লিখেছিলেন। সেই সময় বাবাকে দেখে আমার শ্রদ্ধা হয়েছিল। তারপর বড় হয়ে বিয়ের পর নানা জায়গা ঘুরে ছয় বছর মৈহারে বদলী হয়ে আমরা এসেছি। সেই সময় আমার স্বামীর বন্ধুকে দেখলাম।' ইলা এবার আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই নাতি, আমার মেয়েদের সেতার এবং সরোদ শেখাচ্ছে। মৈহারে এসেই বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়। আমাদের সৌভাগ্য বাবাকে রোজ দেখতে পাই। তবে যেটা করি সেটা আন্তরিক, লোক দেখান নয়।' হঠাৎ আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রবিশঙ্করকে বলল, 'নাতি আমাকে বলে, ঠাকুমা, তুমি ছেলে হতে গিয়ে মেয়ে হয়ে গিয়েছ, কেননা তুমি নাকি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলো। তাই আপনাকেও বলছি, আপনি যা আমাকে দিলেন তার জন্য ধন্যবাদ। অন্য কেউ হলে ফেরৎ দিয়ে দিতাম, কেননা আমি মনে করি ভদ্রতা মানেই ভীরুতা এবং ভণ্ডামীর মুখোস। তাই বলছি, এটা আমাকে না দিয়ে যদি দিদিকে অর্থাৎ অন্নপূর্ণা দিদিকে দিতেন তা হলে আমি খুশী হতাম।' রবিশঙ্কর এ ধরনের কথা শুনবে আশা করে নি। রবিশঙ্কর এতক্ষণ চুপ করে সব শোনার পর বলল, 'যতীন ঠিকই বলে। এই মেসিনটা নাও নইলে লাঠি দিয়ে তোমাকে মারব।' হঠাৎ রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'তোমার বন্ধু পত্নীকে দেখে, আমার ডি. সি. এম. এর বিনয় ভরত রামের স্ত্রীর কথা মনে হচ্ছে। উভয়ের মধ্যে অনেক মিল আছে।' ইলা সঙ্গে সঙ্গে কফি ও চানাচুর এনে বলল, 'এখন আর কি খাওয়াতে পারি। আগে আসছেন জানলে কিছু করতাম। যাক এসেছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

রবিশঙ্কর অরুণের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে কফি খেয়ে আমাকে বলল, 'এখন চল বাড়ী, কাল সকালে তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব।' এরপর রবিশঙ্করের সঙ্গে বাড়ী গিয়ে বাবাকে দেখলাম, নিঃসাড়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। কিছুক্ষণ বাবার কাছে বসে বাড়ী চলে এলাম। বাড়ী আসবার সময় রবিশঙ্করের ব্যাগ-এর রহস্য বুঝলাম। এ যাবৎ শুনে আসছি, রবিশঙ্কর সকলকেই কিছু না কিছু উপহার দেয়। আজ নিজের চোখে দেখলাম। সর্বদাই কি রবিশঙ্কর নিজের কাছে উপহার দেবার জিনিষ রাখে? যাক এ হোল ট্রেড সিক্রেট। পরের দিন সকালেই বাবার কাছে গেলাম। রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার সব নেওয়া হোল না। সে যখন আমার খাতায় দেখল আরও প্রশ্ন আছে, হঠাৎ বলল, 'দেখ মাথাটা ভার ভার লাগছে। পরের মাসে তুমি, কোলকাতায় তো যাচ্ছো বাজাতে। সেই সময় তোমার বাকী প্রশ্নের জবাব

দেবো।' বললাম, 'কোলকাতায় আপনি তো ব্যস্ত থাকবেন। তার মধ্যে কোথায় কথা হবে?' রবিশঙ্কর নিজের ডায়রি থেকে দিন এবং সময় দেখে বলল, কখন নিশ্চিন্তে বসে কথা বলতে পারবে। বললাম, 'ঠিক আছে।'

এরপর আলি আকবরের কাছে গিয়ে প্রশ্নের তালিকা খুলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা নিজের হাতে লেখা খাতায়, 'আমার জীবনী' লিখেছিলেন। সেটা আমায় পড়িয়েছিলেন। সেই খাতাটা আমার দরকার।' উত্তরে আলিআকবর বলল, 'সেই খাতা এবং বাবার সব খাতা আমি আমেরিকা নিয়ে গিয়েছি।' বললাম, 'তাহলে আমি কি করে সেটা পাব। আলিআকবর বলল, 'ঠিক আছে পরের মাসে আমেরিকা গিয়েই আমি বাবার লেখা 'আমার জীবনী', কোলকাতায় আমার সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়ে দেব।' সেক্রেটারি সেটি অন্য খাতায় লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। যদিও আমার জানা ছিল, তা সত্ত্বেও বললাম, 'একটা কথা বলুন তো। বাবার তৈরী রাগ সম্বন্ধে খাতায় বাবা কি লিখেছেন?' আলিআকবর বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, বাবার লেখাটা পড়বার আমি এ যাবৎ সময় পাই নি।' বললাম, 'ঠিক আছে যথাশীঘ্র আমেরিকা গিয়েই খাতাটা পাঠাবেন এবং সেক্রেটারিকে বলবেন, অন্য খাতায় লিখে আমাকে না পাঠিয়ে মদনলাল ব্যাসকে যেন পাঠিয়ে দেয়। কেননা আমাকে পাঠালে সেটা আবার আমাকে ব্যাসকে পাঠাতে হবে। ব্যাস, সেটা পেলে হিন্দিতে অনুবাদ করে রাখবে। তারপর আমি বম্বে গিয়ে সব ঠিক করব।' আলিআকবর আমাকে বলল, 'ঠিক আছে খাতা ব্যাসকেই সেক্রেটারি পাঠিয়ে দেবে, তবে আমার একটা সর্ত আছে।' অবাক হয়ে বললাম, 'কি সর্ত?' আলিআকবর বলল, 'জানি না তুমি কি লিখবে? বইটা লিখে প্রথমে আমার কাছে পাঠাবে। সেটা আমি পড়ে যদি ঠিক বুঝি, তাহলেই তুমি বই ছাপতে পারবে। এ কথা শুনেই বললাম, 'কি বললেন? যে লোক তাঁর বাবার নিজের হাতের লেখা জীবনী, ছোট থেকে পঁচাত্তর বয়স পর্যন্ত সব ঘটনা পাওয়া সত্ত্বেও পড়বার সময় পায়নি, সেই লোক আমার মোটা বই কখন পড়বে? আপনি পড়ে উপযুক্ত হয়েছে কি না বুঝে পাঠালে, বোধ হয় জীবনে সে বই ছাপান হবে না। ভাল করে একটা কথা শুনে রাখুন। বাবার জীবনী লিখছি তাঁর আদেশে। আপনার ভয় নেই। আপনার কেচ্ছা লিখব না। বাবার খাতাটা না পাঠালেও বই আমি লিখবই। তবে সে খাতাটা পেলে আমার সুবিধা হবে নিঃসন্দেহে। তবে এটা ঠিক, বই লিখে আপনাকে তার পাণ্ডুলিপি কোন মতেই পাঠাব না। ইচ্ছা হলে দেবেন আর নইলে দেবেন না। আগে বলেছি, আবার বলছি, অবাক হলাম আপনার কথা শুনে। বাবার নিজের লেখা জীবনী পড়বার সময় হয় নি? বাবার লেখাটা আমি দুবার পড়েছি। অথচ আপনার বাবার কত অজানা কথা জানবার কৌতূহল হয় নি?' আলিআকবর আমার মুখের চেহারা এবং কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে পাঠাতে হবে না তোমার পাণ্ডুলিপি। আমি আমার সেক্রেটারিকে বলে দেব খাতাটা দেখে, অন্য খাতায় লিখে, মদনলাল ব্যাসকে যেন পাঠিয়ে দেয়।' বললাম, 'কথাটা মনে রাখবেন। বাবার আদেশ বলেই লিখছি। এ কাজটা বহু আগে আপনারই করা উচিৎ ছিলো। মনে রাখবেন বাবা হলেন সকলের বাবা।' আলিআকবর আমার কথা থামিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি শীঘ্রই পাঠিয়ে দেবো। এখন বলো কি জিনিষ আমার কাছে জানতে

চাও?' এ কথা শুনেই এক এক করে প্রশ্নের তালিকা দেখে এক একটা প্রশ্ন করতে লাগলাম। আলিআকবর সব প্রশ্নের জবাব দিলো।

দেখতে দেখতে যে কখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে খেয়াল নাই। খেয়াল হোল জুবেদা বেগমের কথায়। বলল, 'খালি কথা বললেই চলবে? খেতে হবে না?' কথায় কথায় চার ঘণ্টা লেগে গেছে বুঝতেই পারি নি। সবে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি, ইতিমধ্যে নিচের থেকে আওয়াজ পেলাম দীপচন্দের। শুনতে পেলাম জুবেদা বেগম বলছে 'এখন তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হবে না। দীপচন্দও কড়া ধাতের ছেলে। বলল, 'কেন হবে না? আমার ভাইদের সঙ্গে দেখা হবে না?' দীপচন্দ বেশ জোরেই কথা বলছে। বাবা হঠাৎ সজাগ হয়েছেন জোর আওয়াজ পেয়ে। বাবা বললেন, 'কে, কে?' দীপচন্দ বলল, 'বাবা আমি।' বাবা চিনতে পারলেন। দীপচন্দ বাবার কাছে যেতেই বাবা হাত ধরে কেঁদে ফেললেন। বুঝলাম, বাবার অবস্থাটা এখন ভালো। দীপচন্দের আওয়াজ পেয়েই, আলিআকবর বলল, 'দীপচন্দকে উপরে পাঠিয়ে দাও।' দীপচন্দের সঙ্গে আমিও উপরে গেলাম। আলিআকবর দীপচন্দকে ঘরে বসাল। দীপচন্দ্র আলিআকবরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'গতবছর সঙ্গীত সমারোহ হয় নি, কিন্তু এবারে বাবার নামে যে সঙ্গীত সমারোহ হবে, সেই সময় আপনাকে আসতেই হবে। কোন সময়ে আপনি খালি থাকবেন জানতে পারলে, সেই সময় সঙ্গীতের আয়োজন করব।' এরপর রবিশঙ্করকে বলল, 'আপনি দীর্ঘদিন মৈহারে আসেন নি। এবারে আপনাকে আসতে হবে।' আলিআকবর রবিশঙ্করকে বাংলায় বলল, 'দুবছর আগে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারপর আর বাজাবার ইচ্ছা নাই।' দীপচন্দ বাংলা বুঝতে না পেরে বলল, 'কি বলছেন?' রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আরে তোমরা আছ বলেই তো আমরা নিশ্চিন্তে বাইরে থাকি। প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই হবে। ঠিক আছে, আগামীকাল সকাল এগারটার সময় তুমি এসো, সেই সময় তারিখ ঠিক করে বলব।' ইতিমধ্যে জুবেদা বেগম কখন উপরে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ দেখতে পায়নি। হঠাৎ জুবেদা বেগমের কথা শুনে তাঁর উপস্থিতি সকলেই বুঝতে পারলাম। জুবেদা বেগম বেশ জোর গলায় বলল, 'দুবছর আগে তোমরা যে নোংরামী করেছ, সেইজন্য এঁরা কেউ বাজাবে না।' দীপচন্দ বলল, 'ভাবী ছেলেদের মধ্যে আপনি কেন কথা বলছেন?' জুবেদা বেগম আরো জোর গলায় বলল, 'বাধ্য হয়েই বলছি, এই প্রোগ্রাম নহি হোগা, নহি হোগা, নহি হোগা।' দীপচন্দ হঠাৎ চতুর্গুণ আওয়াজ করে বলল, 'হোগা, হোগা, হোগা।' রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'বৌ তুমি নিচে যাও।' রবিশঙ্কর জানে, মৈহারে বিপদের সময় এঁরাই সব করে, তাই কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'আসলে দুই বছর আগে অনেক বাধা এসেছিলো বলে তোমার বৌদি এ কথা বলেছে।' কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। দীপচন্দ বলল, 'ঠিক আছে। তবে একটা কথা বলুন, আমাদের কথার সময় ভাবীর আসার কোন যুক্তি আছে।' রবিশঙ্কর বলল, 'যা হয়েছে ভুলে যাও। পরশু দুপুর বেলায় তুমি নিশ্চয়ই এসো। সেই সময় সকালে বসে দিন ঠিক করা যাবে।' দীপচন্দ সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে বলল, 'ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি।' রবিশঙ্কর দীপচন্দকে চা খাবার জন্য বলল, কিন্তু দীপচন্দ এই দুপুরে চা খাবে না বলে চলে গেল।

পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বললাম, 'কি রূপকই দিলেন। আপনার কথার অগণ্য অর্থ, একটা চাহনির অসংখ্য ব্যাখ্যা, আর এক একটা ভঙ্গীর অজস্র ভাষা। বহু কিছু শিখবার আছে আপনার কাছে। কাল সকাল নয়টার সময় আপনারা চলে যাচ্ছেন, আর ডাকলেন দুপুরবেলায়?' রবিশঙ্কর একটু ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে বলল, 'আরে বাবু কিছুদিন আমার সঙ্গত কর, তাহলে এ সব বুঝবে।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'দরকার নাই আপনার সঙ্গে সঙ্গত করবার। তবে একটা কথা মনে রাখবেন। আপনি যে মনে মনে দীপচন্দকে মিথ্যা আশ্বাস দিলেন সেটা ওর কাছে খুব বড় নয়। ওঁদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন। নিজের ব্যবসা ছেড়ে, যাঁরা এত পরিশ্রমে বাবার জন্য এই সমারোহ করে, সেটা ভোলেন কি করে? এ কাজটা তো আমাদেরই করা উচিত। এ ছাড়া বিপদে যখন এখানে কেউ থাকবে না, এঁরাই এসে কিন্তু সব করবে। কাল দুপুরে এসে যখন দেখবে, আপনারা চলে গেছেন, তখন ওই যে আগে বললাম, 'ওঁদের চোখে ছোট হয়ে যাবেন।' রবিশঙ্কর বলল, 'কি করব বল? সকলের মন যুগিয়ে কি চলা যায়? উত্তরে বললাম, 'সকলের সঙ্গে দীপচন্দের তুলনা করবেন না। বাবা দীপচন্দ, তাঁর বাবা এবং এঁদের সকলকে কত ভালবাসেন তা কি জানেন না? এ ছাড়া দীপচন্দ বাবার জন্য যা করেছে কজনে তা করেছে?' রবিশঙ্কর চুপ করে গেল। এর পর নীচে নেমে বাবার কাছে গিয়ে আমরা বসলাম। বাবা এই সময় আধো জাগা অবস্থায় ছিলেন। বাবার কপালে গিয়ে যে মুহূর্তে হাত রাখলাম, এবং হাতটা ধরে একটু চিপতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে বাবা ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' আমাদের নাম বললাম। বাবা তাকালেন। হঠাৎ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে দুজনকেই বললাম, 'আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যাঁরা অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক তাঁরা যখন মাঝে মাঝে কথায় কথায় কেঁদে ফেলেন, সেটা ভাল লক্ষণ নয়। বোধ হয় বাবা আর বেশীদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন না। সুতরাং যদি পারেন তো মাঝে মাঝে আসবেন। আলিআকবর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ধ্যানেশের বিয়ের রিসেপসান-এর পরের দিনই, আমি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাবো।' বললাম, 'যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমার যা বলবার তা বলে দিলাম।' রবিশঙ্কর বলল, 'পরের মাসের শেষ সপ্তাহে, আমিও আমেরিকা চলে যাব।'

৫৯

সকালে বাবার বাড়ী গিয়ে দেখি, আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর দুজনেই নীচে রয়েছে। কথায় কথায় রবিশঙ্কর বলল, 'বাবা এত সাত্ত্বিক জীবন পালন করেও জীবনের শেষে এত কষ্ট কেন পাচ্ছেন বুঝি না। মনে হয় মৈহারের মহারাজ-এর সামনে আদব কায়দা মানতে হ'তো বলে, বাবা মনে মনে অসন্তুষ্ট হতেন। যার ফলে সেই রাগটা বাড়ীর সকলের উপর পড়ত। তাই বোধ হয় এত কষ্ট হচ্ছে।' আলিআকবরও বলল, 'ঠিক বলেছ। যোধপুর মহারাজের আনুগত্যে থেকে আমারও মনে মাঝে মাঝে আকাশে মেঘ জমতো। যাঁর জন্য নিজের প্রতি কখনও কখনও ঘৃণা হ'তো। রাত্রি দুটোর সময় রাজা ডেকে পাঠাল, বাজনা শুনবে বলে। এ কি জ্বালা।' দুজনের কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'বা-বা আপনাদের দার্শনিকের ব্যাখ্যা শুনে হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে। বাবা রাগটা পেয়েছিলেন হেরিডিটারি সূত্রে অর্থাৎ বাবা

তাঁর মায়ের মত রাগটা পেয়েছেন এবং বিনয়টা পেয়েছেন নিজের বাবার মতন।' আলিআকবরকে বললাম, 'আপনি বাবার থেকে সঙ্গীত পেয়েছেন এবং মায়ের মত সহনশীলতা পেয়েছেন। বাবা মা'কে হাজার কিছু বললেও মা'র মুখে যেমন কোন আওয়াজ বেরোত না, আপনিও তেমনি সহজে মুখ খোলেন না, এবারে রবিশঙ্করকে বললাম, 'আপনি বাবার কষ্টের যে কারণ বললেন, আদপে তা নয়।' পরমহংসদেবের মত এত বড় সত্যদ্রষ্টা হয়েও শেষ জীবনে কেন কষ্ট পেয়েছিলেন? আসলে আমাদের মত পাপীরা তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে নিজেদের পাপটা বাবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। সেইজন্য কষ্ট হচ্ছে বাবার।' এই কথা বলেই চুপ করে গেলাম। রবিশঙ্কর কিছু না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আলিআকবর নির্বিকার। মনে হয়েছিল রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরকে বলি, চিত্রগুপ্তের খাতায় যা লেখা আছে তা হবেই। প্রতিটি সেকেণ্ড, প্রত্যেকের জীবনে যা হবার তা লেখা আছে। কি করে এঁদের বোঝাব, নো, দ্যাট অল দ্যাট মুভস ইন দি মুভিং ওয়ারলড ইস হেলড বাই দি ইনিফিনিটি অফ গড।' মনে পড়ে গেল, কবিগুরুর কথা, "পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।" যাক এ সব কথা বলে লাভ নাই। আসলে এঁরা হোল রিয়ালিষ্ট। এঁদের কাছে আইডিয়ালিষ্টের কোন মূল্য নাই। হঠাৎ রবিশঙ্কর আমাকে বলল, 'যতীন তুমি একটা কাজ করতে পার, বাবার কথা ভেবে। বাবার আদর্শ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে তুমি সব করেছ। তুমি মৈহার এসে প্রিন্সিপাল পদের ভার গ্রহণ করো। উপস্থিত বাবা না যাওয়াতে, যে আদর্শে বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তুমি এলেই আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে যাবে। তুমি এখানে কাজ করবে এবং বাইরে গিয়ে বাজাতেও পারবে। তুমি রাজী হলেই, মধ্যপ্রদেশের চিফ মিনিস্টারকে বলে আমি ব্যবস্থা করে দেব।' আমার হাসি পেয়ে গেল এই কথা শুনে। বললাম, 'জীবনে এই প্রথম আমার কথা চিন্তা করলেন। কলেজে কাজ করতে চাইলে, আমি তো অনেক জায়গায় করতে পারতাম, কিন্তু সেটা আমি কোনকালেই করতে চাই না। সকলকে আমেরিকা এবং নানা জায়গায় সঙ্গীতের কার্যক্রম করান, কিন্তু আমার বেলায় সে সব না করে এই মৈহারেই থাকাটা উপযুক্ত মনে করলেন।' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'দেখ জঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল আছে। প্লিজ তুমি রাজী হলেই আমি ব্যবস্থা করে দেব।' বললাম, 'যদি জঙ্গলেই মঙ্গল থাকে, তাহলে আপনি এসেই থাকুন না। আপনার বাচনভঙ্গি অনেক সময় মুখের কথার চেয়েও অনেক বেশী অর্থবহ হয়। ঠিক আছে। তবে একটা কথা শুনে রাখুন, যতদিন বাবা বেঁচে থাকবেন ততদিন আমি মৈহারের কলেজে থাকব, কিন্তু যে দিন বাবা থাকবেন না সেইদিনই আমি চলে যাব। বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবা বরাবরই বলতেন, 'আমি হলাম বুদ্ধিমান, আর সব গরু, জান না যে যারে ঠকাতে চায়, সে তাঁর গুরু।' জীবনে, এই যে আমার কথা কেন চিন্তা করেছেন, তা আমি বুঝি।' রবিশঙ্কর আমার কাছে এই কথা শুনবে আশা করে নি। যদিও আমি বাবার কথা ভেবে রাজী হয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে রাখা হয় নি। সেখানেও বাবার ভাষায় পারটি, পারটি। আমার জন্য ভালই হয়েছিলো কিন্তু চক্রান্ত করে যে মূর্খের সুপারিশ করা

হয়েছিলো প্রিন্সিপাল পোষ্টের জন্য, মধ্যপ্রদেশ সরকার তাঁকে রাখেনি কেননা প্রিন্সিপাল বানান করার যোগ্যতাও তাঁর ছিলো না। যাক, সে সব লিখে জল ঘোলা করার প্রয়োজন নাই। আমার মৈহারে কলেজে থাকবার প্রস্তাব দেবার পরই আমি অরুণের বাড়ী চলে গেলাম। বাড়ী এসে রবিশঙ্করের কথাটাই বারবার মনে পড়তে লাগলো। মনে মনে বলি, জঙ্গল-এর সঙ্গে আমাদের দুনিয়াটাতে প্রভেদ কোথায়? জঙ্গলে পশুরা থাকে। সেখানে খিদে পেলে তারা শিকার করে খায়। কিন্তু আমাদের সমাজে খিদে পাক বা না পাক, সবসময় কার ক্ষতি করব, কাকে ঠকাবো, কেবল এই ভাবনাই সবাই করছে। যার জন্য মনটাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে, সঙ্গীত সাধনার ফলে কি করলে সহজে কিস্তিমাত করা যায়, তারই সাধনা চলছে। ব্যাপারটা যে কত সত্য সে কথা আগেই লিখেছি।

বাবার কাছে কিছুক্ষণ বসে থেকে অরুণের বাড়ী চলে এলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, রবিশঙ্কর ও আলিআকবরের সঙ্গীত ছাড়া, এঁদের বিচার ধারা, যাক এ কথা। ঘুরে ফিরে বাবার কথাই মনে পড়তে লাগলো। মানুষের একটা বড় অভিযোগ। তাঁর ইচ্ছা ম'তো কাজ হয় না। একদিন বাবা সঙ্গীতের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। বাবা সব ত্যাগ করে ভেবেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অন্ততঃ তাঁর এই মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। কিন্তু তিনি ইতিহাসের অলক্ষ্য নির্দেশের আভাষ অনুমান করতে পারেন নি। বাবা সকলকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পর যাঁরা আসবে, তাঁরা যেন তাঁর দেখানো পথ দিয়ে চলে। কিন্তু তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে তাঁর কপালে এত দুর্ভোগ আছে? তিনি কি ভাবতে পেরেছিলেন, তাঁর নাম মুছে দেবার জন্য সকলেই নিজের নিজের ঢাক পেটাবে। না, এর ব্যতিক্রম অবশ্য ছিলো। আজ এতদিন পরে সেদিনকার কথাগুলো ভাবতে গিয়ে মনে মনে অবাক হই। সেদিনকার মৈহার, আর আজকের মৈহার। আশ্চর্য! আজও ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মানুষ ভাবে একরকম, আর হয় আরেক রকম। বাবা কত কিছু আশা করেছিলেন, কিন্তু সব সঙ্কল্প কেন বানচাল হয়ে গেল? কেন, কেন, কেন? কে এর উত্তর দেবে? যাক এ তো অনেক পরের কথা। বাবার এখান থেকে বাড়ী গিয়েই দেখি রজত অরোরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এখনও অনেক কিছু বাবার বিষয় জানতে চায়। বললাম, 'আগামীকাল দুপুরের পর বাবার বিষয়ে যা জানতে চান সব বলব।'

বিকেল বেলায় বাবার কাছে গেলাম। আগামীকাল আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর চলে যাবে। বাবার শরীর সেই একরকম। এক এক সময় চিনতে পারেন আবার পর মুহূর্তেই শুয়ে পড়েন। আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কত কাণ্ডই না হয়ে গেল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় মনে হোল যেন কিছুই হয় নি। রবিশঙ্কর বলল, 'আগামীকাল দীপচন্দ দুপুরে এলে বলে দিও, হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে একজন লোক এসেছিলো বিশেষ কাজে যার জন্য আমরা চলে গেছি। পরে দেখা হলে, সঙ্গীত সমারোহের দিন ঠিক করব।' অবাক হয়ে ভাবি কথা বলতে পয়সা খরচা তো হয় না। সুতরাং আশ্বাস দিলে ক্ষতি কি। চুপ করে থাকতে দেখে রবিশঙ্কর বলল, 'আগামীকাল আমরা ঠিক সকাল নয়টার সময় চলে যাবো। তুমি প্লিজ সকালে এখানে চলে এসো। তোমার সঙ্গে দেখাও হবে, এবং তারপর তুমি বাবার কাছে দুপুর অবধি থেকো

যতক্ষণ না দীপচন্দ আসে।' চুপ করে শুনলাম কিন্তু কোন উত্তর দিলাম না। এ কথা শুনে মনে হোল বাবা ছিলেন আড়তদার কিন্তু আজকাল সকলকেই দেখছি খুচরো কারবারি।

অনুগ্রহ প্রার্থীদের সামনে সাবলীল গতিতে মিথ্যে কথা বলা, আর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা খুব বেশী লোকের নাই। অভিনয়ের লাইনে গেলে বোধ হয় আরো বেশী নাম করতে পারতো। যাক, যার যা ইচ্ছা তাই করুক, এ সব ভেবে লাভ নাই। আমি বাবার কাছে গিয়ে বসলাম। বাবাকে দেখে মনে হোল যতক্ষণ মানুষ কাজ করতে পারে ততক্ষণই মানুষের কদর। যতক্ষণ অন্ধকার থাকে ততক্ষণই আলোর কদর। অন্ধকার কেটে গিয়ে যখন সকাল হয়, তখন আলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এ না হলে বাবার এই অবস্থায় একজনেরও টিকি দেখতে পাচ্ছি না কেন? সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত? আজকাল বেশীর ভাগ মানুষই নিজের চিন্তাতে এত বুঁদ হয়ে থাকে যে অন্যের বিপদ আপদ সুখ অসুখ তাঁদের যেন ছুঁতেই পারে না। এই আত্মমগ্নতা একধরনের অন্ধ বিবর। এখানে কোনরকমে আলোই পৌঁছয় না। বাবার কাছ থেকে এসে দেখা করলাম আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে। রবিশঙ্কর বললো, 'কোলকাতায় নিশ্চয়ই দেখা কোরো। বাই দি ওয়ে তোমার বন্ধু তো আজও এলো না।' বললাম, 'আপনারা বাবার সেবা করবার জন্য এসেছিলেন বলে আসছে না। আপনারা চলে গেলেই নিয়মিত দুইবেলা আসবে। ওষুধের দরকার হলে সাতনা থেকে অরুণ ওষুধ এনে দেবে। আর যেহেতু জুবেদা বেগম বাড়ীর কাজে ব্যস্ত থাকে, তাই অরুণের বৌ এসে সারাশরীর পুঁছিয়ে দেবে এবং চাদর খারাপ হবার পর চাদর পালটিয়ে পাউডার লাগিয়ে দেবে। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বিদেশ যাত্রা করুন।'

পরের দিন সতেরই জানুয়ারি, সকালেই বাবার বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর নাস্তা করছে। আমার কি মনে হোল জানি না, মা'কে গিয়ে বললাম, 'মা আপনি আপনার জামাইকে বলুন, সে যেন আপনার মেয়েকে কষ্ট না দেয়।' মা কি বুঝলেন জানি না, বললেন, 'ঠিক আছে।' বাড়ীর কিছু সদস্যরা বুঝতে পারল, মা'কে এই কথা বলতে বলছি। অবাক হলাম নিজের লোকেরাই বলতে বারণ করল। যাঁরা চিরকাল অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে ঋণী তাঁদের এই ঘৃণ্য মনোভাব কেন?

আলি আকবর আমাকে বলল, 'কিছুদিন পরেই ধ্যানেশ, কোলকাতায় যাবে।' বললাম, 'এখানে মা একলা কি করে সামলাবে?' আলিআকবর বলল, 'চাকর, চাকরানি তো আছে এখানে।' অবাক হলাম কথা শুনে। বললাম, 'এতদিন তো এখানে ছিলেন। বাবার বিছানা রোজ খারাপ হয়ে যায়। এই সময়ে সারা দিন রাতের জন্য নার্সের দরকার। সে কথা কি ভেবে দেখেছেন?' আলিআকবর বলল, 'কিছুদিন পরে ধ্যানেশ ও তার মাকে মৈহারে পাঠিয়ে দেবো।' বলার আর কিছু নাই। দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল।

যাবার আগে আলি আকবর বলল, 'আমার হয়ে তোমার বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রীকে বোলো একবার যেন বাবাকে রোজ দেখে যায়।' বললাম, 'সে কথা বলতে হবে না। তারা নিজের থেকেই আসবে।' ইতিমধ্যে মা এসে সোজা রবিশঙ্করের হাত ধরে বললেন, 'রবু, আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও যে অন্নপূর্ণাকে বরাবর দেখবে। অন্নপূর্ণা তোমার বাবা এবং আমার কাছে

প্রাণের চেয়ে বড়। অন্নপূর্ণা বাজনা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সব শিখিয়ে নিও। তার বাজনা যেন বন্ধ না হয়। সে যেন কষ্ট না পায়।' এই কথা বলেই মা কেঁদে ফেললেন। রবিশঙ্কর হকচকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে দেখল। বুঝলাম বুঝতে পেরেছে আমি মা'কে কিছু বলেছি। রবিশঙ্করের হাত ধরে রয়েছেন মা। রবিশঙ্কর বলল, 'মা আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার মেয়ের ভার আমাকে দিয়েছেন। তার কোন কষ্ট হবে না।' অবাক হয়ে ভাবলাম, মা'কে বলতে নিজের লোকেরাই কেন বারণ করতে লাগল, রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণার খেয়াল রাখে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পান থেকে চুন খসলে আপনার জনেরাই সরে যায়। যাক এরপরই আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর চলে গেল গাড়ী করে। মনে মনে ভাবি, ইতিহাসের বিধান বোধ হয় তা নয়। ইতিহাস বিধাতা বোধ হয় তখন অলক্ষ্যে কটাক্ষ করেছিলেন রবিশঙ্করের প্রতিশ্রুতি শুনে। নইলে এমন করে সব প্রতিজ্ঞা, সব প্রতিশ্রুতি বানচাল হয়ে গেল কেন ঠিক নয় বছর পরে। এঁদের কাছে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য কি আছে? ধীরে ধীরে বাবার কাছে বসলাম। এক এক সময় বাবাকে খুব স্বাভাবিক দেখি আবার পরমুহূর্তেই তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখি। কিন্তু আজ বাবা বুঝেছেন আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর চলে গেছে। ভাঙ্গা গলায় বাবা বললেন, 'ওরা চলে গেছে?' বললাম, 'হ্যাঁ।' বাবা বললো, 'আর কাউকে আসতে হবে না। কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ চলে যাব।' চোখ দুটো দেখি ছলছল করছে, মনে হয় কিছু ভাবছেন। ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে বললেন,

'মন মাঝি তোর বৈঠানেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

এ কথা বলার পরই আবার দেখলাম, বাবার চোখে জল। বাবার চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম বাবা চোখ বুজে শুয়ে পড়েছেন। দুপুর অবধি বাবার কাছেই রইলাম। বাবার কথাগুলো মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করল। আজকের যুগে প্রায় এক মনোভাব। জীবনটা আরামে ভোগ করো। ভালো থাকার সংজ্ঞা তাঁদের আলাদা, তাই বিপর্যয়ের মধ্যেই তাঁরা আরাম পায়। কিন্তু সংসারে এমন একজনও থাকে যে বলে এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও প্রভু। এর থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো। বাবা হোলেন এই শেষোক্তর দলে। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বরাবর এই কথা বাবার মুখে শুনেছি। কিন্তু আজ সেই কথাটার সুরে অন্যরকম লাগলো। মৃত্যুটা নিশ্চিত বলেই, অনিশ্চিত জীবনটাকে এত ভাল লাগে। জীবন তো থেমে থাকে না, সে চলে। একদিন বাবাও এমনি করে চলতে আরম্ভ করেছিলেন। মাঝ পথে অনেকেই থেমে যায়। কিন্তু থামবার জন্য তো বাবা জন্মান নি। কিন্তু বাবার কথা শুনে মনে হোল, বাবা ক্লান্ত হয়ে আজ বোধ হয় থামতে চাইছেন। ঘোলাটে চোখ দেখে মনে হোল, বোধ হয় কিছু দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু দীপচন্দ এখনো এলো না কেন? এবার আমার যাবার সময় হয়েছে। মা'য়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। মা বললেন, 'বেড়া তোমার কথা মত রবুকে তো বললাম। কিন্তু তুমি তো জান না আমার অন্নপূর্ণার কি কষ্ট। রবু আমার অন্নপূর্ণার কাছে যায় না। একটা মাইয়া নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কথায় আছে 'ঘরের বউ রইল পড়ে, হিঁজড়ে হোল পোয়াতি।' নিজের ঘরের দিকে চিন্তা

ভাবনার কিছু নাই।' এ কথা বলেই মা কেঁদে বললেন, 'চিরটাকাল কষ্টই করে গেলাম। এই বয়সে তোমার বাবার কত কষ্ট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ। তারপর অন্নপূর্ণার কত কষ্ট। সে তো কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু আমি তার মা। আমি তো জানি তার কষ্ট হলেও কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু আল্লা আমাকে সব দেখিয়ে দেন। এদের সকলকে রেখে যদি যেতে পারি তাহলে আল্লার মেহেরবাণী। জানি না আল্লা কত কিছু দেখাবে এখনও।' মা'কে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'কোন চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমি যাচ্ছি।' মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তোমার বন্ধুকে, বৌমা এবং নাতিদের নিয়ে আসতে বোলো। কয়েকদিন তো তারা আসছে না। বললাম, 'আজ সন্ধ্যার সময় আসবে।' মনে মনে মা'র কথাগুলোই ভাসতে লাগল।। মা এক একটা কথা এমন করে বলে যে অবাক হয়ে যাই। মা'কে নিশ্চয়ই কেউ বলেছে। আসলে ফুলের গন্ধ আর প্রেম চাপা থাকে না। বাতাসে ভেসে বেড়ায়। মা'র কানেও কোন মন্থরা নিশ্চয়ই বলেছে। কিন্তু মা এ কি কথা বলল?' 'ঘরের বউ রইল পড়ে, হিজড়ে হোল পোয়াতি।' বোধ হয় গ্রাম্য কথা। এ যাবৎ এ কথা তো কখনও শুনিনি।

বাড়ী গিয়ে অরুণকে কিছু বলবার আগেই বলল, 'জানো তো কি হয়েছে?' অবাক হয়ে বললাম, 'কি হয়েছে?' অরুণ বলল, 'সকালে দীপচন্দ এবং সঙ্গীতের কর্মকর্তারা পেট্রোল পাম্পের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। এঁরা ঠিক করেছিলো সকালে গিয়েই সঙ্গীত কার্যক্রমের তারিখ ঠিক করবে। সকলে বাড়ীই যাচ্ছিল কিন্তু এত সকালে রবিশঙ্কর এবং আলিআকবরকে যেতে দেখে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞেস করে বলেছে, 'আমাদের সঙ্গে কথা না বলে এত সকালে কি করে চলে যাচ্ছেন?' রবিশঙ্কর বলেছে, 'এলাহাবাদ থেকে একটা জরুরী খবর পেয়ে আমরা চলে যাচ্ছি। কিছুদিন পরে এসে আমরা তারিখ ঠিক করবো।' অরুণ বলল, 'এই কথা শুনে দীপচন্দ এবং অন্যান্যরা খুব রেগে গিয়েছে। আমার বাড়ীতে এতক্ষণ এঁরা ছিলো। এইমাত্র সকলে চলে গিয়েছে।' রাগের চোটে দীপচন্দ বলল, 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।' কার মুখ বন্ধ করবো। এঁরা বুঝেছে ইচ্ছা করে দুপুরে এঁদের আসতে বলে সকালেই পালিয়ে গিয়েছে। অরুণের কথা শুনে মনে হোল যে মিথ্যা কথা আরম্ভ করে, একটা অসুবিধা হয় যে ধরা পড়বার লজ্জাটা সর্বদাই তাকে পীড়া দেয়। কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যেস হয়ে গেলে দুর্বলতা কেটে যায়। তারপর মিথ্যা বলাটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা বোঝে না লোকে সেটা বোঝে। আমার কাছে সব খবর শুনে অরুণ বলল, 'যাঁরা নিজের ভালো বোঝে না তাঁদের তুমি হাজার চেষ্টা করেও ভাল করতে পারবে না, তাঁরা ইডিয়ট। উত্তরে বললাম, 'খারাপ কাজ, মিথ্যার আশ্রয়, অসাধু কাজ করতে গেলে সংযম হোল অস্ত্র বিশেষ। এই সংযমের জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন। এ যোগ্যতা এঁদের আছে বলেই এঁরা মেকি হেসে কাজ হাসিল করতে পারে।'

খাবার সময় সমস্ত ঘটনা অরুণ ও ইলাকে বলে বললাম, 'রজত অরোরার সঙ্গে উপস্থিত অনেক কথা বলতে হবে। তোমরা সন্ধ্যার সময় মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসো। মাকে বোলো আমি কাল যাবো।' অরুণ সকলকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় বাবার ওখানে চলে গেলো। আমি একটু বিশ্রাম করে বিকেলে চা খাচ্ছি, ইতিমধ্যে অরোরা এসে হাজির। রাত্রের ট্রেনে

অরোরা চলে যাবে। সুতরাং সময় এখন অনেক আছে। অরোরা বাবার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কথার মাঝে সে একটা কথা বারবার বলছে, 'এই অবস্থায় সামান্য টাকার জন্য কি করে এঁরা চলে গেল।' মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করে যার উত্তর দিতে আমার পক্ষে লজ্জায় পড়তে হয়। একবার কথায় কথায় বললেন, 'প্রত্যেক মানুষের জীবনে টাকার প্রয়োজন হয়। টাকা না হলে জীবনধারণ করা চলে না। অনেকে অবশ্য টাকা দিয়েই মানুষ বিচার করে। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো? কারো কাছে টাকা না থাকলে বাবা এঁকে কি নজরে দেখতেন?' বললাম, 'কারো কাছে টাকা থাক্ বা না থাক্ বাবার চোখে তার কোন মূল্যই ছিল না। বাবা সবাইকে সমান নজরে দেখতেন। এ শিক্ষাটা আমি বাবার কাছেই পেয়েছি। বেশী টাকার স্বপ্ন বাবা কখনও দেখতেন না। ইচ্ছা করলে বাবা বহু টাকা জমা করতে পারতেন। কিন্তু প্রয়োজনের বেশী বাবা কখনও টাকার পেছনে দৌড়তেন না। আজকাল দেখি টাকার জন্য মানুষ নিজের বিবেক বিসর্জন দিয়ে টাকার পেছনে ছোটে।' দেখতে দেখতে কখন যে রাত্রি নয়টা বেজে গেছে বুঝতে পারি নি। বুঝলাম, যখন দেখলাম অরুণ সকলকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। অরোরা যাবার আগে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'কয়েক মাস পরেই সাপ্তাহিক 'দিনমান'-এ বাবার বিষয়ে ধারাবাহিক যা দেখে গেলাম এবং বাবার আদর্শ চরিত্রর সম্বন্ধে যা শুনলাম সব লিখব। বেরোলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।' বললাম, 'পাঠাতে হবে না। আমাকে জানিয়ে দিলে নিজেই কাশী থেকে কিনে পড়বো।' রাত্রে অরোরা দিল্লী চলে গেল।

আমার এখন কেবল মনে হচ্ছে কবে আমি বইটা লিখে শেষ করব। বইটা যদি বাবার হাতে দিতে পারি তাহলে আমার বোঝা অনেকটা হালকা হবে। কিন্তু ডাক্তারের কথাটাই বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাতি জ্বলে আর নেভে। আলো ফোটে আবার অস্ত যায়। মানুষ হাসে আর কাঁদে। এই করতে করতে একদিন বাবা পৌঁছে যাবেন তাঁর গন্তব্যে। তখন অজান্তে তাঁর আঙ্গুল আর চলবে না। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এখনও কত লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাত্রেই মদনলাল ব্যাসকে বাবার শরীরের অবস্থা জানিয়ে লিখলাম, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন সব যেন সাজিয়ে রাখবেন। আমি সময় মত বম্বে গিয়ে, যে সব ভুল আছে তা ঠিক করে নেব এবং এ যাবৎ যা সংগ্রহ করেছি সব দিয়ে শীঘ্র শেষ করে বাবার হাতে যেন বইটা দিতে পারি। এই বিষয়ে আলাদা গর্গকে আর চিঠি দিলাম না। গর্গকে সব কথা বলে পরামর্শ করবেন।'

পরের দিন আবার বাবাকে দেখতে গেলাম। বাবাকে এই অসহায় অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে ভাবি, যে লোক এক দণ্ডও চুপ করে বসে থাকতেন না, তাঁর আজ কি পরিণতি। মনে মনে বলি, ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকে এবং মানুষ সম্পর্কে কিছু ক্ষমতা থাকে তোমার, তাহলে কাউকে দীর্ঘজীবন পীড়া দিও না। যদি তাঁর পাশে আত্মীয়স্বজনরা থাকেও তবু কর্মহীন দীর্ঘজীবন পীড়াদায়ক। প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে মানুষের আর কি থাকে।

মৈহারে তিনদিন আরও থেকে কাশী চলে এলাম। কাশীতে এসেই আমি এর পর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দিন রাত্রি যত বড় হতে লাগল, সময়গুলো তখন আরো

দ্রুতগতিতে বয়ে যেতে লাগল। বেশীর ভাগ সময় কেবল বই-এর উপাদান যা পেয়েছি, একে একে সাজাতে লাগলাম।

কিছুদিন পরে যথাসময়ে কোলকাতা গেলাম। কোলকাতায় গিয়েই আলিআকবরের সঙ্গে দেখা করলাম। ধ্যানেশ-এর বিয়ের রিসেপসান এখনও আট দিন দেরী আছে। দেখলাম জুবেদাবেগম, ধ্যানেশ, আরও সকলে মিলে রিসেপসনের কাজে ব্যস্ত। শুনলাম আশিস আমেরিকা থেকে বিশেষ কারণে আসতে পারবে না। নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়ে গেল। রিসেপসনের একদিন আগে রবিশঙ্করের সঙ্গে দেখা করলাম। রিসেপসন-এর দিনই সন্ধ্যায় রবিশঙ্করের বাজনা হবে অমলাশঙ্করের স্কুলের চ্যারিটি উপলক্ষে। রবিশঙ্কর বরাবরই একটা না একটা নূতনত্ব করে। এবারে ঠিক করেছে বাজাবার সময় কোলকাতার বেশীর ভাগ নামী গায়ক বাদককে মঞ্চেতে বসিয়ে বাজাবে। আমাকেও মঞ্চেতে বসে বাজনা শুনবার জন্য বলল, আমি এক কথায় নাকচ করে দিলাম। আমি এ যাবৎ কখনও কারো বাজনায় স্টেজে বসি নি। ব্যতিক্রম একমাত্র বাবার সঙ্গে মৈহারে যাবার আগে একবার, মৈহারে তিনবার এবং কোলকাতায় দুইবার মঞ্চে বসেছিলাম। এ ছাড়া কখনও বসি নি। না বসার একটা কারণ ছিল। মৈহার ছাড়ার পর যে দিন জানলাম মিথ্যা প্রশংসা করে বাহবা বলতে হবে, সেইদিন থেকেই নিজের লোকের সঙ্গে বসি নি। মৈহার ছাড়ার পর একবারই ব্যতিক্রম হয়েছিল, সে কথা আগেই লিখেছি। যাক যা বলছিলাম। রবিশঙ্করের বারবার অনুরোধে, হলে যেতেই টিকিট চেকারের জায়গায় বিমান ঘোষকে দেখলাম। রবিশঙ্কর চৌকিতে বসেছে। চৌকির বাঁ দিকে এবং ডানদিকে সব গায়ক বাদক বসেছে। রবিশঙ্কর বাজাবার আগে আমাকে ডানদিকের সারিতে প্রথমে বসতে বলল, বাজনার সময় রবিশঙ্কর ডানদিকে, বাঁদিকে তাকাতেই সঙ্গীতজ্ঞদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। বুঝলাম এও এক বাজনার ট্রেড।

আমি ডানদিকের সারিতে পেছনের দিকে বসেছিলাম। বাজাবার আগে দেখতে পেয়েই ইসারায় প্রথম সারিতে আমাকে বসতে বলল। বাধ্য হয়ে বসলাম। বাজনার শেষে রবিশঙ্কর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো এইচ.এম.ভি.'র ডিরেকটরের সঙ্গে। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'আরে আপনাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি কিছুদিন ধরে, অথচ দেখা পাই না। আপনার একটা লংপ্লেয়িং রেকর্ড করব। রেকর্ড করাবার একমাস পরেই আমি রিটায়ার করব।' সঙ্গে সঙ্গে তারিখ নির্দ্ধারিত হোল। দশদিন পরে স্টুডিওতে আমার রেকর্ড হবে।

ধ্যানেশের বিয়ের রিসেপসনে গেলাম। ধ্যানেশের বউকে রবিশঙ্কর এবং আমি আশীর্বাদ করে খেতে বসলাম। চেয়ার টেবিলে একদিকে রবিশঙ্কর, বিমান ঘোষ এবং আমি বসলাম। উল্টো দিকের সারিতে কমলা, নিখিল, নিখিলের বউ এবং আর সকলে বসল। খেতে বসে রবিশঙ্কর গল্পে মাতিয়ে রাখল। আমি নির্বিকার, কেননা কোন জনসমাগমে আমি যাই না, ঘরকুনো বলে। আলিআকবর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ থাকবার পর আমাকে বলল, 'আমি বাড়ী যাচ্ছি কেননা আগামী কাল ভোরের ফ্লাইটে আমেরিকা যাব।' আলিআকবর বাড়ী চলে গেল। রবিশঙ্করকে স্মরণ করিয়ে বললাম, 'দুই দিন পরে আপনার ইন্টারভিউ নিতে যাব।' রবিশঙ্কর সম্মতি জানিয়ে জুবেদা বেগমের সঙ্গে আলিআকবরের বাড়ী গেল। আমি নিজের স্থানে চলে গেলাম।

নির্দিষ্ট দিনে রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার আবার নিতে গেলাম। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দূর থেকে দেখলাম রবিশঙ্কর এবং বিমান ঘোষ ডি.সি.-এর গেস্ট হাউসে দোলনায় দুলতে দুলতে গল্প করছে। মনে মনে অবাক হলাম। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবি এত অপমানিত হয়েও কি করে বিমান ঘোষের সঙ্গে রবিশঙ্করের বন্ধুত্ব হয়। এই ধরনের আত্মমর্যাদাহীন মানুষকে আমি কখনো এভাবে দেখব ভাবতে পারি নি। অনুমানটাই প্রমাণ নয়। প্রত্যক্ষ দেখা আর অনুমানে বহু প্রভেদ। অথচ এই অনুমানের ভিত্তিতে কত লোক সাজা পায়। তাই পরের কানে শোনা বা অন্যের মুখে কালি লেগেছে শুনেই গুণীব্যক্তির কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এর মধ্যেও তর্ক করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও বিশ্বাস করা যায় যেমন ইলিউসান এবং হ্যালিউসিনিশেন। কিন্তু যুক্তি-সঙ্গত অনুমানকেও অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যখন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুমানকে প্রমাণ করে, তার বিচার কে করবে? সময়ই তো তার বিচার করে। এখানেও তাই হোল। এ না হলে যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড তাঁর সঙ্গে দোলনায় কি দোলা যায়? উপরন্তু যাঁর নামে কলঙ্ক দেওয়া হোল তাঁকে আবার বরণ করা যায়? আসলে অনুমান মানে ইনফারেন্স, ইলিউসান, হ্যালিউসিনেশন না হয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে যা দেখা যায় তাই বিশ্বাসযোগ্য। উপরোক্ত জিনিষগুলোর ব্যাপারে প্রতি কোন স্টেপ বা ডিসিসান নেওয়া মূর্খতা। অবাক হয়ে ভাবি এ কি করে সম্ভব হোল। এঁরা কত বড় অভিনেতা ভগবান জানে। রবিশঙ্কর আমাকে অভ্যর্থনা করে ডেকে বিমান ঘোষকে দেখিয়ে বললো, 'জানো তো এখন রেডিওর চাকরি ছাড়িয়ে দিয়ে বিমানকে এইচ.এম.ভি.-তে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভাল করি নি? একজন নিজের লোক রইল।' অবাক হলাম। গম্ভীরভাবে বললাম, 'ভালোই তো।' মনে হোল বৃহস্পতির দশায় যাঁর জন্ম তাঁর সব জিনিষেই জয়জয়কার। ইচ্ছা করলে এঁরা একজনকে গাছে চড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে জলে ডুবিয়েও মারতে পারে। বিমান ঘোষ আমাকে দেখেই রবিশঙ্করকে বললো, 'এখন তোমরা কথা বলো, উপস্থিত আমাকে যেতে হবে।' রবিশঙ্কর হাসতে হাসতে বিমান ঘোষকে দেখিয়ে আমাকে বললো, 'বিমানটা হোল এক নম্বরের ক্রিমিনাল।' বিমান ঘোষ মেপে কথা বলে। একটু হাসির রেখা দেখা গেল। বিমান ঘোষ চলে গেল।

মনে পড়ে গেল রাসেলের কথা। বার্ট্রানড রাসেল বলে গেছেন, 'সায়েন্স ইজ হোয়াট ইউ নো এনড ফিলজফি ইজ হোয়াট ইউ ডু নট নো।' সায়েন্স অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু মানুষের মন? মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করে কেউ কোন দিন বলতে পারে না যে আমি এর শেষ কথা দেখিয়ে দিলাম। এর পর আর নূতন কিছু বলবার নেই। এর জন্য সব কিছুর মধ্যেই আজকাল কূটনীতি ঢুকে গেছে। এই কূটনীতি হয়েছে এ যুগের মহাপাপ। বাবার ভাষায়, পারটি পারটি, আজ যদি বাবা এই দৃশ্যটা দেখতে পেতেন তাহলে বিস্ময় হতবাক হতেন। তাঁর মনের সংশয় আজ পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু এখন বাবা কোন কিছুর জানার উর্দ্ধে। বাবার যদি এই অবস্থা না হ'তো তাহলে কি রবিশঙ্কর খোলাখুলি তাঁর নর্মসহচরীকে এইরকম সর্বসমক্ষে নিয়ে ঘুরতে পারত?

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। রবিশঙ্কর বলল, 'কি ব্যাপার, তোমাকে চিন্তিত মনে

হচ্ছে?' বললাম, 'না এমন কিছু নয়।' এর পর সাক্ষাৎকার নিয়ে যে সব কথা বাকী ছিল তা প্রায় শেষ হোল। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর রবিশঙ্কর এড়িয়ে গেল। যে সময়ে সাক্ষাৎকার নিলাম বাবার আত্মীয়স্বজনদের কাছে, যদিও অনেক কথা জেনেও তাঁরা বলেন নি, তবুও তার সবগুলোর উত্তর আমি পেয়ে গিয়েছি তাঁদের দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। বুঝি না কি করে এঁরা ভুলে যায় সেই স্বপ্নভরা অতীত? সকলেই তো বাবার কাছে শিখেছে। সঙ্গীতের প্রশ্ন নিয়েও আমি সকলকেই পরীক্ষা করেছি। অনেক জিনিষ কেউ বলতে না পারলেও দেখেছি, এক একজন এক একদিকে পারদর্শী। তবে এঁদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনকেই পেয়েছি, যিনি সঙ্গীতকে সাধনার স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। বাবার পরে তাঁকেই স্থান দিয়েছি। কিন্তু সে কে? এ কথা জানতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বই যখন শেষ হবে তাঁর নাম নিশ্চয় সেই জায়গায় থাকবে।

যেমন প্রতিবারই বিদায়কালীন হয়ে থাকে এবারেও তার ব্যতিক্রম হোল না। শৃঙ্গার বাসের চুটকি সনেটে রবিশঙ্করকে শোনালাম। রবিশঙ্কর বলল, 'ক্যা ব্যাত।' এই কথা বলেই জগুকে বলল, 'যতীনের এই সনেটটা নিশ্চয়ই লিখে রাখো।'

এঁর কিছুদিন পরেই আমার লংপ্লেয়িং রেকর্ড হোল। কোলকাতায় এই সময়ে আমি বহু লোকের সাক্ষাৎকার নিলাম। কিছু ছবিও যোগাড় হোল। উপস্থিত এখনও অনেকের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। বই লেখা যে এত ঝকমারির কাজ, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিলো। এর ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিয়েছি। কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ছাড়া কোন সঙ্গীত কার্যক্রম সম্বন্ধে আর লিখব না। যেটুকু আগে লিখেছি তার কারণ যে অভিজ্ঞতা তবলাবাদক সম্বন্ধে হয়েছে সেটা নব্যযুগের বাদকের হয়ত কাজে লাগবে ভেবে লিখেছি। অবশ্য সে অভিজ্ঞতা লেখার কারণ জানাবার সময় এখনও হয় নি। কোলকাতা থেকে কিছুদিন পরে কাশী ফিরে এলাম। কাশী আসবার দুই মাস পরেই বহুল প্রচারিত মাসিক হিন্দি 'দিনমান' ম্যাগাজিনে বাবার সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রথম সংখ্যা পড়লাম। রজত অরোরা লিখেছে এবং আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা করে বাবার বিষয়ে অনেক কিছু তথ্য পেয়েছে এই বলেই লেখাটা শুরু করেছে।

খুব সুন্দর লিখেছে। পরের সংখ্যাও পড়লাম। কিন্তু তারপর আর বেরোল না। এত ভাল লিখছিল কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন? কারণ বুঝতে পারলাম না। রজত অরোরাকে লিখলাম, 'ক্রমশঃ লেখাটা বন্ধ হয়ে গেল কেন?' কিছুদিন পরে রজত অরোরার চিঠি পেলাম, লিখেছে, 'বিশেষ কারণে দিনমান-এর এডিটর একজন ফটোগ্রাফারকে মৈহার পাঠিয়েছিলেন। বাবার বাড়ীর ফটো, বাবা রোগশয্যায় কি ভাবে শুয়ে আছেন, বাবার ঘরের ফটো এবং প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য ছবির জন্য। কিন্তু ফটোগ্রাফার যে সময় 'দিনমান ম্যাগাজিন'-এর তরফ থেকে গিয়ে মৈহারে ফটোর কথা বলেছিলেন, সেই সময় বাবার পুত্রবধূ ছিলেন। ফটোগ্রাফারকে দেখেই বাবার পুত্রবধূ বলেছেন, 'আমি ভাবছিলাম 'দিনমান'-এর সম্পাদককে একটা চিঠি দেব। ভালই হয়েছে আপনি এসেছেন। যতীন ভট্টাচার্যের কাছে সব কথা শুনে লেখক যে লিখেছেন সব ভুল। যতীন ভট্টাচার্য বাবার বিষয়ে কি জানেন?

আপনি এডিটরকে গিয়ে বলবেন, যা ছেপে গেছে তা ছেপে গেছে। এর পর ধারাবাহিক আর যেন ছাপান না হয়। যদি ছাপান হয় তাহলে আমি কেস করব। আপনি ফটো তুলতে এসেছেন কিন্তু ফটো তুলবার জন্য আপনাকে অনুমতি দেব না। যদি দূর থেকেও বাড়ীর কিংবা কোন ছবি ছাপেন তাহলেও কেস করব। এই কথা শুনে ফটোগ্রাফার এডিটরকে এসে সব কথা বলেন। এডিটর আমাকে ডেকে বলেন, উস্তাদ-এর পুত্রবধূ যে হেতু বলছেন ভুল তথ্য, সুতরাং আর ছাপাব না। এডিটরকে আপনার পরিচয় দিয়ে সব বলা সত্ত্বেও বলেছেন, পুত্রবধূর আপত্তি থাকলে না ছাপানই ভালো। যদিও আমার লেখাটা এডিটরের খুব ভালো লেগেছিলো। আসলে আমি যে গত সংখ্যায় লিখেছিলাম বাবার এই রকম অবস্থায় ছেলে ও জামাই কি করে মৈহারে না থেকে টাকা উপার্জন করার জন্য আমেরিকা চলে গেল? এই নিষ্ঠুর সত্যটা বোধ হয় বাবার পুত্রবধূ পড়ে লজ্জিত হয়ে রেগে গিয়েছেন। যাক আপনি তো বই লিখছেন সেই বই পড়ব এবং তারপর আমি সেই বই এর রিভিউ লিখব।' রজত অরোরার চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ কথা জুবেদা বেগম কোন সাহসে বলে যে আমি বাবার সম্বন্ধে কিছু জানি না। যাক সময় পেলে এর উত্তর দেব। অবাক হয়ে ভাবি, যে সময়ে মতলব থাকে সেই সময় প্রশংসা করে, আর মতলব ফুরিয়ে গেলে এঁরা আর চিনতে পারে না। যখন বাড়ীর উইল পাচ্ছিল না তার আগে আমাকে কত আপ্যায়ন। উইল পাবার পরই রবিশঙ্করের সঙ্গে আমাকে টোনা দিয়ে কথা বলল। কারো কাছে এতটুকু উপকার পেলে তার পরিবর্তে অন্য ভাবে পুষিয়ে দিতেন এবং কখনও ভুলতেন না। কিন্তু এঁরা কোন ধাতুতে গড়া। অবশ্য এ কথাটা আমার কাছে নূতন নয়। মনে মনে ভাবলাম এঁরা আমাকে শাস্তি দেবার কে? বিবেকই এঁদের শাস্তি দেবে।

ইতিমধ্যে এক নাগাড়ে বাবার বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, মদনলাল ব্যাসকে লিখলাম, 'শীঘ্রই বম্বে গিয়ে সেগুলো দেখাব। বাবার ফটো সব নিয়ে যাব এযাবৎ যা সংগ্রহ করেছি। যত শীঘ্রই পারো, লেখাটা শেষ করো, যে সব ভুল তথ্য আছে, সেগুলো গিয়েই ঠিক করব। বাবার শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাবার হাতে বইটা দিতে পারলে আমার গুরুদক্ষিণা শেষ হবে। লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গকে আলাদা চিঠি দিলাম না। তাঁকে সব কথা জানিও। যে মুহূর্তে সকলের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তারপরেই বম্বে যাব।' হায়। তখন কি জানতাম বিধাতা মনে মনে হাসছেন। কত ঝড় ঝাপ্টা আমার উপর দিয়ে যাবে, এ কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম? ইতিমধ্যে অরুণের চিঠি পেয়ে চমকে উঠলাম। অরুণ লিখেছে, 'চৌদ্দই জুন হঠাৎ বাবার বাঁদিকটা প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছে।' এই খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে মৈহার গেলাম। দেখলাম বাবার অবস্থা এক রকমই। ডাক্তার গোবিন্দ সিং এলেন। বললেন, আগের মত কোমা স্টেজ চলছে। উপরন্তু বাঁ দিকের হাত পা প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছে। তারপর বাবার কষ্ট দেখে পরীক্ষা করে বোঝা গেল ইউরিমিয়া হয়েছে।

বাবার এই অসহায় দৃষ্টি দেখে কষ্ট হোল। দেখলাম, বাবা তাকিয়ে আছেন। কথা বলার চেষ্টা করছেন। চিনতে বোধ হয় পারলেন। তারপরই দেখি চোখে জল। চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাঁদিকের পক্ষাঘাত কত দিনে ভাল হবে?' ডাক্তার

বললেন, 'চিকিৎসার কিছুই নাই, বাবা চিরকাল সাত্ত্বিক ভাবে নিয়মিত জীবন কাটিয়েছেন বলেই এখনও বেঁচে আছেন, নইলে অনেকদিন আগেই আমরা বাবাকে হারাতাম। এই অবস্থাতেও যে কদিন বাবাকে সেবা করবার সুযোগ পাই সেইটাই হবে আমাদের জন্য আশীর্বাদ।' জুবেদা বেগমকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবার এই অবস্থা হয়েছে দেখে আলিআকবরকে সংবাদ দিয়েছেন কিনা?' উত্তরে বললেন, 'আসবার জন্য চিঠি লিখেছি।' বাবার সেবার জন্য নার্স দিনরাত রাখা প্রয়োজন। অথচ ডাক্তারের কাছে শুনলাম, হসপিটালে উপস্থিত একজন নার্সও নাই। ডাক্তারকে বললাম, 'এই রোগের বিশেষজ্ঞকে দেখান উচিত।' ডাক্তারকে দেখে বুঝলাম চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করলেন জব্বলপুরের ডাক্তার টোমারকে। পরের দিনই ডাক্তার টোমার এলেন। ডাক্তার টোমার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। ডাক্তারের মুখ দেখেই বুঝলাম বাবার অবস্থা ভাল নয়। টোমার গোবিন্দ সিংকে বললেন, 'উপস্থিত হাসপাতাল থেকে দুইজন নার্সকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ডিউটি লাগিয়ে দিন। একজন নার্স বার ঘণ্টা থাকবে। বাকী বার ঘণ্টা অন্য নার্স থাকবে।' ডাক্তার সিং বললেন, 'উপস্থিত মৈহারে একজন নার্স যদিও আছে, কিন্তু সে ছুটি নিয়ে গিয়েছে।' ডাক্তার টোমার বললেন, 'উপস্থিত তাঁকে ডেকে পাঠান। আমি আজই জব্বলপুরে গিয়ে চীফ মিনিস্টার প্রকাশচাঁদ শেঠিকে সব বলব।' ডাক্তার টোমার চলে গেলেন। বিকেলে খবর পেলাম, যে নার্স ছুটি নিয়েছিল, সে শয্যাগত হয়ে রয়েছে। অগত্যা গোবিন্দ সিং হসপিটালের একজন কমপাউণ্ডারকে বললেন রাত্রে থাকবার জন্য। রোজ দুই বেলা বাবার কাছে গিয়ে বেশীর ভাগ সময় কাটাই। এই সময় বাড়ীর কেউ না হয়েও, ইলা যে সেবা করছে ভাবা যায় না। দিনরাত গ্লুকোজ বোতল চলছে।

বাবাকে এই অবস্থায় দেখে মনে হোল সব মানুষের বোধ হয় এই পরিণতি। অথচ বাবার যখন জ্ঞান ছিল তখন এই মানুষটিই কত কড়া কথা শোনাতেন, নিজের পরিবারবর্গ এবং ছাত্রদের। সমস্ত বাড়ীটাই বাবার ভয়ে তটস্ত হয়ে থাকত। যে কেউ কাজে গাফিলতি করতো তাকেই তিনি নানা রকমে শায়েস্তা করতেন। বলতে গেলে সমস্ত বাড়ীটাই তটস্থ হয়ে থাকত। কিন্তু সেই মানুষই এখন একেবারে অসহায়, অচৈতন্য অনড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছেন। এখন পরের করুণার পাত্র হয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হচ্ছে। ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস। বাবার এত সাধের আশ্রম বাড়ীটা বর্তমানে ধূলামাটিতে ভরাট হয়ে গিয়েছে। মুখের দিকটায় কেবল একগুচ্ছ দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। অতীতের সাক্ষী গোলাকৃতি জায়গাটা দেখে কেমন যেন মায়া হোল। মনে হয় যৌবনে যে বলদীপ্ত যোদ্ধা ছিল জরার বশে ধরাশায়ী হয়ে সে উর্দ্ধমুখে মৃত্যুর দিন গুনছে। অবাক হয়ে ভাবি যে বাড়ীতে সকাল থেকে সবাই নিয়ম মেনে চলেছে, সেই বাড়ীতেই এখন অনিয়ম। এমনিই হয়। সত্যিই এমনি হয়। কারণ সবাই তো সংসারের নিয়মের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। সংসারের সঙ্গে আপস করে চলে, সবাই সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারলে বর্তে যায়, কিন্তু এমন লোকও সংসারে জন্মায় যারা সংসারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে না চলে, সংসারকেই নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। লোক এঁদের বলে বেহিসেবী। অথচ এই বেহিসেবী লোকগুলোর

জন্যই আমাদের এই পৃথিবীটা এগিয়ে চলে। বাবাকে এই বেহিসেবী লোকেদের মধ্যেই গণনা করা যায়, তাই তো সঙ্গীতের জগৎ এখনও এগিয়ে চলছে। পুরোনো কথা এক এক করে যত মনে হচ্ছে ততই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

হঠাৎ আমেরিকা থেকে আলিআকবর কোলকাতা হয়ে মৈহার এলো কয়েকদিন পর। বাবার এই অবস্থা আলিআকবরও কল্পনা করে নি। আলিআকবর বলল, 'আমি সব কাজ ছেড়ে এসেছি। আমি মাত্র পাঁচ দিন থেকেই কোলকাতা গিয়ে আমেরিকা চলে যাব। তুমি প্লিজ কিছুদিন থাকো।' অবাক হলাম কথা শুনে। বললাম, 'বাবার এই অবস্থা দেখে কেবল পাঁচদিনের জন্য এসেছেন? কাজ তো চিরকালই থাকবে। কিন্তু বাবা আর বেশী দিন নাই। সুতরাং আপনার এখন থাকা দরকার।' আলিআকবর বলল, 'বিশ্বাস করো আমার থাকবার উপায় নাই। নইলে আমি কিছুদিন থাকতাম।' জানি আলিআকবর চলে যাবেই। পাঁচ মাস আগে, আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর চলে যাবার পর বাবা যে কবিতাটি বলে ছিলেন বললাম,

মন মাঝি তোর বৈঠানেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না

কবিতাটি বলে এও বললাম, 'বাবা বলেছেন আর কাউকে আসতে হবে না। এবারে কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ চলে যাব।' আলিআকবর চুপ করে শুনল। বুঝলাম কথাটা প্রাণে লেগেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলিআকবর তেসরা জুলাই মৈহার থেকে কোলকাতায় চলে গেল। তখন কি আলিআকবর স্বপ্নেও ভেবেছিল, এই হোল তাঁর শেষ চোখে দেখা? আলিআকবর যাবার পর দিনই সকালে মধ্যপ্রদেশের চিফ মিনিস্টার প্রকাশচন্দ শেঠি বাবাকে দেখতে এলেন। বাবার অবস্থা দেখে প্রথমেই মায়ের হাতে, বাবার ওষুধ পথ্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক দিলেন। এ ছাড়া সাতনার সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার কে পি সিং এবং দুইজন নার্সকে অবিলম্বে আসবার জন্য নির্দেশ দিলেন নিজের সচিবকে। মৈহারের একজন ডাক্তার পাণ্ডে এবং সাতনার ডাক্তার কে পি সিংকে দিন রাত্রি সময় ভাগ করে থাকবার নির্দেশ দিলেন। এ ছাড়া দুইজন নার্সও সময় ভাগ করে দিন রাত যেন থাকে তারও নির্দেশ দিয়ে জব্বলপুর চলে গেলেন। বিকেলেই সাতনা থেকে একজন ডাক্তার এবং দুইজন নার্স এল। যাক এবারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। বাবার এই অবস্থা শুনে বাহাদুর এবং ধ্যানেশ সেইদিনই এলো। সব দেখে পরের দিনই কোলকাতা চলে গেলো। বাবার অবস্থা সেই এক রকম। স্যালাইন এবং অক্সিজেন বরাবর দেওয়া হচ্ছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে কি রকম অসহায় দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখেন। এবারে একমাসের উপর মৈহারে থেকে কাশী ফিরে এলাম।

বাবার এই অবস্থা দেখে মদনলাল ব্যাসকে চিঠিতে সব কথা জানিয়ে লিখলাম, 'আলিআকবরের সেক্রেটারি যে মুহূর্তে বাবার লেখা 'আমার জীবনী' পাঠাবে, সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবাদ করে রাখবে। তিনমাসের মধ্যেই আমি সব সামগ্রী নিয়ে বম্বে যাব। লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গকে আলাদা চিঠি দিলাম না। তাঁকে সব কথা বলো। লেখা হয়ে গেলেই, আমি গিয়ে সব ঠিক করব।'

৬০

এখনও কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে, কিন্তু যদিও বাবা আমাকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তাঁর জীবনের সব সত্য ঘটনা লিখতে বলেছিলেন, তথাপি ভাবলাম বাবার সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু লেখা উচিত। বাবা কত কষ্ট করে নানা উস্তাদের কাছে এক একটা জিনিষ সংগ্রহ করেছেন সেই বিষয়ে কিছু লেখা উচিত। সঙ্গীতে বাবার অবদান কি, বাবার কিছু রচিত গান, বাবার রচিত রাগ এবং সঙ্গীত সাধনার জন্য প্রথমে কি ভাবে সাধনা করা উচিত, এ সব লেখা উচিত। বাবার সঙ্গীতে কি বিশেষত্ব ছিলো তা যদি না লিখি তাহলে বাবার জীবনী লেখার কোন অর্থ হয় না। যেমন ভাবা সেই ভাবে সঙ্গীতের একটা অধ্যায় লিখতে শুরু করলাম। আলিআকবর নিজের কথা রেখেছে। মদনলাল ব্যাসের চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'আলিআকবরের সেক্রেটারি আপনার কথামত বাবার লেখা 'আমার জীবনী' পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি তার অনুবাদ শুরু করে দিয়েছি। আপনি কবে নাগাদ আসবেন জানাবেন।' নিশ্চিন্ত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে আলিআকবরের সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোলকাতায় চিঠি দিলাম।

কাশী আসার কিছুদিন পরেই বরোদা থেকে রেডিও সঙ্গীত সভায় বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। তিনমাস পরে কালীপুজোর দিন বাজনা স্থির হয়েছে। মনে মনে এই বাজনাটা ভগবানের বরদান ভাবলাম। মনে হোলো এর মধ্যে আমি সঙ্গীতের সব কিছু লিখে, বরোদায় বাজিয়েই বম্বে যাব। সঙ্গে সঙ্গে মদনলাল ব্যাসকে চিঠি লিখলাম। সব কথা জানিয়ে লিখলাম, 'বরোদায় বাজিয়েই আমি এ যাবৎ যা সংগ্রহ করেছি সব নিয়ে বম্বে যাব। আমি গিয়ে একমাস বম্বে থেকে বইটা শেষ করব। এর মধ্যে এ যাবৎ যত সামগ্রী দিয়েছি সব লিখে রাখবেন। যা ভুল থাকবে সেগুলো ঠিক করব। সঙ্গীত-এর উপর লেখা প্রায় শেষ হয়ে যাবে সেই সময়ের মধ্যে। গর্গকে এই বিষয়ে সব জানিয়ে দেবেন। বরোদায় যাবার আগে, কবে বম্বে পৌঁছব গর্গকে লিখে পাঠাব। সে যেন স্টেশনে আসে।'

দিন যায়, রাত আসে। মাস শেষ হবার আগেই দিনরাত লিখে সব শেষ করলাম। ইতিমধ্যে ব্যাসকে কিছু সামগ্রী পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গীত বিষয়ে যা লিখেছি সেগুলো আমি না বোঝালে ব্যাস লিখতে পারবে না ভেবে, সেগুলো নিজের কাছে রেখে দিলাম। বহু সাক্ষাৎকার এখনো নিতে হবে বলে সেগুলো পাঠালাম না। যতটা পেয়েছি ধারাবাহিক ভাবে সাজাতে লাগলাম।

হঠাৎ এর মধ্যে লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী যাবার সুযোগ এলো বাজাবার জন্য। বাজানর ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই বাবার পরিচিত লোকের কাছে সাক্ষাৎকার নিই। লক্ষ্ণৌ গিয়ে আমার দাদার মারফৎ ডি. টি. যোশীর ভাই-এর সঙ্গে আলাপ হোল। বাবার কাছে ডি. টি. যোশীর নাম শুনেছি। যোগাযোগ করলাম। বাবার বিষয় কিছু কথা বলে বললেন, 'উস্তাদ হাফেজ আলির শরীর খুব খারাপ। এমনিতে দেখলে কিছু বোঝা যায় না কিন্তু সর্বদা মাথা ঘোরে। মিনিটে মিনিটে ওঠেন আবার শুয়ে পড়েন।' মনে হোল দিল্লীতে তো যাচ্ছি। একবার দেখা করব, যদি কোন সূত্র পাই। দিল্লী গিয়ে তেইশ বছর পরে হাফেশ আলি খাঁ সাহেবকে

দেখবার সুযোগ হল। শুনলাম আমজাদ নাই। আমজাদকে একবারই বহুদিন আগে কাশীতে কিশোরি রমনজীর বাড়িতে দেখেছিলাম। সে বহুদিন আগের কথা। শুনলাম তাঁর ভাই রহমৎ আছে। সময় নির্দিষ্ট করে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম রহমৎ নাই। আমজাদের মা'কে অনুরোধ করে বললাম, 'একবার দেখবো।' দেখা হোল। বললাম, 'প্রায় চবিবশ বছর আগে প্রথম কাশীতে দেখা হয়েছিলো। সেই সময় আপনি ক্যাভেণ্ডার সিগারেট খেতেন। ইচ্ছা ছিলো আপনার কাছে শিখবো কিন্তু পরে উস্তাদ আলাউদ্দিন বাবার কাছে গিয়ে শিখেছি। বিছানার থেকে উঠে বললেন, 'খুব ভালো। বাবুর কাছে শিখেছ? বাবু কেমন আছেন?' বললাম 'ভালো নাই।' হাফেজ আলি খাঁ সাহেব বললেন, 'আমার শরীরও ভাল নাই। বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারি না, মাথা ঘোরে। বাবুকে আমার আদাব জানিয়ো।' এই কথা বলেই শুয়ে পড়লেন। কিন্তু অবাক হলাম চেহারা দেখে। চবিবশ বছর আগে যেমন মোটা এবং সুন্দর গায়ের রং দেখেছিলাম, সেইরকমই দেখলাম। কেউ না বললে বোঝাই যাবে না শরীর খারাপ। বুঝলাম, এই অবস্থায় কোন কথা জানা যাবে না। কিন্তু একটা কথা ভেবে আনন্দ হোল, বাবার প্রতি কি অসীম ভালবাসা। আজকাল এ কথা ভাবা যায় না। দিল্লীতে বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিলাম। সে কথা সব একসঙ্গে লিখব।

দিল্লী থেকে আসবার পর দেখলাম অরুণের কাছ থেকে একটা চিঠি এসেছে। অরুণ লিখেছে, 'বাবার শরীর দিন কে দিন আরও খারাপ হচ্ছে। যদি পার, দু, তিনদিনের জন্য দেখা করে যেও। এই চিঠি পাবার পরই বাবার কাছে কয়েকদিনের জন্য গেলাম। বাবার শরীর দেখলাম আগের থেকেও খারাপ। যদি কখনও চিনতে পারেন, আবার পরমুহূর্তেই চোখ বোজেন। চোখের দৃষ্টিটা ঘোলাটে। মাঝে মাঝে একটু জ্ঞান হয়। কথায় কথায় বললাম, 'উস্তাদ হাফেজ আলির কথা।' বাবা ধীরে ধীরে বললেন, 'কেমন আছে?' বললাম, 'ভালো নেই।' কথা শুনেই বাবার চোখে জল এল। ধীরে ধীরে বললেন, 'দেখা হলে আদাব জানিয়ো।' এই কথা বলেই চোখ বুজলেন। কয়েকদিন থেকেই কাশী চলে এলাম।

দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে একটা মাস কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। এ যাবৎ বহুলোকের সাক্ষাৎকার নিলাম। যদি এই সাক্ষাৎকার না নিতাম তাহলে সঙ্গীত জগতের আর একটা রূপ কখনও জানতে পারতাম না। সেই কথাই আগে বলি। বাবা ঠিকই বলেছিলেন এই বই লিখলে তোমার শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা হয়ে যাবে। সেই সময় এর অর্থ সম্পূর্ণ বুঝি নি। শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষার কথা বাবার কাছে বহু শুনেছি। কিন্তু সঙ্গীত জগতের এক নূতন রূপ দেখলাম সাক্ষাৎকারের সময়, যা এ যাবৎ কখনও কল্পনা করতে পারি নি। কয়েকটা অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

বাবার কাছে দেখেছি একরকম। আর মৈহার থেকে বেরিয়ে এতদিনের অভিজ্ঞতায় দেখছি অন্য রকম। বাবা মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের বিচার করতেন না। বড় লোক গরিব লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতেন না। তাঁর কাছে প্রীতির সম্পর্কটাই ছিলো সবচেয়ে বড়। বাইরের ঐশ্বর্যটা খোলসের মতন একদিন খসে পড়ে। সেই খোলসটা খসে পড়লে বাকী যেটা পড়ে থাকে, সেটাই আসল। সেই আসলটা কি? সেটা হোল সঙ্গীত। সেখানে

সব মানুষই এক। সেখানে উঁচু নীচু নাই। বড়লোক, গরীবলোক নাই। সেখানে সবাই সমান। কিন্তু আজকাল কি দেখলাম? বর্তমানে মানুষকে বিচার করা হয় টাকা, যশ, প্রতিপত্তি দিয়ে। সকলেরই চিন্তা, ঐশ্বর্য প্রদর্শনের। সেটা যতটা না সঙ্গীতের দিকে, তার চেয়ে বেশীটা হোল আত্মপ্রচার এবং পোশাক আশাকের দিকে।

দেখলাম আজকাল সঙ্গীত শিখবার আগ্রহ কম। অবাক হয়ে ভাবি, আজকের গায়ক বাদকের চোখে যেটা নিষ্প্রয়োজন, বাবার কাছে তা অতো অনিবার্য আর অপরিহার্য ছিলো কেন?

এখন দেখছি সকলেই সকলকে টেক্কা দিতে চাইছে। আর এই টেক্কা দিতে যাওয়ার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, ভাই এর সঙ্গে ভাই এর, বাপের সঙ্গে ছেলে মেয়ের সম্পর্কের কংক্রিটে চিড় ধরতে শুরু হয়ে গিয়েছে।

যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। দিনকাল কি রকম বদলে যাচ্ছে। সঙ্গীতের সভ্যতা, অসভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতা, শিষ্টতা যা বাবার কাছে দেখেছি, সেগুলো এখন পুঁথির কথা হয়ে গিয়েছে। সকলের মুখে শুনেছি, এগুলো এখন কথার কথা। এখন দিন বদলেছে। তাই মানুষকেও বদলাতে হবে। এখন অন্যায় ও অন্যায়কারীর মোকাবিলা করার দিন এসেছে। এখন শিষ্টতার কোন মানে নাই।

বুঝলাম আজকের দিনে যাঁরা সৎ, যাঁরা সত্যবাদী, ধর্মভীরু, তাঁরাই সবচেয়ে বিপদে পড়ছে। এ কি মায়া না মতিভ্রম বুঝতে পারি না।

বাবা বলতেন, গুরু কিংবা কোন সাধুসন্তকে কথা দেবার আগে পাঁচবার ভাববে। কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া। কথা দিলে তা রাখতে হয়। তা না হলে চরম সর্বনাশ। কিন্তু আজকাল দেখছি মিথ্যা আশ্বাস বা কথা দিতে কোন পয়সা তো লাগে না, সুতরাং নিজের স্বার্থে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করাটাই হোল আজকের যুগে ধর্ম। আজকের দিনে মুখে অনেকেই নিঃসঙ্কোচে অভয় দেয়, আশ্বাস দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় যে কত কঠিন সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে সময় লাগে। টাকা চাই, প্রচুর টাকা। বিপদে যাঁরা সাহায্য করেছে তাঁদের ভুলে যায় কি করে?

আজকাল দেখছি নিজের আখের গোছাবার জন্য কোন প্রতিবাদ করে না। যাঁরা হাঁ-এ হাঁ, না-এ না রপ্ত করে নিয়েছে, তাঁরা প্রতিবাদ করে না। যাকে দিয়ে কাজ হবে, তাকে সর্বদাই অর্থ, দামী জিনিষ, মদ, মেয়েছেলে দিয়ে বশীভূত করছে। আমার একটা বদ অভ্যাস ছোট থেকেই ছিলো। বদ অভ্যাসটি হোল, অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা। এর জন্য আমার জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবুও অন্যায়কে অন্যায় বলবোই। অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপোষ করি নি।

একদিন আমার এক বিশেষ বন্ধু এক সংবাদপত্রের মালিকের ভাগ্নেকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে বলল, 'আপনার বাজনা শুনতে চায়। দয়া করে আমার বন্ধুকে একদিন আপনার বাড়ীতে বাজনা শোনান।' বললাম, 'সঙ্গতের জন্য আমার কোন তবলা বাদক নাই। আপনি যে কোন তবলা বাদককে ডেকে আনুন আমি শোনাব। ইচ্ছা করলে আমি অনেক

তবলাবাদককে ডাকতে পারি। কিন্তু ডাকব না, এই জন্য পাছে সে আমাকে বাজাবার জন্য ডাকবে।' ভদ্রলোক বললেন, 'তবলার দরকার নেই, কেবল আলাপই শুনব।' বললাম, 'ঠিক আছে।' কথায় কথায় সঙ্গীতের আলোচনা করতে গিয়ে, বিজ্ঞের মত বলল, 'আমার প্রিয় সরোদ বাদক, আড়ী ও দেড়ীতে যেমন তান করে, সেই রকম আলি আকবর করতে পারে না।' বললাম, 'আড়ী এবং দেড়ীর তানটা কি রকম হয় বলুন তো?' ভদ্রলোক বললেন, 'বোঝাতে পারব না, তবে শুনলে বলতে পারি। আসলে এটা এক ধরনের ফ্রাকসান।' এই কথা বলেই বললেন, 'কিছুদিন আগে আলি আকবরের পাহাড়ী ঝিঁঝিঁট শুনলাম। কিন্তু আসলে সেটা পাহাড়ীও নয়, ঝিঁঝিঁটও নয়, আবার পাহাড়ী ঝিঁঝিঁটও নয়।' মনে মনে রাগ হলেও বললাম, 'এই তিনটি রাগের বৈশিষ্ট্য কি বলুন তো? এ ছাড়া পাহাড়ী ঝিঁঝিঁট আমার উস্তাদ বাবার তৈরী। কি ভুল বাজিয়েছেন বলুন তো?' এবারে ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমি কোন রাগ বিশেষ বুঝি না, তবে শুনলেই বুঝতে পারি।' এতক্ষণ বন্ধুর মুখ চেয়ে, প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করছিলাম। আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'আলিআকবর একটা চুল ছিঁড়ে দিলে ডজন ডজন আড়ি এবং দেড়ী তান পরের পর বাজিয়ে যাবে। আপনার প্রিয় সরোদ বাদক কি দেড়ী তান বাজান জানি না। এ ছাড়া যখন কোন বাজনার রূপই জানেন না, তখন রাগের ভুল ধরেন কি করে? আমার বন্ধুর মুখ চেয়ে আপনার মত এঁচোড়ে পাকা ছেলের কথা এতক্ষণ শুনছিলাম। আপনি হলেন মহামূর্খ। আপনাকে বাজনা শোনানোও অপরাধ।' আওয়াজটা এত জোরে হয়ে গিয়েছিলো যে বাইরের কিছু লোক এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে এলাম।

আমার এক সতীর্থ গুরুভাইয়ের কানে জানিনা কি'করে এই কথাটা গেল। একদিন আমাকে সেই সতীর্থ গুরু ভাই বলল, 'আরে কেন তুমি এতো রেগে যাও। সংবাদপত্রের মালিকের ভাগ্নেকে হাতে রাখলে তোমার লাভ হ'তো। সংবাদপত্রে তোমার ভাল সমালোচনা বেরোতো।' কথার মাঝখানেই বললাম, 'মিথ্যা অপবাদ দিলে রাগ করবো নাতো কি পুজো করব নিজের স্বার্থে। আপনাদের মত মুচকি হেসে ভালমানুষ সাজতে বলেন?' সতীর্থ গুরুভাই বললো, 'তোমার ভালর জন্যই বললাম, অথচ তুমি পার্সোনাল এট্যাক করছ আমাকে?' যখন বিস্তর পূর্বক এঁচোড়ে পাকার কমেন্টগুলো বললাম, তখন আমার সতীর্থ গুরুভই চুপ করে গেল। কিন্তু বুঝলাম, আলিআকবরের বিরুদ্ধে বলেছে বলে মনে মনে খুশীই হয়েছে। বললাম, 'ঢিল যখন মেরেছে তখন পাটকেলটি তো খেতেই হবে। আর এটা পাটকেল নয়। এটা থান ইঁট। এ না বললে ছেলেটির শিক্ষা হ'তো না।' এ গল্পটা বলার একটাই মাত্র উদ্দেশ্য। আমার সতীর্থ গুরুভাই বোঝাতে চাইল, ভদ্রলোকের কথায় তাঁকে প্রশংসা দিলে, সেই খুশী হ'তো এবং আমার লাভ হ'তো। সঙ্গীতটা কোথায় দাঁড়িয়েছে এখন পাঠকরাই বিচার করুন। সঙ্গীতটাকে মিথ্যের বেসাতি দিয়ে এ যেন টেলিভিসনে এডভারটাইজস করে ব্যবসা বাড়াবার ফিকির। যাক এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি করলাম।

দেখতে দেখতে মৈহার থেকে এসে, প্রায় দেড় মাস কি ভাবে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। আজ সাতই সেপ্টেম্বর। প্রতিদিনের অভ্যাস অনুযায়ী সকালে বাথরুমে গিয়ে

ট্রানজিসটারটা চালু করেছি। সকালে আটটার সংবাদ এবং রাত্রে এগারটার সংবাদ শোনা আমার বরাবরের অভ্যাস। সংবাদের একটু দেরী আছে। গান হচ্ছে। সংবাদ শুরু হোল। যে সংবাদ প্রথমেই বলল, 'শুনে মনে হোল মাথায় যেন বাজ পড়ল। সেদিন ইন্দ্রপতন ঘটল। সংবাদ এ প্রথমেই বলল, 'গতকাল ভারতের অদ্বিতীয় সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব রাত্রি এগারোটা দশমিনিটে তিরোধান করেছেন। সঙ্গীতের মস্ত বড় প্রধান দিকপালের তিরোধানে, সঙ্গীতের যে ক্ষতি হোল তা অপূরণীয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মর্মাহত হয়ে উস্তাদের সন্তপ্ত পরিবারের কাছে শোক প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপতি এবং অনেকেই শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।' বাবা আর নাই। এক মুহূর্তে দুনিয়ার কত কি যে নেই হয়ে গেল ঠিক নাই। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উত্তেজনা চেপে বেশীক্ষণ থাকা গেল না। আমার আদর্শের আলোটাই চোখে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মনে মনে একটা সঙ্কল্প ছিলো, বাবার আদেশ পালন করে বইটা তাঁর হাতে তুলে দেব। কিন্তু এই শুভেচ্ছা সম্বল করার মত এমন আর কে দ্বিতীয় আছে? আকাশে বাতাসে এই মৃত্যু মূর্ত্ত হয়ে থাকল। জীবনের সব থেকে শুভ সূচনার মুখে এ কি হয়ে গেল? আদর্শের শিখা আরো বড় করে তোলার তাগিদ এখন। নইলে ওই মৃত্যুর মহিমা সার্থক হবে না। অথচ উদ্দীপনার সলতেটোই নিভে গেছে আপাততঃ।

খবরটা শোনা মাত্রই অবাক হলাম। কেউ আমাকে মৈহার থেকে বাবার শরীর খারাপের কথা বলল না। মনে হোল সমস্ত পৃথিবী আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। সমস্ত সংসার আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে। এত নিজের লোক হয়েও, কি আশ্চর্য বাবার শরীর খারাপের খবর পেলাম না। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বোধ হয় আমারই দোষে খবর পাই নি। মনে পড়ল বছরের প্রথমে যেবার আলিআকবর, রবিশঙ্কর চলে গেল ভাঙ্গা গলায় বাবা বলেছিলেন, 'আর কাউকে আসতে হবে না। কাউকে না জানিয়ে চলে যাব।' সত্যই বাবা কাউকে না জানিয়ে চলে গেলেন। যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে কাশী বম্বে এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। মৈহারে অরুণের বাড়ী গিয়ে দেখলাম বসে আছে। বললাম, 'বাবার শরীর খারাপ হয়েছিল, অথচ আমাকে লেখোনি।'

অরুণ বলল, 'গতবারে তুমি যেমন দেখে গিয়েছিলে, ঠিক সেইরকমই ছিলেন। কেউ বুঝতে পারে নি। হঠাৎ যেন বাতি নিবে গেল। যাক কখন তুমি টেলিগ্রাম পেলে?' টেলিগ্রাম? বললাম, 'টেলিগ্রাম তো আমি পাই নি। আজ সকালে রেডিওতে খবর শুনেই চলে এসেছি।' অরুণ অবাক হয়ে বলল, 'রাত্রেই তোমাকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বৌদি বললেন, তোমাকে টেলিগ্রাম করেছেন। এ ছাড়া বাহাদুর, নিখিলকে টেলিফোন করেছে গত কাল মারা যাবার পরই। উপরন্তু ক্যালিফোর্ণিয়াতেও টেলিফোন করা হয়েছে, কিন্তু শুনলাম, দাদা এবং রবিদা আসতে পারছেন না। মন্দের ভাল বাবা মারা যাবার কয়েকদিন আগে, ধ্যানেশ এসে গিয়েছিলো। তবে একটা কথা, দীপচন্দ খুব কাজের কাজ করেছে। বাবার মৃত্যুর পরই ডি. এমকে বলে, রেডিওতে খবর প্রচার করবার জন্য বলেছিল।' অবাক হয়ে ভাবি, বাবা দীপচন্দকে খুব ভাল বাসতেন, কিন্তু যাঁদের কাছে ভালবাসা পাবার কথা ছিলো তাঁদের কাছে পেয়েছে নিন্দা, অপবাদ। বিনা স্বার্থে সে যা

করেছে তার জন্য সে পুরস্কার কখনও চায় নি কিন্তু একটু আন্তরিক সহানুভূতি কি পেয়েছিলো? নিঃস্বার্থ সেবার এই বোধ হয় পুরস্কার। অথচ এঁরই সঙ্গে যে ব্যবহার করতে দেখেছি তা সত্ত্বেও সে নিজের কর্তব্য করেছে। তাঁরই জন্য রেডিওতে আমি খবর পেয়েছি। টেলিগ্রাম কখন পেতাম, জানি না।

যাক যা হবার হয়েছে। অরুণকে নিয়ে রাত্রেই বাবার বাড়ী গেলাম। দেখে মনে হোল বরফের মধ্য প্রসন্ন ঘুমে গা ছেড়ে শুয়ে আছেন বাবা। চোখ দুটো আধবোজা। চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মনে হচ্ছে তিনি ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। দুনিয়ার কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অভিযোগ রেখে গেছেন মনে হয় না। অপলক চোখে দেখতে লাগলাম। মৃত্যু অনেক দেখেছি। এই এক ব্যাপারে, নিজের প্রতি আমার আস্থা থাকে না। ভেতরে কিছু গোলমেলে ব্যাপার হতে থাকে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। শ্মশান বৈরাগ্য যাকে বলে। বাবার নানা স্মৃতি আমার চোখে ভাসছে। মনে পড়ে গেল গালিবের একটা দোঁহা।

জাতা হু জগ এ হসরৎ-এ হস্তি লিয়ে হুয়ে
হু শমাএ কুশত দরখুর এ মহফিল নহীঁ রহা।

অর্থাৎ 'জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্নকে বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি এক নির্বাপিত দীপ। মহফিলে রাখার যোগ্য নই আর।' মনে হোল জন্মালেই যেমন মানুষকে মরতে হয়, তেমনি মরবার জন্যই মরবার আগে মানুষকে অনেক বার মরতে হয়। বার বার মরে মরে, মরবার শিক্ষানবিশি করতে হয় মানুষকে। এও সেই শিক্ষানবিশির মতন। এ শিক্ষানবিশি না করলে হঠাৎ কাউকে জানাবার সুযোগ না দিয়ে মারা গেলেন কেন? সেইজন্য মরবার সময় মুখে হাসি ফুটে ছিলো। কতক্ষণ হয়ে গিয়েছে জানি না। রাত্রির শেষে মন থেকে সব ঠেলে সরিয়ে খানিকক্ষণের জন্য তাঁকে শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু চক্ষু আমার স্থির। মনে হোল ভারতের একজন আলোকসামান্য প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অবসান ঘটলো।

মনে মনে বলি, এইরকম একটা আদর্শ পুরুষ তৈরী করতে বিধাতা পুরুষের আরো কয়েক শতাব্দি লেগে যাবে? ঘোর কাটল কান্না শুনে। আমার কাছে মা এবং জুবেদাবেগম এসে কেঁদে ফেললেন। মা এবং তাঁর পুত্রবধূর কান্না দেখে মুখে কোন কথা এলো না। একটু সামলে নিয়ে কেবল একটা কথাই বললাম, 'মানুষ জন্মালেই তাঁর মধ্যে কালো থাকবে। ওটা আলো হয়ে উঠলেই ফুরিয়ে গেল। তখন কালো নিয়ে কান্নাকাটি করা বোকামী।' কথাটা বলতে বলতে নিজের গলা ভারি হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, ধ্যানেশ কয়েকদিন আগে এমনিই এসেছিলো। তাই বাবার মৃত্যুর সময় ছিলো। কলকাতা থেকে এখনও কেউ আসতে পারে নি। আমিই সর্বপ্রথম এসেছি। কথায় বুঝলাম, আগামীকাল সকলে এসে যাবে। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ দেহ বরফের উপর রাখা হবে, তারপর কবর দেওয়া হবে। শুনলাম, আলি আকবরের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজদুলারি টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে, সেও আসছে। ধ্যানেশের কাছে জানলাম, অন্নপূর্ণাদেবী আসতে পারবেন না, কেননা কিছুদিন আগে বাথরুমে পড়ে গিয়ে ফ্রাকচার হয়েছে, প্লাস্টার করা আছে। ধ্যানেশ বলল, 'বাবা এবং পিসেমশাই আসতে পারবে

না কারণ যে প্রোগ্রাম বাজাবার জন্য অগ্রিম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা না বাজালে কর্ণধাররা টাকার দাবী করবে।' ধ্যানেশের কথা শুনে অবাক হলাম। পৃথিবীর কোন পিতার মৃত্যুতে ছেলে এসে যদি বাজনার তারিখ পরিবর্ত্তন করে, তার জন্য কি তাঁরা টাকার দাবী করবে? কি জানি কেন এ কথা বিশ্বাস হয় না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে আকাশ পাতাল পরিক্রমা করতে লাগলাম। এই তো জীবন। যে জীবনের একটা আরম্ভ আছে। সে জীবনের শেষও আছে। এই বোধহয় জীবনের পরিণতি। বাবা আছেন বলেই এই বাড়ীতে সকলের আগমন। কিন্তু বাবা না থাকলে বোধ হয় কেউ এই বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে আসবে না। বারবার ধ্যানেশের কথাই মনের মধ্যে ভাসছে। আলিআকবর, রবিশঙ্কর আসতে পারবে না, কারণ তাঁরা বাজাবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনেকেই ভাবে যৌবন কালই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। তাই পৃথিবীর যা কিছু ভোগ্য পণ্য, সমস্ত কিছুই নিজের শরীর দিয়ে তখন আয়ত্ত্ব করা যায়। আর তাই পাওয়া যায় মোসাহেবের দল। তাঁরা সকলেই আপনার তারিফ করবে। আপনার গুণগান করবে। আপনার দোষগুলোও তাঁরা গুণ বলে কীর্ত্তন করবে। তখন আপনারই মনে হবে ওগুলো সত্যি কথা আর তাঁরাই তখন হবে আপনার হিতৈষী।

কিন্তু তারপর আপনার রক্তের তেজ কমে আসবে। প্রচুর অর্থ থাকলেও তখন ভোগের আসক্তি চলে যাবে। আসক্তি থাকলেও ক্ষমতা চলে যাবে। তখন দরকার হবে বিশ্রামের, ঘুমের এবং সেবার। তখন হয়ত আপনার মনে পড়বে সেই সব হিতৈষীদের কথা। তাঁদের আপনি খুঁজবেন, কিন্তু তাঁরা তখন নাগালের বাইরে। তখন একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন আপনি। তখন সামনে সমস্ত কিছুই ফাঁকা। যা পিছনে ফেলে এসেছেন সেইটাই শুধু আপনাকে বিব্রত করে তুলবে। তখন সেটা আরো প্রত্যক্ষ হয়ে আপনাকে গ্রাস করবে। যখন এইগুলো বুঝতে পারবেন তখন বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছে। তখন সকলের প্রতি বিশ্বাস হারাবেন। প্রভু এদের ক্ষমা কোরো।

কবরস্থান করার কি রীতি আমার জানা নেই। সেইজন্য জুবেদা বেগমকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আগামীকাল কবর দেওয়ার আগে যা করতে হবে তার জন্য সব আয়োজন সকালেই করতে হবে।' জুবেদা বেগম সব কার্যক্রম বলে বললেন, 'আগামীকাল মৌলবী যে সময় বলবেন সেই সময় কবর দেওয়া হবে। মনে মনে একটা ছক এঁকে দুই ঘণ্টা থাকার পর অরুণের সঙ্গে বাড়ী চলে গেলাম।

বাড়ীতে এসেই নানা কথা মনে হতে লাগলো। মৈহার, শহর থেকে কত আলাদা। মৈহারের চারিদিকে গাছ আর সবুজের সমারোহ। মৈহারের সবুজ পরিবেশ সর্বদাই আমার মনে দোলা দেয়। ছোট বড় গাছগুলো বাতাসে দুলে দুলে সেই প্রথম দিনের মতো আজও ডাকে। সেই রঙ্গীন প্রজাপতির দল জোড় বেঁধে, এ দিক ও দিক ভেসে বেড়াচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় কাঠবেড়ালি গাছের ডালে লুকোচুরি খেলছে। চড়াই পাখী, গরু, মোষ, মুরগী এক একটাকে ধাওয়া করছে। সকলেই অন্যের মন ভোলাচ্ছে। মৈহারের যৌবনে জরা নেই।

মৈহারের বসন্ত খুব উদার। আরো অকৃত্রিম। বাংলোর সামনেই ফুলের বাহার। পেছনে গাছ গাছড়ার চাষ করে কয়েকটা চাকর। বাংলোর বাইরে যে দিকে তাকাও সবুজের

সমারোহ আর পাহাড়। পাহাড়গুলো রিক্ত নয়। মৌসুমি ফুলের মুকুট পরে বসে আছে। আর বাড়ির চারদিকে ঋতু সাজে সেজেই আছে। তাঁর বাতাস রক্তে দোলা দিয়ে যায়। তখন নিজেকে দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ মনে হোল সবাই আছে, কেবল বাবাই নেই। কিন্তু প্রকৃতি নিজের গতিতে ঠিক চলে যাচ্ছে।

ইতিহাসের একটা আদি নিয়ম আছে। সেই নিয়মে একজন যায় এবং তাঁর জায়গায় আর একজন আসে। কিন্তু ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায় শেষ হয়ে গেল বাবার মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে। বাবা ছিলেন বাবাই। তাঁর না আছে বিকল্প, না হবে। রাজা মনের গেলে রাজ্য নিশ্চয়ই চলে কিন্তু সুরের রাজ্য আর অসুরের রাজ্যে যা তফাৎ, মনে হয় এবারে তাই হবে। কিন্তু রাজা বদলালে রাজ্যও কি বদলে যাবে? রাজা বদলালে রাজ্য বদলায় না। কিন্তু এই ঘটনাই হয়েছে বাবার মৃত্যুর পর। এখন শিক্ষার আর মনুষ্যত্বের দামের চেয়ে টাকার দাম বেড়ে গেছে। তা না হলে আলিআকবর, রবিশঙ্কর এই সময়ে অনুপস্থিত কেন? সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন। কে এর উত্তর দেবে? টাকায় মানুষ বড় হয় না। মানুষ বড় হয় মনুষ্যত্বে। কিন্তু আজকাল নীতি ঠিক উল্টো।

ঘুরে ফিরে বাবার কথাই মনে হচ্ছে। ভাবতেই পারছি না। বাবা চোখ খুলে আর তাকাবেন না। এর নামই তো ক্ষণস্থায়ী জীবন। এত বড় পৃথিবীটা যাঁরই সৃষ্টি হোক না কেন, দুঃখ তিনি এখানে স্থায়ী হতে দেন নি। কোন দুঃখ, কোন দুশ্চিন্তাই এই পৃথিবীতে স্থায়ী নয়। যতদিন আছ শুধু কর্তব্য পালন করে যাও। এই পৃথিবীতে রোজ জন্ম আর মৃত্যু হচ্ছে। কখন যে দুচোখের ধারা বইছে বুঝতে পারি নি। কিন্তু সময় তো কারো জন্য বসে থাকবে না। একটা মানুষ শেষ হয়ে গেল। একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবি বাবার কত বড় ভূমিকা ছিলো এই সংসারে। কিন্তু আজ আর তাঁর কোন মূল্য নাই।

অবাক হয়ে ভাবি, বাবা মারা যাবার পরই রাতারাতি আমি খারাপ লোক হয়ে গেলাম। সংসারে এমনিই বোধ হয়। এইটেই বোধ হয় নিয়ম। আশ্চর্য তো! এখনও বাবার উপস্থিতিটা ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠলাম একটা আওয়াজ শুনে। কে যেন আমাকে ডাকছে। সামনে অরুণ ও দীপচন্দকে দেখে ব্যাপারটা বুঝলাম। শেষ রাতে ঘুম এসেছে বুঝতে পারি নি। আশ্চর্য এমন স্বপ্নও মানুষ দেখে।

আমাকে উঠতে দেখেই দীপচন্দ বলল, 'দাদা, বাবাকে খাটের উপর শুইয়ে বিকেল তিনটের সময় মৈহার পরিক্রমা করার স্থির করেছি। লরির ব্যবস্থা করেছি।' কথাটা শুনে ভাবলাম, সত্যিই দীপচন্দের তুলনা নাই। এ কথা তো আমার মনে আসে নি, অথচ দীপচন্দ সব পরিকল্পনা করেছে। বললাম, 'তুমি যা করেছ, ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোটো করব না। বাবা তোমাকে নাতির মত ভালবাসতেন। তুমি পুত্রের যা করণীয় তাই করেছো।' দীপচন্দ চলে গেল। মৈহারের প্রতিটি লোকেই বাবাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে। দীপচন্দের বাবা, বাবাকে 'বাবা' বলেই সম্বোধন করতেন। সম্পর্কে নাতি হলেও, দীপচন্দও বাবাকে 'বাবা' বলেই সম্বোধন করত। মুখ হাত ধুয়েই অরুণ এবং ইলাকে নিয়ে বাবার বাড়ী গেলাম।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি একে একে মৈহারের লোকে আসছে। মৈহারের বাইরের লোকেরাও এসেছে। দেখতে দেখতে লোক উপচে পড়ল। অরুণকে বললাম, 'দুটো লাইন করাও। একদিক দিয়ে লোক আসবে, বাবাকে পরিক্রমা করে মাথার দিক দিয়ে চলে যাবে।' সকলেই দেখলাম মালা নিয়ে এসেছে। পরিক্রমার সময় মালা চড়িয়ে যাচ্ছে। যত বেলা বাড়তে লাগল ততই যেন লোক বাড়তে লাগল। দুপুর পর্যন্ত এই পরিক্রমা চলল। এরই ফাঁকে বাড়ীতে গিয়ে আবার স্নান সেরে কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখি, বাড়ীর বাইরে লোকে লোকারণ্য। বহু সাংবাদিক এসেছেন। এ ছাড়া বুঝলাম, জব্বলপুর, কাটনি, সাতনা, রেওয়া এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসেছে বাবাকে দেখতে। বাড়ীতে ঢুকেই দেখি, সুপ্রভাত পাল এবং নলিন মজুমদার দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, 'কখন এলে? এখানে কেন, বাড়ীর ভেতরে চলো।'

সুপ্রভাত পাল বলল, 'দুপুরের গাড়ীতে এসেছি। বাড়ীতে ঢুকবার দরজায় একটি ছেলে চেয়ারে বসে আছে। সেই ছেলেটি বলল, 'উপস্থিত বাড়ীর ভিতর কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। দু ঘণ্টার পর সকলে বাবাকে দেখতে পারবে।' কথাটা শুনে অবাক হলাম। অরুণের বাড়ীতে স্নান করতে যাবার আগে বিশেষ কোন দর্শনার্থী ছিলো না। কিন্তু একঘণ্টা পরে এসে দেখছি, বাড়ীর বাইরে অজস্র লোক বাবাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছে। কিন্তু বাবাকে দর্শন করতে কেন দিচ্ছে না? কে ঢুকতে দিচ্ছে না? সুপ্রভাত পালকে দেখে মনে হোল বাড়ীর ভিতর ঢুকতে না পেরে মর্মাহত হয়েছে।

সুপ্রভাত পাল এবং নলিন মজুমদারকে নিয়ে এগিয়ে দেখি, দরজার বাইরে চেয়ারে বসে আছে লক্ষ্মণ পাণ্ডে। মৈহার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, আমার থাকাকালীন প্রথমবছরের সেতারের ছাত্র। আমাকে দূর থেকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল। গিয়ে বললাম, 'দরজা বন্ধ করে কাউকে যেতে বারণ করেছো কেন?' ধীরে ধীরে আমাকে বলল, 'ভাবী অর্থাৎ জুবেদা বেগম দুই দিন সারারাত জাগরণ করে ক্লান্ত হয়ে সবে মাত্র একটু শুয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে এখন কাউকে যেতে দিচ্ছি না।' বললাম, 'তোমার ভাবীর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সকাল থেকে যে ভাবে সকলকে লাইন করে পরিক্রমা করিয়েছিলাম, তা তো করাতে পারতে?' এই কথা বলেই অরুণকে বললাম, 'সকলকে দুটো লাইন করে দাঁড়াতে বলো।' তারপর চলল পরিক্রমা। কাশীর সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার অতিবলও এসেছে ক্যামেরা নিয়ে। ভাবলাম আমার বইএর জন্য বাবার মৃত্যুকালীন ফটো একটা বিরাট সম্পদ। অতিবলকে বললাম, 'আজ কবর দেওয়া পর্যন্ত যে সব অনুষ্ঠান হবে, সেই ফটোগুলো তুলবে।' অতিবল আমার পূর্বপরিচিত। বলল, 'ফটো তুলবার জন্যই তো এসেছি সংবাদপত্রের তরফ থেকে।' কাতারে কাতারে লোক একঘণ্টা ধরে বাবাকে দেখেই, ফুল দিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকের আর শেষ নেই। সকলেই দেখলাম শোকে মুহ্যমান। দূরে দেখলাম, মা চুপটি করে বসে আছেন। মা'কে দেখে মনে হোল ঠিক যেন পাথরের মূর্তি। কোন বিকার নেই। কি যে হয়ে গেছে, এবং কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছেন না। মা'কে একা থাকতে দেওয়াই ভালো। তাই মা'র কাছে গেলাম না।

ইতিমধ্যে বাবার ছাত্রদের মধ্যে রেবতীরঞ্জন দেবনাথ, শরণরাণী, নিখিল, রবীন সকলেই

এসে গেছে। পাটনা থেকে সি. এল. দাসও এসেছে। সাতনা থেকে সনৎ এবং রঞ্জিত গতকালই এসে গেছে। মৌলবি সাহেব এসে বললেন, 'সূর্যাস্তের আগেই কবর দিতে হবে। যাঁদের আসবার কথা তাঁরা যদি বিকালের মধ্যে না আসেন তাহলে আর দেরী করা চলবে না। এখন পৈ ফাতেহা পড়তে হবে।' মৌলবি সাহেবের নির্দেশ ম'তো দেখলাম আলিআকবরের এক পরমাত্মীয় হিফজল কবির মাথায় টুপি পরে একটি বই দেখে উর্দুভাষায় বাবার কাছে গিয়ে পড়তে লাগলেন।

বাড়ীর বাইরে এবং বাড়ীর ভেতরে লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ দেখি রেবতীরঞ্জন দেবনাথ একটা পাখা নিয়ে বাবাকে বাতাস করছে। পৈর ফাতেহা পড়া চলছে। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছেন। চুপ করে দেখছি। মনের মধ্যে নানা কথা আলোড়নের সৃষ্টি করছে। হঠাৎ দেখি, আমার কাঁধের উপর কে হাত রেখেছে। পেছন ফিরে দেখি ডাক্তার। ডাক্তার বললেন, 'বিচলিত হবেন না। 'লাইফ মাই ফ্রেণ্ড, ইজ সো এরেঞ্জড দ্যাট ডেথ ইজ সামটাইমস এ হলিডে ফর ওয়ান, সামটাইমস ইট ইজ ব্লেসিং ফর অল।' মনে পড়ল ডাক্তারের কথা। গতবারে যে সময় এসেছিলাম, বলেছিলেন, 'এ অবস্থায় করার কিছুই নাই। এই অবস্থাতেই যে কদিন বাবাকে সেবা করার সুযোগ পাই সেইটাই হবে আমাদের আশীর্বাদ।' শেষ পর্যন্ত প্রদীপের সলতে নিভে গেছে। মনে হোল প্রদীপ্ত সূর্যকরে ম্লান হয়ে গেল দুর্বল দীপশিখা। মনে মনে বলি, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়। কিন্তু স্বাধীন ভাবে মরতে বা বাঁচতে দেওয়া উচিত নয় কি? যদি জানতাম, তা হলে অন্ততঃ বাবার মৃত্যুর আগে এসে থাকতে পারতাম। মৃত্যুর পর শ্মশান বৈরাগ্যের মত একটা ভাব সকলকেই আচ্ছন্ন করে। এই তো মানুষের জীবন। যাঁর শয়নের দাগ এখনও মিলিয়ে যায় নি, তিনি এখন অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন। তাঁর যাত্রা যেন শুভ হয় তার জন্যই পৈর ফাতেহা পড়া হচ্ছে।

চিরকালই দেখেছি মারা যাবার পর সকলকে ডাকতে হয়। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম। মৈহার থাকাকালীন, বাবাকে কখনও কারো বাড়ীতে যেতে দেখিনি। কিন্তু প্রত্যেকের হৃদয়ে বাবার জন্য কত বড় জায়গা ছিল, লোক সমাগম দেখে বুঝলাম। বাবার মহাপ্রয়াণের খবর শুনেই, দূর দূর থেকে লোক বাবাকে দেখতে এসেছে, এটা ক'জনের ভাগ্যে হয়।

দেখতে দেখতে বিকেল তিনটে হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারি নি। এবারে বাবাকে জুলুস করে মৈহার পরিক্রমা হবে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, যে সব মুসলমানরা এসেছে প্রত্যেকের মাথায় একটা সাদা চাদর দিয়ে মাথাটা ঢাকা। অনেকে টুপি পরেছে। দেখলাম জুবেদা বেগম বাবার ছাত্রদের সকলকেই একটা করে পরবার টুপি দিচ্ছেন। যেমন গান্ধী টুপি বাবা ব্যবহার করতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচুখি হওয়া সত্ত্বেও টুপি দিলেন না আমাকে। এ নয় যে টুপি আর নাই। এখনও অনেক টুপি আছে। বুঝলাম কেন আমাকে টুপি দেওয়া হোল না। 'দিনমান' সাপ্তাহিক পত্রিকায় রজত অরোরা লিখেছেন, 'আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কোমা স্টেজ দেখেও, কি করে তাঁর পুত্র এবং জামাতা চলে গেল, সেটা আমার কাছে পরম বিস্ময়।' জুবেদা বেগমের মনে হয়েছিল আমিই বোধ হয় সেই কথা লেখককে বলেছিলাম। যার ফলে 'দিনমানের' ফটোগ্রাফারকে বলেছিলেন এডিটরকে বলবার জন্য লেখাটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু

মৈহারে এসে সে মনোভাব তো দেখতে পাই নি। তবে সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। বুঝলাম কেন আমাকে দেখেও টুপি দিলেন না। মনে হোল, যখন তোমার কেউ ছিলো না তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি।

যাক এর জন্য আমার দুঃখ নাই। যে সময় বুঝলাম মরদেহ নিয়ে যাবার সময়, মাথায় কিছু ঢাকা দেওয়া মুসলমানি প্রথা, তখন মাথার উপর নিজের রুমালটা রাখলাম। যে সময় বিছানা থেকে বাবাকে ওঠান হচ্ছে, হঠাৎ জুবেদা বেগম চিৎকার করে কেঁদে বললেন, 'আমার ছেলেকে সকলে নিয়ে যাচ্ছে।' মেয়েমহলে সকলেই কাঁদছে কোন আওয়াজ না করে, কিন্তু জুবেদা বেগমের কথা শুনে ওই অবস্থাতেও হাসি পেয়ে গেল। জুবেদা বেগম বাবাকে ছেলে কি করে বলছেন? এটাকে কি বলব? মা'র মুখে কোন কথা নাই। মা যেন বোবা হয়ে গিয়েছেন। দেখে মনে হচ্ছে বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারছেন না। জুবেদা বেগম মা'কে বললেন, 'চুপটি করে রয়েছেন কেন? একবার শেষ দেখা দেখে নিন।' মা কিন্তু অনড়। মনে হোল পাথর হয়ে গিয়েছেন। কোন বোধ শক্তিই নেই। বাবার ঘর খোলা হয়েছে, যে ঘর দিয়ে বাবা বাইরে যেতেন, সেই ঘর দিয়েই বাবাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হোল। অতিবল বরাবর ফটো তুলে যাচ্ছে। বাবার শোবার ঘরেরও একটা ফটো তুলে নিলো। বাড়ীর সামনে খাটের উপর বাবাকে শুইয়ে মালা দিয়ে সাজান হোল। এই সময় পুরুষ ও মহিলা সকলের চোখেই জল। বাবার মৃতদেহ যথারীতি স্নান করিয়ে কাফন (শবাচ্ছাদন বসন) দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে মৃতদেহের সদ্‌গতির জানাজা (উপাসনা) করিয়ে তাবুত (শেষ শয়নাসন) করে সাধারণের সম্মুখে আনা হোল। সকলেই দুই হাত তুলে আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করল। এবারে জুলুস করে নিয়ে যাওয়ার সময় হোল।

হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে কাঁধ দিল। অসংখ্য লোক সঙ্গে যাচ্ছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মৈহার পরিক্রমার সময় বাড়ীর ছাদ থেকে সকলে শবাধারের উপর ফুল ছড়াচ্ছে এবং কাঁদছে। মনে হচ্ছে তাঁদের নিজের লোক মারা গেছে। কি হিন্দু আর কি মুসলমান, সকলেই কাঁদছে। কবরস্থ করতে যাওয়ার সময় কাশীতে মুসলমানদের কখনও কাঁদতে দেখিনি। মৌন মিছিল যেতেই দেখেছি। কিন্তু মৈহারে এক ব্যতিক্রম দেখলাম। মুসলমান পাড়া দিয়ে যখন বাবাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মুসলমানদেরও কাঁদতে দেখলাম।

সকলের কান্না দেখে মনে পড়ে গেল একটা হিন্দি কবিতা।

তুলসী যব জগ আয়ো
জগ হাঁস তু রোয়।
ঐসি করনি কর্ চলো
তুঁ হঁসে জগ রোয়।

কবিতাটা বাবার বেলায় প্রযোজ্য। তুলসীদাস যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় সকলেই হেসেছিলেন এবং তিনি কেঁদেছিলেন। এমন কাজ করে যা, যার ফলে মৃত্যুর সময় তুই হাসবি অর জগতের লোকেরা কাঁদবে। মনে হচ্ছে সকলের কাঁধে চড়ে বাবা হাসছেন এবং সকলে কাঁদছে।

শব নিয়ে যাবার সময় শব-যাত্রী হিন্দুদের বলতে শুনলাম, রামনাম সত্ হ্যায়। আর মুসলমানরা বলছিলেন অন্য কিছু যা আমি বুঝতে পারি নি। মুসলমানদের মৌন মিছিল দেখেই অভ্যস্ত। তাই পরে আমি মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মুসলমান ভাইরা কি বলছিলেন?' তিনি বললেন, 'তাঁরা বলছিলেন,

'বাধা বদলনে বালো
হমরাহ চলনে বালো
পড়তে চলে রবা হয়
সল্লে আলা মুহম্মদ।

এই কথা বলে তিনি বললেন, 'যে মুসলমানদের মিছিলে জোরে কোন কথাই বলা হয় না। উপরোক্ত কথাগুলিও মনে মনেই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হিন্দুভাইদের জোরে বলা 'রামনাম সত্ হ্যায়'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখবার জন্যই ওঁরাও 'সল্লে আলা মুহম্মদ' কথাগুলিই শুধু জোরে জোরে উচ্চারণ করছিলেন। মৈহার-এর লোক বাবাকে কত শ্রদ্ধা এবং নিজের জন ভাবে, এই দৃশ্য যে না দেখেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না। মৈহার পরিক্রমা করে যে সময় বাড়ীর কাছে আসা হোল দেখলাম, বাহাদুর কোলকাতা থেকে সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে।'

বাবার বাড়ীর পাশে বিরাট মাঠে মুসলমানেরা এক লাইন করে অলবিদার নমাজ পড়ল। কবরের জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছে বাড়ীর সামনের লনের দক্ষিণ দিকে। মৈহার থকাকালীন, বাবা নিজের ঘরের সামনে, লনে গোলাকার জায়গা করে ফুল লাগিয়েছিলেন। সেই সময় আমাকে কথায় কথায় বলেছিলেন, 'আমি মারা গেলে আমার ঘরের সামনে গোলাকার বেড়া দেওয়া জায়গাটায় কবর দিও।' এ কথাটা বাবা কয়েকবার আমায় বলেছিলেন। কবর বাড়ীর দক্ষিণ দিকে খোঁড়া হচ্ছে দেখে জুবেদা বেগমকে বললাম, বাবার ইচ্ছার কথা। জুবেদা বেগম বলল, 'আপনার দাদা বাড়ীর দক্ষিণ দিকেই কবর দিতে বলেছেন। বাবা আপনার দাদাকে ওই জায়গায় কবর দিতে বলেছেন বলেই আমি দক্ষিণ দিকে কবর খুঁড়বার জন্য বলেছি।' এ কথার উপর আর কিছু বলা চলে না। জানি না বাবা কবে এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কবর খোঁড়া হয়ে গেল। আলিআকবরের দ্বিতীয় স্ত্রী রাজদুলারি এলেই কবর দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও এসে পৌঁচচ্ছে না কেন? সূর্যাস্তের আর বেশী দেরী নাই। হঠাৎ জুবেদা বেগম ঘরের বাইরে বেরিয়ে বললেন, 'আর কারোর জন্য দেরী করা যেতে পারে না। আপনারা কবর দেবার ব্যবস্থা করুন।' এ কথা শুনে, মৌলবী যথা নিয়ম সব পালন করলেন, কবরের মধ্যে বাবাকে শোওয়ান হোল। সকলেই কবরের মধ্যে মাটি দিয়ে ভরাট করতে লাগল। কি মনে হোল জানি না, যে কাজ আলিআকবরের করার কথা সেই কাজ আমি করলাম। প্রথম এবং শেষ মাটি আমিই দিলাম। এর পর দফন (মৃত্তিকায় প্রোথিত) করা হোল। সব কাজ ভাল ভাবে হয়ে গেল। বাবার কবর দেখে মনে হোল যাঁর এত নিয়মনিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র, কবরের মধ্যে আর জাত বিচার কে করে? কবরে প্রবেশ করলে সকলেই মৃত, সব শেষ। অতীতের বিরাট একটা যুগের সামনে বাবার প্রাসাদ যেন একটা ভয়াল সৌন্দর্যের সাক্ষী বিশেষ।

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম, ইতিমধ্যে দীপচন্দ আমার কাছে এসে বলল, 'দাদা আজ মধ্যপ্রদেশের চীফ মিনিস্টার নিজের সচিবকে পাঠিয়েছেন শোক সভা করবার জন্য। সন্ধ্যার সময় গেস্ট হাউসের সামনে শোক সভার আয়োজন করেছি।' বললাম, 'এক কাজ করো। তুমি এখানেই ঘোষণা করে বলে দাও সকলে যেন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত থাকে।' দীপচন্দ সঙ্গে সঙ্গে সকলকে সম্বোধন করে বলল, 'কিছুক্ষণ পরেই গেস্ট হাউসের সামনে বাবার স্মরণে শোকসভা হবে। মধ্যপ্রদেশের চীফ মিনিস্টার নিজের সচিবকে পাঠিয়েছেন। সচিব প্রধান অতিথি হিসেবে কিছু বলবেন। আপনারা সকলে যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, দয়া করে গেস্ট হাউসের সামনে উপস্থিত থাকবেন।'

এই কথা শুনে দেখলাম, সকলেই ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। যে জায়গায় এতক্ষণ লোকে লোকারণ্য ছিলো বাড়ীর সামনে, বাড়ীটা দেখে মনে হোল খাঁ খাঁ করছে। কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখি গেস্ট হাউসের সামনে লোকে লোকারণ্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে দীপচন্দ সব ব্যবস্থাই করেছে। সচিব, প্রধান অতিথি হিসেবে চেয়ারে বসেছেন। প্রথমে দীপচন্দ বাবার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে বলল, 'বাবার সম্বন্ধে মৈহারের বিশিষ্ট লোক এবং বাবার শিষ্যরা যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনুরোধ করছি, এক একজন কিছু বলুন। সকলের বলবার পরে প্রধান অতিথি বাবার সম্বন্ধে কিছু বলবেন। প্রথমে ডাক্তার গোবিন্দ সিং বাবার কাছে যে স্নেহ পেয়েছিলেন সেই কথা বলে বললেন, 'ভাবতেই পারছি না যে বাবা আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু প্রকৃতির বিধানের কথা স্মরণ করেই আমার বক্তব্য শেষ করব। প্রকৃতির বিধান হোল, 'ইউ কান্ট সে নো, হোয়েন ডেথ বেকনস।' এরপর দীপচন্দ পরের পর এক একজনের নাম বলে ডাকতে লাগল। মৈহারের প্রতিষ্ঠিত লোকেরা একে একে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। দীপচন্দ আমার কাছে এসে বলল, 'মৈহারের লোকেরা বলবার পর বাবার শিষ্য যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে সকলের নাম বলুন। ক্রমানুসারে এক একজন এসে কিছু বলবে। আপনি বাবার ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুতরাং বাবার সম্বন্ধে ভাল করে কিছু বলবেন।' মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। ভাষণ দেওয়া আমার স্বভাবে নাই। মৈহারের স্কুলে, বাবার কথায় ছেলেদের সম্বোধন করে সঙ্গীত সম্বন্ধে একবার বলেছিলাম। কিছু বলতে হবে ভেবেই বিচলিত হলাম। বললাম, 'শরণরাণী, নিখিল এবং সনৎ বাবার সম্বন্ধে বলুক, তারপর আমি বলব।' শরণরাণী বলল, 'এই পরিস্থিতিতে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাবার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ এ কি করা যায় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি, আগামীকাল বিকেলে বাবার শিষ্যরা এবং মৈহারের প্রতিষ্ঠিত লোকেরা সকলে একজায়গায় একত্রে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করবেন।' এ কথা শুনে দীপচন্দ বলল, 'আগামীকাল বিকেলে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে বাবার শিষ্যদের এবং এখানের প্রতিষ্ঠিত লোকেদের আসবার জন্য অনুরোধ করছি।' এরপর নিখিল এক কথায় দুঃখপ্রকাশ করে বসে পড়ল। এবারে সনৎ-এর নাম ঘোষণা হোল। সনৎ বলল, 'আমার বাবা মায়ের সঙ্গে, বাবার পারিবারিক সম্বন্ধ ছিল। আমার বাবা এবং মা বাবার কাছে ধর্মকন্যা এবং জামাই। সেই হিসেবে বাবা ছিলেন আমার দাদু। আমার দুঃখ প্রকাশ করবার ভাষা নাই।' যে হেতু সনৎ সঙ্গীতের শিক্ষকতা করে তাই সংক্ষেপে সুন্দর বলে

গেল। এরপর দীপচন্দ আমার বিষয়ে বিরাট ভূমিকা দিয়ে বলল, 'বাবার কাছে শিষ্যদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী দিন বাবার বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁকে বাবার বিষয়ে কিছু বলবার অনুরোধ করছি।' আমার সম্বন্ধে দীপচন্দ এত বেশী বলল, যার ফলে কি জানি কেন, আমার বিচলিত ভাব কর্পূরের মত উবে গেল। যে সময়ে সকলে একের পর এক শোক সভায় বলছিল, সেই সময় কি বলব মনে মনে ঠিক করছিলাম। ভাবছিলাম সকলে বলে নিক, যা সকলে বলছে সেই কথা না বলে নূতন কিছু বলব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমার সময় এসে যাবে বুঝতে পারি নি। বলার সময়ে কেউ যেন আমার মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বলিয়ে দিল। বললাম, 'আমার চেয়ে দুর্ভাগা বোধ হয় আর কেউ নাই। বাবা আমাকে গুরু দক্ষিণা হিসাবে তাঁর জীবনের সব সত্য ঘটনা লিখতে বলেছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকাকারে লিখে তাঁর হাতে দিতে পারলাম না। যদিও পার্থিব শরীরে আজ বাবা আমাদের মধ্যে নেই, তবুও আমি বিশ্বাস করি, মৈহারের প্রতিটি জায়গায় বাবার পায়ের চিহ্ন আছে। কে বলে চলে গেছেন? বাবার গুরু উজির খাঁ সাহেব আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, যতদিন সূর্য চন্দ্র থাকবে ততদিন তোমার নাম থাকবে। সারদা দেবী তাঁর অনন্য ভক্তকে, তাঁর প্রয়োজনে গাছে ফুল ফুটিয়েছিলেন, আবার প্রয়োজন শেষে তাঁরই ইচ্ছায় ঝরে পড়েছে। ঝরে পড়লেও, দেবীর আশীর্বাদে বাবা যে বৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছেন, সেখানেই সময়মত ফুল ও ফল জন্মাবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সচিবের কাছে আমার কয়েকটা প্রস্তাব রাখছি। প্রস্তাব মত কাজ হলে, আমি বিশ্বাস করি, সেনী ঘরাণার প্রতীক হয়ে বাবা চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। প্রথমতঃ, বাবার বাড়ীতে একটা সুন্দর লাইব্রেরির স্থাপনা করতে হবে। তাঁর মধ্যে বাবার হস্ত লিখিত সব খাতা থাকবে। এ ছাড়া বাবার সব যন্ত্র সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। মৈহারে যে পর্যটকরা আসবেন তাঁরা এগুলি দেখবেন, যার ফলে বাবার বাড়ী একটা তীর্থস্থান হিসাবে চিহ্নিত হবে। দ্বিতীয়তঃ, বাবার বাড়ী থেকে মৈহার দেবীর মন্দির পর্যন্ত রাস্তার নাম রাখতে হবে, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মার্গ'।

এছাড়া বাবার কবর স্থানটিতে মারবেল পাথর দিয়ে সুন্দর ভাবে একটা বেদী তৈরী করতে হবে। আমার সর্বশেষ প্রস্তাব হোল, যে বাসনা নিয়ে বাবা মৈহারে সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলেছিলেন, যা ভারতবর্ষের সব কলেজ থেকে ভিন্ন, সেই ভাবেই সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বাবার অর্কেস্ট্রা চলবে। আমি বিশ্বাস করি, মৈহারের এই পবিত্র মাটির থেকে বাবা আবার আবির্ভূত হবেন। এ যদি না হয় তা হলে সঙ্গীতের মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পর সকলেই প্রার্থনা করেন, যিনি মারা গেছেন, তিনি যেন স্বর্গলোকে যান। কিন্তু আমি সে প্রার্থনা করব না। আমি প্রার্থনা করি, বাবা আবার জন্মগ্রহণ করে সঙ্গীতের নূতন রাস্তা দেখাবেন। এর থেকে বেশী কিছু বলার মত মনের অবস্থা নাই। যদিও আরো অনেক কিছু করবার আছে, সেগুলি সকলকে চিন্তা করতে হবে। আমার আরজি মৈহারের প্রতিটি লোক এবং প্রধান সচিবের কাছে জানালাম। আমার আরজি মঞ্জুরির আশ্বাস পেলে, এই দুঃখের মধ্যেও ভাবব, বাবার প্রতি এই হবে আমাদের প্রকৃত শোকসভার উদ্দেশ্য।' এর পর দীপচন্দ প্রধান অতিথিকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করল।

মুখ্যমন্ত্রীর সচিব দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সর্বপ্রথম সারদাদেবীর কাছে আমি প্রার্থনা করি, তিনি যেন উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পরিবারবর্গকে এই শোক সহ্য করবার শক্তি দেন। উস্তাদের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি এবং শিষ্যের প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। তাঁর কথামত রাস্তার নাম, উস্তাদ বাবার নামে যাতে হয়, তার জন্য পি. ডবলু. ডি.র ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দেওয়া হবে। এ ছাড়া যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, সে কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। যে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার জন্য বহু টাকার প্রয়োজন। মৈহারে সঙ্গীতের পীঠস্থান এবং তীর্থস্থান করবার জন্য একটি পরিকল্পনা করতে হবে। এই মহৎ কার্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আর্থিক সাহায্য করবেন। তবে এই মহৎ কার্যের জন্য মৈহারের নাগরিকদেরও আর্থিক সাহায্য করতে হবে।' এই কথা শুনেই মৈহারের সমবেত জনতা একসঙ্গে চিৎকার করে বললেন, 'জরুর করেঙ্গে, জরুর করেঙ্গে।' প্রধান সচিব জনতার আশ্বাস পেয়ে বললেন, 'আপনারা একটা কমিটি করে সব প্রস্তাব জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। তাহলে আমি কথা দিচ্ছি সব প্রস্তাবই মঞ্জুর হবে।' এর পরই সভা শেষ হোল। দীপচন্দ-এর বাবা পূরণ শেঠ আমাকে বললেন, 'আপনি বাবার যোগ্য পুত্রের মতই প্রস্তাব দিয়েছেন।' আমার প্রস্তাবটা লোকমুখে আলোচনার বস্তু হোল। দীপচন্দ বাবার সব শিষ্যদের বললেন, 'আগামীকাল সকালে আপনারা সকলে আসবেন। বাবার জন্য কি করা যায় সে নিয়ে অলোচনা করব।' সারাদিন কি ভাবে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। স্নান করলাম। সন্ধ্যার প্রথম প্রহর শেষ হতে আর বেশী দেরী নাই। মালা, ধূপকাঠি এবং মোমবাতি নিয়ে বাবার বাড়ী গেলাম। যে বাড়ী সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল উপস্থিত একেবারে শূন্য। বাবার কবরের কাছে দেখলাম প্রদীপ জ্বলছে। ধীরে ধীরে আমরা বাবার কবরের কাছে গেলাম। বাবার কবরে যখন বাতি দিতে গেলাম, তখন মনে মনে কল্পনা করেছিলাম আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় বাবার উদ্দেশ্যেই প্রদীপ জ্বালাচ্ছি। ঠিক সেই সময় মনে পড়ল, আজ থেকে কুড়ি বছর আগে মৈহার থেকে কাশী যখন এসেছিলাম কয়েকদিনের জন্য, সেইসময় ফেরার পথে যাত্রার বিরক্তিকর একাকীত্ব এড়ানর জন্য চার আনা দিয়ে কিনেছিলাম হিন্দি ভাষায় লেখা ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের একটি কবিতার সংকলন। যেটা দেখে বাবা খুশী হয়েছিলেন যখন আমি পড়ে শোনাতাম তাঁকে। একটি রচনা বাবার মনে সবচেয়ে বেশী দাগ কেটেছিলো। বাবা বলেছিলেন, 'এ যেন আমার জীবনের কথা লিখেছে। এঁর যা শেষ সেটা যেন আমার শেষ না হয়।' কিন্তু কি নিষ্ঠুর নিয়তি। মনে পড়ে গেল সেই কয়েকটা ছত্র।

ন মৈ কিসিকে আঁখ কা ণূঁর হুঁ
ন মৈ কিসিকে দিল কা করার হুঁ।
যো কিসিকে কাম ন আসকে
মৈ ওয় এক মুস্ত গুব্বার হুঁ।
ন তো মৈ কিসি কা হবীর হুঁ
ন তো মৈ কিসি কা রকীব হুঁ।
যো উজাড় গয়া ওয় নসীব হুঁ

যো বিগড় গয়া ও দয়ার হুঁ।
মেরা রঙ্গ রূপ বদল গয়া
মেরা য়্যার মুঝসে বিছড় গয়া।
যো চমন খিঁজা মে উজাড় গয়া
মৈ উসীকে ফসলে বহার হুঁ।

আর কে থাকল? একজন গেলে আর একজন সেই জায়গায় বসে। এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু ব্যতিক্রম মনে হোল। ওই জায়গায় বসার উত্তরাধিকারি কে? বোধ হয় একজন হতে পারেন। তিনি হলেন বাবার প্রাণাধিক কন্যা অন্নপূর্ণাদেবী।

অরুণের ডাকে চমক ভাঙ্গল। ইতিমধ্যে অরুণ, ইলা, এবং তাঁর ছেলে মেয়ে, সারি সারি মোমবাতি জ্বালিয়েছে, ধূপ জ্বালিয়েছে মালা দিয়েছে। চমক ভাঙ্গার পর যখন মোমবাতি জ্বালাচ্ছি, ইতিমধ্যে জুবেদা বেগমের বিরাট জোরে হাসির শব্দ শুনলাম। অবাক হয়ে ভাবলাম, এই সময় কি কেউ হাসতে পারে? কি হোল? পাগল হয়ে গেলেন নাকি? তাঁর শেষ চিৎকার, 'আমার ছেলেকে এঁরা সব নিয়ে যাচ্ছে,' কথাটি ভেবেই মনে হলো সত্যিই কি পাগল হয়ে গেলেন? মনে শোক পেলে অনেকে বোবা হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়। না না রকম এবনরম্যালিটিজ দেখা যায়।

যাই হোক কবরের কাছে মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মালা দিয়ে, বৈঠকখানার বাইরে দেখলাম জুবেদা বেগম মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। মা'কে দেখলাম চুপটি করে বসে আছেন। কাছে যেতেই দেখলাম, জুবেদা বেগম আমাকে দেখিয়ে ছেলেদের বললেন, 'পণ্ডিতজী ভাষণ দিয়ে এলেন?' বুঝলাম, ছেলেদের কাছে সব সমাচার পেয়েছেন। কিন্তু যে ভয় পেয়েছিলাম, তা তো নয়। এতো পাগল হবার লক্ষণ নয়। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বললাম, 'ভাষণটা কি ভুল হয়েছে? যে কথা বলেছি তার মানে কি এই মূর্খ ছেলেগুলি বুঝেছে? আপনি যদি সেই শোক সভায় থাকতেন তাহলে আপনিও কি বুঝতেন? পণ্ডিতজী বলে আগেও একবার ব্যঙ্গ করেছিলেন, আজও সেই একই কথা বলে ব্যঙ্গ করছেন। মনে রাখবেন আমি যে পরিবারের ছেলে আমার বাড়ীর পোষা বেড়ালকেও লোকে পণ্ডিত বলে। যাক সে কথা। কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারছি না, আজ কি করে এত জোরে প্রাণখোলা হাসতে পারছেন?' জুবেদা বেগম আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'হাসছি মনের দুঃখে।' বললাম, 'মনের দুঃখে এইরকম হাসি?' বুঝলেন উত্তরটা ঠিক হয়নি, তাই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মায়ের মনটা হাল্কা করবার জন্য হাসছি।' এই কথোপকথনে মনে হোল কোন কথাই মা'য়ের কানে ঢুকছে না। মা'য়ের কোন বিকার নাই। মা'র অবস্থা বুঝলাম। একটু কাঁদতে পারলে বোধ হয় একটু হাল্কা হতে পারতেন। মা আসলে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন। মা'কে প্রণাম করলাম। মা আমার মাথায় হাত রাখলেন। এবারে জুবেদা বেগম আমাদের বসতে বললেন। মনে হোল যে বাড়ীতে সকাল থেকে নিয়ম চলে এসেছে, সেই বাড়ী এখনই বেনিয়ম। ভবিষ্যৎ-এ কি হবে? বললাম, 'বসবার মতো মনের অবস্থা নাই। আগামীকাল যা করণীয় তার ব্যবস্থা করুন। আগামীকাল সকালে আসবো।' এই কথা বলেই অরুণকে বললাম, 'চলো।'

এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন বিশ্বাসী মানুষ আছেন। যে মানুষ সততা এবং সত্যবাদিতাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে, বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। এবং সেই মানুষ আমার কাছে উস্তাদ বাবা। এমনটি আগেও হয়ত হয়নি সঙ্গীত জগৎ-এ, এবং ভবিষ্যৎ? এ তো কল্পনার অতীত।

বাবা বড় আশা করে মৈহারে যে সংসারের পত্তন করেছিলেন, তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু সত্যই কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা সহজ সম্পর্ক থাকেই। আমরা তা স্বীকার করি আর নাই করি। এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। পরের দিন সকালে বাবার বাড়ী গেলাম। দেখলাম ধ্যানেশ, বাহাদুর, নিখিল, ডেভিড, সি এল দাস, সনৎ, সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ব্যাণ্ড পারটির সকলে দালানে বসে আছে। রান্না ঘরের কাছে মা, জুবেদা বেগম এবং শরণরাণীকে বসে থাকতে দেখলাম। ইলা মা'র কাছে গেল। আমি ও অরুণ ছেলেদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। ইতিমধ্যে মৌলবী এসে ক্রিয়াকর্ম করতে লাগল। মৌলবীর কাজ শেষ হয়ে গেলে, আজ সকলে খিচুড়ি খাবে। দুপুরে সব কাজ হয়ে যাবার পর মৌলবী আমাদের বললেন প্রসাদ খেতে। আমরা সকলে খিচুড়ি খেলাম। বাবার পারলৌকিক সব কাজ শেষ হয়ে গেল। বাবা দালানের যে স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, সেই জায়গায় সকলে বসে আছে। বাবাকে আর দেখতে পাব না ভাবতেও কেমন লাগছে। মৈহারে এসে অবধি খবরের কাগজ পড়িনি। একসঙ্গে কয়েকদিনের কাগজগুলো চোখ বুলোলাম। বাবা মারা যাবার পরই সংবাদপত্রে অনেক কিছু বেরিয়েছে। একটা জায়গায় আমার চোখ আকৃষ্ট করল। পড়েই মনে হোল, কোন সঙ্গীতের সমঝদার লোক লিখেছে। কাগজে বেরিয়েছে, 'উইথ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ উইল পাস এন এরা দ্যাট আপহেলড দি ডেডিকিটেড, স্পিরিচুয়াল আউটলুক, হানড্রেড ডাউন বাই দি গ্রেট মুনিস এনড ঋষিশ হু কনসিডারড দি সাউণ্ড অফ মিউজিক, নাদ, টু বি নাদ ব্রহ্ম, এ ওয়ে টু রিচ গড।' কথাটা লিখে রাখলাম।

বিকেলে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখলাম, দীপচন্দ সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। মৈহারের প্রধান বাসিন্দা এবং বাবার ছাত্রদের মধ্যে রেবতীরঞ্জন দেবনাথ, শরণরাণী, নিখিল, ধ্যানেশ, সনৎ সকলেই এসেছে। দীপচন্দ আমাকে বলল, 'বাবার স্মৃতিরক্ষার জন্য আমাদের কি করা উচিত, আপনি প্রথমে বলুন। তারপর সকলে নিজের নিজের মন্তব্য রাখবেন। আলোচনায় যা ঠিক হবে, সেই হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা জানাব। আমি শরণরাণীকে বললাম, 'আমার যা বলবার গতকাল সব কথাই বলেছি। উপস্থিত আপনারা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটা খসড়া তৈরী করুন। উপস্থিত রেবতীরঞ্জন দেবনাথ-এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।' এই কথা বলে, তাঁকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসার কারণ ছিলো। কারণটা হোল, আমার বই লেখার জন্য তাঁর একটা সাক্ষাৎকার নেব এই ফাঁকে। প্রায় একঘণ্টা কথা বলে কিছু তথ্য পেলাম। রেবতীরঞ্জন বাবার দেশের লোক। মৈহারে আমার যাবার আগে শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। আমি যে সময় মৈহারে গেলাম, সেই সময় তিনি

দিল্লীর রেডিওতে একসটারনাল সারভিসের কাজে যোগদান করেছেন। বাবা দিল্লীতে গেলেই, রেবতীরঞ্জন দেবনাথ বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। সেইজন্য এই সাক্ষাৎকার নেওয়া।

কথাবার্তা সেরে ঘরে যেতেই শরণরাণী বলল, 'আপনার সব প্রস্তাবগুলি খুব ভাল। সকলেই একবাক্যে সেটা সমর্থন করেছে। তবে আমার নিজস্ব একটা প্রস্তাব আছে।' বললাম, 'বলুন, আপনার কি প্রস্তাব?' শরণরাণী বলল, 'বাবার বাড়ীতে কেউ গেলেই তাঁকে কিছু না কিছু খাইয়ে অভ্যর্থনা করতেন। আমার বক্তব্য হোল বাবার অবর্ত্তমানে বাড়ীতে একজন লোক থাকবে। গরমকালে কেউ এলে মিষ্টি না দিলেও অন্ততঃ গুড় এবং কুয়োর জল দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হবে। মোট কথা সারাবছরেই যে লোকই আসুক না কেন, খালি মুখে যেন না যান। এর জন্য যে লোক রাখা হবে, তার মাইনে এবং বাৎসরিক যে খরচা লাগবে, সেই খরচা বাবার সব ছাত্ররা মিলে সেটা বহন করবে।' বললাম, 'এ তো খুব উত্তম প্রস্তাব।' শরণরাণী বলল, 'ভাই সাহেব বিদেশ থেকে এলে তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করব।' বললাম আলিআকবর বিদেশ থেকে দিল্লীতে এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা ঠিক হয় সকলকে জানাবেন।' আমার প্রস্তাবটা সর্ব সম্মতিক্রমে স্বীকৃত হোল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। এই চিঠির মধ্যে একটা কথা যুক্ত হোল যে, আলিআকবর বিদেশ থেকে এলে এ বিষয়ে তাঁরও মতামত জানানো হবে।

মৈহারে আরও সাতদিন রইলাম। রোজ অরুণ, ইলা এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার কবরে গিয়ে মোমবাতি এবং ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করে আসতাম। তারপর কাশী চলে এলাম।

সঞ্চারী

৬১

বাবার উপর বই লিখবার যে তাড়া ছিলো তার মধ্যে ভাঁটা পড়ল। লিখবার উৎসাহ একেবারেই চলে গেল। পরক্ষণেই মনে হোল, এ বই লিখতেই হবে। বইটা ছেপে বেরোলে বাবার কবরে বইটা রেখে বলব, 'আপনার জীবিতকালে বইটা দেখাতে পারি নি, কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞা পালন করেছি।' এই কথা ভেবেই মনে মনে পরিকল্পনা করতে লাগলাম, এখনও কত লোকের সাক্ষাৎকার নিতে হবে? লেখা মোটামুটি শেষ করেছি। একমাস পরে বরোদা যেতে হবে। মাস শেষ হতে কয়েকটা দিন বাকী আছে। ইতিমধ্যে হাথরস থেকে গর্গ-এর ছোট ভাই বালকৃষ্ণ গর্গের চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'বাবার উপর একটা বিশেষ সংখ্যা বার করবো। আপনি দয়া করে বাবার উপর একটা আরটিকল লিখে পত্রপাঠ পাঠান।' বাবার উপর বিশেষ সংখ্যা বেরোবে জেনে ভালই লাগলো। কিন্তু সংবাদপত্রের যত প্রামাণ্য সংবাদ এবং বাবার হাতের লেখা 'আমার জীবনী' সবই তো মদনলাল ব্যাসের কাছে আছে।

যাক এ সব না থাকলেও ক্ষতি নাই। 'গুরু দক্ষিণা' শিরোনাম দিয়ে দশপাতার মধ্যে একটা আরটিকল লিখে হাথরসে পাঠিয়ে দিলাম। এই লেখার পরই মদনলাল ব্যাসকে একটা চিঠি দিয়ে লিখলাম, 'বাবার উপর সঙ্গীত পত্রিকায় একটা বিশেষ সংখ্যা বার করছে।

সংক্ষেপে একটা প্রবন্ধ আমি পাঠিয়ে দিলাম।' বাবার তিরোধানের খবর দিয়ে লিখলাম, 'কালীপূজার দিন বরোদাতে বাজিয়েই বম্বে যাব। যদিও আগে লিখেছি, পুনরায় আবার লিখছি, যে ভাবে পরিচ্ছেদ করে লিখতে বলেছি এর মধ্যে সম্পূর্ণ করে রাখবেন। আমি বম্বে গিয়ে, যে সাক্ষাৎকার নিয়েছি সেগুলো নিয়ে যাব। এ ছাড়া বাবার মহাপ্রয়াণের সব ঘটনা এবং ছবি নিয়ে যাব। সঙ্গীতের পরিচ্ছেদ আমি সম্পূর্ণ করেছি। বম্বে গিয়ে কাগজের মধ্যে যে সব ভুল তথ্য আছে সেগুলি সংশোধন করে দেব। পনেরো দিন বম্বে থেকে আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে, আশা করি বই শেষ করতে পারব। বম্বেতে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গকে সব কথা বলবেন। বরোদা থেকে কবে কোন ট্রেনে যাব স্থির হলে গর্গকে টেলিগ্রাম করে জানাবো।'

সময় নিজের গতিতে এগিয়ে চলে। বরোদায় বাজাবার সময় এগিয়ে আসছে দেখে ষ্টেশন ডাইরেকটারকে অনুরোধ করে লিখলাম, 'নির্দিষ্ট দিনে একটা হোটেলে আমার জায়গা ঠিক করে রাখবেন এবং দয়া করে হোটেলের নামটি আমাকে অগ্রিম জানিয়ে দেবেন।'

কিছুদিন পরই বরোদার স্টেশন ডাইরেকটার আমাকে হোটেলের নাম জানিয়ে লিখলেন, ঘর রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে। বরোদা যাবার আগে এই প্রথম লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গকে চিঠি দিলাম। গর্গ মাঝে মাঝে বম্বে থেকে নিজের কাজে বাইরে যায়। আমি যে সময় বম্বে যাব সেই সময় যদি কোথাও চলে যায় তাহলে বিপদ। তাই লিখলাম, 'কালীপূজার দিন বরোদায় বাজিয়ে পরের দিন বম্বে যাব। তোমার যদি কোথাও যাবার থাকে তা হলে আগে সেটা সেরে নিও। বম্বেতে পনেরো দিন থেকে, আমেদাবাদে আমার দাদার কাছে যাব। আশা করি মদনলাল ব্যাসের কাছে সব সংবাদ পেয়েছ। চিঠি পেয়ে বরোদার হোটেলে পত্রপাঠ জানাবে তুমি আমার চিঠি পেলে কি না? বরোদার থেকে টেলিগ্রাম করে জানাব কোন ট্রেনে বম্বে যাব। সেইমত স্টেশনে থেকো।'

দেখতে দেখতে বরোদায় যাবার সময় হয়ে এলো। কালীপূজার একদিন আগে বরোদায় পৌঁছে হোটেলে গিয়েই দেখি, গর্গ এর চিঠি এসে গেছে। চিঠি পড়ে আমার চক্ষুস্থির, গর্গ লিখেছে, 'যে সময় তুমি বম্বে আসবে তার আগেই আমি হাথরসে চলে যাবো। আশা করি আমার ভাই বালকৃষ্ণের চিঠি পেয়েছ। বাবার উপরে বিশেষ সংখ্যা যেটা ডিসেম্বারে বেরোবে, তার জন্য কয়েকদিন থেকে ম্যাগাজিন ফ্রন্ট পেজ থেকে সব জিনিষটা ঠিক করেই দিল্লী চলে যাব। দিল্লীতে কয়েকদিন থেকে বম্বে ফিরব। মদনলাল ব্যাস বাবার উপর পঁচাত্তর পৃষ্ঠার মত একটা বড় আরটিকল লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি এখনও না পাঠিয়ে থাক, তাহলে শীঘ্রই বাবার উপর ছোট একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিও। তুমি এমনভাবে লিখো, যার ফলে এক জিনিস না হয়ে যায়। যদিও আমি বম্বে থাকব না, কিন্তু আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে থাকবে। অবশ্য আমার অবর্ত্তমানে তুমি বম্বে এসে বাড়ীতে থাকতে পারো, কিন্তু আমি না থাকলে তোমার ভাল লাগবে না। সেইজন্য বরোদায় বাজিয়ে, তুমি আমেদাবাদে তোমার দাদার কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে বম্বে এসো। সেইসময় আমি বম্বে এসে যাবো। বাবার কয়েকটা ছবি আমার কাছে আছে, কিন্তু তুমি যদি কয়েকটা ছবি পাঠাও তাহলে খুব ভাল হয়। বাবার মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই ফটো ওঠানো হয়েছে। সেই সব ছবি পাঠালে বাবার উপর বিশেষাঙ্কটা ভাল হবে।'

চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ব্যাস এত দীর্ঘ আরটিকল কি করে পাঠাল? তার মানে যে সব সামগ্রী আমি পাঠিয়েছি সেগুলো কি সে পাঠিয়েছে? মনে পড়ে গেল, আলিআকবর, সামতাপ্রসাদ এবং শরণরাণীর সাক্ষাৎকার যে সময় নিয়েছিলাম, সেই সময়ে সকলেই বলেছিল, ব্যাস বাবার উপর বই লিখছে বলে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলো। সে কথা শুনে বলেছিলাম, 'আমি ব্যাসকে দিয়েই লেখাচ্ছি, কারণ হিন্দি লিখতে পারি না বলে।' গর্গ-এর চিঠি পেয়ে মনে হোল, যে সব সামগ্রী ব্যাসকে দিয়েছি তার মধ্যে চিরাচরিত যে ভুল সংবাদ ছেপেছে, সেই জিনিষগুলো যদি সব লিখে পাঠিয়ে দেয় তাহলে তো আমার বই লেখার বারোটা বেজে যাবে। গর্গ-এর চিঠির তারিখ দেখে বুঝলাম যে হাথরসে ইতিমধ্যে চলে গেছে।

বাজনা আমার মাথায় উঠল। যাইহোক সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করলাম, বরোদায় বাজিয়েই হাথরসে যাব। চিঠি পেয়ে মনে হোল, বই এর ব্যাপারটা গর্গ বোধ হয় কিছুই জানে না, তা না হলে এ ধরনের চিঠি লিখবে কেন? কিন্তু ব্যাস কিছুই দীর্ঘ দিন গর্গকে বলবে না, সেটা কি করে সম্ভব? মনে হোল ঠিক সময় ঠিক কাজ করতে কারো মনে পড়ে না। তারপর বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা নিয়ে অস্থির হতে হয়। আমারও হোলো সেই অবস্থা। পরের দিন সকালে গর্গকে হাথরসে টেলিগ্রাম করে লিখলাম, 'হাথরসে যাচ্ছি। আমার জন্য থেকো।'

বরোদায় বাজিয়ে সেই রাত্রেই দুই বার গাড়ী বদল করে এলাহাবাদে পৌঁছলাম। এলাহাবাদে পৌঁছে দিল্লীর গাড়ী ধরে হাথরসে বিকেলে পৌঁছে দেখলাম, গর্গ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। গর্গ কিছুক্ষণ পরেই মোটরে করে জরুরী কাজে দিল্লী যাবে। কথায় কথায় জানলাম, গর্গ আমার বই এর বিষয় কিছুই জানে না। মদনলাল ব্যাস যে মৈহারে গিয়েছিলো সে কথাও তাঁর অজানা। এতদিন যে ব্যাস-এর সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছে সে কথাও ব্যাস তাঁকে বলে নি। গর্গকে বললাম, 'তোমার দিল্লী যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে সুতরাং এই অল্প সময়ে মহাভারতের কাহিনী বলা সম্ভব নয়, পরে তোমায় বিস্তারপূর্বক চিঠি লিখে সব জানাব।' গর্গ দিল্লী চলে গেল।

বাবার কথা মনে পড়ে গেল। বাবা চিঠি পেয়েই জবাব দিতেন। বাবার এই ভাল গুণটা মৈহার ছাড়ার পর ত্যাগ করেছি। ব্যাসকে বই লিখবার জন্য নিয়মিত চিঠি দিয়েছি। অথচ এ কথা গর্গকে লিখতে কুঁড়েমি হয়েছে। ধারণাও করতে পারি নি যে ব্যাস চিঠির ব্যাপারে গর্গকে এ যাবৎ অন্ধকারে রেখেছে। অথচ গর্গকে যদি প্রথমেই চিঠি লিখতাম, তাহলে এই অঘটন ঘটত না।

বালকৃষ্ণ গর্গ-এর কাছে শুনলাম কেবল দুটো লেখাই বিশেষ সংখ্যায় ছাপছে। ইতিমধ্যে প্রথমে ব্যাস এর লেখা পেয়েছে বলে প্রায় দশপাতা ছাপা হয়ে গিয়েছে। বালকৃষ্ণ গর্গকে সমস্ত ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললাম। বালকৃষ্ণ অবাক হোল। বললাম, 'প্রথমে আমার আরটিকেলটা ছাপাও। এ ছাড়া আমার আরটিকেলের নীচে লিখে দাও, ব্যাস যা লিখেছে তা আমার নির্দেশনায়।' যদিও ব্যাস-এর প্রবন্ধ পড়ে দেখলাম বহু ভুল আছে, তা

সত্ত্বেও সেগুলি সংশোধন করলাম না। এ যাবৎ বাবার যত ছবি সংগ্রহ করেছিলাম তার থেকে অনেক ফটো দিলাম। এই ছবিগুলি ছাপা হলে বিশেষ সংখ্যাটি ভাল হবে। যদিও আর্থিক ক্ষতি হবে, তা সত্ত্বেও বালকৃষ্ণ গর্গ ছাপা বন্ধ করে, প্রথমে আমার প্রবন্ধটাই ছাপাবার নির্দেশ দিলো।

সব নির্দেশ দিয়ে হাথরস থেকে কাশী চলে এলাম। কাশীতে এসেই দেখি তিনটে চিঠি এসেছে। বম্বের হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে বছরের শেষমাসের প্রথম সপ্তাহে বাজাবার আমন্ত্রণ এসেছে। যাক একদিক থেকে ভালই হোল। হাতে কিছুদিন সময় পেলাম। এর মধ্যে কিছু সাক্ষাৎকার নিতে পারব। যা বইএর কাজে লাগবে।

আরো দুটো চিঠি এসেছে এলাহাবাদ থেকে। মাসের শেষে রেডিওর প্রোগ্রামে যেতে হবে। অপর চিঠিটা এসেছে অরুণের। অরুণের ছোট শালির বিয়েতে যাবার জন্য বিশেষ করে লিখেছে। রেডিও প্রোগ্রামের আগের দিনেই বিয়ে, সুতরাং প্রতিশ্রুতি রাখতে পারব ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম। প্রতিশ্রুতি রাখতে পারব কেন, সেই কথাই আগে বলি। কয়েকবছর আগে যে সময়ে মৈহারে গিয়েছিলাম সেই সময় অরুণের ছোট শালী এসেছিল। কথায় কথায় বলেছিলাম যে হেতু তুমি অরুণের শালী সেইজন্য তোমার বিয়ের সময় যাব। এই কথা শুনেই ইলা বলেছিল, 'কথাটা মনে রেখো। তুমি বাজনা ছাড়া কাশী থেকে কোথাও যাও না। অবশ্য ব্যতিক্রম যদি কেউ নিজের লোক মারা যায় বা বিপদে পড়ে। তুমি নিজেই বলেছো, বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ এবং জলসায় যাও না। ওই একটা জায়গায়, তোমার প্রোগ্রাম আছে বলে এড়িয়ে যাও, এবং মিথ্যা কথা বলো। অবশ্য বাবার এটা কথা তোমার মুখে বহুবার শুনেছি। যদি কোন জিনিষে কথা দাও, তার মানে মাথা দাও। বাবার ভাষায় কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া। কথাটা মনে রেখো।' অরুণের ছোট শালী সেইসময় ছোটই ছিলো, তাই স্নেহচ্ছলে কথাটা বলে ফেলেছিলাম। জানতাম বিয়ের এখন অনেক দেরী আছে, তবে ইলার কথা শুনে বলেছিলাম, 'বিয়েতে নিশ্চয় যাব, তবে বিয়ের দুই তিনমাস আগে জানাতে হবে। এলাহাবাদেই যখন বিয়ে হবে, সেই সময় রেডিওর প্রোগ্রাম একটা করেই নেব।' যাক বিয়ের খবর পেয়ে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। ভগবান আমার মুখরক্ষা করেছেন। প্রতিশ্রুতি রাখতে পারব ভেবে, সঙ্গে সঙ্গে অরুণকে কবে এবং কোন গাড়ীতে যাব লিখে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে এলাহাবাদে পৌঁছতেই দেখি অরুণ এবং ইলা স্টেশনে এসেছে। অরুণের সঙ্গে এলাহাবাদের নলিন মজুমদারকে দেখে অবাক হলাম। নলিন মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এখানে?' বলল, 'আপনাকে নিতে এসেছি।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে জানলেন যে আমি আসছি?' হেসে বলল, 'সব খবর রাখি।' মনে মনে ভাবলাম, যাঁর সাকরেদি করে তাঁর পক্ষে সকলের সংবাদ রাখাটা প্রধান কাজ। অরুণ বলল, 'যে হেতু ইলার বাবা এবং নলিন মজুমদারের বাবা দীর্ঘকাল এলাহাবাদের বাসিন্দা, সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিলো। এর ফলে বিয়েতে নলিন মজুমদারকে নিমন্ত্রণ করি। নলিন মুজমদার যখন শোনে তুমি আসছ তাই সেও স্টেশনে এসেছে।' ব্যাপারটা বুঝলাম। নলিন মজুমদার বলল,

'আমার বাড়ীতে আপনাকে উঠতে হবে।' আমি পারতপক্ষে কারো বাড়ীতে উঠি না। অরুণের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইলার বাড়ীতে সব আত্মীয় আসবে, সেইজন্য বললাম, 'আমি প্রতিবার এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাতে এসে যেমন হোটেলে উঠি, সেই রকম হোটেলেই উঠব।' সকলেই আমার সঙ্গে হোটেলে এলো। হোটেলে এসে নলিন মজুমদার বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আমার একটা সঙ্গীতের সংস্থা আছে, যার নাম দিয়েছি ঝঙ্কার। আমার সারকেলে একদিন বাজাতে হবে। আগামীকাল বিয়েতে এবং তার পরের দিন আপনি রেডিওর প্রোগ্রামে ব্যস্ত থাকবেন। যদি অনুমতি করেন, তাহলে তার পরের দিন আপনার বাজনা আমার বড় বৈঠকখানায় আয়োজন করব। এই সঙ্গীতের আসরে নর্দান ইনডিয়া সংবাদপত্রের সঙ্গীত সমালোচক প্রজেশ ব্যানার্জি থাকবেন।' প্রজেশ ব্যানার্জির নাম বাবার কাছে শুনেছিলাম। মৈহারে কিছুদিনের জন্য বাবার কাছে শিখতে এসেছিলো। এ ছাড়া মৈহার থাকাকালীন সঙ্গীত সম্বন্ধে বই, ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু লেখা এবং সঙ্গীতের বহু সমালোচনাও পড়েছি। প্রজেশ ব্যানার্জির নাম শুনেই মনে হোল বাবার বিষয়ে তাঁর কাছে একটা সাক্ষাৎকার নেব। এই কথা ভেবে বললাম, 'বাজাব একটা শর্তে।' নলিন ঘাবড়ে গিয়ে বলল 'বলুন, কি শর্ত?' বললাম, 'জানেন তো বাবার বিষয়ে একটা বই লিখছি। প্রজেশ ব্যানার্জির একটা সাক্ষাৎকার নেব, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।' নলিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেবো। প্রজেশদা আপনাকে দেখলে খুশীই হবেন।'

মনে পড়ল, মৈহার যাবার আগে প্রতিমাসে বাবার কাছে যে সময়ে শিখতে এলাহাবাদে যেতাম, সেই সময় একবার বাবা নলিনের বাবা জীবিত থাকাকালীন সময়ে, তাঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন। যদিও তিনি উপস্থিত জীবিত নাই কিন্তু নলিনের বড় ভাই জীবন মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বাবা জীবন মজুমদারকে খুব স্নেহ করতেন। পুরোনো কথাটা মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বড় ভাই জীবন মজুমদার কোথায় থাকেন?' উত্তরে বলল, 'দাদার শরীর খুব খারাপ। উপস্থিত এলাহাবাদেই আছে।' বললাম, 'আপনার দাদারও একটা সাক্ষাৎকার নেব।' নলিন সানন্দে রাজী হোল এবং বললো, 'আমিও বাবার সম্বন্ধে যতটুকু জানি আপনাকে বলব।' বললাম, 'এলাহাবাদে যখন এসেছি, সেই ফাঁকে আরো দুইজনের সাক্ষাৎকার নেবো।' যথারীতি বিবাহে যোগদান এবং রেডিওতে বাজাবার পরদিন নলিন মজুমদার আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেল বাজাতে যাবার জন্য। গাড়ীতেই বলল, 'প্রজেশদার শরীরটা ভাল নাই বলে আজ বাজনা শুনতে আসতে পারবেন না। আমাকে বলেছেন, বাজনাটা রেকর্ড করে আগামীকাল তাঁর বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যেতে। তারপর আমার দাদার বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাব।' নলিনের বাড়ীতে গিয়ে দেখি শ্রোতারা সব বসে রয়েছে। দেখলাম ঘরের মধ্যে বাবা, আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের ফটো টাঙ্গান রয়েছে। একটা বড় ফ্রেমে দেখলাম 'ঝংকার মিউজিক সারকেল।' প্রেসিডেন্ট উস্তাদ আলিআকবর খাঁ এবং পণ্ডিত রবিশঙ্কর। বাজনা হোল। বাজাবার পর খাবারের জন্য অনুরোধ করলেও, খেলাম না। বললাম, 'বাজিয়ে উঠেই আমি খাবার খাই না। তা ছাড়া হোটেলে আমি খাবার রেখে দেবার জন্য বলে এসেছি।' নলিন এ কথা শুনে বলল, 'আমার

একটা অনুরোধ আছে। দয়া করে না করবেন না। আমার বাড়ী থাকতে আপনি কেন হোটেলে থাকবেন? আগামীকাল সকালে গিয়েই আপনাকে আমার বাড়ী নিয়ে আসব। দুদিন কম করেও আমার বাড়ীতে থাকতে হবে। দেখুন আমি যেটুকু শিক্ষা পেয়েছি, তা আলিদা এবং রবুদা যে সময়ে এলাহাবাদে এসেছেন। আপনি আমার কাছে থাকলে, আপনার কাছেও কিছু শিখব। আমার বাড়ীতে কাল সকালে বিশ্রাম নিয়ে বিকালবেলায় প্রজেশদার এবং আমার দাদার বাড়ী আপনাকে নিয়ে যাব।' নলিন মজুমদারের আন্তরিক অভ্যর্থনায় রাজী হয়ে হোটেলে চলে গেলাম। পরের দিন সকালে এসেই নলিন আমাকে নিজের বাড়ী নিয়ে গেল।

সকালে চায়ের পালা শেষ হবার পর, নলিন সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'অনেকবার ভেবেছি আমার ঝংকার সংস্থায় আপনার সঙ্গে কিষণ মহারাজের একটা প্রোগ্রাম রাখব। সাহস করে বলতে পারি নি, কেননা শুনেছি আপনি অনেক টাকা বাজানোর জন্য নেন।' এ কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, 'কে বলেছে আমি অনেক টাকা বাজনোর জন্য চাই?' আমার দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু কে বলেছে তার নাম নলিন বলল না। আমার নামে কত অপপ্রচার আমার বিপক্ষে নিজের লোকেরা করেছে তার প্রমাণ এ যাবৎ বহু পেয়েছি। আবার নূতন করে পেলাম। বললাম, 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বাজনার আয়োজন করতে পারেন। টাকার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। কিষণকে ঠিক করে জানালেই আমি বাজাব। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলেও আমার বাজনা রাখতে পারবেন না।' অবাক হয়ে নলিন বলল, 'কেন রাখতে পারব না।' বললাম, 'যদি আমার বাজনা রাখতে পারেন, সেই সময় বলব কেন এই ফোরকাস্ট করলাম।' নলিনের আগ্রহে তাঁকে কিছুক্ষণ শিখিয়ে প্রজেশ ব্যানার্জির বাড়ী গেলাম। প্রজেশ ব্যানার্জি বাবার সঙ্গীতে কি বিশেষত্ব ছিলো সেই বিষয়ে সুন্দর লিখেছেন। বাবার পুত্র এবং জামাতা ভাল বাজালেও, বাবার বাজনার সঙ্গে কত প্রভেদ সে বিষয়েও লিখেছেন। সেই কথাটা নিজের খাতায় লিখে রাখলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা কথা বলে বাড়ী চলে এলাম। খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে জীবন মজুমদারের বাড়ী গেলাম। প্রায় তেইশ বছর পরে এইবাড়ীতে এলাম। দেখলাম জীবন মজুমদার অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন। বাবা যে ঘরে সেইসময় রেডিওতে বাজাবার সময় এসে থেকেছিলেন সেই জায়গাটা দেখলাম। সেই সময় জীবন মজুমদারের বাবা বেঁচে ছিলেন। কয়েকবছর আগে তিনি পরলোকগমন করেছেন এবং কয়েক মাস আগে বাবাও চলে গেছেন। কিন্তু সেই ঘরটি সেইরকমই আছে। যাইহোক জীবন মজুমদারের কাছেও বহু তথ্য পেলাম। জীবন মজুমদার বললেন, 'এলাহাবাদের প্রথম সঙ্গীত সম্মেলন করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর ছেলের সঙ্গেও দেখা করলে কিছু তথ্য পেতে পারেন।' দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলের সঙ্গেও দেখা করে কিছু তথ্য পেলাম। এলাহাবাদে আরো দুজনের সঙ্গে দেখা করবার আছে। পরের বারে রেডিওতে বাজাতে এলে দেখা করব বলে পরের দিনই কাশী ফিরে এলাম।

দেখতে দেখতে প্রায় দুইমাস হয়ে গেল বাবা গত হয়েছেন। ইতিমধ্যে রাত্রে একদিন খাওয়ার পাট সবে চুকিয়েছি, একটা ছেলে এলো। ছেলেটি আমার বাড়ীর কাছেই একটি

হোটেলে চাকরি করে। ছেলেটি বলল, 'মৈহার থেকে আশিস এসেছে এইমাত্র। গতকাল দুপুরেই চলে যাবে। সেইজন্য আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন। আশিস কাশীতে এসেছে শুনে অবাক হলাম। এই সময় মৈহার থেকে কোন ট্রেনে এল। হোটেলে যেতে যেতে ছেলেটির কাছে জানলাম, গাড়ী করে সবশুদ্ধ চারজন এসেছে। হোটেলে গিয়ে দেখলাম আশিস, ধ্যানেশ ও তার স্ত্রী বসে চা খাচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর পরে আশিসকে দেখলাম। আশিস এতদিন আমেরিকায় ছিল বলে দেখা হয় নি। আশিসকে দেখে খুব ভাল লাগলো। বিদেশে থাকলেও বিদেশী হয়ে যায় নি। আমাকে দেখেই প্রণাম করল। বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে বেরোতে দেখলাম মৈহারের লখন পাণ্ডেকে। আশিস বলল, 'আমেরিকা থেকে বাবা এসে দিদা ও মাকে নিয়ে কোলকাতায় চলে গিয়েছে। দাদুর মৃত্যুর সময় আমি আসতে পারি নি। আমিও বাবার সঙ্গে আমেরিকা থেকে মৈহারে এসে বাবার গাড়ী করে কোলকাতায় যাবার পথে নয়দশ ঘণ্টা কাশীতে হল্ট করলাম।' কথার ফাঁকে ধ্যানেশ বলল, 'কাকা, দাদা তো কাকীমাকে একবার দেখে গিয়েছে বহুদিন আগে। আমি তো কাকীমাকে দেখি নি। আমি কাকীমাকে দেখতে পাব না? ধ্যানেশকে বললাম, 'নিশ্চয় দেখবি। কাল সকালে তোরা তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে চান করে থাকবি। আমি সকালে এসে তোদের নিয়ে যাব। সকালে জল খাবার এবং দুপুরে খাবার খেয়ে তারপর তোরা কোলকাতা যাস।' আশিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আগামীকাল সকালে আপনার বাড়ীতে কাকীমার সঙ্গে দেখা করেই গাড়ী করে কোলকাতা যাত্রা করব। দুপুরে খেলে যেতে দেরী হয়ে যাবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ী করে গিয়ে, আবার রাত্রে কোথাও থাকব। তাড়াতাড়ি কোলকাতায় ফিরতে হবে।' পরিস্থিতি শুনে বললাম, 'ঠিক আছে। তোরা এখন বিশ্রাম কর। আমি এখন যাচ্ছি।' আশিস বলল, 'চলুন আপনাকে হোটেলের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিই।' হেসে বললাম, 'আমাকে পৌঁছে দেবার কি আছে এই রাত্রে?' আশিস ধ্যানেশকে বলল, 'এই ফাঁকে রাত্রের কাশী দেখব।' আশিস সকলকে নিয়ে জোর করে যখন হোটেলের বাইরে এল, বললাম, 'এলিই যখন, চল হোটেলের পাশেই তোর পিশেমশায়ের বাহনের সরবৎ এর দোকান আছে। তোর পিসেমশায় কাশীতে এলে রাত্রে ঘুমের সময়টুকু ছাড়া এই বাহনটা সবসময় হাজিরা দেয়।' এই কথা বলেই পাশে দুবের দোকানে গিয়ে আশিস, ধ্যানেশের পরিচয় করিয়ে দিলাম। দুবে খুব খাতির করে সকলকে সরবৎ করে খাওয়াল।

দুবে আমাকে ব্যাটারি লাগান ঘড়ি দেখিয়ে বলল, 'গুরুজী আমাকে এই ঘড়িটা দিয়েছেন। গুরুজী আমাকে এত স্নেহ করেন যে যখনই কাশীতে আসেন খালি হাতে আসেন না। তবে কতদিন গুরুজীর কৃপা পাব ভগবান জানেন।' বললাম, 'এরকম ভাবো কেন?' বলল, 'আপনি তো জানেন, গুরুজী কানপাতলা। কমলা ভাবি যদি কখনও আমার উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে গুরুজীকে কিছু বলেন, তাহলেই আমার পাত্তি কেটে যাবে।' বললাম, 'যখন সবই জান তখন হ্যাঁ তে হ্যাঁ, মিলিয়ে, নিজের আখের গুছিয়ে নাও।' দুবে বলল, 'আরে কি বলেন দাদা।' এই কথা যে কতবার বলেছে তার শেষ নাই। আশিস,

ধ্যানেশ সকলেই সরবৎ খেয়ে খুব খুশী হোল। তারপর হোটেলে চলে গেল এবং আমিও বাড়ী চলে এলাম। বাড়ী আসবার সময় মনে হোল, যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ধূর্ত এবং কৌশলী, তাঁরা অপরের প্রশংসা করে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারে। এও একটা বড় কলা।

পরের দিন সকালেই হোটেলে গেলাম। দেখলাম সকলেই তৈরী হয়ে আছে। বাড়ীতে এসে সকলে তার কাকীমাকে প্রণাম করল। সকলকে জলখাবার দেওয়া হোল। হঠাৎ লখন পাণ্ডে অশিসকে বলল, 'ভাইয়া, বাবার মৃত্যুর পর দাদাই সবচেয়ে আগে মৈহারে এসে পৌঁছেছিলেন।' এই কথায় আগুনে ঘি পড়ল। আশিসকে বাবার মৃত্যুর পর যা যা হয়েছিলো সব কথা বলতে বলতে আমার এতদিনের পুঞ্জিভূত রাগ ফেটে পড়ল। আমার বাড়ীতে ছেলে এবং তার মা অবাক হয়ে আমাকে দেখছে এবং অদ্ভুত কাহিনী শুনছে। আমার বরাবরকার অভ্যাস, বাইরের কোনো কথা নিয়ে বাড়ীতে আলোচনা করি না। সব ঘটনা বলে আশিসকে বললাম, 'তোর মা, বাবার মৃত্যুর পর আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলো। সেই টেলিগ্রাম আজ পর্যন্ত এলো না। তোর মা সকলকে টুপি দিল, আর আমাকে দিল না। বাবার মৃত্যুর পর তোর মা ঘুমোচ্ছিল এবং এই চামচেটা দরজায় পাহারা দিচ্ছিল। তোর মা এত বড় সবজান্তা যে 'দিনমান'-এর সাপ্তাহিক-এর ফটোগ্রাফারকে বলেছে, আমি কিছুই জানি না। রিপোর্টার এসে দেখেছে যে কোমা স্টেজে তোর বাবা এবং পিসেমশায় চলে গেছেন, সেইজন্যই লিখেছে। এই পড়েই তোর মা ভেবেছে আমিই বলেছি যার জন্য আমাকে টুপি দেয় নি।' হঠাৎ নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেলাম। এতদিনের রাগ বলতে পেরে নিজেকে হাল্কা মনে হোল। তার সপ্তক থেকে মধ্যসপ্তকে ফিরে এসে বললাম, 'বড় দুঃখে আশিস তোকে এই কথা বললাম। তোদের নিজের ভাইপো ছাড়া কখনও অন্য রকম ভাবে দেখি নি, কিন্তু তোর দাদু, দিদিমা এবং পিসিমা ছাড়া, অন্য সকলের কাছে যা পেয়েছি তা যদি বলি, তাহলে তুই লজ্জা পাবি। যাক এ সব কথা। খেয়ে নে।' আশিস সব কথা শুনে ধ্যানেশ এবং পাণ্ডের দিকে চেয়ে বলল, 'সত্যি তোমাদের এদিকে সব দেখা উচিত ছিল। মৈহারে গিয়ে আমি এই ধরনের কথা কয়েকজনের কাছে শুনেছি।' এই কথা বলে আমাকে বলল, 'কাকা, যা হবার হয়ে গিয়েছে। এর জন্য আপনি কিছু মনে করবেন না।' বললাম, 'মনে করার কিছু নাই। মনে এই জন্য কিছু করি না, কেননা কারো কাছে কিছু পাবার আশা আমি করি না। আমি যা করেছি তা নিজের মনের তাগিদেই করেছি। লোক দেখিয়ে কাজ করা আর চাটুকারিতার শিক্ষা, তোর দাদুর কাছে আমি পাই নি।'

এরপর বই-এর ব্যাপার নিয়ে আশিসকে কিছু ফটো দেখালাম, যা এ যাবৎ যোগাড় করেছি। মৈহারে বাবার তৈলচিত্র ফটো যেটা কিনেছিলাম, সেটা দেখে আশিস বলল, কাকা এই ছবির একটু কপি আমাকে পাঠাবেন? এ ছাড়া দাদুর মৃত্যুর সময় যে ফটোগুলো ওঠান হয়েছে সেগুলো কোথায় পাব?' বললাম, 'চিন্তা করিস না সব পাঠিয়ে দেব।' বই এর ব্যাপার শুনে আশিস বলল, 'দাদু যখন আপনাকে বলেছেন, তখন সব সত্য কথা নিশ্চয়ই লিখবেন।' কথা বলতে বলতে আশিসদের হোটলে নিয়ে গেলাম। আশিসরা তার পরেই গাড়ী করে

কোলকাতায় চলে গেল। আশিসরা চলে যাবার পর মনে হোল আমার কথাগুলোরও প্রতিক্রিয়া কি হবে? কথায় আছে কথার নাম লতা। কিন্তু কি করব? আমার বদঅভ্যাস, অন্যায় আচরণ দেখলেই প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি না। তার জন্য আমার জীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবুও অন্যায়কে অন্যায় বলবো। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করি নি বলেই বোধ হয়, এর পরে আলিআকবর এবং জুবেদা খাতুনের সঙ্গে এ যাবৎ আর দেখা হয়নি।

এ বছর অভিজ্ঞতার ভিক্ষার ঝোলা, এমনিতেই ভরা ছিলো কিন্তু উপচে পড়ল তখন, যখন এক গণ্যমান্য সাংবাদিকের পাল্লায় পড়লাম। শ্রীমান মদনলাল ব্যাসকে যা ভরসা করে এ-যাবত জড় করা যে তথ্যগুলি দিয়েছিলাম, তিনি সবকটাকে স্বপার্জিত বলে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছে। বেশ কয়েক জায়গায় দৃঢ়ভাবে বলতে ছাড়েননি যে উনি বাবার উপর একটা বই রচনায় ব্যস্ত। এর ফাঁকে বছরের শেষ মাসের প্রথম দিনেই হাথরস থেকে প্রকাশিত 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ' বিশেষ সংখ্যাটি পেলাম। দেখে চক্ষু চড়কগাছ। দুঃসাহসের বলিহারি। আমার সাহায্যে যৎ কিঞ্চিৎ অনুলেখক হবার স্বপ্ন আচমকা লেখকেতে পরিবর্তিত হওয়ায় ভুলের দোল খেলা হয়েছে। লেখাটার সারা গায়ে অজস্র ভুলের ক্ষত। আমার দুঃখটা এই জন্যই ছিলো না যে মদনলাল ভুল লিখেছে। দুঃখটা ছিলো এই কারণে যে জাতীয় ভ্রমাত্মক এবং বিকৃত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে বাবার মর্যাদা হনন হয়েছে।

যদিও ওটাকে আমি ঠিক করে দিতে পারতাম, কিন্তু যখন যন্ত্রস্থ দেখলাম, তাই ভুলসংশোধন করি নি। প্রথমতঃ অসংখ্য ছিদ্রে জরজর নৌকাকে সারিয়ে ভরাডুবি থেকে বাঁচানো যায় না, আর দ্বিতীয়তঃ, শঠতাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। কেউ কৃতাঞ্জলি হয়ে আমার কাছে চাইলে, একটা কেন দশটা বইএর রচনা করার মত তথ্য আমি স্বেচ্ছায় দিতে পারি, কিন্তু এর অন্যথা সহ্য হয় না। লেখার উপরে 'বাবা' এত বড় একটা সাবজেক্ট, যে কোনও একটা অঙ্গকে তুললে পূর্ণাঙ্গ রচনা কিছুই নয়। শুধু একটা কিন্তু আছে। সেই কিন্তুটা হোল, নেপোলিয়নের তলোয়ার, নেপোলিয়নকেই শোভা দেয়, অন্যথায় নিজের গলা কাটে।

খবর চুরি করা খারাপ নয়। কিন্তু তথ্য ডাকাতি করা অবশ্যই নিন্দনীয়। মদনলাল বলতে গেলে তাই করলেন। যখন এই কথাটা আমার অগ্রজ সাংবাদিক বন্ধুকে বললাম, তিনি বললেন, 'এ তো কিছু নূতন ব্যাপার নয়। এরকম প্রবঞ্চক প্রচুর আছে। যাক তোমার এই মাথামোটা তঞ্চকটি একটা আস্ত বলিবর্দ। ভুল চেনারও ক্ষমতা নাই।'

বিশেষণটা যে কি কঠিন ভাবে আমার কাছে এল, সত্য ভাবে ভাবতে ভয় লাগে। বলিবর্দ দিল গুঁতিয়ে। এই সম্পূর্ণ গোদের উপর একটা বিষফোঁড়া হয়ে এলো আলিআকবরের চিঠি। বিশ্ব আহাম্মুকের মত কেউ তাকে বুঝিয়েছে, একটা ধমকভরা চিঠি দিতে। কাষ্ঠ মাধব তাই করল। কিন্তু পেছনে যে দুষ্ট চক্রটি ছিলো, সে শেয়ালের মত হরিণকে তো ঘাস খেতে বললো, এই বিশ্বাসে চাষী তো হরিণকে ধরে মেরে ফেলবে। আর তার ফাঁকে দুষ্ট চক্রটি পরিত্যক্ত হাড়মাংস কজ্জা চিবিয়ে সুখী হবে। কিন্তু এখানে চাষী হরিণকে ধরলো না। শুধু তাড়িয়ে দিলো।

পাঠক ভাববাচ্যে কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন না। তাই ব্যাপারটা গোড়া থেকেই

বলি। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বিশেষ সংখ্যা বেরোনোর কিছুদিন পর দুটো চিঠি পেলাম। একটা চিঠি লিখেছে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ এবং অপর চিঠিটা লিখেছে আলিআকবর। আলিআকবর 'সঙ্গীত' পত্রিকার এডিটারকে উদ্দেশ্য করে যে চিঠি লিখেছে তারই 'ট্রু কপি' আমাকে পাঠিয়েছে। আলিআকবর সঙ্গীতের এডিটরকে সম্বোধন করে লিখেছে, 'দীর্ঘদিন ধরে আমি সঙ্গীত পত্রিকাটির সঙ্গে পরিচিত। সঙ্গীতের জন্য, সঙ্গীত পত্রিকার বিরাট অবদান। কিন্তু উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ বিশেষ সংখ্যাটি পড়ে মর্মাহত হয়েছি। যতীন ভট্টাচার্য আমাকে কথা দিয়েছিলো, যে বাবার উপর পুস্তক লেখা হলে সে আমাকে প্রথমে দেখাবে। বইএর পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি সম্মতি জানালে তবে সে পুস্তক ছাপাবে। অথচ সে তা করে নি। এ ছাড়া লেখার মধ্যে অনেক ভুল আছে। আমার এই চিঠিটা পরবর্তী সংখ্যায় অতি অবশ্য ছাপিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। যদি না ছাপান তাহলে মানহানির কেস করব।'

চিঠিটা পড়ে অবাক হলাম। এ ধরনের চিঠি লিখতে কে তাঁকে মন্ত্রণা দিলো। আমি তো দশ পাতার মধ্যে গুরু দক্ষিণা বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছি। ম্যাগাজিনটাকে বই কি করে ভাবলেন। এ ছাড়া আমি আলিআকবরের সাক্ষাৎকার নেবার সময় বলেছিলাম পাণ্ডুলিপি দেখাব না। না দেখানোর কারণ আগেই লিখেছি। যাক, এ চিঠি যাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে সে যখন আমাকে লিখবে, সেই সময় এর জবাব দেবো।

দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে আকাশ থেকে পড়লাম। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ লিখেছে, 'বাবার উপর বিশেষ সংখ্যা বেরোনর পর মদনলাল ব্যাস আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছে, যতীনবাবু কি করে লিখেছে যে তাঁর নির্দেশে আমি আরটিকেল লিখেছি। এই কথা বলে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। তোমার নির্দেশে যে লেখেনি, সেই চিঠিটা পরবর্তী সংখ্যায় ছাপাবার জন্য আমাকে দিয়েছে। এ ছাড়া বলেছে, যদিও তোমার কাছে অনেক সামগ্রী পেয়েছে এবং সে কথা সে উল্লেখও করেছে কিন্তু তোমার কাছে যে সামগ্রী পেয়েছে সেগুলি তোমাকে ফেরৎ দেবে না।' চিঠিটা পড়ে অবাক হলাম। বম্বেতে বছরের শেষের মাঝামাঝি যে সময় বাজাতে যাব, সেই সময় যা করবার করব। হাথরসে যদিও গর্গের সঙ্গে আমার কথা হয় নি, কেননা সে গুটি কয়েক কথা বলেই দিল্লী প্রস্থান করেছিলো। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, মদনলালের কথা শুনে গর্গ বুঝেছে, যে আমার তথ্য পেয়ে সে নিজের নামে আরটিকেল লিখেছে।

এখন আমার একটাই চিন্তা। বাবার বিষয়ে সংবাদপত্রের বিরাট বাণ্ডিল এবং নানা তথ্য যা মদনলালকে দিয়েছি, সেগুলি যদি আমাকে ফেরৎ না দেয় তাহলে আমার এতদিনের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। যাক চিন্তা করে লাভ নাই। কয়েকদিন পরেই হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে বাজাতে যাচ্ছি, সেইসময় সামনাসামনি কথা বলব।

গর্গকে টেলিগ্রাম করলাম, 'পনেরো ডিসেম্বার বম্বে যাচ্ছি, স্টেশনে থেকো।' বম্বে পাড়ি দিলাম। স্টেশনে গর্গকে দেখলাম। বাড়ী যেতে যেতে বললাম, 'তুমি কি আলি আকবরের এবং ব্যাস-এর চিঠি সঙ্গীতের আগামী সংখ্যায় ছাপাবার অনুমতি দিয়েছ?' গর্গ হেসে বলল, 'কোন চিঠিই ছাপবো না। আমার ভাই বালকৃষ্ণ গর্গ হাথরস থেকে তোমার যাবার পর, যে কথাবার্তা তোমার সঙ্গে হয়েছিলো আমাকে সব লিখে জানিয়েছিলো। উপস্থিত আগামীকাল

বাজনা বাজাও তারপর সব কথাবার্তা হবে।' বাড়ী পৌঁছেই হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনের কর্ণধার ব্রিজনারায়ণকে টেলিফোন করে বললাম, 'আজ এসে পৌঁছিছি। আগামীকাল আমার বাজনা কিরকম সময় পড়বে?' ব্রিজনারায়ণ বললেন, 'রাত্রি বারোটা নাগাদ বাজনা পড়বে। সঙ্গীতে বিশেষ সংখ্যা খুব ভাল লেগেছে। মদনলাল ব্যাস আমাকে বলেছে, আপনি তাঁকে লিখবার জন্য যে সামগ্রী দিয়েছেন তা ফেরৎ দেবে না। আসলে ব্যাপারটা কি?' ব্রিজনারায়ণের কাছে এ কথা শুনে অবাক হলাম। বুঝলাম জল ঘোলা হয়েছে। বললাম, 'দেখা হলে সব বলব।' গর্গকে বললাম, 'উপস্থিত অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে দেখা করতে যাব। ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় মদনলাল ব্যাসের বাড়ী তোমার সঙ্গে যাব।' ইতিমধ্যে গর্গ-এর স্ত্রী চা, জল খাবার নিয়ে হাজির। গর্গ আমার থেকে বয়সে ছোট হলেও বন্ধুর মত। সেই হিসাবে তার স্ত্রীর সঙ্গেও আমার মধুর সম্বন্ধ। আমাকে চা দিয়েই বলল, 'বিশ্বাস করে যা কিছু দিয়েছেন গুরুজী, তা আর ফেরৎ পাবেন না।' বললাম, 'আজ সন্ধের সময় আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন। মদনলালের স্ত্রী তো আপনার বন্ধু এবং আপনার কর্তার বন্ধু মদনলাল। সুতরাং সন্ধ্যার সময় আমরা তিনজনেই যাব। গর্গকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্নপূর্ণাদেবীর পায়ে ফ্র্যাকচার হয়েছিল শুনেছিলাম, উপস্থিত কেমন আছেন?' উত্তরে বলল, 'মাতাজী এখন ঠিক আছেন। সপ্তাহে একদিন সেতার শিক্ষা করতে যাই। তুমি যে আসছ সে কথা জানিয়েছো কি না?' বললাম, 'প্রতিবারই আসার আগে লিখি, নইলে দরজা খুলবেন না।' গর্গ বললো, 'আসলে ছাত্রদের যে সময়ে ডাকেন, সেই সময় আইহোল দিয়ে দেখে দরজা খোলেন। অসময়ে যদি কেউ কলিংবেল বাজায় তাহলে সেই সময় আসেন না।' বললাম, 'এ ব্যাপারটা জানি বলেই আগে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই।' তাড়াতাড়ি স্নান সেরে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গাড়ী করে যেতে যেতে মনে হোল, বাবার মৃত্যুতে নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছেন। এই সময়ে ব্যাস-এর কথা কিছু বলব না। আজ রাত্রে সব কথা হয়ে যাক, তারপর যা হয় পরেই বলব। উপস্থিত মাথার ভিতর নানা চিন্তা থাকা সত্ত্বেও, বাবার কথাটাই মুখ্য হয়ে উঠল। মনে হয় নিশ্চয়ই সব খবর শুনেছেন। বাড়ী গিয়ে কলিংবেল বাজাবার কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে দিলেন। দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'এত মোটা হয়ে গিয়েছেন কি করে? তেইশ বছর একরকমই দেখছি কিন্তু এত মোটা?' হেসে বললেন, 'বাথরুমে পড়ে গিয়ে পায়ে ফ্রাকচার হয়ে গিয়েছিলো। ছয় সপ্তাহ প্লাস্টার করা ছিল। শুয়েই কাটাতে হয়েছে। সেই সময় চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একটা দাই রেখেছিলাম। কোন কাজ না করায় মোটা হয়ে গিয়েছি। বাজনা কবে আছে?' বললাম, 'আগামীকাল বাজনা আছে। সেইজন্য আসব না। তারপরের দিন আসব।' কথায় কথায় বাবার কথা উঠল। গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বাবা আমার কাছে মৃত নয়। নিজে চোখে তো মৃত অবস্থায় দেখি নি। বাজনা নিয়ে চোখ বুজে বাজাতে বসলেই বাবাকে আমি দেখতে পাই। মনে মনে ডাকলে তো স্বপ্নেও দেখতে পাই।' এই কথা বলতে বলতে গলাটা ভারী বলে মনে হোল। কথা ঘুরিয়ে বাবার আজ্ঞায় বই লেখার ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হয়েছি সব বললাম। চুপ করে সব শুনলেন। বললাম, 'আগমীকাল বাজাবার পর, পরের দিন বিকেলে এসে বাবার সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব।' এই কথা শুনে

বললেন, 'অতীতকে নিয়ে টানাটানির কোন অর্থ হয় না।' বললাম, 'একটা চিঠি লিখতে গেলে জ্বর আসে, কিন্তু বাবার আদেশ হয়েছে বলেই বাধ্য হয়ে বহুলোকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। আপনি কি চান বাবার আজ্ঞা পালন করব না?' এ কথা শুনে চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'সঙ্গীত পত্রিকায় বৌদির ছেলেদের মধ্যে, দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলেদের নাম, বৌদির ছেলেদের মধ্যেই লেখা হয়েছে কেন?' বললাম, 'এ ভুল হবার কারণ আছে। যে দিন আসব সেইদিন সব কথা বলব।' প্রতিবারের মত প্রথম দিন গিয়ে, খাবার খেয়ে যে সময় চলে আসছি, বললেন, 'বাবার নাম স্মরণ করে ভাল করে বাজাবেন।' এই কথাটা প্রতিবার বলেন। এবারও সেই কথা বললেন। বললেন, 'বাড়ী গিয়ে এখন বাজান।'

সন্ধ্যার সময় গর্গ এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মদনলালের বাড়ী গেলাম। সত্যি কথা বলতে, আমার ন্যায্য পাওনার দশ হাজার টাকাও যদি ওর কাছে পড়ে থাকত, আর দেব না বলে ধমক দিতো, তাহলেও হয়ত এতটা দুরু দুরু বক্ষে যেতাম না। কিন্তু এতো আমার গোল্ডেন ট্রেজারি আটকে গেছে।

মদনলালের বাড়ী পৌঁছে ছোট গৎ ধরলাম। আগামীকাল বাজনা আছে। তাই আজ কথার আলাপ জোড় ঝালার ধার দিয়েও গেলাম না। যে দুষ্টু সরস্বতী ওঁকে ভর করেছিল, সে বোধ হয় সেই ক্যাজুয়াল লিভে গিয়েছে। তাই বেগারবাই না করে সুবোধের মত এক কথায় ও বলল, 'পরশু আপনার বাড়ী গিয়ে দেখা করব এবং আপনার সব সামগ্রী ফেরৎ দেব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।' ওঁর কাছেই জানলাম, আজ কোলকাতা থেকে ফিরেছে এবং কোলকাতা প্রবাসে আলিআকবরের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। মাথায় একটা চিন্তা চিড়িক দিয়ে গেল। তাহলে সঙ্গীতে লেখা মদনের ও আলিআকবরের চিঠি কোন কাকতালীয় নয়। যাক।

গাড়ীতে করে ফিরছি। গর্গ বলল, 'এই বুঝি তোমার ছোট গৎ? ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম মানে? বলল, 'কিনা বললে ভাই? একরকম মিষ্টি ক্যাপসুল তো কম দেখেছি। কুলপানা চক্রের কানে কি বিড়বিড় করলে। যে এক কথায় ফণা নামিয়ে পরশু দেখা করতে আসছে।' ভাবলাম, মুচকি হাসব কৃতিত্বের ভাব দেখিয়ে, কিন্তু সাহসে কুলোল না। কারণ বেইমানের ফলার না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

বাজাবার পরেরদিন সকাল যেন আর আসতেই চাইছে না? এলো। দু'টোই, এলো। সকাল, আর মদনলাল। কিন্তু এতো ননী চোরা বেশ, কাগজপত্রের বাণ্ডিল কই? উর্দুতে মাছের প্রতিশব্দ হোল ঝক্। এতো গভীর জলের মাছ। এঁর নাগাল পাওয়া কঠিন। তাই মনে হোল আমি কি ফলবিহীন ঝকমারি অভ্যাস করছি। তাই আজকেও অতিবিলম্বিত লয় গাড়লাম কারণ এই লয়েতে আর যাই হোক বোলের ফুলঝুরি সম্ভব ছিলো না। তাই অনুগত্যের মিষ্টি ঠেকাই মদনলাল দিতে বাধ্য।

এ কথা, সে কথা, সত্য মিথ্যে মিঠে কড়া সব মিলিয়ে, ঘণ্টা খানেকের আমাদের সংলাপ সুখশ্রাব্য ছিল কি না জানি না, কিন্তু অশ্রাব্য ছিলো না। ভাবলাম, পণ্ডিতের কাছে সেতার শিখলে সে আর এক পণ্ডিত হ'তো।

আবার আগামীকাল আসব, এ কথা বলে উঠল। ওর কথাটাকে যদি বিশ্বাস করি, তাহলে চব্বিশঘণ্টা পরে আমার সব কাগজপত্র পেয়ে যাব। শুরু হোল চব্বিশঘণ্টার 'শবরীর প্রতীক্ষা'। এ যেন 'সব হারিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'। হেলায় ফেলায় দিনগুলো যখন যায় তখন গতি হয় ঘণ্টা দুঘণ্টা। আর প্রতীক্ষার সময় মনে হয় পনেরো মিনিটে এক ঘণ্টা। যাক বম্বের আকাশে মাথার সূর্য উঠল। যে রণের প্রস্তুতি আমাকে করতে হবে তাতে আর ঢাল তরোয়াল নাই। আছে সত্য নিষ্ঠার রথ আর গুরুবলের তূণ আর আস্থার বাণ।

রণ হোল না। বিনাযুদ্ধেই সূচ্যাগ্রমেদিনীই নয়, গ্রামও পেয়ে গেলাম। চমক লাগল, কারণ দুর্যোধন তো এর আগে বেশ কয়েকজনকে সদম্ভ হুংকার করেছে, বিনাযুদ্ধে নাহি দিব। কিন্তু একটা স্বভাব গুণ ছাড়তে পারে নি। একটা শর্ত রেখে বসল। আমার অনুরোধে আলিআকবর বাবার আত্মকথা 'আমার জীবনী'র একটা নকল মদনলালকে পাঠিয়েছিলো। সেটা রাতারাতি মদনলালের সম্পত্তি হয়ে গেল। এ যেন স্বপ্নাদিষ্ট ব্যাপার। শর্ত হোল, ওটাকে আমি যেন পড়ে বা নকল করে অচিরাৎ ফেরত দিই। রাগটা তড়বড় করে মাথায় চাপছিল। রোষ, কোন রকমে থামালাম কারণ তর্ক করে লাভ নাই। ওকে কি করে বোঝাই যে, ওর অনুরোধে আলিআকবর ওকে একটা পোষ্ট কার্ডও লিখবে না। 'আমার জীবনী' তো দূরের কথা।

বৈদিক আপ্ত বাক্য মনে পড়ল। উপদেশোহি মূর্খনাম প্রকোপায় না শান্তয়েৎ। তাই দুধকলা দিয়ে স্তুতি করে বললাম, 'কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া। এতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জানেন তো, যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না। তাই বোধ হয় আপনার দ্বিধা হচ্ছে। একটা কথা মনে রাখবেন, দেয়ার ইস নো সাবসিচিউট ফর ট্রুথ, অনেষ্টি এনড সিনসিয়ারিটি। এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে রুচিতে বাধে। ফেরৎ দেব কিন্তু এক্ষণেই চিত্রগুপ্তের জাব্দা খাতা খুলব না। কেননা, যে কদিন বম্বে থাকব, রোজ রাত্রে রাজা এল.পি. পিত্তির বাড়ীতে বাজাতে যেতে হবে।

সুতরাং কাশী গিয়েই হবে। প্রস্তাবটা খুঁত খুঁত করে গলাধঃকরণ করে মদনলাল বললো, 'যাক বইটা লিখলে আমি যেন আপনার অনুলেখক হিসেবে থাকতে পারি।' ব্যাসের বিদায়ের পর চিন্তা করলাম, হিন্দির চালাঘর যখন পুড়ল তখন হিন্দিও নয়, বাংলাতেও নয়। এ পাপের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। মনটা প্রশস্তিতে ভরে গেল। ডন কুইকসোটএর সাহস দেখে, বললাম, 'ঝড় গেলো তো। আগে একটু ধাতস্থ হই। তার পর চিন্তা করব আদৌ লিখব কি না। আর লিখলে ভাষার মাধ্যমটা কি হবে?' হিন্দির অমর কথা শিল্পী প্রেমচন্দের একটা কথা মনে পড়লো, 'সিয়ার সির্ফ চার টাঙ্গ কা হি নহিঁ হোতা হয়।' অর্থাৎ খালি চতুষ্পদই শৃগাল হয় না। যাক আমার দেওয়া সব তথ্য ফেরৎ পেয়ে মন যেন প্রশান্তিতে অবগাহন করল। মনে হোল অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে ধাবমান অঙ্গুলিমান শ্রান্ত হয়ে শরণ চাইছে। নিজের উপর আস্থা ফিরে পেলাম। আমি বিশ্বাস করি সত্যের রাস্তায় চললে জয় তাঁর সুনিশ্চিত। উর্দু কবির ভাষায়, কয়ামৎকে দিন খুদা হী রাজ করতা হয় শৈতান নহিঁ।

যথাসময়ে সে এলো। আমি একগুচ্ছ প্রশ্ন ব্যাসকে ছুঁড়ে দিলাম। বললাম, 'আপনি যাবার

পর থেকে আজ পর্যন্ত যত চিঠি দিয়েছি, প্রত্যেকটি চিঠিতে লিখেছিলাম গর্গকে জানাতে অথচ গর্গের কাছে শুনলাম, সে এ বিষয়ে কিছুই শোনে নি আপনার কাছ থেকে।' এ কথা শুনে ব্যাস বলল, 'আমি যখনই আরটিকেল দিতে গর্গজীর কাছে গিয়েছি তখন আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।' বুঝলাম কথাটা অর্থহীন।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে লিখেছিলাম, 'বিশেষ সংখ্যায় আমি ছোট একটা প্রবন্ধ হাথরসে পাঠালাম। বরোদা থেকে বাজিয়ে বম্বে এসে বইটা শেষ করব। তা সত্ত্বেও আপনি বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখলেন কেন? এ কথায় ব্যাস বলল, 'আপনার সে চিঠিতো পাই নি। সেই চিঠি পেলে আমি লিখতাম না। গর্গজীর অনুরোধে আমি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলাম।' এই কথা শুনে বললাম, 'গর্গ যখন আপনাকে প্রবন্ধ লিখতে বলল, সেই সময়ও আপনি বলতে ভুলে গেলেন যে আমি আপনাকে দিয়ে বই লেখাচ্ছি। এ ছাড়া আমি কয়েকজনের কাছে শুনেছি যে আপনি নাকি আমার তথ্যগুলো দেবেন না, কেননা বিশেষ সংখ্যাতে আমি যে হেতু লিখেছি, আপনাকে দিয়ে লেখাচ্ছি। এটা কি বিশ্বাস করব?'

এরকমই আরো কয়েকটা খুচরো প্রশ্ন করেছিলাম। বোধ হয় সব কটাই চড়া সুরে বাঁধা ছিলো। তাক বুঝে ঝটপট মিথ্যা উত্তর দেওয়া কঠিন। তাই বারকয়েক আমতা আমতাই সার হোল। আর বোধ হয় সেইজন্যই আমার প্রাণ পাখী ফেরত পেলাম। মধ্যযুগীয় গোয়েন্দা গল্পে গুপ্তধন খোঁজাটা খুব বেশী ছিলো। নক্সাভিত্তিক দুর্গম পথে হাঁটাটাই ছিল এডভেনচার। অসাধু অঙ্গরক্ষক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অর্দ্ধেক নক্সা পেয়ে প্রভুকে পথে ফেলে রেখে ছুটত ধনের সন্ধানে। কিন্তু নক্সার পাঠোদ্ধার যে প্রভুই পারবে, সে পারবে না, সেটা ভুলে যেতে। ফলে কেঁচে গণ্ডুষ। প্রভুকে ডেকে আনতে হ'তো।

এখানেও হোল তাই। তথ্য ফেরত দেওয়ার পর, আর ততোধিক তথ্য আমার কাছে আছে দেখার পর ও অনুলেখক হবার সাধ ব্যক্ত করে যা বলেছিলো সব বলে ফেললাম, 'সঙ্গীতের মধ্যে অঙ্কের একটা স্থান আছে। কিন্তু অঙ্কের বাইরেও, অনেক রকমের হিসেব আছে, তেমনি কোনো একটি হিসেবে অনেকে অনেক জেনেছে ও অনেক হারিয়েছে। সেই ওঠা নামা আর পাওয়া হারানোর একটা শূন্য ফল অষ্ট প্রহর হাউইয়ের মত জ্বলে উঠতে চায়। অবশ্য তার জন্য আমার দুঃখ নাই। আসলে আমাদের মনের জোরের অভাব নাই। কিন্তু স্নায়ু বড় দুর্বল। এই দুর্বলতা জন্মেছে কতকগুলো তথাকথিত আদর্শের ফাঁসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। যে ফাঁস আমি ছিদ্র করতে চাই। ছিন্ন করার ইঙ্গিত আমার উস্তাদ বাবাই দিয়ে গিয়েছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কিছুদিন আগে।

এরপর ওর যাবার পরেই প্যাকেটটাকে খুললাম। মিলিয়ে দেখি, শেয়াল সাতটা কুমির শিশুকেই ফেরৎ দিয়েছে কিনা। না সব ঠিক আছে। একটা বিস্ময় যে ঘাপটি মেরে আমার জন্য বসেছিল তা ভাবি নি। সেটা হোল আমার লেখা সেই চিঠিটার খাম খোলা অবস্থায় রয়েছে অন্যান্য কাগজের ফাঁকে। যে চিঠিটা মদনলাল মুখ মুছে অস্বীকার করেছিলো, 'আমি পাই নি তো।'

সাধারণতঃ চল্লিশোর্দ্ধ কোন লোক ছেলেমানুষি করে না। কিন্তু আমি লোভ সামলাতে

পারলাম না। ব্যাসকে ফোন করে আদুরে গলায় বললাম, 'আপনি ব্যস্ত লোক তো, তাই আমার চিঠিটা পৌঁছেও ছিলো, আপনি খুলেও ছিলেন, কিন্তু পড়তে পারেন নি। আপনার ফেরৎ দেওয়া কাগজের তোড়ার ফাঁকে ওটা পেয়ে গেলাম। টেলিফোন তো আর টেলিভিশান নয়, না হলে ওঁর খাবি খাওয়া ফ্যাকাসে মুখটা ঠিক দেখতে পেতাম। মনে হোল অথঃ শ্রী মহাভারত কথা। ব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন, আর আমার মহাভারত ব্যাসের উপরই রচিত। মহাভারত সর্বকালেই ঘটে। আসলে নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, লোভনীয় কোনো বিষয়বস্তুর সন্ধান পেলে লেখক বন্ধুরা সেটা আত্মসাৎ করে নিজের নামে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে আমার দু'বার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। যাক এ কথা।

৬২

একটু গড়ানর নাম করে বাবার আত্মজীবনী পড়তে আরম্ভ করলাম। একনাগাড়ে পড়ে শেষ করলাম। কিন্তু এ কি? ফুলের মালা বলে বেণীতে বাঁধার পর যদি কেউ দেখে সাপ, সে যে রকম চমকায় আমারও তাই হোল। কারণ বাবার কৃপায় রচনাটা আমি আগেই পড়েছিলাম, কিন্তু এখন যেটা পড়ছি তা সিরাজের সেনা মিরজাফর। যেখানে আসল শুরু হবে সেখানেই তো ইতি টানা হয়েছে। বুঝলাম, আলিআকবর এটাকে এবৃজড বা অনুগত সচিবকে আদেশ করেছেন লঘুতম সমাপবর্ত্তক করতে। কিন্তু কোথায় পরিচ্ছেদের যবনিকা টানতে হবে সেটা ছাপার জন্য একটু তত্ত্বজ্ঞান থাকা দরকার। যে আত্মজীবনী রচনার ভূমিকা এবং উপক্রমণিকা, পুংখানুপুঙ্খভাবে বাবা যেখানে নিজের পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে প্রচুর কথা লিখেছেন, সাধারণ লোকেরও ভাবতে বিস্ময় লাগবে যে তিনি সন্তান, এবং সন্ততিদের এক লাইনে পরিচয় দিয়ে হিসেব নিকেশ করেছেন, সেটা সম্ভব নয়।

আলি আকবর এটা করার সময় ভাবেন নি যে, ওর ফাঁকে তিনি বাবাকে কত ছোট করেছেন। তাঁর বা অন্নপূর্ণাদেবীর মত যোগ্য সন্তান যাঁর, তিনি এতই নিষ্ঠুর হবেন যে তাঁদের সম্পর্কে কিছুই লিখবেন না। ধরে নেওয়া যাক, আলিআকবরের প্রতি তিনি বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু সেটা তো ছিলো তাঁর মহাত্বাকাঙ্খার মহত্তম পরিকল্পনার পিতার হৃদয়, যেখানে ছিলো অনেক আশা। কিন্তু তাঁর সব আশা আকাঙ্খাই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এবং সেইজন্য প্রবল পিতৃস্নেহ বিরক্তি হিসেবে ফুটে উঠত।

আর অন্নপূর্ণাদেবী? বাবার জীবনে দুটোই তত্ত্ব ছিলো। সঙ্গীত আর অন্নপূর্ণা। থ্রি গ্রেট ইন ওয়ান। একটা কম করে দিলে বাকী দুটো আনডান্। তাই অন্নপূর্ণাদেবী সম্বন্ধে বাবা যে কিছু লেখেন নি, এ কথাটা ভাবতে আশ্চর্যই নয়, নীচতার ভাব মনে জাগে।

তা হলে কেন আলি আকবর এ কাজ করলেন? আমার যতদূর মনে হয় কড়া ভাষায় চাবুকটা সুগ্রীব দোসর ও তাঁর উপরে সমান ভাবে পড়ত। লেখাটা পড়ে আমার মনে হোল, আলিআকবরের সেক্রেটারি ওটাকে এডিট করে, সংক্ষেপে করতে গিয়ে অনেক তথ্য ধামা চাপা দিয়েছে এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবার ভয়ে সব বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি করে ইতি করেছে। বাবার হাতের লেখাটি যেমন পেয়েছি হুবহু তুলে ধরলাম। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে।

৩০-৫-৫৭

আমার জীবনী

আমার জন্ম স্থান ত্রিপুরা শিবপুর গ্রামে। আমার পিতামহের নাম মাদার হোসেন খাঁ। তাঁর দুই পুত্র। বড় পুত্রের নাম সাধু খাঁ এবং ছোটপুত্রের নাম আনন্দ খাঁ।

আমার বংশাবলীর পরিচয় ও ইতিহাস ত্রিপুরাতে মূলগ্রাম—ঐগ্রামে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের নাম দীননাথ দেবশর্ম্মা। তিনি মূলগ্রামে বাস করিতেন। তাঁর সংসারে পষ্য খুব কম ছিল। দীননাথ দেবের স্ত্রী ও একটা পুত্র। পুত্রের নাম জানা নেই। দীননাথ দেবের স্ত্রী সন্তানটি প্রসব করেই পরে মারা যান। ঐ ছেলেটিকে অতি কষ্টে লালন পালন করতে থাকেন। ছেলেটি যখন চলাফেরা করার মতন ৭-৮ বৎসরের হল তখন তাঁর ইচ্ছা হল ছেলেটিকে তার কুন শিষ্যের নিকট পালনের ভার দিয়ে তিনি তপস্যা করিবেন। দীননাথ ছিলেন অতি বড় তান্ত্রীক সাধক। মহাজ্ঞানী সাধক পুরুষ। ত্রিপুরার পাহাড়ে তাঁর অনেক শিষ্য সামন্ত ছিল। ত্রিপুরাধীপতি মহারাজা কৃষ্ণ কিশোর মানেক্য বাহাদুরের রাজত্ব আগরতলাতে রাজধানী। তারপর করেছিলেন হাবেলিতে রাজধানী। দুই স্থানেই রাজা বাস করতেন। ত্রিপুরা ছিল পাহাড়ে, সেই পাহাড়ের নাম সাতলাই পর্ব্বত। সাতটী পাহাড় ছিল উনির রাজত্বে। সব পাহাড়ে নানা জাতীয় জংলা লোক বাস করিত। তাদের আহার ছিল পশু মেরে কাঁচা মাংস খেত। মানুষ মেরে মানুষের মাংস খেত। রান্না করতে জানতো না। মেয়ে পুরুষ উলঙ্গ হয়ে থাকতো। দীননাথ দেব সেই পাহাড়ে একটা কালি মন্দির পেয়ে সেই স্থানেই তন্ত্র সাধনা করতেন। তিনি ছেলেটিকে একজন শিষ্যের কাছে পালন করতে ব্যবস্থা করতে দিয়ে তিনি পূজা পাঠ নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন।

দীননাথ দেবের ছেলের যখন যুবা বয়স তখন তিনি করলেন কি, পর্বতবাসী ছেলে মেয়ের দলে নাম লিখিয়ে এদের সঙ্গেই বাস করেন। পরে যেয়ে দেবী চৌধুরানীর দল ও ভবানী পাঠকের দলে ভর্তি হল। ডাকাতী করা, কৃপন রাজা জমিদারের বাড়ী লুঠ করা এই সব করতে থাকেন। বাদসা নবাব এদের খাজনা লুটকরা, এই ছিল এদের কর্ম্ম। তারপর এল ইংরেজের রাজত্ব। প্রথম কলিকাতা ইংরেজরা দখল করে। তারপর পলাশী যুদ্ধ করে মুর্শিদাবাদ দখল করে। সেই সময় ইংরেজেরে খাজনা লুঠ করতে আরম্ভ করে দেবী চৌধুরানীর ডাকাত দল। তখন ইংরেজ রানীর পক্ষ হতে নোটীশ জারি হয় এইসব ডাকাত দলকে ধরার জন্য ডিটেকটিভ লেগে যায়। তখন আমার পূর্ব্বপুরুষ দীননাথ দেবের পুত্র মুসলমান ধর্ম্মে দিক্ষিত হয়ে তিনি ফকির হয়ে যান। তখন তাঁর নাম হয় সামস ফকির। তিনি মুসলমান হয়ে ভাল ঘরে সদবংশের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করেন। সেই মেয়ের দুটো ছেলের জন্ম হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষ সামস ফকিরের। তিনি মূলগ্রামে এসে বাস করেন। তার টাকা ছিল প্রচুর। জমি জমা খরিদ করে বসবাস করতে থাকেন। পুকুর দীঘি কাটিয়ে ছিলেন এখনও ঐ সব পুকুর দীঘি আছে। সামস ফকিরের দুই পুত্রের নাম বড় পুত্রের নাম আজর মহাম্মদ এবং ছোটপুত্রের নাম ছিল ছালি মহাম্মদ।

এখন আমাদের বংশের ইতিহাস

আলি আহম্মদ খাঁর একটী ছেলে হয়। তাঁর নাম মাদার হুসেন খাঁ ওরফে মাদারি খাঁ। তার পুত্রের নাম সাধুখাঁ পুত্রদের নাম ও কন্যার নাম, তিনির পাঁচপুত্র ও দুই কন্যা।

১ম পুত্রের নাম— ছমিরদ্দিন খাঁ
২য় " " আপ্তাবদ্দিন খাঁ
৩য় " " আলাউদ্দিন খাঁ
৪র্থ " " নায়ের আলি খাঁ
৫ম " " আয়েত আলি খাঁ
কন্যার নাম
১ম কন্যা— মধুমালতি খাতুন
২য় " ফদর খাতুন।
আমার মাতার নাম হর সুন্দরী খাতুন।

আমার পিতা সাধুখা ঠাকুর দাদার খুব প্রিয় ছেলে ছিলেন। তিনি বেশী লেখা পড়া করেন নাই। গান বাদ্য নিয়ে মেতে থাকতেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীর চন্দ্র মাণেক্য বাহাদুরের দরবারে বড় বড় গুনি ছিল। রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাদক কাশিম আলি খাঁ ছিলেন। যদুভট্ট ছিলেন গায়ক। হায়দার খাঁ ছিলেন দীলরুবা বাদক। কোলকাতা ভবানীপুরের জমিদার কেশব বাবু ছিলেন মৃদঙ্গ বাদক। আমার পিতা সাধূ খাঁ আগর তলাতেই সদা সর্ব্বদা থাকিতেন। এবং রাজদরবারে গুনি জনদের গান বাদ্য শুনিতেন। কাশেম আলি খাঁর নিকট সেতার বাজনা শিক্ষা করেছিলেন। বাড়ীতে যখন আসিতেন তখন সেতার রেয়াজ করিতেন। তখন আমি শিশু। স্তন পান করি। মা বলতেন বাবার সেতার শুনে মায়ের বুকে তবলা বাজাতাম, বাবা যে গৎ বাজাতেন তখনই শুনে শুনে মুখে গেয়ে গেয়ে খেলা করতাম। শিশু কালের গৎ এখনও আমার স্মরণ আছে। আমার ছেলে আলিআকবর ও জামাই রবিশঙ্করকে ঐ গৎ শিক্ষা দিয়েছি। ঐ সব গৎ ভারতবর্ষে কোন বাদকের কাছে শোনা যায় না।

আমার ঠাকুর দাদা মাদারহুসেন যখন স্বর্গবাসী হন তখন আমার পিতা সাধুখা সংসারী হন। আমাদের দেশের যাঁরা উস্তাদ তাদের বেতন দিয়ে রেখে আমার মেজদাদা আপ্তাবুদ্দিন তবলা শিক্ষা দেওয়াতেন। শিক্ষক উস্তাদের নাম ছিল রামকানাই শীল। তিনিরই ভাই রামধন শীল বড় বেহালা বাদক ছিলেন। তিনি বেহালা শিক্ষা দিতেন ও গান শিক্ষা দিতেন তখন আমার বয়স ৪, ৫ হবে। উস্তাদের বাদ্য শুনে ও যে সময় দাদাকে শিক্ষা দিতেন, তবলার ঠেকা শুনে শুনে অভ্যাস করে ফেলতাম। তারপর গ্রামের স্কুলে দাদার সঙ্গে পড়তে যেতাম। পড়তে না গেলে দাদা আপ্তাবুদ্দিন আমাকে খুব মারতেন। আমার দাদা আপ্তাবদ্দিন সাহেবের খুব বদ মেজাজ ছিল। তিনি খুব তামাক খেতেন। তাঁর জন্যে আমাকে তামাক সাজতে হত। তামাক সেজে বাড়ীর পেছনে নিয়ে যেতে হত বাবা মা কেউ জানতে না পারেন। তামাক সময় মত না পেলে আমাকে খুব মারতেন। যে দিন সময় মত তামাক পেতেন সেদিন আমাকে খুব আদর করতেন। তারপর আমার মুখে হুকাটী ধরে আমাকে তামাক খাওয়া

শেখাতেন। দাদার মারের ভয়ে আমিও তামাক খাওয়া শিক্ষা করতেম। এই শিক্ষা এমন পেয়েছি তামাক যতক্ষণ পর্যন্ত্য না খাব ততক্ষণ মনে হয় আমি মানুষ নই। অন্য পৃথিবীতে আছি। যেই তামাক খাওয়া হয় তারপর মনে হয় আমি মানুষরূপে পশু। এই শিক্ষাটি আমার দাদা আপ্তাবুদ্দিন ফকির সাহেব দিয়েছেন। তিনিকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপ্তাবুদ্দিন সাহেবের একটা ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার জন্যে দুব্বো ঘাস দৈনিক আমাকে ছিলে আনতে হত। তিনি খুব ভাল ঘোড় সোয়ার ছিলেন। তিনি নানা রকম পাখী পালতেন সেই পাখীর জন্যে বৃক্ষ থেকে পিপিলিকার বাসা ভেঙ্গে ডিম সংগ্রহ করে আনতে হত। যদি না করতাম তা হলে মার খেতে হত। আমাকে যে মার মেরেছেন তা জীবনে ভুলব না। স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা কিছুই করত না। মাষ্টারেরা কানমলা বেত্রাঘাত করতো। তখন আমি খুব খুশী হতাম। দাদার সঙ্গে আমিও স্কুলে যেতাম। মাষ্টারেরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

এখন আমার জীবনী আরম্ভ

শিবপুর গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ছিল। ত্রিপুরার মহারাজা শিবের পূজার জন্যে দেবত্তর জমি দান করেছিলেন। ঐ শিবের পূজা দৈনিক হইত সকাল বিকাল দুই সময় স্কুলে যখন যাইতাম তখন শিববাড়ী হয়েই যেতে হত। রোজ পূজা দেখে ও শিবের প্রসাদ নিয়ে স্কুলে যেতাম। শিববাড়ীতে সাধু মহান্তরা থাকিতেন। প্রায়ই নানা দেশ হতে মহান্তরা আসতেন শিব দর্শন করতে, মহান্তরা ভজন করতেন, সেতার বাজাতেন। তাঁদের ভজন ও সেতার বাদ্য শুনে আমি স্কুলে যাওয়া ভুলে যেতাম। এইরূপ করা আমার একটা অভ্যাস হয়ে পড়ে। ভোরে উঠেই শিববাড়ী যেতাম খাতা পত্র নিয়ে স্কুলে যাবো বলে। বাড়ীর সকলেই জানে ভোরে স্কুলে যাই। এইজন্য আমার প্রতি বিশেষ লক্ষ ছিল না। তারপর স্কুল ছেড়ে দিলাম। শিববাড়ী যেয়ে সাধুদের বাদ্য শুনি। স্কুলের ছাত্রবৃন্দ যখন স্কুল বন্ধ হলে বাড়ী যেত তখন আমি বাড়ী যেতাম। স্কুলে আমার না যাওয়া প্রায় ছয়মাস হয়ে গেছে। আমাদের স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় একদিন এসে বাবাকে জানালেন আপনার ছেলে আলাউদ্দিন বহুদিন হল স্কুল যায় না। তার কারণ কি? সে পড়াশোনায় খুব ভাল ছেলে, তাহার পড়াশুনা বন্ধ করিবেন না। বাবা হেডমাষ্টার বলেন আলম রোজ স্কুলে যায় ভোরে উঠে। তখন বাবা মার কাছে যেয়ে বললে আলম স্কুলে যায় না। তখন মা বল্লেন আমি নিজে রোজ জলখাবার দিয়ে থাকি স্কুলে যাবার জন্য সে জল খাবার খেয়ে স্কুলে যায়। মা তখন বাবাকে বললেন তুমি তার পিছে লেগে যাও। যখন স্কুলে যাবে তখন তার পিছু নেবে। কোথায় যায় দেখবে। একদিন বাবা আমার পিছু নিয়ে দেখেন শিব বাড়ীতে আমি বইখাতা ফেলে সাধু বাবাদের ভজন, সেতার শুনছি। বাবা মাকে এসে জানান শিববাড়ী যেয়ে আলম সাধুবাবাদের ভজন, সেতার শুনে। আমার মা ভয়ানক রাগী ছিলেন। স্কুল ছুটীর সময় যখন বাড়ী এলেম তখন মা জিজ্ঞাসা করলেন তুই কোথা থেকে এলি? আমি বল্লেম শিববাড়ী থেকে। স্কুলে যাও নাই। আমি তখন সত্য কথা সব বলে ফেল্লেম। শিববাড়ীতে সাধুবাবা গান বাজনা করে এ সব শুনে আমি স্কুলের কথা ভুলে যাই। তখন মা আমার দুইগালে দুইটী চড় মারলেন। তারপর আমার হাতপা বেঁধে ঘরের খুঁটীর সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। ঐ দিন আমাকে কিছু খেতে

দিলেন না। শিবপুর গ্রামেই আমার বড় দিদি মধুমালতীর বিবাহ দিয়েছিলেন পশ্চিম পাড়ায়। তিনিই আমাকে কোলে করে মানুষ করেছিলেন। আমাকে বড় স্নেহ করতেন। আমার এই সব খবর জানতে পেরে সন্ধ্যার সময় বনাই সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। মার কাছে বলেন আলমকে আমার কাছে নিয়ে যাই। আলম আমার কথা খুব মানে। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার এই অভ্যাস দূর করে দিব। মা বল্লেন নিয়ে যাও। দিদি আমার বন্ধন খুলে তিনির বাড়ীতে নিয়ে এলেন। দিদির বাড়ীতে এনে আমাকে খেতে দেন। দিদির সঙ্গেই শুয়ে পড়ি। দিদি আমাকে বুঝিয়ে বলেন ভাইটী আমার শিব বাড়ীতে যেয়ে গান বাজনা শুনে পড়া নষ্ট করিবে না। মন দিয়ে পড়াশোনা করিবে। কয়েক দিন দিদির বাড়ীতে আরামে কাটাইলাম। একদিন দিদি বল্লেন মায়ের শরীর ভাল নেই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন। সন্ধ্যার সময় দিদি আমাকে নিয়ে মাকে দেখিতে আসেন। তারপর দিদি বাড়ী চলে যান। মার সঙ্গেই আমি শুইতাম। তখন আমার ছোটভাই কেহ হয় নাই। তারপর আমার মনে হতে থাকে গান বাজনা বড় ভাল, জন্য থাকে গান বাজনাই শিক্ষা করিব। পড়াশোনা আর করিব না। তারপর আমার একপ্রকার জিদ হয়ে পড়ে। যা হোক পশ্চিম দেশে গিয়ে গান বাজনা শিক্ষা করিব। বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি পশ্চিম দেশে বড় বড় গুণী হয় ও আছে। পশ্চিম দেশেই আদর্শ সঙ্গীত আছে। আমাদের দেশে সঙ্গীত নাই। বাব রবাবী কাশেম আলি খাঁর কথা প্রায়ই বলতেন। এমন শুনি আমাদের দেশে দ্বিতিয় নাই। ত্রিপুরা মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর কাশেম আলি খাঁ সাহেবকে কত সম্মান করেন। গান বাজনা শিক্ষা করতে হলে পশ্চিমেই শিক্ষা করা উচিত। আমাদের দেশে গান বাদ্য কেহ জানে না। বাবার মুখে এসব কথা শুনে আমার ভিতরে উৎসাহ জেগে উঠে। যা হোক প্রান যায় তবুও চেষ্টা করে দেখবো। পশ্চিম দেশে গিয়ে গান বাদ্য শিক্ষা করতে পারি কিনা। মায়ের মার ও হস্তপদ বন্ধন হওয়ার পর আমার জীদ হয়ে পড়ে যে প্রকারে হোক বাড়ী এবং সবাইকে ছেড়ে চলে যাবো। এখন কি করে যাবো সেই চিন্তা ও সুযোগের চেষ্টা আরম্ভ করি। একদিন সুযোগ হয়ে গেল। মায়ের পেটের অসুখ হয়, খুব দাস্ত হয়, মা খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েন। রাত্রে মার সঙ্গেই আমার শুতে হত। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করার পর মার সঙ্গেই শুয়ে আছি। মায়ের আঁচলে বান্ধা চাবির গোছা আমার বুকে এসে ঠেকে। সেই চাবি খুলে মার বাক্স পেটারা খুলে ছোট হাতে আমার মুঠে যা আসে তাহা বের করে নিয়ে পেটরা বন্ধ করে মায়ের আঁচলে যেমন বাঁধা ছিল সেই চাবি বেন্ধে টাকাগুলি গামছার মধ্যে বেন্ধে মার কাছে এসে দেখি মা সজাগ কিনা। মাকে দেখি মা অচেতন হয়ে ঘুমচ্ছেন। তারপর আমার জামা কাপড় যা ছিল সব একত্র করে একটী বুচকা বেন্ধে মার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করি। তারপর ঘর হতে বাহির হই। তখন নিশি মাত্র, আমার বয়স বয়স ৮ বৎসর হবে। বাড়ী থেকে বাহির হয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে পড়ি। শিবপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে চলতে আরম্ভ করি। ভোর সময় যেয়ে মানিক নগর পৌঁছে যাই। তখন দেখি ইষ্টিমারে যাত্রি সব চড়তেছে। আমি ও তাদের পেছনে যেয়ে ষ্টীমারে চড়ি। ঐ ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জে যাবে। পরের দিন ভোর বেলায় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে যাই। তারপর রেলে চড়ি। তারপর দিন শিয়ালদহ পৌঁছে যাই। জীবনে

প্রথম ষ্টীমারে চড়ে বড় আনন্দ পাই। তারপর রেলে চড়ে রেলের দ্রুতগতি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে পড়ি। এমন আনন্দ বোধহয় জীবনে আর পাব না। টিকেট করতে হয় তা জানতেম না। বিনা টিকিটেই এসে শিয়ালদহ পৌঁছেছিলাম। শিয়ালদা স্টেশন দেখেই ঘাবড়ে গেলাম। এত গাড়ী, ইঞ্জিন, লোকারণ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। শিয়ালদহ থেকে বের হয়ে সামনের রাস্তা দেখে ভাবিত হয়ে গেলাম ট্রামগাড়ী ঘোড়ায় টানে, রাস্তা কি করে পার হব এও এক ভয়ের কারণ। রাস্তার লোক এবং যাত্রিদের পিছে পিছে সারকুলার রোড কোন প্রকারে পার হয়ে হেরিশন রোড রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে যাইতে আরম্ভ করি। রাস্তার লোকের বেশভূষা দেখে মনে হয় এরা আমাদের দেশের লোক নয়। মনে হয় বেহেস্তের লোক। এদের সঙ্গে কথা কি করে বলবো তাও সাহস হয় না। মাঝে মাঝে খাড়া হয়ে বাড়ী ঘর দেখি গান বাজনার জন্য ২তলা ৪তলা ৫তলা ৭তলা বাড়ী আকাশের সঙ্গে লেগে আছে। তখন মনে মনে বলি কোথায় যাবো। দাঁড়িয়ে চিন্তা করি। কোলকাতাবাসী ছেলেরা আমাকে দেখে মনে করে আমি জোংগলা মানুষ। ছেলেরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কান টানে ও মুচরা দিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। ডানদিকে বাঁ দিকে যাতায়াত করা ছেলেরা যে দিকে কান ধরে টানে সেই দিকে দেখি। এই বিপদ হতে রক্ষা কি করে পাব তাহা চিন্তা করি। তখন মনে করি দাড়িয়ে দাড়িয়ে বাড়ী ঘর আর দেখবো না। সোজা ফুটপাথ ধরে চলতে আরম্ভ করি। বিকেলে যেয়ে পৌঁছলাম গঙ্গার ধারে হাওড়া পোলের ধারে। সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। খিদা পেয়েছে। গঙ্গার ধারে দেখি উরিয়াদের ডাল পুরীর দোকান। আমি সেখানে কিছু পূরী কিনে খেলাম। বেশ লাগলো। জল খাবো কোথায়। সামনে দেখি নদী সিড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ডাববা দিয়ে জল খেতে আরম্ভ করি। লোনা জল খেতে পারলাম না। কি করা যায়, পরে তিন, চার ডাববা জল খেয়ে ফেললাম। তারপর সন্ধ্যা হল। দেখি রাস্তায় গেসের বাতি ও বিজলী বাতি জ্বলছে। গঙ্গার ধারে রাস্তায় বাতি ও আলো দেখে মনে হল এটা চাদের দেশ। এরূপ স্থান জীবনে প্রথম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিল ১২টী টাকা বুচ্‌কার মধ্যে বান্ধা, বুচকাটি মাথার নীচে বালিস করে গঙ্গার ঘাটের সিড়িতে শুয়ে পড়লাম। গঙ্গার হাওয়া লেগে আমি অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল বেলা উঠে দেখি আমার বুচ্‌কাটী নেই, চুরি হয়ে গেছে। তখন হায় হায় করে কাঁদতে আরম্ভ করলেম। তখন পাহারায়ালা কনস্টেবল এলো জিজ্ঞাসা করলো তুমি কাঁদ কেন। আমি বল্লেম আমার টাকা চুরি হয়ে গেছে। কাপড়ের বুচকা বান্ধা ছিল। তখন কনস্টেবল বল তুম বুরবক। তারপর আর কি করা যায়। গঙ্গার ধার দিয়ে কেন্দে কেন্দে চলছি। অনেক দূরে দেখি কতকগুলি সাধুভষ্য মেখে ধূনী জ্বালিয়ে ভাঁং ঘুটতেছে। সেখানে গিয়ে আমি দাড়ালেম এবং কান্না করেতেছি তখন এক সাধু বল্লে বাচ্ছা কেঁও রোতা হায়। আমি বল্লেম আমার টাকা চুরি হয়ে গেছে। সাধু বল্লেন কুছ পরোয়া নেহী রাম আচ্ছা করেগা। সকলের মধ্যে বড় যে সাধু তিনি বল্লেন, গঙ্গামে নাহাকে আও। তখন আমি লেংটা হয়ে গঙ্গাতে ডুব দিয়ে নাইলাম। সব চুরি হয়ে গেছে একটী মাত্র ধূতি ছিল তাই পরে সাধু বাবার কাছে এলাম। তিনি ধূনি হতে আমাকে কিছু ভষ্য দিলেন বল্লে সব খা লেও। ভষ্য খাওয়ার পর বল্লেন পাঁচ চুল্লি জল খেয়ে

এসো। আমি দুই হাত ভরে পাঁচ চুল্লি জল খেয়ে এলাম। এই স্থান হল নিমতলা শ্মশান ঘাট। তারপর বল্লেন সামনে যে রাস্তা দেখছো ঐ রাস্তা দিয়ে সিধে চলে যাও। আমি তখন সাধুবাবার আদেশমত নিমতলা স্ট্রীট দিকে সিধা চলতে লাগলাম। যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি অনেক ভিখারী, অন্ধ, আতুর, কুড়ে লেংরা, শিশু যুবা মেয়ে পুরুষ শালপাতায় অন্ন খাচ্ছে। একটী ব্রাহ্মণ তাদের পরিবেশন করছেন। আমি যেয়ে সেখানে দাড়াইলাম। যিনি পরিবসেন করছিলেন তিনি আমায় বল্লেন খোকা তুমি খাবে। আমি বল্লেম খাব। তিনি আমাকে একটী শালপাতায় ভাত, ডাল, সাগ খেতে দিলেন। পেটভরে খেলাম। ঐ ব্রাহ্মণটা বললেন, 'ঐ যে কল দেখছো সেখানে যেয়ে জল খাও। ঐখানে গিয়ে দেখি জলের কলে টিপ দিলেই জল বের হয়।' আমি কলে টিপ দিয়ে জল খেতে আরম্ভ করলেম। পেটভরে মিঠা জল খেয়ে অতিশয় শান্তি পাইলাম। জল খাওয়ার পরে এমন সুবিধা তাহা আগে কখনও অনুভব করি নাই। বড় আনন্দ পাইলাম।

ব্রাহ্মণটী দেখেই চিনতে পারলেন আমি অনাথ তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন খোকা তোমার কে কে আছে। কলিকাতায় তোমার আত্মীয় স্বজন কেহ আছে কি? আমি বল্লেম কেহ নাই। তিনি আমাকে বল্লেন রাস্তার ঐ পারে যে ওষুধখানা দেখছো ঐ ঘরের বারান্দায় যেয়ে বিশ্রাম করতে পারো। ওটা কেদারনাথ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী। ঐখানে যেয়ে বসে পড়লেম। সকলকে খাইয়ে এসে ব্রাহ্মণটি বল্লেম এইখানে শুইতেও পারবে। আমি ডাক্তার বাবুকে বলে দেব। তখন থেকে ঐখানেই থাকার স্থান করে নিলাম। দিনের ব্যালায় ১টার সময় কাঙ্গালীদের সঙ্গে একব্যালা খাই। আর ডাক্তারখানায় বারান্দায় মাটিতে শুয়ে ঘুমাই ও বসে থাকি।

নিমতলা ঘাটের সাধুবাবা আমায় বলেছিলেন যখন ক্ষিধা পাবে তখন এখানে এসে গঙ্গার জল পেটভরে খাবে। রোজ ভোর ব্যালা উঠে গঙ্গার ধারে যেয়ে পায়খানা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে চান করে পেটভরে গঙ্গার জল খেতাম। বেলা একটার সময় কাঙ্গালীদের সঙ্গে পেটভরে খেতাম আর রাত্রে ফুটপাতে শুয়ে থাকতেম। মাকে স্মরণ করে ও বড়দিদিকে স্মরণ করে খুব কাঁদতেম। কেন্দে কেন্দে ঘুমিয়ে পড়তাম। এইভাবে তিনমাস কেটে গেল। গান কোথায় শিক্ষা করবো এইসব চিন্তা করি। কোথায় গুরু উস্তাদ পাব কিছুই চিন্তা করে ঠিক করে উঠতে পারি না। হঠাৎ একদিন কেদার ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে ঔষধ নেবার জন্য এসেছিল একটী ছেলে। সে আমাক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো খোকা তোমাকে দেখি রোজ এখানে বসে থাক ও কান্না করো। তোমার কি কেহ নাই। তখন আমি তাকে বলি আমার পালিয়ে আসার বিষয়। গান শেখার জন্য বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। সে খুব দুঃখ করে বল্লে একদিন তোমায় আমার মার কাছে নিয়ে যাবো। আমার মা বড় ভাল মা। যাবে তো আমার সাথে। আমি বল্লেম যাবো। সে বল্লে এখন যেয়ে তোমার সব বিষয় মাকে জানাবো তারপর কাল তোমাকে মার কাছে নিয়ে যাবো। আমার বাবা বড় উস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করেন। বাবাকে বলবো তোমার গান শেখার জন্যে গুরু ঠিক করে দিতে। এই বলে তিনি চলে গেলেন। পরের দিন এসে ছেলেটী তাদের বাড়ী আমায় নিয়ে গেল। তার

মা এসে আমার হাত ধরে বল্লেন ভিতরে চল। আমি বল্লেম আমি মুসলমান। তিনি বল্লেন তাতে কি হল। তুমি তো শিশু জাত ভাত নাই তুমি ব্রাহ্মণ গোপাল। তিনি আমাকে বাটীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। একটী কুশাসনে বসতে দিয়ে পুরী তরকারী মোহনভোগ হালুয়া খেতে দিলেন। আমার মায়ের মত যত্ন করে পেটভরে খাওয়ালেন। তারপর তিনির কাছে আমাকে বসিয়ে আমার বিষয় জানতে চাইলেন। সমস্ত শুনে বল্লেন এত অল্প বয়সে যখন এর সঙ্গীতে এত প্রেম তখন এ একজন বড় গায়ক হবে। তিনি আমাকে বল্লেন তুমি গান গাইতে পার কি? আমি বল্লেম শিববাড়ীতে যে গান শুনেছি সেই গান শোনাতে পারি। শিব শঙ্কর হর হর বম্ বম্ ভোলানাথ এই গানটা গাইতেই তিনি বল্লেন তুমি গান শিক্ষা করতে পারবে। তোমার স্বর বড় মিষ্টি। তারপর তিনির স্বামীর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার বিষয়ে সব বল্লেন। আর বল্লেন তোমার গুরুর কাছে নিয়ে যাও। গুরুকে শোনাও। তিনিও আমার গান শুনলেন তারপর বল্লেন এস আমার সঙ্গে তোমাকে আমার গুরুর কাছে নিয়ে যাবো। মাকে প্রণাম করে বীরেশ্বর বাবুর সঙ্গে গুরুর বাসায় গেলাম পাথুরিয়াঘাটায়।

গুরুর পরিচয়

গুরুর নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। দ্বিতীয় নাম নুলো গোপাল। তিনির দুই হস্ত ছোট ছিল। এজন্য তিনি নুলো গোপাল নামেই পরিচিত। পাথুরিয়াঘাটায় কোলকাতার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে গায়ক ছিলেন। বীরেশ্বর বাবু আমাকে গুরুর কাছে নিয়ে গিয়ে আমার বিষয়ে সব জানালেন। তারপর গুরু আমাকে গ্রহণ করলেন। গুরু আমাকে বল্লেন ১২ বৎসর স্বর সাধনা করতে হবে। তারপর গান শিক্ষা দিব। আমি স্বীকৃত হলাম আজীবন সুর সাধনা করিব। তারপর গুরু আমাকে স্বরগ্রাম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুর রান্না করবার জন্যে একজন শিষ্য ছিল তিনির নাম গঙ্গারাম ঠাকুর। তিনিই আমাকে স্বরগ্রামের পাল্টা অলঙ্কার শিক্ষা দিতেন। রাত্র দুইটার সময় উঠে পাঁচটা পর্যন্ত্য স্বর সাধনা গুরুর সঙ্গে করতে হত রোজ। স্বর সাধনায় আমি আনন্দ পাইতাম। এতে আমার প্রতি গুরু প্রসন্ন হতেন। তিন বৎসর পর্যন্ত্য কাঙ্গালীদের সঙ্গে একব্যালা খেতে হয়েছিল। সন্ধ্যাব্যালা গঙ্গার জল খেতাম রোজ। গুরু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি খাওয়া-দাওয়া কর কোথায়? আমি বল্লেম কাঙ্গালীদের সঙ্গে একব্যালা খাই আর সন্ধ্যাব্যালা গঙ্গার জল খেয়ে থাকি। তিনির একজন শিষ্য ছিল যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের জামাতা। তাঁর নাম কীরণ বাবু। তিনিকে একদিন বল্লেন এই ছেলেটীর বাড়ী ত্রিপুরা। গান শিক্ষার জন্য বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে একবেলা কাঙ্গালীদের সঙ্গে খায়। রাজবাড়ীতে তার যাওয়ার বন্দবস্ত করে দাও। কীরণবাবু আমার যাওয়ার বন্দবস্ত করে দিলেন রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে। ৭ বৎসর পর্যন্ত এইভাবে স্বর সাধনা করেছিলাম।

৮ বৎসর আরম্ভ হওয়ার সময় আমার মেজদাদা আপ্তাবুদ্দিন সাহেব ও তাঁর শ্বশুর গোলমহম্মদ মিয়াকে নিয়ে কোলকাতায় আসেন আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। কোলকাতায় আমাদের দেশের ও আমাদের গ্রামের জমিদারের দুই পুত্র কলেজে পড়তেন। তাদের নিয়ে ভবানীপুর ও অন্যান্য স্থানে যেখানে উচাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসতো ঐ সব স্থানে আমার

খোঁজ করা আরম্ভ করলেন। কোথাও খুঁজে না পেয়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে উস্তাদ নুলোগোপাল গুরুর বাড়ীতে আমি থাকি খোঁজ পেয়ে গুরুজীর বাড়ীতে আমাকে ধরে ফেলে। আমার দাদা ও জমিদার পুত্র গুরুজীর কাছে বলেন আমার মা কান্নাকাটি করেন আমার জন্য সেই জন্য আমাকে নিতে এসেছে। দয়া করে ওকে ছেড়ে দেন। তখন আমার গুরুদেব বল্লেন ওকে যদি এখন নিয়ে যান তাহলে ওর অনেক ক্ষতি হবে। ছেলেটী খুব ভাল। সঙ্গীত শিক্ষায় খুব উন্নতি করেছে। তার শিক্ষা শেষ করে নিয়ে গেলে ভাল মনে করি। তখন সকলে বিচার করে গুরুর কাছে বল্লেন একমাসের জন্য ওকে ছেড়ে দিন। তার মা বাবাকে দেখিয়ে আমরা ওকে এনে আপনার কাছে দিয়ে যাবো। আপনার মত গুরুর কাছে শিক্ষা পেলে ও বড় গায়ক হবে। এদের কথায় গুরুদেব বাধ্য হয়ে আমাকে একমাসের জন্যে ছেড়ে দিলেন। তখন আমি দাদা ও শ্বশুরের সঙ্গে দেশে আসি। তখন চেহারা ও কথাবার্তা কোলকাতাবাসীর মত হয়ে গেছে। বাটীতে আমার বাবা, মা, ভাই, ভগ্নী সকলেন সন্তুষ্ট হন।

বাড়ীতে সবাই মিলে আমার অগোচরে ঠিক করে আমার বিবাহ দিয়ে আবদ্ধ করা। বাড়ী সকলে মনে করেন আমার বিবাহ হইলেই আর আমি ভেগে যাবো না।

ঢাকা জিলার রায়পুর গ্রামে বাবার পরম মিত্র শ্রীযুক্ত বসিরখার সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে মদন মঞ্জরীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার কথা পূর্ব্বেই ঠিক হয়েছিল। মদন মঞ্জরীর যখন জন্ম হয় আর আমার যখন বয়স ৭ বৎসর সেই সময়েই এই বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বাবা, মা, বড়দাদা ও বড়দিদির মত নিয়ে মেজদাদা বিবাহের দিন ঠিক করে আসেন। তখনও আমি বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। সব আমার অগোচরে ঠিক হয়। একদিন মেজদাদা আপ্তাবুদ্দিন আমাকে বলেন তোমাকে যেতে হবে কোলকাতা শিক্ষার জন্যে। এই কথা শুনে আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম। তারপর দাদা আমাকে সঙ্গে করে রায়পুর নিয়ে গেলেন। রায়পুরাতে খুব আদর যত্ন পেলাম। রাজসিক খাওয়ার ব্যবস্থা। ৪/৫ দিন পর দাদা আমাকে বলেন তুমি যখন শিশু ছিলে সেই সময় বাবার বন্ধু বসির খাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনির সর্ব্বকনিষ্ঠ মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবার জন্য। এখন আমাদের ইচ্ছা সেই শুভ কার্য্য শেষ করে তুমি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় চলে যাবে। এই কার্য্য শেষ হয়ে গেলে বাবা ও তালইমহাশয়ের প্রতিজ্ঞা পালন হয়। এতে তোমার অমত করা ঠিক নয়। দাদার কথায় আমি অমত কিছুই করি নাই। দুইদিন পরে আমার বিবাহ হইয়া গেল। তখন আমার স্ত্রীর বয়স ৮ বৎসর। বিবাহের পরের দিন ফুলশয্যা হয় এই নিয়ম অনুসারে আমাকে ঐ শুভ রাত্রে একই ঘরে থাকতে হল। আমি যখন ফুলশয্যার ঘরে যাই তখন দেখি আমার স্ত্রীর দুই পার্শ্বে তার বৌদিরা শুয়ে আছে। আমি যখন ঘরে যাই তখন বৌদিরা চলে গেলেন। তখন স্ত্রীর কাছে যেয়ে দেখি সে অচৈতন্য হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তখন ঘরের কেওয়ার বন্ধ করে তার গলার হার ও হাতের বাজুবন্ধ, সোনার অনন্ত যা কিছু অলঙ্কার ছিল সব খুলে নিলাম। বিবাহের সময় আত্মীয় সকলে নমস্কারী দিয়েছিল এবং আমার স্ত্রীকে প্রণামী দিয়েছিল, অলঙ্কার ও প্রণামীর টাকা দুই জনের যা ছিল সব মিলিয়ে একটা পুটলা বেন্ধে নিয়ে ফুলশয্যার ঘরটা বন্ধ করে রাতারাতি নরসিবেদীতে চলে যাই। নরস্যিবদীতে ষ্টীমার স্টেশনে গিয়ে ষ্টীমারে

চড়ে নারায়ণগঞ্জ যেয়ে পৌঁছি। নারায়ণগঞ্জ হতে গোয়ালন্দের জাহাজে চড়ে গোয়ালন্দ এসে পৌঁছি। তারপর রেলে চড়ে শিয়ালদহ এসে পৌঁছি। গুরুদেবের বাসায় গিয়ে দেখি সেখানে কেহ নাই বাসায় তালা বন্ধ। তারপর রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটী যেয়ে কিরণ বাবুর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেন, হঠাৎ অসুখ হয়ে গুরুদেব মারা গেছেন। তাঁর সবকিছু টাকাপয়সা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। তাঁর কেহ ছিল না। এই সব শুনে আমার কি অবস্থা ভগবানই জানেন। আমি আকাশ হতে পড়ে গেলাম। এবং হতাশ হয়ে পড়ি। কীরণবাবু আমাকে বলেন এখন তুমি কি করতে চাও। আমি তখন বলি, আমি আর গান শিখবো না। আমি বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করিব। বেশ তাই কর। কার কাছে শিক্ষা করিব আমাকে বলে দিন। তখন তিনি বলেন বিবেকানন্দ স্বামীর ভাই হাবু দত্ত। তিনি সকল প্রকার যন্ত্র বাজাইতে পারেন। তিনি বড় দয়ালু সকলকেই তিনি বিনা পয়সায় শিক্ষা দিয়া থাকেন তুমি তিনির সঙ্গে দেখা কর। তিনির ঠিকানা নিমতলায়।

খুঁজে খুঁজে হাবুবাবুর কাছে গেলাম। তিনির কাছে আমার সব বিষয় জানালাম। তিনি বল্লেন, 'তুমি যা শিক্ষা করতে চাও আমি তাই শিক্ষা দিব।' তিনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন শ্বশুরবাড়ী হতে যে টাকা ও অলঙ্কার এনেছিলাম তাই দিয়ে মণ্ডল কোং হতে একটী বেহালা খরিদ করলেম। তিনির কাছে বেহালা ও কর্নেট শিক্ষা করতে আরম্ভ করি। ৭ বৎসর স্বর সাধনা করে ৩৬০ পাল্টা শিক্ষা করেছিলাম। এর দ্বারা আমার সুরজ্ঞান ভালরূপ হয়েছিল। বেহালা কর্নেটের প্রথম শিক্ষা করে সব পাল্টা সরগম করে বাজাতে আরম্ভ করি। ১ মাস ২ মাস অভ্যাস করেই গৎ শিক্ষা আরম্ভ করি। তিন চার মাসের মধ্যেই অনেক গৎ শিখি। আমার গুরু হাবুদত্ত মহাশয় আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হলেন। আমাকে বল্লেন তুমি একজন বড় গুণী হবে।

ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ডমাষ্টার লোবোসাহেবের কাছে কিছুদিন বেহালা ইংরাজি মিউজিক শিক্ষা করি। দরজী পাড়াতে একজন বাঙ্গালী ক্লরিওনেট বাদক ও মাষ্টার তিনি ইংরাজি মিউজিকের বড় ওস্তাদ তিনির কাছে শিক্ষা আরম্ভ করি। ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ডমাষ্টারের কাছে কি করে শিক্ষা করি তার একটী মজার গল্প। বহুবাজারে তিনির বাসা, তিনির স্ত্রী ভাল পিয়ানো বাদক ছিলেন তখন আমি বহুবাজারে জে. এন. ভট্টাচার্য্যের চশমার দোকানে থাকি। সেই দোকানের পিছন দিকেই ব্যাণ্ডমাষ্টারের বাসা। রোজই লোবোসাহেবের স্ত্রীর পিয়ানো আর লোবোসাহেবের ভায়োলিন বাজনা শুনি। তাঁরা দুজনে একই সঙ্গে বাজাতেন। রোজ ঐ বাজনা শুনে আমি পাগলা হয়ে যেতেম। রোজই সাহেবের বাড়ীতে যাই কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। মেমসাহেবকে রোজই সেলাম করি। তিনির কাছে সাহস করে কিছু বলতে পারি না। একদিন আমি বেহালা শিক্ষার জনে যাচ্ছি দেখি সাহেব ও মেম দুজনেই বসে আছে। আমি সেলাম করলাম। সাহেব কিছু বললেন না। মেমসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বেহালা কার কাছে শিক্ষা কর। আমি হাবুবাবুর কাছে শিক্ষা করি। তুমি কি বাজাও আমাকে শুনাও। আমি বেহালা খুলে সরগম ও পাল্টা অনেক প্রকার শুনালেম। মেমসাহেব বল্লেন বিউটিফুল। তুমি ভাল বাজাতে পারবে। তখন আমি মেম সাহেবকে বল্লেম ফাদার

সাহেবকে আপনি বলে দিন আমাকে ইংরাজি মিউজিক শিক্ষা দিতে। সাহেব বল্লেন আমার সময় নাই শিক্ষা দিবার। আমি বল্লেম আমার উপর দয়া করুন। তখন তিনি রেগে এসে ব্লাডি সুয়ার নিকাল যাও এই বলে মারতে এলেন। মেমসাহেব আমাকে ধরে নিয়ে বলেন তুমি দিনের বেলায় একটার সময় ভায়োলিন নিয়ে আসবে তোমাকে আমি শিক্ষা দেব। সাহেব ঐ সময় অফিসে যান। এর কাছে শিক্ষার জন্যে কিছু বলবে না। তারপর মেমসাহেবের কাছে ইংরাজি মিউজিক শিক্ষা করি।

এরপরে একজন উস্তাদ আনাই বাদক তিনির নাম হাজারী। তিনির কাছে সানাই শিক্ষা করি। নুলো গোপাল গুরুর কাছে যখন স্বরে সাধনা শিক্ষা করি তখন নন্দবাবু নামক গুরুর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা আরম্ভ করি। ৫/৬ বৎসর তাঁর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করি।

আমার কাছে পয়সা প্রায় তখন শেষ হয়ে গেছে। আমার গুরু হাবুদত্তের কাছে পয়সার অভাবের কথা জানাই। তিনি বলেন তুমি সবপ্রকার যন্ত্র বাজাতে পার। বেহালা, কর্নেট, ক্লেরিওনেট, সানাই, বাঁশী, তবলা, মৃদঙ্গ, ঢোলক তোমাকে গিরিশ ঘোষের নিকট বলে থিয়েটারে তোমার চাকরী করিয়ে দেব। হাবুদত্ত গিরিশ ঘোষের নিকট আমার বিষয় বলে থিয়েটারে আমার চাকরী করিয়ে দেন। তখন আমি থিয়েটারে চাকরী আরম্ভ করি। থিয়েটারের নাম মিনার্ভা থিয়েটার। মিনার্ভা থিয়েটারের প্রপ্রাইটার গিরিশ ঘোষ ছিলেন। তিনি বড় কবি ছিলেন। আমাকে তিনি যন্ত্র বাদকের সব কার্য্যভার অর্পণ করেন। যেখানে যে যন্ত্র বাজাতে হবে সেখানে সেই যন্ত্র বাজাতে হত। গিরিশবাবু খুব নেশা করতেন। রিহারসালের সময় একদিন আমার সব যন্ত্রের বাদ্য শুনে খুব সন্তুষ্ট হন। সন্তুষ্ট হয়ে আমার নাম রাখেন প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস। তার পর হতে প্রসন্ন নামেই থিয়েটারে চাকরী। তখন আমার খাওয়ার কষ্ট ছিল না। কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গ ভাল ছিল না। এ জন্য মনে সদা সর্ব্বদা আতঙ্ক হয়ে থাকতাম। বেশ্যা, মদখোর, একটর সবকে নিয়ে থাকতে হত। যাহোক থিয়েটারে তিন বৎসর চাকরী করে এতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি মানুষ কি করে অধপতন হয়। থিয়েটারে গান অনেক লিখেছিলাম। কনসার্টের গৎও অনেক লিখেছিলাম। নানা যন্ত্র বাজাতে পারি বলে মনে অহঙ্কার এসে গ্রাস করে ফেললো আমাকে। তখন আমি মনে করিতাম দেশে আমার মতন উস্তাদ শুনি নাই। আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণী হব। থিয়েটারে আর চাকরী করতে ইচ্ছা করে না। দেশে যাওয়ার জন্য মন চঞ্চল হয়ে পড়ে। একদিন গিরিশ ঘোষকে আমার সব বিষয়ে জানালেম। তিনি বল্লেন থিয়েটারে আগুন নিয়ে খেলা করতে হয়। তোমার যদি এসব ভাল না লাগে তবে চাকরী ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীত সাধনায় জীবন অর্পণ কর। আমি আর্শির্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

কোলকাতার উস্তাদপন্থিদের মুখে শুনেছিলাম ময়মনসিং জেলাতে মুক্তা গাছার জমিদার স্টেটে দুর্গাপূজোর সময় পশ্চিম দেশ হতে বড় বড় উস্তাদ সব আসে। আমার মন বলে আমিও একজন বড় উস্তাদ হয়েছি, 'আমিও সেখানে গিয়ে বড় উস্তাদ বলে পরিচয় দিব। আমার বাদ্য শুনিয়ে সকলকে মোহিত করিব। এই আমার মনের অহঙ্কার শয়তান চেপে বসেছে। এই অহঙ্কার নিয়ে মুক্তাগাছার মাননীয় জমিদার জগতকিশোর আচার্য্যের দরবারে

উপস্থিত হলেম। বেহালা, কর্নেট, বাঁশী ও সানাই নিয়ে উপস্থিত হলেম। জগতকিশোর আচার্যের সঙ্গে দেখা করলেম। তিনিকে জানালেম ১০—১৫ বৎসর কোলকাতায় গান বাদ্য শিক্ষা করে বড় উস্তাদ হয়ে এসেছি আপনাকে গান বাদ্য শুনাবার জন্য। তখন তিনি মুচকি হেসে বলেন নিশ্চয় তোমার গান বাদ্য শুনিব। তিনির একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন আমার থাকার বন্দোবস্ত করিতে। আমি যখন কর্ম্মচারীর সঙ্গে রওনা হলেম তিনি বলতে আরম্ভ করলেন এই ছেলেটীর মাথা খারাপ মনে হয়। আমি এসব শুনে গ্রাহ্য করলাম না। কর্ম্মচারী আমার থাকার বন্দোবস্ত করে বললে সকাল ৮টার সময় দরবার হবে সেই সময় আপনি উপস্থিত থাকবেন।

আমার জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাস

পরদিন ৮টার সময় আমি জগতকিশোর মহারাজার দরবারে উপস্থিত হলাম। দরবারে শ্রোতা মণ্ডলী ভরে গেছে। সামনে জগতকিশোর আচার্য ও তিনির পরিষদ সকলে চুপ করে বসে আছেন। আমার দুই হাতে দুই যন্ত্র নিয়ে সেখানে গিয়ে দাড়ালাম। একহাতে কর্নেট অন্যহাতে বেহালা। তারপর দেখি অতি সুন্দর একটী যুবক, চাপদাড়ী, মাথায় জড়োয়া টুপি সামনে একটা সরোদ নিয়ে সুর মেলাইতেছেন। অন্য একজন তানপুরা ছাড়ইতেছেন। সুর মেলান শুনেই আমার রোমাঞ্চ হতে আরম্ভ হল। এমন সুর জীবনে শুনি নাই। রাগটার নাম পরে জানতে পারলেম দরবারী টোরী। যখন বাজাইতে আরম্ভ করলেন নিষাদ হতে সায়েতে এক ঝঙ্কার দিলেন তখনই আমি শিউরে উঠলাম। তারপর যখন আলাপ আরম্ভ করলেন আমার কান্না আরম্ভ হল। এক একটী তান দেন আমার মনে হয় আমার পেটের ভিতরে আৎনার গুলি ছিঁড়ে ফেলছে। দরদর করে চক্ষু হতে জলের ধারা বের হতে আরম্ভ হল। শ্রোতাগন তন্ময় হয়ে শুনছেন আমার কান্না দেখে উস্তাদসাহেবেরও মন দ্রব হয়ে পড়ে। তিনির সাধ্যাতিত সুর তান দরদ মিলান বিয়োগ ভাব নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন। আমারও বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। মুক্তাগাছা এসে সরোদ শুনে আমার অহঙ্কার চূর্ণ হল। চোখের জলে স্বরোদ বাজনা জীবনে আর কখনও শুনি নাই। মনে হয় স্বর্গের বাদ্য শুনছি। ৮টা হতে একটা পর্য্যন্ত আলাপ বাজাইলেন। আমার সঙ্গে উস্তাদ ও কেন্দে কেন্দে বাজাইয়াছেন। তারপর তিনি কোল হতে সেই সরোদ নামিয়েছেন ঐ সময় দৌড়ে গিয়ে তিনির দুই পা ধরে মাথা পদতলে রেখে কাঁদতে আরম্ভ করলেম, অনেকক্ষণ পরে তিনি আমাকে ধরে উঠিয়ে বসালেন। তখন তাঁকে বললেম, 'আপনিই আমার গুরু।' এতদিন আমি গুরু পাই নাই। জগৎজননী মা আমাকে গুরু দর্শন করালেন। আপনি আমাকে শিষ্য করুন। তিনি বল্লেন নিশ্চয় তোমাকে শিষ্য করব। তখন জগত কিশোর আচার্য্য সভাসদ শোতৃবৃন্দ ও গুণীজন সকলেই আমাকে শিষ্য করার সুপারিশ করলেন। ঐ সময় ঐ সভাতেই জগতকিশোর মহারাজা আদেশ করলেন সাগরিদ করার সব সামগ্রী আনার জন্য। সব জিনিষপত্র আনার পর উস্তাদ অহম্মদ আলি খাঁ সাহেব আমাকে নাড়া বেন্ধে সাগরিদ করলেন। মাননীয় জগতকিশোর মহারাজা আমাকে একটী সরোদ দিলেন। তারপর তিনির কাছে সরোদ তিন বৎসর শিক্ষা করি।

উস্তাদের সেবার জন্য আমায় উস্তাদের রান্না হইতে যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিতে হইত।

১ নং রান্না ২ নং বাড়ীঘর ঝাটদিয়া পরিষ্কার করা ৩নং পায়খানা পরিষ্কার করা, তামাক সাজা, বাজার করা, তিনি আরাম করলে পাও দাবান, চাকরের সব কাজ। কোলকাতায় তিনির প্রায়ই মুজুরা হত। তিনির সঙ্গে তবলা সঙ্গৎ করিতাম। তারপর বেহালা বাজাইতাম। আমি নাকি শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদক, বেহালা খুবই ভাল বাজাইতাম। উস্তাদের সরোদ থেকে আমার বেহালা শ্রোতাদের খুব প্রিয় ছিল। এজন্য তিনি মুজুরা করে যা টাকা পাইতেন আমাকেও তিনি সমভাবে টাকা দিতেন।

কোলকাতায় ঘুগুডাঙ্গায় উস্তাদের বাসা ছিল। তিনি রোজই কোলকাতায় যাইতেন। গহরজান নামে একজন বড় গায়ীকা ছিলেন। এর কাছে যাইতেন। বোধহয় ভালবাসা প্রেম ছিল। আগ্রাআলিমালকা নামে আর একজন বড় গায়ীকা ছিলেন। এর সঙ্গে নাকি তাঁর প্রেম মহব্বত ছিল, সেখানেও যাইতেন। তাঁর টাকা পয়সা সমস্তই আমার কাছে রাখিতেন। যখন যা দরকার হত আমার কাছে চাহিয়া লইতেন। সরোদ শিক্ষার সময় আমি সব বাজাবার পদ্ধতি সব নিয়ম কায়দা শিক্ষার পর আমার প্রথম জীবনের শিক্ষার যে স্বরগ্রাম অলঙ্কার শিক্ষা করিয়াছিলাম সে সব সরোদে অভ্যাস করতেম। উস্তাদকে চা জলখাবার খাইয়ে ফুরসৎ পেয়ে রান্না চড়িয়ে সরোদে সব অভ্যাস করিতাম। উস্তাদ সাহেব দিনের ব্যালায় ১টার সময় আসতেন এসে খানা খেয়ে বিশ্রাম করতেন। আমি অন্য কোঠায় দরজা বন্ধ করে তিনি যা শিক্ষা দিতেন তাহা রেওয়াজ করিতাম। তারপর ৪টার সময় উস্তাদকে চা জল খাবার খাইয়ে আবার রেওয়াজ করিতাম। তিনির যদি ইচ্ছা হত আমাকে বলতেন তোমার যন্ত্র নিয়ে এস, তখন গৎ তুরা শিক্ষা দিতেন। উস্তাদ আমাকে সবরকম হিন্দুস্থানী রান্না শিখিয়েছিলেন।

তিনি বাজনা শুনে শুনে ও মুজুরার সময় বাজনা শুনে আমার মধ্যে তিনির বাজনার শক্তি আরম্ভ হয়। তিনির বাজনার নকল করতে পারতেম। তিনি যে সব রাগ মাইফেলে বাজাইতেন সে সব রাগ আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল। তিনি কোলকাতা চলে গেলে রান্না চড়িয়ে দিয়ে তিনি যা সব বাজাইতেন সব অবিকল নকল করে বাজাইতাম। লরি, লরগুথাও, তারানা এই সবও অভ্যাস করিতাম। তখন আমার গৎকারী বিলম্বিত ও দ্রুতগৎ তৈয়ার হইয়া গেছে। উস্তাদের সঙ্গে সমানে বাজাইতে পারতেম। আলাপ শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। শুনে শুনে নিজে নিজে আলাপ অভ্যাস করতেন। আমি যখন একা একা বাজাই বিলম্বিত, দ্রুত গৎ তারপর ঝালা, ঠুক তখন খুব আনন্দ পেয়ে থাকি। এজন্য খোদার দরবারে দোয়া মেঙ্গে কান্না করি। আনন্দের কান্না। খুদার দরবারে করুণা ভিক্ষা চাই। প্রভু আমার কামনা পূর্ণ কর। এই ভিক্ষা তোমার কাছে চাই। পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়াছি। স্ত্রীকেও কষ্ট দিয়াছি। সব অপরাধ আমার ক্ষমা কর।

এই উস্তাদের কাছে প্রায় তিন বৎসর শেষ হল শিক্ষা করা। একদিন আমি দরজা বন্ধ করে দরবারী টোরী আলাপ করিতেছি। উস্তাদ যে নিয়মে বাজান ঠিক সেই নিয়মে সেই রূপ নিয়ে বাজাইতেছি। কতক্ষণ বাজাইলাম তার ঠিক নাই। উস্তাদ করেছেন কি কোলকাতা থেকে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গোপনে আমার বাজনা শুনতেছেন। তাহা আমার অগোচরে।

আমার যেমন শেষ করব তখন জোরে জোরে লাঠি দিয়ে দরজা ঠুক ঠুক করে আঘাত দিচ্ছেন। তখন আমি দরজা খুলে দেখি উস্তাদ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তখন রাগে রক্তবর্ণ হয়ে গেছেন। তখন আমাকে বল্লেন, 'তুম ইয়েসব বাজানা কিস্যে শিখা হায়?' আমি বল্লেম, 'আপনার কাছে শিক্ষা করেছি।' তিনি তখন আমাকে বল্লেন, 'তুম চোর হায় হামারা বিদ্যা সব চোরী কিয়া।' আমি তখন সত্য বল্লেম, 'হুজুর আপনি এই রাগ বাজিয়ে আমাকে কাঁদিয়েছিলেন। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন। এইরূপ রাগ আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। আপনার কাছে যখন এই রাগ শুনেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল এই রাগ স্বর্গের। আপনার বাদ্য বেহেস্তের বাদ্য।' তখন তিনি একটু শান্ত হয়ে এসেছেন। তারপর আমি বল্লেম, 'এইরূপ বাজাইলে যদি আপনার কষ্ট হয় তবে কখনও এই রাগ বাজাইব না। আলাপ বাজনা আপনি যা শিক্ষা দিবেন তাহাই রেওয়াজ করিব।' তারপর থেকে আমাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হল না বলে মনে হতে লাগলো। একদিন আমাকে বল্লেন, 'আমি দেশে যাবো, তোমাকেও নিয়ে যাবো। দেখবে সেখানে বড় বড় গুণী আছেন। প্রায় ৭শত গুণী নবাবের কাছে চাকরি করে। সকলের উপর বড় একজন উস্তাদ আছেন তিনির নাম উস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব। এর মত উস্তাদ হিন্দুস্থানে দ্বিতীয় নাই।' সব জিনিষপত্র গোছ-গাছ করে পেক করে ফেল। প্রথমে পাটনা যাবো নবাবের কাছে তারপর বেনারস। তারপর বাটীতে। উস্তাদের বাটী হল রামপুর, ইউ, পিতে। উস্তাদ যে সব টাকা পয়সা আমার কাছে দিতেন সেই সব পুটলা বেন্ধে রাখতেম। আমাকে একটী ট্রাঙ্ক দিয়েছিলেন টাকা পয়সা রাখার জন্য। তাতেই সব রাখতাম। দুইদিন পর আমরা যাত্রা করলেম। প্রথমে গেলাম পাটনায় নবাবের বাটীতে। সেখানে একমাস ছিলাম। রোজ বাজনা হত। আমি তবলা সঙ্গত করিতাম উস্তাদের সঙ্গে। নবাবকে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার শিষ্য আলাউদ্দিন। সরোদ শিক্ষা করে। সব প্রকার যন্ত্র বাজাতে পারে। বেহালা খুব ভাল বাজায়। নবাব আদেশ করলেন এর সরোদ ও বেহালা শুনবো। উস্তাদের সঙ্গে সরোদ বাজাইলেম। নবাব খুব সন্তুষ্ট হলেন। তারপর দিন শুধু শুনলেন। বেহালা শুনে বললেন এরূপ বেহালা আমি জীবনে শুনি নাই। উস্তাদের কাছে শিক্ষা করার পর হতে তিনির বাজাবার পদ্ধতিতে বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করি। বেগম সাহেবারা পরদার আড়াল হইতে পত্র লিখে পাঠান নবাব সাহেবের কাছে আমার বেহালাই শুনিবে। নবাব বাহাদুর আমার উস্তাদকে বলেন, 'বেগমসাহেবা বেহালা শুনে খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। বেহালা আরো শুনতে চান।' তারপর সমস্ত রাত্র বেহালা বাজান হয়। ভৈরবী বাজিয়ে শেষ করি। সেখানে উস্তাদকে ২০০০ আর আমাকে ১০০০ টাকা দিলেন। সেখান থেকে আমরা কাশী আসি। কাশীতে একমাস থেকে দুই, তিন হাজার টাকা উপায় করে রামপুর আসি। উস্তাদের খোলার কাঁচা বাড়ী। উস্তাদের বাড়ীতে রাত্র বাস করি। পরের দিন সকালে উস্তাদের বাড়ীতে উস্তাদ আমাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে উস্তাদের মা বাবাকে প্রণাম করলেম। তিনিরা তখন প্রাচীন বুড়া হইয়াছেন অতি সজ্জন লোক। আমাকে সঙ্গে নিয়া চা নাস্তা খাওয়ালেন। উস্তাদের পিতার নাম আবেদ আলি খাঁ। নাস্তা খাওয়ার পরে আমি বল্লাম, 'হুজুর যতদিন থেকে আপনার কাছে আছি আপনার

সব জিনিষের ও টাকা পয়সার জিম্মাদারী সব আমার উপরে দিয়েছেন। আপনার মজুরা করা ও বেতনের টাকা সব আমার কাছে দিয়াছেন তাহার কোন হিসাবপত্র নেন নাই ও জিজ্ঞাসাও করেন নাই।' উস্তাদ বল্লেন, 'আমি যা উপায় করেছি তা সবই তো আমার খাওয়া খরচে ব্যয় হয়। তোমার পূবের্ব যতগুলি চাকর ছিল এরা আমাকে মাঝে মাঝে হিসেব দিয়েছে। সব টাকা আমার বাসা খরচ আর খাওয়াতে শেষ হয়ে যায়। সেইজন্য তোমার কাছে হিসাব চাই না। তুমি তো আমার চাকর নও। তুমি আমার সাগরিদ। এই জন্যই হিসাব নেই নাই।' আমি তখন বলি আপনি যে আমাকে ট্রাঙ্ক দিয়াছিলেন সেই ট্রাঙ্কেই আপনার টাকা পয়সা জমা আছে। তখন তিনি বলেন ট্রাঙ্ক নিয়ে এস। ট্রাঙ্ক এনে উস্তাদের পিতামাতার সামনে রাখি এবং ট্রাঙ্ক খুলে পুটলাগুলি সব বাহির করি। পুটলি সব হতে টাকা বাহির করে দশহাজার টাকা হল। তারপর তিনির পিতা এসে আমাকে দুই হাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলেন তুমি কোন ছেলে। তুমি অতি বড় গুণী জ্ঞানী হবে। তিনির মা ও এসে আমার মাথায় ধরে আশির্ব্বাদ করলেন দীর্ঘজীবি হও। তারপর উস্তাদকে বল্লেন, 'তুমি বলেছিলে আলাউদ্দিন বড় চালাক ধূর্ত, তার মত কোন লোক তো আমি জীবনে দেখি নাই। ওকে আমার কাছি রাখিব। আমি শিক্ষা দিব।'

আমার কাছে ১০ হাজার টাকা পেয়ে আর উস্তাদের কাছে ও ৪—৫ হাজার টাকা ছিল এই সব মিলিয়ে ১৫ হাজার টাকার মত হল। ঐ টাকা দিয়ে পাকা বাড়ী তৈরী করা ঠিক হল। তারপর গাড়ী ভরে ইট, সুরকী—চুনা আসতে আরম্ভ করল। তখন উস্তাদের আদেশ হল ইটাগুলো গাড়ী থেকে নামিয়ে থাক দিয়ে রাখার জন্য। আমি ও তাই করতে আরম্ভ করি। ছয়মাস পর্যন্ত এই সব কাজ করে আমার শুল ব্যারাম হয়ে গেল। সেই ব্যারামে বহুদিন ভুগেছি, উস্তাদের বাড়ী তৈরী যতদিন হয় নাই ততদিন কুলী মজুরের সঙ্গে ইটের বোঝা সুরকী চুনের বোঝা বইতে হয়েছে। উস্তাদের বাড়ী তৈয়ারী হওয়ার পর উস্তাদ আহাম্মদ আলি খাঁ কোলকাতায় চাকরীতে চলে যান। ঐ সময় হতে তিনির কাছে শিক্ষা করা আমার জীবনে শেষ হয়।

উস্তাদের বাড়ীর কাছেই মহল্লা রাজদুয়ারায় আটআনা ভাড়ায় একখানা ছোট ঘর ভাড়া নিলাম। সেই ঘরে থাকি আর উস্তাদের বাড়ীতেই দুইবেলা খাই। কিন্তু এদের খাওয়া হয় গো মাংস রান্না করা তরকারী। আমি গো মাংস খাই না সেইজন্য মাসকলাইয়ের ডাল ও দুইটা রুটী খাইতাম। আমি যখন শুলের ব্যাথা নিয়া ২৪ ঘণ্টা ভুগতাম ডাক্তারী ওযুধ খাইতাম কিন্তু কোন উপসম পাই নাই। তারপর হেকিমা চিকিৎসা করে কিছুটা ফল পাই। কিন্তু রুগীর উপযুক্ত পথ্য পাই না বলে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে পারি নাই। ব্যাথা নিয়াই উস্তাদের বাড়ীর সব কাজ করতে হত। আমার কাছে পয়সা নেই সেই জন্য নিজের ইচ্ছামত কিছু খেতে পেতাম না। উস্তাদের পিতা মহাশয়ের আমাকে শিক্ষা দিবার বিশেষ আগ্রহ দেখতাম না। শরীরও ভাল না। শিক্ষারও বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছি না এজন্য কান্না করতেম। খুদার কাছে প্রার্থনা করতেম। প্রভু এখন আমি কি করব। রাস্তা দেখিয়ে দাও। আমার বাসার কাছেই মসজিদ ছিল। সেখানেই পড়ে থাকতাম ও কাদতেম। রামপুরে বহু

গুণীজন ছিল এদের কাছে যেতে আরম্ভ করলেম। কেহই শিক্ষা দিতে চায় না। উস্তাদপন্থীরা বলে বিনা পয়সায় আমরা শিক্ষা দিই না। মাসিক ১০০ টাকা যদি দিতে পার তবে শিক্ষা দিব নচেৎ নয়। প্রায় সকল উস্তাদের কাছে গিয়ে বিমুখ হলেম। এর জন্য বড় দুঃখিত হয়ে পড়লেম। রাত্রদিন কান্না ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কেন্দে কেন্দেই ২৪ ঘণ্টা কাটিয়েছি। একদিন উস্তাদের পিতা আবেদ আলি খাঁ সাহেব এসে বল্লেন, 'বেটা আমার কাছে যা ছিল তাহা সবই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি এখন তুমি অন্য উস্তাদের কাছে শিক্ষার বন্দোবস্ত কর।' এই কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লেম। হতাশ হয়ে পড়ি। উস্তাদের বাড়ীতে যা খেতে পেতাম তাহাও বন্ধ হয়ে গেল। তারপর থেকে উপবাস আরম্ভ হয়ে গেল। দুই দিন, তিন দিন জল খেয়ে রইলেম। রামপুরে পাঠান ও মুসলমান সমাজে এমন নিয়ম পালন করে থাকে যদি কেহ উপবাস থাকে নিজেই না খেয়ে উপবাসী ব্যক্তিকে খাইয়ে দিবেন। এ জন্য ১দিন ২দিন পর পর একবেলা খুদার ওপর গায়েবি খাওয়া খেতে পেতাম। এই অবস্থায় দুইমাস কাটাইলাম। তারপর মনে বল শক্তি দিয়ে উজীর খাঁ সাহেবের বাড়ীর গেটে রোজ যাইতাম। কিন্তু গেটের পাহারাওয়ালা সান্ত্রী গেটের ভিতরে যেতে দিত না। দুইমাস পর্যন্ত রোজ যেয়ে যেয়ে নিরাশ হয়ে আসতে হল।

উজীর খাঁ সাহেবের কাছে দেখা করা ও শিক্ষার ইতিহাস

উজীর খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় কারণ মনের কষ্টে দারুণ অস্থির হয়ে আমার কাছে একটা টাকা ছিল তাই দিয়ে দুই তোলা আফিম কিনে নিলাম। আফিম খেয়ে প্রাণ দেব। এই মুখ বাংলাদেশে দেখাবো না। ২ তোলা আফিমের গুলি নিয়ে মসজিদে হতাশ হয়ে বসে আছি। এমন সময় যিনি নমাজ পড়ান মৌলবী তিনি এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি এমন হতাশ হয়ে বসে আছ কেন? তখন আমি সব সত্য কথা তিনিকে জানাইলাম। আমি আফিম কিনেছি প্রাণ দেবার জন্য। তখন মৌলবী সাহেব আমাকে বল্লেম, 'নিজের হাতে প্রাণ দেওয়া মহাপাপ। হিম্মতে মর্দ্দা, মদতে খুদা। খুদা বলেন হে মানব হিম্মৎকর তুমার পিছনে আমি আছি। চেষ্টা কর কার্য্য সিদ্ধি হবে।' মৌলবী আমাকে ধরে নিয়ে মসজিদে বসালেন। আমাকে কিছু খেতে দিলেন। তারপর রামপুরের নবাব বাহাদুরের নিকট আমার তরফ হতে একখানা আর্জি লিখে দেন। আমি ত্রিপুরা হতে এসেছি আপনার দরবারে, বড় উস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব আছেন তিনির কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য বহু কষ্ট করে এসেছি। ছয়মাস যাবত তিনির গেটে যাই। সান্ত্রীরা আমাকে যেতে দেয় না। এই দুঃখ করে ২ তোলা আফিম কিনেছি প্রাণ দেবার জন্য। আপনি যদি আমার শিক্ষার প্রবন্ধ না করে দেন তবে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করিব এই আমার শেষ চেষ্টা। আফিম আমার জামার পকেটে মজুদ আছে। এইভাবে আর্জ্জিখানা লিখে মৌলবী সাহেব আমার হাতে দিয়ে বলে দিলেন যে সময় নবাব হাওয়া খেতে বাহির হবেন সেই সময় রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়াবে। আরজিখানা ভাজ করে পকেটে রেখে দুইবেলা সকালে বিকালে যাই নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হয় না। একমাস গত হল। একদিন তিনি ক্লাবে যাচ্ছিলেন উজীর খাঁ সাহেবের লিখিত নাটক দেখার জন্য, সেই সময় আমি রাস্তা বন্ধ করে দুইদিকে দুই হাত ফেলিয়ে দাঁড়াই। তারপর পুলিস এসে

আমাকে ধরে ফেলে। পুলিসের গোলমাল শুনে ড্রাইভার মটরকার চালান বন্ধ করে দেয় তখন নবাব বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন মটর কেন বন্ধ হল। পুলিস সুপাররেন্ট এসে স্যালাউট দিয়ে বলে এক বাঙ্গালী সজ্জন রাস্তা বন্ধ করে বলে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তখন নবাব বাহাদুর বলেন বাঙ্গালীকে নিয়ে এস। নবাব বাহাদুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর আমি আরজিখানা ও আফিমের গুলি দুইটা সেলাম করে নবাবের হাতে দিলাম। প্রাইভেট সেক্রেটারি সঙ্গে ছিল তিনিকে বল্লেন আরজি পড়ে শুনাও। আমার আরজি শুনে নবাব তখন প্রাইভেট সেক্রেটারি ও হোম সেক্রেটারিকে বলেন এই বাঙ্গালীকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। আজ থিয়েটারে যাবো না। তোমরা সকলকে থিয়েটার দেখিয়ে নিয়ে আসবে। উজীর খাঁ সাহেবকে সঙ্গে করে আমার কাছে আনিবে। তখন নবাব বাহাদুর আমাকে সঙ্গে নিয়ে হামীদ মঞ্জীলে পৌঁছিলেন। নবাব বাহাদুরের নাম নবাব হামিদ আলি খাঁ। তিনির নামেই প্যালেসের নাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন তুমি কি শিক্ষা করেছ। আমি বল্লেম ৭ বৎসর সুর শিক্ষা করেছি গান শিক্ষা করার জন্য। ৭ বৎসর পর গুরু মারা জান। গুরুর নাম নুলো গোপাল ছিল। তারপর বেহালা, কর্নেট, ক্লেরিওনেট, সানাই, সরোদ শিক্ষা করেছি। তোমার সঙ্গে কি কি যন্ত্র আছে? আমি বল্লেম, বেহালা আর সরোদ। যাও যন্ত্র নিয়ে এস। মটর দিলেন আমি শীঘ্র যন্ত্র নিয়ে এলাম। নবাব বললেন সুর সাধনা কি প্রণালীতে করেছ আমাকে সব শুনাও। গলাতে গেয়ে স্বরগ্রাম পাল্টা শুনালেম। এইসব শুনে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন। তুমি নিয়ম অনুসারে শিক্ষা পেয়েছ। তোমার সুর জ্ঞান হয়ে গেছে। এখন বেশ শিক্ষা করিতে কষ্ট হইবে না। তারপর বল্লেন 'সরোদ বাজাও।' সরোদে ইমন আলাপ করে জোড় বাজিয়ে ঝালা ঠুক লড়ি সব বাজাইলাম। সরোদ শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। নবাব বাহাদুর উজীর খাঁ সাহেবের প্রধান ছাত্র, মহাগুণী, দশহাজার ধ্রুপদ শিক্ষা করেছেন। খুব বড় গায়ক তিনি। বীণা শিখছেন। আমি যা বাজালেম সব নিয়মমত বিচার করে আমাকে ভাল বল্লেন। তারপর বেহালা বাজাতে বললেন। বেহালা শুনে বললেন এইরূপ বেহালা হিন্দুস্থানে কোথাও শুনি নাই। ইউরোপে শুনেছি ইংরেজী বেহালা। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা যে এরূপ বাজাতে পারে তোমার হাতেই শুনলাম। তারপর উজীর খাঁ সাহেব এলেন সেক্রেটারির সঙ্গে। নবাব বাহাদুর দাড়িয়ে তিনির তাজিম অভ্যর্থনা করলেন। উস্তাদকে বসিয়ে বল্লেন, 'এই বাঙ্গালীবাবু আমাকে আপনার থিয়েটারে যেতে দিল না। দেখুন সে আফিম কিনেছে আপনি যদি তাকে শিক্ষা না দেন তবে আফিম খেয়ে প্রাণ দিবে।' খাঁ সাহেব বল্লেন, 'সেক্রেটারির কাছে সব শুনেছি।' নবাব বাহাদুর বল্লেন, 'যা কিছু এই বয়সে শিক্ষা করেছে সব নিয়মমাফিক শিক্ষা পেয়েছে। আমি সুপারিশ করছি একে আপনি সাগরিদ করে শিক্ষা দিন।' তখন উস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব রাজি হলেন। ঐ সময় নবাব বাহাদুর আদেশ দিলেন শিষ্য করার সকল সামগ্রী আনয়ন করুন। আদেশমত এসে গেল। তারপর উস্তাদ সাহেব আমার হাতে গাণ্ডা বাঁধলেন। ২ জোড়া কাপড় মন্দিলা বড় বড় সোনার থালে সব এসেছে। সব থালা গুরুদেবের কাছে নজর করা হল। আমার জন্য নবাব বাহাদুর এসব করলেন। আমি উজীর খাঁ সাহেবের সাগরিদ হলাম। আমার জীবন ধন্য হল।

আমার থাকবার জন্য উজীর খাঁ সাহেবের বাড়ীর নিকট একটা বাড়ী দিলেন নবাব সাহেব। নবাব বাহাদুর খাঁ সাহেবকে বলেন ও বীণা শিক্ষা করতে চায়। উস্তাদ বললেন বীণা আমার বংশের পুত্র বা নাতী ছাড়া কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া হয় না। উহাকে সরোদ রবাব, সুর শৃঙ্গার এসব শিক্ষা দিব। আমি হাতজোড় করে বললাম বীণা আমি শিক্ষা করবি না। সরোদ, রবাব, সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করিব। নবাব বাহাদুরের কৃপায় উস্তাদের সাগরিদ হওয়ার পর অন্য সকল উস্তাদই আমাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। যার কাছেই যাই সকলেই আদর করিতে লাগলেন। আমার কাছে টাকা পয়সা নাই কি করে খাব এই হল প্রধান চিন্তা। স্টেটে একটা স্ট্রীং ব্যাণ্ড ছিল সেখানে যেতে আরম্ভ করলেম। ব্যাণ্ড মাষ্টার ছিলেন লখেনউ এর বড় ধ্রুপদ গায়ক খলিফা দৌতল খাঁ, ছেলে দুলি খাঁ ছিলেন উয়াজদালী নবাবের সভাসদ বড় গায়ক। তিনির কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বেহালা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আমাকে ১২ টাকা বেতনে চাকরী দিলেন বেন্ডে বেহালা বাজাবার জন্য। যা হোক দুইবেলা খাওয়ার মত সংস্থান হল। সকালে খেয়ে দুঘণ্টা বাজাতে হত। ১২ টাকা বেতন হতে ৫ টাকা একজন উস্তাদকে দিতাম তিনি আমাকে ধ্রুপদ, ধামার, হুরি, দাদরা, তারানা শিক্ষা দিতেন এবং পুরান বান্দিসের গৎ শিক্ষা দিতেন। তিনি খুব প্রবীণ উস্তাদ ছিলেন। আমার উপর দয়া করে আমাকে শিক্ষা দিতেন। আমি যা কিছু বাজাই তিনির শিক্ষার প্রভাবে। তিনির পুত্র সন্তান ছিল না বলে তিনির স্ত্রী আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনির বাড়ী লেপে পুছে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করতেম এবং অন্য সব কাজ করতেম। তিনি হলেন কুতুবদৌলার শিষ্য ও মেয়ের জামাই।

উজীর খাঁ সাহেব আমাকে শিষ্য করার পর আমাকে ভুলে যান। আমি রোজ সকালে ছয়টা হইতে ১০টা পর্যন্ত গেটের সামনে গিয়ে দাড়িয়ে থাকতেম। ভিতরে তিনির যাওয়ার আদেশ ছিল না। এ জন্য বেলা একটার সময় সরোদ নিয়ে মহম্মদ হুসেন খাঁ কাছে যেতেম। তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেন। ব্যাণ্ডমাষ্টার রাজা হুসেন খাঁ বড় ধ্রুপদের উস্তাদ ছিলেন। তিনির কাছে ধ্রুপদের খাজানা ছিল। তিনি ও আমাকে অনেক ধ্রুপদ শিক্ষা দিয়াছেন। সেতারের উস্তাদ হাফিজ খাঁর ভাই করিম খাঁ এদের কাছেও সেতারের অনেক তালিম, গৎ, তুরা শিক্ষা করেছি। উজীর খাঁ সাহেব যতদিন আমাকে শিক্ষা দেন নাই ততদিন গোপনে এদের কাছে শিক্ষা করিতাম। এই শিক্ষার দরুন মন সন্তুষ্ট থাকিত। আড়াই কিম্বা তিন বৎসর রামপুরে এসেছি এই প্রকারে শিক্ষা করেছি।

এখন আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছু লেখা

আমার বিবাহ হয়েছে প্রায় পনের বৎসর গত হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী তখন পূর্ণ যৌবনা। তখন আমার শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজনেরা পরামর্শ করে ঠিক করে আমার স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ দেবার। আমার তখন কোন খোঁজ খবর নাই। আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি। আমার স্ত্রীর বড় তিন ভাই মনে করলেন আমি মরে গেছি নচেৎ গান বাজনার কারণে কোন বেশ্যার পাল্লায় পড়ে খারাপ হয়ে গেছি। এ জন্য সকলেই চিন্তা পরামর্শ করে ঠিক করলেন আমার স্ত্রীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দেবেন। বিবাহ দেবার জন্য পাত্রও ঠিক হয়ে গেছে। তখন

আমার স্ত্রী মনে করলেন আত্মহত্যা করব। আমার শ্বাশুড়ী মায়ের সঙ্গেই সে শয়ন করত। একদিন রাত্রে সে করলো কি ঘরের তারের মধ্যে দড়ি বেন্ধে ফাঁসি লাগালে। ফাঁসি লাগাবার সময় ঝটকা লেগে জোরে শব্দ হল। এই শব্দ শুনে শ্বাশুড়ী মা দেখেন আমার স্ত্রী গলায় ফাঁসি লাগাচ্ছে। তখন তিনি চিৎকার করে উঠলেন। সেই চিৎকার শুনে আমার শালা সম্বন্ধীরা ছুটে এসে আমার স্ত্রীকে ফাঁসি হতে রক্ষা করেন। তখন ওর ভাইরা সকলে আমার স্ত্রীকে বলে কেন ফাঁসি লাগাচ্ছিলে। আমার স্ত্রী বলে আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয়বার আমার বিবাহ হইতে পারে না। স্ত্রী জাতির বিবাহ একবারই হয়। দুইবার হতে পারে না। তখন আমার স্ত্রীর ভাইরা বলেন মুসলমানের মেয়ের পাঁচবার বিবাহ হতে পারে ইসলামধর্ম্মে সেই নিয়ম আছে। আমার স্ত্রী বলেন আমি আর বিবাহ করিব না। আমার যদি ভাগ্যে থাকে, মাথার সিন্দুরের জোর থাকে তবে আমার স্বামী ফিরে আসবে। তখন আমার স্ত্রীর ভাইরা বলে জোর করে বিবাহ দেবে। তারপর আমার স্ত্রী উপবাস করতে আরম্ভ করে। সমানে ৮ দিন উপোস করে তখন সকলে মত করে আমার স্ত্রীকে আমাদের বাড়ীতে রেখে আসবে। আমার পিতামাতা আমার স্ত্রীকে পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন। আমার মা ও বাবা আমার স্ত্রীকে বলে বৌমা তুমিই আমার হৃদয়ের ধন আলাউদ্দিন। শ্বশুর বাড়ীর সকলে বলে গেল আমাদিগকে যে অপমান করে তার মুখ আর জীবনে দেখবো না। তখন বাবা ও মা মেজদাদাকে ডেকে এনে বলেন তোমরা কি আলাউদ্দিনের খোঁজ খবর নেবে। যদি ফাঁসি লাগিয়ে মরে যেত তোমাদের মুখ লোককে কি করে দেখাতে। তারপর সকলে পরামর্শ করে উস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবকে টেলিগ্রাম করে জানালেন, আলাউদ্দিনের স্ত্রী ফাঁসি লাগিয়েছিল ফাঁসি হতে বেঁচে গেছে। দয়া করে আলাউদ্দিনকে পাঠিয়ে দিন। তখন উজীর খাঁ সাহেবের শিষ্য হয়েছি প্রায় আড়াই বছর হল। উস্তাদ শিষ্য করে আমাকে ভুলে গেছেন। মেজদার টেলিগ্রাম পেয়েই তিনির চৈতন্য হল। আমার কথা যখন স্মরণ হল তাঁর তিন ছেলেকে ডাকলেন। বড় ছেলের নাম পিয়ার খাঁ, মেজ ছেলের নাম আচ্ছা ছাহাব, ছোট ছেলের নাম ছুটে ছাহাব। এদের ডেকে বলেন বাঙ্গালী আলাউদ্দিন কোথায়? তখন তিনির ছেলেরা বলে আলাউদ্দিন রোজ সকালে এসে দাড়িয়ে থাকে সকাল ৬টা থেকে ১টা পর্যন্ত। তারপর ব্যাণ্ডে চলে যায়। বিকালে ও এসে দুই ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকে। তখন গুরুদেব বল্লেন, 'তোমরা কেন তাকে শিক্ষা দাও নাই।' তখন তারা বলে আলাউদ্দিন আমাদিগকে আদেশ করে নাই। তখন তিনি বল্লেন, 'আলাউদ্দিনকে ডেকে নিয়ে এস।' তিনির মেজ ছেলে যেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে আসে। আমি এসে তখন গুরুদেবের পায়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেম। তখন তিনি আমাকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বল্লেন, 'তোমার কোন চিন্তা নাই খুদার উপর থেকে তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। যতদিন তোমার শিক্ষা হয় নাই তাহা অল্প দিনেই পূর্ণ করে দেব।' তখন গুরুদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার পরিবারে আত্মীয় স্বজন কে কে আছে আমাকে সব সত্য করে বল। তখন আমি বলি আমার পিতা, মাতা, পাঁচ ভাই ও দুই বোন আছে। তিনি বলেন বিবাহ করেছ। আমি মাথা নত করি। তুমি বাড়ী যেতে ইচ্ছা কর কি? আমি বলি আমার শিক্ষাও কিছুই হয় নাই কি করে বাড়ী যাব। যখন বিদ্যা শিক্ষা করে

মানুষ হব তখন আপনি আদেশ করলে যাব নচেৎ নয়। তখন তিনি বল্লেন, 'তোমার উপর বড় অন্যায় করেছি। তুমি যে দিন ভাল বাদক হবে সেই দিন আমার অন্যায়ের ক্ষমা হবে।' তুমি বলেছিলে তোমার দেশের রাজার দবরারে বীণা, রবাব বাজে, কে বাজায় তিনির নাম বলতে পার। আমি বলি কাশেম আলি খাঁ। আরে বল কি? কাশেম আলি খাঁ আমার ছোটমামা।

তিনির কাছে আমার বাবা বহুদিন শিখেছেন। বাবার সেতার শুনে শুনে আমার সঙ্গীত শিকার ইচ্ছা হয়। তিনি বলেন তাহলে তোমার বাবা আমাদের ঘরের সাগরিদ। যাহোক তুমি এসে এখন ঠিক জায়গায় পৌঁচেছ। তোমার মনস্কামনা খোদা পূর্ণ করবেন। আজ থেকে তুমি আমার চতুর্থ পুত্র। তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করবো না। আমার ঘরের বিদ্যা সবই তোমাকে দিব। বীণা শিখতে চাও তাই শিক্ষা দিব। বললেম বীণা অমি শিখব না। আমি সরোদই শিখবো। যদি সরোদ শিক্ষা করিতে পারি তবে পরে রবাব সুরশৃঙ্গাররের তালিম দিবেন। গুরু বলিলেন সব শিক্ষা দিব। আমার ছেলেরা আমীর হয়ে গেছে কিছু করে না এ জন্য আমার ঘরের তালিম তোমাকে দিব আর কাহাকেও না। তারপর থেকে আমার শিক্ষা আরম্ভ হল, গোপনে শিক্ষা দিতেন। আমাকে যখন শিক্ষা দিতেন তখন নিষেধ করে দিতেন অন্দরে কেহ না আসিতে পারে। আমি প্রাণপণে শিক্ষা করতেম। ২০ বৎসর রাত্রে ঘুমাই নাই। সমস্ত রাত্র সন্ধ্যা সাতটা হতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত রেওয়াজ করতেম। তিনির ছেলেদের সঙ্গে ধ্রুপদ, হুরি, দাদরা, তেরানা, চতুরং গান শিখতাম। সরোদ, রবাব, সুরশৃঙ্গার পৃথক শিক্ষা করতেম। সমানে ৩৩বৎসর তিনির কাছে শিক্ষা করি। শিক্ষা করার পর গুরুদেব আদেশ করলেন শিক্ষা দীক্ষা পরীক্ষা কর। তুমি ভারতবর্ষে সব ষ্টেটে যাও বড় বড় গুণী আছে তাদের তোমার বাজনা শোনাও। শুনিয়ে পরীক্ষা দাও। যেখানে দেখবে তোমার বাদ্য থেকে বড় গুণী আছে ঐ গুণীর কাছে শিক্ষা কর। তারপর দেখ তোমার রাগ রাগীনি ওন্য গুণীর রাগ, রাগীনি শুন কারটা ভাল পরীক্ষা কর। এই হল শিক্ষা দীক্ষা পরীক্ষা। তখন আমাকে দেশ বিদেশ ভ্রমণের আদেশ করলেন। গুরুর আদেশ নিয়ে প্রথমে এলেম কোলকাতায়। সেখানে দেখলাম সব গায়ক বাদক হুজুগি। কারো সঙ্গেই কারো মিল নেই। দলাদলি, নিন্দা, চর্চা নিয়েই বাঙ্গালী উস্তাদ হিন্দুস্থানী উস্তাদ সকলেই হামবড়া নিয়েই ব্যস্ত। এই জন্য কোলকাতা ছেড়ে মাইহার আসি। মাইহারের মহারাজা আমার কাছে শিষ্য হল ও আমাকে চাকরী দিল। গুরুর আদেশ নিয়েই চাকরী আরম্ভ করি। তারপর পিতামাতা ভাই ভগ্নী স্ত্রী সকলরে কাছে উপস্থিত হই। সংসার গৃহস্থ আশ্রম করি। তখন আমার ৪৫-৫০ বৎসর বয়স। পিতা মাতার স্বর্গবাস হল। তারপর জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে মাইহারে এসে সংসার গৃহস্থ জীবন যাপন আরম্ভ করি।

মাইহার মহারাজা অতি সম্মান আদর দিয়ে আমাকে রাখলেন। মাইহারে ২২ বৎসর পর্যন্ত্য গান শিক্ষা করেছেন। তারপর আমার জীবন দান করলেম শিক্ষার্থীদিগকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দান করা। যারা গরীব তাদের অন্ন দিয়ে অন্নশিক্ষা দেওয়া। ৪৬ বৎসর পর্যন্ত্য এই সেবা করে যাচ্ছি।

তারপর খুদা ভগবান তিনটী মেয়ে ও একটী ছেলে দান করেছেন। ৪টী সন্তান থেকে একটী নিয়ে নিলেন। এখন তিনটী আমার।

ছেলের পক্ষ থেকে—

ছটী নাতী ও ৩টী নাতনী খুদা দান করেছেন। খুদার আশিস দান পেয়েছি, আশির্ব্বাদ করি আমার সন্তান সন্ততি চিরজীবি চিরসুখী হক।

ইতি—।।

৬৩

এখানে ইতি শব্দটা যেন কমার জায়গায় ফুল স্টপ। কিন্তু স্মৃতির উপর ভরসা করে সেই সব কথাগুলো লিখলাম না এখানে যেগুলো এডিটেড হয়েছে। বাবার লেখাটা পড়েই অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'কি রকম বাজনা হোল? কি রাগ বাজিয়েছেন?' উত্তরে বললাম, 'আপনিও দেখছি বাবার মত পরীক্ষা করছেন? কি ছাতার বাজনা বাজিয়েছি যে বলবো, 'কেমন হলো? যাক কাল আপনার কাছে শিখতে আসব। আজ আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।' এই বলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষাঙ্কর' সব ঘটনা বললাম। চুপ করে সব শুনে বললেন, 'আপনি কেন এই সব লোককে বিশ্বাস করেন? আসলে আপনি লোক চিনতে পারেন না। দুটো মিষ্টি কথা বললেই নিজের লোক বুঝে বিশ্বাস করেন।' বললাম, 'বিশ্বাস করার মধ্যেই উদারতা প্রকাশ পায়। আপনি যে বললেন, মিষ্টি কথা বললেই নিজের লোক বুঝে বিশ্বাস করি, মোটেই সেটা সত্য নয়। বাবার কাছে বরাবর দেখেছি, কেউ মিষ্টি কথা বলে প্রণাম করতে গেলেই বাবা বলতেন, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। আমাকে বলতেন ভেদ লাগাও। এ ছাড়া লোক চেনা কি এতই সহজ? নিজেকেই কি চিনতে পেরেছি?' আমার কথা থামিয়ে বললেন, 'কাজের কাজ নয়, কেবল বড় বড় দার্শনিকের কথা বলতে পারেন।' বললাম, 'দেখুন মায়ের পেট থেকে পড়েই কেউ শেখে না। কেউ দেখে শেখে। কেউ পড়ে শেখে। কেউ শুনে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। আমি ঠেকে শিখলাম, কেননা এই বিষয়টা আমার কাছে নূতন। তাছাড়া বিশ্বাস করে ঠকা ভাল কিন্তু যে ঠকায় সে অনুতাপে ভোগে। আসলে কি জানেন, বিশ্বাস করে ঠকলেও, নিজের মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনা থাকে। যাক এর চেয়ে বেশী কিছু বলব না। বাবা আমাকে বলতেন, 'মহা মূর্খ পণ্ডিত।' আমার কথা শুনে বললেন, 'মুখে বড় বড় তত্ত্ব কথা বলেন অথচ বাজাবার যন্ত্রে এই তত্ত্ব অভিব্যঞ্জিত হলে তাহলে তো সাধনা সম্পন্ন হ'তো।' বললাম, 'চেষ্টা চালাচ্ছি।' আমার কথা শুনে হেসে বললেন, 'যাই বলুন আপনি লোক চেনেন না।' যদিও মনে মনে বুঝি উনি ঘর পোড়া গরু। সিন্দুরে মেঘ দেখলেই ডরানটাইতো স্বাভাবিক। আমি বিশ্বাস করে এমন কি হারিয়েছি? উনি তো বিশ্বাস করে ওনার জীবনটাই হারিয়েছেন। যার ফলে গোলাপ শব্দটি শুনলেই তাঁর মনে পড়ে কাঁটার কথা। চাদের উল্লেখে মনে পড়ে কলঙ্কের কথা, আর সূর্যাস্তের প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁর মনে পড়ে মশার কথা। আমার স্পর্শকাতর মনটা এক উপলব্ধিতে থেমে গেল। আমার সঙ্গে ধোঁকা হয়েছে বলেই বলেছেন, আমি লোকের মিষ্টি কথায় সব ভুলে যাই। প্রতিবাদ করে যদিও বলেছি, আমি ভুলি না আমি কার

ছাত্র। বাবা প্রশংসা বা মিষ্টি কথা শুনলেই বলতেন, 'অত বিলই দণ্ডবত কেন?' অর্থাৎ বিড়ালের স্বভাব, ধীরে ধীরে এসে মাছ চুরি করে দুধ মাছ সব খায়। সুতরাং বাবার কাছে দীর্ঘদিন থেকে, আমিও কারো মিষ্টি কথায় উচ্ছ্বসিত হই না। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর মন যে কত নরম, তা আমার চেয়ে কজন বেশী বোঝে? উনি বুঝেও জীবন ভোরই ঠকেছেন। যাক এ নিয়ে যা বলবার আগেই বলেছি, সেইজন্য এই প্রসঙ্গের ইতি করে আমার বই এর জন্য কথার ফাঁকে কয়েকটা কথা জানতে চাইলাম। কোন কথা জানতে চাইলেই মুখে তালা লাগিয়ে দেন। পরনিন্দা এবং পরচর্চা দুটোকেই এড়িয়ে চলেন। কিন্তু বাবার উপর বই লিখছি বলে কথার ফাঁকে কথা বার করতে কিছুটা পারলেও আজও কি পেরেছি সব কথা জানতে? যদি অন্নপূর্ণাদেবী কোন দিন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন, যদিও নিশ্চিত জানি কোন দিনও লিখবেন না, তাহলে সেটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। দেখতে দেখতে কখন দু ঘণ্টা কেটে গেছে জানতে পারলাম কলিংবেল শুনে। পিণ্ডিজীর ড্রাইভার আমাকে নিতে এসেছেন।

বাবার কাছে যদি রাগ রাগিনীর ভেদ না শিখতাম তাহলে পিণ্ডিজীর আসরে স্থান পেতাম না। এত বড় সমঝদার শ্রোতা সত্যই কল্পনা করা যায় না। তাঁর বাড়ীতে বহু শিল্পী বাজিয়েছেন। কিন্তু বোধ হয় একমাত্র আমিই, আজও যে সময়ে যাই, যে কদিন থাকি, রোজ বাজাই তাঁর বাড়ীতে। লোকটা সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছা করে, তাড়িখোর মাতাল নয়। রাগ এবং তালের রসপ্রেমী। কয়েকদিন থেকে কাশী চলে এলাম। কাশীতে এসেই পরিকল্পনা করলাম, বইটা ইংরেজীতে লিখব। ইংরেজীতে লিখলে সব ভাষাভাষী বুঝতে পারবেন, কিন্তু বাবা এবং মা'র অনেক কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করলে সে রসটা ফোটান অসম্ভব। অনুবাদ সম্পর্কে ইংরেজীতে একটা ঠাট্টা আছে। অনুবাদ একটা নারী। যদি সুন্দরী হয় তাহলে অনুগত হয় না, আর যদি অনুগত হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্দরী হয় না। অবশ্য 'ব্যাকরণের ব্যতিক্রম' আছে।

তাই কতটা লিখব এবং কতটা লিখব না, সেটা হোল সমস্যা। অতঃপর কাশীতে আসার কিছুদিন পরেই মৈহার থেকে অরুণের চিঠি পেলাম। অরুণ লিখেছে, মৈহার থেকে বদলী হয়ে সাগরে গিয়ে কার্যভার গ্রহণ করেছে।' চিঠিটা পড়ে মনে হোল বাবার জন্যই বোধ হয় সে এতদিন মৈহারে ছিলো। বাবাও চলে গেলেন এবং অরুণও বদলী হয়ে গেল। কি অদ্ভুত যোগাযোগ। ইতিমধ্যে খবর পেলাম, কোলকাতায় বাবার বড় ভাই ফকির সাহেবের শ্যালক আলি আহমেদ খাঁ মারা গেছেন। কি আশ্চর্য্য! কিছুদিন আগে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বলেছিলাম, 'বাবার ছবি দিতে।' বলেছিলেন, 'খুঁজে রেখে দেবো।' কিন্তু আর কোথায় পাব? বাবার নামে, আলি আহমেদ খাঁ কোলকাতায় 'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ' খুলেছিলেন। প্রতি বছর একটি কনফারেন্স করতেন। আজকাল বাবার ছাত্ররা নিজের প্রচারেই ব্যস্ত। কিন্তু আলিআহমদ খাঁর পর 'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজেরও' মৃত্যু হোল। নিয়তির কি পরিহাস। এর পরের দিনই আঠাশে ডিসেম্বারে, হাফেজ আলি খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনলাম। মনে হোল তাঁর শেষ কথা, 'বাবুকে আমার আদাব জানিও।' বেশী দিনের কথা নয়। হাফেজ আলি খাঁর সাহেবের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাই, কত কথা হোল। বাবার শারীরিক কুশল জানতে

চাইলেন। তখন কি জানতাম ভারতের দুই দিকপাল সরোদ বাদকের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই উনিশশো বাহাত্তর সালটি। বাবা নেই। তিনি সন্ধ্যাতারায় চলে গেছেন, ভোরের তারায় জাগবেন বলে। বাবা সঙ্গীতের ধ্রুবতারা, তাই নশ্বর শরীরে নেই। নিঃসন্দেহে, এর ক্ষতি বৃদ্ধি আমার মত স্বজনের কাছে প্রচুর হলেও বাবার সৃষ্টি আগামী কয়েক শতাব্দী ধরে, যে কোন সঙ্গীত পথিককে ধ্রুবতারার মত পথ নির্দেশ করবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

ছোটবেলায় আমরা পড়তাম, কোদালকে কোদাল বলা ভাল নয়। কিন্তু এখানেও বাবা প্রচলিত সমাজে, রাইট হ্যাণ্ডারস এর মধ্যে লেফ্‌ট হ্যাণ্ডার। কোদালকে কোদাল বলতেই ভালবাসতেন, বিশেষ করে যদি সেটা কোন শাশ্বত ব্যাপারের হ'তো। সেখানে আপাত বিনয় ও মিষ্টি কথা বাবার কাছে বিষবৎ ছিলো। বলতেন, 'তেল মেরো না, তেল মেরো না, এমন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিও না যা আগামীকাল সত্য হবার সম্ভাবনা আছে।' অবসর সময়ে বাবা আমাকে সঞ্চয়িতার কবিতা পড়তে বলতেন। কয়েকটা কবিতা বাবা বারবার আমাকে পড়তে বলতেন। কি জানি কেন বাবা বলতেন, 'ওই কবিতাটা পড়ো তো।' সঙ্গে সঙ্গে পড়তাম। বাবার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয়, কেন বাবা এত ভালবাসেন এই কবিতাটি। আজ তাই অলস মুহূর্তে কবিগুরুর 'নমস্কার' কবিতাটা মনে পড়ছে। বাবাকে শোনাচ্ছি ভেবেই পড়তে লাগলাম,

যিনি নানা কণ্ঠে কন, নানা ইতিহাস।
সকল মহৎ কর্মে, পরম প্রয়াসে
সকল চরম লাভে, দুঃখ কিছু নয়
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তাঁর।
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো সুর
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।

বাবার জীবনীর বৃহদারণ্যক উপনিষদ এবার পূর্ণত্বের দিকে। এমন এক পূর্ণত্ব, যার থেকে কিছু বের করে নিলেও পুরোনো থাকবে, কিন্তু যোগ করলেও পূর্ণ। তবুও বলতে পারি, বের করে নেওয়ার পূর্ণতাটা রেখে যাবে একটা ক্ষত, আর যোগের পূর্ণতা অক্ষত।

বাবা পূর্ণ হয়েছিলেন, তাই পূর্ণ ছিলেন। তাই পূর্ণ থাকবেন। কিন্তু মহীরুহর সার্থকতা শুধুমাত্র বনস্পতি হওয়াতেই নয়। প্রচুর বীজের সম্ভারে, লক্ষ লক্ষ নবাঙ্কুরের মধ্যে তাঁর চরিতার্থতা। বাবা বনস্পতি হয়েছিলেন। সম্পূর্ণ বনানীর মধ্যে তিনি ছিলেন একক, অনন্য, স্বতন্ত্র ও দীপ্ত। কিন্তু তাঁর বীজ তাঁর সন্ততিতে কতটা পল্লবিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেন হোল না, কি হোল না, কাদের জন্য হোল না, এঁর এক যুগের সংক্ষিপ্ত সমাচার সেরে ফেলতে চাই। যদিও ব্যাপারটা হবে সারমেয়ময়কে ঝাড় দেওয়া। পরিবেশটা হবে পুতিগন্ধময়। কিন্তু অনন্যোপায়। পিতৃমন্দির, শ্বেত শুভ্র নাট মন্দির অপবিত্র দেখতে, বা সহ্য করে নেওয়ার মত ক্লীবতা, এখন আমার মধ্যে বাসা বাঁধে নি।

সুতরাং কিছু উচ্ছৃঙ্খলরূপ বোধ হয় মসীলিপ্ত হবে। এই সত্য লেখনে যদি কেউ মনে কষ্ট পান, তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু আমি অপারগ। হরিহরানন্দ সরস্বতী করপাত্র যাঁকে সকলেই করপাত্র স্বামী বলে জানেন, তাঁর জীবিত কালীন অবস্থায়, দুইবার ধর্ম ব্যাখ্যা শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। দুবারই তিনি একটা শ্লোক বলেছিলেন।

রাজাকে তাসির গরম।
বনিয়া কে তাসির নরম
ঔরতকে তাসির শরম।

অর্থাৎ রাজার মেজাজ গরম অর্থাৎ সে যা বলবে তাই অথেনটিক হবে। যে বেনে, তাঁর মেজাজ হবে নরম। অর্থাৎ বেনে যদি মন জুগিয়ে না চলে তাহলে তাঁর জিনিষ বিক্রি হবে না। এবং মহিলাদের মেজাজ হবে শরম অর্থাৎ লজ্জা। সেইটাই তাঁদের ভূষণ।

করপাত্র স্বামীর এই শ্লোকটা আমার মনে খুব নাড়া দিয়েছিলো। বাবার মেজাজটা ছিলো গরম এবং মার মেজাজটা ছিলো শরম। কিন্তু আমি? মেজাজটা পেয়েইছ রাজার মত। বেনেদের মত মিষ্টি, নরম নরম কথা বলে ক্রেতাদের ভোলাতে পারি নি। যার জন্য যা সত্য বলে মনে হয়েছে, অকপটে বলে গেছি। যাঁর জন্য অনেকের কাছেই অপ্রিয় হয়েছি। অবশ্য তার জন্য দুঃখ নাই, কেননা মনের কথা স্পষ্ট বলে শান্তি পেয়েছি। অবশ্য এই স্পষ্ট কথা বলা আমার আগেও ছিলো, এবং বাবার কাছে দীর্ঘদিন থেকে তার ভিত এমন গড়ে উঠল যে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের কার্য উদ্ধার করাটাকে গর্হিত কাজ বলে মনে হয়েছে। তাই আবার বলছি, যে অপ্রিয় কথাগুলো ইতিমধ্যে লিখেছি, তার সমাপ্তি হবে কি ভাবে? শেষের কথা থাক।

অরুণের চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'আলিআকবর মৈহারে এসে দীপচন্দকে বলেছে, বাবার কবর শ্বেত পাথর দিয়ে সে নিজেই তৈরী করবে। মা'য়ের মৃত্যুর পর পাশাপাশি দুটো কবর শ্বেতপাথর দিয়ে হবে। উপস্থিত বাবার কবর যেমন আছে তেমনি থাকবে। মৈহারে যে প্রস্তাব হয়েছিলো মুখ্যমন্ত্রীর সচিব-এর সঙ্গে, সে কথা শোনা সত্ত্বেও, আলিআকবরের এই কথা বলায় দীপচন্দ এবং মৈহারের লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। দীপচন্দ আমাকে বলল, দাদা আলিআকবর যা ইচ্ছা করুন। আমরা আর এর মধ্যে থাকব না। আলিআকবর এখানে এসে সকলকে নিয়ে কোলকাতায় চলে গিয়েছে। বাবার বাড়ী দেখে কষ্ট হোল। বাড়ী পাহারা দেবার জন্য ব্যাঙ্কের একজন লোককে নিযুক্ত করে গিয়েছে। বাবার বাড়ী গিয়ে দেখলাম, দেবদেবীর একটা ছবিও নাই। বাবার বাড়ীর চেহারাটাই বদলে গিয়েছে। আমি কয়েকদিন পুরানো কিছু কাজ সেরে সাগরে ফিরে যাচ্ছি।'

চিঠিটা পড়ে অবাক হলাম। সব প্রস্তাব বানচাল হয়ে গেল। মানুষের মৃত্যুর কি ঠিক আছে, কে কতদিন বাঁচবে? চৈতন্যদেবের একটা কথা মনে পড়ল। কথাটা হোল,

'এই আছি। এই নাই। নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই।'

অতীত হোল ইতিহাস। বর্ত্তমানটাই সত্য, আর ভবিষ্যৎ, কে দেখেছে বা আগে থেকে বলতে পারে। কাজের মধ্যে এ কথাটা মনেই আসে নি, যে সময় ক্ষণিকের জন্য আশিসের

সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আশিস বলেছিলো বটে তাঁর বাবা সকলকে নিয়ে কোলকাতা চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন মনে হোল, আলিআকবর সব প্রস্তাব বানচাল করে দিলো কেন? বাবা বাড়ীর নাম প্রথমে রেখেছিলেন শান্তিকুটির। পরে মক্কার থেকে ফিরে বাড়ীর নামকরণ করেছিলেন মদিনা ভবন। কিন্তু সেই শান্তিকুটির এখন মুরদা অর্থাৎ মৃত কুটিরে পরিণত হয়েছে কয় মাসের মধ্যেই। এর মধ্যে আলিআকবর আমেরিকা চলে যাবে। কি বিচিত্র চিন্তাধারা এঁদের। ভবিষ্যৎ হোল কল্পনা। কল্পনা নেত্রে দেখলাম, প্রতিবছর বাইরের লোক যাঁরা সারদা দেবীর দর্শন করতে যাবে বাবার বাড়ীর পাশ দিয়ে, কি ভাববে তাঁরা বাড়ীটা দেখলে? এক এক করে সব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেন আলিআকবর আমেরিকা থেকে আসবার পর, আমাকে কোন চিঠি দেয় নি। পরিকল্পনার ব্যাপারে শরণরানী বলেছিলো, দিল্লীতে আলিআকবরের সঙ্গে কথা বলে জানাবে। কিন্তু শরণরানী আলিআকবরের মনোভাব জেনে কিছু বলতে পারে নি। সেইজন্য আমাকে কোন চিঠি দেয় নি, পাছে আমি প্রতিবাদ করি। কিন্তু এই পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য দায়ী কে? যাক এ সব নিয়ে ভাবা বৃথা। যাঁরা নিজের আখের গুছোতে ব্যস্ত, তাঁদের এই সব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

আসলে পরিকল্পনা হয়ত সত্যিই রূপায়িত হ'তো, কিন্তু যে সব সময় প্রতিটি কাজে মন্ত্রণা দেয়, মনে হোল তাঁর বোধ হয় ইচ্ছা নয়। যে বাবার কাছে কাফের উপাধি পেয়েছে, সে কি বাবার স্মৃতিস্তম্ভ করবার কথা চিন্তা করতে পারে? সে নিশ্চয় বুঝিয়েছে, বাবার স্মৃতিস্তম্ভ বিদেশে করাই ভালো। সহজ সরল আত্মভোলা, শুভচিন্তকের কথাটা যথার্থ মনে করে, বিদেশেই বাবার নামে কিছু কাজ করছে। এসব কথা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি, কোলকাতায় এক ফুলবাবুর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে কিছুদিন আগে। উপস্থিত দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি দেখা হ'তো তাহলে বলতাম, আগে নিজের দেশের কথা ভাব। নিজের দেশের লোক নিজেদের ইতিহাস জানল না, অথচ বিদেশীরা অন্যদেশের ইতিহাস আগে জানবে। সভ্যদেশ কখনও তা করেনি। ইতিহাস তো তাই বলে। কিন্তু এখানে হোল উল্টো। কারণ? কারণ আর কিছুই না। কারণ হোল অর্থ। বিদেশে অর্থও আছে, প্রচারও হবে। কিন্তু অর্থই কি সব? কেন এঁরা বোঝে না, মীরজাফরকে ইতিহাসে কাল কালি দিয়ে লিখেছে। অথচ যাঁরা নিজের দেশের জন্য প্রাণপাত করেছে তাঁরাই স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে পাতায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। জানি এ সব বললেও, উলুবনে মুক্তো ছড়ান হবে। ঈশ্বর এঁদের ক্ষমা কোরো। এঁরা জানে না এঁরা কি করছে।

বম্বে থেকে আসার কিছুদিন পরেই ইংরেজীতে বাবার উপর বই লিখতে শুরু করে দিয়েছি। বহু নাম মাথায় এলেও, পরে স্থির করে বইয়ের নাম রেখেছি, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এনড হিজ মিউজিক'। ইংরাজীতে বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হলাম। এ যাবৎ যা দেখেছি এবং শুনেছি যদি লিখি, আমার সামনে এই ঘটনা হয়েছিলো, তাহলে বাবার জীবনটা গৌণ হয়ে যাবে। সকলেই ভাববে আমি আমার ঢাক পিটোচ্ছি। সেইজন্য সে সব তথ্যগুলো বাদ দেবো স্থির করলাম। কিন্তু অনেক সত্য জিনিষ যা আমার সামনে হয়েছে, তা লিখতে পারলাম না, কেননা সংবাদপত্রে অন্য রকম বেরিয়েছে। একটা ঘটনার

কথা লিখলেই পাঠকরা আমার অবস্থা বুঝতে পারবেন। মৈহারে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের যে প্রসপেকটাস আমি করেছিলাম এবং বাবাকে বলে গুরু শিষ্য পরম্পরা হিসাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হোল, সেই তথ্যটা সংবাদপত্রে অন্যভাবে পরিবেশিত হোল। এই ধরনের নানা ঘটনা বিকৃত ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া এ যাবৎ যত লোকের সাক্ষাৎকার নেবার পর, যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, নানা কারণে সেগুলি লেখাও সম্ভব নয়। সাক্ষাৎকার নেবার পর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হোল, সে কথাও লেখা সম্ভব নয়, কারণ তাহলেই আমার কথা এসে যাবে। ইংরেজী সাহিত্যের দিকপাল ম্যাকলে এক জায়গায় লিখেছে, 'কারুর জীবনী লিখতে গেলে 'আই' কথাটা বর্জন করতে হবে। তাই আমি করে লিখলে সেটা সুখপাঠ্য হয় না, এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।' পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই বায়োগ্রাফী এবং অটোবায়োগ্রাফীর তফাৎ বোঝেন না। আবার অটোবায়োগ্রাফীতে আই এর অর্থাৎ আমির উপস্থিত, মাত্র একজন পারসিভার অর্থাৎ দ্রষ্টার অধিক হওয়া উচিত নয়। আর আমি যদি আগেই সেখানে তুলনামূলক নিকৃষ্ট দেখাবার জন্য অস্মদ শব্দে পঞ্চমি লাগাই তাহলেকি সেটা ভালো হবে? যেমন স্বর্গ ভালো কিন্তু জননী জন্মভূমির তুলনায় নিকৃষ্ট। কিন্তু বাংলাতে বাবার কথা মুখ্য করে নিজের কথা লিখতে বাধ্য হয়েছি। যদি তা না লিখি তাহলে ইতিহাসে যে রকম ভুল তথ্য প্রচারিত হয়ে এসেছে, তাই এখানেও হবে। অবশ্য এতো অনেক পরের কথা। আগে গোড়াকার কথা বলি। উপস্থিত লেখা, সাক্ষাৎকার এবং তার সঙ্গে বাজনাও হচ্ছে।

বাবার মৃত্যুর শোক উপলক্ষে বিহার সঙ্গীত পরিষদ পাটনা থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। বাজাবার দিন সকালে প্রেস কনফারেন্স হোল। প্রেস-এর লোকেরা বাবার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বাবার পুত্র এবং জামাতার সম্বন্ধে সেই সময় নানা ঘটনার প্রশ্নবান শুরু হোল, বিপদে পড়লাম। বাবার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে বললাম, 'ইংরেজীতে বাবার উপর একটি বই লিখছি। বইটি প্রকাশিত হলেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পাবেন। বাজাবার পর বিহার সঙ্গীত পরিষদের সচিব, গজেন্দ্র নারায়ণ সিং এক ভাষ্কর্যের দ্বারা নির্মিত বাবার একটি আবক্ষ মূর্তি উপহার দিলো। এই মূর্তিটি আমার কাছে একটা বিরাট সম্পদ হয়ে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

লেখার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। একবছর হোল বাবা গত হয়েছেন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে কমলাপতি ত্রিপাঠির জন্মদিনে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, দিল্লীতে গিয়ে বৃহস্পতি, শীলা ভরতরাম এবং শরণরানীর সাক্ষাৎকার নেবো। দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে শামতাপ্রসাদের সঙ্গে তিনঘণ্টা বাজনা হোল।

বাবা বলতেন, 'মঞ্চে বসবে পেঁচার মতো। যত হাজার পাওয়ারের বাল্‌বই জ্বলুক চোখের সামনে, যত চাকচিক্যময় চেহারা বসে থাকুক তাঁদের দেখবে না। বাইরের চোখ বন্ধ করলে তবেই অন্তরের চোখ খোলে। সুরের বাতি নিয়ে নিজের মনে নিজের ইষ্টকে খোঁজ। আর প্রত্যেকটা ছন্দের স্তোত্রে তাঁর বন্দনা করো। নিজের পুজো ভাল হলে নিজেই শান্তি পাবে। জগৎ দুনিয়ায় হাততালির কোন মানে নেই। তোমার শ্রদ্ধার নিবেদন কি কারো প্রশংসা অপেক্ষা করে?

তাই যখন বাজাই তখন পেঁচা। পরিণাম মাঝে মাঝেই বা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হানিকারক হয়। দুর্বোদ্ধারা বসে সামনে আর বোদ্ধারা বসে পেছনে। কিন্তু এই দুর্বোদ্ধারাই তো সমাজপতি। তাঁদের হাতেই তো পাইয়ে দেবার ক্ষমতা, সুতরাং চোখ বুজে পরমার্থ পাই, অর্থ হারাই। কি কপাল জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণের ছেলে আর তালিমে বাবার সন্তান। কোন রকমে রক্ততে বনিক কর্পাসল ঢুকতে পারে নি।

বিজ্ঞান ভবনেও চোখ বুজেই বাজাচ্ছিলাম। যদিও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভিন্ন সমস্ত তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং গোটা কয়েক মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভার আগামীকালের সম্ভাবনা পূর্ণ সদস্যরা সম্পূর্ণ হলের একটা সিটও খালি রাখেন নি। হঠাৎ প্রথম পংক্তি থেকে একটা গম্ভীর মিষ্টি কণ্ঠস্বরে অনুরোধ শুনলাম, 'একটা ভূপালী বাজাবেন?' চমক লাগবার মতই অনুরোধ। সময় অনুরাগ চয়নে, উজ্জ্বল আলোর ফাঁকে চেনবার চেষ্টা করলাম। মাথায় কালো টুপি। কালো সেরবানী এবং চুড়িদার পায়জামায় এক তপ্ত গৌরবর্ণ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে অনুরোধ করছেন। চিনতে কষ্ট হোল না। জম্মুকাশ্মীরের ভূতপূর্ব অধিপতি, এবং বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডাক্তার করণ সিং।

আশ্চর্য্য হলাম। এ তাবৎ বেশ কয়েকটি রাজাকে দেখেছি যাঁরা সঙ্গীত শুনতে তো চান, কিন্তু শিল্পীকে খাস তালুকের প্রজা ভেবে, বসে বসেই ফরমাইস করেন। কিন্তু এখানে ঠিক এর বিপরীত। শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মান জ্ঞাপন করে, অনুরোধ করায় আমি মুগ্ধ হলাম। পরে তাঁর সাথে যখন পরিচিত হলাম, তখন জানলাম উনি গানও করেন। সেদিনের সন্ধেটা স্মরণীয়, কারণ কয়েকজন মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন তাঁদের রাজ্যে গিয়েই বাজাই। কিন্তু ওই? যেখান থেকে কথা শুরু করেছিলাম। সেটা হোল বনিক পুত্র নই তো। ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো ভাবতেও, আমি সরোদ হাতে করে ওঁদের বাড়ী বাড়ী ঘুরছি। এই অনিমন্ত্রিত যাত্রা আমাকে ছোট করবে না, কিন্তু আমার সরোদকে? তাই সকলকেই আমার ঠিকানা দিলাম, আর সবিনয়ে বললাম, 'আমি সঙ্গীতের সেবক। বাজানই আমার কাজ। যখন ডাকবেন আসব।' কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই আগমনীর গান শুনলাম না।

কাশীর এক সাধু বাবা এই জলসায় প্রথম সারিতে বসেছিলেন। এই সাধু বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। ভারতের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বড় বড় উদ্যোগপতিরা সাধু বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন। বাজাবার পরই, সাধুবাবা যে উদ্যোগপতির বাড়ীতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাকে এবং সামতাপ্রসাদকে বললেন, 'আগামীকাল তোমাদের এখানে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। দুপুরে তোমরা খাবে। এই উদ্যোগপতি তোমাদের বাজনা রাখতে চায়। কাল এলে কথা হবে।' পরের দিন আমরা সাধুবাবার ওখানে গিয়ে দেখি, গায়িকা গিরিজা দেবী এবং এক মহিলা বসে আছেন। গিরিজা দেবীকে দেখলাম, সাধুবাবাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন। কথায় কথায়, সঙ্গে যে মহিলা বসেছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'ভাইয়া একে আপনি চেনেন?' বললাম 'না'। গিরিজাদেবী আমার পরিচয় দিয়ে, ভদ্রমহিলার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ইনি বিনয়ভরতরামের স্ত্রী।' তিনি আমাকে বললেন, 'সাধু বাবার কাছে আপনার বাজনার খুব প্রশংসা শুনেছি। আজ যদি খালি

থাকেন, তা হলে আমাদের বাড়ীতে এসে বাজালে খুশী হব।' মনে পড়ে গেল, তেইশ বছর আগে বিনয় ভরতরামের মা শীলা ভরতরামকে দেখেছিলাম। শীলা বাবার কাছে শিখতেন। দীর্ঘদিন আগে রেডিওতে চাকরির জন্য যে সময় দিল্লী গিয়েছিলাম, সেই সময় রবিশঙ্কর ভরতরামের বাড়ীতেই থাকতেন এবং শীলাজীকে শেখাতেন। ভাবলাম, বাবার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাব। এই কথা ভেবে, ভদ্রমহিলাকে বললাম, 'আপনার শাশুড়িকে দীর্ঘদিন আগে একবার দেখেছি, যে সময়ে সেতার শিখতেন। আপনার স্বামী সেই সময় ছোট ছিলেন। ঠিক আছে, বাজাব।' তিনি বললেন, 'সন্ধ্যার সময় আপনার বাড়ীতে গাড়ী পাঠিয়ে দেব।' আমাদের কথা শুনে গিরিজাদেবী বললেন, 'বিনয় ভরতরাম, আমার ভাইএর মত। আমিও আপনার বাজনার সময় থাকব।'

খাবারের টেবিলে সাধুবাবার সামনে, উদ্যোগপতি বললেন, 'আমাদের একটা ধর্ম সংস্থা আছে। আমরা একমাসের জন্য কিছুদিনের মধ্যেই নানা তীর্থস্থান ঘুরে, বৃন্দাবনে ফিরব। আমাদের সঙ্গে সাধু বাবাও থাকবেন। সব তীর্থক্ষেত্রে আপনাদের বাজাতে হবে। এর জন্য আপনাদের কি দক্ষিণা দিতে হবে?' সামতাপ্রসাদ বিনয়ের সঙ্গে, কি কি অসুবিধা হবে বলে, টাকার কথা পরে বলবে বলে, সাধুবাবার দিকে তাকালেন। আমি নীরব দর্শক হয়ে কথা শুনতে লাগলাম। মনে হোল, আলুপটলের দাম নিয়ে দরাদরি হচ্ছে। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে গাড়ী এলো। বিনয় ভরতরামের বাড়ী গেলাম। বাড়ী গিয়ে দীর্ঘদিন পরে দেখলাম, সলামৎ খাঁকে। সলামৎ খাঁ বললেন, 'আপনি মৈহার থেকে চলে যাবার কিছুদিন পরেই, আমি এখানে চলে এসেছি ভরতরামজীর কাপড়ের মিলে। কর্মচারিদের গান শেখাই এবং সেখানেই থাকি। সেখানে সারেঙ্গীবাদক, কাশীর গোপাল মিশ্রও থাকে। থাকা খাওয়া, পয়সা লাগে না এবং উপরন্তু যে অর্থ পাই, তাতে সুন্দর ভাবে চলে।' বহুদিন পরে সলামৎ খাঁকে দেখে ভাল লাগল। কিন্তু ভরতরামের কাছে, ঠিক প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ দেখলাম। বিনয় ভরতরাম আমাকে বললেন, 'আমি একটু আধটু গান করি। যদি বলেন তাহলে আমি একটা গান গাইব তারপর আপনার বাজনা শুনব।' বললাম, 'খুব ভাল কথা। একটা কথা বলুন তো আপনার মা কেমন আছেন? তাঁকে তো দেখছি না?' ভরতরাম বললো, 'মা এখন পূজা পাঠ নিয়ে থাকেন। উপস্থিত আর সেতার বাজান না।' ইতিমধ্যে বিনয় ভরতরামের ছোট ভাই অরুণ ভরতরাম এলো। সে ম্যাড্রাসে ব্যবসা দেখাশোনা করে এবং সেতার বাজায়। কথায় কথায় বললাম, 'বাবার উপর একটা বই লিখছি। আপনার মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আপনার মা, বাবার বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন।' বিনয় বলল, 'আগামীকাল আমাদের মিলে অরুণের বাজনা হবে। সেইসময় আমার মা থাকবেন। মায়ের সঙ্গে সেইসময় কথা বলতে পারেন। দয়া করে কাল আসুন। মিলে বাজনা হয়ে যাবার পর আমাদের বাড়ীতে খাবার খেয়ে যাবেন।' সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। এখন গান শুরু করুন।' বিনয় ভরতরামের গানের পর, গিরিজা দেবীও গাইলেন। তারপর আমি বাজিয়ে উঠবার পর দেখলাম, খাবারের বিরাট আয়োজন হয়েছে। খাবার খেয়ে বাড়ী চলে এলাম।

পরের দিন, সন্ধ্যে বেলায় আবার গাড়ী এলো। বাড়ী গিয়ে দেখলাম কয়েকজন বসে

আছে। ভায়োলিন বাদক পাওয়ার, আগের দিন বিনয়ের সঙ্গে বাজিয়ে ছিল। আজও বসে আছে। কথায় কথায় পাওয়ার বলল, 'শুভ এত ভাল বাজিয়েছিল এই বাড়ীতে যে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর বাজনার বাধা পড়ায়, আমেরিকা গিয়ে ছবি আঁকার কাজ করছে।' বললাম, 'বাজনা বন্ধ হোল কেন?' উত্তরে বলল, 'কি বলব আপনাকে? কমলা ভাবী কি যে বোঝাল গুরুজীকে, যার ফলে শুভর বাজনা বন্ধ হয়ে গেল।' বললাম, 'তোমরা শুভকে বোঝালে না কেন?' বলল, 'গুরুজীর সামনে কি বলব?' বুঝলাম আজকের দিনে এরা সকলকে তুষ্ট করে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। এঁদের দোষ নেই। আজকাল এই হোল যুগের হাওয়া। ইতিমধ্যে বিনয় এবং অরুণ ভরতরাম এলো। বিনয় ভরতরাম হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলো, 'দাদা একটা কথা বলুন, বাবার গুরু কে ছিলেন?' বললাম, 'বাবার তো গুরু একজন নন। বাবার অনেক গুরু ছিলেন। বাবা অনেকের কাছে শিখেছিলেন এবং সকলকেই গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন।' আমার কথা শুনে বিনয় বলল, 'বাবা সরোদ কার কাছে শিখেছিলেন?' বললাম, 'বাবা সরোদ শিখেছিলেন রামপুর ঘরাণার আহমদ আলি খাঁ সাহেবের কাছে।'

বিনয় একজনকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি আহম্মদ আলির ছেলে। যদিও উনি সরোদ বাজান না, আমার কাছে থাকেন।' বিনয় অন্য ঘরে নিয়ে গেল। দেখলাম অরুণ সেতার মেলাচ্ছে। কিছুক্ষণ সামতাপ্রসাদের সঙ্গে বাজিয়ে সকলে ডি.এস. এম.-এর মিলে গেলাম। যদিও শীলা ভরতরামকে বহুদিন আগে দেখেছি, তবুও দেখলাম সভার মাঝে একদিকে বসে আছেন। পুরোনো কথা স্মরণ করিয়ে, শীলা ভরতরামকে বললাম, 'এখন সেতার বাজান কি?' উত্তরে, 'নিজের ভাগ্য বলে কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'আমার ছোট ছেলে অরুণ সেতার বাজায়।' এই কথা শুনে অরুণ বলল, যদি মায়ের মত আমি রিয়াজ করতে পারতাম, তাহলে আমি সেতার বাদক হয়ে যেতাম। অরুণ বাজাল, কিন্তু সময় অভাবে শীলা ভরতরামের সাক্ষাৎকার নেওয়া হোল না। ফিরবার পথে বিনয় ভরতরাম বলল, 'দাদা, পরের বারে দিল্লী যখন আসবেন, সেই সময় ভাল করে আপনার একটা প্রোগ্রাম রাখব।' মনে মনে ভাবলাম, ইচ্ছা থাকলেও বিনয় প্রোগ্রাম রাখতে পারবে না। কেন? কারণ তো খুবই সরল।

পরের দিন শরণরানীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারের কথা বললাম। শরণরানী বলল, 'দুপুরের আগে নিশ্চয়ই আসুন। সেইসময় কথা বলব। দুপুরে আমার এখানেই খাবেন। সেই সময় আমার স্বামী এসে যাবেন। বিকেলে চা খেয়ে তারপর বাড়ী যাবেন।' যথাসময় শরণরানীর বাড়ী গেলাম। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই শরণরানীর স্বামী সুলতান সিং বাকলিবাল এলেন। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। খাবারের টেবিলে বসেই কথাবার্তা বলতে লাগল। ডাল খাবার সঙ্গে সঙ্গেই উস্তাদ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললাম, 'এই ডাল কে রেঁধেছে?' শরণরানী বলল, 'মৈহারে মায়ের কাছে শিখেছি।' সত্যই মায়ের কাছে ঠিকমত শিখেছে। মা'র হাতের ডাল যে না খেয়েছে, সে কল্পনা করতে পারবে না।

খাবার খেয়ে শরণরানীর স্বামী কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেল। শরণরানীর কাছে কোন

নূতন তথ্য পাবার আশায় আমি যাই নি। এ কথা আমি জানতাম যে শরণরানী বাবার কাছে মৈহারে দুইবার গিয়েছিলো। আমার মৈহার ছাড়ার পর প্রায় চোদ্দ বছর পরে শরণরানী একটা সাক্ষাৎকার নিজের সঙ্গীত শিক্ষা কি ভাবে শুরু হয় এ সব কথা প্রশ্নকর্ত্রীকে বলেছিলো। সাক্ষাৎকারটি বেরিয়েছিলো নর্দান ইণ্ডিয়া পত্রিকাতে। প্রশ্নকর্ত্রী যখন প্রশ্ন করে, 'আপনার জীবনের কোন স্মরণীয় ঘটনা যদি কিছু থাকে তাহলে বলুন। উত্তরে, শরণরানী বাবার কাছে শিক্ষা করতে গিয়ে একবার একটা ঘটনার উল্লেখ করে বলে, 'আজও সেই দিনটির কথা আমি ভুলতে পারি না। সংবাদপত্রে এই সাক্ষাৎকারটি পড়ে আমার কাছে বিস্ময় লাগে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যে দুইজন শিল্পীর কথা লিখেছিলো, তাঁদের কাছে আমি আলাদা আলাদা ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম।

ঘটনাটা এরকম। মৈহারের রাজার অনুরোধে একবার শরণরানী দুইজন গুরু ঘরের শিল্পীর সঙ্গে একত্রে তিনজনে বাজিয়েছিলো। গৎ বাজাবার সময়, বাবা তবলা নিয়ে সঙ্গত করেছিলেন। এই ঘটনাটি শরণরানীর জীবনের উল্লেখনীয় ঘটনা, যা সে কখনও ভুলতে পারে নি। এরকম তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

আমি ভেবেছিলাম নিঃসন্দেহে এটি স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ বাবা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের সাথেও কতটা উদার হতে পারেন এটা তাঁর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু শতংবদ মা লিখ। আর যদি লিখতেই হয় তাহলে জার্নালিজম-এর ভাষায় পাঁচটা ডবলিউকে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। অর্থাৎ কিনা হু, হোয়াই, হোয়াট, হাউ এবং হোয়েন।

সেইজন্য যিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁকে ছেড়ে বাকী দুজনকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞাসা করলাম ঘটনাটা কি? একজন বলল, 'হাঁ আমি এবং অমুক বাজিয়েছিলাম। শরণরানী তো বাজায় নি। সে মাত্র উপস্থিত ছিলো।' দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি প্রথম জনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বললেন, 'তিনি একা বাজিয়েছিলেন মহারাজের সামনে এবং বাবা সঙ্গত করেছিলেন।'

যদিও তিনি অনুগ্রহ করে বললেন, 'শরণরানী হয়ত বা ওখানে ছিলো।' ভারি বিড়ম্বনা। ঘটনাটা ভাবলাম কোথায় লিখব কিন্তু বিরোধভাষের ঠেলায় এখন তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই শরণরানীকে দুইজনের মন্তব্য বলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বক্তব্যটা কি?' উনি বললেন, 'কেউ যদি আমার অস্তিত্বকে সরাসরি লোপাট করতে চায়, আমার বলার কি আছে?'

এই জটিল ধাঁধার সমাধানটা কি? এটা তো একটা ঘটনা নয়। এরকম অসংখ্য ঘটনা আমাকে পেতে হবে যদি আমাকে থাকতে হয় সঙ্গীতের দুনিয়াদারিতে। যে কোন সত্যান্বেষী শার্লক হোমস বা ব্যোমকেশ বক্সীই হোন না কেন, এ গোলকধাঁধাঁয় খাবি খেতে বাধ্য। এ দৃশ্যের তিনটি কুশীলব তিনরকমের কথা বলছে। আর যাঁরা দর্শক ছিলেন, সে দুজন ইত্যাবসরে দিনের শেষের শেষ খেয়া ধরেছেন। তাই, না বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারব, বা মৈহারের রাজার কাছে, যে শরণরানী স্মরণীয় ঘটনায়, প্রথম ব্যক্তি বাহাদুর খাঁ বা দ্বিতীয় ব্যক্তি আলিআকবর খাঁ বা সে নিজে সততার কষ্টি পাথরে কতটা উত্তীর্ণ?

ভাবলাম এই জাতীয় অসংখ্য গুল গল্প আর গুল্প যা কিনা নিজেদের লোকেদের কাছে শুনছি, এঁর থেকে সত্যকে খুঁজে বার করতে গেলে, আমাকে তো রাজহংস হতে হবে। নীর ক্ষীর বিবচন বেদান্তে পড়েছি। কিন্তু এই স্বদন্তের পাল্লায় পড়ে আমার নূতন করে বেদান্ত শিখতে হবে ভেবে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

এই ঝোঁকে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। উপরোক্ত ঘটনায় তো তিনজন মিলে তিহাই দিয়েছিলো। আর নিম্নোক্ত ঘটনায় রবিশঙ্কর একাই দিলো তিহাই। ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি। মৈহারে রবিশঙ্কর এবং আলিআকবরের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আলাদা আলাদা, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ যাবৎ যত লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, নানা প্রশ্নের মধ্যে প্রত্যেককেই বিশেষ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি। প্রশ্নটা হোল, বাবার জীবনে এমন স্মরণীয় ঘটনা কি আপনি জানেন, যার আপনি প্রত্যক্ষদর্শী? রবিশঙ্করকে এই প্রশ্ন করায় বলেছিলো, 'একটা ঘটনা সত্যই মনে রাখবার মতো। একবার মৈহারের মহারাজার দরবারে, দক্ষিণের গুণী বাদক, ঘটম্ বাজিয়ে বাবার সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন। এ কথা ঠিক যে দক্ষিণের মৃদঙ্গ বা ঘটম্ সঙ্গতকাররা লয়ে খুব পণ্ডিত। কিন্তু জানো তো, অহঙ্কারী মনোভাব দেখলেই বাবা সঙ্গতকারদের বরাবর বেকায়দায় ফেলতেন। মহারাজের এখানেও তাই হোল। বাবার সঙ্গে খুব ভাল সঙ্গত করছিলো এবং বাবাও প্রশংসা করছিলেন। ঘটম্ বাদক বাবার প্রশংসায়, নানা মুদ্রা করতে লাগলো এবং মনে হোল তাঁর মত সঙ্গতকার ভারতবর্ষে আর কেউ নেই। বাবা সঙ্গতকারের এই অভিমান বুঝতে পেরেই, অর্দ্ধমাত্রার একটা তাল ধরলেন। ঘটম্ বাদক কিছুতেই গৎ এর ঠেকা বুঝতে না পেরে জব্দ হয়ে গেল।'

এই ঘটনা শুনে রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঘটম্ বাদকের নাম কি ছিলো?' রবিশঙ্কর বললো, 'অনেকদিন আগের ঘটনা, তাঁর নামটা মনে নাই।' এবারে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা সেই ঘটম্ বাদককে কি বললেন?' রবিশঙ্কর বলল, 'বাবা তালি দিয়ে সাড়ে তেরো মাত্রার ঠেকা বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, ঘটম্ বাদক বাজাতে পারলেন না।' আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবা আপনাকে বাজাবার পর কিছু বললেন না।' উত্তরে বললো, 'বাবা কেবল একটা কথাই বলেছিলেন, অহঙ্কার ভালো নয়। ঘটম্ বাদকের অহঙ্কার দেখেই অর্দ্ধমাত্রার তাল বাজালাম।' রবিশঙ্করকে নানা প্রশ্ন করে আলিআকবরের কাছে পাশের ঘরে নানা প্রশ্ন করলাম। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মৈহারের মহারাজের দরবারে, একবার বাবার সঙ্গে একজন ঘটম্ বাদক সঙ্গত করেছিলো শুনেছি। বাবা সাড়ে তেরো মাত্রায় বাজিয়ে ছিলেন শুনেছি। সেই ঘটম্ বাদক এর নাম কি আপনার মনে আছে?' এ কথা শুনে আলিআকবর বললো, 'তুমি কি করে জানলে এ কথা?' বললাম, 'বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে সব সংগ্রহ করেছি, নানা লোকের সঙ্গে কথা বলে। আচ্ছা বলুন তো, সেই ঘটম্ বাদকের নাম কি আপনার মনে আছে? এ ছাড়া যে সময় আপনি সেই আসরে শুনেছিলেন, সে সময় কি অর্দ্ধমাত্রার তাল বাবার কাছে শিখেছিলেন?' আলিআকবর আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'আরে, আমি কোথা থেকে শুনব? যে সময় এই ঘটনা হয়েছিলো, সেই সময় আমি খুবই ছোট ছিলাম। রাজদরবারে বাজনা শুনবার প্রশ্নই ওঠে না।' তবে ঘটনাটা সত্য। এই ঘটনাটা আমি

তিমিরদার কাছে শুনেছি। বড় হয়ে ঘটম্ বাদকের নাম আমার মনে নাই।' অবাক হয়ে বললাম, 'রবিশঙ্কর আমাকে তো বললো, সে সেই আসরে শুনেছিলো ঘটম্ বাজনা।' হেসে আলিআকবর বললো, 'দূর! রবিশঙ্কর সেই সময় মৈহারেই আসে নি। রবিশঙ্কর কোথা থেকে শুনবে?'

এবার আমার অবাক হবার পালা। আলিআকবরকে সব প্রশ্ন করে, আবার রবিশঙ্করকে গিয়ে বললাম, 'আপনি বললেন, ঘটম্ বাদকের বাজনা শুনেছেন। অথচ আলিআকবরের কাছে শুনলাম, সেই বাজনার সময় আপনি মৈহারে আসেন নি?' আমার কথা শুনে রবিশঙ্কর থতমত খেয়ে বললো, 'আরে, আমি কি তোমাকে বলেছি নাকি যে আমি সেই আসরে ছিলাম? আলিআকবর ঠিকই বলেছে। আসলে এই ঘটনাটা আমি তিমিরদার কাছেই শুনেছি।'

যাইহোক, ঘটনাটার সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকের মত অসত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। অবশ্য পরে তিমিরবরণ ভট্টাচার্যকে এই ঘটম্ বাদকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিমিরবরণ ঘটনাটা যথাযথ রবিশঙ্কর যেমন বলেছিলো, সেই কথাই বললেন, কিন্তু ঘটম্ বাদকের নামটা বলতে পারলেন না।

এই ঘটনাটার কথা উল্লেখ এইজন্য করলাম, কেননা পাঠক বুঝতে পারবেন একটা সত্যকে খুঁজে বার করতে আমাকে কি রকম নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। আমি রাজহংস হয়ে যে সময় প্রকৃত সত্য উদ্ধার করতে পেরেছি, সেগুলিকে স্থান দিয়েছি আমার লেখায়। যা বলছিলাম সেই কথাই বলি। শরণরানীর বাড়ীতে আরো দুইতিনটে প্রশ্ন করে চলে এলাম।

পরের দিন রেডিও স্টেশনে টেলিফোন করলাম বৃহস্পতিকে। বৃহস্পতি রেডিওতে চিফ প্রডিউসার অফ মিউজিক পদে কয়েকবছর নিযুক্ত হয়েছেন। আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ইয়ারকি হয়। আমার টেলিফোন পেয়েই বৃহস্পতি বললেন, 'আজ বিকেলে রেডিওতে এলে তোমাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যাব।'

রেডিওতে নির্দিষ্ট সময়ে গেলাম। আমাকে দেখেই আপ্যায়িত করে বসিয়ে একটি ফটো এগিয়ে দিলেন আমার হাতে। অবাক হলাম ফটো দেখে। কমলাপতি ত্রিপাঠির জন্মদিবসে বিজ্ঞান ভবনের স্টেজে, কমলাপতি ত্রিপাঠি এবং অন্যান্য মন্ত্রীরাও বসে আছেন এবং আমি বাজাচ্ছি। ফটোটা দেখে বললাম, 'এই ফটো কোথায় পেলেন? আমি তো এ ফটো দেখি নি।' হেসে বললেন, 'আমাদের কাছে সব খবর আসে। তুমি এই ফটোটা রেখে দাও।' কিছুক্ষণ গল্প করে বললেন, 'চলো আমার বাড়ী। রেডিও স্টেশনের সামনেই একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি।' বৃহস্পতির প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ছিলো। তাঁর মৃত্যুর পর, কিছুদিন হোল দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন, এ কথা জানিয়ে আমায় চিঠি দিয়েছিলো। বাড়ীতে গিয়েই আমাকে দেখিয়েই, নিজের স্ত্রীকে বললেন, 'বেগম, এ হোল আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।' এই কথা বলে অমার নাম এবং পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রীর নাম সুলোচনা যদুর্বেদি। কলেজের অধ্যাপিকা, এ ছাড়া মুস্তাক হুসেন যাঁর কাছে আগে গান শিখেছে এবং এখনও রোজ অভ্যাস করে। তোমাকে ওর গান শোনাবো।' নমস্কার বিনিময়ের পরে চা বানাতে বললেন স্ত্রীকে। নিজের পরিধেয় বস্ত্র বদলে, লুঙ্গি পরে বিছানার গদিতে বসেই বললেন,

'জানি তুমি অবাক হয়েছো আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছি বলে। আমার প্রথমা স্ত্রী, দুইটী বড় ছেলে এবং মেয়েকে রেখে মারা যায়। মেয়ের বিয়ে এবারে দিচ্ছি। সে চলে যাবে স্বামীর কাছে। ছেলেরাও একটু বড় হয়েছে। কিছুদিন পরে চাকরী করে অন্য জায়গায় চলে যাবে। তখন আমাকে কে দেখবে? সেই ভেবেই বিয়ে করেছি। সে আমাকে দেখবে। আমার আত্মীয়স্বজনরা আমায় ভাল ভাবে গ্রহণ করে নি। কিন্তু আমি একটাই কথা বুঝি। আগে জীবন পরে সমাজ। আগে সংগ্রাম পরে শান্তি। যে মিলনের ভিত্তিতে রুচি ও সহৃদয়তার ঐক্য বর্ত্তমান, সেই মিলনই যথার্থ মিলন। আমার আত্মীয়রা কি বলছে, সে নিয়ে আমি পরোয়া করি না। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করেছি। দুই আর দুই এ চার। এর আবার কেন কি? আমার কিছু হলে, কেউ কি বিপদে দেখাশোনা করবে? আমি তো পণ্ডিত এবং উস্তাদের মত নানা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি না। জানি লোকে আমার অসাক্ষাৎএ, এই নিয়ে আলোচনা করে। মৈঁ উফ ভি করতা হুঁ, হো যাতা হুঁ বদনাম ঔর ওহ কতল ভি করতে হঁয়, চর্চা নহিঁ হোতে।

আমি একটাই কথা বলি। পথে যে নামে সেই পথ খুঁজে পায়। চলতে যে জানে সেই খুঁজে পায় পথের সঙ্গী। আদর্শ যাঁর সত্য, কর্মধারাও তাঁর নির্ভুল। যুদ্ধ করবার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যুদ্ধ চালাবার অস্ত্র সে ঠিকই আবিষ্কার করে। এই সত্যটা সকলের চোখে পড়ে না। যা করছি বেশ করছি। আমি তো অন্যের বউকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছি না।'

আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে সেই পুরোনো দিনের কথা, সত্যই বৃহস্পতির কথার মধ্যে যুক্তি ছিলো। যদি সে বিবাহ না করতো, তাহলে তার মৃত্যুর পর কে দিল্লীতে নিয়ে এসে দাহ সংস্কার করতো?

পাঠক হয়ত ভাবছেন যে লোক মরে গেছে, তাঁর বিষয়ে এই সব লেখার কারণ কি? কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। সেই কারণটাই এবারে বলি। রেডিওর প্রোডিউসার অফ মিউজিক হবার জন্য, ভারতের সব শিল্পীর সঙ্গেই তাঁর জানাশোনা ছিলো। বৃহস্পতি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তবে অনেকের সঙ্গে সহজ হলেও, ইয়ারকি সীমিত লোকের সঙ্গেই করতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ এবং আমার সঙ্গে, প্রাণখোলা এবং আদিরস নিয়ে কথা বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হ'তো।

বৃহস্পতির মতো সংস্কৃতে, হিন্দিতে এবং সঙ্গীতের থিওরিতে এত পণ্ডিত লোক কমই দেখেছি। বৃহস্পতি আমার কাছে বন্ধুর মতো ছিলেন। কিন্তু ওই একটা কিন্তু আছে। সেই কিন্তুটার জন্য, কত বড় অঘটন ঘটে গেল আমার জীবনে। যাক সে কথা পরে।

বৃহস্পতির কাছে তাঁর বিবাহের সংবাদ শুনে খুব সহজ ভাবেই বললাম, 'যা হবার তা হবেই। আমাদের জীবনের টেপ রেকর্ডে যে বাজনা হয়ে আছে, তাকে কি কেউ বদলাতে পারবে। যাক আপনার কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। বাবার সঙ্গে কি আপনার পরিচয় ছিলো?' উত্তরে বললেন, 'বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, তবে রেডিওতে তাঁর বাজনা অনেক শুনেছি। আসলে আমার পূর্বপুরুষ রামপুর দরবারের বংশানুক্রমিক পুরোহিত ছিলেন। রামপুর দরবারে উজির খাঁর কাছে যখন বাবা শিখতে গিয়েছিলেন, সেই সময়

আমার সঙ্গে দেখা হবার প্রশ্নই আসে না। তবে রামপুরের সেনী ঘরাণার সঙ্গীতের ইতিহাস আমি সব জানি। বোধ হয় তোমার মনে আছে, কানপুরে তোমাকে উজির খাঁনি শুনব বলে তোমাকে বাজাতে অনুরোধ করেছিলাম।' বুঝলাম বাবার সম্বন্ধে কোন তথ্য পাব না।

বন্ধু হিসেবে বৃহস্পতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু বোধ হয় আমারই ভাগ্যদোষ, হঠাৎ উনি আমার জীবনে শনি হয়ে গেলেন। এই বার পরিবর্তনটা কিন্তু আমার জন্য হয় নি। আসল ব্যাপার হোল আমার ধমনীতে বোধ হয় কোথাও দুর্গেশ দুমরাজের মত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাই

'প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে বিরোধ মেটাতে আজ,
দুর্গ দুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ দুর্গেশ দুমরাজ।'

বোধ হয় আমার জীবনের পরিণতি। গুরু, গুরু পুত্র, অন্নপূর্ণাদেবী এবং তাঁর সৌজন্যে রবিশঙ্করের এই চারজনের নিন্দা আমার প্রিয়তম স্বজনরা করলেও আমি সেটাকে সহজে মেনে নিই না। বিরোধ করেছি। যদিও পরে বুঝেছি, আমার এই সেকেলে বোকামীকে রবিশঙ্কর, আলিআকবর নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করেছে, যার ফলে তাঁদের শেখান বুলি যে, যে লোকের কাছে আমার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আছে, তাঁদের মুখ দিয়ে বলিয়ে আমাকে উত্তেজিত করিয়ে, হেনস্তা করেছে। যন্ত্রণা হোল আমার ধোলাই, ধারে এবং ভারে। পরে দেখেছি সেই নিন্দা করা মুখ মানিক জোড়ের পরম বন্ধু হয়ে গিয়েছে। এ যেন দোজখ্ আর শয়তানের আম দুধের মিলন। মাঝখান থেকে আমি আঁঠি হয়েছি। তথাপি একটা সান্ত্বনা, আমি এঁদের উচ্ছিষ্ট হই নি। ওঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁদের উচ্ছিষ্ট ভুখের শ্রেণীতে আমাকে খুঁজে পাবে না। বৃহস্পতির সঙ্গেও হোল তাই। প্রথমে একটা উর্দু-সংবাদপত্রের সমাচার দিল্লীতে রবিশঙ্কর এবং অন্নপূর্ণাদেবীর যুগল বন্দীর সমালোচনা বৃহস্পতি পড়ে শোনাল। সমালোচক লিখেছেন, 'দুজনের দ্বৈত বাজনা শুনে মনে হোল অন্নপূর্ণাদেবীর তুলনায় রবিশঙ্কর একটা শিশু।' সত্যি বলতে কি, মনে একটা নির্মল আনন্দ হোল অন্নপূর্ণাদেবীর মাদার মেরীর সমতুল্য বর্ণনা দেখে। কিন্তু মিষ্টির স্বাদ আচমকা অম্ল হয়ে গেল, যখন বৃহস্পতি প্রসঙ্গান্তর করলেন।

রবিশঙ্কর মাতোয়ারা ছন্দে বিদেশীদের ধামার বোঝানর জন্য গান গেয়েছে। মাত্রার যোগ চৌদ্দই ছিলো কিন্তু তালের ছন্দ বিভাজন ছিল খেয়াল খুশী। আগেই বলেছি বৃহস্পতি পণ্ডিত লোক। তিনি রেকর্ডটা শুনিয়ে আমাকে বললেন, 'তোমার বুকের পাটা আছে, জনসমক্ষে রবিশঙ্করের নিন্দা করার।' প্রথমে তো ভেবেই পেলাম না একটা নিন্দা করার জন্য আমাকে কেন ধরা হচ্ছে। তিনি তো নিজেই যোগ্য লোক। আসলে সকলেই চিন্তা করে, হু উইল বেল দি ক্যাট।'

বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল, যখন তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বললেন, 'ওঁরা যে হেতু তোমার নিন্দা করে, এটা একটা পালটা ঘা দেবার সময়। আর এটা যদি সফল ভাবে করতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে তুঙ্গে বসাবো।' আমি জানি তাঁর ক্ষমতা কি? তিনি পারেন। হিন্দিতে বলে, 'ঔকাৎ বালা চাহে তো লাখ মিলায়ে, চাহে তো ভাত খিলায়ে।' কিন্তু ভেতো বাঙ্গালী হওয়া সত্ত্বেও ভাল খাওয়া কপালে জুটল না।

ভদ্রলোককে, খামোকা ফরাস ডাঙ্গার ধুতির মত পাট করে ফেললাম। আগেই বলেছি প্রতিশোধ নেবে। আর তা নিলও। আকাশবাণীতে আমার অজান্তে লেখা হয়ে গেল, আমি চোদ্দ বছর 'যন্ত্র-সন্যাস' নিয়েছি। এক যুগ পরে যখন আমার সামনে এই তথ্য এলো, আমার গলার কণ্ঠাটা কয়েকবার ওঠা-নামা করল। এক চাপ ঘৃণা কোন রকমে গলাধঃকরণ করলাম। কিন্তু এই ঘটনার পর যাঁর জন্য লড়াই করেছিলাম, তাঁকে দেখলাম দন্তবিকশিত করে বন্ধুত্বের চাটুকারিতা করতে। যাঁরা স্বেচ্ছায় পতিত হতে চায়, তাঁদের আমার কি সাধ্য আছে সৎ করার।

আমার সো কলড স্বজনরা মনে হয়, এই লঘু নাটিকার পটকথার রচনা করেছিল। মজার ব্যাপার বৃহস্পতি, তিনি আমার জীবনের বার পরিবর্তন হয়ে শনি হয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে বুঝতে দেন নি এবং আমার সদভাবনার সুন্দর যোগাযোগ শুধু মাত্র ওনার চাকরি জীবনের শেষ পর্যন্তই নয়, ওর আমৃত্যু আমার সঙ্গে ছিলো। বুঝলাম এ জগৎটা মহানাট্য লীলা। হীরো ভাল অভিনয় করতে পারেন, কিন্তু লাইটম্যান যদি তাঁর ওপর থেকে স্পটাকে সরিয়ে দেয়, হীরো মঞ্চেতে থাকলেও, অন্তরালে চলে যায়। আমি 'যন্ত্র-গৃহস্থ' কিন্তু প্রচারিত হলাম 'যন্ত্র-বিবাগী' বলে। একেই বলে ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

৬৪

বাবার উপর বই লিখতে গিয়ে বাবার অনেক কথা লিখতে বিপদে পড়লাম। বাবা এবং মা, নিজের দেশের ভাষায় কি সব ছড়া বলতেন, তা অতুলনীয়। কিন্তু সেই সব ছড়া বাংলায় লিখলে, যে আনন্দ পাওয়া যায়, তার অনুবাদ ইংরেজীতে লিখলে, অভারতীয়দের কাছে তার রসাস্বাদন সম্ভব নয়। হয়ত লিখতে পারতাম। কিন্তু ইংরেজী বইতে লিখি নি। সেগুলি লিখতে গেলেই বাধ্য হয়ে আমাকে লিখতে হ'তো আমার সামনে কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, বাবা এবং মা সেই সব কথা বলেছিলেন। সেইসব কথা লিখতে গেলেই লিখতে হ'তো আমার সামনে বাবা কি কি কথা বলেছিলেন। তাহলেই আমি কথাটা এসে যেতো। 'আমি' কথাটা এড়িয়েই যাওয়াই নিয়ম। সেইজন্য বহু ঘটনা বাদ দিয়ে, ইংরেজী বই লিখতে লাগলাম। বাবার ছবির সঙ্গে যে জায়গায় আমি উপস্থিত, সেই জায়গায় ক্যাপসান লিখতে গিয়ে, নিজের নাম বাদ দেওয়া স্থির করলাম। কিন্তু সেইসময় যে সব কথা লিখিনি, সেই সব কথা যে দীর্ঘ দিন পরে লিখব, সে কথা কল্পনাও করি নি। কিন্তু বাংলা ভাষায়, বাবার কথা লিখতে গিয়ে মৈহারে কি কি দেখেছি, সাক্ষাৎকারে কি কি জিনিষ সংগ্রহ করেছি, সেই সব কথা পরিষ্কার করে লিখব। ইংরেজী বই লেখার কাজ যদিও প্রায় শেষ করেছি, কিন্তু তখন কি জানতাম বই ছাপাতে আমার ছয় সাত বছর লেগে যাবে? অবশ্য কিছুই বৃথা যায় না। বই প্রকাশনের দেরী হওয়ার ফলে, অনেক নূতন তথ্যও পেলাম। একদিক দিয়ে ভালই হোল। ভেবেছিলাম বাবার মৃত্যু পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সেই সব কথা লিখেই বই শেষ করব। কিন্তু বিধি বাম। বই প্রকাশ বাবার জীবিত কালে হয় নি। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছিলো। বাবা সেগুলো দেখেন নি, যার ফলে আমাকে পড়ে শোনাতেও হয় নি। কিন্তু এখন আমি পেয়েছি অধিকার। বাবার স্বপ্ন কি ছিলো, কোথায় গিয়ে উপস্থিত দাঁড়িয়েছে, সেটা না

লিখলে নিজের কাছে অপরাধী হব, কেননা কত লোককে দীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে জবাবদিহি করব? কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের দুটো ছত্র মনে পড়ছে। আমার সো কলড স্বজনদের কৃপায়, বাজনার থেকে মুক্ত হবার দাখিল হলাম। স্বাভাবিক ভাবেই আমি হলাম সক্রিয় বেকার। তাই স্থির করলাম, ইতিহাসের দেওয়ালে একটা আগাম ওঁদের ভবিষ্যৎটা লিখে রাখি। কবিতাটা বার বার মনে মনে আওড়াতে লাগলাম।

'দেওয়ালে দেওয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কথা।
আমি তো বেকার পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা।'

বাবার বিষয়ে লেখা কি এত সহজ? বাবা গত হয়েছেন একবছরের উপর। বছর যে কিভাবে শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

নূতন বছরে চিন্তায় যুদ্ধে একটা নূতন ফ্রন্ট খুললো। যে সম্পর্ক আমি অকপটে স্বীকার করতে পারি যে শত প্রতি শত অনভিজ্ঞ ছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে কোলকাতার এক পাঠ্য পুস্তক প্রকাশক যিনি আমার পূর্বপরিচিত, কাশীতে এসে বললেন, 'শুনলাম আপনি নাকি একটা বই লিখছেন ইংরাজীতে?' বললাম, 'আপনি জানলেন কি করে?' বললেন, 'ও সব খবর কি চাপা থাকে? দেখবেন যেন ভাল প্রকাশক ছাপে। কারণ যাঁর কাছে বিদেশে রপ্তানি করার অনুমতি আছে, সেই কিন্তু বইটাকে বাজারে ধরাতে পারবে। এরকম একটা তথ্য সমৃদ্ধ বই ইংরেজীতে লিখছেন, ভারতের কজন বুঝবে? এঁর কাটতি তো বিদেশে।' অবাক হয়ে বললাম, 'সে কথা তো ভাবি নি। সেই রকম প্রকাশক কে? যাঁর বিদেশে রপ্তানি করবার অনুমতি আছে।' বন্ধুবর বললেন, 'ভারতের অনেক প্রকাশকই আছেন কিন্তু কলম্যান কোম্পানি কিংবা অন্য বিদেশী প্রকাশকের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করে বইটা ছাপতে পারেন, তাহলে রাতারাতি বিশ্ব মার্কেটে ছড়িয়ে পড়বে।' বন্ধুবর আমার অবাক ভাব দেখে বোধহয় বুঝতে পেরে, গোটাকয়েক প্রকাশকের নাম লিখে দিলেন যোগাযোগ করবার জন্য। দেশী এবং বিদেশী প্রকাশকদের মধ্যে কি তফাৎ, সে বিষয়ে বিশদভাবে আরো নানা কথা যা বললেন, সেটা আমার কাছে বিস্ময়। বুঝলাম কেবল বই লিখলেই চলবে না, তারপরেও আছে এক বিরাট অধ্যায়।

পরে বুঝেছি সৎ গুরু খোঁজার মত, সৎ প্রকাশক খোঁজা কঠিন। সেই পরশ পাথর খোঁজার বৃত্তান্ত পরে লিখব। শুধু চিন্তার মেহগনি কাঠে ঘুন ধরল। এ কথা তো চিন্তাই করি নি। লেখার জোয়ারে যেন ভাঁটা পড়ল। পরের কথা, পরে চিন্তা করব ভেবে, এক নাগাড়ে বই লিখতে লাগলাম।

দিন রাত পাঁচমাস লেখবার পর, বই লেখা শেষ হোল। ইতিমধ্যে গৌহাটি বাঙ্গালী এসোসিয়েশান এর তরফ থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। মনে হোল, একদিক দিয়ে ভালোই হোল। এই ফাঁকে কোলকাতায় কয়েকটা প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করতে পারব। কাশীতে, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এনড হিজ মিউজিক' লেখাটার এক কপি টাইপ করিয়ে কোলকাতায় গেলাম।

কোলকাতায় গিয়ে জানতে পারলাম, দুই বছর আগে লং প্লেয়িং রেকর্ড যে টেপ করা

হয়েছিল, সেটা বেরোবে পুজোর সময়। রেকর্ডের কভারিং হয়ে গিয়েছে। দেখলাম কভারিং এ আমার পরিচিতি লিখেছেন বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমার পরিচিত প্রকাশকের কথা। প্রকাশক বলেছিলেন, কোন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞকে দিয়ে বইএর ফরওয়ার্ড লেখাতে হবে। মনে মনে ভাবলাম, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির মত যোগ্য ব্যক্তি যদি আমার বইটির ভূমিকা লিখে দেন, তাহলে খুব ভাল হয়। এইচ. এম. ভি যখন লং প্লেয়িং রেকর্ড পরিচিতি লিখিয়েছেন এত সুন্দরভাবে, তাহলে বইটার ভূমিকা লিখতে বললে নিশ্চয়ই লিখে দেবেন।

আমার বই লিখবার জন্য দুইবছর আগে বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। পরের দিনই বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখলাম, একটি মেয়েকে সঙ্গীতের থিয়োরি পড়াচ্ছেন। দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'বই লেখা কতদূর এগোল?' বুঝলাম এই বয়সেও স্মরণ শক্তি প্রখর। বললাম, 'বই লেখাটা শেষ করেছি।' প্রতিটি অধ্যায়ের কিছু কিছু পড়ে শোনালাম। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শুনে বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আপনার ভাল লেগেছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি আপনার কাছে আজ এসেছি একটা প্রার্থনা নিয়ে। আমার বই-এর ফরওয়ার্ড আপনাকে লিখে দিতে হবে।' বললেন, 'নিশ্চয় লিখে দেব। আজ লিখে টাইপ করে রাখবো। আগামীকাল সকালে এসে নিয়ে যেয়ো।' মনটা আনন্দে ভরে উঠল। পরের দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপ করা ফরওয়ার্ডটি আমায় দিলেন। মেঘ না চাইতে জল পেলাম।

আমার বন্ধু রণজিৎ কুণ্ডুর কাছে বইএর পাণ্ডুলিপি রেখে দিয়ে গৌহাটি গেলাম। বাজাবার সময় প্রথম সারিতে শিপ্রা ব্যানার্জিকে দেখে অবাক হলাম। এ যাবৎ গৌহাটিতে কয়েকবার বাজিয়েছি। আমার ছাত্রর কাছে শুনেছিলাম, শিপ্রা গৌহাটি কটন কলেজে ইংরেজীর প্রফেসার পদে নিযুক্ত আছে। কিন্তু কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু এবারে বাজাবার পর যে সময় আমার কাছে এলো, বললাম, 'বাবার আজ্ঞায় একটা বই লিখছি। বহু লোক, যাঁরা বাবাকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আপনিও তো বহুদিন বাবাকে দেখছেন সেইজন্য আপনারও একটা সাক্ষাৎকার নেব।' উত্তরে শিপ্রা বলল, 'আমার কাছে কি সাক্ষাৎকার নেবেন?' বললাম, 'আপনি তো দীর্ঘদিন বাবাকে দেখেছেন। হতে পারে কথায় কথায় কোন সামগ্রী আমি পেতে পারি।' উত্তরে বলল, 'ঠিক আছে। আমার কলেজে কাল সকাল এগারটায় ক্লাশ আছে। আপনি যদি আমার কলেজে সেই সময় আসেন, তাহলে আমার গাড়ীতে আপনাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। আমার ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন। বিকেলে চা খাওয়ার পর আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেব।'

পরের দিন সকালে ঠিক সময়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, শিপ্রা নিজের গাড়ীতে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেল। গাড়ী চলছে তো চলছে। বুঝলাম, গৌহাটি শহর থেকে বেশ দূরেই থাকে। বাড়ীটার চারিদিকে দেখেছি লোকবসতি খুব কম। খুব নির্জন জায়গা।

শিপ্রাকে প্রথমে মৈহারেই কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু কোন কথা হয়নি বাবার জন্য। মৈহার ছাড়ার পর বম্বেতে আলিআকবরের সামনে কেবল নমস্কার বিনিময় হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ ষোল বছর পর তাঁর সঙ্গে দেখা। নির্জন জায়গা দেখে মনে হোল, সাধনার জন্য খুব মনোরম জায়গা। বললাম, 'সাধনার জন্য জায়গাটা তো খুব ভালো। বাজনা কতক্ষণ বাজান?' উত্তরে সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'বাজাই রোজ, তবে বেশী সময় দিতে পারি না।' খাবার খেতে খেতে বিকেল পর্যন্ত অনেক কথা হোল। তারপর আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। মনে মনে ভাবলাম, বিধাতার লিখন কি বদলানো যায়? কোথায় দেরাদুন এর মেয়ে লেখাপড়া করে, বাজনা শিখে, সুদুর গৌহাটিতে অবিবাহিতা অবস্থায় অধ্যাপিকার কাজ করছে। শিপ্রার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা।

গৌহাটি থেকে কোলকাতায় ফিরে এলাম। কোলকাতায় এসে একজন পাবলিশার-এর সঙ্গে দেখা করলাম। পাবলিশার আমার পাণ্ডুলিপি দেখে বললেন, 'আপনি যদি পাণ্ডুলিপি রেখে যান তাহলে আমাদের কমিটির মধ্যে আলোচনা করে তিন মাস পরে আপনাকে জানাব। যদিও লেখাটা আমার খুব ভাল লেগেছে তবে আমাদের প্যানেলে তিনজনের মত নিয়ে বই প্রকাশ করি।' আমার প্রকাশক বন্ধু বারবার বলেছিলো, পাণ্ডুলিপি বিদেশী প্রকাশককে দিতে পারো, কিন্তু সাধারণ পাবলিশার-এর কাছে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কখনও দিও না।' সেই কথা স্মরণ করে বললাম, 'উপস্থিত এই পাণ্ডুলিপির মধ্যে আরো কিছু যোগ করব। এ ছাড়া আমার কাছে কেবল একটি কপিই আছে। এই পাণ্ডুলিপির তিন কপি করিয়ে, তারপর আপনাকে দেব।' মনে মনে ভেবেছিলাম বইটা এই বছরেই প্রকাশ হয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা। তখন কি জানতাম, বইটা প্রকাশিত হবে দীর্ঘ পাঁচবছর পরে। আমি কর্মতে বিশ্বাস করলেও, ভাগ্যবাদী। বিধি যখন মাপান না, তখন ঘাসকুটোও চাপে না। এই বিধির ব্যাপারটা, জীবনে একাধিকবার পেয়েছি। আর আমার জীবনে ভবিতব্যটা বড় বিচিত্র আর প্রবল। কিন্তু আমার ভবিতব্য আমাকে দেরীতে দিলেও, দেরী পুষিয়ে দিয়েছে। বই এর ব্যাপারেও তাই ঘটল, যা শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশিতব্য।

সাধারণ লোককে, ভগবান কথা বলতে দিয়েছেন, তাঁদের পেটের কথা মুখে প্রকাশ করবার জন্য, এবং জ্ঞানী লোককে দিয়েছেন সেটা চেপে রাখবার জন্য। আমি সাধারণ লোক তাই চেপে রাখতে পারি নি। সেইজন্য আজ অকপটে সব জানাচ্ছি, যে সব কথা আজও হয়নি বলা। নাদিম হিকমতের সুর মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, 'আমার এই বই সেই অসংখ্যদের জন্য, যাঁরা সঙ্গীতকে ভালবাসেন। আর যে কটা দিন হারিয়ে গেল, এটাকে লিখতে গিয়ে সফল হলে, বুঝব জীবনের হারান বছরগুলো, একটা কথার কথা।'

গরম কালটা কাশীতে বেদনাদায়ক। একটু আরাম তাঁদের পক্ষে সম্ভব, যাঁদের গলিতে বাড়ী আর একতলায় বসবাসযোগ্য ঘর আছে। আমার পৈতৃক বাড়ী ঘটনাক্রমে এই দুটো গুণেরই অধিকারি। তাই ছোট বাড়ীর নিচের ঘরটাই আমার রিয়াজের বা থাকার জন্য মৌরসী পাট্টা। তার উপরে ট্রাডিশনাল পণ্ডিতের বাড়ী, তাই আমার বাড়ীতে অতিথি সমাগম হলেও, আড্ডা আর বিজনেস টক বাড়ীর চৌহদ্দিতে না করে এড়িয়ে চলতাম। আর এই এড়িয়ে চলার প্রশ্রয় পেতাম, আমার এক কুটুম্বের সৌজন্যে। আমার বাড়ী থেকে একটু দূরেই, কাশীর বিখ্যাত বাঙ্গালী হোটেল ছিল তাঁদের।

রথ দেখা আর কলা বেচা। স্বভাব স্বার্থে আড্ডা করতে যেতাম আর আমার সেই উপস্থিতিটাই বহির বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের স্থান বা সূত্র হ'তো। একদিন শুনলাম ওঁদের কর্তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, 'বাবার দর্শন করতে যাব সন্ধেবেলায়।' কান খাড়া করলাম। বাবাটি কে? ওই আমার স্বভাব। ক দেখলে কৃষ্ণ মনে পড়ে। একগাল হেসে ওঁরা বললেন, 'এ তোমার গুরুদেব বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব নন। ইনি আমাদের গুরুদেব, বাবা সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।'

আমার উস্তাদ বাবা বলতেন 'ঈশ্বর কোন বেশে আসে জানি না বাবা।' তাই আমার কৌতূহল হোল এই বাবা সম্বন্ধে জানবার। কিন্তু আমার বলবার আগেই, তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি যেন তাঁদের সাথে যাই। একথাও তাঁরা শোনালেন যে, বাবা বিদগ্ধ সংস্কৃতের পণ্ডিত, অসাধারণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী, কিন্তু জীবন যাপন করেন সাত্ত্বিক তপস্বীর মত।

এ এক মহা যন্ত্রণা। সাতবছর মৈহারে থাকার পরিণাম। উর্দুতে বলে, হুবহু প্রভাবিত হওয়াকে, 'গুসুল কি আদত ভি নকল কর লিয়া।' আমারও তাই। বাবার বহু জিনিষ আমার অজান্তে প্রতিফলিত হয়েছে আমার জীবনে। এক টুকরো স্ফটিক ছিলাম। বাবার ব্যক্তিত্বের রক্তজবার কাছে এসে লাল রক্ত সংক্রামিত হয়েছে।

বাবা অতিবিশিষ্ট কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে, যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বলতেন, 'আমি তো কথা বলতে পারি না, আমার যন্ত্র কথা বলবে।' আর আমি ভাবলাম, সন্ত দর্শনে যাচ্ছি যখন, ফুল মালা না নিয়ে, আমার সঙ্গীতের অর্ঘটাই নিয়ে যাই না কেন? ফুল মালাতে তো আমি আশীর্বাদ পেতাম, আর যন্ত্রে পাব সঙ্গীত।

আমার এই প্রস্তাবটি শোনামাত্র, সেখানে উপস্থিত প্রচুর ভক্তবৃন্দ উল্লাস ব্যক্ত করলেন, কারণ বাবা সঙ্গীতের একজন বিদগ্ধ বোদ্ধা এবং তিনি বিশ্বাস করেন, নাম গানেতেই মুক্তি। গেলাম, বাজালাম। সংগত করলো মৃদঙ্গে অমরনাথ মিশ্র। সঙ্গে গেলেন কবিরাজ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

এখানে আমি, আমি করে উল্লেখটা সাবজেক্ট নয়, প্রেডিকেট। অর্থাৎ এই সমস্ত প্রকরণে আমি কর্তা। কর্তা অন্য ব্যক্তি, যে নিজের জীবনে শতাধিক চাতুর্যে, আর একটা শঠতা সংযোজন করল। যাক সে পরের কথা।

বাজনার পরের দিন ওঙ্কার বাবার শিষ্যদের হোটেলে উপস্থিত দেখলাম। ওঙ্কার বাবার এক দীক্ষিত শিষ্য আমাকে দেখেই বললেন, 'আমাদের গুরুদেব, আপনার বাজনা শুনে গতকাল এত খুশী হয়েছেন যে সময় মত একদিন আবার বাজনা শুনবেন। গতকাল বাজনা শুনে এত বিভোর হয়েছিলেন, যার ফলে কিছু খাবার না খেয়ে আঙ্গুল স্পর্শ করে আমাদের জন্য ভোগ করে দিয়েছিলেন।

এই কথাবার্তার ফাঁকে, রবিশঙ্করের কাশীর প্রতিনিধি, দুবে এসে হাজির। দুবে বলল, 'আগামী কাল গুরুজী প্লেনে দিল্লী থেকে আসছেন। গুরুজী নিজের জীবনের উপর একটা ডকুমেন্টরি ফিল্ম তৈরী করছেন। সব টেকনিসিয়ান নিয়ে আসছেন। গুরুজী বলেছেন,

আপনাকে এবং আশুতোষকে উপস্থিত থাকতে। আগামীকাল সকালে এসে আপনাকে এবং আশুবাবুকে গাড়ী করে এরোড্রামে নিয়ে যাব। এখন আমার অনেক কাজ করতে হবে। উপস্থিত আশুবাবুকে গিয়ে তাঁর ডিসপেনসারিতে খবর দিয়ে চলে যাব।'

ওঙ্কার বাবার এক শিষ্য, দুবের কথা শুনে আমাকে বললেন, 'আচ্ছা একটা কথা বলুন তো? কবিরাজ আশুতোষ ভট্টাচার্য কি আপনার দাদা?' সারা ভারতবর্ষে, একমাত্র কোলকাতার বহু লোকই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে এই সম্বন্ধের কথা। তানসেনের কর্ণধার শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, কোলকাতায় আশুতোষের নাম সকলেই জানে। তানসেন কনফারেন্সে প্রতিবছর দীর্ঘদিন গিয়েছেন। বাজিয়েছেন বাবা, আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সঙ্গে। সেইজন্য কোলকাতায় একসময় সকলেই তাঁকে চিনত।

এ যাবৎ কোলকাতায় বহু লোককে যে উত্তর দিয়েছি সেই কথাই বললাম। আগে উত্তরটা হ'তো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আজ উত্তরটা স্পষ্টীকরণ করে বললাম, 'ব্যাপারটা হোল, শহর আর ভট্টাচার্য কমন্, আর কমন্ হোল সঙ্গীত, তাই অসুবিধাটার সূত্রপাত। আগেও সত্যটা ধামা চাপা দিতাম এক কথায়। এখনও কটু বলে এড়াতে চাই। আর সেটা হোল এই যে, শুধু মাত্র জর্দা দিয়ে পান খাওয়া ছাড়া, ওর সঙ্গে আমার কোন কিছু কমন নাই। আমরা প্র্যাকটিকালি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আমি প্রফেসানাল আর উমি এ্যামেচার। আমি যন্ত্রী। উনি সঙ্গতকার। আমার ঝোঁক লয়ের দিকে, ওর আখরোটের কাঠিন্যে পছন্দ নয়, যতই ভাল হোক না কেন শাঁসটা। একবার সঙ্কটমোচনের অমরনাথ মিশ্রর কথায়, একটা আনকমনের সূচিপত্র তৈরী করি। তাতে সাতানব্বইটা বিপরীত আচরণ, একে অপরের মধ্যে পাচ্ছি, যেমন রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরের স্তাবকত্ব। একে অপরের বিরুদ্ধে কান ভরা, হাঁতে হাঁ, এবং না তে না, আমার দ্বারায় হোল না। যাক তথাপি ভদ্রলোক এক মজার মানুষ। ওর অর্থ খুঁজতে গেলে, জামার ভিতর জামা হাতড়ে পকেট খুঁজতে হবে।'

পরের দিন গাড়ী করে আশুতোষ এবং আমি এরোড্রামে গেলাম। দেখলাম, কাশীর প্রতিষ্ঠিত দশবারোজন এসেছেন। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কাশীর মিউজিক কনফারেন্সের সেক্রেটারি এবং সদস্যবৃন্দ। প্লেন এলো। দেখলাম রবিশঙ্কর, কমলা এবং পাঁচ ছয়জন বিদেশীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছেন। দেখা হতেই রবিশঙ্কর বলল, 'আগামীকাল সকালে বাঙ্গালী হোটেলে থেকো। আমার ইউনিটের সকলকে নিয়ে আজ দুরে বিশ্বনাথ মন্দির এবং বিশ্বনাথ গলি দেখাবে। যার ফলে আগামীকাল শুটিং করতে কোন অসুবিধা না হয়। রবিশঙ্কর সকলের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। লাগেজ আসতে দেখলাম, সুটিং করবার জন্য নানা সামগ্রী আসছে।

পরের দিন নির্দ্ধারিত সময়ে বিশ্বনাথ গলিতে গিয়ে দেখলাম, ইউনিট-এর লোকেরা বহু দূরে ক্যামেরা সেট করছে। রবিশঙ্কর এবং দুবেকে দেখলাম। দুবে আমাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আজ ডকুমেন্টারির প্রথম দৃশ্যটা নেওয়া হবে একটা দোকানের সামনে। ব্যাপারটা হোল, বিশ্বনাথ দর্শন করে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে গুরুজী কয়েকজন লোকের সঙ্গে দু'দিকের দোকান দেখতে দেখতে আসছেন। দোকানের লোকেরা, গুরুজীকে দেখে

হাত জোড় করে নমস্কার করবে এবং গুরুজী হেসে সকলকে প্রতি নমস্কার করতে করতে এগিয়ে যাবেন। দাদা একটা খুব ভাল সুযোগ এসে গেছে। গুরুজী যখন উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে আসবেন, সেই সময় আপনি যদি দক্ষিণ দিক থেকে যাবার সময় গুরুজীকে প্রণাম করেন, তা হলে গুরুজী হেসে আপনাকে দেখে এগিয়ে যাবেন এবং আপনি সেই সময় উল্টো পথে চলে যাবেন। এই হোলে গুরুজীর ফিল্মে আপনিও এসে যাবেন।'

কথাটা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ধৃষ্টতা দেখে, কেননা ব্যাপারটা কেবল অশালীনই নয়, উর্দুতে বলতে গেলে, 'বেঅদব বদতমিজি'। বললাম, 'এটা তোমার কল্পনা প্রসূত, না রবিশঙ্কর তোমাকে বলেছেন।' দুবে একটু থতমত খেয়ে বলল, 'এটা অবশ্য আমিই চিন্তা করে গুরুজীকে বলেছি। আমার কথা শুনে গুরুজী সম্মতি জানিয়েছে।' হঠাৎ দুবের দৃষ্টিটা অন্য দিকে হওয়াতে, তাকিয়ে দেখলাম, রবিশঙ্কর তাকিয়ে আছে দুবের দিকে।

আমার হাসি পেল। ভাবলাম বাবার যে সময় শতবার্ষিকী হোল ভূপালে, সেইসময় আমার কথা মনে আসে নি। এ ছাড়া বাবার উপর মৈহারে যে সময় ফিচার ফিল্ম তৈরী করেছিলে, সে সময়েও আমার কথা মনে আসে নি। অথচ আজ আমি রবিশঙ্করের ফিল্মে স্থান পাচ্ছি, কি ভূমিকায়? এতদিনে আমাকে সুযোগ দিচ্ছে, যার ফলে ফিল্মে সকলেই আমাকে দেখতে পাবে।

হঠাৎ বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা বলতেন, 'আমি হলাম বুদ্ধিমান আর সব গরু। জান না যে যারে ঠকাতে যায় সে তার গুরু।' কথায় আছে সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। সেইরকম রবিশঙ্করের সব পরিকল্পনা বুঝতে পারলাম। সে হাঁ করলেই তার মনের হাওড়ায় পৌঁছে যাই।

রবিশঙ্কর এতক্ষণে আমাকে ডেকে বলল, 'আরে শোন, তোমাকে দুবে কিছু বলেছে?' বললাম, 'হাঁ।' রবিশঙ্কর বলল, 'আমার ডকুমেন্টারি ছবিটাতে, এই ফাঁকে তুমিও এসে যাবে।' বললাম, 'ঠিক আছে।' হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগল। সুটিং-এর সব ব্যবস্থা হয়ে যে সময় রবিশঙ্কর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে আসতে লাগল, সেই সময় দুবে আমাকে বলল, 'দাদা যেমন বলেছি সেইরকম করবেন। এবারে আপনি যান।' দুবের কথামত, আমি প্রণাম না করে, রবিশঙ্করের দুটো হাত জড়িয়ে বললাম, 'জবাব নাই।' রবিশঙ্করকে অগ্রসর হতে দিলাম না। বাধ্য হয়ে রবিশঙ্করকে দাঁড়িয়ে যেতে হোল। সঙ্গে সঙ্গে রবিশঙ্কর কাট, কাট, বলে আমাকে বললো, 'এটা তুমি কি করলে?' বললাম, 'কি করলাম? দেখুন এ সব জিনিষ কখনও তো করি নি, তাই আবেগের চোটে জড়িয়ে ধরেছি। আপনি অন্য কাউকে দিয়ে এই রোলটা করান। আমার দ্বারায় এ সব হবে না।' রবিশঙ্কর বুঝল, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

পাঁচ মিনিটের বিরতি। রবিশঙ্কর বলল, 'ঠিক আছে।' ব্যাপারটা যেন কিছুই হয় নি, এমন ভাব দেখিয়ে দুবেকে কিছু নির্দেশ দিয়ে, আমাকে একান্তে গিয়ে বলল, 'বাই দি ওয়ে, একটা কথা বলতো? এখানে কি কোন সাধুবাবা এসেছেন?' আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। রবিশঙ্কর সব খবর রাখে। ওঙ্কার বাবার সম্বন্ধে যা শুনেছি, বলে হেসে ফেললাম। রবিশঙ্কর আমার

এই হাসির রোগ জানে। এখনও সুটিং এর দেরী আছে। কিছুক্ষণ কথা বলে বাড়ী চলে এলাম। বাড়ী গিয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘটনাটা আমার চোখে ভাসতে লাগল। বাবা বলতেন, 'কখনও নিজের হামবড়াই করবে না। কখনও মনে অহঙ্কার করবে না, কি কঠিন জিনিষ বাজাচ্ছি। পেতলকে ব্রাসো দিয়ে কেবল ঘিসতে যাও। ঘিসতে যাও। ঘিসতে ঘিসতে সর্বদাই দেখবে কাপড়ে কাল দাগ। পেতল চমকাবে অনেক পরে।' কিন্তু এ কি দেখছি? রবিশঙ্কর নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। এতো সঙ্গীত অমর হওয়া নয়। এতো সেতার মাইনাস রবিশঙ্কর, তাঁর অমর হবার চেষ্টা। কর্তা তো অমর হয় না, কর্ম হয়। কোথায় হওয়া উচিত ছিলো, মৃতসঞ্জিবনী সুধার অমর হওয়া, আর এখানে তো অমর করা হচ্ছে, অহঙ্কার আর আত্মতুষ্টির সঞ্জবনী সুধাকে। সত্য সেলুকাস!

পরের দিন ওঁঙ্কার বাবার শিষ্যদের কাছে শুনলাম, গত সন্ধ্যায় রবিশঙ্কর কমলাকে নিয়ে ওঁঙ্কার বাবার দর্শন করতে গিয়েছিল। ওঁঙ্কার বাবার রোজ নামচা একজন লোক লেখেন। প্রতিমাসে মাসিক পত্রিকা 'ওঁঙ্কার ধ্বনি'তে প্রতিদিনের ঘটনা বেরোয়। কিছুদিন পরে এক শিষ্য মাসিক পত্রিকাটা আমায় দেখিয়েছিলো। তার মধ্যে আমার বাজনার বিশদ বিবরণ এবং রবিশঙ্করের দর্শন করতে যাওয়ার খবরটিও বেরিয়েছিলো। সেই মাসিক পত্রিকাটার থেকে আমি তারিখটা লিখতে পারতাম, কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয়। আর এও লিখতে পারতাম, বা এখনও পারি, যে কি মানসিক শান্তি ও কোন অশান্তির শান্তি, রবিশঙ্কর ওঁঙ্কার বাবার কাছে চেয়েছিল? এ ঘটনাটা জানেন পাঁচ জন। প্রথম শ্রীমৎ বাবা ওঁঙ্কারনাথ, যিনি উপস্থিত এই ধরাধামে নাই। দ্বিতীয় জন আমি। তৃতীয় রবিশঙ্কর, চতুর্থ রবিশঙ্করের এক সময়ের নর্মসহচরী কমলা, যে বর্তমানে পরিত্যক্তা। আর জানেন, যিনি রোজ নামচা লিখতেন।

যাক্, সেকথা না বলাই ভালো। আমার কাছে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গায় বাজনা এবং বই লেখা ছাড়া কিছু ভাববার অবকাশ নাই। কি করে যে একটা বছর কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। যদিও বইটার একটা রূপ দাঁড় করিয়েছি, কিন্তু বহু জিনিষ ইংরেজীতে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও তথ্য যোগাড়ে বিরত হলাম না। বাবা দিব্যি দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবার জীবনের সব সত্য কাহিনী লিখবার জন্য। বাবার জীবনের একটি ঘটনা সম্পূর্ণ উদ্ধার না করতে পারলেও, ইঙ্গিতে সে প্রসঙ্গ লিখেছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন, মৈহার ছাড়ার পর বহু লোকে জিজ্ঞাসা করেছে। বাবা চেয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গটি যেন আমি লিখি। কিন্তু যার শেষ পরিণাম দেখি নি, সে কথা লিখি কি করে? সুতরাং সেই প্রসঙ্গ আমি উহ্য রেখেছি। সকলেই যখন এক প্রশ্ন করেছেন, সেই সময় আমার বুকের মধ্যে কত যে মোচড় পড়েছে, তার হিসেব দিতে পারব না। ইংরেজী বইতে যে দুটি বিষয় লিখতে পারি নি, তার শেষ দেখতে পেয়েছি অনেক পরে। বাংলা বইতে সেই দুটি প্রসঙ্গের সমাধান করেছি। যাক ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য।

আজ মনে হচ্ছে যে সব তথ্য যোগাড় করেছিলাম, তা বৃথা যায় নি। যদিও বহু জিনিষ ইংরেজী বইতে বাদ দিয়েছি, কিন্তু আজ বাংলায় বইটা লিখতে গিয়ে দেখছি, সেই তথ্যগুলি প্রধান উপাদান হয়ে সাহায্য করছে।

ইংরেজী বইতে যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছি তার পুনরাবৃত্তি করব না। যে তথ্যগুলি লিখি নি, সেই কথাগুলিই একের পর এক সাজাবার চেষ্টা করছি।

আমার বই লেখা অনেকেরই চোখের বালি। তাই বহু লোক (?) একক বা সমবেত কণ্ঠে আমার মুণ্ডুপাত করছিলেন এবং কামনা করছিলেন আমার বড় ক্ষতি হোক। কিন্তু শকুনের অভিশাপে তো আর গরু মরে না। তথাপি শয়তানেরও তো সিদ্ধি বল হয়। তাই বোধ হয়, সেই সিদ্ধাই-এর জোরে আমার গোটাটাকে সাবাড় করতে পারুক বা না পারুক একটা সাধারণ একসিডেন্ট তো ঘটিয়েই ছিলো। একে কোলকাতা, তায় গাড়ীর একসিডেন্ট। ভাবলাম, ডান হাতটা তো গেলই। কব্জিতে চোট, বাজনারও সমাধি, আর বই-এর ইতি।

গল্প শুনেছিলাম, এক বৌদ্ধ আর এক বৈদিক তর্ক করছিলেন, কার ধর্ম সত্য এবং মহৎ। পরে স্থির হোল, দুজনেই একটা পাহাড়ের উপর থেকে, নিজ নিজ ধর্মের নামেতে লাফাবেন। যাঁর ধর্ম সত্য হবে, সে বেঁচে চলে আসবে। বৈদিকটি বললেন, 'বেদ সত্য তাই আমার মৃত্যু হবে না।' বৌদ্ধটি বললেন, 'যদি ত্রিপিটক সত্য হয় তাহলে আমার মৃত্যু হবে না।' উভয়েই লাফালেন। বৌদ্ধটি ফিরল না। কারণ তাঁর মনে ছিল, যদি, কিন্তু বা শঙ্কা।

আমার কিন্তু গুরুর কৃপার উপরে সন্দেহ কোন কালেই ছিলো না। যদিও বাবার জন্য সব জায়গাতেই আমি আপোষহীন, তাহলে এই আঘাতের কাছেও আমি মাথা নত করব না। আমার এই বিশ্বাসটা কত সত্য, দেড় মাস পরে বুঝলাম। ইত্যাবসরে এক জেনারেল ফিজিসিয়ান আমার হাতে প্লাস্টার চড়িয়ে দিলেন। বিরাট বাতাবি লেবু যে মুসম্বির কাজ করে না সেটা পরে বুঝলাম। বিরাট নার্সিং হোম এবং অনেক নাম ডাক দেখে গিয়েছিলাম, সেটাই বোধ হয় ভুল হয়েছিলো। পরশুরামের চিকিৎসা বিভ্রাটের মত, আমারও মিস ডাক্তার বিপুলার কাছে যাওয়াই সার হোল। হাড় যে জোড়ে নি, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম ছয় সপ্তাহ পরে।

অতঃপর কিং কর্তব্যম? মেঘ না চাইতে জলের মত দেখা হয়ে গেল বিশিষ্ট চিকিৎসক অমর চক্রবর্তীর সঙ্গে। হাতের আদল দেখে সন্দেহ ব্যক্ত করলেন, গোলমাল মনে হচ্ছে। সন্দেহ নিরসন করার জন্য এক্সরে করার পর দেখা গেল ঘটনাটা সত্য। জুড়েছে কিন্তু বঙ্কিম। বেশ হাবুডুবু খাবার আগে, ডাক্তার চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন ভারত বিখ্যাত অস্থি চিকিৎসক ডাক্তার অশোক সেনগুপ্তের দরবারে। এ যেন এক যুদ্ধ ক্ষেত্র। প্লাস্টারই যেন এখানকার অরডার অফ দি ডে। সকলের শ্রীঅঙ্গে, কোথাও না কোথাও প্লাস্টার উঁকি ঝুঁকি মারছে। ভীড়ের বহর দেখে বুঝলাম যে আমাকে ভৈরব থেকে ইমন পর্যন্ত বসতে হবে। কিন্তু না হোল না। একটু পরেই ডাক পেলাম।

ভিতরে পৌঁছন মাত্র, এক্সরে প্লেট থেকে চোখ না তুলে ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'এই হাতে ডা ডিরি ডা রা এবং ঝালা কি করে বাজাবেন?' ডাক্তারের কথা শুনে চমকালাম। বললাম, 'আপনি কি কিছু বাজান?' উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'আপনার গুরুদেবের প্রথম বাজনা শুনেই, ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম বাজনা শেখার জন্য। কিন্তু হোল না। তা বলে এ নয়, যে খাঁচাটা শূন্য থেকে গেল। সুরের খাঁচাতে সুরবাহারের পাখী পুষলাম, শ্রদ্ধেয়

বিমলকান্ত রায় চৌধুরির কাছ থেকে।' ব্যাপারটা একদমই শৌখিন গোছের।' এ কথা বলেই ধীরে টেপরেকর্ডার চালিয়ে বললেন, 'এটা আমার অবসরের সাথী।' কান খাড়া হোল। ডাক্তারবাবু মিটিমিটি চোখে হাসছিলেন। হেসে বললেন, 'বলুন তো দেখি এটা কার বাজনা?'

খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'আরে, এ তো বাবার ভায়োলিন।' তার পরেই আবার চমক লাগলেন উনি। এবারে শুনতে পেলাম আমারই রেডিওতে বাজনার একটা রেকর্ডিং। জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন তো এটা কার বাজনা?' নীরবে হাসলাম। ডাক্তারবাবু এবারে সরাসরি আমাকে বললেন, 'আগামীকাল আপনার হাড় সেট করব।' ব্যাপারটা একেবারে ভেঙ্গে গড়া। আপনি সঙ্গীতজ্ঞ, আপনার কাছে টাকা নেব না, তবে একটা শর্ত থাকবে। আপনার হাতটা ঠিক হয়ে যাবার পর, আমার বাড়ীতে একদিন ফ্রি বাজাতে হবে। তারজন্য আমি কিন্তু কোন পারিশ্রমিক দেব না।'

মনে ভাবলাম, যদি টাকা দিয়ে হাত সারাতাম, বা ফ্রি বাজাতে না হ'তো, তাহলে কি লাভ হ'তো জানি না, কিন্তু অপরিমিত লোকসান হ'তো, আজও তা বুঝতে পারি। কারণ আমি আমার জীবনে, এমন একজন বন্ধুর, বন্ধুত্বের কবোষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হতাম, যা কোটি টাকার থেকেও বেশী মূল্যবান।

এই প্রমেয়র সমাধান আবার আমাকে নূতন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে, বাবা ছাড়া আমার গতি নাই। বাবার শিষ্য না হলে কি এত সমাদর পেতাম।

তিনমাস ঘরে আবদ্ধ থাকবার পর, যে দিন অশোক সেনগুপ্তের বাড়ীতে বাজাতে গেলাম, দেখলাম কর্ণেল এস বি পালকে। কর্ণেল পালের কাছে শুনলাম, উপস্থিত বদলি হয়ে কোলকাতায় মিলিটারির কমাণ্ড হসপিটালে এসেছেন। এ ছাড়া ডাক্তার অশোক সেনগুপ্ত তাঁর বাল্যবন্ধু। কর্ণেল পাল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বছরের শেষে, মিলিটারি হসপিটাল-এর ডাইরেকটার এবং অন্যান্য ডাক্তারদের সামনে একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে আপনাকে বাজাতে হবে। অবশ্য এর জন্য পারিশ্রমিক পাবেন।' সম্মতি জানালাম। হায়দ্রাবাদে দেখবার পর, এতদিন পরে কর্ণেল পালকে দেখে খুব ভাল লাগল। ভাল লাগল এই ভেবে যে দুই বাল্য বন্ধু ডাক্তার, নিজের পেশায় এত বড় হয়েও, অবসর সময়ে সঙ্গীত চর্চা করেন এবং সঙ্গীতের পাগল।

কোলকাতা থেকে সোজা লক্ষ্ণৌ চিফ মিনিস্টার্স রিলিফ ফানড-এর নিমন্ত্রণে বাজাতে গেলাম। এই বাজনা অনেক আগে থেকেই ঠিক ছিলো। কিন্তু লোকের সাক্ষাৎকার নেওয়া সত্ত্বেও, এবারেও কিছু লোকের সাক্ষাৎকার নিলাম। কিছুদিন পরেই কোলকাতায় কমাণ্ড হসপিটালে বাজাবার পরই, যে কি ভাবে বছর শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।

বাবা গত হয়েছেন তিনবছর হয়ে গেল। বাবার উপর বই লেখা মোটামুটি শেষও হয়েছে। কিন্তু যতই দিন যায়, মনে হয় বাবার বিষয়ে জানবার এখনও অনেক কিছু আছে। মাঝে মাঝেই কিছু না কিছু তথ্য পাই। যে সময় যে শহরে বাজাতে যাই, সেই সময়, হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে যায় কারো না কারোর সঙ্গে।

এক ঝাঁক প্রোগ্রাম দিয়ে বছর শুরু। কিন্তু বেশীর ভাগই অর্থকরী। তাই উল্লেখ ব্যর্থ। এই গতানুগতিকের ফাঁকে, হঠাৎ ডাক পেলাম শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বা সঙ্গীত জগতের বরেণ্য হীরুদার কাছ থেকে। ভীষণ আনন্দ হোল। বাবার সঙ্গত মরুভূমি যাত্রায়, হীরুদা মরুদ্যান। যাঁর সঙ্গে বাজালে বাবা শ্রান্ত হতেন না। তৃপ্ত হতেন। আমার মনে হোল হীরুদার সঙ্গে বসা মানে বাবার সঙ্গে বসা। অতীতের একবার বাজনার স্মৃতিটাকে ঝালাই করে নেওয়ার এ একটা বিরাট সুযোগ।

প্রোগ্রামটা যখন সন্ধ্যাবেলায় হবে, তখন মনেতে অনেকগুলো সন্ধিপ্রকাশ রাগ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। যখন ওনার বাড়ীতে পৌঁছলাম, আর গুণীসমাজের ভীড় দেখে, ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটা আচ্ছন্নতার ভিতরে হীরুদার উদাত্ত কণ্ঠস্বর মাইকে শুনতে পেলাম। বাবার যোগ্য ছাত্র হিসাবে তিনি প্রশংসা করছেন। তাঁর প্রশংসার ফুলটা সন্তর্পণে বাবার চরণে নিবেদন করলাম।

বাবার কথা কানে বাজছিল, গুরু গৃহেতে হয় শিক্ষা আর দীক্ষা, আর গুণী সমাজে হয় পরীক্ষা বা পরখ। সাবধান হলাম। যতীন ভট্টাচার্য! এ শুধু তোমার প্রোগ্রাম নয়, এতে বাবার সম্মানও জড়িত। সুতরাং তেমনটি না হলে, তোমার ক্ষয় ক্ষতি হোক বা না হোক, বাবার উপর আঁচ আসবে। আর যেই এ কথা ভাবলাম, তৎক্ষণাৎ জেদ চাপল, এমন একটা কিছু করব যা সাধারণতঃ কেউ করে না। বাবা বলতেন, 'গুণী সমাজে মারওয়ার আলাপ বাজিয়ে, পুরিয়ার গৎ বাজাবে। তবেই লোকে বুঝবে, গুরু ফাঁকি দিয়ে শিক্ষা দেন নি, আর তুমিও ফাঁকি দিয়ে শেখনি।' এই কথা ভেবেই মারওয়াতে আলাপ বাজিয়ে, গৎ ধরলাম পুরিয়ায়। গৎ বাজাবার আগে, হীরুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটু ধামার বাজাই।'

বাবা ঠাট্টা করে হীরুদার সম্বন্ধে বলতেন, 'ও তো 'হাঁ' বাবু। অর্থাৎ যে তালেই বলি, সানন্দে স্বীকার করে নেয়।' সত্যকারের এ্যামেচারিষ্ট। যে মুহূর্তে আমার প্রশ্নটা করেছি। সেই চিরাচরিত মিষ্টি উত্তর পেলাম, 'হাঁ'। ধামার বাজিয়ে আরো দুটো অপ্রচলিত তাল বাজালাম। দেখলাম তাতেও তিনি সব্যসাচী। মনে হোল, অতীত সর্বদাই বর্ত্তমানের মধ্যে আছে, যেমন বর্ত্তমান অতীতে ছিলো। এই আনন্দের আমেজটা হঠাৎ তিক্ত হোল, যখন সঙ্গীতের রাজনীতির পাল্লায় পড়লাম দু'দিন পর। সুরেশ সঙ্গীত সংসাদে আমার বাজনা ছিলো। সংসদের প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে তবলায় এক শিল্পীকে স্থির করলেন। আমি সম্মতি জানালাম। বাবার সিদ্ধান্ত হোল, কথা দেওয়া মানে মাথা দেওয়া। তাই মাথায় বজ্রাঘাত হোল যখন কয়েকজন উদ্যোক্তার সহযোগে, আর একজন তবলা বাদক আবদার করে বসলেন, আমার সঙ্গে বাজাবেন। বহু বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাঁরা নাছোড়বান্দা। তখন গত্যন্তর না দেখে বললাম, 'পূর্বের শিল্পীকে আমার সামনে যদি ক্ষমা চেয়ে বোঝাতে পারেন, তবেই এ প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হব।' তাঁরা আশ্বাস দিলেন তাই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সেই তবলাবাদককে যত্ন করে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম, কিন্তু কর্মের অভিশাপ কে খণ্ডাবে? যুদ্ধ ক্ষেত্রেই রথচক্র মেদিনী গ্রাস করলো। যাই বাজাই, তাঁর মাথায় কিছু ঢোকে না। যে হেতু স্বজাতি শিল্পী, তাই অর্জুনের মত বধ করলাম না, আর বাঁচাতে

যাওয়াটা হোল মক ফাইট। সেটা আবার শ্রোতাদের পছন্দ নয়। তাই হযবরল কোন রকমে শেষ হোল। এই প্রথম এবং এই শেষ নিয়ম ভাঙ্গলাম। কিন্তু এই নিয়ম ভাঙ্গার জন্য আমায় অনেক মূল্য দিতে হোল। তবলা বাদকের লোকেরা বলতে লাগল আমিই ইচ্ছাকৃতভাবে তবলাবাদককে বিপদে ফেলেছি। প্রত্যুত্তরে আমি কিন্তু বলতে পারি নি, ষাঁড়ের গোবরের ঘুঁটেটা আমি দিই নি।

কোলকাতায় আরোও কয়েকজায়গায় বাজিয়ে, পাটনা, ছাপরা, মুজঃফরপুর এবং মোতিহারিতে বাজিয়ে কাশীতে ফিরলাম। কাশীতে ফিরেই দেখলাম, আমেরিকা থেকে শুভ একটা কার্ড পাঠিয়েছে। এ কথা শুনেছিলাম, শুভ আমেরিকাতে গিয়ে এক আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু নক্সা করা কার্ডটা দেখে বুঝলাম শুভর ছেলে হয়েছে। ছেলের ওজন, জন্ম সময়, সব কিছুই লেখা আছে। ভাবলাম কি দুর্ভাগ্য। যাঁর ঘরেতে বাতি জ্বলল, যদি সব কিছু ঠিক থাকত, তাহলে তো অন্নপূর্ণাদেবীই শঙ্খধ্বনি করে খবরটা দিতেন। বোধ হয় সকলের ভাগ্যে বাড়া খাবার থাকে না। তাঁদের দুর্ভাগ্যকে, বুফে খাবার আধুনিকতার দামে পার পেতে হয়। শুভ বাবার নাম রাখতে পারত। কিন্তু কি হয়ে গেল? সবই ভবিতব্য।

কিছুদিন পরেই বম্বেতে বীরেন্দ্র মেমোরিয়ালের কনফারেন্সে যেতে হবে। ইতিমধ্যে রবিশঙ্করের বাহন এসে বলল, 'দাদা, গুরুজী আসছেন আঠাশে ফেব্রুয়ারী। আপনাকে বিশেষ কারণে একবার দেখা করতে বলেছেন। আপনার কাছে সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।' বললাম, 'ওই দিনে আমার প্রোগ্রাম আছে। পরের দিন গাড়ী পাঠিয়ে দিও, গিয়ে দেখা করব।' মনে মনে ভাবলাম, হঠাৎ আমাকে রবিশঙ্কর ডেকে পাঠিয়েছে কেন? কি এমন বিশেষ কারণ?

যাক নির্দিষ্ট দিনে রবিশঙ্করের বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীর লনে দেখলাম জগদীশ চ্যাটার্জি এবং রাজেন্দ্র শঙ্কর বসে আছে। নিজের মাসতুতো ভাই এবং বড় দাদাকে দেখে মনে হোল, তাঁরা রবিশঙ্করের হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে। সব ভাইদের মধ্যে যে একমাত্র শিক্ষিত, সেই রাজেন্দ্র শঙ্করকে এই অবস্থায় দেখে মনে কষ্ট হোল। টাকার চাবুক এমনিই হয়। কিন্তু বড় ভাইএর, এই সহিষ্ণুতা, এ কি রূপ। এর নামই বোধ হয় দাসত্ব। চাকরির মায়ার পরিণতি বোধ হয় এই হয়, যাঁর নাম মায়া। দুবের কাছে শুনেছিলাম, চার অঙ্কের একটা মোটা টাকা প্রতি মাসে রবিশঙ্কর রাজেন্দ্র শঙ্করকে দেয়, এর পরিবর্তে রাজেন্দ্র শঙ্কর রবিশঙ্করের উন্নতির রাস্তায় পৌঁছবার সব রকম কাজ করে। কিন্তু তার ফল কি হোল? কেন এমন হয়? আসল কথা হোল প্রয়োজন। তখন কি জানতাম, যতক্ষণ প্রয়োজন ছিল সব সহ্য হয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আর কাউকে চিনতে পারবে না।

এও এক রাজনীতি। যতই রাজনীতি হোক, যে লেখাপড়া করেছে, তার আত্মসম্মানে ঘা লাগবার সময়, না বললেও চলে যেত। এবং শেষ পর্যন্ত চলেও গিয়েছিলো। যাঁর বিবেক আছে, শিক্ষা আছে, টাকা তাঁকে কিনতে পারে না। যদিও এত অঙ্কের টাকা, তবুও তাঁকে ছেড়ে যেতে দ্বিধা হয় নি, কেননা আত্মসম্মান থাকলে যেতে চাওয়ারই কথা। অবশ্য এ অনেক পরের কথা। জগদীশ আমাকে দেখেই বললো, 'চলো তোমার জন্য রবিশঙ্কর অপেক্ষা করছে।' মনে হোল, যেন কোন ভি. আই. পি.র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। রবিশঙ্কর আমাকে দেখেই তাঁর চিরাচরিত মন ভোলানো হাসি হেসে বললো, 'আরে এসো এসো। কেমন আছ?' বুঝলাম, এ তো ভূমিকা। এদিক ওদিক সকলের সমাচার জানবার পর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বই লেখা কতদূর এগোলো?' বাবার ভাষায় বুঝলাম, এতক্ষণে আসল ভেদ খুলেছে। চার বছর আগে রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তারপর যদিও একবার দেখা হয়েছে ডকুমেন্টরি ফিল্ম করবার সময় কিন্তু সেই সময় কথা বলবার সুযোগ হয় নি। রবিশঙ্করকে হিন্দিতে 'গুরুদক্ষিণা' লেখার সময় থেকে এ যাবৎ যা যা ঘটেছে সব কথা বললাম। উত্তরে বলল, 'এত কাণ্ড হয়ে গিয়েছে?' বই-এর ব্যাপারে বললাম, 'যদিও বইএর লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তবুও এখনও কিছু সাক্ষাৎকারের বাকী। এ ছাড়া পাবলিশার পাওয়াটাই হোল সমস্যা, যাক যা হবার হবে। মহৎ কার্য করতে গেলে দেরী তো হবেই। আমাকে সাহায্য করবার লোক তো কেউ নাই, সেইজন্য এত দেরী হচ্ছে।' হঠাৎ রবিশঙ্কর কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বম্বে কবে যাচ্ছ?' অবাক হলাম। রবিশঙ্কর কি করে জানলো কয়েকদিন পরেই বম্বে যাচ্ছি? রবিশঙ্করকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি, সে সব খবর রাখে। কোথায় বাজাচ্ছি, কি রাগ বাজিয়েছি, তবলা বা মৃদঙ্গে কে সঙ্গত করেছে, সব তাঁর নখদর্পণে। ভারতের সব জায়গায় তাঁর লোক আছে, যাঁরা সব খবর দেয়। বুঝি না, এ সব খবর রেখে কি লাভ হয়? আমি তো কখনও কাউকে বলতে যাই না, কোথায় বাজাতে যাচ্ছি। বহু শিল্পীকেই নিজের ঢাক পিটোতে দেখেছি। আমি এর ব্যতিক্রম। তা সত্ত্বেও রবিশঙ্কর কি করে সব খবর পায় বুঝি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি বম্বে বাজাতে যাচ্ছি, আপনি কি করে জানলেন?' রবিশঙ্করের সেই এক উত্তর, 'কে যেন বলেছে, নাম মনে পড়ছে না।' বললাম, 'ঠিকই শুনেছেন। তিন দিন পরেই বম্বে যাব।' রবিশঙ্কর বলল, 'তুমি তো বম্বে যাচ্ছ। প্লিজ, অন্নপূর্ণার সঙ্গে দেখা করে একটু বুঝিও।' বললাম, 'বোঝাবার আর কি আছে? দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রতিবছরেই বম্বেতে বাজাতে যাই। গেলেই দেখা করি এবং কয়েকদিন শিক্ষাও করি।' রবিশঙ্কর চুপ করে রইল।

কথায় কথায় বললাম, 'শুভর একটি কার্ড, এই প্রথম ছয় বছর পরে পেলাম। আপনি তো ঠাকুরদা হয়ে গিয়েছেন।' রবিশঙ্করের মুখটা কি রকম যেন হয়ে গেল। বলল, 'আমার কত আশা ছিল, শুভর বিবাহ ভারতে ধূমধাম করে করব, কিন্তু তা হোল না। এ যে আমার কত দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারব না।' কপালে হাত রেখে বলল, 'এ আমার দুর্ভাগ্য। যাক শুভ যখন তোমাকে চিঠি দিয়েছে, প্লিজ একটি চিঠি শুভকে দিও, শুভ তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হবে।' গম্ভীরভাবে বললাম, 'শুভ আমার অতি প্রিয় ছিল, এ কথা আপনার অজানা নয়। তার বাজনা প্রায় পাঁচ বছর আগে একদিন দুই ঘণ্টা শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, বাবার ঘরাণার মুখ উজ্জ্বল শুভ নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু বিধি আর পরের বিড়ম্বনায় তা হোল না। শুভ আমার অতি স্নেহের ভাইপো ছিলো। কিন্তু যে দিন থেকে সে বম্বে ছেড়ে আপনার সঙ্গে চলে গেছে তার মার কাছ থেকে, সেইদিন থেকে শুভ আমার চোখে ছোট হয়ে

গিয়েছে। তা সত্ত্বেও তার কার্ডের জবাব দিয়েছি।' ইতিমধ্যে রবিশঙ্করের এক ছাত্রী, দুবে এবং কমলা ঘরে ঢুকল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললাম, 'আপনার এখন কাজ আছে, এবং আমারও অনেক কাজ আছে, সেইজন্য উপস্থিত চললাম।' রবিশঙ্কর আমার স্পষ্ট কথা বলার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত আছে। রবিশঙ্কর আর কোন কথা না বলে দুবেকে বলল, 'যতীনের যাবার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করে দাও।' আমি এই কথা শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। মানুষের জীবনে এত রকমফের দেখেছি, যে আর কিছুতেই আজকাল অবাক হই না। অবাক হওয়া এখন থেমে গেছে। কিন্তু সত্যই কি থেমে গেছে? তখন কি জানতাম, জীবনে কতবার আবার অবাক হতে হবে?

বাড়ী যাবার সময় বুঝলাম কেন আমাকে রবিশঙ্কর ডেকেছিলো? রবিশঙ্কর সব খবর রাখে অথচ এমন ভান করল যে মৈহারে দেখার পর, দীর্ঘ চারবছর আমার বইএর ব্যাপারে যেন কিছুই জানে না। বললে তো অনেক কিছুই বলতে পারি। কিন্তু একটা কথা ভেবেই নিজের ক্রোধ দমন করি। মনে মনে ভাবি, যদি নিজেদের মধ্যে মিল হয়ে যায়, তাহলে লোকসমাজে আর জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু অনেক কিছু জানলেও, ভাবতে পারি নি যে পরবর্তী চার পাঁচ বছর পরে কি করবে, তার পরিকল্পনা সে করে রেখেছে।

এ যাবৎ বম্বে গিয়ে হোটেলেই উঠেছি। কিন্তু এবারে রাজাসাহেব পিত্তি, তাঁর সারকেলের নিজস্ব গেস্ট হাউস ক্যাফপারেড রোড কোলাবাতে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট হোটেলের পেছনে, ফ্লাটে ঢুকেই সমুদ্র দেখে মুগ্ধ হলাম। সমুদ্র দেখা আমার কাছে নূতন নয়। বম্বেতে অনেকের ফ্লাট থেকেই সমুদ্র দেখা যায়, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখলাম। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সমুদ্র বহু জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এখানে এসে মনে হোল, আমি সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি, শুধু যতটা পিঠ ততটাই স্থলভাগ। যে বয়সে চোখ তুলে নীল আকাশ দেখাটা স্বাভাবিক ছিলো, সে বয়সটায় তো মাথা নীচু করে সঙ্গীতের মুক্তো কুড়িয়েছি। তাই আজ দৃষ্টিপ্রসারিত করে সমুদ্র আর আকাশের আত্মীয়তাকে দেখলাম। অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু কই? এই অপূর্ণতা তো আমার মনকে অমর সৃষ্টি করছে না, যা বাবা এখানে থাকলে হ'তো। আসল কথা, যা সুন্দর দেখি, মনে হয় এটা বাবা থাকলে কত তৃপ্ত হতেন। বাবা আমার জীবনের মানদণ্ড।

দুপুর বেলায় অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। বাড়ী গিয়ে কোন পরিবর্তন দেখলাম না। অবাক হই, কি করে একলা এই ফ্লাটে থাকেন? কত মনের জোর থাকলে, এই ভাবে দিন রাত, দিনের পর দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন। মনে হয়, সহ্য করারই আর এক নাম বেঁচে থাকা। সহ্য না করলে বাঁচাই যায় না। রবিশঙ্কর বম্বে আসবার আগে অনুরোধ করে বলেছেন, অন্নপূর্ণাদেবীকে বোঝাতে। কি বোঝাব? দীর্ঘদিন অন্নপূর্ণাদেবীর একটাই ছিল অবলম্বন, তাঁর ছেলে। মনের মত করে তাকে শিক্ষা দিয়ে বাইরে বাজাবার অনুমতি দেবার আগেই হারালেন। রবিশঙ্কর একবার ভেবে দেখবারও সময় পায় নি, বছরের পর বছর, চার দেওয়ালের মধ্যে অন্নপূর্ণাদেবীর কেমন ভাবে কেটেছে এবং কাটছে। দীর্ঘদিন কেবল সিঁদুরের লাইসেন্স হয়ে বেঁচে আছেন। তাঁরও তো একটা মন আছে, মান অভিমান, সুখ

দুঃখের বোধ আছে। চোখের জল আছে, মুখের হাসি আছে, বিরক্তি আছে, রাগ আছে। তবু স্বামীর পদবীটা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। ধন্য সংসার। ধন্য সমাজ। মনে হয় অন্নপূর্ণাদেবী ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন জীবনের ভার। বোঝাবার ভাষা আমি খুব খুঁজে পেলাম না। যাঁর স্বামী থেকেও স্বামী নাই, যাঁর ছেলে থাকতেও কাছে পান না, তাঁকে আমি কি স্তোক দেব? রবিশঙ্করকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম, ঠাকুরদা হয়েছেন, কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীকে বলতে পারলাম না যে ঠাকুমা হয়েছেন। কথায় কথায় বললাম, 'শুভর চিঠি পেয়েছি।' বুঝলাম উনিও কার্ড পেয়েছেন। কিন্তু চোখের মধ্যে কোন অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম না। কথায় কথায় বললেন, 'বাবার নামে একটা সংস্থা করেছি। তার উদঘাটন করব পঁচিশে এপ্রিল।' বললাম, 'একটা বড় কাজ করলেন। সকলেই নিজের নামের পেছনে দৌড়চ্ছে। একমাত্র আলিআহমদ বাবার নামে সঙ্গীত সমাজ খুলেছিলেন। বাবাকে খুশী হতে দেখেছিলাম। কিন্তু আলিআহমদ-এর মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এত বড় কাজ আপনি কি করে করবেন?' উত্তরে বললেন, 'আমার যে কজন ছাত্র আছে, তারাই সব ব্যবস্থা করবে। আমি টাকা দিয়েই খালাস। বছরে বাবার নামে একটা কনফারেন্স করব।' অবাক হয়ে ভাবি, যে কাজ আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের করা উচিত, সে কাজ অন্নপূর্ণাদেবী করছেন। আলিআকবর নিজের নামে কোলকাতায় এবং আমেরিকায় কলেজ খুলেছে। রবিশঙ্করও সংগীতসংস্থা একসময় বম্বে এবং আমেরিকায় খুলেছিল। কিন্তু যাঁর জন্য তাঁরা এত সম্মান পেয়েছে তাঁর জন্য মাথা ঘামাবার সময় তাঁদের নাই। যাক বাবার নামে অন্নপূর্ণাদেবী একটা সংস্থা খুলেছেন শুনে, মনটা আনন্দে ভরে উঠল। প্রতিবার যা হয়, এবারেও তার ব্যতিক্রম হোল না। বই লেখার ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা হোল। তারপর প্রতিবার যা বলেন, সেই কথাই বললেন, 'বাবার নাম নিয়ে ভাল করে বাজাবেন।'

এবারে বম্বেতে প্রায় পনেরো দিন থাকতে হোল কয়েকটা প্রোগ্রামের জন্য। ইতিমধ্যে খালি থাকলেই পিত্তিজির বাড়ীতে বাজাতে হয়েছে। পিত্তিজির বাড়ীতে বাজানর সময় সর্বদাই বাবার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে। অপ্রচলিত রাগ এবং রাগের ভেদ, বাবা যদি না শেখাতেন, তা হলে আমি পাত্তা পেতাম না।

বম্বের প্রোগ্রাম করে কাশী চলে এলাম। কাশীতে আসবার কিছুদিন পরই আমেদাবাদ এবং বম্বে থেকে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। অবশ্য উপস্থিত প্রায় চার মাস দেরী আছে। কিন্তু এবারে আমেদাবাদ এবং বম্বের প্রোগ্রাম এমন ভাবে পড়েছে যে, তিনবার বম্বে থেকে আমেদাবাদ যাওয়া আসা করতে হবে। এবারে প্রায় একমাস থাকতে হবে।

বাবার বইএর কাঠামো তৈরী হয়ে গেলেও, নূতন নূতন তথ্য লিখতে গিয়ে, দিশেহারা হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। জানি না কবে বইটা লেখা সম্পূর্ণ হবে। দেখতে দেখতে চারটে মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না।

বছর শেষ হতে এখনও পাঁচটা মাস বাকী, অথচ বই লেখা সম্পূর্ণ হয় নি। সাক্ষাৎকারগুলো সাজিয়ে লিখতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমেদাবাদে বাজাতে গেলাম। আমেদাবাদে গেলে, প্রোগ্রামের দিন ছাড়া, রোজ একবার প্রমথেশ সেন-এর বাড়ী যেতে হয়। তাঁর সঙ্গে

আমার ঘরোয়া সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নানা গল্পের মধ্যে আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের গল্প শুনতে পাই। আমেদাবাদে এলে আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর তাঁর বাড়ীতেই ওঠে। আমেদাবাদে পনেরো দিন থেকে কয়েকটা ঘরোয়া প্রোগ্রাম করে, বম্বে যাবার আগে, প্রমথেশ সেন বললেন, 'আগামী বছরের প্রথম মাসে, তিন দিন কনফারেন্সে করব, উনিশ, কুড়ি এবং একুশ তারিখে। অগ্রিম আপনাকে জানিয়ে দিলাম। শেষ দিন আপনার বাজনা এবং ভীমসেন যোশীকে দিয়ে শেষ হবে।' সম্মতি জানিয়ে বললাম, 'বম্বে থেকে আবার আমেদাবাদে আসব সেইসময় সব কথা হবে।'

বম্বে গিয়ে উঠলাম কোলাবার ফ্লাটে। আবার সেই সমুদ্র। সাধনার জন্য এত ভাল জায়গা আর কোথায় পাব? বম্বে গিয়ে প্রথম দিনই চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। ফ্লাটের দরজার পাশে একটা পেতলের ফলক, লেখা দেখলাম ইংরেজীতে। 'আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেল'। রিকোয়েস্ট ডু নট কল পারসোন্যালি এনি ইনফরমেশন। ফাইনলি কমিউনিকেট ইন রাইটিং টু সেক্রেটারি এ্যাট দি এবাভ এ্যাড্রেস। থ্যাঙ্ক ইউ। সেক্রেটারির এ্যাড্রেস লেখা ছিল। এরপর দেখলাম লেখা আছে রিকোয়েস্ট। বিফোর ইউ রিং দি বেল, প্লিজ নোট নোবডি উইল ওপেন দি ডোর অন মনডে এনড থারসডে। রিং দি বেল অনলি থ্রি টাইমস এনড ইফ নো রেসপনস প্লিজ ড্রপ এ নোট স্টেটিং ইয়োর নেম ইট্সেট্র্যা এনড লিভ। থ্যান্ক ইউ ফর বিং কনসিডারেট। লেখাটা পুরো পড়লাম। যে হেতু বম্বে যাবার আগেই জানিয়ে দিই, সেইজন্য বেল বাজাবার পরই দরজা খুলে দিলেন অন্নপূর্ণাদেবী।

ঘরে ঢুকেই বললাম, 'বাবার নামে সারকেল খুলে খুব ভাল কাজ করেছেন। একটা কথা বলুন তো, দুটো রিকোয়েস্ট লিখেছেন কেন?' উত্তরে বললেন, 'সারকেলের কাজের জন্য সেক্রেটারির ঠিকানা লিখে দিয়েছি যোগাযোগের জন্য। আর দ্বিতীয়তঃ, আমার ছাত্ররা যারা আসে, তাদের ছাড়া কারো সঙ্গে দেখা করি না। ছাত্রদের সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে শেখাই না, কারণ ওই দুই দিন ন্যাশনাল আরট সেন্টারে শেখাই। সে কথা তো আপনি জানেন। বহু চর আছে, যারা মাঝে মাঝে আসে দেখতে, আমি কি করছি। সেইজন্য লিখে দিয়েছি তিনবার কলিংবেল বাজাবার পর, যদি দরজা না খুলি, তাহলে নাম লিখে ফেলে যেতে। ছাত্রদের সময় দেওয়া থাকে, তাই আইহোল দিয়ে দেখে দরজা খুলে দি। অন্য সময় কলিংবেল বাজলে দেখতেও আসি না, কে এসেছে?' ব্যাপারটা বুঝলাম। টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও, টেলিফোন এলে ওঠান না। এছাড়া বাইরের অনাহুত লোকেদের সঙ্গেও কেন দেখা করেন না, বুঝতে অসুবিধা হোল না। সারকেলের মেমোরানডাম দেখলাম। সব পাকাপোক্ত কাজ হয়েছে। ট্রেজারারের জায়গায় নাম দেখলাম, ঘাসওয়ালা। গতবছরে বাবার নামে সারকেল হয়েছে, কিন্তু এই বছরে প্রোগ্রাম হয়েছে। সুভ্যেনার দেখে বললাম, 'প্রোগ্রাম করে নিশ্চয়ই টাকার লোকসান হয়েছে।' উত্তরে বললেন, 'টাকার লোকসান তো হয়েছে, তবে বাবার স্মরণ করে সারকেল করেছি।'

ইতিমধ্যে ঘাসওয়ালা এসে পৌঁছলেন। ঘাসওয়ালা আমাকে দেখেই বললেন, 'আগামীকাল

আপনার বাজনা শুনতে যাবো। কবে এলেন? বললাম, 'আজই এসেছি এবং আসার পর এখানে এসেছি।' ঘাসওয়ালা কথায় কথায় বললেন, 'রাজা সাহেব পিত্তিজির কাছে শুনেছি, আপনি ইংরেজীতে বাবার উপর একটা বই লিখছেন। বাবা সঙ্গীত কি ভাবে শিক্ষা দিতেন, বাবার বাজনার বিশেষত্ব কি ছিলো, এ সব বিষয়ে কি লিখেছেন?' হেসে বললাম, 'মানুষের জীবন পরমায়ু দিয়ে মাপতে নাই। মাপতে হয় তাঁর কাজ দিয়ে। কী কাজ সে করে গেল, সেইটাই হবে মানুষের বিচারের মাপকাঠি। পরমায়ু দীর্ঘ অনেকেরই হয়, কিন্তু তারজন্য সে মহৎ হয় না। বাবা আমাদের কাছে আদর্শ তাঁর সঙ্গীতের জন্য। সেইজন্য বাবার সঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতি এবং নানা জিনিষ লিখেছি, যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ লিখেছি মনে হয় ভারতের যত বড় শিল্পীই হোন না কেন, সেটা পড়লে উপকৃত হবেন। তবে দুঃখ এই, ভারতে সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে কজনেই ইংরেজী পড়তে বা লিখতে পারে?'

এবারে এক মাসের উপর আমেদাবাদে এবং বম্বেতে প্রোগ্রাম করলাম। আমেদাবাদে আবার গিয়ে প্রোগ্রাম করে কাশীতে চলে গেলাম। কাশীতে আসবার পর, আবার বই লেখার কাজ শুরু হোল। ধীরে ধীরে বইএর উপাদান বেড়েই চলছে। দেখতে দেখতে বছর কখন শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। জানি না কবে লেখা শেষ হবে? বইএর আকারে কবে বই প্রকাশিত হবে বুঝতে পারছি না। মনে হয় সবই নিয়তির খেলা।

পূর্ববাংলার লোকেদের এক বিচিত্র স্বভাব। উদাহরণ দিয়ে বা গল্প বলে বোঝান। যদি বয়স্ক লোক হন, তাহলে প্রবাদের ছড়াছড়ি। বাবাও তাই। বহু গল্প বলেছেন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, ভূতের উদাহরণ একটাই পেয়েছি। একবার বলেছিলেন, 'এক কৃষক ক্ষেতে কাজ করতে করতে একটা বোতলে বন্ধ জীন পায়। জীন তো সেবক হতে প্রস্তুত। কিন্তু তার একটা সর্ত আছে। সেটা হোল, তাকে কাজ শেষ হওয়া মাত্র নূতন হুকুম দিতে হবে। আর তা যদি সে না পায় অর্থাৎ কৃষক হুকুম দিতে ক্ষান্ত হয় তৎক্ষণাৎ জীন ঘাড় মটকে তাঁকে হত্যা করবে। কৃষক যাই হুকুম দেয়, নিমেষ ফেলতে না ফেলতে জীন সে কাজটা করে বসে। শেষমেষে প্রাণ বাঁচাতে, কৃষক বাড়ীর উঠোনে পোঁতাল একশো ফুট লম্বা মসৃন বাঁশ। তারপর বলল, তেল মাখাতে। অতঃপর শেষ হুকুম, বাঁশ বেয়ে উপরে চাপতে। শুরু হোল জীবনের ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড আর টু স্টেপ ব্যাক। আজও নাকি জীন অধ্যাবসায়ে রত।' এ কথা সকলেই জানে।

আমারও অবস্থা তাই। বাবার জীবনী যেই ভাবছি শেষ করে ফেলেছি, তখনই দেখছি আবার গোড়ায় নূতন তথ্য। মৃত্যুর চার বছর পরেও রোজই বৈচিত্রময় নূতন তথ্য পাচ্ছি। যেটাকে গালগল্প ভাবছি, সেটা মিনস্ হয়ে যাচ্ছে।

বাজনা নিয়ে বাবা বলতেন, 'ঘরকুনো হওয়া ভালো, কারণ তুচ্ছ সস্তা আর মুখ রাখা প্রশংসা শুনতে হয়না। তাতে বাজনারও ক্ষতি হয় এবং অহংও জাগে।' সিদ্ধান্ত মহৎ তাই জীবনের মানচিত্রেতে অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাবার যা শোভা পেতো, তা কি আমার পক্ষে সম্ভব? সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে লোকের কাছে অপযশ কুড়িয়েছি। কেন এই কথা লিখলাম, বলতে গেলে বছরের গোড়ার দিকের ঘটনা দিয়ে উল্লেখ করি।

৬৫

নূতন বছরের প্রথম মাসের মাঝামাঝি আমেদাবাদ যাত্রা করলাম। প্রমথেশ সেন কনফারেন্সের প্রথম দিনে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। বললাম, 'আমার বাজনার দিনই যাব।'

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা কথা, নিজের বিষয়ে বলা প্রয়োজন মনে করি। সঙ্গীতের মধ্যে দেখেছি, বাজাবার পর কারো সঙ্গে দেখা হলে, সে শ্রোতাই, বা সঙ্গীতজ্ঞই হোক, মিথ্যা প্রশংসা করে। বলেন, 'আহা কি বাজালেন।' এই সময় শিল্পী এবং শ্রোতা বা সঙ্গীতজ্ঞর সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান হয়। সেই সময় কি জানি কেন, নিজেকে বোকা বোকা লাগে। বরাবরই এই প্রশংসাকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না। আমার বাজনা কি রকম হোল, আমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে? সুতরাং এই মিথ্যা প্রশংসার কোন মূল্য না দিয়ে, বরাবরই বাজাবার পর মুহূর্তেই স্থান ত্যাগ করে নিজের স্থানে চলে যাই। হয়ত এটা লৌকিক পরিভাষায় অভদ্রতা।

এ বিষয়ে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। বাইরে যখন বাজাতে প্রথম শুরু করি, সেই সময় বেশ কয়েক বছর যেখানেই বাজাতে যেতাম, সকলের গান বাজনা শুনতাম। ভারতবর্ষের নামী গায়ক, বাদক এবং নৃত্যকার, প্রত্যেকেরই অনুষ্ঠান শুনেছি। কবে থেকে যে কনফারেন্সে অনুষ্ঠান শোনা বন্ধ করেছি, তা ঠিক বলতে পারব না। কেন অনুষ্ঠান শুনি না, তার একটা কারণ আছে। কারণটা হোল এই যে, যদি আমি বসি, তাহলে শেষ পর্যন্ত যত শিল্পী থাকবেন, সকলের জন্যই আমার বসা উচিত। সেখানে কে বড়, কিংবা কে ছোট, সেটা আমার বিচার্য নয়। আমার কাছে শিল্পী হিসাবে সবাই সমান। একজনের গান কিংবা বাজনা শুনে, যদি আমি উঠে যাই সেটা ঠিক নয়। কেননা পরবর্তী শিল্পী যদি আমাকে উঠে যেতে দেখে, তাঁর নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের খারাপ লাগে, যদি কেউ উঠে যায়, যখন আমি মঞ্চেতে বাজাবার জন্য বসছি। আমার কাছে এটা সঙ্গীতের বদতমিজি অর্থাৎ অভদ্রতা। এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি বাবার কাছে। অনেক সময় আমার বিশেষ কাজ থাকার ফলে, একজন শিল্পীর প্রোগ্রামের পর উঠে যেতে হয়েছে। তার জন্য কনফারেন্সের সেক্রেটারির কাছে শুনেছি, আমার পরবর্তী শিল্পী জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কোথায়? আসলে মুখ দেখাদেখি হয় দুইজন শিল্পীর সঙ্গে। আমার আগের শিল্পী অনুষ্ঠান শেষ করে যখন ওঠেন, সেই সময় বাজাতে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আবার আমার বাজাবার পর যে শিল্পী বসবেন, তাঁর সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও হয়।

সকলেই দেখি, বাজাবার আগের শিল্পী এবং পরের শিল্পীর সঙ্গে শুভেচ্ছার বিনিময় করে। আমি কিন্তু ব্যতিক্রম। বাজাবার আগে, আমি মৌন থাকতেই ভালবাসি এবং বাজাবার পরেও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান করি। যার জন্য অনেকেই আমাকে অভিমানী বলে শুনতে পাই। কিন্তু তাঁদের কি করে বোঝাব, কেন আমি থাকি না। অভিমান? কি নিয়ে অভিমান করব? তাহলে তো আমার শিক্ষাই ব্যর্থ। বাবা বরাবর শিক্ষাকালীন বলতেন, 'দিয়ে ধন, বুঝি মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ।' ব্যাখ্যা করে বলতেন, 'ধন বলতে কেবল টাকাই মনে কোরো না।

আসলে টাকা, বিদ্যা বা যে কোন গুণ, ভগবান মানুষকে দিয়ে মনটা পরীক্ষা করেন। যে মুহূর্তে ভগবান বোঝেন, তোমার অহঙ্কার হয়েছে, সেই মুহূর্তেই তিনি কেড়ে নেন। উদাহরণ দিয়ে বলতেন, যে কোন জিনিষে, যদি নিজেকে বড়ো বলে মনে করো, কিন্তু পরে যদি সেই জিনিষটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি নিয়ে অভিমান করবে?'

আমেদাবাদে আমি বাজিয়েই নিজের স্থানে চলে যাই। পরের দিন প্রমথেশ সেন আমাকে বললেন, 'ভীমসেন যোশী গাইবার আগে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'আপনি কোথায়?' উত্তরে আমি বলেছিলাম বাজিয়েই চলে গিয়েছেন। এ কথা শুনে প্রমথেশ সেনকে আমার স্বভাবের কথা বলেছিলাম বলে, 'মিথ্যা প্রশংসা যেমন করি না, সেইরকম মিথ্যা প্রশংসা শুনতে ভালবাসি না। অনুষ্ঠানে বসলে এটা করতেই হবে। প্রত্যেক শিল্পীকেই করতে দেখেছি। শিল্পী সামনের সারিতে যাঁর দিকে তাকাবে, তাঁকেই প্রশংসা করতে দেখেছি। প্রোগ্রাম হয়ে যাবার পরেও গিয়ে প্রশংসা করতে দেখেছি। কিন্তু এও দেখেছি, ফেরার পথে নিজের লোকেদের বলছে, এই প্রোগ্রাম শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল। সুতরাং এই মিথ্যার বেসাতি আমার দ্বারায় হয় না। সেইজন্য আমার প্রোগ্রাম হয়ে গেলেই, আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্থানে চলে যাই। কিন্তু এটা কমারসিয়াল যুগ। সকলের সঙ্গে দেখা করো, ওজন করে হাসো, মেপে কথা বলো, এটাই হোল আজকালকার চলন। আমার দ্বারা এটা হয় না। কখনও কখনও আমার মনে হয় পৃথিবীটা কেমন মজার জায়গা। সর্বত্র ভাঁওতাবাজীর জয়।

বাজনার দু'দশক শেষ হোল। কিন্তু এ যেন দুশো বছরের অভিজ্ঞতা। আমার বাজনা সন আটাত্তরে হোল এডাল্ট, যদিও জীবনের গুঁতোয় বহুদিন আগেই পরিণত বয়স্ক হয়ে গিয়েছি। সত্যিকারের বয়সটার দিকে চেয়ে দেখলাম, আর চমকে উঠলাম। পঞ্চাশোর্ধ আমি আর বাজনা কৈশোর থেকে যৌবনে সবে মাত্র পা দিয়েছে। বাজনা যুবক হবার আগেই আমি বৃদ্ধ হয়ে যাব। প্রৌঢ়ত্বের পরিপক্কতা আর বার্দ্ধক্যের মর্মজ্ঞতা বাজনার জীবনে আসার আগেই, আমার জীবন বীণার তন্ত্রীগুলো ছিঁড়ে পড়বে। আজ বুঝতে পারি বাবার হাহাকারের অর্থ। বাবাকে বরাবরই বলতে শুনেছি, 'দুনিয়ায় সব জিনিষেই একটা মাত্রার পর তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গীত এত বিশ্রী যে এতে স্বাদ মেটে না। এ যদি আগে জানতাম, তাহলে পাগলের ম'তো সঙ্গীতের পেছনে দৌড়তাম না। সর্বদাই মনে হয় যা মন চায়, বাজনায় তা হোল না। কি ছাই বাজাই। যা নিজেরই ভালো লাগে না, তা অন্যে কি ভাল বলবে? এই ছাতার বাজনার পরে সকলেই বাজনা শুনে বাহবা দেয়। মনে মনে ভাবি কি মূর্খতা। এই প্রশংসার বিষ্ঠা কেউ আবার বাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায়? লাহোল বিলা কুবত। ঈশ্বরই একমাত্র রক্ষা করতে পারেন।'

গত একটা বছর পেটের জন্য বাজনা বাজিয়েছি, আর বইএর স্বার্থে সারাভারত ঘুরে বেড়িয়েছি। ভেবেছিলাম বইটা চার বছর আগে সমাধা হবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, আটাত্তরের গোড়ার দিকেও সবুজ ঘাসের দ্বীপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। শুধু একটা দুটো ঈগল পাখী ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক নিশ্চিন্ত, যে দিশার নির্দেশ পাচ্ছি, ওই দিকেতেই তটভূমি। পৌঁছনটা কষ্টসাধ্য হলেও একটাই চেষ্টা, তীরে এসে তরী যেন না ডুবে যায়।

এই তীরে পৌঁছনর ইতিবৃত্তের প্রাককথনটা আগে বলি। প্রায় তিনমাস পরে, নানা জায়গায় বাজিয়ে বছরের প্রথমেই কাশীতে এসে বাড়ী আসবার সময়, বহু জায়গায় পোষ্টার দেখলাম রিম্পা প্রেজেনটস। রবিশঙ্কর এবং অন্যান্য শিল্পীর নাম চোখে পড়ল। আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছে শুনলাম, রবিশঙ্কর একটা সঙ্গীতের সংস্থা কাশীতে খুলেছে। সেই উপলক্ষে, কয়েকদিন আগেই সঙ্গীত সম্মেলনের অয়োজন করেছিল। সুভ্যেনারটা দেখলাম। রিম্পার অর্থ বুঝলাম। রিসারচ ইনস্টিটিউট ফর মিউজিক পারফরমিং আরটস-এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ হয়েছে রিম্পা। কাশীতে এই সংস্থা করার উদ্দেশ্য হোল, বছরে একটা সঙ্গীত সম্মেলন হবে। এ ছাড়া রবিশঙ্কর নিজের বাড়ীতেই একটা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছে। ছাত্রদের শিক্ষা দেবে। পরিকল্পনা অনেক কিছু দেখলাম। পড়ে অবাক হলাম। বিদ্যালয়ের বা সংস্থার নামকরণ বাবার নামে কেন রবিশঙ্কর করল না? মনে হোল, সংস্থার নাম বম্বের ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি পারফরমিং আরটস এর অনুকরণে করা হয়েছে। ধন্য বাবার ছেলে এবং জামাই। ছেলে নিজের নামে দু'দশকের আগে, কোলকাতায় নিজের নামে কলেজ করেছে। এ ছাড়া আমেরিকাতেও নিজের নামে কলেজ খুলেছে। জামাইও একটা সংস্থা খুলল। রিসার্চ মানেই রবিশঙ্কর। যে যার ঢাক পেটাতেই ব্যস্ত। অথচ যাঁর জন্য তাঁদের এত নাম, সে বিষয়ে কারো খেয়াল নাই। অন্নপূর্ণাদেবী বাবার মহাপ্রয়াণের তিন বছর পরেই বাবার নামে সংস্থা খুলেছেন। কিন্তু রবিশঙ্কর পাঁচ বছর পর সংস্থা খুলল, যার উদ্দেশ্য নানা জিনিষ সুভ্যেনারে স্থান পেয়েছে। কিন্তু কতদূর কার্যকরী হবে ভবিষ্যৎই বলবে।

বম্বের রাজা লক্ষ্মী প্রসাদ পিত্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বীরেন্দ্র মাথুর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে যে সম্মেলন হয়, তার মধ্যে আমাকে ডেকেছেন।

বম্বেতে গিয়েই প্রতিবারের মত অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। যাবার সঙ্গে সঙ্গে বললেম, 'মা এসেছেন আমার কাছে।' শুনবার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে বললাম, 'মা এসেছেন? কার সঙ্গে?' বললেন, 'ধ্যানেশ এসে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। মা আমাকে দেখতে এসেছেন।' মা'কে দেখব ভেবেই শরীরের ভিতর বিদ্যুৎ তরঙ্গ অনুভব করলাম। ড্রয়িং রুমে মা'কে দেখতে না পেয়ে, জিজ্ঞেস করলাম, 'মা কোথায়?' বললেন, 'আমার ঘরে এইমাত্র খাবার খেয়ে আঁচাতে গেছেন। বসুন মা'কে ডেকে আনছি।' অন্নপূর্ণাদেবী মা'কে নিয়ে এলেন। বাবার মৃত্যুর ছয় বছর পর মা'কে দেখছি। এতদিন পরে মায়ের সঙ্গে দেখা হবে ভেবেই, মনের ভিতর যে আলোড়নের সৃষ্টি হোল তা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দূর থেকে মা'কে আসতে দেখে কোন পরিবর্তন মনে হোল না। কিন্তু মা এরকম ধীরে ধীরে আসছেন কেন? মা কি চোখে কম দেখছেন? মা আসতেই প্রণাম করলাম। মনে হোল চিনতে পারলেন না। অন্নপূর্ণাদেবী যখন আমার নাম বললেন, চিনতে পেরেই ডুকরে কেঁদে বললেন, 'বেডা। কি করে এতদিন মা'কে ভুলে ছিলে? তাই তো বলি আমার সেই বেডা কোথায়, যে ভাল জর্দা এবং আতর দিতো। বেডা, বুড়ো মা'কে এতদিন কি করে ভুলে ছিলে?' মুখে আমার কোন কথা নাই। মনটা আমার হাহাকার করে উঠল। মায়ের চোখের জল দেখে, আমারও যে চোখ কখন জলে ভরে গিয়েছে বুঝতে পারি নি। যেন বোবা হয়ে

গিয়েছি। কোনরকমে বললাম, 'মা, আপনাকে কি কখনও ভুলতে পারি। প্রত্যেক বছর কোলকাতায় গিয়ে দেখা করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বিশেষ কারণে যেতে পারি না।' মা কি বুঝলেন জানি না। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার বাবা তো হাসতে হাসতে চলে গেল। কিন্তু আমাকে এই সব দেখবার জন্য রেখে গেছেন। অন্নপূর্ণার জন্য আমার প্রাণটা ফেটে যায়। একলা থাকতে হয় এতবড় জায়গায়। হায় আল্লা! কি পাপই আমি করেছিলাম জানি না, যার জন্য এই বুড়া বয়সে আমাকে এই সব দেখতে হচ্ছে।' মা'কে কি বলে সান্ত্বনা দেব? মা খাবার পর বরাবরই পান ছেঁচে খান। তাই বললাম, 'মা আপনি পান খাবেন?' কথাটা বলেই দেখলাম, মা যেখানে বসেছেন তার কাছেই একটা থালায় পানের সব সামগ্রীই রয়েছে। ছোট পিতলের হামামদিস্তাও রয়েছে। মা বললেন, 'হাঁ বেডা এখনও দুপুর এবং রাত্রে, খাবার পর একটা পান খাই।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আমি আপনার পান ছেঁচে দিচ্ছি।' মা'র কথা শুনে বুঝলাম এখনও সেই কর্মক্ষমতা আছে। বললেন, 'বেডা তুমি কেন কষ্ট করবে? আমি নিজেই করে নেব।' বললাম, 'আজ আপনাকে পান খাওয়াব।' মা সহজ সরল ভাবে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে বেডা। তুমিও একটা পান খাও।'

পান, খয়ের, চুন, ছেঁচে জর্দার কৌটা খুলতেই বিশ্রি গন্ধ পেলাম। এ কি নিকৃষ্টতম জর্দা? জিজ্ঞেস করলাম, 'এই জরদা এখানে এসে আনিয়েছেন?' বললেন, 'কোলকাতা থেকেই জর্দা এনেছি। অন্নপূর্ণা পান আনিয়ে দিয়েছে।' অবাক হলাম ভেবেছিলাম অন্নপূর্ণাদেবী কাউকে দিয়ে জর্দা আনিয়েছেন। জরদা খায় না, সেইরকম কোন লোককে দিয়েই হয়ত আনিয়েছেন। জরদার কৌটাটা ছিল 'বাবা' জর্দার। কিন্তু ভেতরে? সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'একটু পরে পান খাবেন। আমি এক্ষুনি আসছি।'

অবাক হয়ে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'কি হোল? কোথায় যাচ্ছেন? জর্দাটা কি ভাল নয়?' বললাম, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। এসে আপনার উত্তর দেব।' এই কথা বলেই বাড়ীর বাইরে গিয়ে 'বাবা' জরদার একটা বড় ডিবব্বা কিনে নিয়ে এলাম। মা চিরকালই এক চুটকি জর্দা খান। মাকে পানটা দিয়ে, এক চুটকি জর্দা আলাদা দিলাম। মা পান খেয়েই বললেন, 'আরে বেডা, বড় ভাল খুশবু বেরোচ্ছে। তুমি মৈহারে ভাল জর্দা খাওয়াতে। আজ বড় অচ্ছা পান খেলাম।'

অন্নপূর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার? জর্দা কেন নিয়ে এলেন?' বললাম 'আপনি তো এ বিষয়ে আনাড়ি, তাই বুঝবেন না। দেখলেন তো মা পান খেয়ে কি কথা বললেন?'

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'ঠিক আছে আগে খেয়ে নিন, তারপর মা'র সঙ্গে গল্প করবেন। মা একটু বিশ্রাম করুন। মা কিছুক্ষণ পরেই উঠে নমাজ পড়বেন তারপর মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন।'

আমি কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসলাম। খেতে বসেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলুন তো মায়ের চোখে কি ছানি পড়েছে?' উত্তরে বললেন, 'হাঁ।' বললাম, 'মা এই বয়সেও এত কর্মঠ, অথচ জেনে শুনে মা'কে অন্ধ করে রেখেছেন কেন?' উত্তরে সংক্ষিপ্ত একটা কথাই বললেন, 'এই বয়সে অপারেশন করতে দাদা এবং বাড়ীর সকলে ভয় পাচ্ছে।'

বললাম, 'এঁরা কোন যুগের মানুষ! জানেন, আমার মা'য়ের বয়সও কম হয় নি। মায়ের ছানি যখন পড়েছিলো, আমার দাদারাও সেই ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের অপারেশন করাবার পর এখন পঞ্জিকা দেখেন তিনি। একাদশী, অম্বুবাচী যাবতীয় সব জিনিষ আগে থেকে পড়েন।' উত্তরে বললেন, 'আমি কোন সাহসে এখন অপারেশন করাব?' কথা শেষ না করেই বললাম, 'এখানে কেন করাবেন? কোলকাতায় এত লোকবল আছে, সুতরাং সেখানে কোন অসুবিধে? কিছুদিন পরে আর একটা চোখেও যখন ছানি পড়বে সেই সময় তো একেবারে অন্ধ হয়ে যাবেন। চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে থাকবেন? মা'র হাত ধরে যে সময় নিয়ে এসেছিলেন সেই সময়েই যা সন্দেহ করেছিলাম দেখলাম ঠিক তাই। মায়ের চোখ দেখে বুঝলাম, একটা চোখে তো ছানি পড়েছে, উপরন্তু অন্য চোখেও ছানি পড়তে আরম্ভ করেছে।'

আমার কথা শুনে বললেন, 'আমি তো মা'কে নিজের কাছে রাখতে চাই। কিন্তু মা এসে অবধি, রোজ কথায় কথায় আমার কথা ভেবে কাঁদেন। আপনি তো নিজেই দেখলেন, মা আপনার সামনে আমার কথা ভেবে কি ভাবে কাঁদলেন। আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু মায়ের কান্না শুনে বিচলিত হয়ে পড়ি।' এই কথাটা বলেই চুপ করে গেলেন।

মনে মনে ভাবলাম, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি মায়ের চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে থাকতেন। আজকের যুগে সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের কথা চিন্তা করবার সময় তাঁদের নাই। বাবা তো কম টাকা রেখে যান নি। আসলে টাকা লাগবে বলেই অন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে? সম্পত্তি বা টাকা এমন জিনিষ, যা শুধু নিজের পরিবারবর্গ কেন, নিজের ছেলেকেও বিশ্বাসহন্তা করে তোলে। এ না হলে, কয়েকটা টাকার জন্য, আমেরিকা থেকে এসে বিরাট ফ্লাটের একটা অংশ যা শুভর নামে ছিল, সেটা কি করে আমেরিকা থেকে এসে বিক্রি করে দিয়ে যেতে পারতো অন্যের প্ররোচনায়?

নিজের মনে আবোল তাবোল ভাবছি, ইতিমধ্যে মা এসে নমাজ পড়বার অয়োজন করতে লাগলেন। মা না থাকলে অনেক আগেই চলে যেতাম কেননা আগামীকাল আমার বাজনা অছে। মা নমাজ পড়ে আমার কাছে এসে বসলেন। কত কথাই বললেন। শেষকালে বললেন, 'আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি তো ব্রাহ্মণ। তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করো, সকলকে রেখে যাতে শীঘ্র তোমার বাবার কাছে যেতে পারি। আল্লার কাছে রোজ এই প্রার্থনা করি, কিন্তু কপালে কত দুর্ভোগ লেখা আছে জানি না। আমি সকলের কাছে এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। কথায় বলে, 'শুয়োরের বাচ্ছা পেট, তার জন্যই মাথা হেঁট।'

মা কেন এই কথা বললেন? হঠাৎ মনে হোল যদিও আমার বই লেখার ব্যাপারে মায়ের কাছে অনেক তথ্য পেয়েছি, তা সত্ত্বেও যদি মায়ের কাছে কোন কথা আরো জানতে পারি। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে গর্গকে টেলিফোন করে নিজের আগমনের কথা বলে বললাম, 'আগামীকাল আমার বাজনা আছে। তার পরের দিন তোমার একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে তুমি সকালে এসো। মায়ের সঙ্গে একটা ফটো ওঠাব এবং মায়ের সঙ্গে কথা বলব। তুমি সেই কথাগুলো টেপ করে নেবে।' গর্গ বলল, 'ঠিক আছে, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে যাব। ছেলে ফটো ওঠাবে, আমি টেপ করে দেব।'

আমার বাজনা শুনে, মা আশীর্বাদ করে বললেন, 'বেডা খুব ভাল বাজাও আশীর্বাদ করি। ভালো বাজালে তোমার বাবা যেখানেই থাকুন তাঁর আশীর্বাদ পাবে।' মা'কে প্রণাম করে চলে গেলাম পিত্তি সাহেবের ট্রাস্টের ফ্ল্যাটে। মনটা কি জানি কেন বিষাদে ভরে উঠল।

নির্দিষ্ট সময়ে গর্গ এবং তাঁর ছেলেকে নিয়ে মা'র কাছে গেলাম। মায়ের জন্য আর এক ডিবে জর্দা নিয়ে গেলাম। মা জর্দাটা শুঁকে বললেন, 'খুব আচ্ছা বেডা, সুখে থাকো।' গর্গ এবং তাঁর ছেলে অন্নপূর্ণাদেবীকে প্রণাম করলো। এদিক ওদিক কথা বলার পর মাকে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলাম। গর্গকে বললাম, 'টেপটা চালিয়ে দাও।' মা আমার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন। মা আবেগের চোটে যে সব কথা বললেন, সেগুলো টেপএর মধ্যেই থাক। সে সব কথা লিখব না। টেপএর মধ্যেই ধরা থাক। গর্গও মা'কে কিছু প্রশ্ন করল। মা সেই সব কথারও জবাব দিলেন। এক ঘণ্টা ধরে মায়ের কথা টেপে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। সে সব কথা লিখলে প্রলয় হয়ে যাবে। নিজের ঘরের কথা লিখে কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সেইজন্য সেগুলো লিখলাম না। মা'র শেষ কথাটা আমার মনে আলোড়নের সৃষ্টি করল, যখন বললেন,

'বেটা বিয়োলাম বউকে দিলাম
ঝি বিয়োলাম জামাইকে দিলাম।
আমি হলাম বাঁদি
পা ছড়িয়ে কাঁদি।'

ইতিমধ্যে গর্গ-এর ছেলে, যে সময় মার সঙ্গে কথা বলছি মাইকের সামনে, এই অবস্থায় মা, গর্গ এবং আমার কয়েকটা ফটো তুললো। ভাবলাম আমার বইতে এই ফটোগুলো ছাপব। গর্গকে বললাম, 'কয়েকদিন আমি বম্বেতে থাকব। এর মধ্যে টেপ এবং ফটোগুলো আমাকে অতিঅবশ্য দেবে।' গর্গ বলল, 'যাবার আগে সব দিয়ে দেব, চিন্তা কোরো না।' সব কাজ হয়ে যাবার পর ড্রয়িং রুমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'কি কথা এতক্ষণ হচ্ছিল?' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথা বলে বললাম, 'এই ফটোটা আমার বইএ ছাপাব। উনি ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবেই নিলেন, কোন কৌতূহল দেখলাম না। কোন প্রশ্নও আর করলেন না।

এরপরেই মা'কে বললাম, 'যে কদিন আছি, রোজ সকালে আসব। রাত্রে রোজ এক জায়গায় বাজাতে হবে।' মা কি বুঝলেন জানি না। বললেন, 'বেডা রোজ একবার এসো।' সম্মতি জানিয়ে ফিরে গেলাম নিজের স্থানে।

সন্ধ্যার পর যথারীতি গাড়ী এলো এবং আমি পিত্তিজির বাড়ী গেলাম। যদিও পিত্তিজি জানতেন বই লেখা হচ্ছে, তবুও এই প্রথম আমি বললাম, 'বইটা আমার শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনার কি কোন ভাল পাবলিশারের সঙ্গে জানাশোনা আছে?' পিত্তিজি প্রথমে বললেন, 'বইটায় যা লিখেছেন তা কি টাইপ করিয়েছেন?' বললাম, 'একটা কপি টাইপ করিয়েছি। কিন্তু অনেক জিনিষ তার মধ্যে যোগ করেছি যা টাইপ করি নি।' উত্তরে বললেন, 'আগামীকাল দুপুরের পর আমার অফিসে আসুন। আমার কর্মচারিদের দিয়ে প্রথমে এক

কপি টাইপ করিয়ে দেব কয়েকজনকে দিয়ে। তারপর পাঁচ কপি জেরক্স করে দেব। এই সব করতে হয়ত তিন দিন লেগে যাবে। টাইপ করতেই যা সময় লাগবে। জেরক্স করতে বেশী সময় লাগবে না। একদিনেই পাঁচ কপি জেরক্স হয়ে যাবে।' এই কথা বলেই বললেন, 'এই কাজ শেষ হলেই, একজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। সেই ভদ্রলোক আমার খুব পরিচিত। তিনি অনেক বই লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে কলম্যান এনড কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাঁর সঙ্গে আপনাকে পাঠাব।' কলম্যান এনড কোম্পানির নাম শুনেই আমার প্রকাশক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। মনে হোল হাতে স্বর্গ পেলাম।

পরের দিন সকালে মা'র সঙ্গে দেখা করে, কিছুক্ষণ থাকবার পর, পিত্তিজীর অফিসে গেলাম। পাঁচজন লোককে টাইপ করতে দিলেন, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়। আমি সমানে তদারকি করে দুইদিনের মধ্যেই সমস্ত টাইপ করিয়ে ফেললাম। তৃতীয় দিনে পাঁচ কপি জেরক্স করে পিত্তিজি ফাইল করে দিলেন।

ফাইল বিকেলে পাবার পর পিত্তিজি বললেন, 'আগামীকাল আমার অফিসে আসবেন। আপনার সঙ্গে একটা লোকের পরিচয় করিয়ে দেব। তাঁর বই কলম্যান এনড কোম্পানি ছাপিয়েছে। সেই লোকটির সঙ্গে আপনাকে পাঠাব।'

পরের দিন ঠিক সময়ে অফিসে গেলাম। পিত্তিজির লোকও ঠিক সময়ে অফিসে এলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি আমাকে কলম্যান এনড কোম্পানির ম্যানেজার, মিস্টার মুনির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে, আমার মানুসক্রিপ্টটা দিতে বললেন। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর আমার ইংরেজী বইএর টাইপ করা লেখা পড়লেন।

বুঝলাম ভদ্রলোক খুশী হয়েছেন। বললেন, 'সঙ্গীতের উপর এ ধরনের বই দেখা যায় না।' আমার স্থির বিশ্বাস, এই বই ছাপান হবে। তবে এরজন্য অন্ততঃ তিন মাস সময় লাগবে। আপনার টাইপ করা কাগজ, ফাইল করে লণ্ডনে আমাদের অফিসে পাঠাব। আমাদের কমিটির মেম্বাররা পড়বার পর নির্ণয় করবে, বইটা ছাপান হবে কি না? তবে আমি হাইলি রেকমেণ্ড করে লণ্ডন অফিসে পাঠাব।'

এই কথা বলেই একজনকে ডেকে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এনাকে আমাদের পাবলিস করা বইগুলো দেখান।' মিস্টার মুনির সঙ্গে পিত্তিজির পাঠান লোকটির সঙ্গে খুব পরিচয় আছে বুঝলাম। পিত্তিজির লোক আমাকে নিয়ে যেখানে বই রাখা আছে সেখানে নিয়ে গেলেন। একটা বই খুলে দেখে মুগ্ধ হলাম। এ ধরনের প্রিন্টিং, বাইনডিং, ফটোগ্রাফি দেখে মনে হোল, বাবার উপর লেখা বইটা এই রকম যদি ছাপা হয় তাহলে আমার লেখাটা সার্থক হবে। ফটো দেখে মনে হোল কত জীবন্ত এবং উজ্জ্বল। কিন্তু আমার বহু পুরোনো ফটোগুলি কি এ ধরনের হতে পারবে? মনে মনে চিন্তা করে বুঝলাম, বই ছেপে বেরোতে বেরোতে এক বছরের উপর লেগে যাবে। যতই বই দেখি, মুগ্ধ হই। মনে মনে বলি, এ ধরনের ছাপা বই তো সচরাচর দেখা যায় না।'

পিত্তিজির লোক আমাকে বললেন, 'চলুন আর এক জায়গায় যাই।' এই কথা বলে আমাকে 'বিকাশ পাবলিশিং'-এর দপ্তরে নিয়ে গেলেন। বুঝলাম পিত্তিজির লোকের পাঞ্জাবী

ম্যানেজার-এর সঙ্গেও আলাপ আছে। 'বিকাশ পাবলিশিং'-এর অনেক বই পড়েছি। আমার প্রকাশক বন্ধু যে কয়েকটা পাবলিশার-এর নাম দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এই নামটিও ছিল। এখানেও সেই এক উত্তর পেলাম। ম্যানেজার বললেন, 'আমাদের হেড অফিস দিল্লীতে পাঠাব।' এ এক আলাদা রাজ্য। পিত্তিজির লোক দুজনকেই এক কথা বললেন, 'ঠিক আছে, পরে একদিন আসব।' ভদ্রলোক আমাকে পিত্তিজির অফিসে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে ভাবলাম, এ কি বিড়ম্বনা। আমার ধারণা ছিলো দশ বারোদিনের মধ্যেই বই ছেপে বেরিয়ে যাবে কিন্তু এতদিন কেবল বই পড়েছি। ছাপাবার ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলাম। মনে হোল, উপস্থিত হাথরসে বাবার যে কয়েকটি ছবি দিয়ে এসেছি, সেগুলি প্রথমে আনাতে হবে। পিত্তিজির অফিসে গিয়ে ভদ্রলোক সব কথা বললেন। পিত্তিজি বললেন, 'আপনি তো চারদিন পরেই আমেদাবাদে বাজাতে যাচ্ছেন। আমেদাবাদে বাজিয়ে বম্বে আসুন। তার মধ্যে আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'

বম্বেতে চারদিন রোজ মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। মা'কে দেখে অবাক হয়েছি। অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শুনলাম, মা সব কাজ ঠিক সময়মত এখনও করেন। সারাদিনে পাঁচবার নমাজ এখনও সময়মত করেন। ঠিক সময়ে খাওয়া, বিশ্রাম এবং শয়ন করেন। মায়ের কষ্ট দেখে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আমার করণীয় কিছু নাই। মা'কে কয়েকদিন দেখে, একটা কথাই বারবার আমার মনে হয়েছে। বাবা এবং মায়ের মত ধার্মিক, সৎচরিত্র, উদার প্রকৃতি, ভগবদভক্ত হয়েও এই বিপর্যয় কেন হোল? ভগবানের এ কি বিচার? সত্যই বোঝা ভার। নইলে মা এত সহজ, সরল হয়েও কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন এই বৃদ্ধ বয়সে? মা'র কাছে প্রতিদিন গিয়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। এদিক ওদিক কথা বলার পরই, মাকে রোজ একটা কথা বলতে শুনেছি। বলেন, 'অন্নপূর্ণার এই বনবাস আমার কাছে অসহ্য লাগছে।' মা'র কথা শুনে, রোজ ওমর খৈয়ামের কবিতার শেষ দুটো লাইন মনেমনে আওড়াই, 'নর অল দাই পিটি নর উইট স্যাল লিয়োর ইট ব্যাক টু ক্যানসেল হাফ এ লাইন, নর অল দাই টিয়ার্স ওয়াস আউট এ ওয়ার্ড অফ ইট।

বম্বে থেকে আমেদাবাদে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার দাদার এখানে ভাইঝি এবং জামাই বসে আছে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কথায় কথায় আমার ইংরেজী বইএর সব সংবাদ বলে, বললাম, 'পরশু বাজিয়েই বম্বে চলে যাব প্লেনে। আমার বই ছাপানর কথা শুনে, ভাইজি জামাই বললো, 'আমার সঙ্গে আমেদাবাদে এক বড় পাবলিশারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমি যদি তাঁকে বলি, তাহলে সে আপনার বই নিশ্চয়ই ছাপবে।' বললাম, 'প্রকাশক হয়ত ছাপাবে যে হেতু তোমার বন্ধু, কিন্তু প্রিন্টিং বইএর কভারিং বম্বেতে যা দেখে এসেছি, সেরকম কখনই করতে পারবে না।' জামাই বলল, 'এখানে খুব নামী প্রেস আছে। যে প্রেস থেকে আমার প্রকাশক বন্ধু বই ছাপায়।' বললাম, 'ঠিক আছে দেখা যাবে।'

পরের দিন সকালেই আমার দাদার জামাই একজন লোককে নিয়ে এসে হাজির। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার বন্ধু পাবলিশারকে আপনার কথা বলেছি। আপনি আপনার ম্যানুসক্রিপটা দেখান।' পাবলিশার আমার ছাপান ফাইল প্রায় এক ঘণ্টা দেখবার পর

বললো, 'আসলে আমি কলেজের টেকস্ট বুক ছাপাই। এই ধরনের বই আমি কখনও ছাপাই নি। তবে আপনি যদি এই বইটি ছাপবার অনুমতি দেন, তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।' পাবলিশারকে আমি বম্বের পাবলিশারদের সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছে সব কথা বললাম।

আমার কথা শুনে পাবলিশার বললো, 'আপনি আগামীকাল এখানে বাজিয়ে নিন। পরের দিন দুপুরের আগে, আপনার কাছে এসে, বইএর ব্যাপারে আলোচনা করবো।'

প্রমথেশ সেনের কনফারেন্সে বাজানর পরের দিনই, পাবলিশার দুপুরের আগেই এসে হাজির। এসেই আমাকে বলল, 'দয়া করে আমার গাড়ীতে একটু চলুন।' আমাকে গাড়ীতে বসিয়েই বললেন, 'আমার বাবা আপনার বইটার কথা শুনে বলেছেন, আমাদের অফিসে নিয়ে যেতে। আমার বাবা বৃদ্ধ হলেও রোজ অফিসে বসেন। প্রথমে আপনাকে প্রেসে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমাদের সব বই ছাপাই। এই প্রেসটি গান্ধীজী উদঘাটন করেছিলেন।' গাড়ী একটা ফটকের ভিতর ঢুকল। দেখলাম লেখা হয়েছে নবজীবন মুদ্রালয়। ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে, প্রেসের ছাপান বই দেখালেন, ঘর ভর্তি বই। কয়েকটা বই দেখে ভালোই লাগল। তবে কলম্যান কোম্পানির মতন নয়। ম্যানেজার নিজে আমাকে নিয়ে প্রেসটা ঘুরিয়ে দেখালেন। সারা দিনরাত ছাপানর কাজ চলে। দেখলাম সব অটোমেটিক মেসিন। আমার কাছে বিস্ময়, দেখে মুগ্ধ হলাম। এ যাবৎ ছাপাখানা দেখেছি, কিন্তু সব বিভাগ দেখে মনে হোল, এ যাবৎ খালি বই দেখেছি। কিন্তু একটা বই ছেপে, বইএর আকারে প্রকাশিত হতে কত লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম লাগে, ধারণা ছিলো না।

পাবলিশার এবার আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে গেল। আফিসে গিয়ে দেখলাম আমার মেজদার জামাই বসে আছে। প্রায় দুই ঘণ্টা পাবলিশার-এর বাবার সঙ্গে কথা হোল।

অফিস থেকে পাবলিশার এবারে সোজা নিয়ে গেলো এক আর্ট ডিজাইনারের কাছে। আর্ট ডিজাইনারের ঘরে নানা ধরনের চিত্র দেখলাম। আর্ট ডিজাইনার, বইএর কভার এবং সরোদের চিত্র করবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যা যা দেখলাম, সবই আমার কাছে নূতন হলেও, বুঝলাম বই ছাপাতে প্রকাশকের আগ্রহ আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বইটা ছাপাতে কতদিন সময় লাগবে?'

বললেন, 'বইটা হোল সঙ্গীতের। সঙ্গীতের মধ্যে যে নোটেশন আছে, সে সব আপনি না থাকলে সম্ভব নয়। আপনি যদি ছয় মাস থাকেন তাহলে বইটা প্রকাশ হয়ে যাবে।'

আমার প্রকাশক বন্ধু কোলকাতায় সব কথাই বলেছিলেন। শোনা আর দেখা যে, এক জিনিষ নয় বুঝলাম। বললাম, 'ঠিক আছে। আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ীতে আসুন। সেখানে সব কথা হবে।'

বিকেলে জামাই এবং আমার মেজদার সামনে বললাম, 'আমার এক প্রকাশক বন্ধু বারবার বলে দিয়েছিলো, পাবলিশারের সঙ্গে বই এর ব্যাপারে আগে এগ্রিমেন্ট করে নিতে।' আমার কথা শুনে মেজদা এবং জামাই দুজনেই বললো, 'এ হোল গুজরাট, এখানে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। এখানে মুখের কথাই হোল এগ্রিমেন্ট। সত্যি কথা বলতে,

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, ব্যবসার বুঝিই বা কি? এই তৃতীয় বর্ণটি বর্ণযুক্ত না বর্ণচোরা বুঝলাম না। ঠেকেই শিখতে হবে। এই দুনিয়ার, বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ বোঝার জন্য সাধনা করতে হবে আমাকে।

সন্ধ্যার সময় পাবলিশার এলো। বললো, আপনার বইটার ফরওয়ার্ড যে লিখেছে তাঁর নাম আমরা শুনি নি। আপনার গুরু ভাই পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়ে ফরওয়ার্ড লেখাতে পারলে খুব ভালো হয়। বললাম, 'আপনি যা বলছেন তা করতে কোন অসুবিধা নাই। তবে আমার বই-এর ফরওয়ার্ড যে লিখেছেন, 'সঙ্গীত জগৎ-এ, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরির নাম সকলেই জানেন।' আমার কথা শুনে পাবলিশার বললেন, 'দুজনের ফরওয়ার্ড থাকলে বইটার বিক্রি ভাল হবে।' নানা বিষয়ে আলোচনার পর বললেন, 'উপস্থিত আর্ট ডিজাইনের কাজ শুরু করিয়ে, বইএর কাজ শুরু করতে পারি।' আমি কি করব ঠিক বুঝতে পারলাম না। অতীতের সরোদের গঠনতন্ত্রে, বাবা যে পরিবর্তন করেছিলেন, সেইটা দেখাবার জন্য, আর্ট ডিজাইনারকে দিয়ে করাতে হবে। এ ছাড়া সব ছবি কাশীতে আছে। কি করব বুঝতে না পেরে রাত্রে পিত্তিজিকে টেলিফোন করে সব কথা জানালাম। পিত্তিজি বললেন, 'এ তো খুব ভাল প্রস্তাব, যখন যোগাযোগ আপনার ভাইএর মাধ্যমে হয়েছে। আমেদাবাদে যে প্রিন্টারের নাম করলেন, তাঁর খুব নাম আছে। বই ছাপতে বহুদিন অপেক্ষা করেছেন সুতরাং একটু মেহনত করে বইটা আমেদাবাদেই ছাপিয়ে নিন।' মনে মনে ভাবলাম, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে বইটা ছাপাতে। যে করে হোক বইটা ছেপে বেরিয়ে গেলে, আমিও নিষ্কৃতি পাই। অতঃপর ঠিক করলাম, বইটা এখানেই ছাপাব। সুতরাং বম্বে যাওয়ার দরকার নাই। ইতিমধ্যে কাশীর থেকে চিঠি পেয়ে, জানলাম আমার মায়ের শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। সুতরাং আমি যেন কয়েকদিনের জন্য কাশী যাই। চিঠিটা পেয়ে কাশীতে এসে দেখলাম মা'র শরীর ভাল নেই। আসলে রোগটা হোল বার্দ্ধক্য। কাশীতে আসার পর শুনলাম, রবিশঙ্কর কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে আসছে। রবিশঙ্কর কাশীতে এলেই একদিন সঙ্কটমোচন দর্শন করতে আসে। বিশেষ করে দর্শন করবার দিন, আমাকে খবর পাঠায় যাতে আমি মন্দিরে থাকি। যাঁর ফলে ভালভাবে দর্শন এবং পুজো হয়। উপরন্তু মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র এবং তাঁর কাকা অমরনাথ মিশ্রর সঙ্গে নিভৃতে বসে কিছুক্ষণ কথার আদানপ্রদান করতে পারে। যথাসময়ে রবিশঙ্কর এসেছে শুনে টেলিফোনে বললাম, 'আমার বই লেখার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।' রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে দিন স্থির করে বলল, 'সঙ্কটমোচনে থেকো এবং মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র এবং তাঁর কাকাকেও থাকতে বোলো।'

আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হোল। শুনলাম তাঁকেও সঙ্কটমোচনে যেতে বলেছে। নির্দিষ্ট দিনে, দুজনে সঙ্কটমোচনে গেলাম। যথাসময়ে রবিশঙ্কর, তাঁর নর্মসহচরী কমলা, নিজের বাহন এবং কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মন্দির দর্শন করতে এলো। মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের কাকা অমরনাথ মিশ্র ঘরের বাইরে যে চত্তরে রোজ বসেন সেখানেই বসলেন। মন্দির দর্শনের পাঠ শেষ করে, রবিশঙ্কর অমরনাথ মিশ্রকে প্রণাম করল। অমরনাথ মিশ্র আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতে বললেন। সকলকে নিয়ে ঘরে গিয়ে দেখি মহন্ত বীরভদ্র

মিশ্র নিজের কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে বসে আছেন। বীরভদ্র মিশ্র অভ্যর্থনা করে রবিশঙ্করকে বসাল। কথায় কথায় বীরভদ্র মিশ্র রবিশঙ্করকে বললো, 'আমি একটা ইংলিশ মিডিয়ম প্রাইমারি স্কুল খুলেছি। বিদ্যালয়ের ফাণ্ডের জন্য, আপনি যদি নিঃশুল্ক বাজান তাহলে বিদ্যালয়টি আরো বড় করতে পারি।'

উত্তরে রবিশঙ্কর বললো, 'এ তো মহৎ কাজ আপনি করেছেন। তবে বড় শহরে করলে, যেমন বিজ্ঞাপন সুভ্যেনারের জন্য পাবেন সেরকম কি কাশীতে পাবেন?' বীরভদ্র মিশ্র বলল, 'সে বিষয়ে আপনার চিন্তার কারণ নাই। বড় বড় শহর থেকে বিজ্ঞাপন যোগাড় করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। আপনি রাজী হলে আমি বিরাট ভাবে, আপনার সঙ্গীতের অয়োজন কাশীতেই করব।' রবিশঙ্কর রাজী হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমি যে সময় খালি থাকব, সেইসময় ডাইরি দেখে অগ্রিম তারিখ জানিয়ে দেব।'

এই কথা বলেই রবিশঙ্কর আমাকে বললো, 'তোমার বইএর কতদূর হোল? কবে বই ছাপবে?' এ যাবৎ যা হয়েছে সব কথা বলে, আমার বইএর সূচীপত্র এবং ফরওয়ার্ড দেখিয়ে, প্রকাশকের ইচ্ছার কথা বললাম। রবিশঙ্কর সব দেখে বললো, 'বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরি যখন ফরওয়ার্ড লিখেছেন, সে ক্ষেত্রে আমার লেখার কোন মানেই হয় না।' বললাম, 'মানে হয়, কি হয় না সে কথা বুঝি না। বই-এর পাবলিশার-এর ইচ্ছা, সেইজন্য আপনাকে বলছি। লিখতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে? রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপত্তির কি থাকতে পারে? তবে একটা কথা হোল, তোমার লেখাটা পড়ে তবে ফরওয়ার্ড লিখব।' বললাম, 'আমার কাছে সঙ্গীতের নোটেশন দিয়ে একটা মাত্র কপিই আছে। সেটা তো দিতে পারি না। চার কপি জেরক্স বম্বেতে আছে। যেহেতু টাইপ করা, সেইজন্য তার মধ্যে নোটেশন নাই।' রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ফরওয়ার্ড তো একেবারে পরে ছাপবে। তুমি সময় করে পরে একটা কপি পাঠিও। উপস্থিত একমাস পরে বিদেশে চলে যাবো। কখন কোথায় থাকব দুবে জানে। দুবেকে পাঠালেই আমি পেয়ে যাব। তবে একটা কথা, ফরওয়ার্ড না হয় আমি লিখে দেব, কিন্তু বেগম সাহেবা যদি আপত্তি করে, কিংবা কেস করে তাহলে কি হবে?'

বেশ সুন্দর মেজাজে কথোপকথন হচ্ছিল। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সব ভেসে উঠল। বেগম সাহেবা অর্থাৎ জুবেদা বেগম 'দিনমান' সাপ্তাহিকে আমার সাক্ষাৎকারটা বন্ধ করে দিয়েছিলো। এ ছাড়া সঙ্গীত পত্রিকায় বাবার 'বিশেষ সংখ্যা বের হবার পর, আলিআকবর কেস করবে লিখেছিল। তার মানে রবিশঙ্কর সব কথাই জানে। মনে হোল এ সবের পরামর্শ, রবিশঙ্করই দিয়েছে, কেননা চিরকালই দেখেছি, তাঁর মন্ত্রণায় সব কাজ হয়। কার এত মাথা খেলে? এই সব চিন্তাগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যেই চোখের উপর ভেসে উঠল, এবং তারপরেই খড়ের গাদায় আগুন লাগল। বললাম, 'কি বললেন?' একই কথা দুবার যখন বলেছি খেয়াল নাই, আওয়াজটা তার সপ্তকে পৌঁচেছে। চিৎকার করে বললাম, 'যদি কেউ ভেবে থাকে, বাবা তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি, সুতরাং তাঁদের বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ লিখতে পারবে না, তাহলে তাঁরা অন্ধকারের রাজ্যে বাস করছে। আপনার মুখে এ কথা শুনবো আশা করি নি।'

রবিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা খুব সহজ করে নিয়ে বললো, 'আরে আরে চোটো না। ঠিক আছে, তুমি লেখাটা পাঠিয়ে দিলেই আমি ফরওয়ার্ড লিখে দেব।' ঘরের সকলেই চুপ। বললাম, 'এমন অযৌক্তিক কথা বললেন, যার জন্য মাথা বিগড়ে গিয়েছিলো।' ততক্ষণে অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা নেতিয়ে পড়েছে। বাবা বলতেন, 'ওঁদের কথা আর বোলো না। ওঁরা স্তাবক ও চাটুকার। ওঁরা উচ্ছিষ্টভোগী। ওঁরা প্রভুর সামনে মাথা উঁচু করতে পারে না। চিরকাল একটা কথা মনে রেখো। সঙ্গীতকে প্রভু কোরো, মানুষকে কোরো না।'

রাত্রি হয়ে গিয়েছে। বললাম, 'চলুন। আপনাকে অনেক দূরে যেতে হবে।' ঘর থেকে সকলেই উঠলো। রবিশঙ্কর বাইরে অমরনাথ মিশ্রর সঙ্গে দেখা করে বলল, 'চললাম, পরে আবার আসব।' আমি মন্দির থেকে গেট পর্যন্ত গিয়ে রবিশঙ্করকে একান্তে ডেকে বললাম, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' রবিশঙ্করের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলো সকলেই গাড়ীতে গিয়ে বসলো। বললাম, 'একটা কথা বলি। মন দিয়ে শুনে চিন্তা করবেন। আপনি কি জানেন যে আপনার অসাক্ষাতে লোকে কি বলাবলি করে? নিজের ঘর থাকতে, ঘরে না থেকে বাইরে ঘুরে বেড়ান। সকলের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে নিজেকে লজ্জিত অনুভব করি। দেখুন সব সংসারেই ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয়। মতানৈক্য হয়, মত বিরোধিতাও হয়। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে তা মিটেও যায়। এইই নিয়ম। এই নিয়ম সব সংসারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে আপনি পারবেন না কেন? আপনি যা করছেন তাতে কি আপনার সম্মান বাড়ছে। বাবার কথা ভেবেও কি আপনি এ বিষয়ে একটা সমাধান করতে পারেন না? এটা যদি করেন তাহলে আপনার বিষয়ে এই চর্চাটা বন্ধ হয়ে যাবে। লোকেদের মুখে কোন চর্চাও হবে না, যদি বম্বেতে একসঙ্গে বাড়ীতে থাকেন। এখনও সময় আছে মানিয়ে নিন।' রবিশঙ্কর ব্যাপারটা বুঝে দার্শনিকের মত মুখটা করে বলল, 'তুমি তো জান না, অন্নপূর্ণা এ্যাডজাস্ট করতে পারে না। আমি তো অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু হোল না, আমার দুর্ভাগ্য।' এই কথা শুনে মনে হোল, যাঁর হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাঁকে কিছু বলা বধিরের নিকট গান গাওয়ার সমান। সুতরাং কথাটা যে মুহূর্তে ভাবলাম বলব, ইতিমধ্যে রবিশঙ্করের বাহন গাড়ীর কাছে এসে জোরে বলল, 'গুরুজী কমলা ভাবীর শরীর ভাল নাই। তাড়াতাড়ি চলুন।' কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় ব্যঙ্গ করে বললাম, 'যান, যান। শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই।' আমার ব্যঙ্গ হজম করে চলে গেল। আমার এ লড়াই কোন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে নয়। এ লড়াই দুর্গুণের বিরুদ্ধে। আমি বরাবরই সন্ধির প্রস্তাব করেছি, কিন্তু আমার সন্ধির প্রস্তাব এঁরা গ্রাহ্য করে নি, কেননা উপযাচক হয়ে বলায় আমাকে দুর্বল ভেবেছে।

মন্দিরে ফিরে যেতে যেতে ভাবলাম, এই সব চামচেরা কি করে 'ভাবী' বলে ডাকে। রবিশঙ্কর প্রতিবারই আমাকে, কমলাকে দেখিয়ে পরিচয় করায়, কিন্তু আমি কখনও কোন সম্বোধন করি না। রবিশঙ্কর মনে মনে ক্ষুন্ন হয় বুঝতে পারি। কিন্তু সকলকেই কি বৌদি বলা যায়।

ছোট বেলায় দশাশ্বমেধ ঘাটেতে কীর্তন শুনতাম। 'সোনার প্রতিমা ধূলায় লুটায়, কুজি

বসেছে পাটে।' হায় রে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। সাথে সাথেই মনে হোল, যখন চোখ খুলবে, তখন অন্তরের ঘুম ভাঙ্গবে, তখন আর বলার মুখ থাকবে না। মনে হোল দুটী ছত্র।

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি।
হতাশ পথিক, সে যে আমি, এই আমি।

মন্দিরে গিয়ে দেখি অমরনাথ মিশ্র আর আশুতোষ ভট্টাচার্য কথা বলছে। আমাকে দেখেই অমরনাথ মিশ্র বললেন, 'এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন?' আমার উত্তর দেবার অগেই, আশুতোষ বলল, 'এই রাগের জন্যই তো নিজের ক্ষতি করে।' উত্তরে আশুতোষকে বলি, 'অন্যায় কথা বললেই রাগ করি। আমি তো স্তাবকদের মত, হাঁ তে হাঁ করতে পাারি না। সেইটাই আমার দোষ। আসলে সত্য কথা বলার জন্য, সৎ সাহস থাকা দরকার। যা সত্য বলে মনে হয় তাই বলি।'

দুটো মাস মায়ের শরীর খারাপ থাকবার জন্য কাশীতে থাকতে হোল। মায়ের শরীর ঠিক হবার পর, সব ছবি নিয়ে আমেদাবাদে গেলাম। আমেদাবাদে যেতেই পাবলিশার বলল, 'রবিশঙ্করকে দিয়ে ফরওয়ার্ড কি লিখিয়েছেন?' সব কথা বলে বললাম, বই ছাপানোর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকব। এর মধ্যে সঙ্গীতের একটা বিরাট অধ্যায়ের নোটেশন লিখতে সময় কি করে পাব?' পাবলিশার বলল, 'ঢের হয়েছে। আপনার এই মূল্যবান সামগ্রী পাঠানর দরকার নাই।' মনে মনে ভাবলাম, দুষ্ট গরু থেকে শূন্য গোয়াল ভালো।

একটি দিনও যাতে বৃথা না যায় সেইজন্য প্রথমেই আরট ডিজাইনারকে দিয়ে, সরোদ এর দুই প্রকারের ছবি আঁকবার জন্য বললাম। বইএর সাইজ এবং প্রচ্ছদপটে, বাবার কি রকম ছবি হবে সেই বিষয়ে পরামর্শ করে, আর্ট ডিজাইনার নিজের কাজে লেগে গেল। ছাপার কাজ শুরু হোল। প্রুফ রিডিং এর কাজে একজন দক্ষ সঙ্গীতপ্রেমী লোক পেলাম। ভি. জি. নেসরি গান্ধী ফাউনডেশনে চাকরি করতেন। পাবলিশারকে বলে আমার কাজে তাঁকে নিযুক্ত করতে বললাম। পাবলিশার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হ'তো না। টেকনিক্যাল ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল। ভদ্রলোক শিক্ষিত এবং সঙ্গীতপ্রেমী বলেই আমার ছাপার কাজ চলতে লাগল। দুই মাসের মধ্যে কয়েক ফর্মা ছাপান হয়েছে, ইতিমধ্যে কাশী থেকে খবর এল যে মা মৃত্যুশয্যায়। সুতরাং সব কাজ ফেলে কাশীতে যেতে হোল। মা মারা গেলেন। পৃথিবীটা অন্ধকার মনে হোল। মা'র মৃত্যুর পর আমার অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেলো। কাশীর সব ব্যবস্থা করে তবে আমাকে আমেদাবাদে যেতে হবে। কাজের ফাঁকে দেখা হয়ে গেল রবিশঙ্করের বাহনের সঙ্গে। বললাম, 'তোমার গুরুজীকে আমেরিকাতে লিখে দাও, ফরওয়ার্ড লিখতে হবে না, কেননা নোটেশন ঠিক সময়ে পাঠাতে অনেক অসুবিধা আছে। এর জন্য যেন ভুল না বোঝে।' ইতিমধ্যে বম্বে থেকে আগস্ট মাসের শেষে, বম্বের ন্যাশানাল আরট সেন্টার থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। একদিক দিয়ে ভালই হোল। ভাবলাম সেই সময় বম্বেতে বাজিয়েই আমেদাবাদে গিয়ে বইটা শেষ করব।

দেখতে দেখতে কাশীতে দুটো মাস কেটে গেল। যথা সময়ে বোম্বেতে অন্নপূর্ণাদেবীর

বাড়ী গিয়ে এক রবিদূতের মুখে জানতে পারলাম, যে তাঁদের পরম গুরু ঠাকুর হঠাৎ খ্রিশ্চিয়ানিটি কনফেসন স্টাইলে আত্মজীবনী লিখছেন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়। সবে দুইটী সংখ্যায় বেরিয়েছে, তারপর ক্রমশঃ, নামটা শুনে চমকালাম। বিচিত্র নাম। আপাতদৃষ্টিতে আমার মোটাবুদ্ধিতে যে অর্থ দাঁড়াচ্ছিল, তা হোল ভদ্রলোককে যাঁরা সোজা এবং স্পষ্ট কথা বলে, তাঁদের উপরে 'রাগ', আর যাঁরা ন্যাওটা, তাঁদের উপর 'অনুরাগ'। অবাক হলাম। কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে, অথচ নিজে বই লিখছে আমাকে বলল না।

অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'ভেবেছিলাম বইটা শেষ হয়ে যাবে কয়েক মাসের মধ্যেই, কিন্তু হঠাৎ মায়ের মৃত্যুতে বাধা পড়ল। যাক এই বছরেই বইটা আশা করি শেষ হয়ে যাবে। বইটা শেষ হলে আমিও নিষ্কৃতি পাব। তবে একটা দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না যে, বইটা বাবার হাতে দিতে পারি নি। সর্বদাই বাধা পড়ছে। দেখি এবারে কি হয়?' অন্নপূর্ণাদেবী চুপ করে সব কথা শুনলেন। আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। পিত্তিজির সঙ্গে দেখা করলাম। পিত্তিজি আমার সঙ্গে ন্যাশানাল আরট সেন্টারে বাজনা শুনতে গেলেন। বাজনা বাজাবার পর দিনই, আমেদাবাদে রওনা হলাম। একটা দিনও যাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য আমেদাবাদে গিয়েই বই-এর কাজে লেগে গেলাম। প্রমথেশ সেনের সঙ্গে দেখা হোল। নিজের থেকেই বলল, 'রবিশঙ্করের লেখা 'রাগ অনুরাগের' কথা। দুইটি সংখ্যা যা বেরিয়েছে পড়লাম। দ্রুত গতিতে আমার বই এর কাজ চলছে। 'রাগ অনুরাগ' লেখা শেষ হয়ে গেল। আমেদাবাদে আসবার আগে, বম্বেতে যে সময় শুনেছিলাম 'রাগ অনুরাগের' কথা, তার ব্যাখ্যা অন্য রকম ভেবেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম ব্যাপারটা একেবারেই ভিন্ন।

বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্য সমালোচক ক্রিষ্টোফার কর্ডওয়েল বলতেন, 'অনেক পাপ করলে পুরোটাকে না লিখে কিছুটা লিখে ফেল। সেই কিছুটাই অনেক বেশী হবে। তাই দেখে লোকে চমকাবে আর লোকের মনে জাগবে আহা। লোকটা তো স্বীকার করেছে এবং ক্ষমাও পেয়ে যাবে। আর এর ফাঁকে আখেরের লাভ, অর্দ্ধেক থেকে বেশী পাপ পড়ে যাবে ধামা চাপা।' বাংলায় ব্যাপারটা নূতন হোল। ইংরেজীতে ব্যাপারটা নূতন নয়। প্রতীক্ষার শেষ হোল রাম ধনুষের সব কটা রং দেখে। চিত্র পরিচালক হলে, চিৎকার করে বলতে পারতাম, কাট কাট। কিন্তু বই ছাপাতো সিনেমা নয়। তাই ষ্টপ করতে পারলাম না। না হলে 'রাগ অনুরাগ' যে আসরের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তাতে আমার ধ্রুপদি শৈলীর আদেশে লেখা বই বন্ধ করে, ওয়ান ডে ক্রিকেট শৈলীতে বই লিখতে ইচ্ছে করছিলো। মনে হচ্ছিলো ওই বইটার আনডার থ্রো করা বলগুলিকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিই। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। কিন্তু একটা পাতা যোগ করলাম। আর সে পাতাটা মাত্র 'শ' খানেক শব্দ সংবলিত।

দুখীনি মায়ের দেশে দুষ্মন্তের প্ররোচনায়, ভরত না হয়ে ভারত ছেড়েছে এটুকু যোগ করলাম। অন্নপূর্ণাদেবীর পুত্রত্ব হারানর দুখদ অধ্যায়টা যোগ করে দিলাম। যদিও নিরুদ্দেশের হারান প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথাটা মনে রেখে, সব সত্যকে লিখলাম না। দেখতে দেখতে চারটে মাস কোথা দিয়ে যে গড়িয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। বছরের শেষ দিনে আমার বই সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেল। প্রথম বইটা হাতে পেয়ে বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা যদি

বইটা দেখতেন তাহলে কতই না খুশী হতেন। প্রকাশক বলল, 'আগামীকাল বছরের প্রথম দিনে বইটার উদ্বোধন করব। উদ্বোধনের পর আপনাকে বাজাতে হবে। শ্রোতাদের মধ্যে সাংবাদিক এবং সঙ্গীতপ্রেমীরা থাকবেন।' রাজী হলাম। চার মাস পরে এই প্রথম সারারাত ভাল ভাবে ঘুমোলাম।

বছরের প্রথম দিনেই প্রকাশকের অফিসে সকালে গিয়ে, কয়েকটা ঠিকানা দিয়ে বললাম, 'বইগুলো রেজিষ্ট্রি করে পাঠিয়ে দেবেন। কেননা আমার বই লেখার ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের বই পাঠান দরকার। উপস্থিত আমি চারটে বই নিয়ে যাব আগামীকাল বম্বে যাবার সময়। আমার বইটি প্রথম উপহার স্বরূপ আমার গুরুকন্যাকে দেব।' প্রকাশক বললেন, 'অমেদাবাদের একটা ছেলে বর্ত্তমানে কানাডায় থাকে। শুনেছি সেই ছেলেটি ভারতবর্ষে এলে অন্নপূর্ণাজীর কাছে শেখে। যদি অন্নপূর্ণাজী সেই ছাত্রটিকে বলেন তাহলে বিদেশে কয়েকটা বই সে বিক্রি করিয়ে দিতে পারবে।' বললাম, 'ঠিক আছে বলব।'

রাত্রে স্থানীয় শ্রোতা এবং সাংবাদিকের সম্মুখে বইটা প্রকাশন হোল, তারপর আমার বাজনা হোল।

পরের দিন বম্বে যাত্রা করলাম। পৌঁছেই প্রথমে যেমন প্রতিবারই অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী যাই, সেইরকম গেলাম। এবারে কিছু নিতে যাই নি, দিতে গেছি। ঘরে ঢুকে বললাম, 'বাবার আদেশ অনুযায়ী বইটি লিখেছি। বাবাকে তো বইটা দিতে পারলাম না। উপস্থিত বাবার প্রতিভূ আপনিই। তাই প্রথম বইটি আপনাকে দিয়ে মনে করব, বাবাকেই দিলাম। অন্নপূর্ণাদেবী বইটা কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন। তারপরে বইটা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। বললাম, 'আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে। এই বইটি কাউকে দেবেন না, কারণ পড়তে দিলে এই বইটি আপনার কাছে ফিরে আসতে নাও পারে।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রকাশকের কথা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমেদাবাদের কোন ছেলে যে বর্ত্তমানে কানাডায় থাকে, এমন কি কেউ আপনার ছাত্র আছে?' উত্তরে বললেন, 'দাদার এককালীন একটা ছাত্র, যে বছরে কয়েকদিনের জন্য আমার কাছে এসে শেখে।' আমার বইএর বিদেশের বাজারে বিক্রি হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে উল্লেখ করলাম। উনি চিঠি লিখে দেবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

রাত্রে পিন্তিজির কাছে গিয়ে একটা বই দিলাম। বইটির সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা করে গেষ্ট হাউসে গেলাম। যাবার আগের দিন সকালে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। বইটির সম্বন্ধে সবে কয়েকটা কথা বলব, এমন সময় কলিংবেল বাজল। দেখলাম, আমার পরিচিত বয়সে প্রধান এবং অন্নপূর্ণদেবীর ছাত্র ঘাসওয়ালা এসেছেন। দরজা খুলে দিতেই, আমাকে দেখে বললেন, 'রাজা সাহেব পিন্তিজির কাছে আজ টেলিফোনে শুনেছি, আপনি বাবার উপর একটা বই লিখেছেন? আপনি নিশ্চয়ই বইএর কপি পেয়েছেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ। প্রথম কপিটাই অন্নপূর্ণাদেবীকেই উপহার স্বরূপ দিয়েছি।' আমার কথা শুনে, আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেলের কোষাধ্যক্ষ ঘাসওয়ালা, অন্নপূর্ণাদেবীকে বললেন, 'মাতাজি আমাকে একবার বইটা দেখতে দিন। আমি পড়ে আপনাকে ফেরৎ দেব।'

গম্ভীরভাবে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'যতীনবাবু আমাকে প্রথম বইটি দিয়েছেন। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকেই দিতেন। সেইজন্য এই বইটি দেখাতেও পারব না এবং বাড়ীতে নিয়ে যেতেও দেব না। বইটি আপনি কিনে নেবেন।' ঘাসওয়ালাকে এরূপ উত্তর দেবেন ভাবতে পারি নি। এই কথা শুনে ঘাসওয়ালার মনে কি প্রতিক্রিয়া হোল জানি না, কিন্তু আমার মন প্রাণ ভরে গেল। ভাবলাম, আমার বই-এর যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। বিদায়কালীন অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'এই বই লিখে অনেকের বিরাগভাজন হবেন।' হেসে বললাম, 'সকলেই নিজের ভালো চায়। আমি ভাল মন্দ বুঝি না। আমার নিজের ভালোর চেয়ে, বাবাকে কথা দেওয়ার দাম অনেক বেশী। অনেকের কাছে বিরাগভাজন হয়ত হবো, তবে তার জন্য আমার কোন ক্ষোভ নাই। এর জন্য আমাকে বহু দুর্যোগের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। আজ বাবা নাই, যেখানেই থাকুন, এইটুকু ভেবেই আমার সুখ যে আমার কথা কিছুটা রেখেছি।' এই কথা বলেই বিদায় নিলাম।

রাত্রে কোলকাতায় রওনা হলাম। কোলকাতা থেকে কয়েকদিন পর কাশী ফিরে এলাম। এরপর নূতন অভিজ্ঞতা শুরু। সাংবাদিকের চাতুর্য সম্বন্ধে বিশেষ একটা ধারণা ছিলো না। সেই ধারণাটা হোল বই লিখবার পর। অনেকেই বইটা পড়েছেন। আমার বইটা প্রকাশিত হয়ে বেরোনোর পর, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের যাঁরা শিক্ষিত সঙ্গীতবিদ, তাঁদের কাছ থেকে প্রশংসা পেলাম। ভারতের বাইরে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড থেকেও বইটার জন্য স্তুতিবাদ পেলাম। আমার বইটার রিভিউ দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকায়, ভারতের বহু জায়গা থেকে বেরোল। বেশীর ভাগ প্রশংসাই ছিলো বাবার তথ্য বহুল জীবনের সার্বিক প্রকাশ ভঙ্গীমার জন্য। আর বিশিষ্ট বোদ্ধারা প্রশংসা করেছিলেন, বাবার সঙ্গীতের অংশগুলিকে। সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলাম, যাঁর উপর লেখা তিনি সাধুবাদ পাচ্ছেন। এই নিস্তরঙ্গ প্রশংসার পুষ্করিণীতে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাবার স্থির প্রতিবিম্বটা দেখছি, তখন আচমকা বিরূপ মন্তব্যের দুটো ঢিল এসে পড়ে, সেই প্রতিবিম্বটাকে শতখণ্ডে ছড়িয়ে দিলো। চমক লাগলো, মালকোষের এই 'রেখাব' এবং 'পঞ্চম' কারা?

ইলাসট্রেডেড উইকলিতে এক ভদ্রলোক মিষ্টার নাডকর্ণি লিখলেন, রচনাটি অন্য জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সোজা বাংলায় চুরি। আমি তো আর গুরু গোবিন্দ নই যে 'পলকে পাঠানের মুণ্ড খসে পড়বে?' কিন্তু ভীষণ বিরক্ত লাগলো এই মূঢ়তা দেখে। আমি নাকি 'সঙ্গীতে' প্রকাশিত মদনলাল ব্যাসের রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। সত্যই আজব দুনিয়া। আমারই সোনা, আমারই অলঙ্কারের পরিকল্পনা আর স্যাকরা বলে তাঁর। এখানে স্যাকরার তো সাহস ছিলো না, তাই সাকরেদ শঙ্করার মুখে মুখর হলেন তিনি।

নজরুলী ভঙ্গিমায় যখন হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার ধমক দিয়ে চিঠি দিলাম, ভীষ্মলোচনের গান থেমে গেল। ভাবলাম লেখকটি কত বড় পামর ছিলো। যে হিন্দিটাও পড়ে দেখেনি ঠিক ম'তো, তাতে লেখা ছিলো, মদনলালের সম্পূর্ণ রচনাটি আমার রচনার হিন্দি অনুবাদমাত্র।

আর একটা কটু অভিজ্ঞতা হোল। আমার ইংরাজী বইতে 'Comments and Criticisms' নামে একটা অধ্যায় লিখেছিলাম। তাতে বাবার সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ

উদ্ধৃত করে দিয়েছিলাম। কয়েকটি সংবাদের মধ্যে একটি 'Northern India Patrika'-র ১৯৭২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বার তারিখে প্রজেশ ব্যানার্জির লেখা। তিনি লিখেছিলেন, "He was, actually speaking, an 'impurist-purist' because his art was not light, cheap, materialistic and Commercialised. He was a musical part excellence and not a showman like Ravishankar and Ali Akbar....... Ustad would not add thumri to dhrupad or gazal to thumri, thus making it impure......., according to him, was to establish an intimate oneness between music and the musician and not musician and the audience." এক অকাল পক্ক সমালোচক, বোধ হয় ইংরেজীতে কাঁচা ছিলো। তাই বিভিন্ন সংবাদপত্রের বাবা সম্পর্কে উদ্ধৃতি, যা আমি বইতে প্রয়োগ করেছিলাম, সেটাকে আমার লেখা ভেবে, বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই-এর মতো আলোচনা করলেন, এ সব কথা না লিখলেই পারতাম।

এই কথার বিরুদ্ধে, ন্যাশানাল সেন্টার ফর দি পারফরমিং আর্টস এর ডায়রেকটারকে চিঠি লিখেতে পারতাম যে, আপনাদের রিভিউয়ার একটা জাড্য যদি না সেই ছোকরাটির নাম, সেন্টারের এক অফিসারের মুখে জানতে পেরে যেতাম, ফেদার ওয়েট-এর বক্সার সাহস করে হেভি ওয়েটকে চ্যালেঞ্জ তো করতে পারে, তা বলে হেভিওয়েট তো হাতে গ্লাভস পরতে পারে না। বহু সাংবাদিক-এর সম্মুখীন হলাম। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন। মনে হোল 'শ' খানেক শব্দের যে পাতাটি লিখেছিলাম, অর্থাৎ অন্নপূর্ণাদেবীর পুত্রত্ব হারানর দুখদ অধ্যায়টা, না লিখলেই বোধ হয় ভালো হ'তো। এই অধ্যায়টি সকলের আকর্ষণ বিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু সাংবাদিক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুভোশঙ্করের আমেরিকা যাবার প্রকৃত কারণটা কি?' আর যাঁদের আমি চিনি না, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সম্ভাবনা ছিলো না, তাঁরাও রিভিউ করবার ফাঁকে প্রশ্নটাকে তুলে ধরলেন।

সাংবাদিকরা সব খবর রাখেন। 'রাগ অনুরাগে' রবিশঙ্কর লিখেছে, 'লাইন চেঞ্জ তো আমাদের পরিবারে হামেশাই হয়েছে। ছবির লোক দাদা নাচিয়ে হয়ে গেলেন। আমি নাচ ছেড়ে বাজনা নিলাম। আর শুভ বাজনা ছেড়ে ছবি আঁকিয়ে হোল। এ যেন একটা পুরো চক্কর মেরে ফিরে এল।' কিন্তু আসল কারণটা আমি না লিখলেও তাঁর ইঙ্গিতটাই মুখর হয়ে উঠল।

সাংবাদিকদের নজর এদিকটায় ঠিক পড়েছে। সেইজন্য আগেই লিখেছি, সাংবাদিকের চাতুর্য সম্বন্ধে বিশেষ একটা ধারণা ছিলো না। সাংবাদিকরা জানতে চাইলেও আমি আসল তথ্য কাউকে বলি নি।

৬৬

দিন শেষে রাত্রি ঘনায়, রাত্রির পর দিন আসে। মাসের পর মাস আসে। দেখতে দেখতে দুটো মাস কোথা দিয়ে যে চলে গেল বুঝতে পারলাম না। তারপর এলাহাবাদ রেডিওতে বাজাতে গিয়েছি। হঠাৎ এলাহাবাদের ঝঙ্কার মিউজিক সারকেলের নলিন মজুমদার আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এলো। দীর্ঘ সাত বছর পর নলিন মজুমদারকে দেখে বললাম, 'আপনি জানলেন কি করে আমি এলাহাবাদে এসেছি?'

নলিন মজুমদার বলল, 'আপনার প্রোগ্রাম আগামীকাল হবে খবরের কাগজে পড়ে জানতে পেরেছি। রেডিওতে খবর নিয়ে জানতে পারলাম, এই হোটেলে উঠেছেন। আপনার ইংরেজী বইটা পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে।'

বললাম, 'যদি ভাল লেগে থাকে তাহলে আমার জীবন সার্থক।' এদিক ওদিক কথা বলার পর নলিন মজুমদার বললো, 'বইটা সত্যই খুব ভালো লিখেছেন, তবে রবুদার ছেলের কথাটা না লিখলেই পারতেন।'

বুঝলাম কেন এতদিন পরে আমার কাছে এসেছে। বললাম, 'যেটুকু লিখেছি, একশো ভাগের এক ভাগ লিখেছি। যে শুভ, তার দাদু এবং এই বংশের নাম রাখতে পারতো, তাকে কত পরিকল্পনা করে তার বাজনাটা বন্ধ করে দেওয়া হোল, সেটা কি জানেন? যে শুভ কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষের সব জায়গায় বাজাবে, ঠিক সেই সময় তার গলা টিপে মেরে ফেলল। এই কথাটা যখন রবিশঙ্কর সকলকে অন্ধকারে রেখে অন্য কারণ 'রাগ অনুরাগে' লিখল, তখন একটু না লিখে পারলাম না। আপনার গুরুজীর সম্বন্ধে লিখেছি বলে আপনার খারাপ লাগতে পরে। কিন্তু যে তিল তিল রক্ত দিয়ে, অন্নপূর্ণাদেবী নিজের ছেলেকে গড়েছিলেন, তার কাছ থেকে কত কায়দা করে ছেলেকে বাজনার লাইন থেকে হঠিয়ে দেওয়া হোল, সে বিষয়ে আপনার গুরুজী কি কিছু বলেছে? বাবা বলতেন, একজনকে শেখাতে গেলে একটা প্রাণ দিতে হয়, তবেই একটা প্রাণের সঞ্চার হয়। অন্নপূর্ণাদেবী নিজের প্রাণ দিয়ে একটা প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু তার বদলে তিনি কি পেলেন? এটা আপনাদের বুঝবার ক্ষমতা নেই। যাক কি লেখা উচিত আর কি লেখা উচিত নয়, সেটা কারও পরামর্শে তো আমি লিখি নি। একটা কথা মনে রাখবেন, নীতি কথায় এবং শাস্ত্রেও আছে, কারো দোষ দেখো না এবং ঘৃণা কোরো না। কিন্তু এ কথাও তো শাস্ত্রে আছে, দোষ দেখাও আবশ্যক। বিনা দোষ দেখে, ভাল ভাবে বিচার না করে, কাউকে ত্যাগ করা উচিত নয়। তাই বহু বিচার করেই যা উচিত মনে করেছি তাই লিখেছি। যাক এ সব কথা। একটা কথার উত্তর দিন তো? সাত বছর আগে এলাহাবাদে আপনার বাড়ীতে যখন বাজিয়েছিলাম, সেই সময় বলেছিলেন, আমি নাকি অনেক টাকা বাজনার জন্য চাই বলে বাজনা রাখতে পারেন নি। সেই সময় বলেছিলাম, আপনার সারকেলের প্রেসিডেন্ট যাঁরা, তাঁরা আমার প্রোগ্রাম রাখতে দেবেন না। সেই সময় জোর করে বলেছিলেন, এ ধরনের কথা কেন বলছি? বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রোগ্রাম খুব ভাল-করে কিষণ এর সঙ্গে রাখবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাত বছর পার হয়ে যাবার পরেও কি আমার বাজনা রাখতে পারলেন?'

আমার কথা শুনে মাথা নীচু করে নলিন মজুমদার বলল, 'আই ডিসারভ।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'যাক এ সব কথা। রাত হয়ে গিয়েছে। আগামীকাল সকালেই রেডিওতে আমাকে লাইভ আইটেম বাজাতে হবে। আমি এখন খেয়ে ঘুমোব।'

নলিন মজুমদার মাথা নীচু করে হোটেল থেকে বিদায় নিল। সেই যে বিদায় নিল তারপর আজ পর্যন্ত আর দেখা হয় নি। বুঝলাম, কার নির্দেশে এসে বইটার ভেতরে শুভর কথা কেন লিখেছি জানতে এসেছিল।

এর কিছুদিন পরেই কাশীর কবিরাজ আশুতোষ ভট্টাচার্য আমাকে বললেন, 'শুনলাম তুমি খুব ভাল বই লিখেছ। আমি তো ইংরেজী বুঝতে পারব না, তাই আমার কাকাকে দিয়ে বইটা পড়িয়ে শুনব।' বললাম, 'ঠিক আছে আপনার কাকাকে দিয়ে বইটা পড়া শেষ হলে, বইটা আমাকে ফেরৎ দেবেন।'

প্রায় এক মাস পরে আশুতোষের কাছে গেলাম। বইটা ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'আমার কাকা বলেছেন, বইটা খুব ভাল হয়েছে। আমারও খুব ভাল লেগেছে। জানো তো রবিশঙ্কর কয়েকদিন হোল কাশীতে এসেছে।' বললাম, 'আপনি তাঁর ছোটবেলার বন্ধু। দুজনেই ক্লাস 'টু' পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছেন। আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, সেইজন্য সে এলেই আপনি জানতে পারেন। এখন তো আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই কাশীতে এলে খবর পাই না। তবে সে এলো না গেলো, তার জন্য আমার মাথা ব্যথা নাই।' আশুতোষ বলল, 'রবিশঙ্করও তোমার বইটার প্রশংসা করেছে, তবে শুভর সম্বন্ধে যা লিখেছো, সেটা না লিখলেই পারতে। রবিশঙ্কর আমাকে এই কথা বলেছে, তা ছাড়া, আমারও সেই কথা মনে হয়েছে।'

বললাম, 'আপনাদের মত, আপনাদের কাছে। আমার মত আমার কাছে। যা ভাল বুঝেছি তাই লিখেছি। কার ভাল লাগল, আর কার ভাল লাগল না, এ কথা ভাবলে বই লেখা যায় না। সত্য কথা এক পয়সা লিখেই অপ্রিয় হয়েছি, তাঁর জন্য আমার দুঃখ নাই। আমি জানি এখন একঘরে হয়ে যাব, তবে একজন মনীষী বলেছেন, বি গুড এনড ইউ উইল বি লোনসাম।' এ প্রবাদটা মনে রেখেই বিষপান করেছি। আমার ভাগ্যকে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সঙ্গীতে এ যাবৎ আমার অনেক প্রোগ্রাম অনেকেই হতে দেয় নি। এখন তো আরও হবে, তবে তার জন্য আমি কিছু ভাবি না।'

ভাবলাম একবার বলি, মধ্যযুগীয় মূর্খরা রাজাকে খুশী করবার জন্য, আর ধর্মান্ধতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকার ফলে, সূর্যকেই পৃথিবীর চারিপাশ ঘোরাত। মনীষী গ্যালিলিও পৃথিবীর ঘূর্ণনকে প্রমাণ করেছিলেন। এই বৈজ্ঞানিককে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। সেই তুলনায় আমি তো কয়েকটা প্রোগ্রাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছি মাত্র। অবাক হয়ে ভাবি, যাঁদের আমি নিজের লোক মনে করে উপকার করবার চেষ্টা করি, তাঁরাই আমাকে পর ভাবে। অথচ আমি স্বার্থ চাই নি, অর্থ চাই নি, শুধু চেয়েছিলাম মিশতে, শুধু চেয়েছিলাম ভালবাসতে কিন্তু সব জায়গা থেকে আঘাত পেয়েছি কেবল। কেন এমন হয় আমার বোধগম্যের বাইরে। যাক যা হবার হবে, ভেবে লাভ নাই। কাশীতে আসবার কিছুদিন পরেই, আমার দাদা হীরেন ভট্টাচার্যের শ্যালক, আমাকে বলল, 'তোর মায়ের মৃত্যুর পর যখন কাশীতে এসেছিলি, সেই সময় রবিশঙ্করের সঙ্গে তোর কি কোনরকম কথা কাটাকাটি হয়েছিলো? অবাক হয়ে বললাম, 'এ কথা কেন বলছিস?' উত্তরে দাদার শ্যালক বলল, 'সেই সময় একই প্লেনে তোর দাদা এবং রবিশঙ্কর দিল্লী যাচ্ছিল। রবিশঙ্কর তোর দাদাকে বলেছে, 'যতীন এমন সব চটুল কথা বলে যে তার মানে নাই। বাবার মত কথা এবং রাগটা পেয়েছে, কিন্তু বাবার বৈষ্ণব বিনয়টা নিতে পারে নি। এই কথা শুনে তোর দাদা আমাকে

টেলিফোন করে কাশীতে বলেছিলো, যে যা পছন্দ করে না, সেই সব কথা বলার কি দরকার?'

এই কথা শুনে আমার মনে হলো ভূতের মুখে রাম নাম। আসলে আমেদাবাদে যাবার আগে সঙ্কটমোচনে বিদায়ের পূর্বে তাঁকে যে ব্যঙ্গ করে বলেছিলাম, 'যান যান, শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে'—সেই কথাটা তাঁর অপ্রিয় লেগেছে। যতই হোক নর্মসহচরীর সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করায় প্রেমিক প্রবরের প্রাণে লেগেছে।

রবিশঙ্করের নিজের সাহস নাই আমাকে কিছু বলার। বলেছে আমার দাদাকে। এই কথা ভেবেই আমার মাথা বিগড়ে গেল। আমি পরের মুখে ঝাল খাই না। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম। এ কথাটা আমার দাদা জানল কি করে? আমার দাদা আমার কাছে ফ্রেণ্ড ফিলজফার এবং গাইড। আমার দাদা কখনও মিথ্যা কথা বলে না তাছাড়া সে সঙ্গীতের লাইনের লোক নয় যে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধাবে। তবুও এর সত্যতা যাচাই করে নিলাম টেলিফোন করে।

এতদিন সব সহ্য করেছি অন্নপূর্ণাদেবীর মুখ চেয়ে। নিজের সব ঘটনা বইতে লিখে, নিজের দোষগুলো বেমালুম চেপে গিয়ে, জনসমক্ষে নিজের কীর্তির কথা লিখেছে। দীর্ঘ বাইশ বছর একটা কথা ভেবেই এতদিন সম্বন্ধ রেখেছিলাম। যদি কোনরকমে আপসে মিল হয়ে যায়। কিন্তু আর না। সব শ্রদ্ধা, ভালবাসা 'গয়া গঙ্গা গদাধর হরি' করলাম। এতদিন অপাত্রে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছি, সেই পাত্র ধুয়ে কাৎ করে রাখলাম। সত্য কথা বলতে কি, রবিশঙ্করকে রবি বলতে রুচিতে বাঁধে, কারণ সংস্কারটা তো ভিন্ন, তাই নামটাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করি, একটা কুসঙ্গের কলঙ্কিত অধ্যায় হিসাবে।

দীর্ঘ বাইশটা বছর, যাঁদের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মন্তব্য শুনেই, প্রতিবাদ করে আমার শুভাকাঙ্খীদের কাছে অপ্রিয় হয়েছি, অথচ তাঁদের কাছে শেষকালে এই পুরস্কার। আমার জীবনে দুজন হিট লিস্ট এ পড়লো। একটা পরগাছা ও অপরটা আগাছা। মৃতকে মারতে অভ্যস্ত নই। খড়ের প্রতিমাকে মেরে কি লাভ? আমি তাঁদের মারি না যাঁদের প্রাণ পাখী শরীরে থাকে না, অন্যের পোষা খাঁচা ভোমরার প্রাণ। এ জাতীয় পরগাছা চামচেদের আঘাত করতে, কি রকম ঘেন্না করে। এঁদের নাম হিট লিস্টে তুললাম না বলে, ব্লাক লিস্টে এঁদের নাম লিখে রাখলাম। আসল কথা এই দুটো লিস্টেই মূল তত্ত্ব হোল, হেট লিস্ট। আর তৃতীয়টা গাছ, কিন্তু নিজের কাণ্ডটাকে এতটা মজবুত করতে পারে নি যে রক্ষা পায়। এ তো ছাগলেও গাছ বেয়ে উঠে মগডালে বসে পাতা খাচ্ছে। ভাবি বা-বা-, মহীরুহুর বীজ জাত এগুলোর কি দুরবস্থা।

ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়। বিষজ্বালা আরো তীব্রতর হয় যদি তা হয়, স্বজনের কাছ থেকে। পুরুষের পাঁচটি পিতা। জন্মদাতা, আচার্যপিতা, শিক্ষাদাতা, পারলৌকিক জ্ঞানদাতা এবং শ্বশ্রু পিতা। এঁর ভেতর শ্বশ্রু পিতা ভিন্ন সহোদর বা সতীর্থ ভ্রাতৃদায়ে ভোগ করতে বাধ্য। যেমন আমি উস্তাদ বাবার শিষ্য, সেই হিসেবে পুত্র। আমি যদি সামান্যও ভুল করি, আলিআকবর তাঁর গঞ্জনা শুনতে বাধ্য। আমি যদি মদিরাসক্ত হয়ে পুঁতি গন্ধময় পরিবেশে পড়ে থাকি, গুরু বা গুরুভ্রাতাদের, এঁর নিন্দা শুনতে হয়। ঠিক সে রকমই

আলিআকবর বা রবিশঙ্কর যদি কেউ এ রকম আচরণ করেন, আমি নৈতিক ভাবে সেই নিন্দা শুনতে বাধ্য। এই বাধ্যকতাটাই বড় জ্বালা। এবং সেটার ভোগ আরম্ভ হোল 'রাগ অনুরাগে'। তখন ওটা বই নয়, তখন ওটা বাস্তব। সুস্থ, রুচিকর, অনুশাসিত আর মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাত্রার প্রতি বীতরাগ, আর বিপরীত ধর্মী জীবনের প্রতি অনুরাগের এই ডাইলেকটিকসে রবিশঙ্কর ভুগছে। এই ভাইরাস হয়ত ওর জন্মসূত্র থেকেই ছিলো। ট্রপিকল পরিবেশে বয়স বাড়ার সাথে সাথে, ওটাও প্রবল ভাবে প্রকট হতে আরম্ভ করেছিলো। চল্লিশ দশকের গোড়ায় প্রকোপটা স্পষ্ট হয়। আর বাড়তে বাড়তে গিয়ে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ভরে গেল তাঁর অঙ্গ। এখানে রোগগ্রস্ত শুধু বাসবদত্তাই নয়, উপগুপ্তও। তাই কে কাকে রক্ষা করে?

এই সর্বাঙ্গের পুতিগন্ধ ক্ষতের মলিন নির্যাসকে, ইউরোপিয় কনফেসন স্টাইলে লেখার প্রচেষ্ঠা হোল। আর এ প্রচেষ্টাটা ছিলো, পুরো পাপকে লোপাট করতে না পারায়, অৰ্দ্ধেক পাপকে পুরো বলে বোঝান। তাতে দুটো লাভ হবে। এরকমই ভেবেছিলো। প্রথমতঃ অর্দ্ধেক পাপকে লোকে পুরো বলে ভাববে, আর সাধু আত্মা তাই স্বীকারোক্তি করায়, সাহস আছে বলে লোকে প্রশংসা করবে। কিন্তু ইংরেজীতে একটা কথা আছে। যদিও এটা পড়াশোনা সাপেক্ষ। সেটা হোল নিজের মলিন বস্ত্র তা অল্পই হোক বা বেশীই হোক, জনসমক্ষে ধুয়ো না। এই আপ্তবাক্যটা আমার সতীর্থ ভুলে গেলেন। আর তাই প্রমাদ ঘটল। যাঁরা প্রকাশক ছিলেন, তাঁরা তো ব্যবসায়িক স্বার্থে চূড়ান্ত লাভ করলেন চটকদার কেচ্ছা ছেপে। কিন্তু ঘটনাটা আসলে দাঁড়াল, অন্ধকে যদি বলা যায় সামনের র‍্যাকেতে ডিবে রাখা আছে, আর তাতে রাখা আছে মুখে মাখার ক্রীম। র‍্যাক ভুল হলে, নিভিয়ার বদলে চেরী ব্লসমে তো হাত চলে যেতে পারে। ঘটনাটাও হোল তাই। ওকে ছেড়েছিলাম বড় শীতল বলে। ওর তুলনায় এ কবোষ্ণ। আর শীতল, কবোষ্ণ দুজনেই হারিয়ে গেল উষ্ণ এলো বলে। আসলে এখানে উষ্ণতাটা, বহুগামীতার জন্য একটা আপেক্ষিক মাত্র।

বহুবার আমার এই সতীর্থের উষ্ণতাটা, উদারবাদী কেচ্ছা অৰ্দ্ধসত্যের মোড়কে মোড়া মিথ্যা কথার বেসাতি সম্পর্কে, লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে। প্রতিবারই এড়িয়ে গিয়েছি। আর মনে মনে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছি যে সকলের সাথে নিদারুণ হলেও, আমার সঙ্গে কোন অনাচার করেন নি। আর সেটা হোল ওই কলঙ্কিত বইতে আমার নামটা লিখে কলঙ্কিত করেন নি। হয়ত তার জন্য আমার দুর্বাসা গোত্রটা কাজ করেছে।

না হলে আমার বিষয়েও লেখা হ'তো, ভালো ছেলে, মিষ্টি বাজায়, আমার অনুগত প্রভৃতি। কিন্তু তা হোল না। ওই ছোটবেলা থেকে ঘাড়ের শিরাগুলো আমার জট পাকানো। ঘাড়টা বেঁকে থাকে। লোকে বলে একগুঁয়ে। না হলে অনুরাগের পালায় পড়তে হ'তো।

নিজের অজান্তে সলিলোকিতে কত কিছুই তো বলেছি। এই মায়া মেঘকে কাটাবার বায়ুঅস্ত্র তো তোমার তূণেতে আছে। এক বাণেতেই সব ফক্কা করে দিতে পারতাম। কিন্তু তখন পারি নি। প্রচলিত হিন্দি ফিল্মে ভিলেন যেমন নায়িকার গলায় ছুরি লাগিয়ে বা মাথায় পিস্তল লাগিয়ে এস্কেপ করতে চায়, এখানেও আমার সতীর্থটি আমার গুরুকন্যাকে করেছিলেন ট্রাম্প কারড। তাই হাত নিশপিশ করলেও, মিলনের সম্ভাবনাকে মনে রেখে,

'রাগ অনুরাগের' তিল কাঞ্চন করি নি। কিন্তু যখন বেহুলা বাংলা, রূপসী বাংলাকে দেখলাম, ভাঙ্গা কুটিরের সারিকে দেখলাম, তখন গুরু কন্যার আশা স্বপ্নের সমাধি হয়েছে বুঝতে পারলাম। না চাইতেও বেরিয়ে এলো আমার কৈফিয়ৎ। বিষজ্বালা সহ্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই যা আসে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। ন্যাকামির অমর কাব্য, সুখী লোকেদেরই সাজে। কিন্তু সুখী লোকেদের সংখ্যা গুণে বলা যায়।

যাঁরা সুখী নয়, তাঁদের প্রশ্নের ঠেলায় কি উত্তর দেব? বছরের দশটা মাস যেখানেই বাজাতে গিয়েছি, সেখানেই আমার বই লেখাটি, সঙ্গীতজ্ঞ বোদ্ধার মধ্যে যে বেশ গুঞ্জন তুলেছে বুঝতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাকামির অমর কাব্যের জবাবদিহি করতে গিয়ে, নিজেকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হোল। সত্য এবং স্পষ্ট কথা বলে বুঝলাম, প্রিয়ভাষী পাপী লোক অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় হিতবাক্যের বক্তা আর শ্রোতা, দুই দুর্লভ। মনে মনে ভাবলাম, কুল রক্ষার জন্য যদি একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উচিত। মৈহার থাকাকালীন সম্পর্কটা ভালো ছিলো, তাই দূরত্বটা ছিলো না। নানা ঘাত প্রতিঘাতের পরেও সম্পর্কটা ছিলো, কিন্তু যে মুহূর্তে মর্যাদা হানির আভাস পেলাম মনটা বিষিয়ে গেল। আমাকে যদি নিজে বলতো, তা হলে হয়তো আমার মেজাজটা খারাপ হ'তো না, কিন্তু যখন শুনলাম দাদার কাছে আমার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছে, সেই দিন থেকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর আর দেখা হয় নি। দেখা হয়নি বললে ভুল হবে, ইচ্ছে করেই দেখার সুযোগ হলেও, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আর আলিআকবর? মৈহারে, বাবার মৃত্যুর প্রায় কয়েক মাস আগে যে দেখা হয়েছিলো, তারপর আর এ যাবৎ দেখা হয় নি। বাবার মৃত্যুর সময়ে পারিবারিক যে ব্যবহার পেয়েছিলাম, সেই কারণেই অভিমানে আলিআকবরের সঙ্গে আর দেখা করি নি। যদিও তাঁর প্রতি আমার কোন অভিযোগ নাই, কিন্তু তখনকি জানতাম দীর্ঘ সতেরো বছর পরে ঠিক সেই আলিআকবরকে দেখব। যাক এ তো অনেক পরের কথা। পরের কথা পরেই বলব। এই ক বছরে কত কি পরিবর্তন হয়ে গেলো, কত উত্থান-পতন হয়ে গেল, তাঁর হিসাব রাখা, কারো পক্ষেই সম্ভব হয় নি। মানুষ সমস্তই ভুলে যায় আস্তে আস্তে। যত দিন যায় পুরোনো স্মৃতি ফিকে হয়ে যায়। নূতন নূতন মুখ, নূতন নূতন স্মৃতির ভিড়ের চাপে, পুরানোরা আস্তে আস্তে বিদায় নেয়। কিন্তু আমি কেন ভুলতে পারি না? আশির গোড়ায় গর্ভ যন্ত্রণা তুঙ্গে। বোধ হয় একদিক থেকে ভালই হয়েছিলো। শুধুই যদি আমার বইএর প্রশংসা দশ মাস ধরে শুনতাম, মতিভ্রম হতো। কিন্তু আমার প্রশংসকেরা, বিশেষ করে বঙ্গভাষীরা তিন লাইনে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই 'রাগ অনুরাগের' ব্যাখ্যায় প্রবেশ করতেন, এবং সব শেষে সরস চটুল আর তির্যক কথা বলে কথা শেষ করতেন। তাহলেও একটা সুবিধা ছিলো। সেটা হোল আমার মাথা গরম। তাই খোঁচালেও ঘাটা খুব গভীর হ'তো না। এ দেশের লোক, সুযোগ পেলে কি আর খোঁচাতে ছাড়ে?

তবুও যাক যাক করে, দিন পার করছিলাম। এরই ফাঁকে চাঁদিফাটা রোদ মাথায় নিয়ে, গরমের ভর দুপুরে, একটা ছোকরা আমার বাড়ীতে হাজির। খুব বেশী মাখামাখি না থাকলেও তাঁকে চিনতাম। একে বয়সের পার্থক্য, তায় পেশাগত ভিন্নতা। সেইজন্য

মাখামাখির সুযোগ ছিলো না। ওর বিষয়ে কোলকাতাতে বয়স্ক সাংবাদিকের কাছ থেকে যদিও আগে শুনেছিলাম ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যাপারে ওটা তক্ষক। ওর প্রশ্নের বিষে ডাইনোসোরাস সাইজের কর্তাব্যক্তিরাও অকালে ঢলে পড়েন। এক কথায় ডেসপারেট।

তাই কাঁচা ঘুম ভাঙ্গানয়, রাগ হওয়া সত্বেও, হাসি হাসি মুখ করে, আসতে বললাম ভেতরে। ছেলেটি ঘরে এসে প্রণাম করে বলল, 'আপনি অনেক বদলে গেছেন।' থতমত খেয়ে প্রশ্ন করলাম 'মানে?' ও বলল, 'ইচ্ছে করেই তো ভরদুপুরে এসেছি, কারণ আমি তো শুনতে চাইছিলাম, আরে ভরদুপুরে কোন শুয়ারকে...।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল। এখানে আসার আগে আপনার এক ছাত্রর কাছে আপনার মেজাজ সম্বন্ধে তিন ঘণ্টার লেসন নিয়েছি। আমার অজান্তেই মেকি হাসির ফাঁক থেকে সত্যিকারের হাসি বেরিয়ে পড়লো। খুব ভাল লাগল ওর দীপ্ত, দৃঢ় সরলতা দেখে।

ভূমিকা না করে বলল, 'রবিশঙ্করের রাগ অনুরাগের উপর আপনার ইন্টারভিউ নেবো। কোলকাতার এক প্রথম শ্রেণীর ম্যাগাজিনের জন্য। যদি ঝেড়ে কাসেন, তবেই কলম খুলব। অন্যথায় শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আপনার ধাতে সয় কি না জানি না, আমার ধাতে একদম সয় না।' সত্যি বলতে কি এরকম উদ্ধত মূষলের সম্মুখীন, এর আগে হই নি।

শাঁখের আওয়াজ শুনে ছোকরা চমকাল। বললো, 'চারঘণ্টা আপনার মুড়িঘণ্ট করলাম। ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে। কিছু খাওয়ান এবং আপনার বাজনাও শুনব।' সত্যি বলতে, এই চারঘণ্টার মধ্যে একত্রিশ বছরের পাথরটাকে আমি নামিয়ে ফেলেছি। ভীষণ হাল্কা বোধ করছিলাম। ওকে জলখাবার খাইয়ে বাজনা শুনিয়ে বিদায় করলাম। যাবার সময় বললাম, 'ভায়া কি ছাপবে একবার দেখিয়ে ছেপো।' প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলো।

আমার বাড়ীর সদস্যরা, সাধারণতঃ আমার ব্যাপারে কৌতুহলী হলেও, আমার কথায় আড়ি পাতে না। কিন্তু সে দিন ব্যতিক্রম হোল। গলার বার বার সপ্তক পরিবর্তন বোধ হয় ওঁদের এই কাজ করতে বাধ্য করেছিলো। তাই রাত্রে খাবার পাতে ভোজের স্রোতে এই অনুরোধ পরিবেশিত হোল, এতটা না বললেও পারতাম। এখনও হয়ত একাদশীর সলতেটো জ্বলতে পারে। কিন্তু এটা ছাপলে অচিরাৎ নিভে যাবে।

রাত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। যদি ভাল হবার সম্ভাবনা না থাকে তবে আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হই। আমার তো সব সময়েই কামনা, বাবার মেয়ে, জামাই, ছেলে বৌ সুখে থাক। কিন্তু রবিশঙ্কর দগ্ধ কাষ্ঠ সেবন করছে। অঙ্গার ছাড়া আর কি ত্যাগ করবে? অনেক চিন্তার তোলপাড়ের ফাঁকে কয়েকটা রাত আর দিন পার হয়ে গেল।

বয়সে ছোকরা হলেও ছেলেটা ভদ্রলোকের মত আচরণ করল। ওরিজিনল কপিটা হাতে নিয়েই ফেরৎ এলো। প্রায় হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম। তার পরে জীবনে যা করি নি তাই করলাম। ওকে বললাম, 'আমি এই ইন্টারভিউটা ফেরত দেব না। আমি চাই না এটা ছাপুক। অনর্থ হয়ে যাবে এর বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে গেলে।' ছেলেটি আমার এই রূঢ় আচরণে ক্ষুব্ধ হোল, বিরক্ত হোল আর যাবার সময় বলে গেলো, 'দয়া করে কপিটাকে ছিঁড়ে ফেলবেন না। হয়ত একটা দিন আসতে পারে যখন এর প্রকাশের

প্রয়োজনীয়তা আপনি নিজেই খুঁজে পাবেন। আমার নামে ছাপুক বা না ছাপুক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। শুধু ছাপলেই আমি খুশী হবো।' ওকে কথা দিলাম 'তাই হবে।' আর মনে মনে কামনা করলাম, ঈশ্বর সে দুর্দিন যেন না আসে আমার জীবনে। কিন্তু ভাগ্য লেখা, কে খণ্ডায়?

দেখতে দেখতে আটটা মাস কোথা দিয়ে যে চলে গেল বুঝতে পারলাম না। আটটা মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানেই বাজিয়েছি। আমার বইতে যে দুটী জিনিষ স্পষ্ট লিখিনি সেই বিষয়ে সকলেরই কৌতুহল দেখেছি। সংবাদপত্রে আমার বইএর সমালোচনা চোখে পড়েছে।

এবারে আমার আমেদাবাদে এবং বম্বেতে অনেক প্রোগ্রাম ঠিক হয়েছে। আমেদাবাদে বাজাবার পরই, রেডিওর প্রডিউসার অফ মিউজিক আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'আগামীকাল আপনার কি কোন কার্যক্রম আছে?' বললাম, 'না'। 'তবে এক সপ্তাহ পরে বম্বে যাব।' আমার কথা শুনে বললেন, 'আপনার ইংরেজী বইটি পড়েছি। বইটা পড়বার পরই স্থির করেছিলাম উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব সম্বন্ধে চারজনের ইন্টারভিউ নেব রেডিওতে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কার ইন্টারভিউ নেবেন, এবং বিষয় কি হবে?' বললেন, 'অন্নপূর্ণাদেবী, আলিআকবর খাঁ, রবিশঙ্কর এবং আপনার ইন্টারভিউ নেব। চারজনের ইন্টারভিউ নিয়ে সম্পূর্ণ এক ঘণ্টার রেকর্ডিং করে দিল্লিতে পাঠাব। আপনার বইটা পড়ে কয়েকটা প্রশ্ন মনে দাগ কেটেছে, সেইজন্য ইন্টারভিউ নেব। আগামীকাল আপনার বাজনার রেকর্ডিং করব এবং কুড়িমিনিটের ইন্টারভিউ নেব।' মনে মনে ভাবলাম, ইন্টারভিউতে কি প্রশ্ন করবেন? যে কথা আমি বলতে চাই না, সেই সব বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তো বিপদ। তাই বললাম, 'দেখুন বাবার সম্বন্ধে কোনকথা জিজ্ঞাসা করলে সেই বিষয়ে বলতে আপত্তি নাই, কিন্তু তার বাইরে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনার পরিকল্পনা তো ভাল, কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবী ইন্টারভিউ দেবেন না।' আমার কথা শুনে বললেন, 'অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গিয়ে সাক্ষাৎকার নেব।' বললাম, 'বাড়ীতে গেলে তিনি কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। তবে আলিআকবর এবং রবিশঙ্করের সাক্ষাৎকার নিতে পারেন।' প্রডিউসার অফ মিউজিক নিরাশ হলেন অন্নপূর্ণাদেবীর কথা শুনে। বললেন, 'ঠিক আছে, আলি আকবর এবং রবিশঙ্কর পাঁচ ছয় মাস পরে আমেদাবাদে বাজাতে আসবেন। সেই সময় তাঁদের সাক্ষাৎকার নেব। উপস্থিত আপনি যখন এসেছেন, আগামীকাল রেডিওর তরফ থেকে গাড়ী আপনার বাড়ী যাবে। আপনার বাজনার রেকর্ডিং এবং সাক্ষাৎকার নেবো।'

পরের দিন বাজনা এবং সাক্ষাৎকার হোল। বাবা কি ভাবে শেখাতেন। বাবার রচিত রাগ ইত্যাদি এই সব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করায়, সব প্রশ্নের জবাব দিলাম। আমার ইংরেজী বইএর প্রকাশক, গুজরাটি ভাষায় বইএর রিভিউ পড়ে শোনালেন। রিভিউটি গুজরাটি ভাষায় ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। জানতে পারতাম বইটি বিদেশেও কয়েক জায়গায় গিয়েছে। এবারে প্রমথেশ সেনের সঙ্গে দেখা হোল না। বাড়ী গিয়ে জানলাম কোলকাতায় গেছেন। এক সপ্তাহ ঘরোয়া কয়েক জায়গায় বাজিয়ে বম্বে গেলাম।

প্রতিবারের মত এবারেও বম্বে গিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কবে বাজনা আছে?' বললাম, 'দুদিন পরে হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে বাজনা আছে। এ ছাড়া চারটে মিউজিক সারকেলেও প্রোগ্রাম আছে। এবারে বম্বেতে একমাসের বেশী থাকব। এবারে কম করেও চারদিন শিখব।' বললেন, 'আপনি আসবেন তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শেখাতে?' কথার ফাঁকে কলিং বেল বাজল। অন্নপূর্ণাদেবী আইহোল দিয়ে দেখে দরজা খুলে দিলেন। দূর থেকে দেখলাম একজন অসুস্থ লোক আসছে। কাছে আসতে মুখটা চেনা চেনা মনে হোল। আমাকে নমস্কার করতেই, মনে পড়লো লোকটিকে একসময় তানপুরা ছাড়তে দেখেছি। কিন্তু অকালে কেন বার্দ্ধক্য এসে গিয়েছে। লোকটি মাতাজি বলে অন্নপূর্ণাদেবীকে প্রণাম করলো। লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার শরীর এরকম হয়েছে কেন?' জবাবে লোকটি বলল, 'আগে জামা, পায়জামা সেলাই করে কোনরকমে নিজের চলে যেতো। উপস্থিত কিছুদিন শরীর খারাপ হওয়ায় কাজ করতে পারছি না।' এই কয়েকটি কথা বলেই লোকটিকে হাঁপাতে দেখলাম।

অন্নপূর্ণাদেবী খাবার দিয়ে বললেন, 'খেয়ে নিন। ভদ্রলোক ভাত, ডাল, মাংস ধীরে ধীরে খেতে লাগল। খাওয়া দেখে মনে মনে ভাবলাম, রোজই কি বেশী খাবার তৈরী থাকে। নিজে তো একবেলা কেবল খান। বাবার ভাষায় বলতে গেলে, ডাল ভাত আড়াই হাত। দীর্ঘদিন নিজে নিরামিষ খান। আমি আগাম জানিয়ে এসেছি বলে, হয়ত আমার জন্য মাংস করেছেন। কিন্তু লোকটির খাবার পরিমাণ দেখে অবাক হলাম। এত খাবার কি মানুষ খেতে পারে। অসুস্থ শরীরের এত খাবার খাওয়া দেখে মনে হোল, আমার জন্য বোধহয় আর কিছু থাকবে না।

ভদ্রলোক খাবার খেয়ে দূরে চেয়ারে গিয়ে বসল। অন্নপূর্ণাদেবী নিজের ঘর থেকে এসে, ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে কিছু বললেন এবং কিছু দিলেন। দূর থেকে ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছিলাম। যে হেতু অন্নপূর্ণাদেবী পেছন ফিরে ছিলেন, সেই হেতু পরে একটা কথাই কানে গেল। বললেন, 'ভালভাবে ওষুধ করবেন। পরে আবার আসবেন।'

আমাকে নমস্কার করে লোকটি যখন চলে যাচ্ছে, বললাম, 'আপনার শরীরের যখন এই অবস্থা, তখন আপনার গুরুজীর সঙ্গে দেখা করে বলেন না কেন?' উত্তরে লোকটি বলল, 'দীর্ঘদিন ধরে ভুগছি। গুরুজীর সঙ্গে তানপুরা বাজাতে পারি না বলে দেখা হয় না।' লোকটিকে দেখে দুঃখ হোল। বললাম, 'আপনার গুরুজী বম্বে এলে দেখা করবেন। দেখা করলে নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।' লোকটি করুণ মুখ করে কিছু না বলে, ধীরে ধীরে চলে গেল।

লোকটি যাবার পরই বললাম, 'মৈহারে আপনার থাকাকালীন দেখেছি, এবং আজও দেখলাম। অবাক হয়ে ভাবি, আপনার দান খাতা এখনও খোলা আছে।' আমার কথা শুনে বললেন, 'তার মানে?' বললাম, 'আপনি যে টাকা দিলেন, সেটা কি আমি বুঝতে পারি নি? আশ্চর্য লাগে, যে সময় টাকার দরকার, সেইসময় এঁরা আসে। অন্য সময় তো এঁরা আপনি কেমন আছেন, ভুলেও কখনও আসে না। মৈহারে কত গরীব লোকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, অসুখে ভুগছে, সেই সব লোককে কখনও খালি হাতে যেতে দেখি নি। যদিও আপনি গোপনে

দেন, কিন্তু বই লিখবার সময় মৈহারে বহু লোকের কাছে শুনেছি, আপনি সকলের কাছে বিপদতারিনী মা। যাঁরা গরীব, তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা খারাপ নয়, কিন্তু যাঁরা সুবিধাবাদী, তাঁদের সাহায্য করা অপরাধ। অবাক হয়ে যাই আপনার এই উপকার করা দেখে। চিরকালই দেখেছি পাত্র পাত্রীদের না জেনে, না বুঝে, বরাবর সকলের উপকার করেন। তার বদলে কত বড় শাস্তি পেয়েছেন, সে কথা ভুলে যান কি করে? সকলের ভালো করার দায়িত্ব কি কেবল আপনার একার। আজকের যুগে যাঁরা পরের উপকার করে, উপকৃতেরা পরে তাঁদেরই সর্বনাশ করে। মৈহার ছাড়ার পর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই তো হোল বর্তমান যুগ।'

উত্তরে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'যতদিন আছে দিয়ে যাই। কি করব? অভাবী লোক দেখলে, না দিয়ে থাকতে পারি না। যতদিন পারি দেব, আর যেদিন থাকবে না, সে দিন তো আর দিতে পারব না। আপনি কি বাবার কথা ভুলে গিয়েছেন? বাবা বলতেন, 'দেওয়াটাই প্রেম আর নেওয়াটাই হচ্ছে স্বার্থপরতা। স্বার্থপর মানুষ, মানুষ নয়, তাঁরা হোল পশু। পশুরা কেবল নিতেই জানে, দিতে জানে না। আসলে কি জানেন, বিশ্বাস করে ঠকলেও নিজের মধ্যে সান্ত্বনা থাকে। অবাক হয়ে ভাবি যাঁরা মিথ্যার আশ্রয়ে প্রথমে সফলতা পায়, পরে তাঁরা সাজা পায়। যাঁরা নিজের মতলবে পরের কাছে কাজ নেয়, সেই পর যখন অপারগ হয়ে যায়, তাঁদের যাঁরা ভুলে যায়, তাঁরাও সাজা পায়। যে লোক সর্বদা মতলববাজদের মেসাহেবি করেছে, তাঁর পরিণাম দেখে দুঃখ হয়।' মনে মনে বলি, সব জেনে শুনেও অন্নপূর্ণাদেবী কাউকে নিরাশ করেন না। প্রায়ই দেখা যায় নামের সঙ্গে কর্মের কোন সম্পর্ক নাই। মুখে বুলি উঠবার আগেই, নাম ঠিক করে ফেলা হয়। তারপরেই সময়ের টানে মানুষ বড় হয়, আর বদলাতে থাকে। নামের সঙ্গে কাজের অমিল বেশী দেখা যায়। কিন্তু অন্নপূর্ণা নামকরণটা, মৈহারের মহারাজের দেওয়াটাকে দৈব বলা যেতে পারে। নামের সঙ্গে কর্মের মিল এমন সচরাচর দেখা যায় না।

পুরোনো দিনের স্মৃতি জ্বলজ্বল করে মনে ভাসে। মনে পড়ল মৈহারের একটা ঘটনার কথা। শীতকালে একজনের দেহে গরম জামা কিছু না থাকায়, বাবা নিজের কোট এবং একটা শাল দিয়েছিলেন। লোকটা বাবার কাছে কোট এবং শাল নিয়ে বলেছিলো, 'এ আপনার মহানুভবতা।' বাবা বলেছিলেন, 'মহানুভবতা নয়। এ হোল মানবতা। আমি দেবার কে? যাঁর জিনিষ সেই দিচ্ছে, আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।'

কয়েক সেকেণ্ড অন্যমনস্ক হয়ে মনটা সুদূর মৈহারে পৌঁছে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই মনে হোল, এ কথা কেন বললেন, 'যতদিন পারি দেব। আর যে দিন থাকবে না, সে দিন তো আর দিতে পারব না।' কথাটা কি রকম যেন বেসুরো মনে হোল। কেন মনে হোল জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, একটা কথা বলুন তো? মাসের প্রথম দিন নিয়মিত তিনহাজার টাকা পেতে আগের মত বেগ পেতে হয় না তো?'

উত্তরে যা বললেন, শুনে অবাক হলাম। বললেন, 'যে হেতু ওনার আর্থিক টানাটানি, তাই দীর্ঘদিন ধরে দুই হাজার করেই দিচ্ছেন।' মনে পড়ল পুরোনো আট বছর আগের কথা। লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গের চিঠি পেয়ে, রবিশঙ্করকে যখন দুই হাজার থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার

দিতে বলেছিলাম, রাজী হয়েছিলো। সেই সময় বম্বে এসে শুনেছিলাম নিয়মিত মাসের প্রথম দিনেই তিনি হাজার টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন টাকার অঙ্ক আবার কমে গেছে, অথচ আমাকে এ কথা বলেন নি। মনে মনে ভাবি আর্থিক অনটন?

কাশীতে রবিশঙ্কর এলেই তাঁর নর্মসহচরী, আমার ছাত্রের সাড়ীর দোকান থেকে কম করেও দুই হাজার টাকার সাড়ী কেনে। এ কথা আমার ছাত্রের মুখেই বরাবর শুনে আসছি দীর্ঘ দশ বছর হোল। বুঝলাম, টাকার ব্যাপারে কষ্ট হলেও অন্নপূর্ণাদেবী কখনই কিছু বলবেন না, তাই রবিশঙ্কর সুযোগটা নিয়েছে। পুরোনো দিনের সব কথা ছায়াছবির মত চোখের উপর ভেসে উঠল। দীর্ঘ আট বছর আগে, মায়ের হাত ধরে রবিশঙ্কর আশ্বাস দিয়েছিলো, তাঁর মেয়ের কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু এটা কি হচ্ছে?

বললাম, 'রবিশঙ্কর আপনাকে বলল তাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ, আর আপনি সে কথা বিশ্বাস করলেন?' উত্তরে বললেন, 'আপনি তো জানেন টাকার ব্যাপারে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি। যদি টাকা থাকত, তাহলে ওনাকে এ কষ্টটাও দিতাম না। যাঁরা কথা দিয়ে ভুলে যায়, তাঁদের দ্বিতীয়বার মনে করাতে চাই না। সেটা আমার দুর্ভাগ্য পাওনা বলেই মনকে সান্ত্বনা দিই।'

এ কথা শুনে মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠল। বললাম, 'দুর্ভাগ্য আপনার নয়। দুর্ভাগ্য রবিশঙ্করের। কষ্ট আপনি রবিশঙ্করকে না দিতে পারেন, কিন্তু আমি এবারে রবিশঙ্করকে একটু কষ্ট দেব। এতদিন আপনার মুখ চেয়ে সব সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। উপস্থিত রবিশঙ্কর বিদেশে আছে। কাশীতে এলেই এমন ব্যবস্থা করব, যাতে সে আপনাকে প্রতি মাসে পাঁচহাজার টাকা খরচার জন্য দিতে বাধ্য হয়।'

ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কি ব্যবস্থা করবেন, যার জন্য এত টাকা দেবেন?' বললাম, 'উকিলের নোটিস দেব। তাহলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার বাড়ী তো একটা হোটেল। ছাত্ররা আসে, তাঁদেরও কিছু খাওয়াবেন। এ ছাড়া শতখানেক পায়রা দুপুরবেলায় রোজ উড়ে আসবে। তাদের জন্য গম খাওয়াবেন। এ ছাড়া কত বলব?'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'না না। এ সব আপনি কিছু করবেন না। আমি কোর্ট কাছারিতে ভয় পাই। তা ছাড়া বাবার সম্মানের কথা ভেবে এতদিন আমি সহ্য করে গেছি, কিন্তু পণ্ডিতজী যখন জনসমক্ষে নিজের কথা চাউর করে লিখেছেন, তখন আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নাই। যেমন করে হোক কেটে যাবে।'

বুঝলাম 'রাগ অনুরাগ' পড়েছেন। কিন্তু আমি সে দিক দিয়ে গেলাম না। বললাম 'বাবার ছেলে হয়ে আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে। আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না। যা করবার আমি কাশীতে গিয়ে করব। কাশীতে রবিশঙ্কর এলেই এবারে একটা ফয়সালা করব। ভাববেন না যে আমি এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যাব। যা করবার উকিলকে দিয়েই করাব। আমার উপর আস্থা রাখুন। এমন কাজ আমি করব না, যাতে লোকেদের কাছে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে একটা কথা মনে রাখবেন। রবিশঙ্কর বম্বে এসেও আপনার সঙ্গে দেখা করে না কিংবা এলেও তাঁর কোন প্রমাণ নাই। কেন সে আসে না তা বুঝবার ক্ষমতা

আপনার নাই। আর সে কথা বলা আপনাকে বৃথা।' এক নাগাড়ে অনেক কথা বলার পর অন্নপূর্ণাদেবী সেই পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'দেখুন কোর্ট কাছারি আমি করব না যাতে একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়ায় এবং বাবার সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'এটা আপনি ভাবলেন কি করে, যে এমন কাজ আমি করব যার ফলে বাবার বা আপনার সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়? আসলে সত্যি কথা বলার সৎসাহস চাই। তবে বিশ্বাস? আমার কথায় কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?' উত্তরে বললেন, 'বিশ্বাস কোন বস্তুর নাম? বিশ্বাস বলে কি এ জগতে কিছু আছে? আমার জীবনে বিশ্বাস কথাটা মুছে গেছে।' বললাম, 'আপনার মন থেকে ঐ ভুল ধারণা আমি মুছে দেব। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, সততার কাছে পাপ মাথা নত করবেই। এ আমার স্থির বিশ্বাস। ভ্রমেই লোকের সর্বনাশ হয়। ভ্রমেই লোক মহাবিপদগ্রস্ত হয়। ভ্রমে পড়েই লোকে কষ্ট ভোগ করে, প্রাণও হারায়। কিন্তু আপনার মনে ভ্রম আসে কেন? যে নিজের মনে খাঁটি তাঁর ভ্রম হওয়া উচিত নয়। পবিত্র হৃদয়ে, পবিত্র মুখে প্রভুর স্মরণ করলে আপনার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।' আমার কথা শুনে বললেন, 'এ সব ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ভাল লাগে না।' হেসে বললাম, 'বেঁচে থাকতে গেলে ঝামেলা তো ভোগ করতেই হবে। সমুদ্রে ঢেউ থাকবে না তা কি কখনও হয়, না হয়েছে? জীবন মানেই তো ঝামেলা।'

যুক্তি দিয়ে অনেকক্ষণ বোঝাবার পর বললেন, 'আপনি বড় জিদ্দি। ঠিক আছে উকিলের জন্য যা খরচা লাগবে তা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন।' বললাম, 'এই কাজের জন্য কিছুই খরচা হবে না। যেটুকু হবে সেটুকু দেবার মত ক্ষমতা আমার আছে। আপনি চুপ করে থাকুন। এ বিষয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না।' এরপর আর কিছু বললেন না।

সাইকোলজিতে বলে, হিট অফ দি মোমেন্টে কখনও কোনও ফাইনাল ডিসিশান নিতে নাই। তাই কয়েকদিন বেশ চিন্তা করে কি করব মনে মনে ঠিক করলাম। বাবা বলতেন, 'সকলেই নিজেকে বলবান মনে করে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যায় যে বলবান অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়।' শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করেছি, কিন্তু আর নয়। তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নাই। আমার একটা বদ অভ্যাস আছে। আমাকে প্রেসার দিয়ে কোন অন্যায় কাজ যদি কেউ করাতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় আগুন জ্বলে, যার ফলে যে আমাকে প্রেসার দেয়, আমি তাঁর ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে দিই। যাক এখন কি করব ভেবে দেখা যাবে। বম্বেতে এখন দুটো প্রোগ্রাম করে কাশীতে যাব। পিত্তিজির বাড়ীতে রোজ রাত্রে বাজাই। যে দিন প্রোগ্রাম থাকে সে দিন যাই না। এর মধ্যে একদিন অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গিয়েছি। যাবার কিছু পরেই কলিংবেল বাজতেই, আইহোল দেখে দরজা খুলে দিলেন। একটা ভদ্রলোক এলো। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সেই আমার কানাডার ছাত্র। রুশী কুমার পাণ্ডা, কানাডায় অধ্যাপনা করে। বিপত্নীক। সুদীর্ঘ দিন ধরে প্রবাসে রয়েছে। বছরে মাস খানেকের জন্য দেশে আসে। পনেরো দিন থাকে আত্মীয় স্বজনদের কাছে, আর পনের দিন সঙ্গীত শিক্ষা করে আমার কাছে।' মনে মনে ভাবলাম, বউ, বাচ্চা নাই, পিছুটান নাই। পড়াশোনা আর সেতার। জীবনের একটা যথার্থ অবলম্বন। ভালো লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম,

'জুটল কি করে?' বললেন, 'দাদার কাছে শিখতো বিদেশে।। তাঁরই অনুরোধে আর পরিচয় পত্রের সৌজন্যে শেখাতে হচ্ছে।' আমার পরিচয় জানা মাত্র সে ছাত্রটি নিজের থেকেই বললো, 'আপনার বই পড়েছি। অন্নপূর্ণাজীর কথায় পঁচিশটি বই আমেদাবাদে আমার বাড়ীতে বলে দিয়েছিলাম কিনে নিতে। যেহেতু আপনার পাবলিশারের এক্সপোর্ট করবার লাইসেন্স নাই, সেইজন্য এবারে নিজের সঙ্গে বইগুলো নিয়ে যাবো।' ওকে দেখে খুব ভাল লাগলো। সুদীর্ঘ দিন বিদেশে শিক্ষকতা করছে কিন্তু বোঝাই যায় না। বিদেশের ছোঁয়া লাগে নি। কিছুক্ষণ কথা বলার পর, পরের দিন শিখবার সময় জেনে নিয়ে চলে গেল।

ভেবেছিলাম এইবার বেশ কয়েকদিন শিখব। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর মানসিক অশান্তির কথা ভেবে কেবল একদিনই শিক্ষা করে এবারে আমার কাশী যাওয়ার পালা। কাশীতে আসবার দিন সেই এক কথা বারবার বলতে লাগলেন। বললেন, 'যা করবার ঠাণ্ডা মাথায় করবেন। আমার কথাগুলো মনে রাখবেন। কোন মতেই আমি কিন্তু কোর্টে যাব না।' কথাগুলো শুনে বাবার কথা মনে পড়ে গেল। বাবারই তো মেয়ে। বাবাও কোর্ট কাছারির নাম শুনলেই ভয় পেতেন।

কাশীতে আসার পরই খবর পেলাম যে রবিশঙ্কর নভেম্বারের প্রথম সপ্তাহেই কাশীতে আসছে। ভালই হোল। বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আমার পরিচিত উকিলের বাড়ী গিয়ে সব কথা বললাম। সব কথা শুনে উকিল বললেন, 'রবিশঙ্কর যে সময় কাশীতে আসবে সেই সময় তাঁকে একটা নোটিস পাঠাব। কোন চিন্তা করবেন না।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। সব কথা জানিয়ে বম্বেতে চিঠি দিলাম। অন্নপূর্ণাদেবীর একসঙ্গে বিভিন্ন তারিখে লেখা, দুইটি চিঠি একদিনেই পেলাম। দুইটি পত্র হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

5th nov. 1980

যতিন বাবু,

সর্ব্বপ্রথমে আপনারা আমার বিজয়ার স্নেহ আশির্ব্বাদ নেবেন। আপনাকে আমি বারণ করেছিলুম যে কোর্ট এই সব গোলমালে আমি যেতে চাই না। আমার তরফ থেকে কোনো রকমের অশান্তি উনাকে আমি দিতে চাই না। জাই হোক এখন আপনি উকিলকে বারণ করে দেবেন, কোনো চিঠি জেন আর উনার কাছে জেন না লেখেন। আর আমাকে না জানিয়ে আপনি কিছু করবেন না। এটা আগেও আমি আপনাকে বলেছিলাম, এখন আপনাকে আবার অনুরোধ করছি দয়া করে ভুল বুঝবেন না, রাগ করবেন না। আর উকিল যে উনার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে তার কপি আমার কাছে উকিলকে বলবেন পাঠাতে। আমি এই অশান্তি চাই না, এই সব বেকার অশান্তিতে আমার শরীর খারাপ হয়ে জাবে। আমাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চান তো এই সব ঝগড়া টগরার মধ্যে আমাকে টানবেন না।

আশা করি আমার কথা আপনি বুঝতে পেরেছেন—আমার স্নেহ ও আশির্ব্বাদ নেবেন।

ইতি—
বৌদি

৭/১৯৮০

যতিনবাবু,

এই মাত্র আপনার চিঠি পেলাম। জানিনা এই চিঠি আপনি পাবেন কিনা? আপনি আমাকে জানান নি যে আমাকে কোর্টে যেতে হবে কিনা? আমি কোর্টে জাবো না এবং কেস করতে চাই না। প্রথমত বাবার নাম আগে আসছে, উনার মেয়ে হয়ে আমার গিয়ে গারদে দাঁড়ানো উচিৎ হবে না। দ্বিতীয় টাকা নেই, কি দিয়ে লড়াই করবো। আপনি আগে আমাকে সব দয়া করে জানান, মাথা না গরম করে, বুঝলেন? তা না হলে কিন্তু সই করবো না। ঝোকের মাথায় এই সব কাজ না করাই ভালো। আমি বলছি কি আপনি আগে উকিলকে নিজে গিয়ে উনার সঙ্গে কথা বলতে বলুন, পণ্ডিতজির সঙ্গে জেন উনি বলেন যে উনি আমার এড্ভাইসর এবং আমার উকিল। আমাকে টাকার জন্য ভীষণ কষ্ট পেতে হচ্ছে, উনি এর একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা জেন করেন। আমাকে জেন বার বার সোলিবাট্লিবালার কাছে লোক না পাঠাতে হয়। অবস্য মাসের খরচের দুই হাজার, কিছু বৎসর থেকে ঠিক মত পাচ্ছি। বাট্লিবালা এসে নিজে দিয়ে জান। কিন্তু সোসাইটির টাকাও ঠিকভাবে চলছিলো। এখন বাট্লিবালা বলছেন যে সোসাইটি নিজের ইচ্ছে মত টাকা বাড়ায় সেইজন্য টাকা ছয় মাস থেকে দিচ্ছে না, প্রায় সাত হাজারের মত সোসাইটির টাকা ধার হয়ে গেছে, যেটা বাট্লিবালা দেয় নি। এখন খোজ করে টাকা কেন পাঠিয়েছে জানতে পেরেছি, শুভোর ফ্লেটের জায়গা ছোট সেই জন্য যাঁরা এখানে থাকে তাঁরা সোসাইটির টাকা কামিয়েছে, আমার জায়গা বড় সেই জন্য আমার টাকা বেড়ে গেছে। আমাকে এখন বেসি টাকা দিতে হবে। শাতশো তিরিস টাকা প্রতি মাসে সোসাইটিকে দিতে হবে। এখন বাট্লিবালা বলেছে যে ও বলে সোসাইটিকে টাকা দিতো না কোনোদিন, আমি ঐ যে দুই হাজার টাকা আমাকে দিতো তাঁর থেকেই বলে আমি নিজে সোসাইটিকে টাকা দিতাম। দুই হাজার থেকে সাতশো টাকা দিলে আমি খরচ চালাবো কি করে? মুদিকে আমার হাজার টাকার মত মাসে দিতে হয়। আমি টাকা বাড়াতে বলছি না। যতোদিন যা দিচ্ছিলেন তাতো দেওয়া উচিৎ, আমার হাতে সময় মতো সব টাকা আসা উচিৎ। আর এই সব উল্টো পাল্টা কথায় কি মানে হয়? আরেকটা কথা আমাকে প্রতি বৎশরে এক হাজার আলাদা দিতেন ফোন এবং ইলেকট্রিক এই সবের জন্য। বাকি কোনোদিন আমি আলাদা বেশি টাকা ওদের কাছ থেকে নিই নি। এখন আমি চাই, সোসাইটির টাকা যেন আমার খরচের টাকার সঙ্গে আমার হাতেই জেন দেওয়া হয়। আমি নিজে সোসাইটির টাকা দেবো। প্রতি মাসে আমার নিজের লোক গিয়ে সোসাইটিকে টাকা দিয়ে আসবে। আমি কোনোদিনও সোসাইটির টাকা দিই নি। প্রথমে উকিল দিতো, পরে বাট্লিবালা দিতো। আপনি ওইভাবে উকিলের সঙ্গে একটু কথা বলুন। উনি এইসবের জন্য যা চাইবেন তা দেবো। কিন্তু ঝগড়া না করে মাথা ঠাণ্ডা করে পণ্ডিতজির সঙ্গে জেন উনি নিজে গিয়ে কথা বলেন, অন্যকারুর সঙ্গে কথা বলতে বারন করবেন। উকিলের চিঠি পাঠালে উনি অপমানিত বোধ করবেন। দয়া করে আপনিও আমার কথা শুনুন, আমার দেখুন নিজের কেউ নেই, আপনি তবুও বাবার কথা ভেবে আমার কষ্টের কথা

ভাবেন। আর কেউ ভাবে না, আমি মরে গেলে সবাই খুব খুশী হবে। ভগবান আপনার জেন মঙ্গল করেন, আপনি জেন নিজের সংসারে সুখী হোন এই প্রার্থনা করি। আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, হাইপ্রেসারে ভুগছি। একমাস ধরে প্রেসার কমাবার ঔষুধ খাচ্ছি এখনো নর্মাল হয়নি। রোজ ডাক্তার এসে প্রেসার দেখে যাচ্ছে। রুশিজির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে এই জাত্রা বেঁচে গেলাম। আমি রোজ ভগবানের কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করি, আর বাঁচতে চাই না। জীবনটা ভীষণ ভার হয়ে পরেছে, এতো মিথ্যের মধ্যে কি করে থাকা জায় বলুন?

আপনি বইয়ের জন্য সম্মান পাবেন জেনে খুব সুখী হলুম ভগবান যেন আপনার মনোকামনা পূর্ণ করেন।

আমার শুভেচ্ছা, আশীর্ব্বাদ নেবেন,

ইতি—
বৌদি,

পুনঃ আপনি রাগ করবেন না। আমার আর অশান্তি ভালো লাগছে না।

সেই এক কথা, অশান্তি চান না। অন্য কেউ হলে দুষ্টকে জব্দ করে প্রতিশোধ নিতো। কিন্তু উনি যে বাবার কন্যা। কোর্ট কাছারিতে ভয় পান। উনি চান না সকলে এটা জানুক। চিরকাল অন্যায় সহ্য করে মুখ বুজে থেকেছেন এবং থাকবেনও। রবিশংকর কাশীতে আসবার আগেই উকিলের বাড়ী গেলাম। উকিল নোটিশ লিখেই রেখেছিলো। নোটিসটা দেখলাম। লিখেছেন, 'আমার ক্লায়েন্ট অন্নপূর্ণাদেবীর নির্দেশে আপনাকে জানাচ্ছি যে এই সমন পাবার পর পনেরো দিনের মধ্যে যদি আপনার উত্তর না পাই তা হলে বাধ্য হয়ে আপনার নামে স্যুট ফাইল করব। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁয়ের সম্মানীয়া কন্যা অন্নপূর্ণাদেবীকে যদি মাসের প্রথম তারিখে পাঁচ হাজার টাকা তাঁর জীবিত থাকাকালীন না দেন তাহলে কেস করতে বাধ্য হব।'

এ যাবৎ অন্নপূর্ণাদেবী কখনও আমাকে চিঠি লেখেন নি। দীর্ঘ একত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম চিঠি পেলাম। চিরকালই দেখেছি প্রয়োজন হলে কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেন। কিন্তু এবারে তার ব্যতিক্রম হোল।

রবিশঙ্করকে উকিল নোটিস পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'দুটো কাজ আপনাকে করতে হবে। বম্বে থেকে একটা খবর নিন। রবিশঙ্কর কতদিন হোল অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী যান না। এ ছাড়া আমি একটা দরখাস্ত লিখে দিয়েছি। এই দরখাস্তে অন্নপূর্ণাদেবীর একটা সই চাই। উনি যে আমাকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করেছেন, তার প্রমাণ স্বরূপ আমার কাছে কাগজটা থাকা উচিত।'

সব কথা জানিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীকে চিঠি দিলাম। এ দিকে রোজ দুবেলা হাসপাতালে যাই, জণ্ডিসে আক্রান্ত অমরনাথ মিশ্রকে দেখতে। নানা রকম পরীক্ষা চলছে। ওষুধে ওষুধে টেবিলের র‍্যাক ভরে গিয়েছে। ইতিমধ্যে উকিল আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,'রবিশঙ্কর

আমার নোটিশ পেয়ে একজন লোক পাঠিয়েছিল। লোক মারফৎ জানিয়েছে, একটা সমঝোতা করে দিতে। লোকটিকে আমি বলেছি 'সমঝোতা করার মালিক আমি নই। আমি অন্নপূর্ণাদেবীর নির্দেশে নোটিস দিয়েছি। অবশ্য রবিশঙ্কর ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। রবিশঙ্করের বক্তব্য আমি অন্নপূর্ণাদেবীকে জানাতে পারি। তিনি যা নির্দেশ দেবেন তাই আমাকে করতে হবে।' উকিলের কথা অনুযায়ী সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। উপস্থিত আমার শুভচিন্তক অমরনাথ মিশ্রের শরীর খারাপ। এর জন্য দুইবেলা রোজ আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়। আপনি নিশ্চিত থাকুন কোন চিন্তার কারণ নাই।'

অমরনাথ মিশ্রকে ডাক্তাররা একের পর এক পরীক্ষা করে চলেছেন, কিন্তু রোগ নির্ণয় করতে পারছেন না। যে লোক জীবনে কখনও ইনজেকসান নেন নি, তাকে হাসপাতালে থাকতে হচ্ছে। হাসপাতালে অতিষ্ঠ হয়ে বারবার বলছেন বাড়ীতে নিয়ে যেতে। কিন্তু ডাক্তাররা অনুমতি দিচ্ছে না। বাইরে থেকে দেখলে বুঝবার উপায় নাই কোন রোগ আছে। তাঁর ধারণা আয়ুর্বেদিক ওষুধ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। চিরটাকাল তিনি আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়েছেন।

ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণাদেবীর চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

26th 1980

আপনার চিঠি পেয়েছি।

আপনি ভালো করে খোজ নিন যে, যাতে আমাকে যেন কোনোমতেই কোর্টে না যেতে হয়। কেন না পরে দেখা গেলো, আমাকে কেস করতে হবে হয়তো উকিল বলবে। তাঁর মানে কোর্টে হয়তো যেতে হবে এটা আমি করতে চাই না। আমি উকিলের হাতে ভয় পাওআতে চাই, জাতে আমাকে না জ্বালান। আর কাশির উকিলই ভালো হবে, এখানে হয়তো জানা জানি হয়ে যাবে। আমি চাই না যে এটা নিয়ে বাইরে কিছু আলোচনা হয়, এই ব্যাপারে খুব ভেবে চিন্তা করে করবেন। ঝোকের মাথায় বা রেগে কিছু করা ভালো নয়। আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? আর আমার মনে হয় আপনি বাইরের থেকে ফিরে এলে তখন করাই ভালো হবে, তখন ভাববার ও অনেক সময় পাওয়া জাবে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন।

আমার আশীর্বাদ নেবেন

বৌদি

পুনঃ দশ বৎসর থেকে বাড়ি আসছেন না এর কিছু বেসি হতে পারে কিছু কম ও হতে পারে।

অবাক হয়ে ভাবি যাঁর সম্মানের জন্য তাঁর এত চিন্তা, সে লোকটা কোন জগৎ-এর লোক। চিঠিগুলো পড়ে মনে মনে কষ্ট পাই। বুঝতে পারি কত বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

মনে পড়ে গেল বম্বেতে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, 'আমার জীবনের দাম কি? গেলেও যা থাকলেও তাই।' জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ কথা বলছেন কেন?' উত্তরে

বলেছিলেন, 'আমার জীবনের কোন দাম নাই কারো কাছে। আমি মরে গেলে অনেকেই স্বস্তি পাবে। আমি কি একটা মানুষ? বেঁচে থাকলেই বা কি আর মরে গেলেই বা কি? আমি মারা গেলে কাঁদবার কেউ থাকবে না। একমাত্র মা ছাড়া।'

আবার চিঠি পেলাম বম্বে থেকে। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

30th 1980

যতিন বাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার ওপর ভরোষা আছে। কিন্তু আপনার রাগকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

আমার সরীর একরকম আছে, ডাক্তার আসছে আর রিতিমত ওষুধ রাত দিন খাচ্ছি, আপনি দয়া করে কোনো চিন্তা করবেন না।

আমার কপালে মৃত্যু নেই। শান্তির কপাল নিয়ে আসিনি, সেইজন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনার গুরুদেবকে প্রণাম জানাচ্ছি, এবং উনার যখন মত আছে তখন চিঠি সাইন করবো, তবে মকোদ্দমা-টমা করবার ইচ্ছা নেই। আমার পাকাপাকি একটা ব্যবস্থা যেন সারাজীবনের উনি করে দেন। কেন না উনার সাঙ্গপাঙ্গরা আমাকে শেষে খুব জ্বালাবে। অন্যের কাছে গিয়ে জেন আমাকে টাকা না চাইতে হয়। আপনার উকিলের চিঠি আমি এখনো পাই নি। উকিলকে কত দিতে হবে নিশ্চই জানাবেন তা না হলে রাগ করবো। আপনি যা বলেছেন সেটা খুব ভালো লেগেছে।

আমার আশির্ব্বাদ, শুভেচ্ছা নেবেন।

ইতি—

বৌদি,

চিঠির বিষয়বস্তু সেই এক। কয়েকমাস পরে আমার বিদেশে যাবার কথা ছিলো। তাই লিখেছেন 'আপনি বাইরে থেকে ফিরে এলে তখন করাই ভালো হবে। তখন ভাবারও অনেক সময় পাওয়া যাবে।' চিঠি পড়ে দুঃখ হয়। সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। যাঁর সম্মানের জন্য এত চিন্তা, তাঁর কিন্তু এ সব ভাববার সময় নাই। চোখের সামনে যাঁকে দেখি, চোখের আড়ালে গেলে তাঁকে দেখতে কেমন লাগে, তার নমুনা সব সময় পাওয়া যায় না।

অন্নপূর্ণাদেবীর চিঠিগুলো বারবার পড়ি। কত অসহায় হয়ে চারদেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। কারো বিষয়ে কখনও অভিযোগ শুনি নি। এত কাণ্ড হয়ে যাবার পরেও তাঁর উদারতা দেখে অবাক হই। মনে হয় ক্ষমা সকলকে করাও যায় না আবার সকলের কাছে ক্ষমা চাওয়া যায় না। হাজার অপরাধের পরেও যে ক্ষমা চায় তাঁর ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোন মহত্ব নাই কিন্তু তারপরেও যে ক্ষমা করে তাঁর ক্ষমা করার মধ্যে মহত্ব আছে।

হায় রে মানুষের আশা, আর হায় রে মানুষের স্বপ্ন। মানুষ কত আশা করেই না সংসার গড়ে, আর মানুষের সৃষ্টিকর্তা কত নিপুণ ভাবেই না সেই সংসার আবার ভাঙ্গে। নিজের হাতে গড়া সংসার যে এমন করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম। যাক এ তো পরের ঘটনা।

চিঠির মধ্যে সেই এক কথা। লিখেছেন, 'আপনার উপর ভরোসা আছে কিন্তু আপনার রাগকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।' এই লেখার পর যা লিখেছেন তা পড়ে মনে হোল, মনে মনে কি অশান্তিই না ভোগ করছেন। চিঠি পড়ে দুঃখ হোল। কি এক অদ্ভুত চরিত্র। যে সঙ্গীতকে একমাত্র লক্ষ্য করেছে, তাঁর কাছে সংসার কখনও গুরুতর হয়ে ওঠে না। আর্থিক পরিস্থিতি যদিও মাঝে মাঝে চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে, তবুও সঙ্গীতের মধ্যে অবগাহনে থাকাকালীন সব ভুলে থাকা যায়। এ এক ভগবানের চরম আশীর্বাদ। কখনও কখনও তাই হয়ত মনে হয়েছে, কারো কাছ থেকে কিছু নেবো না। যদি নিতেই হয় তাহলে সেই ওঁকার পরমেশ্বরের হাত থেকেই নেওয়া ভালো। কিন্তু আমি অটল প্রতিজ্ঞ, যে কষ্ট অন্নপূর্ণাদেবী পাচ্ছেন তাঁর হাজারো গুণ শিক্ষা এমন দেব যে, রবিশঙ্কর জীবনেও ভুলতে পারবে না। সে বুঝতে পারবে, এ যাবৎ মিষ্টি কথা বলে এবং নানা উৎকোচ দিয়ে ভালমানুষ সেজে সকলের কাছে প্রিয় হয়েছেন। কিন্তু একজায়গায় সে ধরা পড়ে গেছে। তাঁর মিষ্টি কথায় আমার মন ভোলাতে পারে নি সেইজন্য এ যাবৎ কোন উৎকোচ বা কোন জিনিষ দিয়ে আমাকে চামচে করতে পারে নি। এখন আমার সকলকে চেনা হয়ে গিয়েছে। সাধ করে কি আর কাউকে এখন বিশ্বাস করতে মন চায় না।

৬৭

বম্বে থেকে কাশীতে আসবার পর কি ভাবে দিনরাত চলে যাচ্ছে বুঝতে পারি না। এতদিনে সব পরীক্ষা করে ডাক্তাররা ঠিক করল রোগ ধরা যাচ্ছে না। অপারেশন করেই বুঝতে পারবে কি রোগ। অপারেশন করার পরই ডাক্তার, মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র এবং আমাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বললেন, ক্যানসার হয়েছে। ক্যানসার বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে স্টিচ করে দিয়েছে। এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। যে লোকটি সারা জীবন কোন নেশা করেন নি, এত সাত্ত্বিক ভাবে থেকেছেন, ঘি, দুধ এবং ফল যাঁর একমাত্র আহার ছিলো, তাঁর কেন ক্যানসার হোল। কে এর উত্তর দেবে?

হঠাৎ উকিলের কাছে খবর পেলাম রবিশঙ্কর বম্বে গেছে। এই অবস্থার মধ্যেও অন্নপূর্ণাদেবীকে চিঠি লিখে জানালাম, 'খবর পেয়েছি রবিশঙ্কর বম্বে গেছে। জানি আপনি গোলমালে যেতে চান না। হয়ত রবিশঙ্কর কম টাকায় আপনাকে রাজী করাবে কিন্তু আপনি রাজী হবেন না। উকিল আমাকে বারবার বলে দিয়েছে, কোন কাগজপত্রে সই করবেন না। সই করতে হলে ঘাসওয়ালাজীকে বলবেন, কোন উকিলের সামনে সব বুঝে, তবেই সই করবেন, যদি আমার কথায় সম্মত হয়।'

অপারেশনের আটদিনের মাথায় অমরনাথ মিশ্র এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন। আমার জীবনের শুভানুধ্যায়ী গুল্লুজী অকালে চলে গেছেন। এখন অমরনাথ মিশ্রও চলে গেলেন। নিজেকে বড় অসহায় মনে হোল। এই অবস্থার মধ্যেও অমরনাথ মিশ্রের তিরোধান-এর খবর দিয়ে, বারবার উকিলের নির্দেশ, অন্নপূর্ণাদেবীকে চিঠিতে জানালাম।

অমরনাথ মিশ্রের ক্রিয়া কর্ম সম্পন্ন হতে কয়েকদিন লেগে গেল। কেন এমন হয়? অকালে মহৎ হৃদয়ের লোকেরা পরপারে চলে যায়, অথচ যাঁরা অপকর্ম করছে তাঁরা তো

বেশ বহাল তবিয়ৎ এ আছে। মনে মনে বলি, ‘ও নিষ্ঠুর, আরো কত বাণ তোমার তূণে আছে? এখনও কত কি দেখতে হবে কে জানে।’

কিছুদিন পরেই অন্নপূর্ণাদেবীর চিঠি পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

13th 1980

আপনার চিঠি পেয়েছি,

আমি এর আগে আপনার বাড়ির ঠিকানায় লিখে ছিলুম, আপনি আশা করি আমার সেই চিঠি পেয়েছেন? আমি উনার সঙ্গে মামলা করতে চাই না। উনি টাকা দিতে চান দেবেন না চান না দেবেন। আমার পক্ষে ঝগড়া করে টাকা পয়সা আদায় করা এক্কেবারে সম্ভব নয়। তবে আপনি যা করেছেন তাতে সব ব্যাপার ঠিক হয়ে গেছে। টাকা পয়সা আমি ঠিক মত পাবো। আপনি উকিলকে বারণ করে দেবেন আর জেন কোনো চিঠি পত্র উনার কাছে জেন না লেখেন। আর কোনো প্রকারের অশান্তির দরকার নেই, সব মামলার ব্যাপার এখানেই সব শেষ করে দেবেন, এই আমার আপনার কাছে অনুরোধ যে কটা দিন বেঁচে আছি শান্তিতে বাঁচতে চাই আর এই সব ভালো লাগে না। আপনি আমাদের জন্য সর্ব্বদা নানান ভাবে অপমানিত হয়েছেন। আর আপনি নিজেকে এই সব বাজে ব্যাপারে জ্বরাবেন না এটা আমার অনুরোধ। বাকি উনি এসে ছিলেন কি কথা হয়েছে দেখা হলে বলবো। আমার শরীর খুব খারাপ ডাক্তার বলছে কোনো রকম ভাবনা চিন্তা আমার শরীরে খুব ক্ষতি করবে। মোহন্তজির খবর সুনে মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। সত্যিকার বন্ধুকে আপনি হারিয়েছেন।

এইখানে শেষ করলাম।

আমার শুভেচ্ছা আশির্ব্বাদ নেবেন,

ইতি—
বৌদি

পুনঃ উকিলের ব্যাপার সব শেষ করে দেবেন।

চিঠি পড়ে বুঝলাম আমি যা চেয়েছিলাম তা হয় নি। করতে তো অনেক কিছু পারি। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ বাণী শুনে লিখতে কিছু সাহস হোল না। মনে হোল যাতে কিছু না করি, তার জন্যই ডাক্তারের দোহাই দিয়েছেন। যাক যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বম্বে গেলে সব জানতে পারব। এ চিঠির আর কি উত্তর দেব? মনের মধ্যে ক্ষোভ রয়ে গেল। অন্নপূর্ণাদেবীর মুখ চেয়ে কিছু করতে পারলাম না, নইলে যা শিক্ষা দিতাম, জীবনেও তা ভুলতে পারতো না। কিন্তু যা করেছি তাই কি সে কোনকালে ভুলতে পারবে? এক কথায় তো তাকে দৌড় করিয়ে দিলাম বম্বেতে। মনের মধ্যে একটাই সংশয় রয়ে গেল। চিঠির মধ্যে দুইরকমের আভাষ রয়েছে। চতুর পণ্ডিত জাত অভিনেতা। নিশ্চয়ই অভিনয় করে একটা কিছু করেছে। সে ভাল ভাবেই জানে, টাকার ব্যাপারে অন্নপূর্ণাদেবীর কোন কালেই আগ্রহ নাই। যাক, ফলেন পরিচিয়তে।

নিজের মনে মনে বলি যে জঘন্য অপরাধের জন্য আসামীকে অভিযুক্ত করেছিলাম, তাঁর

নিন্দা করবার মত ভাষা আমার জানা নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে যাই, এই ভেবে যে, সুসভ্য শহরে আসামীর এমন ব্যক্তিত্ব সগর্বে মাথা উঁচু করে বিরাজ করছে। এই যে আসামী শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত মানব সমাজের শত্রু। আজ উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে, আমি আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলাম বটে, কিন্তু আমার ভয় হয়, এই মুক্তি হয়ত আসামীকে আরো দুঃসাহসী, আরো বেপরোয়া করে তুলবে। আর এমন দিন হয়ত আসছে বলে আশঙ্কা করি যখন এই জাতীয় সংখ্যা ভারতের সমাজে আরো বেড়ে যাবে। আর সব চেয়ে আশঙ্কা এইজন্য, যে আসামী নিজেকে সম্ভ্রান্ত সুসভ্য বলে পরিচয় দিয়েছে। অশিক্ষিত দরিদ্র শয়তানের চেয়ে, ধনী শয়তান সমাজের পক্ষে আরো ভয়াবহ বলে মনে করি। এ ধরনের ঘটনা আগে কতই না ঘটেছে। কিন্তু কে আজ তা মনে রেখেছে? টাকা দিয়ে সব রেসপেক্ট কেনা যায়, ফেম কেনা যায়। আসলে মানি মেকস এ ম্যান। আমার ধারণাটা যে ঠিক, দশবছরের মধ্যেই দুইবার বুঝেছিলাম। সে কথা যথাসময়েই বলব।

এই প্রথম একটা শীতকাল এলো উনিশশো আশির শেষে যখন আমার কোন দায়িত্ব নাই। রুটিন মাফিক সারা ভারতের সঙ্গীত সম্মেলনের তরফ থেকে কয়েকটা আমন্ত্রণ পেয়েছি। তাও জানুয়ারীর শেষে এবং ফেব্রুয়ারীতে। অন্নপূর্ণাদেবীর ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতি, আর বাবার স্বপ্নকে সাকার করার রসদের অভাব। তাই অলস ভাবে দিনগুলো কাটছিলো। কিন্তু কি বিড়ম্বনা। চরৈবেতি লগ্নে আমার জন্ম বলে, বিধি আড়ালে হাসলেন।

‘পাগল রে পাগল, সাঁকো নাড়াস না। ও হো ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।’ এখানেও হোল তাই। আমার এক অনুজ প্রতিম খবরের কাগজওয়ালা তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে আমার এখানে হাজির। বলল দাদা, ‘আপনার বইএর অনুসারে, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের শতবর্ষ তো এ বছরেই হওয়া উচিত। সে বিষয়ে কোন খবর বা বক্তব্য দেবেন নাকি?’

এ পেশাটা যে খুঁচিয়ে ঘা করার সেটা আমি জানতাম। কিন্তু ঘাটা যদি নিজের ঘাড়ে হয় তখন বিরক্তিকর। বললাম, ‘আমরা ক্ষমতা নাই। যদিও জানি এটা শতবর্ষ, এবং পালন করা উচিত। কিন্তু আমার মনোবল ছাড়া আর কোন বল নাই।’

বাজনাতে হয় সুরের খেলা, আর কাগজে হয় কথার খেলা। আমরা যেমন লয়ের খেলায় বাঘা বাঘা লোককে প্যাঁচে ফেলতে পারি, ওরাও পারে বুঝলাম। বাবার শতবার্ষিকী যাঁরা পারলেও করছে না, আমি চাইলেও পারছি না, এই দুটোকে বেশ মিলিয়ে মিশিয়ে মনে মনে একটা নিউজ গড়ে নিয়েছে এবং তার বোঝা যে আমার ঘাড়ে চাপবে, তা বুঝলাম দুদিন পর।

ইউ.এন.আই.-এর মাধ্যমে আমার বক্তব্যটাকে সর্বস্তরে ওঁরা রিলিজ করিয়ে দিলো, আর সারা ভারতের কাগজগুলো কিরকম বেআকেল্লে যে, ঝপঝপ করে বড় হরফে ছেপে দিলো আমার বক্তব্য। আমার বক্তব্যের একটা লেজুড় জুড়ে দিয়েছিলো। সেইটাই হোল আমার কাছে বজ্রপাত। আমি নাকি মনে মনে বাবার শতবর্ষ পালন করার কথা ভাবছি। আর তাও ছোটখাট নয়। অখিল ভারতীয় স্তরের সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে।

কাগজটা পড়ে প্রায় শ্বাসরোধ হবার যোগাড়। একটা মেয়ে বিয়ে দেবার সংস্থান নাই,

এ তো একশোটা মেয়ের বিয়ে। রাগেতে গাটা রিরি করে উঠল। ভাবলাম দেখা হলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবো। মানিক এলো সে দিনেই, যখন আমি মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র এবং আমার বিশিষ্ট অনুরাগী রামবাবার সাথে এই সংবাদটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বেমক্কা রাগ চাপতে না পেরে বললাম, 'আচ্ছা লোক তো হে তোমরা। এ বাঁদরামির কি মানে হয়?'

আমার কথা গায়ে না মেখে ওরা বলল, 'এই রইল আমাদের কুড়ি কুড়ি টাকা, আর ছোট্ট একটা প্রস্তাব আজকে এখানেই জন্ম নিক, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের স্মৃতিতে একটা সংস্থা'। আমাকে কথা বলতে না দিয়েই আমার, আর মহন্তজীর দিকে হাত বাড়াল, কুড়ি কুড়ি টাকার জন্য। আমি আমার বন্ধুটি দিলাম কুড়ি টাকা করে, আর মহন্তজী দিলেন চল্লিশ। সাথে সাথে বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। এঁর নাম হোক 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন মিউজিক সারকেল।'

ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, আমার স্তম্ভিত ভাব কাটিয়ে উঠতে সময় লাগলো। তারপর ধাতস্থ হয়ে বললাম, 'আপনারা এর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। আজে বাজে ভাবে করলে আমার লোকনিন্দা কি হবে জানি না, কিন্তু বাবার যে অমর্যাদা হবে এতে কোন সন্দেহ নাই। তাই এই অলীক স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়ণ সম্ভব নয়। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার এটা ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে।' যদিও আমি জানতাম, মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র কোন দিনই খেলাচ্ছলে কোন কথা বলেন না।

আজকেও তাই হোল। গম্ভীর এবং দীপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি হালকাভাবে বলছি না। গুরুত্ব সহকারেই বলছি। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার জনপ্রিয়তা কতটা। কাজে নামলেই দেখতে পাবেন আমরা সকলেই আপনার সাথে আছি। আমি তো একটা কথাই বুঝি, কোন মহৎ কার্যে যদি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবার বাসনা থাকে, তার জন্য কোন কিছুই আটকায় না। তা ছাড়া শিষ্য হিসাবে আপনার তো করাই উচিত।'

যদিও মনে মনে জানতাম, মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র নিজের বল ভরসাতেই, একটা সংগীতের অমরাবতী গড়তে পারেন। তবুও একটা বাধ বাধ ভাব রয়েই গেল। যাক এখন তো দেরী আছে। করলে, হবে বছরের শেষেই। আমি চুপ করে আছি দেখে বীরভদ্র মিশ্র বললো, 'উপস্থিত ডোনেসান এবং অনুদান-এর জন্য বিল বই ইত্যাদি ছাপান। সারা বছর যেখানেই বাজাতে যাবেন, কিছু ডোনার করুন। এছাড়া কাশীতে সারকেলের জন্য কিছু সভ্যর কাছে নামমাত্র চাঁদা ওঠান।' এ যাবৎ বহু জায়গায় বাজিয়েছি। সঙ্কট মোচনে চারদিনের সঙ্গীত সমারোহ হয়। তার জন্য যে ঝামেলা পোয়াতে হয়, তার অভিজ্ঞতা আছে। মনে হোল বিল ছাপাতে হলে, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারির নাম দরকার। কথাটা উত্থাপন করতেই রামবাবা বললেন, 'মহন্তজীকে সেক্রেটারি করুন এবং আপনি প্রেসিডেন্ট হন।' মহন্তজী রাজী হয়ে বললেন, 'কিছু টাকা যোগাড় করেই একটা মেমোরাণ্ডাম তৈরী করে, একটা ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলুন।' বীরভদ্র মিশ্রকে বললাম, 'মেমোরাণ্ডাম'-এর ব্যাপারে আপনার উকিলকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে।' মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র রাজী হলেন। গত তিনটে মাস নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কেটেছে। ভেবেছিলাম একটু বিশ্রাম নেবো। কিন্তু মাথায় বিরাট দায়িত্ব এসে

পড়লো। কয়েকদিনের মধ্যেই রামবাবা এবং আমার একটী ছাত্র বিল ছাপিয়ে নিয়ে এলো। তিনি সপ্তাহের মধ্যেই বীরভদ্র মিশ্র মেমোরাণ্ডাম তৈরী করলেন। সকলে মিলে কিছু সভ্যর চাঁদা উঠিয়ে ব্যাঙ্কে একাউন্ট খোলা হোল, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেল' নামে। মাত্র একশো টাকা একাউন্টে জমা পড়ল।

দেখতে দেখতে কোলকাতায় যাওয়ার সময় হয়ে এলো। কোলকাতায় গিয়ে তিনটে প্রোগ্রাম করবার পর, শ্যাম গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা হোল। বললেন, 'তোমার বই যে আমেদাবাদ থেকে পাঠিয়েছিলে তা পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। স্থির করেছি বাবার শতবার্ষিকী এই বছরের পাঁচই ডিসেম্বারে, সারারাত্রি রবীন্দ্র ভারতীর রথীন্দ্র মঞ্চে করব। এই সম্মেলনে তোমাকে কিন্তু বাজাতে হবে।' সানন্দে সম্মতি জানালাম। বললাম, 'আমার বই লেখার পর বাবার সত্যি শতবার্ষিকী যে ভুল করে করা হয়েছিলো, সেটা জেনে বাবার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন। তবে আপনি যে শতবার্ষিকী করবার স্থির করেছেন, তার জন্য সর্বপ্রথম আমার শ্রদ্ধা আপনাকে জানাচ্ছি। আপনার কাছে আমারও একটা অনুরোধ আছে। কোলকাতায় আসার আগেই মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রর আশ্বাসে, ঠিক করেছি বাবার শতবার্ষিকী করব। দিন এখনও স্থির করি নি। আপনি পাঁচই ডিসেম্বর ঠিক করেছেন, তাহলে আমি ডিসেম্বরের শেষেই দিন স্থির করব।' আমার কথা শুনে শ্যাম গাঙ্গুলি সানন্দে রাজী হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই কাশীতে তোমার অনুষ্ঠানে যাব।'

শ্যাম গাঙ্গুলির কথা শুনে মনে হোল, প্রায় দশ মাস পরে শতবার্ষিকী করবেন, তার জন্য ইতিমধ্যে হল ভাড়া করে রেখেছেন। একটা অনুষ্ঠান করতে কত আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হয় জেনে ভাবলাম, আমাকেও তো করতে হবে। শ্যাম গাঙ্গুলির কলেজ আছে। তাঁর সাহায্যের জন্য বহু শিষ্য আছে, কিন্তু আমার তো কিছুই নাই। মনে মনে ভাবলাম, কাশীতে গিয়েই এখন থেকে সব ব্যবস্থা করতে হবে। অনুষ্ঠান করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন টাকার। এর জন্য আমাকে বহু পরিশ্রম করতে হবে। কোলকাতা থেকেই, কিছু ডোনার এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে, একমাস পরে কাশীতে এসে পৌঁছলাম। কাশীতে আসার কয়েকদিন পরেই, ফ্রান্স থেকে দুই জন লোক এসে হাজির। তাঁরা আমার ইংরেজী বইটা পড়েছে। একজন আমাকে বলল, 'আপনার ইংরেজী বইটা ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করবার অনুমতি যদি দেন, তাহলে আপনার কাছে উপকৃত হবো।' ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার অনুমতি দিলাম। ভাবলাম বাবার প্রচার যদি হয় অন্য ভাষায়, তাহলে এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে। অপরজন বলল, 'আমার ভীষণ ইচ্ছা আপনার কাছে সরোদ শিখব। বছরে তিনমাস আপনার কাছে আসব। ইতিমধ্যে তিন বছরের স্কলারশিপ নিয়ে, কাশীতে এসে আপনার কাছে শিক্ষা করব। আপনি অনুমতি দিলে সে ব্যবস্থা আমি করতে পারব।' ছেলেটির আগ্রহ দেখে বললাম, 'ঠিক আছে। উপস্থিত আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। এই সময়ে তুমি আমার ছেলের কাছে শিক্ষা করো।' ছেলেটি বাঁ হাতে বাজায়। অবাক হয়ে দেখলাম, সে একটা সরোদ ইতিমধ্যে তৈরী করিয়েছে। তাঁর শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। ছেলেটির অপর বন্ধু, আমার সম্মতি নিয়ে ফ্রান্সে চলে গেল। বলল, 'শেষ হলে আপনার কাছে এসে বইটা দেখাব।'

উস্তাদ বাবার আশীর্বাদে মূলধন একশো টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম কনফারেন্স করবার জন্য। বছরের প্রথম নয় মাসে অভাবনীয় ভাবে ভারতের কোলকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী যেখানেই বাজাতে গিয়েছি, সব জায়গায় বেশকিছু টাকার যোগাড় করলাম।

ইতিমধ্যে কনফারেন্সের তিনমাস আগে আমেদাবাদ, ইন্দোর, উজ্জ্যেন এবং বম্বে থেকে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলাম। একদিক দিয়ে ভালোই হোল। যেখানেই যাব, সেখানে কিছু ডোনেশান এবং অনুদান নিশ্চয়ই পাব। ইতিমধ্যে তারিখ ঠিক করা হোল বাইস, তেইস, এবং চবিবশ ডিসেম্বার। কনফারেন্সের জন্য, স্থানীয় একমাত্র ভাল হল নাগরি নাটক মণ্ডলি ঠিক করে আমেদাবাদে গেলাম। আমেদাবাদ, ইন্দোর এবং উজ্জ্যেন এ গিয়ে কিছু ডোনেশান এবং অনুদান পেলাম। বাজনা বাজিয়ে বম্বে গেলাম। বম্বে গিয়ে প্রথমেই অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে দেখা করলাম। দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে বাজনা আছে?' আমি বললাম 'আগামীকাল।' আমার কথা শুনেই বললেন, 'জানি আপনি সব কথা শুনতে চান। আমি নিজেই সব বলব। তবে আজ নয়। আগামীকাল, ভাল ভাবে বাজাবেন। তারপরদিন সকালে আসবেন। সেইসময় সব কথা হবে। আজ এখানে খেয়ে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। আজ কোন কথা নয়। পরশু সকালে এসে প্রথমে খাবেন, তারপর সব কথা হবে।' কথাটা যুক্তিযুক্ত ভেবে বললাম, 'ধ্যানেশের যে বন্ধুটি থাকত তাকে তো দেখছি না।' বললেন, 'ছেলেটি বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে।' মনে মনে ভাবলাম, 'একটা অবলম্বন তাও ছিলো, সেটাও আর নেই। বিপদ কিছু হলে রাত বিরেতে কি হবে? যাইহোক খেয়ে দেয়ে নিজের স্থানে চলে গেলাম। সন্ধের সময় পিত্তিজির বাড়ী গিয়ে, বাবার প্রকৃত শতবার্ষিকী করছি বললাম। এ যাবৎ যা যা হয়েছে সব শুনবার পর বললেন, 'খুব ভাল কাজ করছেন। আপনার সারকেলের জন্য আমার কাছেও ডোনেশান নেবেন।' বললাম, 'সে তো নেবোই।' আমার বলার আগেই 'সোমে' এ আসবার আগেই, অনাঘাতে 'ধা' মেরে দিয়েছেন। বললাম, বম্বে থেকে যাবার আগে ডোনেশান নেব, পিত্তিজি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে।' প্রতিবারের মত খাবার খেয়ে বাজালাম। বাজনার পর পিত্তিজি হেসে বললেন, 'কাল তো আপনার বাজনা আছে। সুতরাং পরশু রাতে গাড়ী পাঠিয়ে দেব।' পরের দিন বাজনা হোল হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে। বাজাবার পরের দিনই সকালে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। গিয়ে বললাম, 'আমার নিজস্ব কিছু কথা আছে। সে কথাগুলো পরে বলব। আগে আপনার কথা শুনব, যে কথা জানবার জন্য আমি দীর্ঘদিন উদগ্রীব হয়ে আছি, সে কথা না শোনা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

আমার কথা থামিয়ে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রান্না হয়ে যাবে। আগে খেয়ে নিন, তারপর সব শুনবেন।' অন্নপূর্ণাদেবী রান্না করছেন, সেইজন্য ঘরের বাইরে চেয়ারটায় বসলাম। চেয়ারে বসে, নিজের মনের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছে, কি করে বোঝাব? বললাম, 'যা খাবার হয়েছে তাই দিন, কেননা আপনার কথা শুনবার যেমন কৌতুহল আছে, ঠিক সেইরকম আমারও কিছু বলবার আছে, যে কথা আপনি স্বপ্নেও

ভাবতে পারবেন না। জানি না সে কথাগুলো আপনি কি ভাবে নেবেন।' আমার কথু শুনে বললেন, 'এমন কি কথা, যা কি আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারব না? আগে আপনার কথাটা বলুন, তারপর আমার কথা বলব।' মনে মনে ভাবলাম, নিজের কথাটা আগে বলে নেওয়াই ভালো, কেননা যে সব ঘটনার কথা শুনব তারপর হয়ত নিজের কথা বলবার অবকাশ পাব না। এই কথা ভেবে, শতবার্ষিকী করবার পরিকল্পনা কি ভাবে মনে এলো, প্রথম থেকে এ যাবৎ যা যা হয়েছে, সব কথা বললাম। আমার সব কথা শুনে বললেন, 'এ তো খুব ভালো কথা। কিন্তু এর জন্য তো অনেক টাকার দরকার। সকলের কাছেই যখন অনুদান নিচ্ছেন তখন আমার কাছেও টাকা নেবেন।' বললাম, 'আপনার আশীর্বাদই হোল ডোনেশান। সুভ্যেনিরে আশীর্বাদিকা বলে আপনার নাম লিখব।' বললেন, 'আমার নাম কেন লিখবেন?' বললাম, 'কেবল নামই লিখব না। ট্রিবিউট বলে আপনার একটা লেখাও ছাপাব।' এই কথা বলেই কাগজ বার করে শোনালাম। ডিয়ার স্যার বলে প্রথমে 'শতবর্ষ' পালন হচ্ছে জেনে খুশী হয়েছেন। শেষ কয়েকটা কথা 'ইট গিভস মি গ্রেট প্লেজার টু নোট দ্যাট দি কনট্রোভারসিক অফ দি ডেট অফ বারথ অফ মাই রেভারড ফাদার হ্যাজ বিন সলভড উইথ ডকুমেন্টারি প্রসেস ইন দি বুক এনটাইটেলড 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন এনড হিজ মিউজিক' স্ক্রিপটেড বাই পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য, হিজ ওনলি রেসিডেনসিয়াল ডিসাইপাল, হুইচ ওয়ারেন্টস ইমিডিয়েট এটেনশান অফ দি মিউজিক লাভারস টু গেট রিড অফ দি কনট্রোভারসিয়াল ইস্যু ওয়ানস ফর অল। উইথ অল গুড উইসেস টু দি মিউজিক সারকেল। থ্যানকিং ইউ।'

লেখাটা পড়ে বললাম, 'দুটো জিনিষ, আশীর্বাদিকা এবং ট্রিবিউট লিখলে আশা করি আপত্তি করবেন না।' হেসে বললেন, 'আমি চাই না, আমার নামে আশীর্বাদিকা থাকুক। আমার আশীর্বাদের সে ক্ষমতা কোথায়? তবে আপনাকে জানি, যখন স্থির করেছেন তখন করবেনই। জানি আপত্তি টিকবে না।' যাক গ্রীন সিগন্যাল পেলাম। আমার কথা বলে বললাম, 'কোলকাতায় শ্যাম গাঙ্গুলিও বাবার শতবর্ষ করছেন এবং আমাকেও বাজাতে বলেছেন।' আমার কথা শুনে বললেন, 'শ্যামবাবুর কাছ থেকে আমিও একটা চিঠি পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ঘরের সকলেই বলেছে, কুড়িবছর আগে যে হেতু ভারত সরকার দ্বারা শতবার্ষিকী হয়ে গিয়েছে, সেইজন্য আমি যেন লিখি শতবর্ষ হয়ে গিয়েছে। যদিও তাঁদের কথামত লিখেছি তবে একথাও লিখেছি বয়সটা নিয়ে যে বিবাদ, সেটা ঐতিহাসিকদের কাজ। বাবার সম্মানে যে প্রোগ্রাম হচ্ছে তারজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বললাম, 'আমার বইটা তো পড়েছেন। ভুল মানুষেই করে। কিন্তু ভুল হয়ে গেলে সত্যকে স্বীকার করা উচিত। তাই আমার বই পড়েও সত্যকে কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, আপনার কাছে অন্ততঃ আমি এ আশা করি না। যাক এ সব কথঅ। একটা কথা বলুন তো? যুগান্তরে আপনার একটা সাক্ষাৎকার প্রায় তিনমাস আগে বেরিয়েছে। আপনি তো কাউকে বাড়ীতেই ঢুকতে দেন না।' আমার কথার মাঝখানেই বললেন, 'আমি সাক্ষাৎকার দিই নি। আসলে সলিল চৌধুরি একজন লোককে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে সলিল চৌধুরির আলাপ

বলেই দরজা খুলেছিলাম। সলিল চৌধুরির সঙ্গে যে লোকটি এসেছিলেন, সে যে যুগান্তরে লেখে আমি জানতাম না। কথায় কথায় কয়েকটা কথা বলেছিলাম। পরে কোলকাতার এক ছাত্রী আমাকে যুগান্তরের কাটিংটা পাঠিয়ে দেয়। আমি তো দেখে অবাক। তারপর সলিল চৌধুরিকে খবর দিয়েছিলাম, আর কখনও ঘরে আসতে দেবো না। সলিল চৌধুরিও আসলে জানত না যে তাঁর বন্ধু অমিতাভ গুপ্ত যুগান্তরে বার করবে।' যে হিসেবটা এ যাবৎ মেলে নি সেটার কারণ বুঝলাম। কথাটা শুনবার পর বললাম, 'দেখুন গতকাল রাত্রে বাজিয়ে, বাড়ীতে এসে রাত প্রায় চারটে পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে এসেছি সেটা আপনার কাছে সব শোনার পর বলব।' ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়। সহজ ভাবে বললেন, 'এত কেন ভাবেন? আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে আপনি কি তা বদলাতে পারবেন?'

বললাম, 'এর উত্তরে একটা কথাই বলতে পারি। ভুলে যাবেন না ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'ম্যান ইজ দি আরকিটেক্ট্ অফ হিজ ঔন্ ফরচুন।' অর্থাৎ 'ভাগ্যকে আপনি গড়ে নিন।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'শুরু হোল আপনার দার্শনিক কথাবার্তা। থাক এ সব কথা। হাত ধুয়ে খেতে বসুন।' আহারান্তে বললাম, 'আপনার এখনও কি সেই পুরোনো অভ্যাস? সারাদিনে একবার কেবল বিকেলে খাওয়া?' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এ তো বহুদিনের অভ্যাস।' বললাম, 'প্রতিবারই আপনাকে বলি, অথচ শোনেন না। যখন গ্যাসট্রিক ব্যথা হবে তখন বুঝবেন।' বললেন, 'হবে না, হয়েছে। আর, কিছু ভাল লাগে না। এখন আমার কাছে মৃত্যুই কাম্য।' বললাম, 'এই সব অলীক কথা শুনবার জন্য আমি আসি নি।' আমার কথা শুনেই বললেন, 'আপনি একটু বসুন। রান্নাঘরের কয়েকটা কাজ সেরে শীঘ্রই আসছি।' কিছুক্ষণ পরে আসবার পর মোড়ায় বসতেই বললাম, 'টাকার ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন না জানা কথা। যাক, কি কি হয়েছিল প্রথম থেকে আমাকে বলুন তো?'

বললেন, 'একদিন পণ্ডিতজীর এক স্তাবক এসে বলল যে, তাঁর গুরুজী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সম্মতি জানিয়ে আসতে বললাম। পণ্ডিতজী এক পাল স্তাবকদের নিয়ে এলেন। তাঁদের ড্রয়িং রুমের একদিকে বসিয়ে রেখে আমাকে এসে বললেন, 'জানি না বিশ্বাস করবে কি না কিন্তু সত্য করে বলছি আমি জানতাম না, মাসের প্রথম দিনে তুমি টাকা পাও না। সত্যই আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে প্রতিমাসে প্রথম দিনে তিনহাজার টাকাই দেব। তুমি যাতে মাসের পয়লা তারিখে পেয়ে যাও, সে ব্যবস্থাও করে দেবো। কিন্তু তুমি আমাকে কাশীর উকিলকে দিয়ে নোটিস দেবে কল্পনাই করতে পারি না। তোমার এই ব্যবহারে সত্যই আমি দুঃখ পেয়েছি।'

পণ্ডিতজীর কথা শুনে বললাম, 'টাকা দিয়ে তুমি সকলকেই নিজের আওতায় করেছ। ব্যতিক্রম হোল যতীনবাবু। মামলা করবার জন্য যতীনবাবুকে আমি বলি নি। যতীনবাবু এখানকার সব অবস্থা দেখে টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায়, বাধ্য হয়ে বলেছিলাম। টাকার জন্য বারবার আমাকে লোক পাঠাতে হয়, এই কথা শুনেই যতীনবাবু রেগে যান। তাঁর কথায় রাজী হয়েছিলাম, কেননা টাকার জন্য বারবার লোক পাঠানোর জন্য আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি।'

কথা থামিয়ে বললাম, 'পণ্ডিতজী তিন হাজার দেবে বললো, আর আপনিও রাজী হয়ে বিশ্বাস করলেন। যদি আবার বন্ধ করে দেন তাহলে কি করবেন?'

উত্তরে বললেন, 'আপনি তো জানেন টাকার জন্য বলতে আমার ঘৃণা হয়। ইচ্ছে হলে দেবেন, আর না হলে দেবেন না।'

এ কথা শুনে বললাম, 'বা-বা-বা। এইরকম না হলে কি চিরকালই আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে এই সব করতে সাহস পেতো। আপনি কি জানেন না যে রবিশঙ্করকে কি পরিস্থিতিতে ফেলেছিলাম, যার জন্য সে বম্বে আসতে বাধ্য হয়েছিলো?'

আমার কথা শুনে বললেন, 'বাবার মুখ চেয়ে আমি এ যাবৎ সব সহ্য করেছি এবং এখনও করছি, পাছে সকলের কাছে এটা একটা আলোচনার বস্তু হয়ে যায়। কিন্তু এখন তো পণ্ডিতজীর মতিভ্রম হয়েছে। তা না হলে কি নিজের বিকৃত মনের পরিচয় ফলাও করে লিখতে পারতেন?' বুঝলাম লেখাটা সম্পূর্ণ পড়েছেন। উত্তরে একটা কথাই বললাম, 'যাঁরা অতি বুদ্ধিমান মনে করে, তাঁদের জন্য একটা প্রবাদ আছে। অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি। একটা কথা বলুন তো? আপনাকে দিয়ে কি কোন কাগজে সই করিয়েছেন?' অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন?' উত্তরে বললাম, 'বহু চিন্তা করে এই কথাটা আগেই আপনাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে কোন কাগজে সই করতে বললে করবেন না।'

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আমি পণ্ডিতজীকে বলেছিলাম, মাসিক পত্রিকায় যখন সব লিখেছো তখন আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। কোর্টে আমি যেতে চাই না। যে পরিমাণ অর্থ তুমি আমাকে দিতে পারো, দিয়ে দিলেই স্বেচ্ছায় আমি ডিভোর্স দিয়ে দেবো। তোমার আনন্দে আমি বাধা দেবো না।' পণ্ডিতজী বোধ হয় আমার এ ধরনের প্রস্তাব আশা করেন নি। পণ্ডিতজী বলেছিলো 'ঠিক আছে তোমার যখন তাই ইচ্ছে, তখন একটা সই করে দাও কাগজে। আমি উকিলকে দিয়ে সব লেখাপড়া করিয়ে তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করব।'

এক নাগাড়ে এই কথা বলার পর বললেন, 'আপনি আমায় বলে দিয়েছিলেন বলে, আমি পণ্ডিতজীর উত্তরে বলেছিলাম, 'উকিল কি লিখবে, তা না দেখে সই করব কি করে? আমার কাছে পণ্ডিতজী বোধ হয় এ ধরনের কথা বলব, আশা করেন নি। পণ্ডিতজী আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করো না।' উত্তরে বলেছিলাম, 'আগে সকলকে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু এখন আর কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

এ কথা শুনে আমি বললাম, 'যাক জীবনে এই প্রথম বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছেন। যাক যা হবার হয়েছে। আপনার কথা শুনে পণ্ডিতজী কি বললেন?' উত্তরে বললেন, 'আমার কথা শুনে পণ্ডিতজী প্রসঙ্গ বদলে বললেন, যে তাঁর উপস্থিত দারিদ্র্য দশা চলছে, তাই উপস্থিত এক লাখ দেবেন, এবং কিছুদিন পরে আরো এক লাখ টাকা দেবেন।' এই কথা শুনে অবাক হলাম। বললাম, 'আপনি তো আমায় লিখেছিলেন, আমি যা করেছি সেই হিসেবে সব ব্যাপার ঠিক হয়ে গিয়েছে। টাকা আপনি ঠিক মত পাবেন। উকিলকে যেন এ ব্যাপারে পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে কোন চিঠি দেওয়া না হয়।'

উত্তরে বললেন, 'আমি জানি আপনার রাগ। এ কথা না লিখলে, আপনি অনর্থ করতেন।

আমি এ সব ভালোবাসি না। তাই আপনাকে ওই ভাবে লিখেছিলাম।' কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। পরমুহূর্তেই বললাম, 'উকিলের সামনে লেখাপড়া কি হয়ে গিয়েছে?' উত্তরে বললেন, 'এখনও হয় নি। পণ্ডিতজী উপস্থিত খুব ব্যস্ত আছেন। যতদিন না বিবাহ বিচ্ছেদ উকিলের সামনে হয়, ততদিন পণ্ডিতজী মাসে তিন হাজার টাকা করে দেবেন। উপরন্তু টেলিফোন, ইলেকট্রিক এবং সোসাইটির টাকা সব দেবেন। বাবার কথা ভেবে এতদিন আমি সব সহ্য করেছি কিন্তু লোক দেখান স্বামী স্ত্রী সেজে থাকার আর কোন মানে হয় না। তবে সকলকে জানিয়ে, কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স-এর মামলা করব না লোক হাসানোর জন্য। পণ্ডিতজী কয়েকদিনের জন্য বিদেশে গিয়েছেন। এবারে ফিরে এলেই বাড়ীতে উকিলের সামনে সব নিষ্পত্তি করব।'

যে দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা বললেন, তা শুনে বললাম, 'যখন স্থিরই করেছেন, বুঝতে পারছি আপনার মত বদলাবে না, তবে উপস্থিত এক লাখ টাকা দেবে, কিন্তু কিছুদিন পরে যদি বাকী একলাখ টাকা না দেয়, তখন কি করবেন?'

উত্তরে বললেন, 'আমার যদি টাকা থাকত, তা হলে এ টাকাও নিতাম না। কিন্তু যখন পণ্ডিতজীর টাকার অভাব, তখন ইচ্ছে হলে দেবেন আর না হলে দেবেন না। তার জন্য আমি কোন অভিযোগ করব না। তবে এটা ঠিক পণ্ডিতজীর সঙ্গে আর লোক দেখান সম্পর্ক কোন মতেই রাখব না।' কি জানি কেন আমার মনে হোল অন্নপূর্ণাদেবী স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। সে সিদ্ধান্ত আর বদলাবে না। যে মানুষ তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচার করেছে, যে মানুষ তাঁকে পদে পদে ঠকিয়েছে, তাঁর সঙ্গে আর কোন মতেই সম্পর্ক রাখবেন না। বাস্তব জগৎ-এ ফিরে এলাম অন্নপূর্ণাদেবীর কথায়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছেন?' উত্তরে বললাম, 'তার মানে বিচ্ছেদ অনিবার্য। যাক যা হবার তা তো হবেই, তবে খুব বুঝে, নিজের উকিলের সামনে, ঘাসওয়ালাকে মধ্যস্থতা করে যা করবার করবেন। তারপর কিছু হলে দেখা যাবে।' অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'চা খেয়ে বাড়ী যান। অকারণ মনের শান্তি বিঘ্নিত করবেন না।' যাওয়ার সময় হতাশ কণ্ঠে বললাম, 'এত অল্প অর্থের বিনিময়ে রাহু মুক্ত হলেন। শেষ জীবনের পাথেয়টা কি আছে?' উত্তরে বললেন, 'ঈশ্বরের অনুকম্পা আর আপনাদের শুভেচ্ছা।'

মনে মনে ভাবলাম, যদি আমি বম্বেতে থাকতাম, তাহলে কখনও এরকম হ'তো না। অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে বম্বেতে যদিও কিছু শিষ্য আসে শিখতে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কি আলোচনা করবেন? এ ছাড়া ছাত্রদেরও সাহস হয় না এই সব নিয়ে কথা বলতে।

যদি কেউ বোঝবার মত শ্রোতা পাওয়া যায়, একমাত্র তাঁকেই নিজের ব্যথার কথা শোনান যেতে পারে। কিন্তু এরকম শ্রোতা অন্নপূর্ণাদেবী কোথায় পাবেন? অবশেষে সেই দূরত্বই এলো এবং মনের শান্তি গেলো। কি বেদনাদায়ক।

জনবহুল বোম্বাই শহরটা হঠাৎ আমার কাছে নির্জন অরণ্য বলে মনে হতে লাগলো। ওখানকার নাগরিকরা নাকি সচেতন এবং মুখর। এঁরা জানতেই পারল না, যে তাঁদের শহরেই এক অবলা বিনা অপরাধে, বিচারের বাণীর মতো নীরবে অশ্রুপাত করছে। চোয়ালটা শক্ত

হলেও হাতের মুঠোকে আকাশে ছুঁড়তে পারলাম না। এ যেন প্রভুর আদেশে দুর্গেশ দুমরাজকে ত্যাগ করতে হচ্ছে। এটাকে স্বীকার করে নেওয়া থেকে তো মৃত্যুও ভালো।

জীবনে অভিজ্ঞতা হোল। যাঁরা ভালো মানুষ তাঁরাই কষ্ট পায়। যাঁরা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, যাঁরা মিথ্যাচারী, যাঁরা পরের সর্বনাশ করার চিন্তায় সব সময় অধীর, যাঁরা আত্মকেন্দ্রিক, তাঁরাই সুখে থাকে। সুখ তাঁদের একচেটিয়া। তাঁরা বাড়ী করে, গাড়ী করে, ঐশ্বর্যবান হয়, বিলাসের মধ্যে কাটায়। কিন্তু বাবার জীবনে কি দেখলাম? আর আজ কি দেখছি। যখন প্রাণের টান থাকে না, চক্ষুলজ্জার বালাই থাকে না, তখন আর আমার চিন্তা কিসের? আমি আর কাউকে পরোয়া করি না। চিন্তাজালকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে, পিত্তিজির বাড়ীতে বাজনা বাজাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। বম্বেতে এমন কেউ নাই, যাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলে মনের ভার একটু লঘু হতে পারত। এ সব বিষয়ে যে আমার যথার্থ পরামর্শ বা বুদ্ধিদাতা, সেই লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ ঘটনাক্রমে তখন প্রবাসে।

পিত্তিজির গাড়ী যথাসময়ে এলো। বাড়ীতে যাওয়া মাত্র, হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা চেক। এটা হোল ওনার পেট্রন শুল্ক। মনে হোল, ওটা নিয়েই অপেক্ষা করছিলেন। বিচিত্র আভিজাত্য। লোক দিলে অহঙ্কার করে, আর ইনি দিতে পেরে কৃতার্থ। বললেন, 'এবার তো আর দেখা হচ্ছে না, আপনার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।'

পরের দিন সকালে ব্রিজনারায়ণের কাছে গিয়ে, বাবার প্রকৃত শতবর্ষ সম্মেলন করছি বললাম। এ কথা শুনেই বললেন, 'কবে করছেন?' বললাম, 'বাইস, তেইস, চবিবশ ডিসেম্বার।' সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজনারায়ণ বললেন, 'হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনের তরফ থেকে আমিও উস্তাদের শতবার্ষিকী পালন করব।' ডায়েরি দেখে বললেন, 'একত্রিশ ডিসেম্বারে কি আপনি খালি থাকবেন?' বললাম, 'সে সময়ে আমার কোন কার্যক্রম নাই।' আমার কথা শুনে বললেন, 'শতবর্ষ উপলক্ষে যে আয়োজন করবো, তাতে আপনাকে প্রধান অতিথি করবো এবং সভাপতি করবো এল আই সির ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে।' সম্মতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই, সেক্রেটারিকে ডেকে সব আয়োজনের ব্যবস্থা করতে বলে, হলও বুক করতে বললেন। আমার উস্তাদ বাবার জন্য, ব্রিজনারায়ণ যা করলেন, তা দেখে আমি অবাক। যে কাজ বাবার পুত্র এবং জামাই-এর করা উচিত, কিন্তু তাঁরা নীরব। অথচ ব্রিজনারায়ণের মত সঙ্গীত প্রেমী, যাঁর শ্লোগান হল, 'জয় সঙ্গীত, জয় কলাকার'। তিনি বাবাকে কত শ্রদ্ধা করেন বুঝে, মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। ব্রিজনারায়ণের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বললেন, 'আপনার একটা রসিদ বই রেখে যান। আমি কিছু মেম্বার করে আপনার সারকেলের জন্য টাকা পাঠিয়ে দেবো।'

অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। ব্রিজনারায়ণের সম্পূর্ণ ঘটনাটা অন্নপূর্ণাদেবীকে খুলে বললাম। সব মলিনতার মাঝখান থেকে ওনার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যথার্থ সঙ্গীত আর বাবার মর্যাদা সম্পন্ন রূপ যখনই অন্নপূর্ণাদেবীর সামনে প্রকাশ পেয়েছে, তখনই তাঁকে এই সব লোকের সংকীর্ণতার, দীনতার উর্দ্ধে, অমৃতলোকের বাসিন্দা বলে মনে হয়েছে।

যাবার তাড়া। তাই উঠে পড়লাম। বললাম, 'আমার কোন কথাই তো শোনেন না

এবারেও শুনলেন না। যুক্তই ছিলেন না, তাই বিচ্ছেদটা আমার কাছে খুব বেদনার নয়। কিন্তু একটা সম্ভাব্য খরচের কথা ভেবেই, আমি আশা করেছিলাম আপনি লাখ ছয়েক টাকায় অঙ্গীকৃত হবেন। কারণ প্রথমে ভেবেছিলাম, মাসিক পাঁচ হাজার টাকার ব্যয় ভার ওঁর বহন করা উচিত। ব্যবস্থাও তাই করেছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। আপনি বিস্বাদের বিরক্তিকর অস্তিত্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়ে, শঠের শঠতার শিকার হলেন। আর সব পথ বন্ধ করে রেখেছেন, যাতে আমি নিষাদকে বলতেও না পারি, মা নিষাদঃ।'

স্মিত হেসে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আপনি বাবার প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। উত্তেজনা বাড়িয়ে বাবার নামে যে কর্মযজ্ঞে নেমেছেন, তার ক্ষতি করবেন না।' এ কথা শুনে শুভাশিষ মাথায় করে যাত্রা করলাম। চিতা মৃতকে দগ্ধ করে, আর চিন্তা জীবিতকে সর্বদা দগ্ধ করে। নিজের শংকা, আর অনিশ্চয়তার কাঠ, রসদ যুগিয়ে চলে। এ যজ্ঞে যজ্ঞ, অগ্নি, পুরোহিত আর সমিধ নিজেকেই হতে হয়। আমারও তাই। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনের শায়িকা আমার কাছে সঙ্গীত দগ্ধ বলে মনে হতে লাগলো। নিজের উপর রাগ হোল, যখন দেখলাম প্রায় মাঝ পথ বসা অবস্থায়, ঘামতে ঘামতে এসেছি। ষোল ডিগ্রির তাপনিয়ন্ত্রণ অচিরাৎ ভেঙ্গে পড়ে, তখন আমার মনে হয় আটচল্লিশ ডিগ্রির অনুভূতি সৃষ্টি করছে। কিন্তু কেন, তা খোলসা না করলে ঠিক বোঝানো যাবে না।

ট্রেনে বসবার কিছুক্ষণ পরেই নানা চিন্তা আলোড়নের সৃষ্টি করল। কাশীতে গিয়েই বাবার শতবার্ষিকীর কাজে লাগতে হবে। শ্যাম গাঙ্গুলি শতবার্ষিকী করছেন। কোলকাতায় গিয়ে ডোনার, অনুদান সভ্য করবার জন্য, কার কার সঙ্গে দেখা করলে কাজ হবে, চিন্তা করতে লাগলাম। এ যাবৎ যেখানেই বাজাতে গিয়েছি, অকল্পনীয় সহযোগিতা পেয়েছি। তিনটে মাসের আগেই কাশীতে সব ব্যবস্থা করতে হবে। কাশীর কনফারেন্সের আগে কোলকাতায় যেতে হবে, আবার কাশীর কনফারেন্স শেষ হবার পরেই, আবার বম্বে যেতে হবে। এই সব চিন্তা করতে করতে, কখন যে মনটা বম্বেতে চলে গিয়েছে খেয়াল নাই।

সামান্য অসহযোগিতার জন্য এতদিনের আইনকানুন একেবারে ভেঙ্গে চুরে তছনছ হয়ে গেল। এমনিই হয়। কারণ সবাই তো সংসারের নিয়মের সঙ্গেই মানিয়ে নেয়। সংসারের সঙ্গে আপোষ করে চলেই সবাই সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারলে বর্তে যায়। কিন্তু এমন লোক সংসারে জন্মায়, যাঁরা সংসারের নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে না চলে, সংসারকেই নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। লোকে এদেরই বলে বেহিসেবী অথচ এই বেহিসেবী লোকগুলোর মধ্যে, আমাদের এই পৃথিবীটা এগিয়ে চলে। তাঁদের অমানুষিক কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়েই, পরবর্ত্তী যুগের অনেক সমাচার আর অনেক অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে। অন্নপূর্ণাদেবীও বোধ হয় এমনি এক বেহিসেবী স্ত্রী। তাঁর সৃষ্টিকর্তার এ কি নির্দয় পরিহাস।

শান্তিপ্রিয় লোকেরাই বোধ হয় এ যুগে সবচেয়ে কৃপার পাত্র। সত্যি বলতে কি, তাঁদের একুলও নাই, ও কুলও নাই। তাদের সততাই তাঁদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাঁদের সততাকে লোকে নির্বুদ্ধিতা বলে ধরে নেয়। যেহেতু তাঁরা শান্তিপ্রিয়, তাই তাঁরা কোন বাদ প্রতিবাদে

যেতে চায় না। তার ফলে যাঁরা চতুর তাঁরা সরলতার সুযোগটা নেয়। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। অবাক হয়ে ভাবি দীর্ঘদিন কি ভাবে জীবন যাপন করছেন এবং ভবিষ্যৎ-এও করতে হবে। এ এক এমন জীবন, যাকে গ্রহণ করা চলে না আবার বর্জন করাও চলে না। নিজের জন্মভূমি, নিজের বাড়ী থাকা সত্ত্বেও, সকলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। কেউ এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান না। মনে হয়, নিজের বোঝায় তিনি নিজেই ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। আঘাতে, আঘাতে, এ পর্যন্ত অনেক কল্পনা মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ছেলে যাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে বড় পুঁজি, সেও চলে যাবার পর এখন শেষ পুঁজিতে টান ধরেছে এবার।

কিন্তু কেন এই অঘটন ঘটলো? ভালো কমোডিটি বুঝেই উদয়শঙ্কর নিজের ছোট ভাইএর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে নির্বাচন করেছিলেন অন্নপূর্ণাদেবীকে। কিন্তু অতি বুদ্ধিমান হয়েও তিনি বুঝতে পারেন নি, যে তাঁর ছোট ভাই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ভুগবে। একই প্রফেসানে স্বামী স্ত্রী থাকলে, যদি স্ত্রীর যশ বেশী হয়, তাহলে স্বামী হীনমন্যতায় ভোগে। এখানেও তাই হয়েছে। অন্নপূর্ণাদেবীকে বাধ্য হয়ে দিল্লী, ম্যাড্রাস এবং বম্বেতে বার পাঁচেক বাজাতে হয়েছে যুগলবন্দী। আর এই বাজনাটাই কাল হয়েছে। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে অন্নপূর্ণাদেবীকে। হীনমন্যতার বীজ প্রায় তিরিশ বছর আগেই বপন হয়েছিলো। অন্নপূর্ণাদেবী সেটা বুঝতে পেরেই, লোকেদের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও একত্রে বাজনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বহু দিন আগেই। কিন্তু হীনমন্যতায় যে ভোগে, সে কি কখনও ভুলতে পারে? ভুলতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

পৃথিবীতে স্বামী ও স্ত্রী একই প্রফেসানে থাকলে, দ্বন্দ্ব অনিবার্য। দ্বন্দ্ব সেখানে হয় না যদি স্ত্রী কমজোর হয়। সে ক্ষেত্রে স্বামী নিজেকে সুপিরিয়ার ভেবে গৌরব অনুভব করে। মনোবিজ্ঞানে সেই জন্য স্বামীর, স্ত্রী নির্বাচনে বহু নিয়ম পালন করতে বলেছে। পৃথিবীর সর্বত্র এক পেশাতে যেখানে স্ত্রী বড়, সেখানেই মনান্তর, মতান্তর এবং বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। একটা সামান্য ঘটনার কথা বললেই লোকে বুঝতে পারবেন। আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড় ক্রিস এভার্ট ডিভোর্স করেছিলো ইংলণ্ডের স্বামী জন লয়েডকে। যে সফলতা ক্রিস পেয়েছিলো, তার শতকরা পাঁচ লয়েড পাওয়াতে বিপর্যয় হয়েছিলো। লয়েড হীনমন্যতায় ভুগতে লাগলো। পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রিস-এর স্থান হয়েছিলো চতুর্থ পর্যায়ে। মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা, স্টেফিগ্রাফ, হানা মাণ্ডালিকোভার পরে স্থান হয়েছিল ক্রিসের। তাই নিজের থেকে ভাল খেলোয়াড়কে বিয়ে করার ফলে লয়েড-এর বিবাহ সুখের হয় নি। এই ব্যাপারটা হয়েছিলো রবিশঙ্করেরও। এখানে সর্বোচ্চ স্থানে থেকেও অন্নপূর্ণাদেবী বাজনা বাজান বন্ধ করে দিয়েছিলো স্বামীর জন্য। তা সত্ত্বেও বিচ্ছেদের পর্যায়ে এসে পড়েছে। তার আর বেশী দেরী নাই।

রাত্রে সকলেই ঘুমোচ্ছে ট্রেনের মধ্যে। কিন্তু নানা আবোল তাবোল জিনিষ আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে। মানুষ যখন ইহজীবনে ব্যর্থ কাউকে দেখে, তখন পূর্ব জন্মের দোহাই দেয়। যতটা দেখেছি এবং শুনেছি অন্নপূর্ণাদেবী সম্বন্ধে, চিরকালটাই পরের উপকারই করেছেন। তাহলে জীবনে এত কষ্ট কেন? এ কি অভিশাপ তাঁর জীবনের? এ কি গত

জন্মের পাপের ফল? নইলে এটা কেন হোল? স্বামী থেকেও স্বামী নাই। ছেলে থেকেও ছেলে নাই। অর্থ থাকলেও সামর্থ নাই। যৌবন থাকলেও ভোগ নাই। যতবারই এই কথা ভাবি, একটা বিরাট সংশয়ের সম্মুখীন হই। যদি সাংসারিক জীবনের দুঃখের কারণটা ওনার গতজন্মের কর্মফল হয়, তাহলে কি করে এই নৈসর্গিক সঙ্গীতের অধিকারিণী উনি। এতো একাধিক জন্মের সুকৃতি ভিন্ন সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবি, ইহকাল বলে যা আছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমার যথেষ্টই আছে। কিন্তু পরকাল বলে সত্যিই কি কিছু আছে? আমি জানি না। কিন্তু হে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা, সত্যিই যদি পরকাল, পরজন্ম বলে কিছু থাকে, তবে অন্নপূর্ণাদেবী যেন এরকম মনোকষ্ট না পান।

একজন যখন চারদেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে, অপর জন বিদেশে তাঁর বিদেশিনী নর্মসহচরীর সঙ্গে রাত্রি কাটাচ্ছে। স্বদেশে, নর্মসহচরী, আর বিদেশে এক বিদেশিনী, টাকার জন্য নর্মসহচরী খুব এডজাস্ট করতে পারে। তুমি ভেবেছিলে, সকলের তালে, তাল না দিয়ে তুমি অক্ষয় কীর্তি রেখে যাবে। শুধু তোমার ভুল হয়, তোমার অন্যায়ও হয়েছিলো। পৃথিবী তোমাকে তা হতে দেবে না। তোমার বোঝা উচিত ছিলো, তোমার ভুলের জন্য এঁরা ভুগবে না, তোমার অন্যায়ের ভাগ এঁরা নেবে না। বাবু, বাবু। হঠাৎ বেয়ারার আওয়াজে আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। দেখি চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে বেয়ারা। তবে কি স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ? অবাক হই। ধড়মড়িয়ে উঠলাম। মনে হোল আমার মাথায় যেন পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। এই প্রকার মনের অবস্থাতেও কাশীতে পৌঁছেই বাবার শতবার্ষিকী আয়োজনে মন দিতে হোল। কাশীতে আসার পরই কোলকাতার সদারং কনফারেন্সে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। কনফারেন্সের শেষ দিন পাঁচই ডিসেম্বারে সারারাত্রি বাজাতে হবে। অথচ শ্যাম গাঙ্গুলিও বাবার শতবর্ষ করছেন পাঁচই ডিসেম্বারে সারারাত্রি। সমারোহের শেষ আমাকে দিয়েই হবে। যাক সদারঙ্গে বাজাব বলে স্বীকৃতি জানালাম।

কাশীতে আসবার পর যে বিরাট দায়িত্ব মাথায় এসে পড়ল, দিশেহারা হয়ে পড়লাম। মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের কথাটা মনে পড়ল। শতবর্ষ করবার পরিকল্পনা বছরের প্রথমে যখন হয়েছিল, বীরভদ্র মিশ্র বলেছিলো, কোন মহৎ কাজ যদি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে করবার বাসনা থাকে, তার জন্য কোন কিছুই আটকায় না। কথাটা ঠিক। আমার মত ঘরকুনো লোক, কি করে এই দুরুহ কাজ করবার প্রেরণা পেলাম, ভাবলেও অবাক হতে হয়। পরে মনে হয়েছে, বাবাই অলক্ষ্যে আমাকে দিয়ে এতবড় কাজ করিয়ে নিয়েছেন। তা না হলে অযাচিতভাবে একটার পর একটা সুযোগ কি করে পেলাম?

৬৮

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। উপস্থিত একমাত্র কাজ টাকার যোগাড় করা। বাবার শতবার্ষিকী করছি বলে কাশীর অনেকেই নিজের থেকে এসে সভ্য হোল। যে যে স্থানে বাজাতে গিয়েছি, সেখানেই ডোনার এবং অনুদান পেয়েছি। প্রত্যেক জায়গায় সভ্য হবার জন্য এক একটি লোককে রসিদ বই দিয়ে এসেছি। এ ছাড়া কাশীতে দুইজন অনুরাগী, নাম মাত্র টাকায় সভ্য করতে লাগলো। তিনদিনের সঙ্গীত কার্যক্রমের জন্য শিল্পীর তালিকা মনে মনে ঠিক করলাম।

সঙ্কট মোচনে যে হেতু প্রতিবছর সঙ্গীত সম্মেলন হয়, সেইজন্য মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রকে তিন জন শিল্পীকে ঠিক করবার জন্য বললাম। যদিও আমার সঙ্গে প্রত্যেকেই পরিচিত, কিন্তু একটা নূতন পরিকল্পনা ঠিক করে বীরভদ্র মিশ্রকে বললাম। বীরভদ্র মিশ্র তিনজন শিল্পীকে লিখলেন। মনে মনে স্থির করলাম, কোলকাতায় যখন যাব সেইসময় সাত আটজন শিল্পীকে ঠিক করব।

সময় তো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। মহন্ত, বীরভদ্র মিশ্রের কাকা পণ্ডিত অমরনাথ মিশ্রের প্রথম মৃত্যু তিথি, ঊনত্রিশ নভেম্বরে একটি সঙ্গীত সভার আয়োজন করা হোল। যেহেতু অমরনাথ মিশ্র আমার ছেলেকে খুব স্নেহ করতেন, সেইজন্য মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র, আমার ছেলেকে বাজাবার জন্য বললেন। যদিও ইচ্ছা ছিলো না, তাহলেও রাজী হলাম একটাই কারণে। মনে পড়লো শুভোর কথা। শুভ যদি একবার বাজাত, তাহলে কেউ তাকে বিপথে চালিত করতে পারতো না। আমার ইচ্ছা ছিলো, ছেলে লেখাপড়ায় সর্বোচ্চ উপাধি পাবার পর, একটা চাকরি করবে, এবং সঙ্গীতকে অবসরের সাথী করবে। বীরভদ্র মিশ্রর ছেলে বিভূতিনারায়ণ মিশ্র, ছোট থেকেই অমরনাথ মিশ্রের কাছে মৃদঙ্গ শুরু করেছিলো। সে মাঝে মাঝে আমার ছেলের সঙ্গে বাড়ীতে এসে বাজাত। আমার ছেলের ঝোঁক কঠিন কঠিন তালে। সাড়ে পনেরো, সওয়া তেরো এবং পৌনে বারমাত্রায় তিনটি গৎ বাজিয়ে, কাশীতে একদিনেই সঙ্গীত মহলে পরিচিত হোল। ছেলেকে একটিই কথা বললাম, 'লোকেদের প্রশংসায় ভেবো না খুব ভাল বাজিয়েছ। এখনও বহু শিখতে হবে। যদি ঠিকমতো শিখতে পারো, তাহলেই বাজাবে।'

ফ্রান্স থেকে যে ছাত্রটি এসেছিল, তাঁর ভিসা শেষ হওয়ায়, ফিরে যাবার আগে বলল, 'দশ মাস পরে আবার আসব।' ছাত্রটির নিষ্ঠা আছে। তিন মাসের মধ্যে সরোদে যতটা শিক্ষা পেয়ে সাধনা করেছে, অকল্পনীয়। ছাত্রটি চলে গেল। এবারে আমার কোলকাতায় যাবার সময় হয়ে এসেছে।

কোলকাতায় বাজনার কয়েকদিন আগেই গেলাম। আগে যাবার উদ্দেশ্য, কিছু ডোনার এবং অনুদান যাতে সংগ্রহ করতে পারি। আগে যাওয়া আমার সফল হোল। আশাতীত ডোনার এবং অনুদান পেলাম।

বাজনা নিয়ে বিপদে পড়লাম। শ্যাম গাঙ্গুলি বাবার শতবার্ষিকীতে সারারাতের প্রোগ্রামের মধ্যে সাতটি প্রোগ্রাম রেখেছেন। সর্বশেষ প্রোগ্রাম আমার রেখেছেন। এ দিকে সদারঙ্গ কনফারেন্সে সারারাত্রির অনুষ্ঠানে আমার বাজনার পর ভীমসেন যোশীকে দিয়ে শেষ করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সদারঙ্গ সম্মেলনের সেক্রেটারিকে অনুরোধ করলাম, আমার প্রোগ্রামটা রাত্রি বারোটার সময় রাখতে। আমার পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কালিদাস সান্যাল সেই ব্যবস্থা করলেন।

রাত্রে সদারঙ্গ বাজিয়ে বাড়ীতে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। ঘুম এলো না। রাত তিনটে নাগাদ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী এল। গিয়ে দেখলাম ইন্দ্রনীল বাজিয়ে শেষ করেছে। ইন্দ্রনীলকে কাশীতে আসবার জন্য বললাম। সানন্দে আসবে বললো। তারপর গান হবে

এবং সর্বশেষে আমার বাজনা। আমার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করল শ্যামল বোস। বাজনার শেষে মনে হোল, কাশীতে শ্যামল বোস এবং শঙ্কর ঘোষ কখনও যায় নি। সুতরাং শ্যামল বোস এবং শঙ্কর ঘোষকে কাশীতে আসবার জন্য বললাম। সানন্দে দুজনেই রাজী হোল। বাজাবার পর শ্যাম গাঙ্গুলি আমাকে একটা সুভ্যেনির দিলেন।

সব কাজ সেরে দুপুরের পর বাড়ীতে এসে সুভ্যেনিরটা উলটে পালটে দেখলাম। বেশ ভালো লাগলো। যাঁরা কর্তাব্যক্তি বাবার ছাত্র, তাঁরা সন্তর্পণে উপস্থিতি এড়িয়ে সত্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন। কিন্তু যাঁরা আমার চতুর বন্ধুদের অনুগামী, তাঁরা তো অতোটা চতুর নয়, তাই বুদ্ধিজীবীর মত কাগজ কলমে এই শতবর্ষ পালনটাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, আর তা করতে গিয়ে নগ্ন হয়ে পড়েছেন। কেউ লিখেছিলো, যেহেতু শতবর্ষ নয়, তাই বাজাব না, কারণ শতবর্ষ উনিশশো বাষট্টিতেই পালন হয়ে গিয়েছে। একজন আবার লিখেছেন টাকা চাই।

মজার কথা হোল শতবর্ষ না হোক, অব্যবসায়িক স্বার্থে বাবার স্মৃতি সমারোহ হিসাবেও, যদি তাঁরা এটাকে স্বীকার করতেন, তাহলেও স্বাভাবিক ছিলো। যাক শ্যাম গাঙ্গুলি একটা ভাল কাজ করেছেন। নিজের মতামত প্রকাশ না করে কটুক্তি আর ব্যঙ্গোক্তিকে এড়িয়ে সুন্দর ভাবে ওঁদের চিঠিগুলোকেই ছেপে দিয়েছেন যা পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন এঁরা কী? খুব ভাল লাগল, তাই ফোন করে শ্যাম গাঙ্গুলিকে অভিনন্দন জানালাম।

কাশীতে পৌঁছে দেখলাম অনেক কাজ এগিয়েছে। বাবার নামে শতবার্ষিকী করব। সুতরাং এমন না হয়, যা দেখে লোকে টিটকিরি দেয়, কেননা নিন্দুকের তো অভাব নাই। ইতিমধ্যে বিকেলে চিঠি এলো অন্নপূর্ণাদেবীর। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

3rd 1981

আপনার চিঠি পেয়েছি।

উত্তর দিতে দেরি হোলো, কারণ বাইরের থেকে অনেক লোক শিখতে এসেছে। তার পর প্রোগ্রামের নানান কাজ, মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। তার পর কয়দিন ধরে হাঁফানি, জ্বর এই সব চলছে। আপনার চিঠি পড়ে আমার শরীর খারাপ হয় না। শুধু অশান্তিকে আমি ভয় পাই আর বাজে জিনিস নিয়ে অসুবিধে করতে চাই না। সহজ সরল জীবন কাটাতে চাই। লেখা পড়া কিছুই হয় নি পরে হবে, এখন হয় কিনা তাও জানি না। আর এই নিয়ে কিছু ভাবতেও চাই না। যা হবার হোক। আমার বাঁচবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। এটাই প্রবল দিনে দিনে হচ্ছে। এই একটি জিনিস আমাকে শান্তি দেবে। আপনাকে এই সব বাজে জিনিষ, ঝগড়ার থেকে দূরে রাখতে চাই। যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে কেউ তাকে পাল্‌টাতে পারে না, আমার এই বিশ্বাস। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন? আমার শুভেচ্ছা, আশির্ব্বাদ আপনারা সবাই নেবেন।

ইতি—
বৌদি

শতবার্ষিকীর কার্যক্রমের বিবরণ এবং কোলকাতার সব খবর জানিয়ে আশীর্বাদ চেয়ে

পাঠিয়েছিলাম, যাতে সুষ্ঠু ভাবে কাজ হয়ে যায়। তারই উত্তর এসেছে। কিন্তু চিঠি পড়ে অবাক হলাম। এ কি লিখেছেন? বুঝলাম, বাবার নামে যে একদিনের কনফারেন্স করেন, তার জন্য ব্যস্ত আছেন। আমার পাঠান পূজা সংখ্যা পড়বার সময় পান নি। হাঁপানি, জ্বর হয়েছে। এর মধ্যে অনেক ছেলে শিখতে এসেছে সুতরাং মাথা খারাপ হবার জোগাড় স্বাভাবিক। কিন্তু এ সব কথাগুলি পড়ে অবাক হই নি। অবাক হলাম, চিঠিটার একটা লাইন আমায় চিন্তিত করে তুললো। এ কথা কেন লিখেছেন, আমার বাঁচবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। ওটাই দিনে দিনে প্রবল হচ্ছে। এ আবার কি হোল? মনে নানা কথা আসতে লাগল। কি হ'তে পারে?

চিঠি লিখে জানালাম, কোন চিন্তা না করতে। কোলকাতা থেকে আজই ফিরেছি। কাশীতে বাবার শতবার্ষিকী করেই, তিরিশ ডিসেম্বরে ব্রিজনারায়ণ যে বাবার শতবার্ষিকী করছেন, তার জন্য যাব। বম্বে পৌঁছে সব কথা শুনব। কোন ব্যাপারে নিরাশ হবেন না। বিবাদের সঙ্গে লড়াই করার নামই জীবন। চিঠিটা লিখে পাঠাবার পর মনে হোল ভীষণ ফ্রাসটেশন না হলে, এ প্রকারের চিঠি তো লিখতে পারেন না? মনের এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যেও আমাকে বাধ্য হয়ে বাবার শতবার্ষিকী কাজে মনোযোগ দিতে হোল।

মনে মনে ঠিক করলাম চীফ গেস্ট করব বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত ঠাকুর জয়দেব সিংকে। তিনি একাধারে সঙ্গীত, দর্শন, সাহিত্যের পণ্ডিত এবং মিউজিকোলজিষ্ট। খবর পেলাম, নানা কনফারেন্স থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হলেও যান না। কিন্তু আমি সরাসরি তাঁর বাড়ী গিয়ে আমার সম্মেলনের উদ্দেশ্য বলায় রাজী হলেন। সভাপতি ঠিক করলাম, বয়োবৃদ্ধ ডাক্তার কৌশলপতি ত্রিপাঠিকে, যিনি কাশীর সঙ্গীত পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। যদিও তিনি উপস্থিত কোথাও যান না, কিন্তু বাবার নামে সম্মেলন হচ্ছে জেনে রাজী হলেন।

কোথা দিয়ে যে সব কিছু যোগাড় হয়ে গেল তা অকল্পনীয়। আমার পরিচিত, বাবার ভক্ত কল্যাণ নামে এক চিত্রকর, নিজের থেকে আমার কাছে এসে বলল, 'আমাকে একটা বাবার ছবি দিন। আমি বিরাট আকারে বাবার একটা তৈলচিত্র করে দেব, যা স্টেজে থাকবে।' কিছুদিনের মধ্যেই তৈল চিত্রটি আমার কাছে নিয়ে এল, দেখে মুগ্ধ হলাম। একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

যে মুহূর্তে কনফারেন্সের খবর বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের খুব নামী স্টেজ ডেকরেটর এস. এন. সিং আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, 'বাবার স্মৃতিতে আমি সম্পূর্ণ হল এবং স্টেজ, রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবো।' নামটির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। এ কথা জানা ছিল, কাশীর এক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের কাছে যে দশহাজার চেয়েছিলো। কাশীতে সব ফুল পাওয়া গেলেও, রজনীগন্ধা পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও কখনও দুই তিনটি স্টিক পাওয়া যায়। মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও আমার অক্ষমতার কথা জানালাম। ডেকরেটার বলল, 'কোলকাতা থেকে রজনীগন্ধা নিয়ে আসব। আপনি টাকার কথা চিন্তা করবেন না। কেবল ফুলের দামটা দেবেন। বাবার মত বরেণ্য সঙ্গীতজ্ঞের জন্য এটা করতে পারলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করব।' তিনি এই কথা বলে স্টেজ এবং হলের

ডেকরেশনের কয়েকটা চিত্র দেখালেন। দেখে মুগ্ধ হলাম। একটা প্যামপ্লেটে স্টেজ এবং হল সাজাবার জন্য যে টাকা নেন তা দেখে আর সাহস হোল না। যতই তিনি বলুন, ফুলের দাম দিলেই করে দেবেন, কিন্তু আমারও তো একটা নৈতিক কর্তব্য আছে। যতই হোক এটাই তাঁর পেশা। বোধ হয় আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, আমার পরিস্থিতিটা বুঝলেন। বললেন, 'এই মহৎ অনুষ্ঠানে, আমি সুন্দর করে স্টেজ এবং হল সাজিয়ে দেব। আপনি পয়সার জন্য একটুও চিন্তা করবেন না। টাকা সারা ভারতবর্ষে পাই। আপনার অনুষ্ঠানে আমি ডেকরেশন করে ভাবব, বাবার উপর আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। তবে একটা অনুরোধ, কনফারেন্সের দিন সকাল থেকে আমি যেন হলটা পাই। সন্ধ্যার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সাজিয়ে দেব।' সকলের সঙ্গে আলোচনা করে রাজী হলাম।

সম্মেলনের আয়োজনে সকলেই সাহায্য করতে নিজের থেকে এগিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে কনফারেন্সের সময় এগিয়ে এল। আমি জানতাম না, আমার সেই অনুজপ্রতিম সাংবাদিকদ্বয়, আমার অজান্তে কি কি অঘটন ঘটিয়েছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা ফোন পেলাম। আমার একটা প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা ওঁরা করেছে। আমার তরফ থেকেই, ওঁরা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছে যদিও আমি জানি না। এর থেকেও একটা বিস্ময়কর খবর ওঁরা দিলো। তা হোল কাশীর জনা পঞ্চাশেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক নাকি স্বেচ্ছায় এই শতবর্ষ পালন অরগাইনাজিং কমিটির সদস্য হয়েছেন।

যাক, প্রেস কনফারেন্সে ওঁদেরই নির্দিষ্ট স্থান, মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের বাড়ী পরদিন যথা সময়ে পৌঁছলাম। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বললাম, 'ভুলক্রমে বাবার শতবার্ষিকী, আমার অজান্তে বা আমাকে এড়িয়ে, উনিশশো বাষট্টি সনে হয়েছিল, যে কথা আমার ইংরেজী বই 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন এনড হিজ মিউজিক' বইতে লিখেছি। সে বই আপনারা পড়েছেন এবং তার রিভিউ করেছেন। তা সত্ত্বেও, অনেক রথী মহারথী ইতিহাসকে স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁরা বোধ হয়, এক ইংরেজ মনীষীর কথা ভুলে গিয়েছেন 'উই লারন ফ্রম হিস্ট্রি দ্যাট উই ডু নট লারন ফ্রম হিস্ট্রি।' তাই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হিস্ট্রি ইজ পাস্ট পলিটিকস, এনড পলিটিকস ইজ প্রেজেন্ট হিস্ট্রি।' ইতিহাসকে বিকৃত করা আমার মতে মস্ত অপরাধ। প্রাচীনকালে যত মহামনীষী সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কথাও ইতিহাসে নানা ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগেও, যদি আমরা উস্তাদ বাবার ইতিহাস বিকৃত করি, তাহলে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা আমাদের ক্ষমা করবেন না। তাই সংশোধন করবার জন্যই, প্রকৃত শতবার্ষিকী করছি। এর বেশী আমার আর বলার কিছু নাই।'

উস্তাদ আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেলের সেক্রেটারি মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র বললেন, 'শতবার্ষিকী করার কারণ আপনারা শুনলেন। তবে এই সারকেল স্থাপনা করার অন্য মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য যদি আমরা সাধন করতে পারি, তাহলে এই ঘরাণা দীর্ঘজীবি হয়ে থাকবে। সেটা সময়সাপেক্ষ।'

এরপর সাংবাদিকরা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের কনফারেন্সে কারা কারা

আসছেন?' উত্তরে বললাম, 'বাবা ধ্রুপদ ঘরাণার শিষ্য ছিলেন। আজকাল কোন কনফারেন্সে ধ্রুপদ শোনা যায় না। সেইজন্য তিনদিনের কনফারেন্সে দুইদিন ধ্রুপদ গান রেখেছি। এ ছাড়া এ যাবৎ যা কখনও হয় নি, তা আমাদের সম্মেলনে হবে। উড়িশি নৃত্যের আচার্য কেলুচরণ মহাপাত্র কোন সম্মেলনে অংশ নেন না। তাঁর ছাত্র ছাত্রীরা ইদানিং সব জায়গায় নাম করেছে। আমাদের সম্মেলনে এই প্রথম কেলুচরণ মহাপাত্র, তাঁর শিষ্যা সংযুক্তা পানিগ্রাহীর সঙ্গে যুগল নৃত্য করবেন। এ ছাড়া আর একটি নৃত্যের অনুষ্ঠান রেখেছি, যা না কি এ যাবৎ হয় নি। স্বপ্নাসুন্দরী (কুচিপুড়ি নৃত্য) এবং তাঁর স্বামী বিজয়শঙ্করের (কথক নৃত্য) যুগল নৃত্য হবে।'

সম্মেলনের দুদিন আগেই শিল্পীদের আসা শুরু হোল। সম্মেলন শুরু হল বাইশে ডিসেম্বার। সম্মেলন শুরু হবার আগেই ঠাকুর জয়দেব সিং এবং ডাক্তার কৌশলপতি ত্রিপাঠিকে গাড়ী করে আনতে গেলাম। সম্মেলনে যাবার পথে, ঠাকুর জয়দেব সিং আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সারকেল খোলার অন্য কিছু উদ্দেশ্য আছে নাকি?' বললাম, 'আপনি তো আমার ইংরেজী বইটি পড়েছেন। প্রকৃত শতবর্ষ এইবছরই, সেই হিসাবে সম্মেলন করছি। তবে সারকেল খুলবার একটা উদ্দেশ্য আছে। জানি না কতটা সফল হবো। আমাদের সারকেলের উদ্দেশ্য হবে, গুরু শিষ্য পরম্পরা শিক্ষাপদ্ধতির প্রচার, এবং প্রসার লাভের চেষ্টা করা। স্কুল, কলেজ থেকে শিক্ষা করে কেউ গায়ক বা বাদক হতে পারে না। কেননা শিক্ষার গোড়ায় গলদ, ভুল প্রসপেকটাস-এর জন্য। একটি নূতন শিক্ষার্থী এক বছরেই দশটা রাগ শেখে। তা তো আপনার অজানা নয়।' এই কথা বলতে বলতেই আমরা নাগরি নাটক মণ্ডলির হলে পৌঁছে গেলাম। হলের ভিতর ঢুকেই মঞ্চ এবং হলের ডেকরেশনের সঙ্গে রজনীগন্ধার সুবাসে, মুগ্ধ হয়ে দুজনেই বললেন, 'বা! এ তো ইন্দ্রপুরীতে এসেছি।'

যথাসময়ে সম্মেলন শুরু হোল। সম্মেলনের উদ্বোধন করে ঠাকুর জয়দেব সিং বললেন, 'স্কুল কলেজের সঙ্গীত শিক্ষায় কোন শিক্ষার্থীই মঞ্চে গান, বাজনা এবং নৃত্য করতে পারে না। স্কুল কলেজে শিক্ষার সঙ্গে কেউ যদি দীর্ঘদিন ভাল ভাবে শিক্ষা করে, তবেই সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। উস্তাদ আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেলের উদ্দেশ্য শুনে, আমি আলোর সঞ্চার দেখতে পেয়েছি। গুরু শিষ্য পরম্পরা শিক্ষাতেই কেউ কুশলী সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংস্থা খোলা হয়েছে, তার জন্য সাধুবাদ জানাই। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব একজন সাধক ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। সেই উচ্চ সাধকের শতবর্ষ পালন হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে আমাকে যে ডাকা হয়েছে, তার জন্য আমি কৃতার্থ।' সেক্রেটারির সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর, আমি সংক্ষেপে একটি কথাই বললাম, 'গুরু শিষ্য পরম্পরায় খুব বড় বিদ্যালয়ের দরকার নাই। আবার খুব ছোট হলেও চলবে না। দেরী এবং ভুল যা হবার হয়ে গেছে।' সুতরাং আজ থেকে সংকল্প নিয়েই গুরু শিষ্য পরম্পরার কাজ শীঘ্রই শুরু করব।' আমার ভাষণের পরই কার্যক্রম শুরু হোল। প্রথম দিন শ্রীমতি সুমিত্রা মিশ্রর কথক নৃত্য দিয়ে শুরু হোল। তারপর যশরাজ-এর গান। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতার, নসির অহমদ এর গান এবং সর্বশেষে শ্যাম গাঙ্গুলির সরোদ দিয়ে প্রথমদিনের কার্যক্রম শেষ হোল।

দ্বিতীয় দিন, প্রথম কেলুচরণ মহাপাত্র এবং সংযুক্তা পানিগ্রাহীর যুগল নৃত্য, রাম চতুর মল্লিক এবং অভয় মল্লিক এর যুগল ধ্রুপদ গান, মনিলাল নাগের সেতার, বাগেশ্রী দেবীর গান, এবং সর্বশেষে বাবার ভাইপো বাহাদুর খাঁর সরোদ বাদন দিয়ে সমাপ্তি হোল।

তৃতীয় দিন স্বপ্না সুন্দরী এবং বিজয় শঙ্করের যুগল নৃত্য। সিয়ারাম তিওয়ারির ধ্রুপদ গান, রবিন ঘোষ এবং আমার ছাত্র দীপক চক্রবর্তীর দ্বৈত বেহালা এবং সেতার, শ্রী কান্ত বাখরের গান এবং সর্বশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি বাজালাম। চার রাত্রি জাগরণ, শিল্পীদের ট্রেন থেকে নিয়ে আসা, হোটেলে পৌঁছে দেওয়া, তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব এ সবই আমাকে করতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে বাজালাম। কিছু টাকা বাঁচাবার জন্যই আমাকে বাজাতে হোল। আমার জায়গায় অন্য কেউ বাজালে, তাঁকে টাকা দিতে হ'তো।

এই তিন দিনের সম্মেলনে তবলায় সহযোগিতা করলেন কিষণ, সারদা সহায়, শ্যামল বোস, শঙ্কর ঘোষ, ঈশ্বরীলাল মিশ্র, কুমার লাল মিশ্র। মৃদঙ্গে সহযোগিতা করলেন পাগলাদাস এবং রামাশীষ পাঠক। সারেঙ্গীতে সঙ্গত করল বাচ্চালাল মিশ্র।

কাশীর ইতিহাসে যে ধরনের শ্রদ্ধা পূর্বক শিল্পী এবং শ্রোতা একাত্ম হয়েছিল, তা বিরল। কনফারেন্সের তিনদিন হলের মধ্যে ঢুকেই, রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো, তার সঙ্গে কাশীর শ্রোতারা পরিচিত ছিলেন না। প্রতিটি কার্যক্রমই ভালো হয়েছিলো। এরকম সফল কার্যক্রম, বাবার আশীর্বাদেই হয়েছিলো। এ আমার বিশ্বাস। স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকেরা নিজেদের সংবাদ পত্রে ভূয়সী প্রশংসা করে, দীর্ঘ স্পেস ছবি সহকারে দিয়েছিলেন। এও এক বিরল ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের এবং দিল্লীর, এদের মধ্যে সবিশেষে বারাণসীর সংবাদপত্র জগৎটা এক কথায়, যেন আমাকে কিনে নিলো। শারীরিক, আর্থিক এবং খবরের মাধ্যমে তাঁরা যে অকৃপণভাবে বাবার এই কাজটা সমাধা করতে আমাকে সাহায্য করলেন তা দেখে আমি অভিভূত।

সবচেয়ে বিরল ঘটনা কোন শিল্পীর সঙ্গে টাকার চুক্তি করি নি। প্রত্যেককেই বলেছিলাম, যাওয়া আসার ফার্স্টক্লাস ভাড়া ছাড়া যা পারি তা দেব। বাবার শতবর্ষ শুনে প্রত্যেক শিল্পীই আমার কথায় সম্মত হয়েছিলেন। যদিও সকলকে টাকা দিয়েছিলাম, কিন্তু কারো চাহিদা ছিলো না, এও এক বিরল ঘটনা। একমাত্র ব্যতিক্রম হয়েছিলো বাহাদুর খাঁর সঙ্গে। যাওয়া আসার খরচার উপর, যখন উপরি টাকা দেওয়া হোল, কিছুতেই নিলো না। বললো, 'জ্যেঠার কাজে এসেছি, সেখানে টাকা কি নেব?' যদিও ট্রেন ছাড়ার আগে, আমার এক ছাত্র জোর করে কিছু টাকা পকেটে দিয়েই নেমে গিয়েছিলো ট্রেন থেকে।

এত বিরাট সাফল্যের পরেও, কুড়িহাজার টাকার লোকসান হয়েছিলো। তার কারণ, কিছু লোক যাদের উপর বিরাট ভরসা করেছিলাম, শেষ মুহূর্তে তারাই ডোবাল। সঙ্কল্পের তরী একবার ভাসলে, পরিকল্পনা আপনি গজায়। আবেগের তরীটা জোয়ারের মধ্যে ভাসিয়ে দিলাম। জোয়ারে ভাঁটা পড়তে দিই নি। হাতে সময় ছিল অল্প, কিন্তু আন্তরিক সঙ্কল্প থাকার জন্য বিফলে যায় নি। সেইটাই ছিলো আমার কাছে সান্ত্বনা। পাঁচটি দিন একটুও বিশ্রাম না করে, কি করে ঘোরের মধ্যে কেটে গেল, বুঝতে পারলাম ছয় দিন পর। এই অবস্থার মধ্যেও কিন্তু

আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে দুটো জিনিষ। প্রথম বম্বেতে একত্রিশ ডিসেম্বারে বাবার শতবার্ষিকীতে বাজাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অন্নপূর্ণাদেবীর শেষ চিঠিটা আমায় এত চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে, যা আমি কাউকে বলতেও পারছি না। বলতে পারলে মনটা একটু হালকা হয়। কিন্তু কাকে বলব? তাই নিজের মনের মধ্যে দিনরাত চিন্তা হয়, যার ফলে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

বম্বেতে প্রোগ্রামের এক দিন আগেই পৌঁছলাম। বম্বে গেলেই পিন্তিজিকে আগেই খবর পাঠাই, যার ফলে তিনি একজনকে স্টেশনে পাঠিয়ে দেন। প্রতিবারের মত এবারেও লোক এল। লোকটি বলল, 'এবারে আপনার থাকার জন্য হোটেলে ব্যবস্থা করেছি।' অবাক হয়ে বললাম, 'গেস্ট হাউসে কি কেউ এসেছেন?' উত্তরে বলল, 'রাজা সাহেবের কাছেই সব শুনবেন। গেস্ট হাউসটা রাজা সাহেব বিক্রি করে দিয়েছেন।' মনে খটকা লাগল। কেন বিক্রি করে দিয়েছেন? সমুদ্রের এমন শোভা আর দেখতে পাব না। আমার হোটেলটা পিন্তিজি এবং অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ীর খুব কাছেই। হোটেলে গিয়ে স্নান সেরে প্রথমেই ব্রিজনারায়ণের সঙ্গে দেখা করে কাশীতে শতবার্ষিকীর একটা সুভ্যেনির দিলাম। সুভ্যেনির দেখে খুশী হয়ে বললেন, 'এল.আই.সি.-র ম্যানেজিং ডাইরেকটারকে চিফ গেস্ট করেছি এবং আপনাকে প্রেসিডেন্ট করেছি। আপনাকে বাবার উপর কিছু বলতে হবে। চিফ গেস্ট যাঁকে করেছি, তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রেমী। তাঁকে আপনার লেখা ইংরেজী বইটা দেখিয়েছি। সম্মেলন শুরু হবে সন্ধ্যায়। আপনি একটু আগে আসবেন, কেননা চিফ গেস্ট আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন। প্রথমে চিফ গেস্ট এবং আপনার ভাষণের পর কয়েকটা সঙ্গীতের প্রোগ্রাম হবে এবং সর্বশেষে আপনাকে বাজাতে হবে।

বললাম, 'আমি আবার কি বলব? দেখুন আমি বক্তা নই। এই প্রথম কাশীতে আমি প্রেসিডেন্ট হবার জন্য বলেছি।' আমার কথা থামিয়ে ব্রিজনারায়ণ বলল, 'আপনি বাবার নামে সার্কেল করেছেন। আপনার সার্কেল করবার কিছু উদ্দেশ্য আছে, সে কথা বলবেন এবং বাবার শতবার্ষিকী হচ্ছে এই বিষয়ে কিছু বলবেন।' এই কথা শুনে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি তো বক্তা নই। আমি তাহলে এখন বলবার জন্য লিখব, তারপর সেইটা দেখে বলব।'

ট্যাক্সি নিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। গাড়ীতে বসেই মনে হোল, অন্নপূর্ণাদেবীর ব্যাপারে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি। তাঁর প্রথম জীবনে বাবা, আলিআকবর এবং পরে নিজের স্বামী ছাড়া, কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসেন নি। আমার সঙ্গে তাঁর কিসের সম্পর্ক। আমি তো ঐ পরিবারের বাইরের লোক। কিন্তু আমি তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে না গেলে, আর কে সাহায্য করবে? আমি যদি সাহায্য করতে এগিয়ে যাই, তাহলে তাঁর আত্মীয়স্বজনরা হয়ত আমায় ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু পরে কি ভাববে, না ভাববে, তা ভেবে সময় নষ্ট করলে, অন্নপূর্ণাদেবীর কষ্ট বাড়বে। যদি তিনি কোন দুর্ঘটনার মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর মত সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব, এমন অত্যাচার কি করে সহ্য করতে পারবেন। তিনি যদি এই বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেন। ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। কার কাছে উপদেশ চাইব? কে আমাকে অন্নপূর্ণাদেবীর এই বিপদ থেকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দেবে?

হঠাৎ দেখি, ট্যাক্সি বাড়ীর সামনে এসে গেছে। ফ্লাটে গিয়ে, কলিং বেল বাজাবার আগেই নজরে পড়ল দরজার মধ্যখানে নেমপ্লেট দেখে। বরাবর লেখা থাকতে দেখেছি, অন্নপূর্ণাশঙ্কর, রবিশঙ্কর। কিন্তু সেই প্রথম প্লেট উঠিয়ে দিয়ে, নূতন করে কেবল লেখা হয়েছে অন্নপূর্ণাদেবী। আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেল-এর প্লেট দরজার পাশে। রিকোয়েষ্ট বলে যেমন লেখা থাকত তা ঠিকই আছে। যাই হোক কেবল অন্নপূর্ণাদেবী লেখাটা চোখে পড়ল। বুঝলাম না, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে। কলিংবেল বাজালাম। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে আমাকে দেখে, অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি?' বললাম, 'আপনার স্মৃতিশক্তি বোধ হয় কিছুটা লোপ পেয়েছে, কেননা গত সেপ্টেম্বার মাসে এসে বলে গিয়েছিলাম, ব্রিজনারায়ণ বাবার শতবার্ষিকী করছেন। তাঁর জন্য আজ এসে পৌঁছব। এ ছাড়া আসবার আগে চিঠি লিখেওতো জানিয়েছি। আপনি কি আমার চিঠি পান নি? আজ বম্বে এসে কাগজেও দেখলাম আগামীকাল সম্মেলন হবে। আজকাল কি খবরের কাগজও পড়েন না?' লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সত্যি আজকাল কিছু মনে থাকে না। যদিও কয়েকদিন আগে সংবাদটি বেরিয়েছিলো কিন্তু আজকের কাগজ এখনও পড়ি নি।' কিন্তু এ কি ব্যাপার? ভালো করে প্রথমে দেখি নি। এ কি চেহারা হয়েছে? জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার কি শরীর খারাপ? ডাক্তার দেখেছে?' সহজ ভাবেই বললেন, 'এখন যেতে পারলেই বাঁচি। অনেকেই শান্তি পাবে।' এর উত্তরে মুখে কথা জোগাল না। মনে পড়ে গেল চিঠির কথাটা। নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেলাম। বললাম, 'এই বাজনা যদি নাও থাকত তা হলেও আপনার মানসিক অবস্থার কথা জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা পাবার পর, না এসে কি থাকতে পারি?'

আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আমার নিজের দাদা, স্বামী থাকতেও, তাঁরা কেউ কিছু করলেন না। আপনি আমার জন্য কি করবেন? আপনি আমার কে? আপনি তো আমার পর। এখন আমার সকলকে চেনা হয়ে গিয়েছে। সাধ করে কি, আর কাউকে এখন বিশ্বাস করতে মন চায় না। আমি সাধারণ। ট্রাজেডি নিয়ে জন্মেছি এবং ট্রাজেডি নিয়েই মরব।' বুঝলাম এ হোল অভিমানের কথা। ঘা খেয়ে খেয়ে পাথর হয়ে গিয়েছেন। উনি ভাল করেই জানেন যে, আমার চেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী তাঁর আর কেউ নাই। তা সত্ত্বেও নিজের দাদা এবং স্বামীর উপর অভিমানটা আমার উপর দিয়েই চালালেন।

বললাম, 'উস্তাদ বাবা যদি আমার বাবা তথা গুরু হন এবং আপনিও যদি আমার একজন গুরু হন, তা হলে আমি কে, কল্পনা করুন? উপস্থিত আমাকে সব কথা বলুন। রবিশঙ্করের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে এবং আপনি আমার কাছ থেকে কি সাহায্য চান? আপনি যা আদেশ করবেন তাই করব।'

আমার কথা শোনার পর হঠাৎ বললেন, 'কাল তো আপনার বাজনা আছে?' হঠাৎ আমার কথায় বাধা পড়ায় বুঝলাম বাজনার কথা ভেবেই এখন কোন আলোচনা করতে চান না। এক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, 'আগামীকাল বাবার শতবার্ষিকী উৎসবে বাজাব। কাল বাজিয়ে, পরশু সকাল দশটার সময় আসব এবং সেই সময় সব কথা শুনব। উপস্থিত আমি খুবই ক্লান্ত।' এই কথা বলেই, কাশীতে বাবার শতবর্ষের উৎসবের সুভ্যেনিরটা দিলাম।

সুভ্যেনিরটা উলটে পালটে দেখেই অন্নপূর্ণাদেবী একেবারে বদলে গেলেন। বললেন, 'যা রান্না হয়েছে তাই খেয়ে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল খুব ভাল করে বাজাবেন বাবাকে স্মরণ করে। আমার কাছে এক বিদেশী মহিলা এসেছে। সেতার বাজায় এবং সঙ্গীতের উপর রিসার্চ করছে। বিদেশী মহিলা আপনার ভাষণ এবং বাজনা শুনতে যাবে।' বললাম, 'বক্তৃতা দেওয়া আমার অভ্যাস নাই। বাবার শতবার্ষিকী উপলক্ষে কাশীতে ভাষণ দিতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং এখানেও তাই বাধ্য হয়ে বলতে যাব।' প্রসঙ্গ বদলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাশীতে কি রকম বাবার শতবার্ষিকী পালন হোল।' রান্না করতে করতে আমার কাছে উৎসবের কথা সব শুনলেন। টাকার লোকসানের কথা ইচ্ছা করেই এই সময়ে বললাম না। কিন্তু তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'শতবার্ষিকীর সব কথাই তো বললেন, কত লোকসান হোল তা তো বললেন না।' বললাম, 'যদিও কুড়ি হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, কিন্তু কাশীতে এরকম উৎসব কখনও হয় নি।'

বিকেলে বসে একটা খসড়া তৈরী করলাম। আগামীকালের অনুষ্ঠানে বাবার বিষয়ে বলতে হবে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে হবে ভেবেই, কাশীর কথা মনে পড়ে গেল। বক্তৃতা দেওয়াটাও একটা বড় আর্ট। এ যাবৎ তিনবার বলতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। এবারেও বাধ্য হয়ে বলতেই হবে।

সন্ধ্যার পর পিত্তিজির গাড়ী এলো। পিত্তিজির বাড়ী গেলাম। পিত্তিজিকে দেখে অসুস্থ মনে হোল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার শরীর কি ভাল নাই?' বললেন, 'শরীর ঠিকই আছে, তবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি। গেস্ট হাউসটা বেচে দিয়েছি বিশেষ কারণে, যার জন্য এবারে আপনার থাকবার জন্য হোটেল ঠিক করে দিয়েছি।' মনে মনে ভাবলাম, ট্রাস্টের গেস্ট হাউস কেন বিক্রি করে দিলেন? কি কারণ হতে পারে, যার জন্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। আমার দৃষ্টি দেখেই পিত্তিজি, আমার মনের কথা বোধহয় বুঝলেন। বললেন, 'আগামীকাল তো আপনার বাজনা আছে। বাজনা হয়ে যাক, তার পরে আপনাকে বলব, কেন ট্রাস্টের গেস্ট হাউস বেচে দিয়েছি। আসলে আমি যাঁকে খুব নিজের লোক ভাবতাম, ভালবাসতাম, সেই লোক ভাবতে পারি নি যে পেছন দিক থেকে আমাকেই ছুরি মারবে। এই কারণেই বললাম, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছি। যাক এও এক শিক্ষা হোল। এর জন্য অযথা আপনি চিন্তা করবেন না। যাক এ কথা। কাশীতে কি রকম বাবার শতবার্ষিকী পালন হোল?' পিত্তিজিকে একটা সুভ্যেনির দিলাম। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

ব্রিজনারায়ণের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে বলবার পর যেটা লিখেছি সেটা দেখালাম। বরাবরের মত রাত্রে আলাপ বাজিয়ে জোড় বাজাবার আগেই, পিত্তিজি বললেন, 'আজ এখানেই শেষ করুন। আজ বাজনা শুনে মনটা অনেক হাল্কা হোল। আজ আমার মনের দুঃখটা, আপনার আলাপে, বাজনায় ফুটে উঠেছে, তাই জোড় শুনলাম না। সঙ্গীতের মধ্যে আলাপটাই হোল প্রাণ।' সত্যিই পিত্তিজির মত সঙ্গীতের সমঝদার শ্রোতা এযাবৎ দেখি নি।

পরের দিন বাবার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে গেলাম। হলে গিয়ে দেখলাম মঞ্চটা খুব ভাল ভাবে সাজানো হয়েছে। ব্রিজনারায়ণ, এল. আই. সি.র ম্যানেজিং

ডাইরেক্টারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ব্রিজনারায়ণের কথা অনুযায়ী আমার লেখা বইটা উপহার স্বরূপ দিলাম। বইটা কিছুক্ষণ দেখার পর, আমাকে নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, 'দয়া করে কাল সকাল এগারটার সময় আমার অফিসে আসুন। আপনি এলে খুব খুশী হবো। সঙ্গীত একসময়ে একটু চর্চা করেছিলাম, কিন্তু হোল না, কিন্তু আমি সঙ্গীত খুব ভালবাসি।' এত উচ্চপদের অধিকারী হয়েও, এধরনের অমায়িক ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলাম। আমার সম্মতি জানাবার পর, কার্ডটা দেখলাম। কার্ড দেখে বুঝলাম, বিদেশ থেকে পাশ করে বহু ডিগ্রির অধিকারী হয়েছেন। বাবার বিষয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। হলে একটু আগেই গিয়েছিলাম। হল ভর্তি শ্রোতাদের, ব্রিজনারায়ণ বাবার সম্বন্ধে বললেন, 'কেন এই শতবার্ষিকী পালন করছেন।' তারপর আমি এবং পরে এল. আই. সি.র ম্যানেজিং ডাইরেকটার বাবার সম্বন্ধে বললেন। সম্মেলনের উদঘাটনের পরই হোটেলে চলে এলাম। রাত্রে বাজাতে গেলাম। বাজনা শেষ হবার পর, ব্রিজনারায়ণ বললেন, 'ইংরেজীর উনিশশো বিরাশির পয়লা জানুয়ারী শুরু হোল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সারাটা বছর সকলে যেন সুখে শান্তিতে থাকেন। সঙ্গীত রসিকদের সম্মেলনের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। জয় সঙ্গীত, জয় কলাকার।' সম্মেলন শেষ হবার পর, হোটেলে পৌঁছে নানা চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগলো। অন্নপূর্ণাদেবী যদিও নিজের বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেন নি, তথাপি এটুকু বুঝতে পেরেছি চূড়ান্ত বোঝাপড়া বোধহয় হয়ে গিয়েছে। যদি তা না হ'তো, তাহলে নেম প্লেটে অন্নপূর্ণাদেবী কেন লেখা ছিলো? এ ছাড়া পিত্তিজি কেন মানসিক কষ্টে আছেন? এই সব নানা চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালে বেশ দেরী করেই উঠলাম। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার সংবাদ পত্রে চোখ বোলাতেই দেখলাম, গত রাত্রের সম্মেলনের সমাচার বেরিয়েছে।

নির্দ্ধারিত সময়ে এল. আই. সি. অফিসে গিয়ে দেখি টেবিলের উপর আমার ইংরেজী বইটা রয়েছে। যাবার সঙ্গে সঙ্গে কফির অর্ডার দিয়ে বললেন, 'আগামী কাল রাত্রি তিনটে পর্যন্ত আপনার লেখা বইটি পড়েছি। বইটা পড়তে কিছুদিন সময় লাগবে। লাঞ্চ টাইমে বইটা পড়ব বলে অফিসে নিয়ে এসেছি। এককালে বেশ কিছুদিন সঙ্গীত চর্চা করেছিলাম, কিন্তু বিদেশে পড়তে যাওয়ার ফলে, সঙ্গীত চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশ থেকে ফেরবার পর, চাকরির জন্য আর অগ্রসর হতে পারি নি। তবে সঙ্গীত হোল আমার খাদ্য। রাত্রে রোজ ক্যাসেটে, গান এবং বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।' এই কথা বলে আমাকে একটি বড় এনভেলাপ দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে একটা চিঠি আছে। বাড়ীতে গিয়ে পড়বেন।' অবাক হলাম। এ কি রহস্য? কার চিঠি? যে চিঠি বাড়ীতে যাবার পর পড়তে বলছেন। আমার অবাক ভাব দেখে বললেন, 'ইচ্ছা ছিলো আপনার সঙ্গে বসে, সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব, কিন্তু দেড়টার সময়, আজ থেকে তিনদিন অল ইণ্ডিয়া এল.আই.সি.-র মিটিং আছে। তিন দিন মিটিং শেষ হবার পরই, আমি ব্যাঙ্গালোরে প্লেনে করে চলে যাব। গতকাল আপনার বাজান, দরবারী কান্থাড়ার টেপ করেছিলাম। রাত্রে বাড়ী গিয়ে শুনেছিলাম। বাজনা শুনে মনে হয়েছে, আপনার অন্তরের কান্না বাবার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন।' এ কথা শুনেই

বললাম, 'আমি কি বাজিয়েছি জানি না, তবে আপনার ভাল লেগেছে, তার জন্য যে প্রশংসা করলেন, তা আমার গুরু বাবার প্রাপ্য।' আমার কথা শুনে বললেন, 'আজ আমি নিরুপায়, কেননা মিটিং আছে। এ না হলে, ঋষিতুল্য আপনার গুরুদেবের বিষয়ে অনেক কিছু শুনে, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম।'

সময় হয়ে গিয়েছে দেখে, ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী রওনা হলাম। গাড়ীতে চড়েই খামটা খুলেই দেখলাম, একটা চিঠি এবং আশি টাকা তার মধ্যে আছে। আমি টাকা দেখে অবাক হলাম। এই টাকা কিসের জন্য দিয়েছেন? চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলাম। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে লিখেছেন, 'আপনার এই অমূল্য বইটা সকলের পড়া উচিত। সেই কথা ভেবে আপনার বইটা পড়ে, এল. আই. সি.র লাইব্রেরিতে রেখে দেব। যাঁরা সঙ্গীতপ্রেমী, তাঁরা এই বইটা পড়ে লাভবান হবেন। আজ সকালে অফিসে এসেই কয়েকজনকে বইটা দেখিয়েছি, যাঁরা সঙ্গীতপ্রেমী। বইটি দেখে সকলেই পড়তে চেয়েছেন। তাই এই অমূল্য বইটার যে নামমাত্র দাম আশি টাকা, সে টাকাটা এল. আই. সি.র তরফ থেকে আপনাকে দিলাম। দয়া করে ভুল বুঝবেন না এবং টাকাটা ফেরৎ পাঠাবেন না। টাকা ফেরৎ পাঠালে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। বইটা যে আমার নাম লিখে উপহার দিয়েছেন, তার জন্য আমি অমর হয়ে থাকব বইটি লাইব্রেরিতে থাকলে। এক বছর পরই আমি রিটায়ার করে ইংলণ্ডে আমার ছেলের কাছে চলে যাব। লাইব্রেরিতে বইটা রাখবার কারণ, যখনই বইটা কেউ পড়বে, সেই সময় আমার নামটা তাঁরা দেখবে। সেটাই হবে আমার কাছে বিরাট সম্পদ, কেননা যতদিন এখানে আছি, সকলেই আমার চেয়ারের সম্মান করে। যে দিন এই চেয়ার ছেড়ে চলে যাবো, তখন কেউ আমাকে মনে রাখবে না। টাকা দিয়েছি বলে আশা করি ভুল বুঝবেন না।' ইতি—ভি. দীক্ষিত।

উপরোক্ত চিঠিটা পড়ে মনে হোল, বইটা লেখা আমার সার্থক হয়েছে। যাই হোক চিঠিটা পকেটে রেখে, মনটা কখন বাবাময় হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারিনি। অন্নপূর্ণাদেবীর বিলডিং এর ফটকের মধ্যে ঢুকতেই, খেয়াল হোল এটা মৈহার নয়। আমি বম্বেতে আছি।

ফ্লাটের বাইরে, কলিংবেল বাজাবার কিছু পরেই দরজা খুললেন। দূরে দেখলাম এক বিদেশী মহিলা এবং দুইটি ছেলে। ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী মহিলাটি উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে ইংরেজীতে বললেন, 'ইয়েসটারডে আই হারড ইয়োর লেকচার এনড সরোদ। ইন ওয়ান ওয়ারড রিয়েলি সুপারব।' অন্নপূর্ণাদেবীর সামনে এ কথা শুনে ধীরে বললাম, 'থ্যান্ক ইউ ফর এপ্রিসিয়েসন বাট ফর গডস সেক ডোন্ট আটার এ সিঙ্গল ওয়ারড বিফোর।' এই কথা বলেই ইশারায় অন্নপূর্ণাদেবীকে দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছেলে আমার বাজনার প্রশংসা করল। মনে মনে ভাবলাম এ কি বিপদ। দরজা খুলে দিয়ে অন্নপূর্ণাদেবী রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরে এসেই বললেন, 'খবরের কাগজে বাজনার তো খুব প্রশংসা বেরিয়েছে। যদিও সংবাদ পত্রের প্রশংসার আমি কোন মূল্য দিই না। আপনি বলুন, কেমন গতকাল বাজিয়েছেন?' বুঝলাম, সকালের সংবাদ পত্র পড়েছেন। বললাম, 'আপনি তো দেখছি বাবার মত আমাকে পরীক্ষা করছেন।'

আমার কথা শুনে হেসে বললেন, 'দরবারী বাজিয়েছিলেন?' বললাম, 'দেখুন বাবা বলতেন, বহুদিন অভ্যাস করবার পর, দরবারী এবং শুদ্ধ কল্যাণ বাজাবে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর বাজাচ্ছি। এই সময়ের মধ্যে জলসায় কেবল বাবার শতবর্ষ ভেবে, ডিসেম্বারে কোলকাতায় দরবারী বাজয়েছিলাম, এবং বছরের প্রথম দিনে দরবারী বাজালাম। বাবার কাছেও শিখেছি এবং আপনার কাছেও শিখেছি।' বললেন, 'এখন তো বোঝেন বাজনার মধ্যে সাধনা করার কতদিন পরে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করা যায়।' বললাম, 'প্রশংসা যদি পেয়েই থাকি, বাবা এবং আপনার আশীর্বাদেই পেয়েছি। যাক এ সব কথা। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এঁদের দয়া করে বিদায় করুন।' বললেন, 'আপনার তো অনেক আগে আসার কথা ছিলো। এত দেরী হোল কেন?' এল.আই.সি.র ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সব গল্পটা বলে বললাম, 'এই কারণে দেরী হয়ে গেল।' তাঁর চিঠিটা দেখলাম। চিঠিটা পুরো পড়লেন। মুখ দেখে বুঝলাম চিঠিটা পড়ে খুশী হয়েছেন। বললেন, 'এঁদের সঙ্গে একটু গল্প করুন। এঁরা একটু পরেই চলে যাবে। তার মধ্যেই আমার রান্না হয়ে যাবে।' কি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লাম। মনের মধ্যে নানা কথা জানবার জন্য যে সময়ে আকুলি বিকুলি করছে, সেইসময় এঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিদেশী মহিলাটি বললেন, 'আপনার ইংরেজী বইটা পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে আপনার মুখে কিছু শুনতে চাই। বাবার সম্বন্ধে জানবার বিশেষ কৌতূহল দেখলাম। বাধ্য হয়ে তাঁর প্রশ্নের কয়েকটা উত্তর দেবার পর বললাম, 'আজ খুব ব্যস্ত আছি। একটা বিশেষ কারণে এখানে এসেছি। কথা হয়ে গেলেই চলে যাব।' বিদেশিনি সময়ের মূল্য বোঝেন। বললেন, ঠিক আছে অন্য কোন দিন শুনব।'

ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণাদেবী খাবার নিয়ে টেবিলে রাখলেন। সকলেই খেতে বসে গেল। আমার খাওয়া মাথায় উঠল। ভাবলাম এটা কি! দুপুরে যে আসে, সেই কি খায়? প্রতিবার বম্বেতে এসে প্রথম দিন এসে খাই। তারপর কখনও দুপুরে আসি না। কারণ দুপুরে এলে না খাইয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু এবারে ব্যতিক্রম। বিশেষ কথা আছে বলেই দুপুরে এসেছি। কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়েছিলাম। নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেলাম যখন শুনলাম, 'কি হোল? খেতে বসছেন না কেন? কি ভাবছেন?' দেখলাম, আমি বসি নি বলে কেউ খাচ্ছে না। কোন উত্তর না দিয়ে খেতে বসলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে, বিদেশিনি মহিলাটিকে বললাম, 'আমার কাজ আছে বলে তাড়াতাড়ি খেলাম। আপনারা ধীরে ধীরে খান।'

হাত ধুয়ে এসে বসলাম। এঁদের খাওয়া আর শেষ হবে না মনে হোল। কত কথা জানবার আছে, অথচ এই সময়ে এঁরা উপস্থিত। অন্নপূর্ণাদেবী বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝলেন। বললেন, 'আপনার কি কোন জায়গায় যাবার আছে?' কোন উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। এবারে বললেন, 'কাজ না থাকলে, ওদিকে চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়ুন।' অবাক হলাম কথা শুনে। উনি ভাল করেই জানেন, কি জন্য এসেছি। জানা সত্ত্বেও বলছেন, 'আপনার কি কোন জায়গায় যাবার আছে?' কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ ম্যাগাজিনের পাতা উলটোতে লাগলাম। অবশেষে সকলে গেলেন। অন্নপূর্ণাদেবী এসে বললেন, 'এত তাড়াহুড়ো করেন কেন? বসুন একটু। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা কাজ সেরে এখুনি আসছি।'

কিছুক্ষণ পরে এসে মোড়াতে বসে বললেন, 'বিদেশ থেকে মহিলা এসেছে। সঙ্গীতের উপর রিসার্চ করছে। ওঁর সঙ্গে একটু কথা বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো? বাড়ীতে অতিথি এলে কি এইরকম ব্যবহার কেউ করে।' বললাম, 'আপনার তুলনা আপনিই। আমি সকলের সঙ্গে বকরবকর করতে পারি না। বাবার ভাষায়, 'লোক দেখলে ত্রস্ত হই।' যাক এ সব কথা। আসল ব্যাপার কি হয়েছে বলুন তো?'

সহজ ভাবে উত্তরে বললেন, 'আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম। এই মিথ্যা লোক দেখান সম্বন্ধর আর কোন অর্থ হয় না। তাই সেপারেসন নিয়ে নিয়েছি। এখন অন্ততঃ পণ্ডিতজীর দুষ্টচরেরা আমাকে আর জ্বালাতন করবে না, যা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এখন যা হবার হবে।' বাবা বলতেন, 'মেয়েদের জন্য স্বামীর বাড়ীই হোল তীর্থস্থান। সেখানকার নিন্দা করতে নেই। সেখানকার নিন্দা শুনতেও নাই। বাবা বিয়ের আগে বারবার আমায় বলেছিলেন, স্বামী এবং গুরুজনদের ভক্তি করবে। তাঁদের মুখের উপর কথা বলবে না। বাবা আজ বেঁচে নাই। আজ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে বলতাম, আপনার কথা রাখতে পারলাম না। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনি তো সবই জানেন। বিয়ের পর সুখীই হয়েছিলাম। কিন্তু সুখবস্তুটা তো বড় ঠুনকো। কখন কি কারণে সেটা নষ্ট হয়ে যায় বলা মুস্কিল। বেঁচে থেকে, রোজ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করার থেকে, একেবারে বাঁচার মোহটাকে ঘুচিয়ে ফেলাই কি ভালো নয়? বাঁচাটা হোল আনন্দের ও সম্মানের। কিন্তু যে বাঁচা গ্লানির, অপমানের, তাও কি দিনের পর দিন বয়ে বেড়াতে হবে?' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে একটু আনমনা হয়ে গেলেন মনে হোল। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার সব কিছু থাকতেও আজ কিছুই নাই। সব দুঃখ আমি ছেলের মুখ চেয়ে সহ্য করেছিলাম। ছেলেই ছিলো আমার অবলম্বন। ছেলেকে মনের মত শিক্ষা দিয়ে কিছুদিন পরে যখন বাইরে বাজাবার অনুমতি দেব ভেবেছিলাম, সেই সময় কি জঘন্য চক্রান্ত করে ছেলেকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল, সে কথা তো আপনি জানেন। সে দুঃখও সহ্য করেছি, কিন্তু এখন নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এখন একলা অসহ্য মনে হচ্ছে। আগের সেই মনের জোর ধীরে ধীরে কমে আসছে। যাইহোক আমার কপালে যা লেখা আছে তা আপনি খণ্ডন করবেন কি করে? আমার বাঁচবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। মৃত্যুই আমাকে শান্তি দেবে।' মনে পড়ে গেলো চিঠির কথা। এতক্ষণ ইচ্ছা করে চুপ করে শুনছিলাম। বললে মনটা হয়তো হাল্কা হবে। সব শোনার পর বললাম, 'চিঠিতেও লিখেছিলেন এবং এখনও সেই কথা বলছেন মৃত্যুই আপনাকে শান্তি দেবে। মৃত্যুটা যথাসময়েই হবে, তার জন্য কেন চিন্তা করেন? কাপুরুষেরাই মৃত্যুর কথা চিন্তা করে।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে বললেন, 'কাপুরুষ কথাটায় কি যায় আসে। কারণ আমি আর বাঁচতে চাই না।' প্রসঙ্গটা পালটে জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা কথা বলুন তো? আপনি তো বললেন, সেপারেসন হয়ে গিয়েছে। আপনি অ্যালিমনির কথাটা কি ভেবেছেন?'

বললেন, 'অ্যালিমনির? সেটা আবার কি?'

বললাম, 'ডিভোর্স চাইলে স্ত্রীকে যে খেসারত দিতে হয় তাকে অ্যালিমনি বলে।

একটা কথা বলুন তো। আগের কথানুযায়ী, আপনার পরিচিত উকিলের মাধ্যমে কি, সব ব্যাপার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে?' উত্তরে বললেন, 'হাঁ। নীচতার আক্রমণ থেকে, অসত্যের দাসত্ব থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। এবং এতদিনে সেই মুক্তি এলো।' বুঝলাম আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তবুও আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'পূর্বের কথানুযায়ী, দুইলাখ টাকাতেই রাজী হয়ে নিয়ে নিয়েছেন?' উত্তরে বললেন, 'উপস্থিত এক লাখ টাকা দিয়েছেন, কিছুদন পরে বাকী এক লাখ টাকা দেবেন বলেছেন। উপস্থিত ওঁনার খুবই টানাটানির মধ্যে চলছে।'

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হলাম। পণ্ডিতজীর টাকার টানাটানি চলছে? সেই এক পুরোনো গৎ, সেই একের পর এক বাঁধা তান। বললাম, 'উকিলের সামনে সব ঠিক হয়েছে বটে, কিন্তু যদি একলাখ টাকা না পান, তাহলে বাকী একলাখ টাকা পেতে, কত বছর কেস করবার পর পাবেন, সে কথা উকিল বলে নি?' উত্তরে বললেন, 'ইচ্ছে হলে দেবেন আর যদি নাও দেন, তাহলে আমি কোন কেস করব না। এ নিয়ে কোন ঝামেলা আর ভাল লাগে না।'

বললাম, 'দুদিন আগে বম্বে এসেই যেদিন দেখা করতে এসেছিলাম, সেইদিন বাইরে নেমপ্লেটে অন্নপূর্ণাদেবী লেখা দেখেই বুঝেছিলাম, উকিলের মারফৎ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।'

ঘুরে ফিরে একটা কথাই বারবার মনে হতে লাগলো। কতকালের সত্তা, দুমড়ানো একটা জগদ্দল পাথর টুপ করে খসে পড়ে গেল। কোন নিঃসীম নীরবতার গভীরে ডুবে গিয়েছিলো। সবই ঠিক আছে। কেবল জ্বলজ্বলে একটি নক্ষত্রের নাম কোথায় হারিয়ে গেলো ফ্লাটের নেমপ্লেট থেকে? অবাক হয়ে ভাবি, তাড়াহুড়ো করে অন্নপূর্ণাদেবী যা করেছেন, সেটা কাজের কথা নয়। সমস্ত পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখা উচিত ছিলো। নিজের স্বার্থটা বুঝবে না, তাই নাম মাত্র নগদ একলাখ এবং পরে একলাখ দেবে, কেননা উপস্থিত বড়ই আর্থিক অভাব। অবাক কাণ্ড। কি করে অন্নপূর্ণাদেবী রাজী হয়ে গেলেন? পাকাপাকি ডিভোর্স হয়ে গেলো। আমার এখন আর বলার কিছু নাই। যাক যা হয়ে গিয়েছে, তার উপর তো আর করার কিছুই নাই। বাবা বলতেন, 'যাঁরা ভক্তি দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছে, তাঁরা কিছুতেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করে না। তাঁরা অনায়াসেই, সেই কর্মফল শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করেন।' অন্নপূর্ণাদেবীও জেনে শুনে দুঃখ বরণ করলেন।

আমাকে চুপচাপ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবছেন? সব জিনিষের সমাপ্তি যখন হয়ে গিয়েছে, তখন আর নূতন করে ভাববার কিছু নাই।' হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। এই সময়ে স্নান করে খাবার খাবেন। বললাম, 'আজ আপনাকে বিরক্ত করব না, কেননা আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আপনাকে কয়েকটা কথা বলার আছে। প্রতিমার অঙ্গে রং লাগিয়ে তারপর সাজ না পরালে, কারিগরের যে অপরাধ হয়, আমারও সেই অপরাধ হবে, যদি আমি কয়েকটা কথা না বলি। উপস্থিত আমি যাচ্ছি, কিন্তু আগামীকাল বিকেল তিনটের সময় আমি আসব। আমার যা কিছু বলবার সেই সময় বলব। দয়া করে কাল সেই সময় কোন অতিথির সমাদরের ব্যবস্থা করবেন না।'

বললেন, 'কাল আসুন কোন ক্ষতি নাই, তবে এ নিয়ে আলোচনা করার আর কিছু নাই।

আমার মৃত্যুই সব সমাধান করে দেবে।' এই কথা বলেই উঠে বললেন, 'চা করে দিচ্ছি। চা খেয়ে যান।' মাথাটা কিরকম ভার হয়ে গিয়েছে। মনে হোল, মানুষ যখন নিজের লোককে পর করে, তখন সে পরের চেয়েও পর করে।

৬৯

হোটেলে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসেই শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, এরকম অসুখী দাম্পত্য জীবন কি দেখা যায়? লোক দেখান একচল্লিশ বছরের জীবন। ব্যতিক্রম কেবল একটা বছর। একচল্লিশ বছরের শুরুতে বোধ হয়, এক পক্ষ বলেছিলো, 'বসন্তের কোকিলের ডাক হাওয়ায় ভেসে আসা গানের মতই রমণীয় তুমি।' বোধ হয় উত্তরে অপর পক্ষও বলেছিলো, 'তুমি সত্যই সুন্দর। ভোরবেলার শিশির ভেজা গোলাপ যেন।' তারপর বেশ চলছিলো। একবছরের মাথায় ছেলে হবার পরই, সব ভালবাসা কর্পুরের মত বাইরে উবে গেলো, নিজের লোকের কাছে যখন জঘন্য চরিত্রের সংবাদ শুনলেন। কি মর্মান্তিক! সব স্বপ্ন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেলো। প্রথমে ভাবলেন, তাঁকে কেউ বিভ্রান্ত করলো নাকি? তবু তাঁর মনের গভীরে তোলপাড় হোল। ভাবনা চিন্তার জ্বালা আগুনের মত দগ্ধ করতে লাগলো। ভাবলো, যাঁর চেহারা এত সুন্দর, যাঁর কথায় মাধুরী মেশানো, তাঁর চরিত্রে এমন কালিমা? যাঁর প্রেম এত গভীর, যে দুই চারদিনেই উজাড় করা ভালবাসার কথা বলতে পারে, সে এত অপবিত্র, এত কলঙ্কময়? সরাসরি জিজ্ঞাসা করল নিরুপায় হয়ে, অপর পক্ষ স্বীকার করতে বাধ্য হোল। এর পরই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। পাছে বাবা কষ্ট পাবেন বলে মনকে শক্ত করলেন। বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে বাজনার তার ছিঁড়ে গিয়েছে। কিন্তু একচল্লিশ বছরেই দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে গেলো, কেন এমন হোল? ঝগড়া কি শুধু মুখে হয়? মনের সঙ্গে মনের ঝগড়া হয় না? রুচির সঙ্গে রুচির, কালচারাল ব্যাকগ্রাউণ্ডের সঙ্গে কালচারাল ব্যাকগ্রাউণ্ড-এর? কিন্তু এখানে ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন। কোন স্বামীই স্ত্রীর প্রাধান্যকে সহ্য করতে পারে না। দাম্পত্য জীবন তো শেষ হোল, কিন্তু ভবিষ্যৎ-এর সমস্যা? এহেন প্রতিপত্তিশালী মানুষটির উপর অথবা তাঁর চিত্তের উপর দখল নেবার জন্য, আমার কথামত অন্নপূর্ণাদেবী যদি হাত বাড়াতেন, তাহলে ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, সে হাতের মুঠো পণ্ডিতকে ভরে দিতে হ'তো। কিন্তু তা তিনি করলেন না। এখানেই তিনি অনন্যা।

ক্লান্ত মন নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বেয়ারার ঘণ্টিতে জেগে উঠে বুঝলাম, প্রায় দুই ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। কিছু পরেই পিণ্টিজির গাড়ী আসবে। পিণ্টিজির বাড়ী গিয়ে, প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন কি কারণ, যার জন্য আপনি মানসিক কষ্ট পেয়েছেন?' তাঁর কাছে যা শুনলাম তা কি সম্ভব? সত্যই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কোন বস্তু নাই। স্নেহপরবশ হয়ে, যাঁর খাওয়া থাকার সংস্থান ছিলো না, তাঁকে প্রেস করে দিয়েছিলেন। গেস্ট হাউসের দেখাশোনার ভার এবং থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। মনে হ'তো বাড়ীর একজন সদস্য। পিণ্টিজির কথা শুনে বুঝলাম, সত্যই তো, এই প্রথম তাঁকে বাড়ীতে দেখছি না। বাড়ীতে এ যাবৎ যখন গিয়েছি, সেই ভদ্রলোককে দেখেছি। অত্যধিক ভালবাসা পেয়ে

গেস্ট হাউসটাই হজম করবার তাল করেছিলো। মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয় কি করে? বলতে গেলে যাঁকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করলেন সেই লোক নিজের উন্নতি আর খ্যাতির জন্য, এত হীন কাজ করতে পারে, ভাবা যায় না। পরের প্ররোচনায় গেস্ট হাউসটা নিজের বলে বিক্রি করতে চেয়েছিলো। সত্যই ভালবাসাও অপরাধ আজকের যুগে। মানুষের বাইরে দেখে কি মানুষ চেনা যায়? লোকটিকে দেখে কত সরল মনে হ'তো। আসলে ছিল ভেক ধরা ভণ্ড সন্ন্যাসী। পিত্তিজির কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। বাড়ীর অবসর সময়ে, সঙ্গীত এবং বই পড়া হোল তাঁর নেশা। নিজের হাতে গড়া লোকের এই হীন চক্রান্ত আশা করেন নি। সেইজন্য গেস্ট হাউসটা বিক্রি করে দিয়েছেন। সত্যই মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাত্রে বাজালাম। পিত্তিজির অনুরোধে ভূপালির আলাপ বাজালাম। পিত্তিজি বললেন, 'বছরের প্রথম দিনটা স্মরণীয় হয়ে রইল। আজ আপনার জীবনের দুঃখ, বাজনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আপনি জানেন না, কি বাজিয়েছেন আজকে? আজকে আর কিছু শুনব না।' কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি তো এ যাবৎ নিজের বাজনায় মন যা চায়, মনে হয় বাজাতে পারলাম না। যাক রাত্রে হোটেলে চলে গেলাম।

একলা হলেই চিন্তা আমার মাথায় ভর করে। নিজের মনে মনেই কথা বলি। এ যেন কোন নাটকের রিহারসাল হচ্ছে।

পরের দিন ঠিক তিনটের সময় অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। কোন ভূমিকা না করেই বললাম, 'আপনি তো ঘড়ি দেখে পাঁচটার সময় স্নান করতে যাবেন এবং তারপর খাবেন। সুতরাং আপনি চুপটি করে বসুন। কয়েকটা কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন ভেবে এসেছি। আমার কথার মাঝে কোন প্রতিবাদ করবেন না। আমার পুরো কথা শুনবার পর, আপনার মতামত বলবেন। আমার কথা অযৌক্তিক মনে হলে, আপনার মনে যা হয়, তাই করবেন।'

আমার কথা শুনেই বললেন, 'এইতো আপনি প্রথমেই চটে যাচ্ছেন। আপনার কথা যদি না শুনতাম, তাহলে কি এই সব আইনের সাহায্য নিতাম। একমাত্র আপনিই আমার শুভাকাঙ্খী। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি, এবং আপনার প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।'

এ কথা শুনে আমার হাসি পেয়ে গেল। পরমুহূর্তেই বললাম, 'দেখুন আমি অনেক চিন্তা করে আপনাকে যা বলব ঠিক করেছি, তার মধ্যে আপনি যদি কথা বলেন, তাহলে আমি সূত্র হারিয়ে ফেলব। প্রথমে একটু ভূমিকা করছি, তারপর আসল কথায় আসব। দেখুন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দুঃখ আছে। পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই, যাঁর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও একটা সুপ্ত দুঃখ নেই। একবার কার্লমার্কসকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হোয়াট ইজ দি গ্রেটেষ্ট ট্রেজার অফ দি ওয়ার্লড?' তার উত্তরে কার্ল মার্কস উত্তর দিয়েছিলেন, 'সরো।' জীবনে আমরা যা কামনা করি, সবই যদি পেতাম তা হলে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখতাম না। তাই দুঃখটাই হোল মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সাধারণ মানুষ এই দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু যত মনীষী সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁরা এই দুঃখকে মন থেকে হঠিয়ে দিয়ে, নিজের কর্মে আরো মন দিয়ে নিষ্ঠার সহিত একাগ্র হয়েছেন, এবং তার ফলেই পৃথিবীর সেই সব মনীষী অমর হয়ে গিয়েছেন। এবারে আর একটা কথা বলেই আসল এবং শেষ প্রসঙ্গে আসব।

আপনার শেষ চিঠিটা কোলকাতা থেকে এসে পেয়েই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তার আগের চিঠিতে জানিয়েছিলেন, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, উকিলকে বারণ করে দিতে, আর কিছু না করতে। হঠাৎ আবার এ কি হোল যার জন্য আপনি লিখেছেন, 'আমার বাঁচবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। এটাই প্রবল দিনে দিনে হচ্ছে। এই একটা জিনিষ আমাকে শান্তি দেবে।' আপনার এই চিঠি পেয়ে মনে হয়েছিলো, আপনি মাথার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যে হেতু কাশীতে বাবার শতবার্ষিকী সম্মেলনের জন্য, আমি রাত দিন ব্যতিব্যস্ত, কি করে সুন্দর ভাবে এই মহৎ কাজটা করব তার চিন্তায় পাগল, সেই সময় আপনার চিঠি পেয়ে বাধ্য হয়ে টেলিগ্রাম করলাম। চিঠিতে সব পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি দিলাম তিরিশে ডিসেম্বার পৌঁছব।

আজ আপনাকে বলছি, আপনার চিঠি পেয়ে মনে হয়েছিলো, আপনি আত্মহত্যা না করে বসেন। 'এই পৃথিবী বসবাসের যোগ্য নয়?' এটা পৃথিবীর অনেক প্রতিভাধর মানুষের কথা।

আমি আপনার কষ্টের কথা বুঝতে পারি। আপনার দুঃখগুলো চেপে রেখে রেখে, পাথর হয়ে গিয়েছে। নিজের দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারলে, মনটা অনেক হাল্কা হয়, কিন্তু আপনার কোন বন্ধু নাই, যা প্রায় সকলেরই থাকে। আপনি চিরকালই একলা, সুতরাং অলস চিন্তায় যদি কখনও এই ধরনের কথা মনে হয়, তখন একটা কথাই মনে রাখবেন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই-এর নামই জীবন। আপনি কেন হেরে যাবেন?

যাক এ তো গেলো ভূমিকা। এবার আসল প্রসঙ্গে আসছি। আমি চেয়েছিলাম এক, আর আপনি দুঃখেই হোক, বা রাগেই হোক করে ফেললেন উল্টো। আমি চেয়েছিলাম, আপনার জীবিত থাকাকালীন একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা যেন হয়ে যায়, এবং প্রায় তা হয়েই গিয়েছিলো। রবিশঙ্কর তিন হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলো। সেটা আমি পাঁচ হাজার করিয়ে নিশ্চয়ই দিতাম, কিন্তু আপনি গাণ্ডীব থেকে যখন তীর ছেড়ে দিয়েছেন, সে তীর তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, তারপর? সেটা কি ভেবে দেখেছেন? তারপরেও তো পর থাকে। সেই কথাতেই এবার আসব।

দেখুন, সাধারণ পরিবারে আকছারই কত ঘটনা ঘটে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু যাঁরা, যে কোন বিষয়েই কৃতি, তাঁরা যদি একটু হাঁচে, সেটাও একটা সংবাদ হয়ে দাঁড়ায়। সেই কৃতিদের মধ্যে সঙ্গীত জগতে বাবা এক বিরল কৃতিত্বের দাবী রাখেন। বাবার মেয়ে হিসেবেই কেবল নয়, সঙ্গীত জগতে আপনিও এক বিরল আধিকারিণী। এ কথা বাবা, আলিআকবর এবং রবিশঙ্করও, বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন এবং লিখেছেন। কিছু লোক আপনার বাজনাও শুনেছেন। সুতরাং আপনিও একটা সংবাদের পর্যায়ে পড়েন। রবিশঙ্করও সেই সংবাদের পর্যায়ে পড়ে।

মৈহার ছাড়ার পর যখন বাইরে বাজাতে আরম্ভ করলাম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত এক প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনি তো বাইরে বেরোন না এবং রবিশঙ্করকেও বাইরের কেউ জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু লোকে যখনই জেনেছে, আমি বাবার ছাত্র, তখনই লোকে 'উইথ ডিউ এ্যাপোলজি' বলে জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা এ কথা কি

সত্যি, যে রবিশঙ্কর এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সেপারেসন হয়ে গিয়েছে?' সকলকে একই উত্তর দিয়েছি, 'এই সব বাজে কথা কোথায় শুনেছেন? যদি হয় তাহলে খবরের কাগজে বড়বড় হরফে বেরোতো না? কোন কাগজে কি দেখেছেন? এই কথা শুনে সকলেই লজ্জিত ও নীরব হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এ কথা যতই ভেবেছেন ঘরের মধ্যে উকিল মারফৎ গোপনে হয়ে গিয়েছে, তা কিন্তু সব না। রবিশঙ্কর নিজের এই লজ্জা, কিছু মুষ্টিমেয় লোককে ছাড়া বলবে না। কিন্তু আপনার নিজের লোক? যাঁদের অন্ততঃ আপন ভেবে এসেছেন তাঁরাই এ কথা প্রচার করবে। জানেন তো বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, কথার নাম লতা। তাই এই সংবাদটা খুব মুখরোচক হবে লোকের মুখে মুখে। মানুষ নিজের সংসারের ত্রুটি বিচ্যুতির চাইতে, পরের সংসারের কেচ্ছা, কেলেঙ্কারি বা অঘটন নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা করতে বড় ভালবাসে। বরাবরই একটা জিনিষ এ যাবৎ দেখেছি। দু পাঁচজনের কথা যখন নানা লোকের কানে ছড়ায়, রটনার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। প্রিয় হোক, অপ্রিয় হোক, জনতা রটনার উত্তেজনা ভালোবাসে।

যাক এ কথা। এরপর আপনার একাকী জীবনটা কি ভাবে কাটবে, এটা কি ভেবে দেখেছেন? জানি আপনি বলবেন, যে এতদিন তো একলাই কাটালাম। আর কটা দিন? যেমন ভাবে হোক কেটে যাবেই। আমি কিন্তু এর উত্তরে বলবো, 'না।' আপনি কি জানেন কতদিন আপনি বাঁচবেন? জীবনে কত বিপদ আপদ আসবে? তখন ইচ্ছা থাকলেও তো কেউ সাহায্য করতে পারবে না, কারণ চার দেওয়ালের বাইরে আপনি কখনও যান না। ছাত্ররা নিজের নিজের সময়ে যখন আসে, সেই সময় হয়ত অসুবিধা নাই, কিন্তু বাকী সময়? হঠাৎ কিছু হলে কেউ জানতেও পারবে না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, একদিন মরে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকবেন। যখন ছাত্ররা নির্দ্ধারিত সময়ে এসে কলিংবেল বাজিয়ে সাড়া পাবে না, সেই সময় তাঁরা চিন্তিত হবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পারছি, সেই সময় দরজা ভাঙ্গা হবে, এবং সকলে দেখবে আপনি শেষ। এই পরিণতি সারা বিশ্বে দাবানলের মতো সংবাদ হয়ে সংবাদপত্রে বেরোবে।

আপনি একবার চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, হাই প্রেসারে ভুগছেন একমাস ধরে, প্রেসার কমাবার ওষুধ খাচ্ছেন। এখনও নর্মাল হয় নি। রোজ ডাক্তার এসে প্রেসার দেখে যাচ্ছে। আপনার ছাত্র রুশির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে এই যাত্রা বেঁচে গেলেন। ভাবুন দেখি, সেই সময় আপনার ছাত্র যদি না থাকত, তাহলে আপনি ডাক্তারকে ডাকতেন না। তখন কি হ'তো? এ ছাড়া আরোও লিখেছিলেন, 'আমি রোজ ভগবানের কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করি। আর বাঁচতে চাই না। জীবনটা ভীষণ ভার হয়ে পড়েছে। এতো মিথ্যের মধ্যে কি করে থাকা যায় বলুন?'

এখন আপনিই বলুন, আপনার যখন মনের এই অবস্থা, তখন ভবিষ্যৎ—এ কি হবে? আপনাকে একটা কথাই বলতে পারি। মিথ্যার মধ্যেও বাঁচা যায়। আসলে কি জানেন সময়ের স্রোতে একবার ছিটকে পড়লে, পুরাতনকে আর মনে থাকে না। নূতন পরিবেশ নূতন জীবনের মধ্যে টেনে নেয়। অতীতকে সেখানে ঠাঁই দেয় না। যাক এ তো হোল আপনার চিঠির জবাব।

অতএব যদি কখনও নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, তখন আমার অনুরোধ, সেই সময় ভুলেও এই আত্মহত্যার চিন্তা মনে স্থান দেবেন না। অতঃ কিম? এবারে সেই প্রসঙ্গে আসছি। এখন যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হোল এই, এমন একজন সঙ্গীত শিক্ষার্থী, যে আপনার বাড়ীতে থাকবে, আপনার কাছে শিক্ষা করবে, এবং সাথে সাথে আপনার দেখা শোনাও করবে। এই ধরুন যেমন ধ্যানেশের এক বন্ধু ছিলো।'

এতক্ষণ এক নাগাড়ে অন্নপূর্ণাদেবী চুপ করে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনেই বললেন, 'আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?' উত্তরে বললাম, 'প্রায় শেষই হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলার থাকে তো বলুন।'

বললেন, 'আপনার তো এ কথা অজানা নয় যে, আমার কাছে ছেলের বয়সি একটা ছেলে থাকলেও, তা নিয়ে পণ্ডিতজী কত রকম কথা বলেন? অবশ্য তার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই। কেননা সব পাট চুকে গেছে। কিন্তু যেমন ধ্যানেশের বন্ধু ছিলো, তার সময়ে যখন বিবাহ হোল, সে চলে গেলো। সেইরকম বিশ্বাসী কোন ছেলে রাখলেও, তার ভবিষ্যতও তো আমার দেখা দরকার। সময় হলে, তার বিয়ে হবে এবং চলে যাবে। এতদিন যে কোন ছেলেই থেকেছে, তার খাওয়া দাওয়ার খরচা আমি করেছি। কিন্তু বিয়ের পর হয়ত সেই ছেলে এবং তার স্ত্রীরও ভার নিতে পারি। কিন্তু আমার ছাত্রের বিবাহের পর তাদের নূতন জীবনের আনন্দে, আমার সুবিধার জন্য কেন বাধা দেব? বিয়ে করে নূতন বৌর স্বাভাবিক ইচ্ছা হতে পারে, তার স্বামীর সঙ্গে স্বাধীন ভাবে থাকবে, ঘুরবে। অথচ আমার জন্য ছাত্র আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। নিজের স্বার্থের জন্য, একটা মেয়ের জীবনের স্বপ্নের বাধা স্বরূপ হয়ে, আমি কেন দাঁড়াব? তাছাড়া আজকাল সেই রকম ছাত্রই বা কোথায়? আজকাল একটু শিক্ষা করবার পরেই, বাজানর জন্য ছটফট করে। কয়েকটা ছেলেকে তো শেখালাম। যে সময় একটু রাস্তায় আনলাম, সেই সময় পিপীলিকার পাখা গজিয়ে গেল। যার জন্য এখন আর কাউকে শেখাতেও ইচ্ছা করে না। কাউকে শেখাতে গেলে কতটা মাথা খারাপ হয়, তা তো বোঝেন? এত কষ্ট করে শেখাবার পর, মধ্যপথে যখন ছেদ পড়ে যায়, সেটা কত কষ্টকর তা কি বোঝেন না? এ সব ভেবে কোন লাভ নাই। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।' বললাম, 'কথাটা ঠিক পুরুষাকারের চেয়ে দৈবই প্রবল। তবু পুরুষাকারের একটা মূল্য আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'লেকচার বন্ধ করুন। ভগবান থাকলে, আমার কপালে এরকম হবে কেন? জ্ঞানতঃ কোন পাপ করিনি, অথচ যাঁরা সত্যকারের জ্ঞান-পাপী, তাঁরা তো দিব্যি আরামেই আছে।'

বললাম, 'সত্যের আদর্শে যাঁরা চলে, তাঁদের শেষে ভাল হতে বাধ্য। এবং যাঁরা অসৎ পথে চলে, সাময়িক ভাবে বাড়লেও তাঁদের শেষ পরিণতি বড়ই দুখদ। এঁর দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি দিতে পারি।' আমার জীবনটাই দেখুন না। কি হতে চেয়েছিলাম? যা হতে চেয়েছিলাম, তা না হয়ে কি হয়েছি? দেখুন কেউ নাম করে, এবং কেউ কাজ করে। তেল এবং সলতে ছাড়া আগুন জ্বলে না। কিন্তু সকলেই প্রদীপ বলে। তেল এবং সলতে ছাড়া প্রদীপের যে কোন অস্তিত্বই নাই, এটা কটা লোকে বলে? তাই তো কার্ল মার্কসকে যখন একজন জিজ্ঞাসা

করেছিলেন, 'হোয়াট ইজ হ্যাপিনেস?' জানেন, তার উত্তরে কার্ল মার্কস কি উত্তর দিয়েছিলেন? বলেছিলেন, 'স্ট্রাগল।' বাংলাতেও একটা প্রবাদ আছে, 'সংঘর্ষই জীবন এবং জড়ত্বই মৃত্যু।'

এই কথা বলেই লক্ষ্য করলাম, ঘড়ির কাঁটা পাঁচটায় ঠেকেছে। বুঝলাম স্নান এবং খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। বললাম, 'আপনার কথার মধ্যেও যুক্তি আছে। তা সত্ত্বেও একটা রাস্তা বার করতে হবে। এখন যাবার সময় হয়ে গিয়েছে। আগামী কাল আবার আসব।'

অন্নপূর্ণাদেবী মোড়া থেকে উঠে বললেন, 'চা করে দিচ্ছি। চা খেয়ে যান। কাল আসুন, কিন্তু আমার জন্য অযথা চিন্তা করবেন না। মৃত্যুই আমার সব সমাধান করবে।' একথা শুনে বললাম, 'বারবার মৃত্যুর কথা কেন বলেন? যাঁরা কাপুরুষ তাঁরা বারবার মরে, কিন্তু যে বীর সে কেবল একবারই মরে? আপনি কি কাপুরুষ?' সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কাপুরুষ কথাটায় আমার কি যায় আসে? কারণ আমি বাঁচতে চাই না।' অবাক হয়ে ভাবি, এই এক কথা কেন বারবার বলেন? মনে হয়, অন্তরদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মৃত্যুর কথা চিন্তা করেন। চা খেয়ে হোটেলে যাবার আগে বললাম, 'আপনার উত্তর কাল এসে দেব।' মনে মনে বলি আপোষের দুইধারা। একদিক ছেড়ে দিয়ে, অন্যদিক ধরতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো দিকই খোয়াতে হোল। একা থাকার অনেক অসুবিধা। মনে মনে আর একটি পন্থা ভেবেছিলাম, যদিও জানতাম বাস্তবে কখনও তা সম্ভব হবে না। তাই অন্নপূর্ণাদেবীকে বলতে সাহস পেলাম না কারণ পরিস্থিতির গুরুত্ব হ্রাস করবে। সেই হোল, যদি উনি আলিআকবরের পরিবারের সাথে কোলকাতায় গিয়ে থাকেন। ওঁদেরও কোন অভাব নাই, আর অন্নপূর্ণাদেবীরও কোন চাহিদা নাই। মাঝখান থেকে আলিআকবরের ছেলেরা মানুষ হয়ে যেতো। কিন্তু ভেবে স্থির করলাম তা সম্ভব নয়। যাঁরা সীতাকে বনবাসে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোন, তাঁরা নিশ্চয়ই বনবাসের অবসান করিয়ে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হবেন না।

হোটেলে এসে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। আজ সকালে পিন্তিজি হায়দ্রাবাদ গেছেন। আগামীকাল ফিরবেন। আজ তাঁর বাড়ী যাব না। তাই বিছানায় আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে, অন্নপূর্ণাদেবীর অভিশপ্ত জীবনটা বারবার আমার কাছে নানাভাবে আলোড়নের সৃষ্টি করতে লাগলো। জীবনে আমি বহু বিবাহিত মহিলা দেখেছি। কয়েকটা ব্যাপারে, আমার চোখে অন্নপূর্ণাদেবী অনন্যা। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে। 'কিউরিওসিটি ইজ এ ফেমিনিন ভাইস।' কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবী হলেন ব্যতিক্রম। তাঁকে কখনও, অন্যের ব্যাপারে পরনিন্দা, পরচর্চা করতে দেখি নি। এ ছাড়া অন্যের ব্যাপারে কিছু শুনবার কৌতূহলও দেখি নি। সাধারণতঃ বিবাহিতা মেয়েরা যা চায়, তা হোল প্রথম নিরাপত্তা, গয়না, স্বামীর সঙ্গে দেশ ঘোরা, নিজের স্বামীর গরবে গরবিনী হয়ে সকলকে নিজের ঐশ্বর্য দেখানো ইত্যাদি। কিন্তু দীর্ঘ তেত্রিশ বছর আগে মৈহারে যখন প্রথম দেখি, যেমন সহজ, সাধারণ, আজও তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পাই না। মনে হয় সঙ্গীতের যে বিরাট সম্পদ তাঁর কাছে আছে, তার জন্য পৃথিবীর কোন ঐশ্বর্যই তাঁকে প্রলোভিত করতে পারে নি। এ না হলে কি, কোন মেয়ে মিউচিয়াল সেপারেশানের পর এই সামান্য অর্থে রাজী হতে পারে?

উপনিষদে আছে ঋষি যাজ্ঞবল্কির কাহিনী। সে কাহিনী সবাই জানে। কাহিনীতে আছে যাজ্ঞবল্কের দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথমজনের নাম হোল কাত্যায়নী এবং দ্বিতীয়জনের নাম হোল মৈত্রেয়ী। যাজ্ঞবল্ক যখন বানপ্রস্থে যাবার আয়োজন করলেন, তখন দুই স্ত্রীকে কাছে ডাকলেন। প্রথম স্ত্রীকে বললেন, 'আমি এবার বানপ্রস্থে যাব। আমার যা কিছু সম্বল এবং সম্পত্তি আছে, সবই তোমাদের দুজনের মধ্যে ভাগ করে, দান করে দিয়ে যেতে চাই।'

কাত্যায়নীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কি চাও বল?' উত্তরে কাত্যায়নী বললেন, 'আমার সব চাই। আপনার জমি, জমা, পুকুর, গরু প্রভৃতি যা কিছু আপনার নিজের নামে আছে, সবই আমার চাই।'

যাজ্ঞবল্ক তখন মৈত্রেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবারে মৈত্রেয়ী তুমি বল, তোমার কি চাই?'

মৈত্রেয়ী স্বামীকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আর্য আমার কি চাই এই উত্তর দেবার আগে, আমাকে এ কথা বলুন, আপনি কেন এসব পরিত্যাগ করছেন?' উত্তরে ঋষি বললেন, 'এ সবই নশ্বর। এতে পরমার্থের বোধ হয় না, তাই অর্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছি, পারমার্থিক তত্ত্ববোধের আশায়। নশ্বরকে ছাড়লাম, তবেই চিরন্তন প্রাপ্তি হবে।' এই কথার উত্তরে মৈত্রেয়ী বললেন, 'আমার কিছুই চাই না।' যাজ্ঞবল্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে কি নিয়ে তুমি থাকবে?' মৈত্রেয়ী বললেন, 'কিমহং তেন কুর্যাম, যে নাহং অমৃতম তাম কিম কুর্যাম?' অর্থাৎ যা নিয়ে আমি অমর হবো না, তা নিয়ে আমার কি লাভ? আমার সেই বস্তুর দরকার নাই যার দ্বারা জ্ঞান, ভক্তি পরমাত্মার দর্শন হয় না।'

এই মৈত্রেয়ীর বাণী ভারতবর্ষের আত্মার বাণী। ভারতের সেই আত্মা, ধন, জন সম্পদ, সম্পত্তি কিছুই চায় না। সে কেবল চায় অমৃত। সংসারের এক জাতির মানুষ চায় ধন, জন, সম্পদ, সম্পত্তি ইত্যাদি, আর অতি অল্প সংখ্যক লোক চায় মৈত্রেয়ীর বাণী। মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে উপনিষদকার প্রকাশ করেছেন। মৈত্রেয়ী হলেন সেই মুষ্টিমেয় লোকেরই প্রতিনিধি। আমার মনে হোল, অন্নপূর্ণাদেবীও সেই জাতীয় মানুষের প্রতীক। অন্নপূর্ণাদেবীও জীবনে কিছুই চান নি। বাবার কোন সম্পত্তির উপর তাঁর কোন লোভ ছিলো না, কারণ তিনি বাবার কাছ থেকে 'সুর' পেয়েছেন। সেই সুরই তাঁর কাছে অমৃত। এই 'সুর' নিয়েই তিনি এখনও জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন, এবং যতদিন বাঁচবেন ততদিন সুরই হবে তাঁর জীবনের পাথেয়।

উপস্থিত অন্নপূর্ণাদেবীর ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবেই চিন্তা হচ্ছে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'হাউ ক্যান এ ম্যান বি পিসফুল হোয়েন হি হ্যাজ নো ফিউচার?' অন্নপূর্ণাদেবীর ভবিষ্যৎটা আমার কাছে অন্ধকারই মনে হোল। এর সমাধান কি? নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো। বিছানা থেকে উঠেই, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। পরের দিন দুপুরবেলায় পিন্তিজি টেলিফোন করে বললেন, 'এইমাত্র হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরেছি। রাত্রে আটটার সময় গাড়ী পাঠিয়ে দেব।' বিকেল তিনটের সময় অন্নপূর্ণাদেবীর ফ্লাটে যাবার আগে, মনে হোল, অন্নপূর্ণাদেবীর এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এটা বাঁচাও নয় মরাও নয়। এই ভাবেই তাঁকে রাখা হয়েছে। কিন্তু এ কথাটা সে ভুলে গেছে, কারও সর্বনাশ করলে এত সহজে পার পাওয়া যায়

না। তাঁর জানা উচিত ছিলো, সব মেয়েমানুষই নিরীহ গোবেচারা নয়। মেয়েদেরও আত্মসম্মান আছে। তাঁদের প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে। এ পাপের কোন জবাবদিহি নেই। কোনও প্রায়শ্চিত্তও নেই। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ফ্লাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, খেয়াল করি নি। খেয়াল যখন হোল, কলিংবেল বাজালাম। দরজা খুলবার পর বললাম, 'ভয় নেই। আপনার বেশীক্ষণ সময় নেব না। কয়েকটা কথা বলেই চলে যাব। আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা কথা চিন্তা করেছি। সেই কথাটা বলেই বিদায় নেব।'

আমার কণ্ঠের আন্তরিকতা বুঝে বললেন, 'কি আর নূতন কথা বলবেন? ঠিক আছে, ড্রয়িং রুমে বসুন। আমি পাঁচ মিনিটেই কাজ সেরে আসছি।' মনে স্বস্তি পেলাম। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, সংক্ষেপে কি ভাবে আমার কথাগুলো বলব। হঠাৎ বাবার কথা মনে হোল। কয়েকটা জিনিষে বাবার সঙ্গে অন্নপূর্ণাদেবীর খুব মিল আছে। বাবাকে কখনও অলসভাবে বসে থাকতে দেখি নি। সর্বদাই একটা না একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অন্নপূর্ণাদেবী ঠিক বাবার স্বভাব পেয়েছেন। এ যাবৎ কখনও তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখি নি। সর্বদাই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত আছেন। এ ছাড়া বাবার মতই বাইরে থেকে খুব কঠিন মনে হলেও, ভেতরে অত্যন্ত নরম প্রকৃতি। ভেতরের এই কোমল স্বভাবটা প্রকাশ করেন না।

কিছুক্ষণ পরেই এসে নিজের স্থানে ছোট মোড়াটায় বসলেন। বললাম, 'যদিও জানি আমার বলার কোন অধিকার নাই। প্রথম বম্বেতে এসেই যে দিন দেখা করতে এসেছিলাম, সে দিন কি বলেছিলেন সে কথা ভুলিনি। কিন্তু কি করব? আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। তাই আপনার প্রথম দিনের কথার পরেও এসেছি। আপনাকে যদি কেউ এ কথা বলতো, তাহলে কি তাঁর কাছে ভবিষ্যতে কখনও যেতেন?' অবাক হয়ে উত্তরে বললেন, 'বম্বে আসার প্রথম দিনে আমি কি বলেছিলাম?' বললাম, 'যদিও আপনার মানসিক অশান্তির কথা বুঝতে পারি, তা সত্ত্বেও আপনার প্রথম দিনের কথাটা আমি ভুলতে পারি নি। আপনি বলেছিলেন, 'আমার নিজের দাদা, স্বামী থাকতেও তাঁরা কেউ কিছু করলেন না। আপনি আমার জন্য কি করবেন? আপনি আমার কে? আপনি তো আমার পর। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। সত্যই তো আমি আপনার কে? রক্তের তো কোন সম্বন্ধ নাই। কথাটা তো ঠিকই। আজকের যুগে মানুষ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম বিশ্বাস করে মানুষকে।'

আমার কথা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হেসে বললেন, 'সত্যি আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। কবে রাগের মাথায় বা দুঃখে কোন প্রসঙ্গে, কি কথা বলেছি সে কথাটা মনে রেখেছেন। আপনি কি জানেন না, আপনাকে খুব নিজের না ভাবলে, এই সব বিষয় নিয়ে কখনও এত কথা বলতাম?'

যাক বুঝলাম বরফ একটু গলেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'গতকাল যে কথাগুলো বলেছিলাম, তা তো এক কথায় নস্যাৎ করে দিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় সে কথাগুলো একবার নিশ্চয়ই ভেবেছেন। ধরুন, আপনি যদি বাবা কিংবা মায়ের মত দীর্ঘজীবি হন, তাহলে শেষ বয়সে কে আপনাকে দেখবে? দীর্ঘজীবি হওয়ার যে কি যন্ত্রণা, তা আমি দেখেছি। আর সেই দেখার ফলেই, মাঝে মাঝে ভাবনা হয়। যাক আপনি ভাবুন আর নাই

ভাবুন, আমি আপনার ভবিষ্যৎ ভেবে একটিই পন্থা ভেবেছি। গতকাল যে কথাটা বলেছিলাম, সেইটাই একমাত্র রাস্তা আপনার নিরাপত্তার জন্য। আপনার কাছে যে কয়েকটি ছেলে শেখে, তাঁদের মধ্যে যে কম বয়স্ক, তাঁকে নিজের বাড়ীতে রেখে শেখান। আমার মনে হয়, যে ছেলেটিকে আপনি বাড়ীতে রেখে শেখাবেন, তাঁর বাবা মা হাতে স্বর্গ পাবে। এ সুযোগ ক'জনে পায়? ছেলেটি বিবাহের বয়স হলে চলে যাবে। যাক, ক্ষতি নাই। আবার একটা ছেলে নিজের কাছে রাখবেন। সেইজন্য আগেই বলেছি, কমবয়স্ক ছেলে হোলে অন্ততঃ আট বছর তো থাকবেই। এ ছাড়া তো আর কোন রাস্তা দেখি না। আপনার পক্ষে একলা থাকা বিপদজনক। কেন বিপদজনক সেই কথাই আগে বলি।

দীর্ঘ তেত্রিশ বছর আগে যে সময়ে প্রথম মৈহার যাই, সেইসময় প্রথম আপনার ফিট হওয়া দেখি। মৈহারে বহুবার আপনাকে ফিট হয়ে যেতে দেখেছি। ফিটের রোগ আপনার এখনও আছে। যদি কোন বিপদ আপদ হয়, তাহলে রাত বিরাতে একলা কি করবেন? যাক এ কথা। একটা কথা বলুন তো, এখানে ফায়ার ব্রিগেডের টেলিফোন নম্বরটা কত? আপনি কি বলতে পারেন?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফায়ার ব্রিগেডের নম্বর আমি কি করে জানব? সে টেলিফোন ডাইরেক্টারি দেখতে হবে।' উত্তরে বললাম, 'টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা একটু দেবেন?' আমার কথা শুনে বললেন, 'আমার ঘরে ঢুকেই ডান দিকে ডাইরেক্টারিটা আছে। সেটা নিয়ে আসুন।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্টারিটা নিয়ে এসে বললাম, 'দেখুন তো ফায়ার ব্রিগেড-এর নম্বরটা কত?'

উত্তরে বললেন, 'ও সব আমি জানি না। আপনি নিজে দেখে নিন।' ডাইরেক্টারি দেখতে দেখতে বললাম, 'আমার কয়েকদিন হোল এলার্জি হয়েছে। আপনার জানাশোনা কোন ডাক্তার আছে?' উত্তরে বললেন, 'আমার ডাক্তার ছাত্রী আছে।' বললাম, 'দয়া করে আপনার ডাক্তার ছাত্রীর টেলিফোন নম্বরটা বলবেন?' উত্তরে, উঠে গিয়ে একটা বড় মোটা খাতা নিয়ে এসে বললেন, 'এই খাতাটাতে সারকেলের সকলের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর পাবেন।'

নামটা খুঁজে টেলিফোন নম্বর বার করে, আমার ব্রিফকেসটা খুললাম। একটা রেড ডটপেন বার করে, টেলিফোন ডাইরেক্টারির মধ্যে নাম এবং নম্বর লিখলাম। অবাক হয়ে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'এ কি লিখছেন ডাইরেক্টারিতে?'

উত্তরে বললাম, 'ক্ষমা করবেন। আপনার বিদ্যার দৌড়টা এতক্ষণ পরখ করছিলাম। আপনার বাড়ীতে ডাইরেক্টারি আছে, কিন্তু কখনও কি খুলে দেখেছেন? কিছু মনে করবেন না। আপনি কেবল তিনটি জিনিষই জানেন। প্রথম হোল সংগীত। দ্বিতীয়তঃ হোল অতিথি সৎকার এবং তৃতীয়তঃ হোল ঘুমোনোর সময় ছাড়া দিন রাত কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।'

ভ্রূ কুঁচকে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কি আবোল তাবোল বলছেন? প্রথমে বললেন, ফায়ার ব্রিগেডের নম্বর কত? তারপর বললেন,

ডাক্তারের টেলিফোন নম্বর কত? তারপর কি সব আজেবাজে অসংলগ্ন কথা বলছেন? আমি নাকি তিনটি জিনিষই মাত্র জানি।'

হেসে বললাম, 'আমার মাথা খারাপ হয় নি। আপনাকে এতক্ষণ একটু পরীক্ষা করলাম। একা একা বাড়ীতে থাকেন। ধরুন যদি বাড়ীতে আগুন লেগে যায়, তাহলে কি করবেন? টেলিফোন ডাইরেক্টারির প্রথম পাতায়, প্রয়োজনীয় নম্বরগুলো লেখা আছে, সেগুলোও আপনি জানেন না। হঠাৎ যদি শরীর খারাপ হয়, তাহলে এই জাবদা খাতা খুঁজে আপনার ডাক্তার ছাত্রীর নম্বর খুঁজতে হবে। নম্বর খুঁজে বার করবার আগেই আপনার গয়াগোবিন্দ হয়ে যাবে। টেলিফোন ডাইরেক্টারিতে আপনার ডাক্তার ছাত্রীর নম্বরটা লাল কালি দিয়ে লিখে দিলাম। এ ছাড়া যেগুলি বিপদ আপদে প্রয়োজনীয়, সেগুলোর নম্বরের নীচে, লাল কালি দিয়ে আণ্ডার লাইন করে দিলাম।' এই কথা বলে ডাইরেক্টারিতে প্রয়োজনীয় নম্বরে যে আণ্ডার লাইন করেছিলাম, দেখালাম। বললাম, 'যাক এ সব কথা, একটা কথা বলুন তো? সারাদিন রাত আপনি একলা কাটান কি করে? বাড়ীর বাইরে দেশে বিদেশে বেড়াতে ইচ্ছে করে না? পণ্ডিতেরও বরাবরই অভিযোগ ছিলো, আপনাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে, আপনি বরাবরই বাইরে বা বিদেশে যেতে আপত্তি করেছেন। কিন্তু কেন?' গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বাইরে বেড়াতে যাওয়াটা আমার কাছে বিলাসিতা মনে হয়। বন্ধ ঘরের মধ্যে সারা পৃথিবীর ভাল মন্দকে অনুভব করতে আমার ভাল লাগে। বাড়ীর ভেতরেই দেখতে, শুনতে, বুঝতে ভালবাসি।' এ কি অদ্ভুত চরিত্র? এ ধরনের মহিলা চরিত্র তো কখনও দেখি নি যে দেশ বিদেশে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা করে না। বললাম, 'ঠিক আছে, এ কথাটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু যে প্রশ্নটা আগে করেছি, সেই কথাটা বলুন তো? সারা দিন রাত একলা কাটান কি করেক এত বড় ফ্ল্যাটে?'

উত্তরে বললেন, 'আপনি তো জানেন, সপ্তাহে দুই দিন ন্যাশানাল সেন্টারে শেখাতে যাই। এ ছাড়া কিছু ছাত্র ছাত্রী বাড়ীতে এসে শেখে। সকাল থেকে উঠে, ঘরের সব কাজ করে, নিজের কাপড় জামা ধুয়ে, স্নান করে, পুজো করতে করতেই বারোটা বেজে যায়।' কৌতূহল হল পূজা করেন শুনে। বললাম, 'কিসের পূজা করেন?' আমার অবাক ভাব দেখে বললেন, 'চিরকালটাই আমি বাবা, মা এবং সঙ্গীতকে পুজো করেছি। কিন্তু বাবা মারা যাবার কিছুদিন পরে ঘুমের মধ্যে বাবাকে একদিন দেখলাম। স্বপ্নে দেখলাম, বাবা আমাকে বলছেন, মা তুমি মন্ত্র জপ করো। স্বপ্ন ভেবে কিছু করলাম না। পরের পর কয়েকদিন স্বপ্নে বাবাকে দেখলাম। একদিন দেখলাম, বাবা রাগ করে বলছেন, সকালে এবং রাত্রে, 'জয় শ্রী কৃষ্ণ' বলে জপ করবে। তারপর থেকেই জপ করি এবং পূজা করি।'

স্বপ্নমন্ত্র পাওয়া অনেকের কাছে শুনেছি। কিন্তু কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলুন তো? এত বড় ফ্লাটে একলা থাকেন, রাত্রে ভয় করে না? আমার কথা শুনে স্লান হেসে বললেন, 'আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিলো শুভ। শুভর যাবার পরে আমার সব আশা ভরসা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। জীবনের বেশী ভাগ তো কেটেই গেল। বাকিটা এই রকম ভাবেই কেটে যাবে। একলা থাকতে থাকতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। একলা

থাকতে আমার কোন ভয় করে না। বাবা আমাকে যে অমূল্য শিক্ষা দিয়েছেন তার ফলে রাত্রে একলা থাকতে আমার কোন ভয় করে না। আমার ঘরে সর্বদাই পাহারাদার থাকে।' এই কথা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা কথাচ্ছলে মৃত্যুর তিনবছর আগে, আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'অনন্ত সাগর, সঙ্গীতের মধ্যে যদি প্রবেশ করতে পারো, তাহলে কয়েকটা জিনিষ উপলব্ধি করবে। তবে সেই উপলব্ধিগুলো কখনও কাউকে বলবে না। বললে, মনের মধ্যে অহঙ্কার আসতে পারে। আর অহঙ্কার এলেই সেই উপলব্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এই উপলব্ধির কথা নিজের শিষ্য এবং পুত্রকে নিশ্চয়ই বলবে, যদি তাঁর মধ্যে সেই উপলব্ধির ভাব দেখতে পাও।' বাবা কয়েকটা উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। সেই উপলব্ধির মধ্যে, একটা জিনিষ মনে পড়ে গেলো অন্নপূর্ণাদেবীর কথা শুনে। উনি কি সত্যই সেই জিনিষ উপলব্ধি করেছেন? উপলব্ধি যদি না করতেন, তাহলে এই কথা হঠাৎ বললেন কি করে?

মনে মনে বলি, যতই উপলব্ধি থাকুক না কেন কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, নিঃসঙ্গতা কতটা কষ্টকর। কারোর সঙ্গে মন খুলে তো দূরের কথা।' এমনিও একটা কথা বলবার কেউ নাই। যদিও এটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, তবুও এই নিঃসঙ্গতা কষ্টকর তো বটেই। না হয়, নাই থাকলো বলার মত কোন কথা। তবু বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও, কথা বলতে না পারা কি কম কষ্ট? একটু কথা বলা, কিছু আলোচনা করা, বা কোন পরামর্শ নেবার মত একটা লোকও নাই। অবাক হয়ে ভাবি, একা থাকতে ভয় করে না এতবড় ফ্লাটে। প্রত্যেক জিনিষে মানুষের ভয় থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম বৈরাগ্য। ভোগের মধ্যে রোগের ভয় হয়। যাঁরা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের ভয় থাকে যেন তাঁদের অধঃপতন না হয়। বেশী টাকা থাকলে ইনকাম ট্যাক্সের ভয়। শাস্ত্রজ্ঞ হলে বাদ বিবাদের ভয়, শক্তি থাকলে শত্রুর ভয়, সৌন্দর্য থাকলে বার্দ্ধক্যের ভয়, বিনয় থাকলে দুষ্টকে ভয়, শরীর থাকলে মৃত্যু ভয় থাকে।

এ সব কথা বলার তাৎপর্য এই যে, সংসারে সব জিনিষের মধ্যেই ভয় আছে। কেবল বৈরাগ্যতেই একমাত্র নির্ভয়তা। তা হলে কি অন্নপূর্ণাদেবীর মধ্যে সেই বৈরাগ্য এসেছে, যে কথা বাবা বলেছিলেন। মনের সংশয় দূর করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যে বললেন আপনার ঘরে পাহারাদার থাকে, সেটা কি?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, যে কথা বললেন, শুনে অবাক হলাম। আমার অবাক ভাব দেখে বললেন, 'এসব কথা কাউকে বলবেন না। আপনি জেদী, না বললে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবেন বলেই বললাম।' মনে পড়ে গেল বাবার কথা। আজ বুঝলাম কেন সঙ্গীতের এত ঊর্দ্ধে অন্নপূর্ণাদেবী। সকলেই তো বাবার কাছে শিখেছেন, কিন্তু সকলের বাজনার সঙ্গে এত পার্থক্য কেন অন্নপূর্ণাদেবীর, বুঝলাম। মনে মনে ভাবলাম একেই কি বলে বৈরাগ্য? মনে হয় আধ্যাত্মিক শক্তির যেন একটা উৎস কোথাও আছে।

এই উপলব্ধি কি সেক্সপিয়ারের হয়েছিলো। এ না হলে কি করে তিনি লিখেছিলেন, 'দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন এনড আরথ্ হোরোশিও দ্যান আর ড্রেমট অফইন

ইয়োর ফিলজফি।' যাক এ কথা। কেননা যুক্তি তর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা চলে না। অন্নপূর্ণাদেবীকেও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করলাম না।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাবছেন?' যা ভাবছিলাম সে কথা না বলে বললাম, 'আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি, এই সংসারে যাঁরা সাহস করে 'জয় মা' বলে ঝাঁপ দিতে পারে, তাঁরা কখনই ব্যর্থ হয় না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষেরই এই সাহসটুকু নেই। তবুও মনে মনে ভাবি, যদিও ব্যর্থ হয়েছি, তবুও কোন এক অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে ঘন অন্ধকার রাত্রের, জীবন নদীর এক একটা খেয়া ঘাট, নির্বিবাদে পার করে দিয়েছে। একেই কি বলে ভগবান না ভাগ্য? আপনাকে যে কথাগুলো বললাম, ভেবে দেখবেন।' উত্তরে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, 'যাক এ সব কথা।'

বুঝলাম, কেন এই সব আলোচনা আর করতে চাইছেন না। আজকাল ভালো জিনিষের চেয়ে, তাঁর ছায়াটা আগে নজরে পড়ে। গোলাপ শব্দটি শুনতেই, মনে পড়ে কাঁটার কথা। চাঁদের উল্লেখে তার কলঙ্কের, সূর্যাস্তের প্রসঙ্গ উঠলে মশার। আধুনিক কোন জিনিষই, আধুনিককালের লোকেরা দু চক্ষে দেখতে পারে না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্নপূর্ণাদেবীর কথায় নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরে পেলাম। বললেন, 'পাগলের মতো কি এত ভাবেন? এতক্ষণ অনেক বাজে কথাবার্তা হয়েছে। কাজের কথা বলুন। একটা কথা বলুন তো আপনার ছেলে কতক্ষণ বাজনা বাজায়?'

বম্বে এলেই প্রতিবার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। বললাম, 'দেখুন বাবার আদেশে ছেলেকে সরোদ বাজনা শুরু করিয়েছিলাম। ছেলে বাদক হবে, এ কথা ভেবে আমি শুরু করাই নি। ভেবেছিলাম, লেখাপড়ার সঙ্গে যদি সঙ্গীতের প্রতি প্রেম হয়, তা হলে অন্ততঃ অসৎসঙ্গ থেকে বেঁচে থাকবে। সেটা বাবার আশীর্বাদে সফল হয়েছে। লেখাপড়ায় ক্ষতি হবে বলে, বাজনার জন্য খুব জোর দিই না। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যে রুচি আছে। আমি যখন বাজাই, ঘরের বাইরে থেকে শোনে। হঠাৎ ঘর থেকে বের হবার সময় দেখেছি। আমাকে দেখেই, সঙ্গে সঙ্গে যে রাগ শোনে, জোরে জোরে বাজাতে আরম্ভ করে। শুনে শুনে দেখি, কিছুটা নকল করেছে। সেই সময় ভুল বাজালে ঠিক করে দিই। উপস্থিত দুই মাস আগে, কাশীর ধ্রুপদ সম্মেলনে মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের কথায়, ছেলেকে বাজাতে দিয়েছিলাম। শুভর কথা ভেবেই বাজাতে দিয়েছিলাম, পাছে কেউ তাকে নিরাশ না করে। ছেলের ঝোঁক নানা তালে বাজান। কাশীতে আধ মাত্রা, পৌন মাত্রা, সওয়া মাত্রা, মহন্তজীর ছেলে বিভূতি নারায়ণ মিশ্রের সঙ্গে 'মৃদঙ্গে' বাজিয়েছে। মহন্তজীর কথায়, এবারে সঙ্কটমোচনে তিনমাস পরে তবলার সঙ্গে বাজাবে। তারপর আর বাজাতে দেব না। লোকের প্রশংসায় নষ্ট হয়ে যাবে। বাজনার লাইনে দেবার ইচ্ছাও আমার নাই। যে রাজনীতির মধ্যে নিজের জীবন কাটালাম, তার পরিণতি দেখে চাই না, সে এই লাইনে থাকে। লেখাপড়ায় ভাল। আমার ইচ্ছা এম. এ. পাশ করে একটা চাকরি করুক। সঙ্গীতটা অবসরের সাথী হলেই ভাল। বাজনার মধ্যে এখনও সিরিয়াসনেস আসে নি। বাবার আশীর্বাদে এখনও কোন বদ নেশা হয়নি।

'ভবিষ্যৎ এ কি হবে জানি না? তবে এ যাবৎ বাবার আদর্শেই শিক্ষা দিয়েছি।' আমার

কথা শুনে বললেন, 'বাজনার মধ্যে যখন এত রুচি আছে, তখন রোজ নিয়ে কেন বসেন না?' বললাম, 'রোজ বসে প্রথম অনেকদিন শিখিয়েছি, কিন্তু শেখাতে গেলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। লেখাপড়া শেষ হলে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার কাছে শিখলে সিরিয়াস হবে। এখনই বলে রাখছি, আপনার কাছে এসে গণ্ডা বাঁধাব এবং আপনাকে শেখাতে হবে।'

উত্তরে বললেন, 'আমি এ কথা বিশ্বাস করি না, লেখাপড়ার সঙ্গে বাজান যায় না। দিনরাত তো পড়ে না। যখন লেখাপড়া করবে না, সেই সময় বাজাবে। আপনার ছেলেকে নিশ্চয়ই শেখাব, তবে গণ্ডা আমি এ যাবৎ কাউকে বাঁধি নি। কোলকাতায় গিয়ে, মা'র কাছে গণ্ডা বাঁধিয়ে আসবে, তারপর আমি শেখাব।'

বললাম, 'মা'কে নিয়ে গণ্ডা বাঁধাতে আমার তো কোন বাধা নাই, কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, বাবার মৃত্যুর পর আমি কোলকাতার বাড়ীতে এ যাবৎ যাই নি। মা'কে দেখতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু কোলকাতায় গিয়েও বাড়ী কেন যাই না, সে কথা তো একবার আপনাকে বলেছিলাম। সুতরাং আপনাকে গণ্ডা বাঁধতেই হবে এবং শেখাতে হবে।'

আমার কথা শুনে বললেন, 'আপনি না গেলে, আপনার স্ত্রীকে দিয়ে পাঠাবেন ছেলেকে। আসলে, আমি আজ পর্যন্ত যাঁকেই শিখিয়েছি, তাঁকে কোলকাতায় পাঠিয়েছি। মা'র কাছে গণ্ডা বেঁধে আসবার পর তবে শিখিয়েছি। মা যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন এই নিয়মই চলবে।'

এই কথা শোনার পর বললাম, 'ঠিক আছে, পরে সময় হলে দেখা যাবে। উপস্থিত আপনার সমস্যার যে সমাধান বললাম, স্থির চিত্তে চিন্তা করবেন। আপনার এই শরীর খারাপের সময়, দিন রাত্রি একটা ছাত্রকে নিজের কাছে রাখুন।'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কটা বেজেছে দেখুন তো?' সময়ের খেয়াল ছিলো না। দেখলাম বিকেল পাঁচটা বেজে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। বললাম, 'কথায় কথায় সময়ের খেয়াল ছিলো না। আপনার সময় পেরিয়ে গিয়েছে।'

হেসে বললেন, 'এতক্ষণ যখন মাথা খেয়েছেন, চা খেয়ে যান।' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'না-না-না। আমি হোটেলে গিয়ে চা খাব। রাত্রে পিণ্ডিজির বাড়ী যাব। আরো দুদিন আছি। তার পরেই রাত্রের ট্রেনে কাশী যাব।'

বললেন, 'আগামীকাল পুনা থেকে একটা ছেলে এবং মেয়ে শিখতে আসবে। তা ছাড়া, পরের দিন বম্বের একটি ছেলে এসে শিক্ষা করতে বসে আমার মাথা খাবে।' বললাম, 'তাহলে আমি পরশু কাশী যাবার আগে, বিকেলে আপনার সঙ্গে দেখা করেই কাশী চলে যাব।' আমার মনের কথাগুলো বলে আজ একটু হাল্কা বোধ হোল। কিন্তু মনে মনে অবাক হয়ে ভাবি এটা কি হোল? প্রত্যেক মানুষের জীবনেই সমস্যা আছে। সমস্যা চিরকালই ছিলো, চিরকাল থাকবে। সমস্যা যদি না থাকবে, তো কিসের জীবন? সকলেরই সমস্যা সুখ ও শান্তিতে। সকলেই সেটাকে মানিয়ে চলে। কিন্তু এখানে যে সমস্যার শেষ হয়ে গেল, অর্থাৎ অপমৃত্যু। কিন্তু তখন কি জানতাম যে হোটেলে গিয়েই এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হবো?

হোটেলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, ম্যানেজার আমাকে একটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ইনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। ভদ্রলোককে তো আমি চিনি না। আমার অবাক ভাব দেখে, ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। আপনি এই হোটেলে এসে উঠেছেন বলে, দেখা করতে এলাম। আমি একজন রিটায়রড ইঞ্জিনিয়ার। গান বাজনা ভালোবাসি। একটু তবলাও বাজাই। আপনার বাজনা শুনেছি। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম। আমার বাড়ী খুব কাছেই। যদি দয়া করে একদিন যান, তাহলে খুব খুশী হব। উপস্থিত আপনি কি খুব ব্যস্ত?' একনাগাড়ে এতগুলো কথা শুনে, বাধ্য হয়ে বললাম, 'দুই ঘণ্টা পরে আমি একজায়গায় যাব। ঠিক আছে আসুন আমার ঘরে।' কামরায় এসে বেল বাজালাম রুম সারভিসে। চায়ের পিপাসা তখন তীব্রতর। চা আসার ফাঁকে দেখলাম ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। এত শিক্ষিত হয়েও নিজের আনন্দের জন্য তবলার চর্চা নিয়মিত করেন। বুঝলাম, বহু গান বাজনা শুনেছেন এবং ভারতের বহু গায়ক বাদকের সঙ্গে পরিচয় আছে। কিছু শিল্পীর নামও করলেন, যাঁরা বম্বে এলে তাঁর বাড়ীতেই থাকেন। ভদ্রলোক এক ভীরু এবং এক সাহসী শিল্পীর, রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। মনে মনে অবাক হলাম। ভদ্রলোক অনেক খবর রাখেন।

ভদ্রলোককে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই সব সাহসী, ভীরু শিল্পী সম্বন্ধে কেন আমাকে বলছেন? আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আপনারা তো যন্ত্রে আলাপ শেষ করবার পর, 'গৎ' বাজান। তাই আপনাকে বক্তব্য বিষয় বলবার আগে, একটু 'আলাপ' করলাম। বুঝতে পারছি আপনি খুব ব্যস্ত। আপনাকে যেতে হবে শীঘ্র। কাল সকালে কি আপনার কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?' বললাম, 'কেন বলুন তো?' ভদ্রলোক বললেন, 'আমার বাড়ী আপনার হোটেল থেকে যেতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। আমি আগামীকাল সকালে এসে আপনাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব। সকালে ব্রেকফাস্ট আমার বাড়ীতেই করবেন। আপনি গেলে, আমি এবং আমার স্ত্রী অত্যন্ত খুশী হব। আমার স্ত্রী সখের গানের চর্চা করেন। আমরা দুজনেই, আপনার হরিদাস সঙ্গীত সম্মেলনে বাজনা শুনেছিলাম। কাল আমার বাড়ীতে 'গৎ' শোনাব। আজ কেবল 'আলাপ' হোল।'

ব্যস্ত থাকলেও ভদ্রলোককে রসিক মনে হোল। বললাম, 'ঠিক আছে, কাল আপনার বাড়ী যাব। কিন্তু আপনার 'ছোপ আলাপ' শুনে রাগ তো বুঝতে পারলাম না। ছোপ আলাপ হলেও শেষে রাগ বোঝা যায়।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ছোপ' আলাপের একটা স্বরই কেবল লাগাই নি। সেই স্বরটি বাড়ীতে যাবার পর আগামীকাল লাগাব। কিন্তু আমার মনে হয়, যদিও আমি 'ছোপ' আলাপ করেছি, কিন্তু আপনার কাছে 'অছোপ' নয়। যাক এখন চললাম।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। পিত্তিজির বাড়ীতে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। স্নান করতে করতে ভদ্রলোকের কথাগুলোই কেবল মনে হতে লাগলো। ভদ্রলোক সঙ্গীতের থিওরি জানেন। থিওরি না জানলে 'ছোপ' এবং 'অছোপ' আলাপ, জানলেন কি করে? বয়স বাড়লে

শুনেছিলাম, লোকে উত্তেজনা চায়, কথায় না ঘটনায়। আর সেই উত্তেজনা তাঁকে স্টিমুলেট করে তোলে। কিন্তু এ ভদ্রলোক ব্যতিক্রম। সাসপেন্স বজায় রেখে, বেশ চলে গেলেন আগাথা খ্রিষ্টির উপন্যাসের মতো। আভিজাত্যপূর্ণ বাচনভঙ্গি এবং উপস্থিতি, আমার কাছে ওঁর কথাগুলো আজেবাজে ভাবতে, বাধ সাধলো। যাক একটা রাতের কথা। দেখি রূপকটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

রাত্রে পিত্তিজির বাড়ী গেলাম। এ ভদ্রলোকের পরের জন্য কাঠ কাটার স্বভাব আছে। আর বেশীর ভাগ সময়েই কৃতজ্ঞেরা বাঘের মুখে ফেলে যায়। এক দুদিন মুহ্যমান থাকেন, তারপরই আবার ব্যাক টু দি নেচার। কোনদিনই নিজের মুখে কৃতজ্ঞদের নিন্দা করেন নি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃতজ্ঞতাটা অনুল্লিখিতই থেকে যেতো। আজ ব্যতিক্রম হোল। আলাপ বাজানোর পরেই বললেন, 'থাক, আর না।' চমকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে? কয়েকদিন ধরেই আপনাকে বিচলিত দেখছি।' মলিন হেসে বললেন, 'স্বজনের আঘাত।' বুঝলাম, যে আশ্রিতকে উনি একটা ভদ্রজীবন দিয়েছিলেন, সেই ওকে আঘাত করেছে। চট করে একটা উপনিষদের গল্প মনে পড়ে গেল এবং শুনিয়েও দিলাম। এক যুবক সন্ন্যাসী নদী তীরে স্নান করছিলেন। দেখলেন একটা বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে। গুরুর শিক্ষা মনে পড়ে গেল। জীবে সেবা কর্তব্য। দুহাত দিয়ে বিছেটাকে তুলে জলের বাইরে করতে গেলেন। বিছেটা কামড়াল। হাত থেকে পড়ে গেল আবার জলে। আবার তুললেন। আবার কামড়াল। আর্তনাদ করে যেই হাতটাকে সরিয়ে নিলেন আবার পড়ে গেল জলে। এই নিয়ে পরপর তিনবার যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোল, যুবক সন্ন্যাসী দূর ছাই বলে ভাবলেন, যাক জলে ভেসে। আমি ওকে জীবন দান করতে গেলেও ওর কৃতজ্ঞতা নাই, তাই ও মরুক। এই বলে যখন চলে যাচ্ছেন, দেখলেন নদীতীরে গুরু দাঁড়িয়ে আছেন। গুরু তিরস্কার করে বললেন, 'বিছের মত নিকৃষ্ট জীবও যদি নিজের স্বভাব ধর্ম না ছাড়ে, তুমি তো মানুষ। তাই সন্ন্যাসীর ঘোষিত ধর্ম, জীবে সেবা তুমি কি করে ত্যাগ করো?' শিষ্যের চৈতন্য হোল। আবার দু হাতে আঁচলা করে বিছেটাকে তুললেন। এবারেও সে দংশন করল কিন্তু যুবক সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল বেদনায় আর্ত হোল না। অবিচলিত হাতে, পরম করুণাময় দৃষ্টিতে, বিছেটাকে নিয়ে গিয়ে শুকনো স্থলের মধ্যে রাখলেন।

ঝোড়ো হাওয়ায় যেন মেঘ কাটলো। এক গাল হেসে পিত্তিজি বললেন, 'খুব ভাল করেছেন। ভুলে যাওয়া এই আপ্ত কাহিনীটাকে মনে করিয়ে দিয়ে।' তারপর বিভিন্ন কথার ফাঁকে বললেন, 'আপনাকে সেপ্টেম্বারে আমার কনফারেন্সে বম্বেতে বাজাতে আসতে হবে।' স্বীকৃতি জানিয়ে পান্থশালার পথ ধরলাম।

শক্ত, সমর্থ, ধৈর্যশীল বেটাছেলে প্রচণ্ড আঘাত না পেলে আর্তনাদ করে না। লোক মুখে শুনেছি, উপকৃতর কৃতঘ্নতায় উনি অভ্যস্ত। কিন্তু এবারের বিচলিত ভাবটা দেখে মনে হোল, ক্ষতটা অনেক গভীরে। আর গভীর না হলে, আমার সামনে ওঁনার এ বিষয়ে কথাই ফুটতো না। কি করতে পারলাম? বিচলিত বন্ধুর বেদনাকে তো লাঘব করতে পারলাম না। যে মানুষটা কোনদিন মুখর হন নি। তাঁকে বেদনায় মুখর হতে দেখলে কষ্ট হয়। আসার সময়

কানে বাজতে লাগলো পিন্তিজির সেই কথাটা। 'আপনি ওয়েসিস। স্বার্থান্বেষীদের পরিবেশেতে আপনি একটা রিলিফ।' ধীরে ধীরে রাতটা পার হতে লাগল। একটা জিনিষ ভুল হয়ে গিয়েছিলো, রাত্রি বেলায়। তা হোল এলার্ম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সকালের এলার্ম, তা হোল আমার জন্য বেড টি। অন্যান্য দিনের মত রুম সারভিস, সকাল নটাতেই চা পাঠাবে ধরে বসেছি। তাই যখন দরজায় করাঘাত হোল, চা এসেছে ভেবে দরজা খুলতেই, দেখলাম ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু পূর্ব নির্দ্ধারিত কথা মতোই এসেছি।' লজ্জায় হেসে ফেললাম। বললাম, 'সারারাত্রি চিন্তার আবোল তাবোল আবৃত্তি করতে করতে, আমাকে জাগিয়ে দেবার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।' ভদ্রলোক বললেন, 'সে আমি রিসেপসানেই শুনে নিয়েছি।'

যাক কোন রকমে ফ্রেস হয়ে, ভদ্রলোকের সাথে যাত্রা করলাম। আলাপ পরিচয়ের পার্টটা শেষ হবার পর, কোনরকমে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার গলঃধারণ করলাম। আসলে তখন আমার মন আকুপাকু দেখে ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, 'বয়েস হয়েছে তো। তাই কৌতুকপ্রিয়তাটা ঝোঁকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যাক আর আপনাকে জ্বালাব না। আমার ভীরুটা হচ্ছে পুরুষ। ঠিক নায়ক বলব না। ধরুন একটা বড় রোলের খলনায়ক। আর আমার বীর একজন নারী। তিনি এই গল্পের উপজীব্য বা নায়িকা। তারপরে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঘটনার জট খুললেন। অসাধারণ শব্দ বিন্যাস। অদ্ভুত সহমর্মিতা নিয়ে যা শোনালেন, তা আমার কাছে বিস্ময়কর। রীতিমতো খাবি খেতে লাগলাম। একে তো আদার ব্যাপারি বলেই ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ দেখলাম, ভদ্রলোক মাস্তুলের শীর্ষে দাঁড়ান ক্যাপটেন। ভাবলাম, কি করে জানলেন এত কথা? মনে হোল, ঠিকই বলেছিলাম অন্নপূর্ণাদেবীকে, আপনি যতটা নিজেকে আনপপুলার ভাবেন, ঘটনা কিন্তু তা নয়। স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে নিজেকে শ্রোতারূপে সীমিত রাখলাম।

বিকেলে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখলাম, পনেরো ষোল বছরের একটা ছেলে সেতার বাজাচ্ছে। ছেলেটির একটু বাজনা শুনে অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'এই ছেলেটিকে তৈরী করুন।' আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন কত দিন টেকে? একটু বাজাবার পরই দেখবেন পালাবে। এদের সমাজে চোদ্দ বছর বয়সেই বিবাহ হয়। ছেলেটির বাবাকে বলেছিলাম, কম করেও আরো আটবছর পরে বিয়ে দিলে তবে শেখাব। ছেলেটির বাবা রাজী হওয়াতে শেখাতে রাজী হয়েছি। ছেলেটি তিনবছর শিখছে।'

ছেলেটিকে বললাম, 'তোমার ভাগ্য ভাল। এই অল্প বয়সে সুযোগ পেয়েছো। এ সুযোগ হারিও না। খুব মন দিয়ে বাজাও।' অন্নপূর্ণাদেবীকে বললাম, 'বম্বেতে আবার সাত মাস পরে আসব। পিন্তিজি সেই সময় একটা কনফারেন্স করবেন। সেই সময় আবার দেখা হবে। তবে যে কথাগুলো আমি বলে গেলাম, সেটা একবার ভেবে দেখবেন।' রাত্রের ট্রেনে কাশী যাত্রা করলাম।

কাশীতে আসার পরেই উস্তাদ আলাউদ্দিন মিউজিক সার্কেলের চলতি বছরের ক্রিয়াকলাপের একটা রূপরেখা ঠিক করবার জন্য মিটিং হোল। সার্কেলের সেক্রেটারি, মহন্ত ডাক্তার বীরভদ্র

মিশ্রের বাড়ীতে, আমাদের কয়েকজন একত্রিত হলাম। প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনার পর ঠিক হোল এই বছরটাকে কনক্লুডিং ইয়ার অফ দি বারথ সেনটেনারি করা হবে। সারা বছরে তিনটে সেমিনার হবে, এবং একটা ছোট সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে। এ ছাড়া বছরের শেষে, একটা পূর্ণাঙ্গ কনফারেন্স হবে। তার জন্য এখন থেকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বসম্মতিক্রমে এই কার্যক্রমের রূপরেখা স্থির হবার পর, বাড়ী আসার সময় একটা নূতন কথা শুনলাম। কাশীতে রবিশঙ্করের রিম্পা কনফারেন্স-এর সময়ে, প্রেস কনফারেন্স হয়েছিলো। প্রেসের সাংবাদিকরা রবিশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'ভূপালে কি করে উনিশশো বাষট্টি সনে শতবার্ষিকী হয়েছিলো? যখন উস্তাদ আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেল একাশি সনে শতবর্ষ পালন করল।' উত্তরে রবিশঙ্কর বলেছে, 'ভূপালে ভুলক্রমে বাবার শতবার্ষিকী পালন হয়েছিলো। যেহেতু আমি শেষ সময়ে জানতে পারি, তাই যদিও আমি শতবর্ষ সমারোহে ভূপালে যোগদান করেছিলাম, কিন্তু আপত্তি করতে পারি নি।' উত্তরপ্রদেশের সব সংবাদপত্রেই ব্যাপারটা ফলাও করে ছাপা হয়েছিলো। এ কথা শুনে মনে হোল, যাক এতদিনে রবিশঙ্কর সত্যটা স্বীকার করেছে সাংবাদিকের কাছে।

আমাদের সংস্থার একজন সদস্য বলল, 'রিম্পা উনিশশো সাতাত্তর সন থেকে শুরু হয়েছে, এবং এর অধ্যক্ষ রবিশঙ্কর প্রতিবছর কনফারেন্স করেছে। আপনি বম্বে যাবার পর, এবারেও কনফারেন্স হয়েছে। কিন্তু এবারে একটা ব্যতিক্রম হয়েছে। আমাদের সম্মেলনে, বাবার একটি বিরাট প্রতিকৃতি মঞ্চের বাঁ দিকে রাখা হয়েছিলো, যার মধ্যে প্রত্যেক শিল্পীই মাল্যার্পণ করেছিলো। সেই কথা বোধ হয় শুনে, এই প্রথম রিম্পা বাবার একটি প্রতিকৃতি রেখেছিলো, মঞ্চে লোককে দেখাবার জন্য। এ নিয়েও কাশীতে খুব আলোচনা হয়েছে। রিম্পার সম্মেলনে, এ যাবৎ নামেতে বা ছবিতে, উস্তাদ বাবার মঞ্চের ধারে কাছেও স্থান পান নি। কিন্তু এবারে যেহেতু শুধু মঞ্চেই নয়, সম্পূর্ণ রঙ্গালয়ে বাবার নাম প্রচারিত ছিলো আমাদের সম্মেলনে, সে কথা শুনে বোধ হয় বিকর্ণের লজ্জা হয়েছে। সেইজন্য এই প্রথম ব্যতিক্রম হোল। রিম্পার সম্মেলনে বাবার ছবি স্থান পেয়েছে।

যেহেতু, আমাদের সম্মেলন শেষ হবার পরই বম্বে চলে গিয়েছিলাম, সেইজন্য কাশীতে কি হয়েছে খবর পাইনি। বাড়ীতে আসবার পরেই, এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বললেন, 'একদিন আপনার বাড়ী এসে শুনেছিলাম, আপনি বম্বে গেছেন। আপনি এসেছেন খবর পেয়েই এসেছি। আমার দিকে কয়েকটা সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, 'এ গুলো পড়ে দেখুন।'

উত্তর ভারতে বহুল প্রচারিত দৈনিক জাগরণ লিখেছে, 'রজনীগন্ধা সুগন্ধতে জড়িত উস্তাদ আলাউদ্দন খাঁ সাহেবের শতবর্ষ পালন উৎসব শেষ হবার দুশো ষোল ঘণ্টার ভিতরে, তাঁর শিষ্য এবং জামাই-এর কৃপাতে, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব স্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেলেন, কারণ রিম্পা সঙ্গীত সমারোহ মঞ্চেতে লেখা ছিলো, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন স্মৃতি সঙ্গীত সমারোহ।'

আর একটি সংবাদপত্র লিখেছে, 'উদ্যোক্তাদের জন্য খাঁ সাহেবের মঞ্চস্থিত ছবিটি একটা বিড়ম্বনা ছিলো। কখনও সেটাকে তুলে ডান কোণে রাখা হচ্ছিল, কখনও বা বাঁ কোণে।

কয়েকটা সংবাদ পড়লাম। কাশীর বহুল প্রচারিত জনবার্তা খুব বড় হেড লাইন দিয়েছে, ৬২তে আলাউদ্দিন খাঁর জন্মশতবর্ষ ছিলো না। লিখেছে, 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর প্রমুখ শিষ্য বিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর স্বীকার করেছে, বাবা আলাউদ্দিন খাঁর জন্মশতবর্ষ উনিশশো উনআশি থেকে উনিশশো একাশির মধ্যেই হওয়া উচিত। ভুলক্রমে শতবর্ষ ভূপালে হয়েছিলো। যেহেতু শেষ মুহূর্তে আমি জানতে পারি, তাই প্রতিবাদ করতে পারি নি। সম্মেলনে বাধ্য হয়ে যোগ দিয়েছিলাম। তবে ব্যক্তিগত ভাবে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে দেখা করে, ডাক টিকিট প্রকাশন স্থগিত করতে অনুরোধ করেছিলাম।' এ ছাড়া আমার সার্কেল এবং ইংরেজী বইএর ইঙ্গিত দিয়ে নানা ভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে রবিশঙ্করকে।

কাগজগুলো পড়ে নিজেকে লাঞ্ছিত বোধ করছিলাম। যে ভদ্রলোক সংবাদপত্রের এই কার্টিংগুলো এনেছিলেন, তাঁকে বললাম, 'এগুলো আমাকে না দেখালেই ভাল করতেন। আপনি যাঁকে খুব সম্মান করেন, তাঁকে অন্যের হাতে হেনস্তা হতে দেখলে, আপনার কি খুব ভাল লাগে?' ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার গুরুভক্তি প্রশংসনীয়।' ভদ্রলোক চলে যাবার পর মনে পড়ে গেল একটা ইংরেজী প্রবাদ। কমনসেন্স ইজ দ্যাট সেন্স হুইচ ইজ জেনেরালী মোষ্ট আনকমন ইন দি কমন পারসন। যাক এতদিনে রবিশঙ্করকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হোল। সংসারের সব অপরাধেরই একদিন জবাবদিহি দিতে হয়। সেই জবাবদিহি দিতে হোল এতদিন পরে, বাবার শতবার্ষিকী নিয়ে যেটা করা উচিত ছিলো উনিশ বছর আগে, যখন ভুলক্রমে বাবার শতবার্ষিকী হয়েছিলো।

৭০

কাশী আসবার কিছুদিন পরেই আমার বিশেষ পরিচিত এক বন্ধুর চিঠি পেলাম দিল্লী থেকে। দিল্লীর সুন্দর নগর মার্কেটে, বন্ধুটির কুমার আর্ট গ্যালারি আছে। আর্ট গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন আমাকে বাজাবার অনুরোধ করে লিখেছে, 'আমার আর্ট গ্যালারিতে চারদিন চিত্র প্রদর্শনী হবে। উদ্বোধন-এর দিন আপনার এবং ডাগর ব্রাদার্সএর গান রেখেছি। এছাড়া আপনার তিনটে ঘরোয়া জলসার ব্যবস্থা করেছি। আপনার উপযুক্ত দক্ষিণা দেব। আশা করি আমায় নিরাশ করবেন না। সম্মতি জানিয়ে পত্রপাঠ টেলিগ্রাম করবেন।' আমার বন্ধু কুমার, নিজের নামেই এয়ার কণ্ডিশান আর্ট গ্যালারি দিল্লীতে করেছেন। এঁর, দিল্লীর তাজ হোটেলে এবং বিদেশেও আর্ট গ্যালারি আছে। আর্ট গ্যালারির মধ্যে নিজস্ব অ্যানট্রিক্স এবং দুষ্প্রাপ্য বইএর লাইব্রেরী আছে। চিত্র প্রদর্শনীর জন্য নিজের হল ভাড়া দেয়।

দিল্লীতে মডার্ন আর্টের উদ্বোধনের দিন, চিত্র প্রেমিক দিল্লী নিবাসী এবং বিদেশীদের সামনে বাজালাম। লতিফ আহমদ আমার সঙ্গে সঙ্গত করল। একাকী তিনটে ঘরোয়া জলসা বাজাবার পর, আমার বন্ধু কুমার বলল, 'দাদা বহুদিন আগে আপনার একবার ন্যাশানাল প্রোগ্রাম রেডিওতে শুনেছিলাম। এ ছাড়া দিল্লীতে কেবল একবার টিভিতে আপনার বাজনা শুনেছিলাম। কিন্তু এ যাবৎ আর কখনও শুনি না কেন? উত্তরে বললাম, 'না ডাকলে কি করব?' আমার কথা শুনে কুমার বলল, 'দাদা, আপনি কোন যুগে বাস করছেন? আজকাল সকলের সঙ্গে দেখা

করতে হবে। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বাড়ীতে চুপি চুপি সাধনা করলে কি করে চলবে? ঠিক আছে, ডাইরেকটার জেনারেলের নামে আপনি একটা দরখাস্ত লিখুন, কেন আপনাকে ন্যাশানাল প্রোগ্রাম এবং টিভিতে আমন্ত্রণ করে না, যখন আপনি এত ভাল বাজান?' এই কথা বলেই, কুমার একটা টেলিফোন করল একজনকে। বুঝলাম আমার সম্বন্ধেই একজনকে বলছে। টেলিফোনে কথা বলে আমাকে বলল, 'সাধারণ শিল্পীরা উচ্চ অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়, অথচ আপনার মত প্রবীণ শিল্পীর কোন সমাদর নেই? অবশ্য এর জন্য আপনিই দায়ী।' আজকের যুগে অন্তরমুখী হলে চলবে না। যাই হোক আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আমার পরিচিত একজনের সঙ্গে ডাইরেক্টার জেনারেলের সঙ্গে পরিচয় আছে। আমার পরিচিত লোকটি, সময় ঠিক করে আমাকে জানাবে। আপনি রেডিওতে গিয়ে ডাইরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে সব বলবেন, এবং একটা দরখাস্ত দেবেন।' আজকাল যে কোন বিষয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে, কি কি করা দরকার সেই বিষয়ে নানাকথা বলল। আমি অবাক হয়ে শুনছি, ইতিমধ্যে টেলিফোন এলো। কুমার টেলিফোন উঠিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে, ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন রেখে বলল, 'পরশু সকাল এগারটার সময় আপনি দরখাস্তটি নিয়ে রেডিওর ডাইরেকটার জেনারেলের সঙ্গে দেখা করবেন। আমার বন্ধু আপনার বাজনা শুনেছিল। তাঁর সঙ্গে ডাইরেকটার জেনারেলের পরিচয় আছে। টেলিফোন করে সময় এবং দিন ঠিক করে দিয়েছে।'

কুমার-এর কথামত নির্দিষ্ট দিনে ডাইরেকটার জেনারেলের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার কাছে সব কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে প্রডিউসার অফ মিউজিককে বললেন, 'আরটিস্টদের ফাইলটা নিয়ে আসুন।' কিছুক্ষণের মধ্যে প্রডিউসার অফ মিউজিক একটা মোটা খাতা নিয়ে, সন্ত্রস্ত ভাবে ঘরের মধ্যে এলো। ডাইরেকটার জেনারেল, প্রডিউসার অফ মিউজিককে জিজ্ঞেস করলেন, ন্যাশানাল প্রোগ্রামে বহু পূর্বে বাজান সত্ত্বেও, রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনে, তানসেন সঙ্গীত সমারোহে এবং ন্যাশানাল প্রোগ্রামে কেন বাজাবার সুযোগ দেওয়া হয় নি?' এই কথা শুনেই জাবদা খাতার একটা পাতা বার করে বললেন, 'স্যার এই খাতায় লেখা আছে, 'সিক্স ফোরটিন ইয়ার্স যতীন ভট্টাচার্য হ্যাজ লেফ্‌ট সরোদ। আমি প্রডিউসার পদে নিযুক্ত হবার বহু পূর্বে লেখা আছে বলে বাজাবার নিমন্ত্রণ পাঠাই নি।' এই কথা শুনে আমি তো অবাক। বললাম, 'সত্তর সনে আমি ন্যাশানাল প্রোগ্রামে বাজিয়েছিলাম, অথচ লেখা আছে আমি চৌদ্দ বছর বাজনা ছেড়ে দিয়েছি।' আমার কথা শুনে ডাইরেকটার জেনারেল প্রডিউসার অফ মিউজিককে বললেন, 'এঁর ব্যাপারটা ঠিক করে সব ব্যবস্থা করুন।'

প্রডিউসার অফ মিউজিক আমার পরিচিত। বললাম, 'আপনার পদে যিনি আগে ছিলেন এবং রিটায়ার করেছেন, তিনি হয়ত যে কোন কারণে শত্রুতাবশতঃ লিখে গেছেন, যে চৌদ্দ বছর আমি বাজনা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনি কি জানেন না, যে আমি বাজাই? লক্ষ্ণৌ এবং বম্বেতে দুবার আপনার গানের পরই আমি বাজিয়েছি। সেই সময় সাক্ষাৎও হয়েছে, তাহলে আপনি কেন এই পদে আসার পর আমাকে ডাকেন নি। এ ছাড়া যে ভুল তথ্য আমার নামে লেখা আছে, সেটা পরিবর্তন কেন করেন নি?' কাঁচুমাচু মুখ করে প্রডিউসার

অফ মিউজিক, কথা ঘুরিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনি দিল্লীতে কদিন আছেন?' বললাম, 'পরশু কাশী চলে যাব।' সঙ্গে সঙ্গে প্রডিউসার অফ মিউজিক বললেন, 'আপনি আগামীকাল এসে রেডিওতে ব্রডকাসটিং-এর জন্য রেকর্ড করিয়ে যান। এ ছাড়া আমি টিভিতে বলে দিচ্ছি, সেখানেও একটা রেকর্ড করিয়ে যাবেন। এই কথা বলেই, আমায় কন্ট্রাক্ট সই করিয়ে নিলেন।' বললাম, 'দেখুন, আমি এর আগে দিল্লীর টিভিতে বাজিয়েছি। সেটা বড় কথা নয়। সারাভারতের অধিকাংশ রেডিও স্টেশনে আমার রেকর্ড আছে। এ ছাড়া কোলকাতা এবং বম্বেতে টিভিতে বাজিয়েছি। কিন্তু আমার নামে এই ভুল তথ্য যে লেখা আছে, সেটা আগে ঠিক করুন।' উত্তরে বললেন, 'কমিটির সঙ্গে কথা বলে আপনাকে সব জানাব।' রেডিও থেকে বাড়ী ফেরার পথে বাবার কথা মনে পড়ে গেল। মৈহার ছাড়ার আগে বাবা বলেছিলেন, 'এখানে তো কিছু বুঝতে পারো নি। বাইরে যখন বাজাবে তখন দেখবে রাজনীতিটা কি?' এ যাবৎ অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু আজ এক নূতন অভিজ্ঞতা হোল। অবাক হয়ে ভাবি সঙ্গীদের মধ্যে কি নিকৃষ্টতম রাজনীতি ঢুকেছে। প্রাইম মিনিস্টার, ব্রডকাসটিং মিনিস্টার কিংবা ডাইরেক্টর জেনারেল কি করবেন? তাঁদের কাছে আপিল করলে, শেষ কালে প্রডিউসার অফ্ মিউজিক-এর কাছেই আবেদন যাবে। যেন ঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেই সর্ষের মধ্যে ভূতরা বসে আছে। সেখানে একটা কমিটি আছে। সেই কমিটির মধ্যে রাজনীতি চলছে। মনে মনে বুঝলাম, কেন আমার নামে এই ভুল তথ্য লেখা হয়েছে। মনে পড়ে গেল ভূতপূর্ব প্রডিউসার অফ মিউজিক আমার বিশেষ বন্ধু হলেও, একবার বচসা হয়ে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। আমাদের ঘরের এক নামী বাদকের সম্বন্ধে যদি বিরূপ মন্তব্য করি, তাহলে সে আমার অনেক কিছু করে দেবে বলেছিল। একটি বিষয়ে সত্য বললেও, বাকী যে সব বিরূপ মন্তব্য করেছিলো, তার জন্য আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। তারই পরিণাম জানতে পারলাম। আমার নিজের লোকেদের চক্রান্তেই এই ধরনের বিরূপ মন্তব্য লেখা হয়েছে। মনে মনে বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে গেল, যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর। যাক এ নিয়ে বিশেষ আর কিছু লিখতে চাই না। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে।'

পরের দিন রেকর্ডিং করেই রাত্রে কাশী রওনা হলাম। কাশী আসার কিছুদিন পরে, দিল্লীর ডাইরেকটারেট জেনারেলের অফিস থেকে একটা চিঠি পেলাম। প্রডিউসার অফ মিউজিক লিখেছে, 'কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয়েছে, উপস্থিত রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনে, ন্যাশানাল প্রোগ্রামে এবং তানসেন সঙ্গীত সমারোহতে আপনাকে ডাকতে পারব না। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আপনাকে জানানো হবে।' চিঠিটা পেয়ে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। যে কথা আগেই লিখেছি, সর্ষের মধ্যে ভূত অর্থাৎ পারটি, পারটি, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিজের লোক যখন সামনে ভাল সাজে এবং পেছন থেকে ছুরি মারে, সেইখানেই হয় বিপদ। আজকের যুগে, ভালো করে ঠিক মানুষকে ঠিক জায়গায় ঠিকমত ঘুস দিতে পারলে, অথবা তেল লাগাতে পারলে কার্যসিদ্ধি হয়। কিন্তু এ শিক্ষা তো আমি বাবার কাছে পাই নি।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাজাচ্ছি। এতদিনে একটা কথাই বুঝেছি। তোমার প্রয়োজনের

সঙ্গে যদি আমার স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত থাকে, তবেই তুমি আমার বন্ধু। নইলে তুমি আমার কেউ নও। আসলে প্রয়োজনটাই সব। প্রয়োজনের খাতিরে তুমি আমার বন্ধু, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তুমি আমার পর। তুমি তোমার ধান্ধায় থাক, আমি আমার। কিন্তু সব জেনেও এই মিথ্যার বেসাতি করতে, বিবেক বরাবরই বাধা দিয়েছে। মিথ্যা অপপ্রচারে আগে দুঃখ হ'তো, কিন্তু এখন আর দুঃখ হয় না। কারণ মনে হয় ভাগ্যে যা আছে তাকে শুধরাবার উপায় তো নেই। কারণ আমরা হলাম যন্ত্র। যন্ত্রী যেমন বাজিয়ে গিয়েছেন, তা খণ্ডন করার কোন উপায় নেই। সেইজন্য আনন্দ বা দুঃখ, আমাকে আজকাল ভয়বিহ্বল করে না। দিল্লী থেকে আসবার কয়েকদিন পরে, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতির একটা চিঠি পেলাম। ইন্দোরের সঙ্গীত বিভাগের প্রিন্সিপাল আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন। আমার বর্তমান ঠিকানা না জানার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ চিঠিটা এসেছে। ইন্দোর সঙ্গীত বিভাগের প্রিন্সিপাল লিখেছেন, 'আমাদের কলেজের অধ্যাপিকা বন্দনা জমিন্দার, আপনার অধীনে সঙ্গীতে ডক্টরেট করতে চায়। থিসিসটা হবে 'উস্তাদ আলাউদ্দিনের সঙ্গীত অবদান। আপনার বাজনা আমরা শুনেছি। এ ছাড়া আপনার ইংরেজীতে লেখা বইটা পড়েছি। আপনি যদি তারিখ জানান, তা হলে আমরা আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।'

বাবার বিষয়ে কেউ যদি গবেষণা করতে চায়, তাঁকে সাহায্য করা কর্তব্য ভেবে তারিখ জানালাম। কিছুদিন পরেই তিনজন এসে হাজির। প্রিন্সিপাল একজন মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনিই হলেন বন্দনা জমিন্দার। যদিও কলেজে অন্য বিষয়ের অধ্যাপিকা, কিন্তু সেতার বাজান। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের উপর রিসার্চ করতে চান। আমি সঙ্গীত কলেজের প্রিন্সিপাল। আমার কাছে সেতার শিখেছেন, কিন্তু থিসিস আপনার অধীনে করতে চান। সঙ্গে আর এক মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ হোল সঙ্গীত বিভাগের গানের অধ্যাপিকা।' বন্দনা জমিন্দারকে দেখে খুব সাধাসিধে এবং নম্র মনে হোল। বললাম, 'বাবা বলতেন, 'কেবল লিখে রিসার্চ করে ডক্টরেট নেওয়ার কোন মূল্য নাই। বাজনাও বাজাতে হবে। বাজনা ঠিকমত না বাজালে, কি করে বুঝবেন, বাবার যন্ত্র সঙ্গীতে কি অবদান? আপনি কি সেতার এনেছেন?' সলজ্জ হেসে বললেন, 'সেতার তো আনি নি।' বললাম, 'আমার কাছে সেতার আছে। আগে বাজান তার পরে রিসার্চের কথা ভাবব।' সেতার বাজালেন। সঙ্গীত নিপুণ উপাধি পেয়েছেন, কিন্তু স্কুল কলেজের শিক্ষায়, এর চেয়ে বেশী কি আশা করব? চারদিনে রিয়াজের পদ্ধতি শেখালাম, এবং তার সাথে সাথে বাবার বিষয়ে অনেক কথাই বললাম। ইন্দোরে ফিরে যাবার সময় অনুরোধ করে বললেন, 'আপনি তো বম্বে যান। বম্বে গেলে যদি সময় করে ইন্দোরে আসেন, তা হলে আপনার একটা প্রোগ্রাম রাখব এবং সেই ফাঁকে আপনার কাছে শিখব, এবং থিসস-এর কাজও করব। যে জিনিষ পেলাম, সে সব ঠিক করতে অনেক দিন লেগে যাবে। আমার পক্ষে ইন্দোর থেকে কাশী আসা সংসারের জন্য সহজ নয়। তবে আপনি যদি মৈহার, জববলপুর, উজ্জৈন কিংবা বম্বে যান বাজাতে, সেই সময় দয়া করে যদি ইন্দোর আসেন তাহলে আগের থেকে ইন্দোরে প্রোগ্রাম রাখব।' উত্তরে বললাম, 'ঠিক আছে। সময় হলে জানাব।' সকলে চলে গেলেন। দেখতে দেখতে

দুটো মাস কি করে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে সঙ্কটমোচনের জলসার সময় এসে গেলো। এবারে কাশীর জনতার সামনে মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের কথায়, ছেলেকে বাজাতে দিলাম। জনতার সামনে এই তার দ্বিতীয় বাজনা। কিন্তু এবার তার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করল সারদা সহায়। উস্তাদ বাবার ঘরের সুনামই পেল। বাজনার পরে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা অমিতকে উপস্থিত জনতার সামনে 'পণ্ডিত' উপাধিতে ভূষিত করলো। কিন্তু এরপর আর ছেলেকে লোকের বলা সত্ত্বেও কোথাও বাজাতে দেব না স্থির করলাম। ছেলেকে বললাম, 'লোকের প্রশংসায় ভেবো না ভাল বাজিয়েছ। এখন প্রথম থেকে আবার শিক্ষা করতে হবে। যদি সত্যিকারের মত কোন দিন বাজনা বাজাতে পার, সেইসময় বাজাবে। তার আগে বাজাবার কথা চিন্তাও কোরো না। এখন বহু কিছু শিখতে হবে। তুমি যাতে উৎসাহ পাও, সেইজন্য দুইবার বাজাতে দিয়েছি। এই বাজনার কোন মূল্য নাই।' ছেলে আমার কথা শুনে চুপ করে রইলো।

এ বছরে বাবার কনক্লুডিং ইয়ার অফ দি বারথ সেনটিনারি করতে হবে। সেই চিন্তা সর্বদাই মাথার মধ্যে ঘুরছে। বম্বে থেকে কাশী আসার পর, এ যাবৎ দুটো সেমিনার এবং একটা সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেছি। আমার উদ্দেশ্য হোল সারাটা বছর বাবার স্মৃতিচারণা করা, সেমিনারের দুটো বিষয় ছিলো। প্রথম সেমিনারে 'কনট্রিবিউসান অফ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন টু দি ইনডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিক' আলোচনা হয়েছিল। দ্বিতীয় সেমিনারে, বিষয় ছিল 'দি কারেকটার অফ এ মিউজিসিয়ান ইন দি আইজ অফ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'। আমাদের এই সেমিনারে এবং একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে সার্কেলের সভ্য ছাড়াও, বহু লোক এবং সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকায়, একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিলো। দেখতে দেখতে বছরের আটটা মাস কেটে গেল। কাশীতে সকলের মুখে একই জিজ্ঞাসা, আমাদের প্রোগ্রাম কবে হবে? এই জিজ্ঞাসার কারণ, আমরা যত অল্প ব্যয়ে সঙ্গীতের বিরাট আয়োজন করেছিলাম, কাশীর পক্ষে তা ছিলো একটা কল্পনামাত্র। যে অল্প মূল্যে আমরা সঙ্গীতকে জনগ্রাহী করেছিলাম, সেটা লোককে মুগ্ধ করেছিলো। যদিও আমাদের এই অব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিলো, তথাপি আমাদের মনেতে বাবার সেই কথাটাই ছিলো। সঙ্গীত মুক্তদ্বার হওয়া উচিত। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই, উস্তাদ আলাউদ্দিন সার্কেলের একদিন মিটিং হোল। কনফারেন্সের তারিখ ঠিক হোল, তিন চার এবং পাঁচ ডিসেম্বার। উপস্থিত শিল্পীদের ঠিক করতে হবে। গতবছরে কাশীর সব শিল্পীকেই ফ্রি পাস দিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে ঠিক হোল তা করলে অনেক লোকসান হবে প্রথম বছরের ম'তো। প্রথম বছরে নানা কারণে লোকসান হয়েছে। কিন্তু এবারে লোকসান হলে আমাদের সব উদ্দেশ্য বিফল হবে।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের ছাত্রটি এলো। এখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা প্রয়োজন। বিদেশ থেকে এ যাবৎ বহু শিক্ষার্থী এসেছে আমার কাছে শিখতে, কিন্তু আমি তাঁদের শেখাই নি। কারণটা হোল এই যে, তাঁরা ভাবে তিন মাসের মধ্যেই উস্তাদ হয়ে যাবে। ভারতের সব জায়গায়, বিদেশীরা আসে, সেতার, সরোদ, তবলা শিখতে কত আশা নিয়ে, কিন্তু কি ভাবে তাঁরা প্রতারিত হয়, ভাবতেও লজ্জা লাগে। ভারতে যাঁরা একটু বাজায় তাঁরাও বিদেশিদের

শিখিয়ে মোটা টাকা উপায় করে। যাঁদের নাম আছে, তাঁদের তো কথাই নাই। ভারতে বিদেশীদের এক ঘণ্টা ঘড়ি দেখে শিখিয়ে, অনেকেই পঞ্চাশ থেকে দুশো ডলার উপার্জন করে। অবশ্য এই নিয়মটি যাঁরা বিদেশে সঙ্গীত প্রচার করেছেন, তাঁরাই প্রবর্তন করেছেন।

ভারতের তিন জন নামী শিল্পী আমাকে বহুবার বলেছেন, বিনা পয়সায় কাউকে না শেখাতে। আজ পর্যন্ত যদিও কয়েকটি ছাত্র তৈরী করেছি, এবং বর্তমানেও শেখাই, কিন্তু এ যাবৎ কোন ছাত্রের কাছে, অন্য শিল্পীদের মত পারিশ্রমিক নিই নি। দুই জন বিদেশীকে শিখিয়েছি, কিন্তু তাঁদের কাছেও কোনও অর্থ নিই নি। স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ থেকে যে দুইজন ছাত্র এসেছে, তাঁদের কাছেও কোন অর্থ নিই নি।

বাবাকে বরাবর বলতে শুনেছি, 'একজনকে শেখাতে একটা প্রাণ দিতে হয়। তবেই একটা প্রাণের সঞ্চার হয়।' বাবা কখনও কোন ছাত্রের কাছে একটি পয়সাও নেন নি। সেইজন্য বাবার আদর্শটাই গ্রহণ করেছি। শিক্ষা দিয়ে অর্থকরী পেশা করতে, বিবেকে লেগেছে। যাঁদের শিখবার প্রবল ইচ্ছা দেখেছি, সেই রকম কিছু মুষ্টিমেয় ছেলেকে শিখিয়েছি এবং এখনও শেখাই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। ১৯৭১ সালে কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মন্মথ নাথ ঘোষ বেনারসে গিয়ে আমাকে অনুরোধ জানালেন, তাঁর পরিচিত গায়ক ফণী ভট্টাচার্যের ছেলে মলয়কে সরোদ শেখাবার জন্য। না করতে পারলাম না। আমার কাছে রেখে তাকে শেখাতে লাগলাম। প্রথমে কিছুকাল তাকে শিক্ষা দেওয়ার পর, তার ভবিষ্যৎ ভেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম। এরপরে সে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোদে প্রাক্টিক্যাল পি. এইচ. ডি করলো। সঙ্গীতকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবে ভেবে মধ্যপ্রদেশের একটা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য সে আবেদনও করেছিল। কিন্তু সঙ্গীতের রাজনীতির সঙ্গে আত্মমর্যাদার লড়াইয়ে, সে না পেলো শিক্ষকতা আর না পেলো প্রতিষ্ঠা। বীতশ্রদ্ধ হয়ে সঙ্গীতকে ত্যাগ করে ব্যবসাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করলো। যদিও এখনও মাঝে মাঝে সে সরোদ বাজায় অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলি, বাবার সঙ্গীত সাধনার অমূল্য রত্নভাণ্ডারের গুপ্তধন আমি সবসময়েই চেয়েছি যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে। যাতে বাবার রত্নভাণ্ডার লুপ্ত না হয়ে যায়। আমার ছেলে অমিতকে আমি ছোট থেকেই এই ঘরাণার রসাস্বাদন করিয়েছি। অন্নপূর্ণাদেবীও তাকে ১৯৯৪ সালে সব জায়গায় বাজাবার অনুমতি দিয়েছেন এবং সে দেশে ও বিদেশে সবজায়গায় বাজাচ্ছে। তার বাজনার ক্যাসেট এবং সি.ডি. ফ্রান্স থেকে বেরোবার সাথে সাথে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমার সরোদের অপর ছাত্র শিবদাস চক্রবর্ত্তীও সব জায়গায় অনুষ্ঠান করছে। তবে সে একটি সরকারী চাকরিও করে, এজন্য তার জন্য আমার বিশেষ চিন্তা নাই। এছাড়া, আমার ছাত্রদের মধ্যে তিনজনের জন্য বিশেষভাবে আমি চিন্তিত। কারণ, এরা সঙ্গীতকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে কৃতসঙ্কল্প। এরা হোল আমার স্নেহভাজন দেবাশিস চক্রবর্তী (গীটার), অরূপরতন মুখার্জী (সেতার) এবং কুমারী রাণী পাণ্ডে (সেতার)। আমি নিশ্চিত জানি এরাই আগামী কয়েক প্রজন্ম ব্যাপী সঙ্গীতচর্চার পরিবেশে বাবার অমূল্য ধনভাণ্ডার বহন করে চলবে। বাবা যে বলতেন, শিক্ষা দিতে গেলে

নিজের প্রাণটা দিতে হয়, সেই কথাটা কত খাঁটি, পরে বুঝেছি। প্রকৃত শিক্ষা দিতে গেলে, যে কি পরিশ্রম হয়, সেটা বুঝতে পেরেই, 'সঙ্গীত মেড ইজি' করি নি। শিক্ষার নামে আজকাল যা হচ্ছে, সে অভিজ্ঞতার কথা যথাস্থানেই বলব।

যাক যে কথা বলছিলাম। ফ্রান্সের ছাত্রটি এল। ছাত্রটি এবারে এসে বলল, যে লোকটি অমার ইংরেজী বইএর অনুবাদ করছে ফ্রেঞ্চ ভাষায়, সে তিন মাসের জন্য আগামী বছরের শেষের দিকে, আমার বাজনার ঠিক করেছে। ফ্রান্সে মিউজিগিমে এবং ফ্রান্স মিউজিক নামে দুটি সংস্থা, আমার বাজনার আয়োজন করেছে। যাক সে তো অনেক পরের কথা। তার এখন দেরী আছে। ছাত্রটিকে কয়েকদিন শিখিয়ে, পিত্তিজির কনফারেন্সে বম্বে বাজাতে গেলাম।

বম্বেতে গিয়ে প্রথমেই অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে দেখা করলাম। বাবার নামে 'কনক্লুডিং ইয়ার অফ দি বার্থ সেনটিনারি' করার কথা, সব বিস্তারপূর্বক বললাম। সব কথা শুনে বললেন, 'গত বছরে কুড়িহাজার টাকা লোকসান হওয়া সত্ত্বেও, এ বছরে কি ভাবে সম্মেলন করছেন? লোকসান দিয়ে কি করে সংস্থার কাজ করবেন?' অবাক হলাম। বরাবর দেখেছি জাগতিক বিষয়ে তাঁর কিছুই মনে থাকে না, অথচ গতবছরে যে লোকসান হয়েছিলো বলে গিয়েছিলাম, সেটা ঠিক মনে রেখেছেন। আমাকে অবাক ভাবে তাকান দেখে, অন্নপূর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হোল? কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে?' বললাম, 'আপনার স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হয়েছি।' উত্তরে বললেন, 'বাবার জন্য এত বড় কাজ করেছেন এবং আবার করছেন, তাই আর্থিক ক্ষতির কথাটা মনে ছিলো।' বুঝলাম বাবার প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা না থাকলে কি সঙ্গীতে এত উর্দ্ধে আছেন। বললাম, 'এবারে তো সারা বছর কিছু না কিছু করেছি। সমাপ্তিটা করি, তারপর দেখা যাবে যা হবার হবে।' গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এ সব কাজে বহু লোকের দরকার হয়। আপনাকে তো জানি। ঝোঁকের মাথায়, বাবার উপর শ্রদ্ধা আছে বলে করছেন, কিন্তু এই সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে করতে গেলে, যে যে জিনিষের প্রয়োজন, তা আপনার দ্বারা হবে না।'

কি জানি কেন কৌতূহল হোল। বললাম, 'আপনি তো প্রায় ছয় বছর বাবার নামে একদিনের জন্য একটা সম্মেলন করেন। আপনার ছাত্র ছাত্রীরা সব করে। আপনি টাকা দিয়ে খালাস একবার বলেছিলেন। বলুন তো আপনার সার্কেলে যা খরচা করেন, তা কি উঠে আসে?' উত্তরে বললেন, 'বরাবরই কিছু টাকার লোকসান হয়। তা সত্ত্বেও যতদিন পারি করব, তারপরে দেখা যাবে। আপনি বৃহৎ ভাবে আয়োজন করেন, যার জন্য লোকবল এবং অনেক সহযোগিতার প্রয়োজন। সেইজন্য আগেই বলেছি, আপনার দ্বারা হবে না।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললেন, 'আগামীকাল তো আপনার প্রোগ্রাম আছে। খুব ভাল করে বাজাবেন। রান্না হয়ে গিয়েছে। খাবার খেয়ে হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করুন। পরশু আসবেন। আজকে আর কোন কথা নয়, কেননা থাকলেই আপনার লেকচার শুরু হয়ে যাবে।'

পরের দিন পিত্তিজির কনফারেন্সে বাজাবার পরই, একটা লোক আমার কাছে এল। লোকটি বলল, 'ন্যাশানাল সেন্টার ফর দি পারফরমিং আর্ট-এর ডিরেক্টার, ডাক্তার নারায়ণ মেনন আপনাকে আগামীকাল সকাল এগারটার সময় দেখা করতে বলেছেন।

পরের দিন ডাক্তার নারায়ণ মেননের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'বম্বেতে কতদিন থাকবেন?' উত্তরে বললাম, 'পাঁচদিন বম্বেতে থাকব। তারপরেই কাশী চলে যাব।' আমার কথা শুনে বললেন, 'তরশু কি আপনার কোন বাজনা আছে?' বললাম, 'না।' বললেন, 'তরশু দিন আমাদের সেন্টারে আপনার একটা লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশন রাখব।' সম্মতি জানালাম। আগেও একবার বাজিয়েছি। এত সুন্দর হল ভারতে কোথাও দেখি নি। মাইকের দরকার নাই। মনে হয় চারটে মাইক সামনে রয়েছে। আমার সম্মতি পেয়েই, ডাক্তার নারায়ণ মেনন সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠালেন। সেক্রেটারি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবার পর, আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'তরশু দিন এনার লেকচার কাম ডিমনষ্ট্রেশন রাখুন। এই মুহূর্তেই সব মেম্বারদের প্রোগ্রামের বিষয় লিখে, ইনভিটেশান কার্ড পাঠিয়ে দিন।' আমাকে বললেন, 'সেক্রেটারি আপনাকে বুঝিয়ে দেবে কখন কি করতে হবে।' বিদেশে লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশন হয়। এদেশে প্রচলন কম। আর তাই আমারও অভিজ্ঞতাটা এ বিষয়ে স্বদেশী শ্রোতাদের সামনে নবীন। ডাক্তার মেননকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'লেকচারের বিষয়টা কি?' উত্তরে বললেন, 'আপনার উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করা হবে। যেমন ধরুন, বাবা কি ভাবে প্রথম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন? বাবার বাজনার মধ্যে কি বিশেষত্ব ছিলো? আমার সেক্রেটারি আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে সব কথা বলে নেবে। প্রথমে দেড় ঘণ্টা আপনি বাজাবেন। বাজাবার পর দেড় ঘণ্টা আপনার সঙ্গে কথোপকথন হবে।' ঠিক আছে বলে সেক্রেটারির সঙ্গে গেলাম। সেক্রেটারি আমার পূর্ব পরিচিত। ইতিপূর্বে একবার বাজিয়েছিলাম। সেক্রেটারির ঘরে ঢুকবার পর, কফির জন্য বেয়ারাকে বলেই, আমার সামনে একটা ছাপানো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশনে প্রায়শঃ আমরা এই ধরনের প্রশ্ন করি। গায়করা নিজেদের ঘরাণা সম্বন্ধে বলেন এবং বাদক বা নৃত্যকাররা নিজেদের ঘরাণা সম্বন্ধে বলেন।' কাগজটা দেখলাম। শেষ প্রশ্নটিতে ছিলো, উপরোক্ত প্রশ্নগুলি ছাড়া যদি নিজের কোন জিনিষ বলবার থাকে, তাহলে আপনি বলতে পারেন। প্রশ্নগুলি দেখবার পর, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। গতবার যে সময়ে বম্বে এসেছিলাম, সেইসময় আমাকে এক সঙ্গীতবোদ্ধা একটা প্রশ্ন করেছিলেন। বলেছিলেন, কিছুদিন আগে ভারতের এক নামী সেতার শিল্পী, ন্যাশনাল আর্ট সেন্টারে লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশনে বলেছিলেন, তাঁর পূর্বর্ব পুরুষ, সুরবাহার আবিষ্কার করেছিলেন এক অদ্ভুত উপায়ে। কুইন ভিক্টোরিয়া একবার বহু বছর আগে জাহাজে করে ভারতবর্ষে-বম্বে এসেছিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একটি পিয়ানো ছিলো। ডকে নামবার সময়, সব জিনিষ বার করবার সময়, পিয়ানোটা ভেঙ্গে যায়। পিয়ানোটা ভেঙ্গে যাবার ফলে, সমুদ্রের ধারেই কুইন ভিক্টোরিয়া পিয়ানোটা ফেলে দেন। সেই ভাঙ্গা পিয়ানোটা, নামী সেতার শিল্পীর প্রপিতামহ দেখতে পেয়ে, টুংটাং করে বাজান। সেই প্রপিতামহের মাথায় সুরবাহারের কল্পনা জাগে। তারপর তিনিই প্রথম সুরবাহার যন্ত্রটী আবিষ্কার করেন।' উক্ত গল্পটি বলে, ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সুরবাহারের উৎপত্তির ঘটনাটি কি সত্য? আপনি সেনী ঘরাণার শিষ্য? সেজন্য আপনাকে প্রশ্নটা করছি, সুরবাহারের উৎপত্তিটি যা শুনেছি তা কি ঠিক?'

এক নাগাড়ে ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'ইতিহাসকে কি করে বিকৃত করে, এক অর্বাচীনের দল। আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার। লেখাপড়া করেছেন। ইতিহাসে কি পড়েছেন, ব্রিটিশ শাসনকালে কখনও কুইন ভিক্টোরিয়া কি বম্বে বা ভারতবর্ষে এসেছিলেন?' আজকাল প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে শুনতে পাই সেতার, তার পূর্বপুরুষ তৈরী করেছেন। সেগুলি ছাপার অক্ষরে বইতেও প্রকাশ হয়। বর্তমানে জীবিত একজন সেতার বাদক সব জায়গায় বলে থাকেন যে, তাঁর পিতা বিলম্বিত মসীদখানি গৎ-এর প্রবর্তক। আপনার প্রশ্নের উত্তরে একটাই কথা বলতে পারি, যে কথা আমার উস্তাদ বাবার কাছে শুনেছি। সেতার বাজনার বহু পূর্বে সুরবাহারের প্রচলন ছিল। তানসেনের পুত্র বংশের মধ্যে, পিয়ার খাঁ প্রথম সুরবাহারের প্রবর্তক। পিয়ার খাঁর দৌহিত্র বংশের ওমরাও খাঁ সুরবাহার বাজাতেন। ওমরাও খাঁর শিষ্য গোলাম মহম্মদ খাঁ সুরবাহার বাজাতেন। এ যুগের কেউ তাঁদের দেখেন নি। তবে গোলাম মহম্মদ খাঁর ছেলে সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ শুনেছি শেষ জীবন কোলকাতায় ছিলেন। এখন আপনিই বলুন, যে সেতার শিল্পী বলেছে, তাঁর ঊর্দ্ধতন তিনপুরুষ আগে সুরবাহার প্রবর্তন করেছেন, কথাটা কত হাস্যকর? আজকাল কত বিকৃত তথ্য সকলে বলে। অথচ তার প্রতিবাদ কেউ করে না। দেখুন ন্যাশানাল সেন্টারে আমি বাজিয়েছি, কিন্তু মুখর হবার সুযোগ হয় নি। যদিও কখনও সে সুযোগ পাই, তাহলে আপনার কাছে যে কথা শুনলাম সেই প্রসঙ্গটা নিশ্চয়ই বলব।'

ন্যাশানাল সেন্টারের সেক্রেটারির সামনে বসে, প্রশ্নগুলি দেখবার পর হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই সঙ্গীতবোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ারের কথাগুলি। বললাম, 'আপনাদের এই প্রচেষ্টা এ যাবৎ ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নি। তবে লেকচারের সময় বহু জিনিষ বোঝাতে গেলে, বাজনা বাজিয়ে সেটা দেখাতে হবে। মুখে বললে, শ্রোতারা বুঝতে পারবেন না। উত্তরে বললেন, 'এ যাবৎ সকলেই প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন। তবে আপনি যদি বাজিয়ে কিছু দেখাতে চান, তাহলে কোন অসুবিধার কারণ নাই।'

এ কথা শুনে বললাম, 'দয়া করে প্রশ্নাবলীর মধ্যে দুটী প্রশ্ন যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। সেই দুইটী প্রশ্ন আপনি লিখে রাখুন। প্রশ্ন দুটী হল মসীদখানি গৎ-এর প্রবর্তক এবং সুরবাহারের প্রবর্তক কে?' সেক্রেটারি দুইটি প্রশ্ন লিখে নিলেন। এবারে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশনের সময় প্রশ্নগুলি কে করবেন?' উত্তরে বললেন, 'আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেকটার, ডাক্তার নারায়ণ মেনন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।' সেক্রেটারির কাছে বিদায় নিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী যাবার জন্য ট্যাক্সিতে উঠেই একটা চিন্তা মাথার মধ্যে এলো। এ যাবৎ মঞ্চে বাজনা বাজিয়েছি। শ্রোতাদের সামনে সঙ্গীতের বাক্যালাপ করতে হবে ভেবে চিন্তায় পড়লাম। আজকাল বাজাতে বসবার আগে, অনেককে দেখেছি বিনয় সম্ভাষণ করতে। বাজাতে বাজাতে অনেককে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করে বলতেও শুনেছি। মঞ্চে বসে কিছু বলা, আমার কাছে শিরঃপীড়ার উদ্রেক করে। তবুও মনে মনে ভাবি, যখন বলতেই হবে, তাহলে কয়েকটা নিষ্ঠুর সত্য কথা প্রশ্ন না করলেও বলব। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, বুঝলাম ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে যাওয়াতে। দেখলাম এসে গেছি গন্তব্যস্থলে।

অন্নপূর্ণাদেবীকে সব কথা বললাম। উত্তরে বললেন, 'এ তো খুব ভালো কথা। খুব ভালো করে বাজাবেন। ন্যাশানাল সেন্টারের মেম্বাররা খুবই সঙ্গীতপ্রেমী। পরিবেশও সুন্দর। প্রশ্নের উত্তর খুব ভাল করে দেবেন।' দুটী ছাত্রকে দেখলাম দূরে বসে আছে। গতকাল বাজাবার সময় ছাত্র দুটীকে গ্রীণরুমেই দেখেছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, গতকালের বাজনা সম্বন্ধে ছাত্র দুটী নিশ্চয়ই কিছু বলেছে।

হঠাৎ অন্নপূর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'গতকাল কি রকম বাজনা হোল?' উত্তরে বললাম, 'অতীত দিয়ে কি হবে? বর্তমানের কথা বলুন।' উপস্থিত চারদিন বম্বেতে থাকব। কাশীতে বাবার শতবার্ষিক সমাপন উৎসবের জন্য দুই একজন শিল্পীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই কয়েকদিনের মধ্যে আপনি কবে খালি থাকবেন বলুন? যে দিন খালি থাকবেন, সেই দিন শিখতে আসব।' উত্তরটা যেন মুখে লেগেই ছিলো। বললেন, মৃত্যু হলেই খালি থাকব। সর্বদাই কেউ না কেউ শিখতে আসে এবং আমার মাথা খায়।' উত্তরে হেসে বললাম, 'সকলেই যখন মাথা খায়, তাহলে একদিন আমিও না হয় মাথা খাব।' আমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হেসে বললেন, 'আপনাকে নিয়ে তো আর এক জ্বালা। আপনি আবার কারো থাকাকালীন শিখবেন না।' ঠিক আছে ন্যাশনাল সেন্টারে বাজাবার পরের দিন, সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় শিখতে আসবেন। রাত্রে তো আপনি পিত্তিজির বাড়ীতে বাজাতে যান। আমার কাছে শিখে, এখান থেকেই পিত্তিজির বাড়ী চলে যাবেন।'

মনে মনে ভাবলাম কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু থাক। এখন নয়। কাশীতে যাবার দিন জিজ্ঞাসা করব। বললাম, 'কয়েকদিন ব্যস্ত থাকব। আপনাকে জ্বালাতন করতে আসব না।'

রাত্রে পিত্তিজির বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম কমল মিশ্রকে। সে আমার পূর্ব পরিচিত, যেহেতু এক কালে কাশীতে থাকত। গায়িকা হীরা দেবীর স্বামী এবং এ ছাড়া, ভারতের বিখ্যাত নর্তক এবং নর্তকীদের সঙ্গে গান গায়। কমল মিশ্র তবলা এবং মৃদঙ্গ বাজায়। পিত্তিজি কমল মিশ্রকে ডেকেছেন তবলা সহযোগিতা করবার জন্য। পিত্তিজিকে ন্যাশানাল সেন্টারে লেকচার ডিমনস্ট্রেশনের কথা বললাম। সাধারণতঃ পিত্তিজি কোথাও যান না। কিন্তু আমার প্রোগ্রাম হলে, যান। পিত্তিজিকে আমার প্রোগ্রামে যাবার জন্য বললাম। পিত্তিজি বললেন, 'আপনার বাজনা এবং লেকচার শুনতে নিশ্চয়ই যাব।' খাওয়ার পাট চুকিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর বাজালাম। কমল মিশ্র আমার সঙ্গে সঙ্গত করল। বাজনা বাজিয়ে রাত্রে হোটেলে ফিরলাম।

নির্দিষ্ট দিনে ন্যাশানাল আর্ট সেন্টারে বাজাতে গেলাম। সেক্রেটারি এসে বলল, 'ডাক্তার নারায়ণ মেনন বলেছেন, এখানকার সভ্যরা আপনার বাজনা তিনঘণ্টা শুনতে চান। সেইজন্য সাক্ষাৎকার যেটা ঠিক ছিল সেটা হবে না।' কথাটা শুনে হাসি পেল। যে দুটো প্রশ্ন আমি নিজে থেকে যোগ করেছিলাম, তা জিজ্ঞেস করলে, কথায় কথায় অনেক নিষ্ঠার সত্য কথা বলতে হ'তো। যাক বাঁচা গেল।

বাজনার শেষে, গ্রীণ রুমে ধ্যানেশ এবং অন্নপূর্ণাদেবীর পরিচিত বিদেশিনি মহিলাকে দেখে অবাক হলাম। ধ্যানেশকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কবে বম্বে এসেছিস?' উত্তরে বলল,

'গত কাল এসেছি।' ধ্যানেশকে বললাম, 'আগামীকাল যাব, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময়। যদিও তোর পিসিমাকে বলে এসেছি, তবুও একবার মনে করিয়ে দিস।'

সন্ধ্যায় অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। ধ্যানেশের সঙ্গে দেখা হোল। বললাম, 'দেখ অল্প সময়ের মধ্যেই, আমি শিক্ষা করে রাত্রি আটটার সময় চলে যাব। শিক্ষাকালীন কেউ সামনে থাকলে, আমার অসুবিধা হয়। তুই পাশের ঘরে যা।' উত্তরে বলল, 'আপনি শিখুন। আমি এখন সিনেমা দেখতে যাব।'

অন্নপূর্ণাদেবী এসে বললেন, 'গতকাল লেকচার কেন হোল না?' বললাম, 'প্রশ্নোত্তর না হয়ে ভালোই হয়েছে। নইলে, কি বলতে কি বলতাম, যার ফলে অনর্থ হয়ে যেতো। আগামীকাল রাত্রে ট্রেনে কাশী যাব। বিকেলে এসে দেখা করে যাব। আধ ঘণ্টা আপনার সময় নেব। কিছু কথা আছে। তারপরই চলে যাব।' এই কথা বলেই যন্ত্র মেলাতে লাগলাম। অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'গতকাল শুনলাম খুব ভাল বাজিয়েছেন। আমার কাছে, কি আর শিখবেন?' উত্তরে বললাম, 'দেখুন আপনি বাবারই তো মেয়ে। কথায় কথায় পরীক্ষা করেন? আমার দুর্ভাগ্য, দীর্ঘদিন আপনার কাছে শিখতে পারি নি। দীর্ঘ বাইশ বছর আপনি কোলকাতা থেকে বম্বে এলেও, আপনার মানসিক অশান্তির জন্য শিখবার ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষা করি নি। বিবেকে বাধত। অন্যরা শিখবার সুযোগ নিয়েছে, কিন্তু আমি সে সুযোগ নিই নি। তবে এটা ঠিক, প্রায় চৌদ্দ বছর বম্বেতে এসে, এক দুই দিন নিশ্চয়ই শিক্ষা করেছি। আপনার কাছে শিক্ষা করতে বসলেই, বাবার কথা মনে পড়ে যায়। যে দুটো দিন শিক্ষা করে যাই, তাই আমার কাছে বিরাট সম্পদ। যাইহোক আমাকে পরীক্ষা না করে, এখন শেখান, কেননা পিত্তিজির গাড়ী ঠিক আটটার সময় এখানে এসে যাবে।' বাজাতে শুরু করলাম। ঠিক সময় ড্রাইভার এসে কলিংবেল বাজাল। ড্রাইভারকে বললাম, 'নীচে অপেক্ষা করতে। রাত্রি নয়টা বেজে গেল। তারপর পিত্তিজির গাড়ীতে বসে যেতে যেতে ভাবলাম, সবই নিয়তি। মৈহারে যে সময় প্রথম শিক্ষা করতে গিয়েছিলাম, সেইসময় বাবার ভাষায় বলতে গেলে সঙ্গীতের মহামূর্খ। সেই সময় অন্নপূর্ণাদেবী মৈহারে ছিলেন। বছরে একবার কয়েক মাসের জন্য বাবার কাছে দিল্লী থেকে আসতেন। বাবার কাছে শিখতে সুবিধা হবে বলে আমাকে বরাবরই শিখিয়েছেন। পাঠকরা হয়ত ভাবতে পারেন, এখনও গেলে তাহলে কি শিখি? তার উত্তরে একটা কথাই বলতে পারি যে, সঙ্গীত হোল সমুদ্র। বাবার কাছে বহু রাগ, অনেক তাল, বিভিন্ন ছন্দ, লয়কারি সবই শিখেছি, কিন্তু পারফেকশান? যেমন শ্রী রাগের সাকারাত্মক ঋষভ, শুদ্ধ কল্যাণের অবরোহীতে নিখাদ ও কড়িমাধ্যমের সূক্ষ্ম প্রয়োগ, দরবারী, মালকোষ, কৌষিক কান্থাড়ার, গান্ধার, ধৈবত এবং নিখাদের এর শ্রুতির ভেদ, এ সব অনেক সাধনার পর অনুভব করা যায়। এমনিতে তো অনেক শিখেছি, কিন্তু বাবার কাছে শেখা চিত্রাগৌরি, ললিতাগৌরি প্রভৃতি রাগের আরেক রূপ অন্নপূর্ণাদেবীর কাছেই জানতে পেরেছি। এখন মনে হয়, পঁচিশ বছর আগে যদি দুটো বছর রোজ শিখতে পারতাম, তাহলে হয়ত এতদিনে অনুভুতি হ'তো। তবে এইটুকুই সান্ত্বনা, যে জিনিষ এ যাবৎ পেয়েছি, তুলনা তার নাই। ছোট থেকে শিখবার সুযোগ পাই নি। তা সত্ত্বেও বাবার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি, এটুকু জোর গলায় বলতে পারি, অনেকেই তা পায় নি। বাবা বলতেন, 'গান, বাজনা, রোনা, পিটনা, সকলেই করতে পারে, কিন্তু আসল গান, বাজনা, রোনা, পিটনা কজনে করতে পারে?' আমার মনে হয়, অন্নপূর্ণাদেবী গভীর সমুদ্রের মধ্যে সমাধিতে লীন হতেন। তাঁর কাছে যে একটুও শিখেছে, সেই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী যা পেয়েছে, সেই এ কথাটা বুঝতে পারবে। এই সব ভাবতে ভাবতে পিত্তিজির বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

বাড়ী গিয়ে দেখলাম, পিত্তিজির বড় ভাই বদ্রী বিশাল পিত্তি হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছেন। এ ছাড়া কিছু অতিথি এসেছেন। যথারীতি বাজনা বাজিয়ে হোটেলে চলে এলাম। মাথার মধ্যে নানা চিন্তা। সঙ্গীত সমারোহের জন্য দিল্লী এবং কোলকাতায় যেতে হবে শিল্পী ঠিক করবার জন্য।

পরের দিন বিকেলে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, 'আজই কাশী যাচ্ছেন?' বললাম, 'হাঁ। আপনাকে জ্বালাতন করতে আসব না। দুটো কথা বলেই চলে যাব, কেননা আপনার স্নান এবং খাবারের সময় হতে বেশী দেরী নাই।' আমার কথা শুনে বললেন, 'শুরু হোল আপনার লেকচার। আপনি এলে আমি জ্বালাতন হই, কবে আপনাকে বলেছি? দেখুন এই সংসারে সবাইকে যেমন ভালো লাগে না, সেইরকম সবাইকে খারাপও লাগে না। দুই একজনকে অন্তত: আপনজন মনে হয়, এবং তাঁকেই নিজের সুখ দুঃখের কথা না বলে, কেউ থাকতে পারে না। আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। এ নিয়ে আলোচনা করতে আর ভালো লাগে না। আগেও বলেছি, আবার বলছি, আমার জন্য চিন্তা করবেন না। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।'

এ কথা শুনে হেসে বললাম, 'ভেবে করতে পারছি কি? করার সাধ্যই বা কতটুকু। করার সাধ্য কারোর নাই। করতে চাওয়াটাই আসল। সেটাই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমায় কিছু করবার সুযোগ দিলেন না।'

আমার কথা থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনার সামনে এখন কাশীতে বাবার সঙ্গীত সমারোহের চিন্তা, এবং কত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমি বুঝতে পারি। এখন মাথা ঠাণ্ডা করে বাবার সমাপন শতবার্ষিকী যাতে ভালোয় ভালোয় হয়, তার চিন্তা করুন।' উত্তরে বললাম, 'বড় একটা কাজের আরম্ভে অনেক ভুলত্রুটি, অনেক পরিশ্রম আর নৈরাশ্য, অনেক প্রকারের বাধা বিপত্তি, সেইটাই হোল সকল কাজের আগে পরীক্ষা। সেই পরীক্ষার কালটার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে না পারলে, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো যায় না। এর পর দেখা যাবে সৌভাগ্যের নিশানা। পথ অনেক দীর্ঘ। পায়ে ব্যথা হলে তো চলবে না। সকল ক্লান্তি সইতে হবে হাসিমুখে। আমার মনে, সৎ কার্যে প্রচেষ্টা আছে বলেই বিশ্বাস আছে। সাহস আছে বলেই সান্ত্বনা আছে। এই কথাটা কেবল আমার জন্যই বলছি না। এ কথাটা আপনার জন্যও সম্যক ভাবে প্রযোজ্য। যাক গতবারে কয়েকটা কথা বলে গিয়েছিলাম, সে বিষয়ে কি কিছু ভেবেছেন?'

উত্তরে বললেন, 'গতবারে অনেক কিছু বলে গিয়েছেন। আপনি আমার শুভাকাঙ্খী, তাই এত ভাবেন। এ কথা সত্যি, এক একবার মনে হয়েছে আত্মহত্যা করি কিন্তু নিশ্চিত থাকুন। ও কথা আর মনে স্থান দেবো না। হোল তো?' বললাম, 'যাক নিশ্চিন্ত হলাম। এবারে একটা

কথা বলুন তো? এক লাখ টাকা তো আগে পেয়েছেন। বাকী এক লাখ টাকা পেয়েছেন কি না?' নির্বিকার হয়ে উত্তরে বললেন, 'একমাস পরে টাকাটা দেবে বলেছে।' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কথায় আপনি রাজী হয়ে গেলেন?' সেই এক উত্তর। বললেন, 'দেখুন টাকা নিয়ে কথা কোনদিন বলি নি। টাকার লোভ আমার কোনকালেও ছিলো না, এবং এখনও নাই। যখন পণ্ডিতজীর টাকার টানাটানি, তখন ইচ্ছে হলে দেবে আর না দিলেও কেস করবো না।' মনে হোল আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম টাকার টানাটানির কথা দেখা হলে কিংবা বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে উনি আমাকে বলেন বটে, কিন্তু আমি জানি আসল রহস্যটা কি? প্রথমতঃ অভাবী পরিচিত বহুলোককে অন্নপূর্ণাদেবী অর্থসাহায্য করতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'অভাবী লোক দেখলে, না দিয়ে থাকতে পারি না। যতদিন পারি দেবো, আর যেদিন টাকা থাকবে না, সেদিন তো দিতে পারবো না।' আরও একবার এক দরিদ্র লোকের মেয়ের বিয়েতে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম তাঁর সঞ্চয়ী অভ্যাসের কথা। উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে আজ পর্যন্ত যে অর্থ হাতে পেয়েছেন তার থেকে একটা অংশ সবসময়েই তিনি সরিয়ে রাখতেন ভবিষ্যতের জন্য। এছাড়া বম্বেতে আসার পর ন্যাশনাল সেন্টারে শিক্ষকতা করার জন্য যে পারিশ্রমিক পেতেন, তার থেকেও সঞ্চয় করতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন একদিকে লক্ষ্মী এবং অন্যদিকে মা অন্নপূর্ণা। আমার মনে হয়েছে, বাবার কাছে তিনি যেমন সঙ্গীতের জ্ঞানলাভ করেছেন, তেমনিই সঞ্চয়ের অভ্যাসটিও বাবার মতোই পেয়েছেন। তা না হলে, কোন সাহসে তিনি রবিশঙ্করের নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য একলাখ টাকাকে তুচ্ছ মনে করেন? মনে হোল অন্নপূর্ণাদেবীর অস্বস্তিটা আত্মগত। ভেতরে ঝড়ের ইঙ্গিত, কিন্তু বাইরেটা চুপ। দুষ্ট চক্রান্তের বিষবাষ্পে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, এ সব কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে নি। এ যেন সর্বপাপহারিনী গঙ্গার গৈরিকধারা। এর উপর দিয়ে, সমস্ত মালিন্য আর জঞ্জাল ভেসে চলেছে, তবু এঁর শুচিতা আর নির্মলতা পলকের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আমার চুপ থাকা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হোল?' বললাম, 'কিছু না।' অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'দেখুন চিরকালই মিথ্যার মধ্যে কাটালাম। আর ভালো লাগে না। বাবার মুখ চেয়ে এতদিন সব সহ্য করেছি কিন্তু সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করল, তখন সব সম্বন্ধের ইতি করলাম।' মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি বা বলবার আছে? দেখলাম সময় হয়ে গিয়েছে। বললাম, 'সাবধানে থাকবেন। কোন রকম অসুখ বিসুখ হলে, ডাক্তার ছাত্রীকে ডেকে পাঠাবেন। প্রণাম করে বললাম, 'যাচ্ছি।' উত্তরে বললেন, 'ভালোয় ভালোয় আসুন।' হাসি পেয়ে গেল কথা শুনে। বম্বে থেকে যখন কাশী যাবার আগে প্রণাম করি, তখনই বলেন, 'ভালোয় ভালোয় আসুন।' আমার হাসি দেখে বললেন, 'কি হোল? আপনার হাসির রোগ এখনও যায় নি?' উত্তরে বললাম, 'আমার বিদায়কালীন সেই এক কথা। আরে আমি কি ছেলেমানুষ, যে ভালোয় ভালোয় যেতে বলছেন।' আমার কথা শুনে হেসে বললেন, 'যাবার সময় যাচ্ছি বলতে নেই। আসছি বলতে হয়।' লিফটের বোতাম আগেই টিপে দিয়েছিলাম। লিফট দাঁড়াতেই বিদায় নিলাম।

হোটেলে যাবার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটি অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেলো। এতে সত্যিই কি এঁরা কেউ প্রকৃত আনন্দ পেলো? আনন্দ বোধটা সকলের কাছে সমান নয়। আমাকে কেউ খারাপ কথা বলে হয়ত আনন্দ পায়, আর আমার মুখ থেকে ভাল কথা শুনে, হয়ত অনেকে আনন্দ পায়। আমি যাতে আনন্দ পাই অন্যে সে কথা শুনলে হয়ত দুঃখবোধ করে। আবার অন্যে যাতে আনন্দ পায়, তাঁর মধ্যে হয়ত আমি কোন অর্থই খুঁজে পাই না। এ এক বড় গোলকধাঁধা। নারী চিরকালই অভিমানিনী। তাঁর আত্মসম্মান বড় বেশী। পুরুষপ্রবর যদি একটু সংযমের পরিচয় দিতো, পরস্পরকে আর একবার বোঝবার চেষ্টা করতো, তাহলে বোধ হয় এই অঘটন ঘটতো না। যাক এ সব ভেবে আর কোন লাভ নাই। হোটেলে আসার পর আমার মনের মধ্যে সেই এক কথাই ঘুরতে লাগলো। মনে হোল নারীদের অনেককেই মিথ্যেবাদী পুরুষের পাল্লায় পড়তে হয়। মিথ্যেবাদী যতই সুন্দর, আর সপ্রতিভ হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে বসবাস করা মানেই অসুখী হওয়ার ভয় প্রতি পদে পদে। কেননা খাওয়া এবং ঘুমানোর মত, মিথ্যা কথা বলাটাও পণ্ডিতের পক্ষে ভীষণ স্বাভাবিক। কিন্তু এখন কি করতে পারেন অন্নপূর্ণাদেবী? এখন এই দুর্দিনে কিই বা করার আছে তাঁর? শুধু মনে মনে দগ্ধে মরা ছাড়া? কেননা মিথ্যে বলতে বলতে, মিথ্যেটাই তাঁদের জীবনে সত্যি হয়ে উঠেছে। অন্নপূর্ণাদেবীর ঘেন্না লাগাটা স্বাভাবিক। ঠক, প্রবঞ্চকদের এই মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা নিয়ে, বিদেশী মনস্তাত্ত্বিকরা বহু আলোচনা করেছেন। ফরাসী মানসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মার্সেল শুধু এই মিথ্যে বলার প্রসঙ্গেই তাঁর বিখ্যাত 'লাইজ এণ্ড টুথ' বইটি লিখেছেন। কথায় বলে বটে, মেয়েরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গোছগাছ করে মিথ্যা বলতে পারে শুধু পুরুষমানুষই। কি অবলীলায় মিথ্যা বলে যাবে ভাবাই যায় না। আসলে অন্যের প্রশংসা কুড়োবার জন্য, পুরুষরা অহেতুক মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে। তাই অক্ষম পুরুষ মিথ্যা কথার মায়া বিস্তার করে অন্যের চোখে বড় হয়ে উঠতে চায়।

অবশ্য মিথ্যা কথা আমরা সবাই বলে থাকি। বলি, যখন যন্ত্রণা এড়ানোর আর কোন উপায় খুঁজে পাই না। কিংবা বলি মান বাঁচাবার জন্য। অশান্তি কমানোর আশায়। কিন্তু সব কিছুর ক্ষেত্রের তো একটা সীমা থাকা উচিত, কারণ একটা মিথ্যাই জটিলতা আর সংঘাতকেও অনেক বেশী বাড়িয়ে দিতে পারে। আসলে মিথ্যা কথা বলা একটা রোগ, স্বভাব দোষ। যাকে বলা যেতে পারে, 'মিথ্যা ম্যানিয়া'। মিথ্যাবাদীদের চেনবার বড় উপায় হোল, অন্যের সামনে শুধু নিজের প্রশংসার উচ্ছ্বাসে যাঁরা মাতাল হয়ে ওঠে।

অন্নপূর্ণাদেবীর শেষ কথাটা, 'চিরকালই তো মিথ্যার মধ্যে কাটালাম', এই কথাটা ভাবতে ভাবতে উপরোক্ত কথাগুলো মনে পড়লো। খেয়াল হোল চন্দরের উপস্থিতিতে। আমি বম্বে এলে, চন্দর আমার গাইড ও তানপুরার বাদক। ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছে। রাত্রে ট্রেনে সকলেই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নাই। সাত রাজ্যের চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। সঙ্গীত সমারোহ ভাল ভাবে করতে হবে। বম্বেতে যা দেখলাম, সে চিন্তাও মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো। কি কথা হয়েছিলো জানি না, কিন্তু দুজনের কথোপকথন

নিজের মনেই বলি। একজন জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমায় ভালবাসি না?' উত্তরে অপরজন বললো, 'ভালবাসা না ভাললাগা? যেমন তোমার প্রচার ভালবাসা। আসলে সম্মান না দিলে ভালোবাসার মূল্য কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি মূল্য দিই নি? আমি কি বাড়ী করে দিই নি?' উত্তর পেলো, 'সে তে বাইরের জিনিষ। কিন্তু আমার মন যা চাইত সেটা তুমি কোন কালেই বোঝ নি। আমার অন্য চাহিদা থাকতে পারে।' এমন কথা শুনবে ভাবতে পারে নি। চিরকাল যাঁকে সহজ সরল ভেবেছে, তাঁর কাছে এই ধরনের উত্তর পাবে আশা করতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে রিট্রিট করেছে। কেন এমন হোল? আসলে সব কিছু স্বাভাবিকতায় চলে না বলেই তো, সৃষ্টিতে রয়েছে এক বৈচিত্র্য। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এক বক ধার্মিক-এর কথা। ফলাও করে নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছে, ছোটবেলা থেকেই তাঁর ধর্মের প্রতি টান বেড়েছিলো। ধর্মের টান বাড়তে বাড়তে বিস্ফোরণ হোল উস্তাদ বাবার সান্নিধ্যে এসে। এই কথা মনে হতেই নিজের মনেই জিজ্ঞেস করি, তুমি লিখেছ তোমাতে ধর্মপ্রেরণা বা আধ্যাত্মিকতা সেঁধিয়ে আছে। তার উপর আছে বাবা আলাউদ্দিনের প্রভাব। অবাক হয়েছি তোমার লেখা পড়ে। অদৃষ্টের বশে তুমি ধর্ম স্মরণ করেছো। নীচ লোক বিপদে পড়লে, দৈবের নিন্দা করে। নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে নিজের গুরুকন্যার হাত ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিলে, যাতে সে বাজাতে না পারে, তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয় নি? আজ পর্যন্ত বাবার নামে ডাক টিকিট, মূর্তি স্থাপনা করলে না। নিজের ঢাক নিজেই পিটোচ্ছ, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিলো? নিজের গুরু পুত্রকে গ্রীণরুমে একলা বসিয়ে রেখে, বাজনা বাজাবার পর লোকের কোলে চড়ে চলে গেলে তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিলো? যাঁরা তোমায় মানুষ করলো, তাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করেছো, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিলো? নিজের পত্নীকে লোক পাঠাতে হতো মাসিক খরচার জন্য, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিলো? গুরুমার গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তাঁর মেয়েকে কোন কষ্ট দেবে না, অথচ যা করলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিলো? এই সব সময়ে যদি তোমার ধর্ম না থাকে, তবে এমন ধর্ম ধর্ম করে তালু শুকিয়ে লাভ কি? আজ তুমি যতই ধর্মাচারণকর, তথাপি নিষ্কৃতি পাবে না। কোথায় গেল তোমার ধর্মের বইএর সখ? শান্তিরক্ষকরা যখন তোমার আলমারি খুলেছিলো, তখন কি বেরিয়ে পড়ে নি, একতাড়া নিষিদ্ধ বই? সেই রেডেতে এমন একজন লোক ছিল, সে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ভালবাসে। সে তোমার এই রূপ জানার পরবর্তীকালে আমাকে বলেছিলো, আর কোনদিন তোমার সেতার শুনবে না। তাই বুঝতে পারি তোমার ধর্মের পরিভাষাটা কি? তুমি যাঁকে ধারণ করো সেটাই ধর্ম। তাঁর বেশভূষা তোমার নিজের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে বদলায়। ধন্য অহিরাবণ। বয়সে ছোট হলেও তোমাকে জানিয়ে রাখি, তুমি তোমার জীবনীতে ছটা সনাতন ধর্মের ভিতরে, পঞ্চমটা ছাড়া বোধহয় একটাও মানো না। তোমার কাছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, শৌচ এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ভিতরে, একটাই মাত্র রিলিভেন্ট। তাও শৌচ বাহ্যই করো, কিন্তু তাতে অন্তরশুদ্ধ হয় না। তোমার স্বার্থে আঘাত লাগলে, তুমি হিংস্র। তোমার প্রচার যন্ত্রে তুমি অসত্য। অন্যান্য খ্যাতি প্রাপ্তির জন্য, তুমি চৌর্যবৃত্তিকে অসাধু বলে মনে করো না। অন্যের

স্ত্রী বা ছাত্রকে অপরিগ্রহ সিদ্ধান্তে কেড়ে নিতে তোমার রুচিতে বাঁধে না, আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ব্যাপারে তুমি মাশে আল্লা। সারমেয়ও পিটুওট্যারি গ্ল্যাণ্ডে ক্ষরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, আর তুমি? সাত থেকে সাতাত্তরে বিরক্তি নাই? নিশাচর, প্রবৃত্তি সাধু। এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

পরের দিন বিকেলের আগেই কাটনি স্টেশন ছাড়বার পরই, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থেকে বেরিয়ে, দরজার ঘষাকাঁচে চোখ রাখলাম। কাঁচের সবুজে বা আমার চোখের জন্য, মৈহারটা আজও আমার কাছে জীবন্ত মনে হয়। দূর থেকে প্রথমেই পাহাড়ের উপর সারদা দেবীর মন্দির দেখতে পাই। মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পাই চুনের ভাট্টা, সঙ্গীত বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল, ব্যাণ্ড পার্টির বাড়ী, সিনেমা। মনে পড়ে বাবার কথা। মৈহার ছাড়ার পর, যে সময় মৈহারের উপর দিয়ে ট্রেনে গিয়েছি, ট্রেনের দরজার কাঁচের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছি। কিন্তু আজ মৈহারের উপর দিয়ে গাড়ী যাবার সময়, মায়ের একটা কবিতার শেষ তিনটে লাইন মনে পড়ে গেল।

> কোথায় রে তোর নীল ঘোড়া
> একদিন দেখবি রে মন।
> কবরে ঘোর অন্ধকার।

৭১

দেখতে দেখতে বাবার মহাপ্রয়াণ হয়ে গেছে দশবছর হোল। তারপর কোথায় রইল মা, কোথায় রইল আলিআকবর, কোথায় রইল রবিশঙ্কর। কোথায় রইল বাবার নাতিনাতনি, সে সব খবর রাখবার দীর্ঘদিন অবসর হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম অন্নপূর্ণাদেবী। মুহূর্তের মধ্যে মৈহার অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে মনে বলি, যাক বাবাকে এ সব দেখতে হয় নি। কিন্তু সত্যই কি বাবা সব দেখতে পাচ্ছেন না? কি জানি?

রাত্রে কাশী পৌঁছলাম। পরের দিন আমাদের 'মিউজিক সার্কেলের' একটা মিটিং হোল। ঠিক হোল কনফারেন্সের আগে, একটা সেমিনার হবে। দেখতে দেখতে বছরের নয়টা মাস কি ভাবে কেটে গেল। ইতিমধ্যে বেরিলি থেকে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। বাজনাটার একমাস দেরী আছে। শিল্পী ঠিক করবার জন্য ভাবলাম, যে সময়ে বেরিলি যাব, সেইসময় দিল্লী গিয়ে শিল্পী ঠিক করব। চিঠি লেখার থেকে সামনা সামনি কথা বলাই ভাল। উপস্থিত, কোলকাতা গিয়ে কয়েকজন শিল্পীকে ঠিক করতে হবে, ভেবে, প্রথমে কোলকাতায় গেলাম। কোলকাতায় গিয়ে নিজের পরিচিত শিল্পীদের ঠিক করতে সময় লাগলো না। বাবার নামের এমনই মহিমা। যাওয়া আসার খরচা এবং থাকার বন্দোবস্ত করব। উপরন্তু যা পারব দেব। এই কথাতেই তাঁরা রাজী হোল, যেহেতু সকলে আমার পরিচিত।

মনে মনে একজন গায়ক শিল্পীর কথা ভাবলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। শুনলাম সেই শিল্পী, আই.টি.সি.-তে অধ্যাপক হয়ে নিযুক্ত আছে। আমার পরিচিত একজন বললেন, 'আই.টি.সি.-র ডিরেকটার বিজয় কিচলুকে বললেই, সেই শিল্পীকে আপনি কাশীতে নিয়ে যেতে পারেন।' ইতিমধ্যে আই.টি.সি.-র নাম, এবং বিজয় কিচলু যে

ডাইরেকটার তা জানা ছিলো। মৈহার ছাড়ার পরের বছরেই, বিজয় কিচলুর বিয়েতে বাজিয়েছিলাম। যে হেতু আমি ঘরকুনো, সেইজন্য কোলকাতায় প্রতিবছর গেলেও কখনও কোন জলসায় তাঁকে দেখি নি। শিল্পী ঠিক করবার জন্য, ঠিকানা জেনে নিয়ে সোজা হাজির হলাম। গেটের দারোয়ান বলল, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে উনি এসে যাবেন।' ইতিমধ্যে ঢুকতে দেখলাম ভি, জি, যোগকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আরে আপনি এখানে?' উত্তরে বললেন, 'আমি এখানে পারট টাইম কাজ করি। কিন্তু আপনি কি মনে করে এসেছেন?' আসবার কারণ বলে, গত বছরের একটা সুভ্যেনির দিলাম। ভি, জি, যোগ আপ্যায়ণ করে বললেন, 'আমাদের ডিরেকটার একটু পরেই আসবেন। ততক্ষণ আমার কামরায় চলুন।' আমরা একটা ঘরে যেতেই, দেখলাম জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বসে রয়েছেন। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ-এর কাছে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, প্রায় বারো বছর আগে বাবার উপর বই লিখবার জন্য। এ ছাড়া জলসায় আমার বাজনা শুনতে কয়েকবার দেখেছি, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও আমাকে আপ্যায়ণ করে সেই এক প্রশ্ন করলেন, 'কি মনে করে?' সেই এক উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনিও কি এখানে শেখান?' উত্তরে বললেন, 'আমি ও যোগ সাহেব লাইব্রেরীর ইনচার্জ। এই ঘরে যত টেপ দেখছেন, তারই দেখাশোনা করি।' ঘরে দেখলাম মেসিনে টেপ চলছে। আমাদের কথার মাঝখানেই, একজন এসে বললেন, 'কিচলুজী এসেছেন।' জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ আমাকে বললেন, 'আপনি নিজের নাম লিখে দিন একটা কাগজে। সময়মত আমাদের ডিরেকটার আপনাকে ডাকবেন। বাই দি ওয়ে একটা কথা বলুন তো। আপনার সঙ্গে কি আলাপ আছে আমাদের ডিরেকটারের সঙ্গে?' বললাম, 'দীর্ঘ চব্বিশ বছর আগে আলাপ হয়েছিলো। সে সময় বিজয় কিচলু আপনাদের ডিরেকটার হন নি।' যাই হোক কাগজটা চাপরাশিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ডাক পড়লো। বিজয় কিচলুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। সে সকলেরই কাছে ডাইরেক্টার, কিন্তু আমার কাছে সেই পুরোনো দিনের, এক রাতের পরিচিতিতে যেন মনে হোল, দীর্ঘ দিনের পরিচয়। বিজয় কিচলুকে গত বছরের সুভ্যেনির দিয়ে বললাম, 'আপনি লতাফৎ হুসেন খাঁকে আমাদের সংস্থায় গাইবার জন্য নামমাত্র মূল্যে ঠিক করে দিন।' সঙ্গে সঙ্গে লতাফৎ হুসেন খাঁকে ডেকে বিজয় কিচলু ঠিক করে দিলো। এবার বিজয় কিচলু আমাকে বললো, 'আমাদের আই.টি.সি.-তে লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশন হয়। বাজনা এবং লেকচার টেপ করে রাখা হয়, যাতে সঙ্গীত শিক্ষার্থী তা শুনে শিল্পীকে বুঝতে পারে। আমাদের লাইব্রেরীতে সেই রেকর্ড থাকবে। এর জন্য আপনাকে যৎ সামান্য উপহারস্বরূপ কিছু দেব।' সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বিষয়ে কথা হবে?' উত্তরে বললো, 'আপনার উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করব, এবং আপনি তার উত্তর দেবেন। ঠিক সকাল দশটার সময় প্রথমে এক ঘণ্টা বাজাবেন এবং তারপর এক ঘণ্টা কথোপকথন হবে।' বিজয় কিচলু আমাকে নীচে নেমে, হল ঘর দেখাল যেখানে বাজনা হবে। চমৎকার হল ঘর। বিদায় নেবার সময় বিজয় কিচলু বললো, 'এখানে বাইরের শ্রোতা কেউ থাকবে না। আই.টি.সি.-র শিক্ষক এবং অন্যান্য সদস্যরা থাকবেন। দিন স্থির হোল দুইদিন পরে বাজনা হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকালে আই.টি.সি.-তে গিয়ে পৌঁছলাম। সবে বাজনা মিলিয়েছি, ইতিমধ্যে লোডশেডিং হয়ে গেল। সুতরাং রেকর্ডিং হবে না। ঠিক একঘণ্টা পরে আলো এলো। বাজাবার সময় সামনে দেখলাম নীসার হুসেন খাঁ, লতাফৎ খাঁ, নিবৃত্তিবুয়া সরনায়ক, দীপালি নাগ, মালবিকা কানন, ভী জি যোগ, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ছাড়াও অনেকে বসে আছেন।

বাজনা শুরু হবার আগে বিজয় কিচলু প্রথমে আমার বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে বলল, 'যতীনবাবু আমাদের এখানে বাজাবার এবং উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সম্বন্ধে লেকচার দেবার জন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন, তার জন্য আই.টি.সি.-র তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ আমরা উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারব। যা আমাদের সংগ্রহালয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে আমি প্রশ্ন করব এবং তার উত্তর দেবার জন্য যতীনবাবুকে অনুরোধ করেছি। এখন প্রথমে আপনারা বাজনা শুনুন, পরে লেকচার হবে।'

পরিবেশটা খুব সুন্দর। ভালো লাগলো। এক ঘণ্টা বাজালাম। এবার ঠিক হোল বাবার সম্বন্ধে কথোপকথন হবে। হঠাৎ আমার কাছে এসে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ বললেন, 'আমার একটা জরুরি এপয়েন্টমেন্ট আছে, সেইজন্য থাকতে পারছি না। লোডশেডিং না হলে, আমি ঠিক থাকতাম। চলে গেলেও, পরে রেকর্ডিং রুমে বসে ভাল করে শুনব। শুনবার পর সংগ্রহালয়ে ঠিক মত রেখে দেবো। আমি চলে যাচ্ছি বলে দয়া করে কিছু মনে করবেন না।' এই বিনয় ভাষণ শুনে বললাম, 'এঁর মধ্যে মনে করার কি আছে? আপনি এপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন ঠিক সময়েই, কিন্তু লোডশেডিং হবে কে জানত?'

মাইকম্যান মাইক ঠিক করে বসিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে বাবার বিষয়ে লেখা ইংরেজী বইটা বার করলাম। যেখানেই বাজাতে যাই, বাবার সম্বন্ধে জানার কৌতূহল দেখি। সেইজন্য সর্বদাই আমার লেখা বইটি সঙ্গে রাখি।

কিছু প্রশ্ন করার আগেই, দর্শকদের সম্বোধন করে বললাম, 'দীর্ঘ চব্বিশ বছর আগে যাঁর বিবাহের দিন ঘরোয়া পরিবেশে আমি বাজিয়েছিলাম, সেই ব্যক্তিটিকে যেমন দেখেছিলাম, আজও তাঁর কোন পরিবর্তন না দেখে, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। সেই ব্যক্তিটি আমার সামনেই বসে আছেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হওয়ার আগে সেই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা আমি আপনাদের শোনাব। আমার জীবনে আমি দেখিনি বা শুনিনি যে কোন ব্যক্তি তাঁর নিজের ফুলশয্যার রাত্রে বিবাহবাসরের মধ্যে ঘরোয়া সঙ্গীতের আয়োজন করতে পারেন। একের পর এক ফরমায়েসের ফলে সেই ফুলশয্যার রাত্রে এগারটা থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত বাজালাম। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করবার পর জানতে পারলাম, গৃহকর্তা সঙ্গীতের সামান্য চর্চা করেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছর আগের সেই গৃহকর্তা আজ খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ এবং বর্তমানে একটা আদর্শ সংস্থার উচ্চপদে আসীন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিজয় কিচলুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন বলে। উস্তাদ বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গ বলতে গেলে, এই অল্প সময়ে বলা সম্ভব নয়। আমি বাবার নির্দেশে একটা বই ইংরেজীতে লিখেছি। বইটার নাম 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এনড হিজ মিউজিক'। এই বইটি আমি উপহার হিসাবে আই.টি.সি.-কে দিচ্ছি। এই বইটা পড়লে বাবার বিষয়ে কিছু

জানতে পারবেন। যে কথা লেখা হয়নি, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলব। কিছু বলবার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমার জনসমক্ষে বাজাবার অভ্যাস আছে, কিন্তু মঞ্চে বসে কিছু বলবার অভ্যাস নাই। তবে বাবার সম্বন্ধে অনেকে আমাকে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তখন এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই, অর্থাৎ আমি খেই হারিয়ে ফেলি। সেইজন্য বিজয় কিচলুকে আমি অনুরোধ করছি, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলে, যেন আমাকে তাঁর প্রশ্নটা মনে করিয়ে দেন।'

বিজয় কিচলু প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'বাবা কি ভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন?' একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ, সেইজন্য খুব সহজ ভাবেই বাবার শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে বললাম। কথায় কথায়, মহিলাদের থেকে, ছাত্রদের কি প্রকার দূরত্বে রাখতেন, সেই প্রসঙ্গে বাবার কয়েকটি গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে, দীপালি নাগ এবং মালবিকা কাননকে হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম। এরপর বাবা বাজনাকালীন, তবলা বাদক কি প্রকারে সঙ্গত করলে খুশী হতেন বললাম। তবলা বাদকের ঔদ্ধত্য ভাব দেখলে কি প্রকার গৎ বাজাতেন, তারপর কি প্রকারের বোলের কাজ করতেন বাজিয়ে দেখালাম। এরপর বললাম, বাবা আদ্ধা ঠেকায় একটা গৎ বাজাতেন। বাবা বলতেন এটা দাদু নাতির গৎ। বাবা যে ঠেকাটি চাইতেন সেটা কাউকে এ যাবৎ লাগাতে দেখি নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কণ্ঠে মহারাজ। মুখে বলে দেওয়া সত্ত্বেও, অদ্ধা ঠেকার বদলে, ত্রিতাল বাজালে, বাবার মেজাজ, শৃঙ্গার রস থেকে বীররসে পরিবর্তিত হ'তো। এই গৎটির ঠেকা বাবা মুখে কি ভাবে বলে বাজাতেন, সেইটা বাজালাম। এরপর কয়েকটি কঠিন বন্দিশের গৎ বাজিয়ে, ত্রিতালে সম্ বিষমের একটি গৎ বাজিয়ে বললাম, 'এই গৎটির বৈশিষ্ট্য বলে বুঝিয়ে না দিলে কোনো তবলাবাদকই এর সঙ্গে সঙ্গত করতে পারবেন না।'

বাবার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কয়েকবার খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিজয় কিচলু পুরোন সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যাই হোক যখন শেষ হোল, বিজয় কিচলু বললো, 'এ কথা বললে ভুল হবে না, যে আজ পর্যন্ত আই, টি, সিতে যত লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশন হয়েছে, এত প্রাণবন্ত কখনও হয় নি।' আশ্চর্য হলাম এ কথা শুনে। কারণ যাঁদের নাম এঁদের সদর দরজার পাশে লেখা আছে, তাঁদের মধ্যে বাবার এক ছাত্রের নাম আছে। কিন্তু তাঁর ফুরসৎ কোথায় ছিলো বাবার সম্পর্কে বলা? হয়ত নিজের বিষয়েই সব কথা বলেছে। তাই এঁদের কাছে বাবা এখনও অজানা ছিলেন। হায়রে আমিত্বের আহাম্মুকতা। করুণা হয়! এঁদের এ আস্থাও নাই যে এঁদের সম্বন্ধে, অন্য কেউ লিখবে বা বলবে? তাই এত স্বঘোষণ।

কোলকাতার সব কাজ সেরে কাশী ফিরে এলাম। কাশীতে এসে দেখলাম, আমাদের সার্কেলের মুষ্টিমেয় লোক, যাঁর প্রতি যে দায়িত্ব, সেই কাজে লেগে আছে। সমারোহ হবার দেড় মাস কেবল বাকী, সেইসময় বেরিলিতে বাজিয়েই দিল্লী গেলাম। উদ্দেশ্য শিল্পী সংগ্রহ। আমার একজন স্নেহভাজন কাশীর বাসিন্দা হলেও, দিল্লী প্রবাসী তবলা বাদক শ্যামল চৌধুরি। স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো আমাকে সাহায্য করতে। নিজে ফোন করে যোগাযোগ করল আমজদ আলিকে। তারপরে গেলাম ওর সাথে। মনে মনে ভাবছিলাম,

যদি আটচল্লিশ সালেতে, হাফেজ আলি খাঁর কাছে শেখাটা স্থির হয়ে যেতো, তাহলে যে পরিণত আমজাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি তাকে বালক অবস্থা থেকেই চিনতাম। বাড়ী যাবার পরে একটু আশ্চর্যই হলাম। জনজীবনে, বহুল প্রচারিত নাম উস্তাদ আমজাদ আলি খাঁ, ব্যক্তিগত জীবনে কি সহজ, কি সরল, অতীতের অল্পক্ষণের যোগাযোগটা আমাকে এতটা বুঝতে দেয়নি। কিন্তু আজ ওর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। বাবার শতবর্ষে বাজানর সুযোগ পেয়ে যেন নিজেকে ধন্য বোধ করছে। আমজাদ পাথেয়কেই পারিশ্রমিক বলে স্বীকার করে নিলো। এটা আমার কাছে এক সুখদ বিস্ময়। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। আবার এক শিল্পীর ঋণ বাড়ল। শুরু এবং সমাপনের উৎসবের প্রায় সমস্ত শিল্পীই স্বেচ্ছায় এবং স্বল্প দক্ষিণায় অকৃপণ ভাবে যে এগিয়ে এসেছেন, সেটা আমাকে এই শিক্ষা দিলো যে বাবা শুধু আমাদের কাছেই নন, সর্বজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দিল্লীতে আমার পরিচিত তিনজন শিল্পীকে ঠিক করেই কাশী চলে এলাম।

কাশীতে আসবার পরেই, কাশীতে ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্মেলন হোল। এবারে মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের কথায় ছেলেকে বাজাতে দিলাম। মৃদঙ্গে সঙ্গত করল বীরভদ্র মিশ্রর ছেলে বিভূতিনারায়ণ মিশ্র। ছেলে সতেরো মাত্রা, পৌনে তেরো মাত্রায় বাজিয়ে, সঙ্গীত মহলে একটা বিশেষ স্থান করে নিলো। এই বাজনার পরে কয়েক জায়গা থেকে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলো। কিন্তু আমি ছেলেকে বাইরে বাজাবার ইতি করলাম। এ যাবৎ তিনবার বাজাবার অনুমতি দিয়েছিলাম, মনে যাতে উৎসাহ পায়। ছেলেও বুঝতে শিখেছে, সে যদি ঠিক মত দিনরাত এই বাজনা নিয়ে থাকে, তাহলে সে বাজাতে পারবে। মনে মনে ভাবি, দুটো বছর লেখাপড়ার শেষ ডিগ্রিটা নেবার পর, অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে গেলেই ছেলে ধাতস্থ হয়ে যাবে এবং সিরিয়াস হয়ে বাজাবে।

কয়েকদিন পরেই আমাদের সংস্থার তরফ থেকে একটা সেমিনারের আয়োজন করলাম। বিষয়টা ছিলো 'জাসটিফেকেশন অফ এনি সেনটিনারি, আণ্ডার দি লাইট অফ আলাউদ্দিন সেনটিনারি।'। এই সেমিনারে আমাদের কাশীর সব সভ্যই এল। দুঘণ্টার মধ্যে সকলেই নিজের নিজের মন্তব্য প্রকাশ করলো। এই ধরনের সেমিনার কাশীতে কখনও হয়নি, যা আমাদের সার্কেলের তরফ থেকে হোল।

আমাদের সম্মেলন শুরু হবার কিছুদিন আগেই, আমার ফ্রেঞ্চ ছাত্রটির ভিসা শেষ হয়ে গেল। এত কাজের মধ্যেও তাঁকে শিখিয়েছি। যাবার আগে আমাকে বলল, 'প্যারিসে গিয়ে আপনাকে আগামী বছর কবে যেতে হবে, সব ঠিক করে লিখব।' ইতিমধ্যে আগামী বছরের জানুয়ারীতে, কোলকাতা, জববলপুর, ইন্দোর এবং উজ্জয়নে বাজাবার নিমন্ত্রণ পেলাম।

সম্মেলন শুরু হবার এক সপ্তাহ আগে, মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের বাড়ীতে, স্থানীয় সব পত্রিকার প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করলাম। কাশীর সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এলেন। প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে বললাম, 'এই বছরে আমরা আমাদের সার্কেলের তরফ থেকে 'দি কনক্লুডিং সেরিমনি মিউজিক ফেষ্টিভাল অফ দি বার্থ সেনটিনারি অফ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন' করব। তবে আমাদের সারকেল-এর উদ্দেশ্য, উস্তাদ বাবার সঙ্গীত, গুরু শিষ্য পরম্পরা হিসাবে অব্যাহত থাকবে।

গত বছরের মত এবারেও প্রধান অতিথি এবং সভাপতি করবার জন্য যথাক্রমে ঠাকুর জয়দেব সিং এবং ডাক্তার কৌশলপতি ত্রিপাঠিকে ঠিক করলাম।

স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সংবাদ পত্রে খুব সুন্দর করে আমাদের কনফারেন্সের উদ্দেশ্য লিখল। এবারেও রজনীগন্ধার মালা দিয়ে পুরো হলটি সাজাবার ভার নিলেন শ্রী এস.এন.সিং ফ্লাওয়ার ডেকরেটের।

দেখতে দেখতে তেসরা ডিসেম্বার এসে গেল। তিন দিনের সারা রাত্রির কার্যক্রমের প্রথম দিন, গতবারের মত এবারেও দুই বয়োবৃদ্ধ ঠাকুর জয়দেব সিং এবং কৌশলপতি ত্রিপাঠিকে কার্যক্রমের আগেই আনতে গেলাম। গাড়ীতে বসে ঠাকুর জয়দেব সিং জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই কনফারেন্স করার উদ্দেশ্যটা কি?' উত্তরে বললাম, 'কনফারেন্স করাটা বড় উদ্দেশ্য নয়। একটা কথা সকলকে বোঝাতে হবে যে, গুরু শিষ্য পরম্পরার পদ্ধতিতেই, আজ পর্যন্ত সঙ্গীত বেঁচে আছে। কিন্তু এই পদ্ধতি যদি না চলে, তাহলে মনে হয় অদূর ভবিষ্যৎ-এ কুড়িবছর পর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত লোপ পেয়ে যাবে।'

প্রধান অতিথি হিসাবে ঠাকুর জয়দেব সিং আমার কথাটাই বললেন। উপরন্তু বললেন, 'আজকাল স্কুল কলেজের শিক্ষায় বিদ্যার্থীদের হয়ত ঔপপত্তিক সম্বন্ধে জ্ঞান হবে, কিন্তু মঞ্চে শিল্প কলা প্রদর্শন করবার ক্ষমতা হবে না। স্কুল, কলেজ ছাড়া যে সমস্ত সমিতি, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে, তার দ্বারায় সারটিফিকেট হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই মনে করি।' সভাপতি ডাক্তার কৌশলপতি ত্রিপাঠি বক্তব্যের সমর্থন করলেন। আমাদের সংস্থার সেক্রেটারি মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র, গুরু শিষ্য পরম্পরার শিক্ষা পদ্ধতি রূপায়িত করবার জন্য প্রস্তাব করলেন।

তারপর শুরু হোল সঙ্গীতের কার্যক্রম। তিনদিনের অধিবেশনে গানে অংশগ্রহণ করলেন লতাফৎ হুসেন খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক এবং কমলা বোস। বাদ্যে অংশগ্রহণ করলেন আমজাদ আলি খাঁ, মনিলাল নাগ, দেবু চৌধুরি। আমার তিনটি ছাত্রও অংশগ্রহণ করলো। কোলকাতার দীপক চক্রবর্তী, বীরেন ভট্টাচার্য এবং কাশীর রাজেশ মৈত্র। এবারেও আমি বাজাতে চাই নি। কেননা এই কয়েকদিন রাত দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই ক্লান্ত অবস্থাতেও বাজাতে হোল। বাবার ঘরের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আমাদের সার্কেলের সদস্যরা আমাকে জোর করাতেই, বাধ্য হলাম। নৃত্যে অংশগ্রহণ করলেন, দয়মন্তী যোশী, মায়া চ্যাটার্জি এবং গীতাঞ্জলি। তবলায় সহযোগিতা করল কিষণ, লতিফ আহমদ খাঁ, ঈশ্বরীলাল মিশ্র, মদন মিশ্র, সারদা সহায়, ছোটেলাল মিশ্র এবং শ্যামল চৌধুরি। সারেঙ্গীতে বাচ্চালাল মিশ্র এবং নারায়ণ মিশ্র গানের সঙ্গে সহযোগিতা করল। এ ছাড়া সারদা সহায়ের এক বিদেশি ছাত্র বব বেকার একক তবলা বাজাল। এবারেও কোলকাতা, দিল্লী এবং বম্বের শিল্পীরা আসাতে সঙ্গীত সমারোহ খুব সুন্দর ভাবে বাবার শতবার্ষিকীর সমাপন হিসাবে পালিত হোল। সংবাদপত্রে কাশীর সাংবাদিকরা নিজেরা যে প্রাধান্য সহকারে সংবাদ ছাপিয়েছিলেন, তা কাশীর সঙ্গীত সমারোহর পক্ষে অকল্পনীয়।

সঙ্গীত সম্মেলন শেষ হোল। হিসেব নিকেশের ভার অন্যের উপর দিলেও, আমার কিছু

দায়িত্ব আছে। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবার পর, ঠেলা সামলাতে কয়েকদিন লাগা স্বাভাবিক। দেখতে দেখতে সাত আটদিন কোথা দিয়ে যে পেরিয়ে গেল বুঝলাম না। প্রায় এক মাস পরেই জববলপুর, ইন্দোর, উজ্জৈন এবং কোলকাতায় বাজাতে যেতে হবে। নানা চিন্তায় যখন বিপর্যস্ত, ঠিক সেই সময় একটা চিঠি এলো বম্বে থেকে। চিঠিটা লিখেছেন অন্নপূর্ণাদেবী। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

8th 1982

যতিন বাবু,

গুরু এবং ভগবানের স্বরন নিয়ে নতুন জীবন সুরু করতে যাচ্ছি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবেন জেন উনি যেন আমার সহায় হোন। আশা করি আপনি যেমন আমার সাথে বন্ধুর মত সর্ব্বদা ছিলেন তেমনই থাকবেন।

আমার শুভেচ্ছা আপনারা সবাই নেবেন।

অন্নপূর্ণা

আমি আপনাকে জানাচ্ছি আর কারুর কাছে কিছু জানাইনি।

চিঠিটা পেয়ে আমার মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা আমি হাজার চেষ্টা করলেও ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কি এমন কথা যে চিঠিতে প্রকাশ করা যায় না যা একমাত্র সাক্ষাতেই বলা যায়। যদিও লিখেছেন নূতন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি। কিন্তু নূতন জীবনই বা কি? তাঁর জীবনে এমন কি নূতন ঘটনা ঘটল? এ ছাড়া একটা জিনিষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, যা ইতিপূর্বে কখনও হয় নি। এ যাবৎ যে কয়েকটা চিঠি পেয়েছি, চিঠির শেষে ইতি করে বৌদি লিখেছেন। যে হেতু আমি বরাবরই অন্নপূর্ণাদেবীকে বৌদি বলে সম্বোধন করি, সেইজন্য চিঠিতেও ইতি করে অন্নপূর্ণাদেবী বৌদি লেখেন। কিন্তু এবারে বৌদি না লিখে, অন্নপূর্ণা কেন লিখেছেন? সবচেয়ে বড় কথা এমন কি ঘটনা ঘটেছে, যে কথা আমাকেই কেবল জানালেন অথচ অন্য কারো কাছে কিছু জানান নি? কয়েকবার চিঠিটা পড়লাম। চিঠিটা আমার কাছে ধাঁধাঁর মতো মনে হোল। চিঠিটার অনেক অর্থ হয়। তবে যে অর্থই হোক না কেন, এটা নিশ্চিন্ত যে বিপদে পড়েন নি। সে রকম কোন দুর্ঘটনা হলে, পত্রপাঠ বম্বে যেতেই হ'তো। প্রায় একমাস পরে আমাকে জববলপুর, ইন্দোর এবং উজ্জয়িনী যেতে হবে। স্থির করলাম উজ্জৈন-এর প্রোগ্রাম শেষ করেই বম্বে যাব। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে দিলাম যে আটাশে জানুয়ারী বম্বেতে পৌঁছব। চিঠি লিখছি। একটা চিঠি লিখলাম, সব কথা জানিয়ে পরিষ্কার করে লিখতে। দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। কিন্তু কোন চিঠি পেলাম না।

এখন দেখছি শেষ জানবার কৌতুহল সকলের। এই জীবন মরণ সমস্যার অক্লান্তর সুষ্ঠু সমাধান জানবার আগ্রহ। বরাবর দেখে আসছি সকলের এক প্রশ্ন, কী হোল তাড়াতাড়ি বলে দাও। আর দেরী সহ্য হয় না। আরে দেরী কি আমি সহ্য করতে পারছি? বম্বে গেলে বা চিঠি পেলে তবেই না জানতে পারব কি হোল? তাই চিঠির অর্থ বলতে গেলে একটু পেছনের দিকে যেতে হবে। সেই কথাই আগে বলি।

দেখতে দেখতে বছর পেরিয়ে নূতন বছরের সকাল দেখলাম। গত বছরে কাশীর সংবাদপত্র জগৎ আমাকে যে অকৃপণ সাহায্য করেছেন তার জন্য বিনম্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে, প্রেস ক্লাবে বাজানর অনুরোধ স্বীকার করলাম। কাশীর সব পত্রিকার সংঘ, একই দিনে বরেণ্য সাহিত্যিক বিমল মিত্র আর আমাকে মিট দি প্রেসএ আমন্ত্রিত করল। এটা আমার মনে হোল বাবাকে প্রদর্শিত সম্মানের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের একটা সুযোগ।

দেখতে দেখতে জব্বলপুর রেডিও সঙ্গীত সভার সময় এসে গেল। জব্বলপুর গিয়ে শুনলাম, সঙ্গীত সভায় রসিকলাল আন্ধেরিয়ার গান এবং আমার বাজনা হবে। আমার বাজনা হবার পরেই, জব্বলপুর রেডিওর স্টেশন ডাইরেক্টার জিজ্ঞেস করলেন, 'কয় দিন জব্বলপুরে থাকবেন?' উত্তরে বললাম, 'আগামীকাল সন্ধ্যায় ইন্দোর যাব।' আমার কথা শুনে ডাইরেক্টার বললেন, 'আগামীকাল সকালে আপনার ইন্টারভিউ রেকর্ড করিয়ে যান।' পরের দিন সকালে রেডিওতে গিয়ে দেখলাম, গোবিন্দ কুলকার্ণি দাঁড়িয়ে আছে। মৈহার থাকাকালীন কুলকার্ণি আমার কাছে এসে শিখত। বাবারও স্নেহভাজন ছিল, যে হেতু তাঁর বাবা একজন জব্বলপুরের নামকরা জ্যোতিষী ছিলেন। আমাকে দেখেই বলল, 'গতকাল রাত্রে জব্বলপুর ফিরেছি। তাই আপনার বাজনা শুনতে যেতে পারি নি। আজ তাই আপনার বাজনা শুনতে, সকালেই আপনার হোটেলে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে রেডিও থেকে আমাকে খবর দিয়েছে, আপনার ইন্টারভিউ নেবার জন্য।' জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনও মহিলা কলেজের সঙ্গীতের অধ্যাপকের পদেই আছো?' সলজ্জ হেসে বলল, 'কিসের অধ্যাপক? কোন রকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দাদা আপনার লেখা ইংরেজি বইটি পড়েছি। বইটা পড়ে অনেক কিছু শিখেছি। আপনার মৈহার থেকে যাবার পর তো, আর শিক্ষা পাই নি। যাই হোক আজ কিন্তু রেডিওর কাজ সেরে, আমার বাড়ীতে খেতে যেতে হবে। বৌ এবং ছেলে মেয়ে আপনাকে দেখবার জন্য পথ চেয়ে আছে।'

কথার ফাঁকে, প্রডিউসার অফ মিউজিক এসে আমাকে ডাইরেক্টারের ঘরে নিয়ে গেলেন। ডাইরেক্টার আমাকে দেখেই বললেন, 'আধ ঘণ্টার ইন্টারভিউ নেবে জববলপুর মহিলা কলেজের অধ্যাপক। আমরা জানি গোবিন্দ কুলকার্ণি আপনার কাছে শিখেছে, সেইজন্য তাঁকেই আমি ডেকেছি।' প্রডিউসার অফ মিউজিক-এর সঙ্গে স্টুডিওতে গেলাম। ঠিক হোল, বাবার সঙ্গীতের মধ্যে কি বিশেষত্ব ছিলো, এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে। এ ছাড়া কথাচ্ছলে কয়েকটা প্রশ্ন করলে, তার উত্তর আমাকে দিতে হবে।

রেকর্ড শুরু হোল। প্রথমেই প্রশ্ন করলো, 'বাবা সরোদের মধ্যে কি নূতনত্ব করেছেন? উত্তরে বললাম, 'প্রথমতঃ সরোদের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়, এটা বাবার আবিষ্কার। পূর্বের মত সরোদ বাদক ছিলেন, তাঁদের সরোদের আকৃতি এবং মেলাবার পদ্ধতি এ রূপ ছিলো না। সরোদের তরফের মধ্যে এরকম ছয়টি তার, এবং জওয়ারীর মধ্যে চারটি তার, এবং তাঁর ব্রিজ নূতন করেছিলেন। যা দেখলেই বোঝা যায় বাবার ভিন্নতা। এ ছাড়া বাবা সরোদের মধ্যে বীন, রবাব, ধ্রুপদ এবং খেয়াল অঙ্গ মিশিয়ে একটা নূতন সৃষ্টি করেন, যা আগে কোন সরোদ বাদকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনার পর,

কুলকার্ণি আমায় প্রশ্ন করল, 'উপস্থিত স্কুলে এবং কলেজে সঙ্গীতের পাঠ্যক্রম হয়ে সঙ্গীতের প্রচার এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েছে কি না? এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?' উত্তরে বললাম, 'সঙ্গীতের প্রচার হয়েছে ঠিকই, সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেও অনেকে সোচ্চার হয়ে থাকেন।' আমি সবিনয়ে বলি, সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার। স্বর্গীয় ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গীতে নিঃসন্দেহে বিরাট অবদান। সঙ্গীত প্রচারের জন্য স্কুল এবং কলেজে যে পাঠ্যক্রম তিনি তৈরি করেছিলেন,, সেটা ছিলো একটা একসপেরিমেন্ট। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি পাঠ্যক্রমে সীমিত রাগের পরিবর্তন করতেন। সেই জিনিষগুলি ভারতবর্ষে সঙ্গীত শিক্ষকদের ভাবা দরকার। ভারত সরকার বহু অর্থব্যয় করছেন কিন্তু সেই অর্থে ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই, লাল আলো নিভে গেল। প্রোডিউসার অফ মিউজিক এসে বললেন, 'এই কথাটা আপনি বলবেন না।' অবাক হয়ে বললাম, 'সত্যি কথা বললে যদি অপরাধ হয়, তাহলে ইন্টারভিউ-এর দরকার নাই। আগে শুনুন কি বলতে চাইছিলাম, সবকথা না শুনেই রেকর্ডিং বন্ধ করে দিলেন।' সঙ্গীত নির্দেশক বললেন, 'আমি একটু ডাইরেক্টারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।' কিছুক্ষণ পরে ডাইরেক্টারের সঙ্গে সঙ্গীত নির্দেশক এলেন। স্টেশন ডাইরেক্টারকে সব কথা বলতে, সঙ্গীত নির্দেশক বললেন, 'সরকারের বিরুদ্ধে কথা হয়ে যাচ্ছে।' উত্তরে বললাম, 'ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি নি। সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কি করণীয় তাই বলছিলাম।' স্টেশন ডাইরেক্টার রেকর্ডটা শুনে, টেপ করতে সম্মতি দিলেন। আবার রেকর্ডিং শুরু হোল। যে জায়গায় টেপ বন্ধ হয়েছিলো, সেই জায়গা থেকে আবার শুরু করলাম। বললাম, 'ভারত সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেছেন, কিন্তু সেই অর্থ ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। এর জন্য দায়ী স্কুল কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী। ভারতবর্ষে এত সেমিনার হয় স্কুল কলেজে, নানা দিকপাল পণ্ডিতরা আসেন সেমিনারে, কিন্তু সেই চিরাচরিত প্রথাকে বদলাবার কথা, তাঁরা কখনও ভেবে দেখেন না। যে এ, বি, সি, ডি-র মধ্যে, বি কিংবা ডি চিনতে পারলো না, পরের দিন তাঁকে সেক্সপিয়ার পড়ান শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ প্রথম বছরে যাঁর স্বরের পরিচিতি হোল না, তাঁকে প্রথম বছরেই দশটি রাগ শিক্ষা করতে হবে। এ কি সম্ভব? এই ভুল প্রথার জন্য, প্রতিভাধর ছেলে কিংবা মেয়েরা বিকশিত হবার সুযোগ পায় না। বলতে পারেন, ভারতবর্ষে এত স্কুল কলেজের মধ্যে একটা ছেলে কিংবা মেয়ের নাম? যাঁরা দীর্ঘ দশবৎসর শিক্ষা করবার পর মঞ্চে বসবার উপযোগী হয়েছে? উত্তরে, আমি বলব হয় নি, এবং ভবিষ্যৎএও হবে না। সঙ্গীত হোল গুরু শিষ্য পরম্পরার শিক্ষা। স্কুল কলেজেও হতে পারে যদি পাঠক্রম বদলান হয়। এর জন্য সব শিক্ষকবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে।'

আমার কথা শুনে কুলকার্ণি প্রশ্ন করল, 'এঁর প্রতিকার কি?' উত্তরে বললাম, 'মৈহারের সঙ্গীত বিদ্যালয়ে বাবা যে প্রকারের পাঠ্যক্রম করেছিলেন, সেই প্রকার যদি না হয়, তাহলে কুড়ি বছর পরে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য, রেডিও বা টিভির জন্য স্টাফ আর্টিস্ট পাওয়াও দুর্লভ হয়ে পড়বে। উপস্থিত সঙ্গীতের ভেক ডিগ্রির কোন মূল্য নাই। সুতরাং সাধু সাবধান।'

ইন্টারভিউ শেষ হলে রেডিও থেকে কুলকার্ণির বাড়ী গেলাম। বহুদিন পরে সকলকে

দেখে খুব ভাল লাগলো। রাত্রের ট্রেনে ইন্দোর যাত্রা করলাম। পরের দিন স্টেশনে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম প্রিন্সিপাল, বন্দনা জমিন্দার, এবং সেই পূর্বের গায়িকা। অধ্যাপিকা বন্দনা জমিন্দারের স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হোল। গতবছরে বন্দনা জমিন্দার বাবার উপর গবেষণা করবে বলে যখন এসেছিলো, সে সময় বুঝতে পারি নি এত বড় গুণী, জ্ঞানী এবং ধনীলোকের পত্নী। উপাধি হোল জমিন্দার অর্থাৎ জমিদার। বন্দনার স্বামী নিরঞ্জন জমিন্দার অন্ধদের জন্য একটা বিদ্যালয় করে দিয়েছেন। সঙ্গীত-এর কলেজ করে দিয়েছেন। এ ছাড়া বহু কিছু করে দিয়েছেন ইন্দোরবাসীর জন্য। অবাক হলাম, বিরাট প্রাসাদ-এর একদিকে নিজস্ব লাইব্রেরী দেখে। একাধারে সাহিত্যিক এবং সঙ্গীতপ্রেমী। হিন্দিতে কয়েকটা উপন্যাস লিখেছেন। সব বিষয়ে লাইব্রেরীতে বই আছে। সঙ্গীতের উপর যে এত বই লেখা হয়েছে, না দেখলে বুঝতাম না। অবশ্য হাথরসে সঙ্গীতের বহু বই দেখেছি। এখানে বাংলা, হিন্দি, এবং ইংরাজীতে লেখা সঙ্গীতের বই দেখে অবাক হলাম। সঙ্গীতের বই দেখতে দেখতে, একটা বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মৈহার থাকাকালীন শান্তিনিকেতনে বাবার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন শুভময় ঘোষ, তাঁরই হিন্দি অনুবাদ। অবাক হয়ে দেখলাম এই বিরাশি সনেই বইটির প্রথম প্রকাশন হয়েছে। বইটির প্রকাশক উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীত এ্যাকাডেমি, ললিত কলা ভবন, ভূপাল। উক্ত এ্যাকাডেমির সঞ্চালক অশোক বাজপেয়ী, বইটির ভূমিকায় লিখেছেন সঙ্গীত এবং অনুসন্ধানের জন্য, মধ্যপ্রদেশের কিছু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞের জীবনীর উপর গবেষণা হচ্ছে এবং উপস্থিত আলাউদ্দিন খাঁর আত্মজীবনী, উস্তাদ রজব আলি খাঁ এবং এ ছাড়া অন্য অনেক সঙ্গীতজ্ঞের জীবনীর প্রথম প্রকাশন হোল। শ্রী মোহন নাডকর্ণি এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু সঙ্গীতজ্ঞ প্রথম প্রকাশনে নেমেছেন। অবাক হয়ে দেখলাম, শুভময় ঘোষ লিখিত আলাউদ্দিন খাঁর 'আমার কথার' মারাঠি এবং হিন্দি অনুবাদ রাহুল বারপুতে করেছে।

অবাক হলাম বইটা পড়ে। আমার লেখা ইংরেজী বইটা ভূপাল এ্যাকাডেমিতে পাঠান হয়েছিলো। সেই বইটি কি লাইব্রেরীতে শোভা পাচ্ছে। বইটা কি কেউ পড়ে নি? যাক মনে মনে ভাবলাম, মুখ্যমন্ত্রীর নামে একটা চিঠি লেখাব, হাথরসের এডিটার লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গকে দিয়ে। মনে পড়ে গেল মোহন নাডকর্ণির বিরূপ মন্তব্য। প্রতিবাদ করে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ছাপা হয় নি। এ্যাকাডেমি এই ধরনের ভুল তথ্য ছেপে ইতিহাসকে অস্বীকার করল। এই বইটা যাঁরা পড়বে, তাঁরা ভুল ধারণার মধ্যে থাকবে। বইটা পড়ে নিরঞ্জন জমিন্দারকে সব কথা বলে বললাম, 'এই বই দেখে, যেন বন্দনা জমিন্দার রিসার্চ না করেন।'

নিরঞ্জন জমিন্দার বললেন, 'প্রতিবাদ করে চিঠি লিখুন।' বললাম, 'প্রতিবাদ করে কি হবে? প্রতিবাদ পত্র ডাস্টবিনে গিয়ে পড়বে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি।' নিরঞ্জন জমিন্দার খুব জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর এমন প্রাণখোলা হাসি, এ যাবৎ তিন চারজনের মধ্যে দেখেছি, যা বিরল।

ঘরোয়া আসরে সুন্দর সঙ্গীতের আয়োজন করেছেন। ইন্দোরের সব সঙ্গীত প্রেমিকদের ডেকেছেন। ইতিপূর্বে ইন্দোরে আগেও এসেছি, কিন্তু এ এক বিরল পরিবেশ। বিকেলে

অসময়ে বৃষ্টি হোল বেশ কিছুক্ষণ। অসময়ে এই বৃষ্টি দেখে, বর্ষা ঋতু মনে হচ্ছে। মিয়া মল্লার দিয়ে শুরু করলাম। তিন ঘণ্টা বাজাবার পর সভা শেষ হোল। রেডিওর প্রডিউসার শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। অনুরোধ করে বললেন, 'আগামী কাল রেডিওতে একটা রেকর্ডিং করিয়ে যান। আপনি আসছেন জেনেই আমরা রেডিওর পারমিশান আনিয়ে রেখেছি।' এর পর স্থানীয় হিন্দি সংবাদপত্রের রিপোর্টার বললেন, 'আগামীকাল আপনি সকালে রেডিওতে যাবেন, সন্ধ্যাবেলায় এসে আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব।' বললাম, 'আমার কি ইন্টারভিউ নেবেন?' নিরঞ্জন জমিন্দার বললেন, 'যে বন্দিস সব শোনালেন, এরকম তো কখনও শুনি নি। আপনার ইন্টারভিউ কেন দেবেন না।' রাজী হতে হোল। সকলে চলে যাবার পর, খেতে বসে বুঝলাম, নিরঞ্জন জমিন্দার ভারতের সব বড় বাদকদের বাজনা শুনেছেন। নিজে গান বাজনা না করলেও, গায়ক, বাদক এবং সঙ্গীতকারদের বিষয়ে, যে সমালোচনা করলেন, শুনে বিস্ময়বোধ করলাম।

তিনদিন ইন্দোরে থেকে, বন্দনা জমিন্দারকে সেতারের রিয়াজের পদ্ধতি এবং বাবার বিষয়ে থিসিসের জন্য অনেক কিছু বললাম। থিসিস সম্পূর্ণ করতে দুবছর আরো লাগবে। এবার উজ্জৈন যাবার পালা।

উজ্জয়িনীতে একটা স্থানীয় সংস্থায় বাজালাম। এর পর এক মহাত্মার আশ্রমে বাজালাম। এই মহাত্মাকে, আমি কাশী, দিল্লী, কোলকাতায় যে সময় দেখেছি, সেই সময় আমার জীবনে বহু মহাত্মার দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু এই মহাত্মার যে স্নেহ আমি পেয়েছি, তাতে আমি ধন্য। দীর্ঘ দশবছর আগে কোলকাতায় এই মহাত্মার দর্শন পাই। যেহেতু উনি প্রচার চান না, তাই নামটা লিখলাম না। বাজনা শুনে প্রতিবার আশীর্বাদ করেন। কিন্তু এই প্রথম বললেন, 'বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের রস বাড়ছে।'

বাবার একটা কথা আমার মজ্জায় মিশে গেছে। বাবা বরাবর বলতেন, 'প্রশংসা এক কান দিয়ে শুনবে এবং অন্য কান দিয়ে বার করে দেবে। তাহলেই সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। সামনে সকলেই মিথ্যা প্রশংসা করে, এই কথাটা মনে রাখবে।' বাবার নির্দেশ আমি বরাবরই আন্তরিক ভাবে পালন করেছি। এই প্রশংসা যাতে শুনতে না হয়, তার জন্য বাজাবার পরেই আমি স্থান ত্যাগ করে বাসস্থানে ফিরে যাই। কিন্তু এই প্রথম, মহাত্মার প্রশংসা শুনে, মনে প্রেরণা পেলাম। আমি বিশ্বাস করি, সঙ্গীতের মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে, কিন্তু জনতার সামনে বসে সে রকম ধ্যান করা কি সহজ?

উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোরে এসেই বম্বে যাত্রা করলাম। আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম, সেইজন্য পিত্তিজির লোককে স্টেশনে দেখতে পেলাম। হোটেলে স্নান সেরেই অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গেলাম।

সবই ঠিকই আছে কিন্তু নেমপ্লেটে কেবল অন্নপূর্ণাদেবী লেখা! কলিংবেল বাজালাম। অন্নপূর্ণাদেবী দরজা খুলে দিলেন। তাঁর চেহারার মধ্যে কোন নূতন জীবনের প্রভাব দেখতে পেলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার? আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'নূতন জীবনে প্রবেশ করেছেন? আপনার নূতন জীবন কি?'

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আগে তো বসুন, তারপর বলছি।' আমি বসবার ঘরে বসলাম। অন্নপূর্ণাদেবীও আমার সামনে মোড়াতে এসে বসলেন। তারপর বললেন, 'আমি রোজ যে কথা আপনাকে বলছি, সেটা আগে আর কাউকে বলি নি। আর ঘরের লোক বলতে জানে, দাদা এবং আশিস। যদিও জানি না তাঁদের জানার চোখটার দৃষ্টি কতটা স্বচ্ছ। হতে পারে ভুল বোঝার ছানি পড়েছে।' তবুও আমার কাছে অধিকতর রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠল। আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে চেয়ে এবারে বললেন, 'আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছি।' বিস্ময়ে পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আপনি অবাক হবেন, তা আমি জানতাম। সেইজন্যই চিঠিতে সব কিছু লেখা সম্ভব হয় নি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কে? কাকে আপনি বিয়ে করলেন?'

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আপনি তাকে চেনেন? তাঁর নাম রুশী পাণ্ডা।'

নাম শুনে আমি চিনতে পারলাম। তিনি তো অন্নপূর্ণাদেবীর একজন ছাত্র। তিনি একজন গুজরাতি। দীর্ঘদিন তিনি কানাডায় অধ্যাপনার কাজে বহাল আছেন। তিনি বছরে একবার করে দশবারদিনের জন্য ভারতবর্ষে-আমেদাবাদে নিজের বাড়ীতে আসেন এবং তিনি বিপত্নীক। সেই সময় তিনি বম্বে এসে অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে সেতার শিখে আবার কানাডায় ফিরে যান। বিদেশে যখন আলিআকবর থাকেন, তখন রুশী পাণ্ডা তাঁর কাছে সেতারের তালিম নেন। অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আলি আকবরই। সেইটা ছিলো অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত। তারপরে বছরে যখনই আমেদাবাদে নিজের বাড়ীতে এসেছেন তখনই অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে তালিম নিয়েছেন। এঁর কথা জানার সুযোগ হয়েছিলো উনিশশো উনোআশি সনে। সেই সালে যখন উস্তাদ বাবার জীবনী সম্বন্ধে একটা ইংরেজী ভাষায় বই লিখেছিলাম, তখন আমার আমেদাবাদস্থিত বইটির প্রকাশক আমাকে প্রথমে রুশী পাণ্ডার কথাই বলেন। সেই প্রথম আমি তাঁর নাম শুনি। তিনিই নাকি অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে সেতারের তালিম নেন। তখন অন্নপূর্ণাদেবীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে রুশী পাণ্ডা তাঁর ছাত্র এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টাতেই বিদেশে আমার পঁচিশটা ইংরেজী বই বিক্রি হয়েছিল যে কথা আগেই লিখেছি। এই রুশী পাণ্ডাকে আমি অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ীতে উনিশশো আশি সালে স্বচক্ষে তালিম নিতে দেখেছিলাম। কিন্তু সে তো এখন একজন অন্নপূর্ণাদেবীর অন্যতম অনুরাগী ছাত্রবিশেষ এবং অল্পবয়সী। সে কি না, অন্নপূর্ণাদেবীকে এখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল?'

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'হাঁ। ছাত্র হয়েও এখনও আমার থেকে বয়সে ছোট হলেও সে একাধারে ছাত্র এবং স্বামী।' এরপর আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হোল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'চারজন সাক্ষীর সামনেই আমাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ঘরে।' আমার মুখ দিয়ে তখনও কোন কথা বেরোচ্ছে না দেখে অন্নপূর্ণাদেবী আবার বলতে লাগলেন, 'এ ছাড়া আমার আর কি পথ ছিলো বলুন? আমি স্ত্রীলোক। আমি সঙ্গীতের সেবক এবং অন্তর্মুখী। সারাজীবন এই একখানা ঘরের মধ্যে

আমার দিনরাত একলা কাটে। আপনি তো জানেন, পণ্ডিতজী তো প্রায় বারো বছরের মধ্যে একবারও এই ঘরের মধ্যে পা রাখেন নি। শুধু উকিল মারফৎ মাসোহারার টাকা পাঠিয়েছেন। একটাই অবলম্বন ছিলো ছেলে। তাকেও তিনি এখান থেকে ষড়যন্ত্র করে বিদেশে নিয়ে গেছেন। সে কথাও আপনার অজানা নয়। তারপর পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমি যথারীতি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিয়েছি। এ সমস্তই আপনার জানা।

তারপর একদিন রুশী পাণ্ডাকে বাজনা শেখাবার সময় বারবার বলা সত্ত্বেও বাজাতে পারছিলো না বলে, উত্তেজিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তখন এই রুশী পাণ্ডাই ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসেই আমাকে সুস্থ করে তোলে। আপনি তো জানেন মৈহারে বহুবার আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি। যা হোক আমি সুস্থ হবার পর ডাক্তার আমাকে বললে, 'আপনার মতন একজন অসহায় মহিলার পক্ষে একটা ফ্লাট-এর মধ্যে একা থাকা নিরাপদ নয়। আপনার একজন বিশ্বস্ত সহকারী থাকা উচিত।' রুশী পাণ্ডাও আমাকে তাই বলল। কিন্তু তেমন সহকারী বিশ্বস্ত পুরুষ কোথায় পাব? তারপরে আমি যখন আস্তে আস্তে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছি, সেই সময় একদিন রুশী আমার সামনে হাত জোড় করে একটা প্রস্তাব দিলো। বললো, 'আপনি যদি অপরাধ না নেন তাহলে আমি একটা যুক্তিসংগত ব্যবস্থা করতে পারি।' আমি বললাম, 'বল কি ব্যবস্থা।' সে বলল, 'আপনি আমাকে আপনার ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দেবেন না বলুন?'

আমি বললাম, 'বল কি বলবে?' সে বলল, 'আমি আপনার একজন বিশ্বস্ত সহায়কের কাজ নিজের মাথায় তুলে নিতে পারি।' আমি বললাম, 'তার মানে তুমি এই ফ্ল্যাটে থাকবার অনুমতি চাইছ? তাহলে তো আমাদের সম্পর্কের সম্বন্ধে লোকে কানাঘুষো করবে।' রুশী বলল, 'সে কথাও আমি ভেবেছি। যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে লোকের কানাঘুষো বন্ধ করবার জন্য আমি আপনার স্বামী বলে ঘোষিত হই।' আমি বললাম 'বলছ কি?'

রুশী বলল, 'আমি তো আগেই আপনার অনুমতি নিয়েই প্রস্তাবটা রেখেছি। তাতে আপনার সুবিধা এই যে আপনি আর একলা রইলেন না এবং অসহায়াও রইলেন না। আমি যেমন ছাত্র ছিলাম, এখনও তাই থাকব, এবং সবাই জানবে যে আমি এখন থেকে শুধু ছাত্রই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বামীও বটে।' অবাক হয়ে বললাম, 'সেটা কি করে সম্ভব?' সে বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে সেটা অসম্ভব হবে না। চারপাঁচজন শুভাকাঙ্খী এবং বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে, আমরা একটা আইনসম্মত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো। তাহলে তো আর কেউ কিছু কানাঘুষো করবার সুযোগ পাবে না। আপনি এখনি এর জবাব দেবেন না। আপনি আগে ভেবে দেখুন। তারপর যা আপনি বলবেন তাই আমি শিরোধার্য করব। আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি কানাডার চাকরিতে এখান থেকেই পদত্যাগপত্র দেব। আসলে আমার ছোটবেলায় যে সময় সঙ্গীতের সখ ছিলো, সেই সময় আমার টাকা ছিলো না। আর যে সময় বিদেশে দীর্ঘদিন থেকে অর্থ উপার্জন করলাম সেইসময় শিখবার সুযোগ পেলাম না। আপনি যদি রাজী থাকেন, তাহলে আপনি অসহায়াও থাকবেন না এবং আমার চিরদিনের যে একান্ত ইচ্ছে সেতার শেখা, সেটা পূরণ হবে। আমার এখন অর্থের অভাব

নাই। ভারতে থাকতেও যে বিষয়ে আমি লেখাপড়া করেছি, সেটা একেবারে ছেড়ে দেবো না। ভারতে বছরে পাঁচ ছয়বার আমি লেকচার দিলেই আমার এতদিনের লেখাপড়াটা ব্যর্থ হবে না। কয়েকটা দিন হয়ত বাইরে থাকব, কিন্তু সারা সময়ে আমি থাকলে আপনি অসহায়া হবেন না। এখন আমি যাচ্ছি হোটেলে। আবার বলছি আপনি ভেবে দেখুন। একটা কথা বলতে পারি, আপনি চিরকালই আমার কাছ থেকে গুরুর মতই সম্মান পাবেন। বর্তমানে আপনাকে যে রকম শ্রদ্ধা এবং সম্মান করি, সেইরকম করবো। আপনি তো আমায় অনেকদিন দেখছেন। আমি খুব একটা খারাপ লোক নই।'

রুশী চলে যাবার পর কয়েকদিন ধরে ভেবে ভেবে কোন উপায়ান্তর পেলাম না। অথচ এ ছাড়াও আর কি করা সম্ভব, তাও বুঝতে পারলাম না। তাকে আমি বহু বছর ধরেই ঘনিষ্ঠ ভাবে জেনে এসেছি। সেও বহুদিন যাবৎ বিপত্নীক অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে এবং নিঃসন্তানও বটে। এতদিনের পরিচয়ে আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে তাঁর মত বিশ্বস্ত সহায়ক আর কেউ হবে না। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রস্তাবটা আমার মনঃপূত হোল। তার পরে আমি তাঁকে আমার সম্মতি জানালাম। এর পরে একদিন যথারীতি একটা বিবাহের অনুষ্ঠান হোল। এখন সে আমার ফ্ল্যাটেই দিনরাত থাকে এবং আমার কাছে তালিম নেয়। বিদেশের চাকরি পরিত্যাগ করেছে। লোকে যাই বুঝুক, সারা পৃথিবীতে এমন স্বামী স্ত্রীর সহাবস্থান বোধ হয় আর একটাও নাই।'

আমি তখনও নির্বাক হয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর দিকে চেয়ে আছি। অন্নপূর্ণাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে চুপ করে আছেন? আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে রুশীকেই জিজ্ঞাসা করুন। ও তো পাশের ঘরেই রয়েছে।' আমাকে নিয়ে অন্নপূর্ণাদেবী পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। রুশী আমাকে দেখে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছেন?' তিনি আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না।

অন্নপূর্ণাদেবী রুশীকে বললেন, 'যতীনবাবুকে আমি আমাদের দুজনের সম্পর্কের কথা খুলে বলেছি। আমাদের অন্য কেউ ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু যতীনবাবু আমাদের শুভাকাঙ্খী। তাঁর কাছে তুমি চুপ করে থেকো না।' এই কথা বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি তখন রুশীকে বললাম, 'আপনার লজ্জা করবার কিছু নাই। আমি অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে সব শুনেছি। আমি শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আপনি অন্নপূর্ণাদেবীর বিপদের সময়ে যা উপকার করেছেন তা আমি জীবনে কখনও ভুলব না। আপনি গুরুর প্রতি প্রকৃত শিষ্যের কাজ করেছেন। আমি মন থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনি আপনার কানাডার কলেজের অর্থকরী পেশা পরিত্যাগ করে, বম্বেতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকছেন এবং অন্নপূর্ণাদেবীকে গুরুর মত সেবা করছেন, এর চেয়ে বড় পুণ্য আর কিছু নাই। অন্নপূর্ণাদেবীর জীবন বড় দুঃখের জীবন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে বড় কষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। এ কথা বাইরের আর কেউ না বুঝুক, আমি উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি। এবং একমাত্র আপনিই অন্নপূর্ণাদেবীকে সেবা করে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে সুখী করতে পারেন, তবে আপনি উস্তাদ বাবার আত্মার আশীর্বাদ পাবেন। এ কথা আমি আপনার

কাছে আন্তরিকভাবে বলে গেলাম।' শেষে আমি বললাম, 'আপনাকে আর দুএকটা কথা বলে যাই। আপনি তো গুজরাটের ছেলে। গুজরাটিদের কাছে, রান্নাঘরটা একটা সম্পদ বিশেষ। আপনি এই ফ্ল্যাটের রান্নাঘরটা খুব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন। এ ছাড়া এই ফ্ল্যাটে জলাভাব আছে। তাঁর জন্য আপনি একটা ট্যাঙ্ক এর ব্যবস্থা করবেন যাতে চব্বিশ ঘণ্টা জল থাকে। আর একটা কথা বলে রাখি, অন্নপূর্ণাদেবীর কোন কথার প্রতিবাদ করবেন না। উনি যা বলেন তা শিষ্যের মতো মাথা নীচু করে পালন করে যাবেন। এঁর কেউ নেই। যাঁরা আপন ছিলো তাঁর কাছে, তাঁরা সবাই ওঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তাঁরা তাঁদের দরকারের সময় আসে এবং নিজেদের মতলব হাসিল করে চলে যায়। উনিও এত সরল যে তাঁদের মতলব বুঝেও চুপ করে থাকেন। আপনিও তো অন্নপূর্ণাদেবীকে এতদিন ধরে দেখছেন, আশা করি আমার কথাগুলো আপনি সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। সঙ্গীতই ওঁর স্বামী, সন্তান, পিতা, শিষ্য সবকিছু। সঙ্গীত শেখাতে শেখাতে অনেক সময় যদি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন, আপনি তখন চুপ করে থাকবেন।

এবারে একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। এই লোকদেখান বিয়েটা আপনি, অন্নপূর্ণাদেবী আর আমি জানলাম। কিন্তু যে চারজন শুভকাঙ্খীর সামনে এই বিয়েটা হয়েছে, সেই চারজন লোকের মুখ দিয়েই কথাটা বেরোবে। কারণ কথা চেপে রাখা বড় কঠিন। অন্য কেউ এমন করলে, কেউ মাথা ঘামাত না, কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবী এক ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব। সে কথাটা আপনার অজানা নয়। ধীরে ধীরে এই নিয়ে গুঞ্জন হবে। অবশ্য রবিশঙ্কর এই কথা জানতেই পারবে। সে নিজের লোক ছাড়া এ কথা কাউকে বলবে না, কেননা এটা তাঁর পরাজয়। লোকে এই কথা একদিন জানবেই। যখন জানবেই, তখন আপনাকেও অন্যের সামনে একটু অভিনয় করতে হবে। সকলকে জানিয়ে প্রতিবছর বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠান করবেন। সকলেই বুঝবে এই বিবাহে অন্নপূর্ণাদেবী খুব আনন্দে আছেন। এর বেশী আর কিছু বলবার নাই উপস্থিত।'

রুশী পাণ্ডা হাতজোড় করে বললে, 'দাদা আপনি যা বললেন, তা আমি বর্ণে বর্ণে পালন করব।' বিদেশে এতদিন কাটিয়েও এমন নম্র এবং বিনয়ী ছেলে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। হঠাৎ মনে হোল এর বিষয়ে আরো কিছু জানি। চারদশক পার করা রুশীর চেহারা, একটা নিষ্পাপ কিশোরের রূপ, যা দেখলে আন্দাজই করতে পারা যায় না, ও জীবনের কতটা পথ হেঁটেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি, আপনার বিষয়ে আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করছে।' সলজ্জ হাসি হেসে আত্মপ্রকাশ বা আত্মপ্রচারের জন্য নিজের মুখকে প্রয়োগ না করে একটা ফাইল এগিয়ে দিলো। বললেন, 'এতে আমার বংশপরিচয়, পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনচর্যার উল্লেখ নেই, কারণ দেশের আরো দশটা সাধারণ মানুষের মতো আমিও। শুধু ব্যতিক্রম এই যে আমার জানতে বা শিখতে ভালো লাগে। আর সেই তাগিদে যা ঘুরেছি, যা দেখেছি বা যা শিখেছি তার উল্লেখ আছে এই কাগজগুলোয়। শুধু একটাই অনুরোধ, যেখানে অধ্যাপক শব্দ লেখা আছে সেখানেও আমাকে ছাত্রই ভাববেন।'

কথা বলতে বলতে ফাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। হঠাৎ প্রথম পাতাটায় চোখ পড়ল। সেরব্রুক ইউনিভারসিটির স্নাতোকোত্তরের ডাইরেক্টারের একটা চিঠির উপরে। ডাইরেকটার লিখেছেন, 'প্রিয় প্রফেসার, তুমি ভারতে সেটল করেছ জেনে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশী কিন্তু একজন অধ্যাপক হিসেবে দুঃখী। কারণ অজস্র ছাত্র বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তোমার বাগ্মীতা থেকে বঞ্চিত হবে। তোমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেও এ কথা জানবে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তোমার কাছে চিরকালই স্বাগত আহ্বানের জন্য খোলা থাকবে। আরো অনেক কথা লেখা ছিলো অধ্যাপক রুশীর পড়ানর প্রশংসায়। এরপর ফাইলের পাতা উল্টোতে লাগলাম। এ যেন রঘুনাথের অধ্যাবসায়। কোন পক্ষধর মিশ্রের দরজায় যায় নি। ঝোলাটা বিরাট বড়, তাই যেখানে যা জ্ঞানের মণিমাণিক্য পেয়েছে, কুড়িয়ে ভরেছে। বাবার কথাটা মনে পড়লো। বলতেন, 'একটা বয়স পর্যন্ত যা পাও জড়ো করো। আর পরপর এক এক করে সাজাও। তবেই সুন্দর লাগবে।'

রুশীও তাই মানুষের অজানাকে জানার সন্ধানে বা মানুষের সত্যকে জানার প্রচেষ্টায়, মাতৃভাষা গুজরাটি ছাড়া শিখেছে সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, মারাঠি, ইংরেজী প্রভৃতি। দর্শন, ইতিহাস, শিক্ষাশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, রস শাস্ত্রের মত দুরুহ বিষয়গুলোকেও আয়ত্ব করেছে। যাট সালেতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করার পর, এল.এল.বি. পড়েছে। ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভারসিটি থেকে ইংরেজীতে এম.এ. পড়েছে। ওখান থেকেই পেয়েছে শিক্ষা শাস্ত্রের উপাধি। তারপরে কানাডা থেকে শিক্ষা শাস্ত্রের উপাধি, কনকোরডিয়া ইউনিভারসিটি (কানাডা) থেকে করেছে ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মেতে এম.এ.। তারপর দর্শনের মনবিজ্ঞান বিষয়ে পি.এইচডি. শুরু ওখানেই। সাথে সাথে চলছিলো ক্যালিফোর্ণিয়ার ইউনিভারসিটি মনস্তত্ব পড়াশোনা। মানুষের মনজগতের রহস্য, সম্মোহন এবং বৈজ্ঞানিক যৌন শিক্ষার পদ্ধতির উপরে। অচিরাৎ বিষয়গুলোকে আয়ত্ত্ব করে একজন স্বীকৃত অধ্যাপক হয়ে উঠল। অনেক স্বীকৃতি পেয়েছে জীবনে, সারা বিশ্বময় প্রভূত বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটতে হয়েছে বক্তৃতা দিতে ওকে। বিশ্বের প্রভূত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্সটিটিউটের সম্মানীয় সদস্য হয়েছে। আরও অনেক কাজ ছিলো। রুশী হাতজোড় করে বলল, 'ওগুলো পড়ে সময় নষ্ট করবেন না।' বললাম, 'সময় নষ্ট করছিলাম না, দেখছিলাম ক'বার ডুব দিয়েছেন, প্রতি ডুবেই একটা মুক্তো তুলেছেন। সঙ্গীত অনন্ত সাগর। কামনা করি এতেও ডুবতে পারবেন। আর মুক্তোর সন্ধান পাবেন।' এই কথা বলে অন্নপূর্ণদেবীর কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, 'কি বুঝলেন কথা শুনে?' হেসে বললাম, 'কথা তো আমি বললাম। ও তো চুপ করে শুনে গেল।' উত্তরে বললেন, 'আপনি কি বললেন?' বললাম, 'আপনার কখনও তো কৌতুহল দেখি নি। কার সঙ্গে কি কথা হোল সে জেনে আপনি কি করবেন? যাক প্রথম দিন বম্বেতে এসে আপনার এখানে খাওয়াটা চিরাচরিত। বেলা তো হয়ে গিয়েছে। আপনার কি রান্না হয় নি? লজ্জিত হয়ে বললেন, 'রান্না হয়ে গিয়েছে। খেতে বসুন এবং রুশীকেও ডাকুন। ও আপনাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। ওকে ডেকে একসঙ্গে খেতে বসলাম। খেতে খেতে বললাম, 'এখনও কি সেই একবেলা খাওয়া বিকেলের পরে? সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'নিয়ম কেন বদলাবে? যেমন ছিলো তেমনি আছে?' আচমকা মনে পড়ে গেলো একটা কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটা কথা বলুন তো? দুইলাখ টাকার মধ্যে রবিশঙ্কর যে বলেছিলো, 'এক লাখ টাকা পরে দেবে, সেটা কি দিয়েছে?' উত্তরে বললেন, 'গতবারে যখন এসেছিলেন, আপনি চলে যাবার কয়েকদিন পরেই একলাখ টাকা দিয়ে দিয়েছেন।' এই কথা শুনে দুঃখের মধ্যে হাসিও পেলো। এতক্ষণ যেন অন্যজগতে ছিলাম। সব শোনার পরে অন্নপূর্ণাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আলিআকবর এবং আশিসকে যে বলেছেন বিয়ের কথা, সেটা যে লোক দেখানো, তা কি তাঁরা বিশ্বাস করেছে।' উত্তরে বললেন, 'জানি না এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই সকলে জেনেছে সত্যি বিয়ে করেছি। আমি হাজার বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। সেইজন্য বলি নি। একমাত্র আপনাকেই সত্য কথা বললাম। এখন বিশ্বাস করা, না বিশ্বাস করা আপনার অভিরুচি।' এই কথাবার্তার ফাঁকে আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। হাতধুয়ে কাশীর কনফারেন্সের কথা বলে একটা সুভ্যেনির দিলাম। সুভ্যেনিরটা দেখেই বললেন, 'এবারে কত লোকসান হোল?' উত্তরে বললাম, 'পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে, লাভ লোকসান তো হবেই। সে সব কথা পরে হবে। একটা কাজের কথা বলুন তো? এবারে বম্বেতে আপনার চিঠি পেয়েই এসেছি। কোন প্রোগ্রাম করতে আসি নি। প্রোগ্রাম না করলেও পিত্তিজির বাড়ীতে রাত্রে রোজ বাজাব। সাতদিন বম্বেতে থাকব। তারপর এখান থেকে কোলকাতায় বাজাতে যাব।' এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দিন দেখে বলুন, কবে যন্ত্র নিয়ে আসব শিখতে?' দিন নির্দিষ্ট করে হোটেলে আসতে আসতে যে যে কথাগুলো শুনলাম, চোখের সামনে ভেসে উঠল। এ আবার কেমন স্বামী, এ আবার কেমন স্ত্রী, এ আবার কেমন বিয়ে? পৃথিবীর কোন ধর্মশাস্ত্রেও তো এ রকমের বিয়ের বিধান নাই। বেদেও নাই, পুরাণেও নাই। এ রকম সৃষ্টিছাড়া বিয়ে তো কখনও শুনি নি, দেখিও নি, তাহলে? হঠাৎ চমক ভাঙ্গল হোটেলের সামনে এসে। এতক্ষণ যে কথাগুলো ভেসে উঠল, সেটা কিন্তু আমার উক্তি নয়। মনে হোল, নিজের লোকেরাই এই কথাগুলো চতুর্দিকে বলাবলি করবে এবং এক কান থেকে আর এক কানে যাবে। সকলেই বিস্মিত হবে। বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। আমি যদি অন্নপূর্ণাদেবীকে না চিনতাম এবং এই ধরনের ঘটনা অন্য কোন দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদের পর শুনতাম, তাহলে আমিও কি বিস্মিত হতাম না? লোকে বলত মতিভ্রম হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস সে দিন আর বেশী নাই। এখন তো ঘটনাটা সবে হয়েছে। এটা ঠিক, ঘটনাটা প্রথম প্রকাশ হয় বম্বেতে। কিন্তু বম্বেতে লোকেদের এই সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় নাই। আসলে প্রথমে কোলকাতায় নিজের স্বজনদের দ্বারাই এ ঘটনাটা এক কান থেকে আর এক কানে যাবে। তার পরে ধীরে ধীরে সব জায়গায় প্রকাশ হবে। যা হবার হোক। আমি কিন্তু মনে নিশ্চিন্ত হলাম। অঘটন ঘটতে কত সময় লাগে। চারদেওয়ালের মধ্যে রেখে, মনে মনে সে ভেবেছিলো জব্দ করবে, তা আর হোল না। মনে মনে রুশী পাণ্ডাকে সাধুবাদ জানালাম। যাই হোক, অন্নপূর্ণাদেবীর একটা অবলম্বন তো হোল। অন্নপূর্ণাদেবীর লোক দেখান বিবাহ যা ঘটেছে, অকপটে যা দেখেছি এবং শুনেছি তা লিখলাম। এ আমার স্থির বিশ্বাস, পাঠকরা এই বিবাহ প্রসঙ্গে পড়ে নানা আলোচনা করবেন।

মনে মনে বলবেন, এও কি সম্ভব? উত্তরে আমি একটা কথাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, অন্নপূর্ণাদেবীর জীবনে এই কি ঘটনার শেষ? এই কি শেষ সত্য? এবং এই কি সব সত্য। অন্নপূর্ণাদেবীর নারী হৃদয় কি সত্যই এইবার সর্ববেদনা বিমুক্ত এক সুখ স্বর্গের আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়েছে। আমার মনে হয় তা নয়। রবিশঙ্কর অন্নপূর্ণাদেবীর অভিমানকে সম্মান দেয় নি। তাই এতদিন নীরবে সব সহ্য করে তার প্রত্যুত্তর দিলো। এইটাই হোল ঘটনা এবং এইটাই হোল শেষ সত্য। জানি এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। এখন একটি প্রশ্ন? লোকের হাসিটা বড়, না মানুষের জীবনটা বড়? বাইরের লোক কী বললো, না বললো, তা নিয়ে আর ভাবতে চাই না।

মনে পড়ে গেল মৈহারের কথা। কত কাল আগে বাবার কাছে গিয়েছিলাম। বাবা আমাকে বলতেন বুড়ো বয়সের ছেলে। কত আপদ বিপদ আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটে গেলো। জীবন দেখলাম, মৃত্যুও দেখলাম। মিলন-বিচ্ছেদও দেখলাম। জীবন, মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদের সমন্বয়ে যে মহাজীবন, তাও দেখলাম। বেশীদিন বেঁচে থাকার এই সৌভাগ্য বা এই-ই দুর্ভাগ্য। যাঁর শুরু দেখা যায় তাঁর শেষটাও দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো এরই নাম দর্শন। তেত্রিশ বছর আগে মৈহারে না গেলে, এই মহাজীবন দেখতে পারতাম না। এই বাড়ীতে এসে যা দর্শন করলাম, তা কি দেখতে পারতাম।

প্রতিবারে বম্বেতে এসে প্রথম দিন অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী গিয়ে আহার করে, নিজের স্থানে এসে ঘুমাই। খাবার পরেই ঘুমটা মৈহার থেকেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। জীবনে তো আর চাকরি করলাম না, সেইজন্য সেই অভ্যাসটা আজও আছে। কিন্তু আজ ঘুম কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। পুরো ঘটনাটা পর্যালোচনা করে মনে হোল একলা একটা গৃহে যখন কোন পুরুষ অথবা নারী বাস করে, সব সময়েই কৌতুহলের বিষয় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ অন্নপূর্ণাদেবীর বেলায়ও ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু লোকে কি কথা একবারও চিন্তা করবে না, যে ঘটনা অনেক আগেই ঘটতে পারত। এবং সেরকম ঘটলে টেরও পাওয়া যেতো। ঘটবার হোলে পঞ্চান্ন সালেই হতে পারত। ছাব্বিশ বছর পরে এ রকম ঘটনা ঘটবে কেন? এর হিসাব মেলে নি আমার কাছে। এ নিয়ে জল ঘোলা হবে। আর জল ঘোলা করবে নিজের লোকেরাই। অবশ্য তাতে কিছু এসে যাবে না। যাঁর মনের মধ্যে পাপ নাই, তাঁর কিসের ভয়? কারণ এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও বদলে যায়। তাইতো কখনও কাছের মানুষ দূরে যায়, দূরের মানুষ কাছে আসে। যাঁর সঙ্গে এককালে সম্বন্ধ ছিলো বলেই কি চিরকাল সম্বন্ধ রাখতে হবে? এই অবস্থায় সব সম্পর্কই তো মুছে যায়, হারিয়ে যায়, বদলে যায়। দেখতে দেখতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বুঝতে পারি নি।

সন্ধ্যার সময় পিণ্ডিজির বাড়ীতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডিজি এবং তাঁর স্ত্রী উর্মিলা দেবী যে ভাবে অভ্যর্থনা করেন, মনে হয় যেন নিজের অতি প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হোল। এবারে প্রথম সাক্ষাৎ হবার পরেই পিণ্ডিজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বম্বেতে এসে প্রথমেই সকালে প্রতিবার অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে যান। আজও নিশ্চয়ই গিয়েছিলেন?' বললাম, 'গিয়েছিলাম।' পিণ্ডিজির স্ত্রী উর্মিলা দেবী বললেন, 'অন্নপূর্ণাদেবী ভালই করেছেন। একা থাকায় কত বিপদ? এখন অন্ততঃ সেই বিপর্যয়ের সময় একজন থাকবে সেইটাই সান্ত্বনা।' শুনলাম ঘাসওয়ালার কাছে শুনেছেন সব। বয়োবৃদ্ধ ঘাসওয়ালা আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেলের ট্রেজারার। ঘাসওয়ালাজীর সামনেই লোক দেখান বিবাহ হয়েছে। তিনি পিণ্ডিজির বাড়ীতে প্রায় আসেন। বুঝলাম ঘাসওয়ালার কাছেই পিণ্ডিজি শুনেছেন। আমি, আসল যা যা ঘটনা যদি বলতাম, পিণ্ডিজি আমার কথা বিশ্বাস করতেন কিন্তু ইচ্ছে করেই বললাম না, এই লোক দেখান বিয়ের আসল কারণ কি? হঠাৎ ঘাসওয়ালাজী এসে উপস্থিত। পিণ্ডিজি, আমি এসেছি খবর দেওয়াতে, তিনি এসেছেন আমার বাজনা শুনতে। এক সঙ্গে ফেরার সময় একটা নূতন কথা শুনলাম ঘাসওয়ালাজীর কাছে। ব্যাপারটা বুঝলাম। মনে হোল শক্তির অধিকার যেখানে নাই, দুর্বলতা সেখানে করে অভিমান। একজন চিরকাল নির্যাতন করে গেছে। সে স্বপ্নেও এরকম হবে ভাবতে পারে নি। এর মধ্যেই বোধ হয় অন্নপূর্ণাদেবীর এক আত্মীয়র কাছে গিয়ে এই কথা শুনে কেঁদে ফেলেছে। মনে মনে বলি, এখন চিরকালই কাঁদতে হবে। কিন্তু কাঁদল কেন? কাঁদবার কারণ প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু ঘটনা দুঃস্বপ্নের মত ঘটে যায়, যা জীবনে কখনই ভুলতে পারে না। ভুলতে এইজন্য পারবে না, কেননা তাঁর জীবনে মস্ত বড় পরাজয় হয়েছে। অনেক মানুষ নিজের উন্নতি আর খ্যাতির জন্য কত রকম হীন কাজ করে তা ভাবা যায় না। কথায় আছে, যে যেমন কর্ম করে সে তার ফল পায়। এখানেও তাই হোল। আসলে অতীতের স্মৃতি ভুলতে না পারা যে কত বড় অভিশাপ, সেটা তাঁর মত কেউ বোধ হয় বোঝে নি, যার জন্য এই কান্না।

এবারে পিণ্ডিজি আমার কয়েকটা রেকর্ড করলেন। তাঁর নিজস্ব একটা সঙ্গীতের ট্রাষ্ট আছে। সেই ট্রাষ্টের জন্য রেকর্ড রেখে দেবেন বলে রেকর্ড করলেন।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ী সন্ধ্যায় শিখতে গেলাম। এবারে বললেন, 'আজ কোন শিক্ষা নয়। বাজান তো দেখি দরবারী কাহ্বাড়া।' মনে পড়ে গেল বাবার কথা। বাজনার পর বাবা বরাবর বলতেন, 'ভাল রেঁধেছ কিন্তু কাঁচা আছে। এই ডাল কুত্তাও খাবে না। এখনও সেদ্ধ হতে অনেক দেরী আছে। সাধনা করতে যাও তবেই ঠিক মত পরিবেশন করতে পারবে। তখন লোকেও খেয়ে ভাল বলবে এবং তুমিও তৃপ্তি পাবে।'

অন্নপূর্ণাদেবীর কথায় বাজাবার পর বললেন, 'সব জায়গায় তো বাজান। বাজিয়ে তৃপ্তি পান?' উত্তরে বললাম, 'লোকে শোনে এবং পরের পর ফরমাইসও করে, কিন্তু আপনার মত শ্রোতা তো পাই না, তাই এরকম মন্তব্য কেউ করে না।' মনে পড়ে যায়, বাবা একটা অত্যন্ত দামী কথা বলতেন। বাবা বলতেন, 'সব জিনিষে তৃপ্তি পাই, কিন্তু বাজনা বাজিয়ে কোনদিন তৃপ্তি পাই না।' এখন বুঝি বাবা কত দামী কথা বলতেন। যেটা চাই সেটা কখনই বাজিয়ে হয় না, সর্বদাই অতৃপ্তি থেকে যায়।' কিন্তু এই প্রথম অবাক হলাম। আজ পুরো আলাপ শুনে, এই প্রথম প্রশংসা করে বললেন, 'এখন তো বোঝেন কতদিন সাধনার পর ঠিক শ্রুতির কাজ হয়।' মনে মনে প্রেরণা পেলাম। এই প্রশংসা শুনে নিজের মনে আস্থা হোল। যদি ঠিকমত সাধনা করি, তা হোলে কিছুটা নিশ্চয়ই করতে পারব। এই প্রথম আমার বাজনা শুনে অন্নপূর্ণাদেবী নিজের ঘরে গিয়ে, একটা চন্দন কাঠের বাক্স আমাকে দিয়ে বললেন,

'বাবা আমাকে এই বাক্সটা দিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম শুভকে এই বাক্সটা দেব, বাজনার তার রাখবার জন্য। কিন্তু সে বাজনা ছেড়ে দিল। আমার তো কিছুই নাই। আমি জানি, জিনিষটা তুচ্ছ হলেও বাবার চিহ্ন স্বরূপ আমার কাছে এটা অমূল্য। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনি এর মর্যাদা বুঝবেন। তাই এটা আপনাকে দিলাম বাবার আশীর্বাদ স্বরূপ।' বাবার আশীর্বাদ ভেবে বাক্সটা নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, বাবার চিহ্নস্বরূপ, এটা নিজের বাক্সে রেখে দেব। আর বাজনা শোনানর পর যে উপহার পেলাম, তা আমার কাছে অমূল্য সম্পদ।

বাজনার পর বললাম, 'পিত্তিজি এবং তাঁর স্ত্রী বিয়ের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।' আরও বললাম, 'এ হোল বম্বে। আপনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু দেখুন এবারে কোলকাতায় যাব। দেখবেন কিছুদিন পরে কথাটা পত্রে পুষ্পে কি ভাবে রটনা হবে। যাইহোক কোন চিন্তার কারণ নাই।'

দেখতে দেখতে নূতন বছর শুরু হোল। নূতন বছরের দ্বিতীয় দিনেই কোলকাতায় রওনা হলাম। কোলকাতায় কলামন্দিরের বেসমেন্ট হলে একটা সঙ্গীতের কার্যক্রম হোল। কোলকাতায় কয়েক দিন থেকেই কাশী চলে এলাম।

কাশীতে এসেই দেখি ফ্রান্সের ছাত্রটি এসে গেছে। ছাত্রটি বলল, 'ফ্রান্সে বারো আক্টোবার আপনাকে যেতে হবে।' উত্তরে বললাম, 'এখন তো অনেক দেরী আছে। উপস্থিত তিনমাস খুব ভাল করে শেখ।' ইতিমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গের চিঠি পেলাম। কাশীতে বিশেষ কাজে আসছে। যথাসময় এলো। কথায় কথায় বাবার উপর যে বই বার করেছে ভূপাল থেকে সে কথা বললাম। তা ছাড়া আমার ইংরেজী বই পড়ে মোহন নাডকরনি যে কথা লিখেছে, সে কথাও বললাম। লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ আমাকে বলল, 'তোমাকে সঙ্গীতের সম্পাদক হয়ে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠিটা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দাও।' কিন্তু চিঠি লিখে দিলেও সে চিঠিটা আমি পাঠাই নি। চিঠি পাঠিয়ে কি লাভ? হিন্দিতে যে বই ছেপে গেছে তা তো আর নিষিদ্ধ হবে না। সেইসময় চিঠিটা না পাঠালেও আজ তা অনুবাদ করে দিচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংজিকে সম্বোধন করে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ লিখেছে, 'মাননীয় অর্জুন সিংজি, যতীন ভট্টাচার্যের ইংরেজী পুস্তক 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন এনড হিজ মিউজিক' পড়ে মোহন নাডকর্ণি যে লিখেছে, বইটি মদনলাল ব্যাস দ্বারা লিখিত, সঙ্গীতে বিশেষাঙ্কের আধারে লেখা হয়েছে, তা মিথ্যা। আসলে প্রকৃত সত্য হোল যতীন ভট্টাচার্য কিছু সামগ্রী দিয়েছিলেন মদনলাল ব্যাসকে হিন্দিতে অনুবাদ করবার জন্য, যা নাকি সঙ্গীত পত্রিকায় উনিশশো বাহাত্তরেই বেরিয়েছিল। এই ঘটনা আমার সামনে হয়েছিলো। ভূপালের আলাউদ্দিন খাঁ এ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ অশোক বাজপেয়ীর উচিত, এই সত্য উদঘাটন করে দেওয়া। পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে আলাউদ্দিন খাঁর বিষয়ে যতীন ভট্টাচার্য যতটা জানে, তা অন্য কোন ব্যক্তির জানা নাই। ইতি লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ।

কয়েকদিন থেকে চলে গেল। তাঁর যাবার পর বুঝলাম এবারেও ষোল হাজার টাকার লোকসান হয়েছে আমাদের কনফারেন্সে। উপস্থিত ভবিষ্যৎএ কনফারেন্স করবার আর

সাহস নাই। যতদিন না বত্রিশ হাজার টাকার যোগাড় করতে পারি, ততদিন আমাদের সার্কেলের যে উদ্দেশ্য গুরুশিষ্য পরম্পরার শিক্ষা, সেই বিষয়েই মনোযোগ দিলাম।

এই সময় পাটনার বিহার সঙ্গীত পরিষদ থেকে একটা চিঠি পেলাম। পাটনার সঙ্গীত পরিষদ 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ' স্মৃতি সঙ্গীত সমারোহের নাম দিয়ে একটি সঙ্গীত সভার আয়োজন করেছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাটনা গেলাম। রাত্রে বাজাবার আগে কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা সুভেনার দিলেন। বিহার সঙ্গীত পরিষদের প্রধান হলেন রাজ্যপাল ডাক্তার এ আর কিদেয়াই। এই সংস্থার সদস্য হলেন শ্রীমতি আজিজা ইমাম এম.পি। এই সুভেনারে অনেকেই বাবার সম্বন্ধে লিখেছেন। আমার লেখা ইংরেজী বই পড়ে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মহমুদ আহমদ সংক্ষিপ্ত দুই পাতায় আমার ইংরেজী বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আমার বাজানর আগে, আমাকে উস্তাদ বাবার একটা মূর্তি উপহার দিলেন। বিহারের উদীয়মান শিল্পী মহেন্দ্র এই মূর্তিটা তৈরী করেছে। এমন জীবন্ত মূর্তি না দেখলে কল্পনা করা যায় না। আমার কাছে এটি অমূল্য সম্পদ। আমাকে যে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হোল, সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাজালাম। পরের দিন বিহারের ইংরেজী এবং হিন্দিতে সংবাদ পত্রিকায়, আমার বাজনার সম্বন্ধে যা বেরোল, তার জন্য আমি মোটেই উচ্ছ্বসিত হলাম না। উচ্ছ্বসিত হলাম বাবার সুন্দর মূর্তিটা পেয়ে।

পরের দিন পাটনা রেডিওর তরফ থেকে, একটা রেকর্ড করবার জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। টেলিফোন পেলাম আজিজা ইমামের কাছ থেকেও। বললেন, 'আজ রাত্রে যদি আমার বাড়ীতে আপনি বাজান এবং রাত্রের ডিনার খান তাহলে আমি অত্যন্ত সুখী হবো।' শ্রীমতি আজিজা ইমাম ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় ফকিরুদ্দিন আলি আহমেদের ভগিনী। বাজনার দিন আলাপ হয়েছিলো এবং সামনেই বসে বাজনা শুনেছিলেন। যাই হোক আজিজা ইমামের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

সকালে রেডিওতে রেকর্ড করে রাত্রে আজিজা ইমামের বাড়ী গেলাম বাজাতে। বাজাবার সময় বুঝলাম আজিজা ইমাম অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রেমীই কেবল নন, সঙ্গীত বোদ্ধাও। শ্রোতাদের মধ্যে পাটনার সঙ্গীতপ্রেমীদেরই নিমন্ত্রণ করেছেন এবং অনেকেই আছে দেখলাম। একটার পর একটা ফরমাস করে বাজনা শুনলেন। প্রায় চারঘণ্টা বাজনা হোল। তারপর খাওয়ার পালা। খাবার খেতে খেতে আজিজা ইমাম বললেন, 'যৌবনে আমার গায়িকা হবার স্বপ্ন ছিলো। কিছুদিন সঙ্গীত চর্চার পর রাজনীতিতে প্রবেশ করলাম। রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও অবসর সময়ে সঙ্গীতের রেকর্ড শুনি এবং সময় পেলেই শিল্পীদের গান বাজনা শুনি।'

পরের দিন কাশী রওনা হলাম। কাশীতে এসেই দুটো চিঠি পেলাম। দুইমাস পরে রাজা লক্ষ্মীপ্রসাদপিত্তির কন্যার বিবাহের স্থির হয়েছে। হোটেল তাজএ রিসেপসান হবে। চিঠিতে লিখেছেন, 'বিবাহের পরে আমার বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনদের সামনে আপনার বাজনার ঠিক করেছি।' অপর চিঠি এসেছে কোলকাতা থেকে। বম্বের বাজনার একমাস পরেই কোলকাতায় বাজাবার নিমন্ত্রণ।

দেখতে দেখতে দুটো মাস কোথা দিয়ে পেরিয়ে গেলো। তারপরই বম্বে যাত্রা করলাম।

বম্বে গিয়েই অন্নপূর্ণাদেবীর বিলডিংএ ঢুকতেই দেখলাম বাড়ীর বাইরেটা রং করা হচ্ছে। ফ্লাটের ভিতর ঢুকে বুঝলাম মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। বাইরে পরিষ্কার হচ্ছে বলে এই ফাঁকে নিজের ঘরেরও টুকিটাকি মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। রুশীর সঙ্গে দেখা হতে বলল, 'আপনার কথা আমার মনে আছে। পরের বারে যখন আসবেন, দেখবেন আপনার কথামত কাজ হয়েছে কি না?' এর উত্তর দেবার আগেই অন্নপূর্ণাদেবী এলেন। কথায় কথায় বললাম, 'আট মাস পরে ফ্রান্সে যাব।' ফ্রান্সের যাবার ঘটনা সব বলে বললাম, 'প্রোগ্রাম যে কয়েকটা করব, খুব ভাল জায়গায় হবে।' অন্নপূর্ণাদেবী খুশী হলেন। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম, 'আপনি তো ন্যাশানাল সেন্টারে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার শেখাতে যান। সুতরাং পরশু বাজনা শিখতে আসবো যেহেতু সে দিন আপনি ন্যাশানাল সেন্টারে যাবেন না।' আমার কথা শুনে বললেন, 'গতবারে যখন এসেছিলেন, তার কিছুদিন পরেই সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। ডাক্তার মেনন সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমির ডিরেক্টার হয়ে চলে যাবার পর, ন্যাশানাল সেন্টারের কাজ ভালই চলছিল। কিন্তু তাঁর যাবার পরে যে নূতন ডাইরেক্টার হয়েছেন, তিনি একদিন, একটা চিঠি দিয়ে জানালেন, 'আপনার ছাত্রদের, একজন গায়ক দুইদিন গলা সাধাবে।' এই চিঠি পাবার পরই ন্যাশানাল সেন্টারে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। যে ছাত্র কয়েকটি সেন্টারে শিখত, তাঁরা উপস্থিত আমার বাড়ীতে এসেই শিখছে। সুতরাং সোম এবং বৃহস্পতিবারে বাড়ীতেই থাকব।'

অন্নপূর্ণাদেবীর কথা শুনে অবাক হলাম। মনে পড়ে গেল বাবার কথা। মৈহার ছাড়ার আগে বারবার বলেছিলেন, 'এখানে থেকে বাইরের দুনিয়ায় কি হয় বুঝতে পারছ না। বাইরে যখন গিয়ে বাজাবে দেখবে কি প্রচণ্ড রাজনীতি।' বাবার কথা মনে হোল এই জন্য, যে ন্যাশানাল সেন্টারেও পারটিবাজী। পারটিবাজী না হলে কেউ এ কথা বলতে সাহস করবে না যে অন্নপূর্ণাদেবীর ছাত্র ছাত্রীদের সুরের জ্ঞান করাবার জন্য, দুইদিন গায়কের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। ডাক্তার নারায়ণ মেনন থাকলে এটা হতো না, কারণ তিনি জানতেন অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ীতে একটা ছেলে এবং মেয়েকে খেয়ালের তালিম দেন। এ ছাড়া গানের তালিম যে দিতে পারেন, এ কথা মেননের জানা ছিলো। কি অপরিসীম ধৃষ্ঠতা? বম্বে আসার কারণ, চিঠিতে আগে জানিয়েছিলাম, সেইজন্য বললাম, 'মাত্র ছয়টা দিন থেকেই কোলকাতায় যেতে হবে। কোলকাতায় যাবার আগের দিন শিখতে আসব।' উত্তরে বললেন, 'উপস্থিত ছাত্রদের একটা মাস আসতে বারণ করেছি। সম্পূর্ণ বাড়ীটা রং করবার জন্য ঘরে ধুলো হয়। যতই দরজা বন্ধ করে রাখি না কেন, বারবার করে ঘর পরিষ্কার করতে হয়। আমার ফ্লাটের প্লাস্টার খসে পড়ছিলো। আমি এতদিন একলা থাকায় মেরামত করাতে পারি নি। রুশী আছে বলেই মজুর লাগিয়েছি। ঠিক আছে, যাবার আগের দিন শিখতে আসবেন। এখানে থেকেই পিত্তিজির বাড়ী যাবেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ এসে উপস্থিত হোল।' কাশীতে কয়েকদিন দেখার পর বহুদিন পরে আবার গর্গের সঙ্গে দেখা হোল। আমি প্রতিবারই যখন আসি, সেই সময় গর্গ বোম্বের বাইরে থাকে। প্রতিবারের মত এবারেও কার্যক্রমের কথা লিখেছিলাম। সেইজন্য গর্গ এসেছে। প্রথমেই গর্গকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রকম শিক্ষা

চলছে?' গর্গ বলবার আগেই অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'এঁর বাজনা বাজাবার সময় কোথায়? সিনেমায় মিউজিক ডাইরেকসান দিচ্ছে এবং ফিল্ম তৈরী করবার ধান্দায় লেগে গেছে।' গর্গ লজ্জিত হয়ে বলল, 'মাতাজি, বম্বেতে স্থায়ী হবার জন্য এই কাজে লাগতে বাধ্য হয়েছি। আমি বাজনা ভালবাসি বলে শিখছিলাম। এ কথা জানতাম বাজনা বাজিয়ে আমার খরচা চলবে না। একটু স্থিতি হলেই আবার বাজাব।' উত্তরে অন্নপূর্ণাদেবী হেসে বললেন, 'সে সময় আর কখনও আসবে না। টাকার পেছনে দৌড়লে সঙ্গীত হয় না।' এবারে আমি গর্গকে বললাম, 'শেষ বাজনা চার বছর আগে তোমার বাড়ীতে থাকাকালীন শুনেছিলাম। কি সুন্দর মধ্য লয়ের গৎ শিক্ষা পেয়েছিলে? সেই সময় বাজনা ছেড়ে দিলে?'

আমার কথা শুনে অবাক হয়ে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'কি গৎ শিখিয়েছিলাম?' ইমন মধ্যলয়ের গৎটা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই গর্গ বললো, 'তোমার এখনও মনে আছে? আমি তো ভুলেই গিয়েছি। উত্তরে বললাম, 'আমার স্মৃতি শক্তিটা খারাপ নয়। অতীতের সব কথাই আমার মনে আছে। এ ছাড়া তোমার মাতাজির কাছেও কবে, কোথায়, কি পরিস্থিতিতে শিখেছি তাও বলতে পারি। কিন্তু তুমি পেয়ে হারালে। এ স্বর্ণযুগের দিন আর আসবে না।' আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'এই জন্য তো কাউকে আর শেখাতে ইচ্ছা করে না। যখন একটু শিখবার মত হয় সেই সময় উড়তে আরম্ভ করে। অবশ্য এঁর কথা আলাদা। তবে এতদিন যদি ঠিক করে শিখতো তাহলে কিছুটা তো নিশ্চয়ই হ'তো।' গর্গ লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই খাবার খেয়ে হোটেলে চলে এলাম। নানা গল্পের পর, গর্গ-এর কাছে যা শুনলাম তা আমার কাছে বিস্ময়। গর্গ বলল, 'মাতাজি ন্যাশানাল সেন্টারে কেন বাজনা বন্ধ করে দিয়েছেন জানো?' বললাম, 'ডাইরেক্টার কি সঙ্গীত জানে না? এই এত বড় সেন্টারের ডাইরেক্টারের তো সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত।' আমার কথার মাঝখানে গর্গ যে কথা বলল, তা শুনে অবাক হলাম। মানুষ কত নীচে নামলে এই সব হীন চক্রান্ত করতে পারে? এই হীন চক্রান্তের নায়ক দুজন। নায়ক দুজনেই হোল সঙ্গীত জগতের। একজন নিজেকে সর্বোচ্চ স্থানে কায়েম করবার জন্য ন্যাশানাল সেন্টারের ডাইরেক্টারকে তৈল মর্দন করে বুঝিয়েছে, গায়কের প্রয়োজনীয়তা। ডাইরেক্টার এই নায়কের চামচাগিরিতে খুশী হয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর ছাত্র ছাত্রীর সুর সাধনার জন্য, সপ্তাহে দুই দিন গায়ক ঠিক করে চিঠি দিয়েছিলেন। যার ফলে অন্নপূর্ণাদেবী ন্যাশানাল সেন্টারে পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন।

আমার কৌতুহলী মুখটার দিকে চেয়ে বলল, 'প্ররোচক কোন ছোটখাট ব্যক্তি নয়। পেসেবর মাতং গানেওয়ালা। অর্থাৎ বাংলায় তর্জনা করলে দাঁড়ায়, পেশাদার শোকসঙ্গীত গায়ক। ভ্যাবাচেকা খেয়ে বললাম, 'মানে?' বলল, 'দেশের কোন কর্তাব্যক্তি মরলে, রেডিওতে আদ্যশ্রাদ্ধ পর্যন্ত সারেঙ্গীতে মরা কান্না বাজায়। ব্যাস, নামটা আর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর অপরটি? সেই অভাগা পাথর। যে হতে পারত অজন্তার মূর্তি। বড় ভূধরের কীর্তি কিন্তু নিজের আচরণ দোষে বিধবার শাঁখা ভাঙ্গার পাথরই হয়ে রয়ে গেল। ভাবলাম এতদিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় শনিটাই অন্নপূর্ণাদেবীর বারোর ঘরে ছিল। প্রথমটি তার চর হয়ে জুটল। কথায় আছে স্মলার এনিমিজ বিকাম ফ্রেণ্ড টু ফাইট রিগার

এনিমি। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য। যাঁকে এর বৃহত্তর শত্রু ভাবছে তিনি তো এঁদের শিখণ্ডি ভেবেছেন। আর বীর ভীষ্ম তাই নপুংসককে শরাঘাত করেন না। ধন্য অ্যানহোলি ইউনিয়ন।

ফ্রান্সে যাবার এখনো দুমাস দেরী আছে। হঠাৎ একটি বাংলা মাসিক পত্রিকায় চোখ পড়ল। একটি সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। এ যাবৎ দেখে আসছি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেকেই মিত্র হয়, পরে শত্রু হয়। মিত্রতা এবং শত্রুতা স্থির থাকে না। প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শত্রু হয়, কেননা স্বার্থই বলবান। যাঁরা পূর্বে মিত্রতা করে তাঁরাই আবার পরে শত্রুতার চেষ্টা করে। পরস্পরকে প্রতারণা করাই উদ্দেশ্য। তাঁদের মধ্যে যে অধিক বুদ্ধিমান সে অন্যকে বঞ্চনা করে। যে নির্বোধ সে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সত্যিই কি বঞ্চিত হয়? কেন এ কথা বললাম, সে ঘটনাটা পরিষ্কার করে বলাই ভালো।

নিখিলের মত সৎ, অনুগত আর বিশ্বস্ত শিল্পী এ যুগে বিরল। অসাধারণ প্রতিভা এবং অনন্য সাধারণ অধ্যবসায়। এ যুগের এক বিরল দৃষ্টান্ত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। যে বয়েসে কোন একজন সাধারণ শিল্পী নিজেকে বিদ্বান ভাবতে আরম্ভ করে, সে বয়সেও নিখিল লোক দেখাতে নয়, সত্যিকারের শিক্ষা করতে যেতো অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে। বম্বে গেলে ঘাসওয়ালাজীর কাছে শুনতাম। বম্বের এই শিক্ষার দিনগুলোতে অজস্র বকুনি খাবার ফাঁকে অনেক মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনত রত্নাকরের বালুকাতট থেকে। সুর সাগরে ডোবার আকাঙ্খা নিয়ে বারবার ছুটে যেতো অন্নপূর্ণাদেবীর পায়ের কাছে। এমন এক শিল্পী, সেও দুর্জনদের পাল্লায় পড়লো। তাও কি না পঞ্চাশোর্দ্ধ অবস্থায়।

এক কালে যাঁর গুরু আনুগত্যকে লোকে ঈর্ষা করত, নিখিলের সঙ্গীত গুরু আলিআকবরকে সে যে রকম শ্রদ্ধা করতো সেটা ছিলো দ্রষ্টব্য। এবং সেটাই হয়তো কারণ ছিলো যার জন্য আলিআকবর নিখিলকে যশের শীর্ষে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কি নিকৃষ্ট অসাধু রাজনীতি? নিখিলের শয়তান বন্ধু জুটল। আর সেই ডেভিলসদের দয়ায় হঠাৎ কৃতঘ্ন হয়ে গেল। বাংলা এক সাপ্তাহিকে ইন্টারভিউ বেরোলো। তাতে আলিআকবরই হাপিস।

যদি হাপিস হয় এতে আমার কোন আপত্তি ছিলো না। আলিআকবর যত্ন করে শেখান সত্ত্বেও নিখিল ছিলো ওর বোড়ে। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি রবিশঙ্করের সঙ্গে মনোমালিন্যের দাবায় নিখিলকে দিয়ে আলিআকবর চেষ্টা করেছিলো কিস্তিমাত করতে। তাই পলিটিক্যাল এ্যালায়েন্সের স্কাউড্রেল বোল্ড খারাপ লাগে নি। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবী? যিনি সঙ্গীতের এই পারলামেন্টারি মিসটেককে বিশ্বাসই করেন না। তাঁর সঙ্গীতের মনারর্কির প্রসাদ পুষ্টরা কি করে অন্নের ঋণ অস্বীকার করে, ভুলতে পারি না। সত্যি, শয়তান যদি বন্ধু হিসাবে আসে, সব থেকে ক্ষতি করতে পারে। যা হোল নিখিলের বেলায়। এই সাক্ষাৎকার বেরোবার কয়েকদিন পরেই আলিআকবর কোলকাতায় এলো। সেই সাক্ষাৎকারটি পড়ে একটি চিঠি লিখল সাপ্তাহিক পত্রিকায়। তার উত্তরে নিখিল ক্ষমা চেয়ে সেই পত্রিকায় লিখল, 'যাঁর যাঁর কাছে শিখেছি তার মধ্যে আলিআকবরের নাম লিখতে ভুল হয়ে গিয়েছে। তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।' এর পরে এক পাঠক নিজের এক বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলো। সাপ্তাহিক পত্রিকায় সেটাও ছাপা হোল। যাঁদের একটুও বুদ্ধি আছে তাঁরাই বুঝতে পারে, নিজের

লোককে দিয়ে চিঠি লেখান যায়। সঙ্গীত জগতে সব লোকেই এ কথা জানে এবং এ বিষয়ে আগে কত বার লেখা হয়েছে। মনে মনে ভাবি আজ থেকে দশ, পনেরো বছর পর যাঁরা এইগুলো পড়বে, তাঁরা কি ধারণা করবে? সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব থাকা উচিত। তাঁদের জানা উচিত, ব্যক্তি থেকে বড় সমাজ, এবং সরকার থেকে বড় দেশ। সংস্থা এবং সিদ্ধান্ত অমর হয়ে থাকে। স্পষ্টবাদী এবং আত্মভিমানী হওয়া উচিত। যা ছাপা হয়, তার দায়িত্ব সম্পাদকের। আজকাল অবশ্য অবাক হই না এ সব দেখে। সর্বক্ষেত্রেই রাজনীতির দলাদলি। বাবা একটা কথা নিজের গুরুদেবকে উদ্দেশ্য করে বরাবর বলতেন। ভেবেছিলাম বাবার সেই কথাটা মনে করিয়ে দিই। বাবা বলতেন, 'মানুষের নশ্বর দেহ পিতা মাতা হতে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্য, গুরু, বা উপগুরুর উপদেশে যে জন্মলাভ হয়, তা অজর, অমর।' বাবা যে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছিলেন, সে কথা আজকাল সকলে ভুলে যায় কি করে?

ঠিক এই সময় এক ফ্রেঞ্চ যুবক আমার কাছে এলো। পরিচয়ে জানাল, সে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শনের শিক্ষার্থে এসেছে। আরও জানাল, সে আমার ফ্রেঞ্চ ছাত্রের বন্ধু। বলল, 'আপনি দর্শন এবং সঙ্গীতের ছাত্র। আমাদের দেশ আপনাকে অন্য চোখে দেখবে। যখন যাবেন তখন সঙ্গীতই কেবল শুনব না, সঙ্গীতের দর্শনও শুনতে চাইব। আপনি যে সময়ে ফ্রান্সে যাবেন সেই সময় আমিও যাব।'

এ কথাটা শুনে আমার চিন্তা বাড়ল কারণ শুধু বাজিয়েই পার পাওয়া যাবে না। তাত্ত্বিক আলোচনাও তার সঙ্গে থাকবে। ছোটবেলা থেকে আমি খুব আমুদে হলেও মিশুকে নই। নিজের লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেও, বাইরের জগতের সামনে অতটা একসট্রোভার্ট্ হতে পারি না বাজনা ছাড়া।

বছরের নয়টা মাস কোথা দিয়ে চলে গেল বুঝতে পারলাম না। আর কিছুদিন পরেই ফ্রান্সে যাব। ইতিমধ্যে আমার ফ্রেঞ্চ ছাত্র লনিক কোরের চিঠি পেলাম। লিখেছে, 'বাজনা ছাড়াও সঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিতে হবে। সাথে সাথে সম্ভাব্য বক্তৃতামালার একটা সূচীও পাঠিয়েছে। বিষয়বস্তু দেখে চক্ষু চড়কগাছ। প্রথম বিষয়টা সব থেকে বেশী মজাদার। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে তাঁর ছাত্ররা শতকরা কত অর্জন করতে পেরেছেন অর্থাৎ তাঁর শতকরা কত সঙ্গীত পরিকল্পনা তাঁর প্রয়াণের সাথে হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত স্নায়বিক উত্তেজনাকে কি প্রশমিত করতে পারে? তৃতীয়তঃ, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-এর পরিপ্রেক্ষিতে আসল সোনা এবং নকল সোনার বিচার। আরোও কয়েকটা বিষয় গৌণ ছিলো বলে মনে নাই।

এই প্রশ্নোত্তরগুলোর ভিতরে প্রথমটার উত্তর অত্যন্ত কঠিন, কারণ যদি সত্য কথা বলা যায়, কে কতটা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, এটা বলা কঠিন। কিন্তু শিক্ষার পর জনসম্পর্কে যে পরিমার্জিত রূপ ফুটে উঠেছে তা দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে অন্নপূর্ণাদেবী শীর্ষে। কেননা, জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি বাজান না। এরজন্যই তাঁর শিক্ষা এবং সৃষ্টিধর্মিতা অলমোষ্ট নিয়ার টু দি পারফেকসান। রইল বাকী অন্যদের কথা। কার বিষয়ে কি বলব? বাবা যাঁদের ভেতরে শৌর্য দেখে তলওয়ার উপহার দিয়েছিলেন, তাঁরা তো বেশীর ভাগই

অপরকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সে তরোয়ালকে প্রয়োগ না করে, কষাই-এর দোকানে মাংস কাটার কাজ নিয়েছেন। ধারে ও ভারে মাংস তো কাটছে, অর্থাগমও হচ্ছে কিন্তু বাবার দেওয়া সোনার প্রতিমা ধুলোয় লুটোচ্ছে। কুব্জি এখানে পাটরাণী। তাই স্থির করলাম, অন্নপূর্ণাদেবীর বিষয়ে বলব এবং নিজের আত্মসমালোচনা করব। বাসে বা পরবাসে, নিজের দীনতাকে স্বীকার করতে আমার সামান্যতম লজ্জা নাই। একথা ঠিকই যে আমার সুরের ভিক্ষার ঝুলি এখনও অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই আমার দন্তপ্রস্ফুটিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তথাপি সঙ্গীতকে দর্শন দিয়ে যতটা বুঝতে পারি তাতে ইন্দ্রিয়দের প্রশমিত করে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্ভব। এ কথাটা বোঝাতে পারব, এ বিশ্বাস মনেতে আছে।

আর শেষ প্রশ্নটা সম্বন্ধে স্থির করলাম। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তখন তো জানতাম না, কি বিপাকে পড়ব।

দেখতে দেখতে ফ্রান্সে যাবার দিন এগিয়ে এলো। বারোই অক্টোবার প্যারিসে যাব। এখানেও নিমিত্ত বাবা। মনে পড়ে গেলো প্রায় তেরো চৌদ্দ বছর আগে একবার থাইল্যাণ্ডে যাবার কথা হয়েছিলো। বাবার আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। বাবা আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। বাবার বয়স প্রতিবছর দুবছর না বেড়ে আরো বেড়ে গেছে। বাবা লিখেছিলেন, 'আমার বয়স এখন একশত আঠাশ। নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ কর। তুমি ইউরোপ যাইতেছ জেনে খুব সুখী হলাম। মা সারদা তোমার মঙ্গল করুন এবং খুব জয় হোক, জয়কার হোক এই আশীর্বাদ করি।'

দিল্লী যাবার সময় বাবার পুরোনো চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেলো। পালতোলা আর লগি তোলার দিকপাল আমার বাল্যবন্ধু রাজ্যসভার এম. পি হিন্দির বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুধাকর পাণ্ডে আমায় রাত্রে খেতে বললো। সুধাকরের স্ত্রী আমার ছোট বোনের মত। বলল, 'ভৈয়াজী সকলেই তো বিদেশে যায়। আপনি কেন এড়িয়ে যান?' প্রশ্নটা তো সাদামাটা ছিলো কিন্তু উত্তরটা ঝামেলার। তাই ভাবলাম এক কথাতেই সারি। বললাম, 'সম্মান করে না ডাকলে কি কোথাও যাওয়া ভালো?' সেও নাছোড়বান্দা। বলল, 'এ হলে যাঁরা বিদেশে যান, সেই সব শিল্পী কি যান বিনা আমন্ত্রণে?' তখন একটু খোলসা করে বললাম, 'যে বা যাঁরা ডাকছেন এবং কোথায় গিয়ে বাজাতে হবে সেটা হোল বিচার্য বিষয়। হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী ছাড়া, ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা বর্তমানে বিদেশে যান, তাঁদেরও বেশীর ভাগই গুণীজনদের পাতে পড়বার সুযোগ পান না। তাঁদের সকলকে চরিতার্থ হতে হয় ক্যামেরার আর না হলে রেষ্টুরেন্টের লাঞ্চটাইম বা ডিনার টাইম ভ্যারাইটিতে বাজিয়ে। তাই আমার শুচিবাইগ্রস্ততা বারবার বাধা দিয়েছে। গত তিন দশক বার তিরিশেক হাতজোড় করে অক্ষমতা জানিয়েছি।' আবার প্রশ্ন, 'এবারে তাহলে যাচ্ছেন কেন?' হেসে বললাম, 'চিত্রগুপ্তর খাতায় ক্রেডিট সাইডে একটা এনট্রি করিয়ে রাখলাম।'

বাজনা শুনে এবং বক্তৃতা শুনে শ্রোতাদের কার কেমন লেগেছে জানার আমার আদৌ কোন কৌতুহল ছিলো না। শুধু মনে আছে কয়েকটা নিষ্পাপ মন্ত্রমুগ্ধ মুখ। ইউরোপীয়

মেটিরিয়াল পাথরে সুরের ঝর্ণার ধারাকে ওঁরা যে নির্বাক ভাষায় সম্মান করেছেন, তাতে বাবার শিক্ষার প্রতি আবার আস্থা জাগে। বাকচতুর নয় বলে বক্তৃতা খুব উৎকৃষ্ট মানের হয় নি। এক শ্রোতা তো বলেই বসলেন, 'আপনার বোধ হয় রাজনৈতিক শিক্ষা নেই।'

শুধু মনে থাকবে এক বৃদ্ধ পাদরি সাহেবের কথা। অক্সেরের একটি গির্জা ঘরে গিয়ে সন্ধেবেলায় বাজনা বাজাই। পাঁচশো বছরের পুরোনো চার্চটি দেখে আমার সারদা দেবীর মন্দিরের কথা মনে হয়েছিলো। ঘণ্টাখানেক বাজনা বাজালাম। তারপর পাদ্রী সাহেব ডেকে শুধু একটা কথাই বললেন, 'তোমার যীশুবন্দনা খুব ভালো লাগলো।' আমার মনে হোল মাদার মেরির কোমল হাত যীশুর পবিত্র ক্ষতর উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত সবিনয়ে আমার কাছে অনুমতি চেয়ে বললেন, 'আপনি যদি আপনার এই বাজনাটা নিঃশুল্ক দান করেন, তাহলে আমি প্রাত্যহিক উপাসনার সময় এটি চার্চে বাজাব।' হঠাৎ মৈহারে বাবার শোবার ঘরটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। দেওয়ালে সারি সারি ছবি টাঙ্গান আছে। পবিত্র মক্কা, সারদা মা, পরমহংসদেব আর মা মেরীর কোলে যীশুর ছবি।

আমার মনে হোল বাবার সঙ্গীতের যে পরিকল্পনা ছিল, সে সঙ্গীত দেশ, কাল জাতির ঊর্দ্ধে, সেটা আবার প্রমাণিত হোল। হাত জোড় করে বললাম, 'নিশ্চয়ই আমার আজকের বাজনা আমি যীশুকে নিবেদন করেছি। এখন আর এটা আমার সম্পত্তি নয়। এটা এখন আপনার সম্পত্তি।' পাদ্রীসাহেব চার্চের দানপত্র থেকে আমাকে একটা রসিদ দিলেন। দাতার নাম লেখার ব্যাপারে আমি তাঁকে অনুরোধ করে বললাম, 'লিখে দিন উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জনৈক শিষ্য।' কারণ আমার মনে হোল ভিক্ষুর, দাতার সূচিতে নাম থাকাটা হাস্যাস্পদ।

বিদেশে গিয়ে কয়েকটা জিনিষ আমাকে পীড়া দিয়েছে। সঙ্গীত নিয়ে ব্যবসা চলছে। ভারতবর্ষে যাঁর নাম কেউ কোনদিন শোনে নি, তাঁরা এখানে বাজিয়ে বিদেশীকে বিয়ে করে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে। ঘণ্টা হিসাবে টিউশান চলছে। এ সবের প্রচলন কিন্তু বহু পূর্বে ভারতের নামী শিল্পীরাই চালু করেছেন। বছরে ছয় মাস বিদেশে থেকে বহু জায়গায় কেন্দ্র করেছে। অবসর সময় তাঁদের ছাত্ররা শেখাচ্ছে। বিদেশী মহিলাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু চামচেরা এমন অশালীন ব্যবহার করেছে যে স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর পর অন্য জায়গায় স্কুল খুলে আবার ঘড়ি দেখে একঘণ্টা শিখিয়ে মোটা টাকা উপার্জন হচ্ছে। এ ছাড়া ছোটখাট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বাজনা তো লেগেই আছে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসবে, কিন্তু পরিবর্তন তো পাগলামি হলে চলবে না। মানুষের পরিবর্তন, মানুষের বয়সের সঙ্গে ঘটে। ছেলে যেমন ধীরে ধীরে যুবক ও বুড়ো মানুষ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষ তো আর কুকুর বেড়াল হয়ে ওঠে না। এক কথায় আজকাল তাই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

এই সব করে হয়ত অনেকেই নাম করেছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুর্বিনীত অমানুষই রয়ে গেছে। তারজন্যই সংসারে দুর্ভোগ লেগে আছে। প্যারিসে এসে জনৈক সঙ্গীতপ্রেমীর কাছে জানতে পারলাম, এই যে শিক্ষা পদ্ধতি যার দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয়-এর প্রথম

পদক্ষেপ ষাট সালে। চৌষট্টির পর জলের স্রোতের মত টাকা এসেছে। পরপর বিদেশ ভ্রমণের ফলে টাকা যে অজস্র ধারে এসেছে, তার আভাস পাওয়া গেছে। নানা নামে, নানান রকম দলিলে, জলের দরে, জমি কিনে বাড়ী হয়েছে। সম্পত্তি কোনটা নিজের নানা নামে, নাবালক ছেলের নামে, নানা আত্মীয়ের নামে।

একদিন যখন জিজ্ঞাসা করা হোল এ-টাকা, সম্পত্তি সাদা পথে এসেছে? এর উত্তরও হোল খুব সাদা। সাদা কি কালো সেটা দেখার উপর নির্ভর করছে। যাঁর কিছুই নাই সে সবটা কালো দেখে। যাঁর কিছু আছে সে ঝাপসা দেখে আর যাঁর অনেক আছে, পথটা সে অনুসরণযোগ্য সাদা দেখে। তবে এটা ঠিক যে যেমনই দেখুক, যে এ সব করেছে তার মতো কেরামতি কোন সঙ্গীতজ্ঞর মধ্যে দেখা যায় না। যাঁরা বিরাট ব্যবসা করে তাদের এসব শোভা দেয়। সুরের যে কারবারি, তাঁর মন কখনওকি এদিকে যাবে? তাই তো বলছিলাম যে যাই বলুক, এমন কেরামতি দেখা যায় না। যদিও নাম মানেই অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, তবে এই গোপন বাসনার জন্য ইন্ধন যোগাবার লোক রাখতে হবে এবং এই কেরামতির মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে চাটুকারদের। যাঁদের নূতন নামকরণ 'চামচা' যা দীর্ঘদিন ভারতে বরাবরই দেখেছি।

আমার জীবনে সঞ্চয় যদি কিছু জমা হয়ে থাকে, তা সে শুধু বিস্ময়ের সঞ্চয়, অবাক হবার সঞ্চয়। বার বার মনে হয়েছে, 'হে প্রভু কত অজানারে জানাইলে তুমি।' দেখতে দেখতে বছরটা কখন শেষ হয়ে গেলো বুঝতে পারলাম না।

৭৩

তথ্যের আর তত্ত্বের জমাট বাঁধা বরফের হিমালয়ের মত, বাবার জীবনীকে তরল করে খাল কেটে জন সমুদ্রের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছি বিশ্বাস করে যখন ভাবছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম। মোহনার কাছে এই পলির ঢিপিটা কোথা থেকে এলো? যে নির্মল নিষ্কলুষ জলধারাকে জনসমুদ্রের কাছে পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিলো, তাতে এই উটকো বাধা এলো কি করে? বাবা বলতেন, 'বাজনা শেষ করার আগে, শেষ তেহাইএর সময়ে তার ছিঁড়লে, আবার তার লাগিয়ে একটু বাজান উচিত। না হলে শ্রোতাদের কাছে পরিতৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয় না। একটু বিস্বাদ থেকে যায়।'

আমারও হোল তাই। অজাতশত্রু বাবার সব কথা লেখা শেষ করে ফেলেছি এই কথা ভাবার কয়েকদিনের ভিতরেই দেখতে পেলাম রাজার মাকে আড়ালে ডাইনী বলার লোকের অভাব নাই। কিশোর বয়সের পরিণত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে লেখা আর এক কবির একটি কবিতার কয়েকটা ছত্র মনে পড়ে গেল—

'দালালে আর শয়তানে ছেয়ে গেছে দেশটা'
সুকান্ত যদি থাকত, বলতাম
ভাই তোমার কলমটা দেবে?
এদের ধরে চাবুক লাগাই।

আমিও মনে মনে সুকান্তর কলমটা ধার করলাম। কোথায় শেষ করব বই, আবার একটা পর্ব বেড়ে গেলো। এ পর্বটা যুদ্ধের পরে শান্তি পর্ব না শান্তি পর্বের পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি ঠিক বলতে পারছি না। আবার সেই বাবার কথা। মেঝেতে যদি বেশী ময়লা থাকে মুছলে নাকি কাদা বাড়ে। তাই ধুতে হয়। আবার সেই জল বালতি আর সমার্জনী।

কথায় বলে মিসিং লিংক। যে কাগজের টুকরোতে ধাঁধাটা ছিলো তার অর্দ্ধেক টুকরো বাবার কাছে পেয়েছিলাম উনিশশো বাহান্ন সালে। আর অর্দ্ধেক টুকরো ছিলো হয় বাবার কাছে, আলিআকবর, রবিশঙ্কর বা জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের কাছে। কিন্তু এঁরা কেউ আমাকে দেন নি। তাই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়েছিলো আমার কাছে, যে বাবা সব ব্যাপারেই আমার কাছে অকপট ছিলেন, এমন কি ব্যাপার ছিলো, যা ঘটেছিলো জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের সাথে কোলকাতার আসরে আর আসরের অন্তরালে?

সেই মিসিং লিংকটা জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ নিজেই ধরিয়ে দিলেন বাংলার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় তাঁর ক্রমশঃ প্রকাশিত আত্মজীবনীতে। 'তহজীব-এ-মৌসিকী'র ৬'ই অক্টোবর ১৯৮৪ সংখ্যায়। এতদিন জানা ছিলো মানুষ মরে গেলেই তার গুণের কথা অগুন্তি শোনা যায়। বেঁচে থাকলেই নিন্দে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর তের বছর পরে কোরামিন ইনজেকসান দেওয়া হচ্ছে। জীবিতকালীন কিছু লেখার সাহস ছিলো না অথচ এখন তাঁর নিন্দা প্রকাশ হচ্ছে। লেখকের বোধ হয় একটা বাংলা প্রবাদ জানা ছিলো না। প্রবাদটা হলো 'পর্বতের গায়ে লাথি মারলে পর্বত টলে না। তাঁর অর্থাৎ যে মারে পা ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যায়।' হঠাৎ যেন চোখের সামনে থেকে একটা বিরাট পর্দা উঠে গেলো।

বাবার আদেশ ছিলো একটু খুলে লিখতে। অর্থাৎ তাঁর জীবনের সব তথ্যই খোলাখুলিভাবেই প্রকট করতে। সেই করতে গিয়ে বহুলোকের জবানীকে কলমবন্ধ করেছি। কিন্তু তখন কি বুঝতাম, খুলে লিখতে গেলে অ্যানাটমির ডিসেকসান করতে হয়? এ সাহিত্যের মুর্দাফরাসের কাজ। উপায় যে নেই।

উর্দুর কালিদাস মিরজা গালিব তাঁর রচনায় একটা লাইনও বোধ হয় এমন লেখেন নি, যা নিরর্থক বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাওয়ামাত্র অপ্রয়োজনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যা প্রাসঙ্গিক ছিলো আজও তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। গালিব লিখেছিলেন, 'হম হ্যয় মুস্তাক, উত্ত বেজার য়্যা ইলাহি, য়্যা ম্যাজরা ক্যা হ্যায়?' অর্থাৎ কিনা, আমি উৎসুক আর উনি বেজার। হে ঈশ্বর রহস্যটা কি?

বই লেখার তাগিদায় ইস্তক ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি, আর যাঁর কাছে সামান্যতম তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করি নি, কারণ সুদীর্ঘ ষাট বছরের জনজীবনে বাবা যাঁদের বা যাঁরা বাবার সান্নিধ্যে এসেছেন, হয়ত তাঁদের কাছে বাবার বিষয়ক কিছু মণি মুক্তা আছে।

এই রকম মুক্তার খোঁজে বহু ঝিনুক সাগর তটেতে খুঁজেছি। মুখ খুলে দেখেছি কিছুতে রয়েছে মহামূল্যবান স্বাতিনক্ষত্রের জল আর বেশীর ভাগেতেই খুঁজে পেয়েছি বাবাকে ছোট করে, আত্মম্ভরিতার বেনো আর নোনা জল। যে গল্প বলা হ'তো, তাতে বাবা হয়ে যেতেন কর্ম এবং বক্তাই কর্তা। আর উদ্দেশ্য থাকত এতদ্দারা স্বমহিমার গুণগান।

জল দুধ আলাদা করতে আমাকে গলদঘর্ম হতে হ'তো। এই তালগাছে চড়ার দুরূহ কাজ

নিয়ে একবার জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ-এর কাছেও যাই। উদ্দেশ্য ছিলো মনের মধ্যে একটা পুরোনো কথা, বা ধাঁধার উত্তরটা জেনে নেওয়া। অকপটে প্রশ্ন করি, 'উনিশশো বাহান্ন সনে বাবার সঙ্গে বাজাবার সময় আপনার সঙ্গে কি ঘটনা ঘটেছিলো, বা অফ দি স্টেজ আরো কিছু ঘটেছিলো কি? কিন্তু ভদ্রলোক আমার আলাপ বিস্তারের আগেই এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ছেদ টানলেন। বললেন, 'ঐ প্রসঙ্গটা থাক। দয়া করে ঐ বিষয় নিয়ে আর নাড়াচাড়া করবেন না।' আমিও ভাবলাম ঠিক আছে।

যাঁরা মাইন পোঁতে তাঁরা যুদ্ধে হেরে গেলে, আর কষ্ট করে মাইনগুলোকে খুঁজে অকেজো করতে ভুলে যায়। আর কি বিড়ম্বনা, তাঁরাই ওই পোঁতা মাইনের উপর দিয়ে হাঁটে অর বিস্ফোরণের কালে স্বখাত সলিলে চলে যায়? পঞ্চাশ দশকের পোঁতা মাইন ফাটল আশি দশকের মাঝামাঝি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ লিখলেন আত্মজীবনী। যে প্রসঙ্গ তিনি একযুগ আগে আমাকে এড়িয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই লিখে বসলেন। বোধ হয় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, যাঁর বিরুদ্ধে লিখছি, তিনি তো আর ইহধামে নাই। আর যাঁরা আছে, তাঁদের মধ্যে একজন আত্মবিস্মৃত, আর অপরজন আত্মকেন্দ্রিক। তাই ভাবলেন নকল বুঁদির কেল্লা ফতে করে ছাড়বেন।

শরৎ বাবু নিষ্কৃতি উপন্যাসে লিখেছিলেন, 'বড় বউ মেজ বৌ-এর প্ররোচনায় ছোট বৌ এর কাছ থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা মেজ বৌ এর কাঁধে চাপে নি। বেঁধে নিয়েছিলেন নিজের আঁচলে। আপ্ত বাক্যটা এই, যে যার কথায় অপরকে অবিশ্বাস বা অপমান করতে শেখে, তাঁকেও সমমাত্রিক অবিশ্বাস বা অপমান করে। এখানেও হোল তাই। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ রবিশঙ্করের শঠতা, আর আলিআকবরের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে বাবাকে হেনস্থা করেছিলেন। সে ঘটনা তো লিখলেনই, নিজের তহজীবে, আর তার সাথে রবিশঙ্কর এবং আলি আকবরকেও উচ্ছৃঙ্খ করতে ছাড়লেন না। বাবা বলতেন, 'যে পুরুষ নিন্দিত কাজ করে, আত্মপ্রশংসা করে, তাঁকে উপেক্ষা করবে। দুষ্টের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। এতদিন এই ভেবেই চুপ ছিলাম, কিন্তু যে লেখা পড়লাম আর চুপ করে থাকা যায় না। তাই কলম ধরতে হোল। সময় কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। যাঁদের প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিলো, তাঁরা চুপ করে বসে আছে। প্রতিবাদ না করে কি তাঁদের সম্মান বাড়ছে?

আমার দায়িত্ব জীবিতদের ওকালতি করা নয়। তাঁদের ধমনীতে রক্ত থাকলে আর হৃদয়ে তেজ থাকলে তাঁরা নিজেরাই অতীত, আর অনাঘাতেই পড়তেন। আমার দায়িত্ব গুরুঋণ। আহাম্মুকের বোকা বোকা কথা আমার ভালো লাগে, কিন্তু বামনের চাঁদ ধরার আস্ফালন আমার বরদাস্ত হয় না।

এত গৌরচন্দ্রিকার কারণ জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের রচনা। ভদ্রলোক জ্ঞান গৌরবে না হোক, বুদ্ধি (করিৎকর্মা) ও প্রচলিত জগৎএর গণিতটা ভাল বোঝার জন্য, মোটা হরফেই ছিলেন। আর এটাই ছিলো তাঁর তুরুপের তাস। বহু পণ্ডিতজী এবং উস্তাদরা কোলকাতার আসরে পাত পাওয়ার সুযোগ যাতে না হারান তার জন্য সঙ্গীত-এর এই ক্ষীণ স্বাস্থ্য ভদ্রলোককে দাদা কিংবা বাবু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

বাবা সব গণিতই বুঝতেন, কিন্তু অশুভংকরী অঙ্কে তাঁর মাথাটা ছিলো মোটা। পরিস্থিতি বেয়াড়া হলে, বাবা স্টেজ ম্যানেজ আর সোম্যানসিপ দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে পারতেন না। বোঝাবার চেষ্টা করলে বলতেন, 'ওরে বাবা, ও সব শঙ্করদেরই শোভা পায়। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

যাক যে কথা বলছিলাম। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় স্মৃতিচারণ প্রকাশ করছেন। তা বেশ লিখুন না। আপত্তি কোথায়? কিন্তু চমক লাগলো যখন দেখলাম, বাবা প্রসঙ্গে সত্য ঘটনাকে লুকিয়ে মিথ্যের বেসাতি করেছেন ভদ্রলোক। কথায় বলে একটি মিথ্যে ঢাকতে, অনেক মিথ্যা বলতে হয়, আর মিথ্যার সবচেয়ে বড় গুণ যে, সেটা হয় পরস্পর বিরোধী। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেও স্মৃতিচারণ করতে হচ্ছে যাতে ইতিহাস বিকৃত না হয়। দীর্ঘবত্রিশ বছর আগে কোলকাতা থেকে মৈহারে এসে বাবা আমাকে যা বলেছিলেন, সে কথাটায় সামান্য উত্তেজনা ছিলো, কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এতদিন পরে বাধল ঝামেলা। জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ সাপ্তাহিক পত্রিকায় বেশ ফলাও করে আত্মঘোষণা করেছেন, 'বাবা ত্রিতালেই বাজাচ্ছিলেন কিন্তু ঠকাবার জন্য একবার খালিকে সোম এবং সোমকে খালি দেখাচ্ছিলেন।' উপরন্তু বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কি বেতালা হয়ে আমাকে বেতালা প্রমাণ করতে চাইছিলেন।' উত্তরে নাকি বাবা বলেছিলেন, 'না বাবা, আমরা করে থাকি মাঝে মাঝে, তবে আপনার সঙ্গে করি নাই।'

উপরোক্ত কথাটি হয় নির্বোধের পরিচয় বা আহাম্মুকি। কারণ নিজেকে বেতালা করে তবলাবাদককে বেতালা করাটার কোন যুক্তিই নাই। যে কোন সঙ্গীতের গুণীই এটা বুঝতে পারবেন। এর পরে জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ লিখেছেন, 'আসলে ওঁরা মাঝে মাঝে এমন বন্দিশ বাজাতেন, যখন সোমের স্থানটা একবার ফাঁকে এসে পড়ে, আবার ফিরে ফিরে যথাস্থানে পৌঁছে যায়। সে ক্ষেত্রে তবলাবাদকেরা ঘাবড়ে গিয়ে, সোম ফাঁকের গণ্ডগোলে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।' এ ছাড়া আরো লিখেছেন, 'বাবা নাকি এই রকম অনেক তবলাবাদককে নাস্তানাবুদ করেছেন, নিকৃষ্ট প্রমাণ করে উঁচুতে উঠবেন বলে। পুরোনো কালে অনেক উস্তাদদের এই বদ অভ্যাসটি ছিলো।'

এইখানেই জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ক্ষান্ত হন নি। কেননা তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন যখন বাবা মাথার টুপি খুলে আরক্ত মুখমণ্ডল রুমাল দিয়ে মুছে বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমি কি বাজাইব। তবলায় আপনার ডাঁয়া, বাঁয়া কোনটাইতে ঠিক হয় না অথচ আপনি তো কোলকাতার উস্তাদ হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকবার এই কথা বলে শেষ পর্যন্ত উনি কোল থেকে সরোদটি ফরাসের উপর নামিয়ে রাখলেন।'

এইখানে এই উক্তির দ্বারাই, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষের 'অসত্য' প্রমাণিত হয়ে যায়। যদি বেতালা হয়ে বাবা জ্ঞান প্রকাশ ঘোষকে বেতালা করেন কিংবা সোমকে ফাঁক অথবা ফাঁককে সোম দেখান, তাহলে বাবা এ কথা কেন বলতে যাবেন, 'আপনার ডাঁয়া বাঁয়া কোনটাইতো ঠিক হয় না। আসলে বাবার গৎএর বন্দিশের সঙ্গে, ত্রিতালের ঠেকার পরিবর্তে অদ্ধার ঠেকা

তিনি বাজাতে বলেছিলেন। বাঁয়াকে দাবিয়ে না বাজালে গৎএর মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়, যার জন্য বাবা মন্তব্য করেছিলেন।

এ বিষয়ে আর একটি কথা পরিষ্কার বলতে চাই। উপরোক্ত জলসায় বহু গুণী লোক ছিলেন, তাঁদের কাছেও আমি এই ঘটনাটা শুনেছি। যে সময় আমি ইংরেজীতে বাবার উপর বই লিখেছিলাম, সেই সময় ভারতের প্রায় বহু সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট প্রতিবেদক হয়ে ঘটনা সংগ্রহ করেছিলাম। আমার লেখা ইংরেজী বইটিতে, তবলা বাদকের নাম এবং উপরোক্ত ঘটনাটি না লিখে কেবল লিখেছিলাম, 'এই অদ্ধা ঠেকায়, প্রায় সব তবলা বাদকই বাবার মনের মতো ঠেকা দিতে পারতেন না। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি কণ্ঠে মহারাজকে।' কিন্তু জ্ঞান প্রকাশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নিজেই করেছেন, তাই আমার প্রত্যুত্তরটা তাঁকে সহজ ভাবে নিতে হবে।' উপরোক্ত আরও লিখেছেন, 'আমি সহস্র সহস্র উৎসুক শ্রোতার মধ্যে খাঁ সাহেবের পদধূলি গ্রহণ করে আসরে বাজাতে বসলাম এই বলে, 'খাঁ সাহেব, আপনার সঙ্গে তবলা বাজাবার এই বিশেষ সৌভাগ্য তো আমার হোল, এখন আপনি দয়া করে আমাকে অনুমতি দেন তো একটু সাথ সঙ্গতের অর্থাৎ সওয়াল জবাবের চেষ্টা করি, ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন।'

হায় রে মূঢ়। সাথ সঙ্গত এবং সওয়াল জবাব কি এক জিনিষ? ভারতের যত বড়ই সঙ্গতকার হোক না কেন, কোন বাদকের সঙ্গে সাথ সঙ্গত এবং হুবহু সওয়াল জবাব করতে পারা অসম্ভব। তবে এটা ঠিক যাঁরা যথার্থই গুণী সঙ্গতকার, তাঁরা শতকরা নব্বই ভাগ করতে পারতেন। এইখানেই সব সঙ্গতকাররা জব্দ হতেন যখন সওয়াল জবাব বাবা ঝালাতে বাজাতেন। ছোট ছোট এক আবৃত্তির বোল বাজিয়ে, তবলা বাদককে বলতেন, জবাব দেবার জন্য। ঠিক না হলে বাবা তবলায় কি বোল বাজাতে হবে বলতেন। না পারলে বলতেন, 'নহিঁ হুয়া অর্থাৎ হোলো না।' ঠিক বাজালে বাবা খুবই আনন্দিত হতেন। এ তো হোল সওয়াল জবাবের ব্যাপার।

এবারে সাথ সঙ্গতের কথা বলি। সাথ সঙ্গতে তবলা বাদককে জব্দ করা মানে, অপমান করা নয়। ফুটবল খেলায় যেমন ড্রিবলিং করে বিপক্ষকে ডজ দেওয়া হয়, সেইরকম সঙ্গীতে সাথ সঙ্গত, বাবার ধোঁকা দেওয়া, দর্শকরাও খুবই উপভোগ করতেন। এবারে একটা কথা বলেই এই প্রসঙ্গের ইতি করব। এ রকম বহু ঘটনা বাবার জীবনে হয়েছে। যখনই কোন তবলাবাদকের বেআদবি দেখেছেন, তখনই তাঁকে জব্দ করেছেন, আবার যখনই কোন সাধারণ তবলাবাদককে নম্র দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে সেইরকমই বাজিয়েছেন।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে বাবা পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু যতই বিনয় করে জ্ঞান প্রকাশ বলুন না কেন, 'আমাকে অনুমতি দেন তো একটু সাথ সঙ্গত অর্থাৎ সওয়াল জবাবের চেষ্টা করি,' এই কথায় বাবার কাছে অগ্নিতে ঘৃত পড়েছে। তা সত্ত্বেও বাবা ক্ষমা করেছেন পুত্রস্নেহে, নইলে এক ঘণ্টা সহজ ভাবে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ-এর সঙ্গত করা সম্ভব হ'তো না। কিন্তু যখন ঠেকা বলে দেওয়াতে ঠেকা লাগাতে পারেন নি তখন বাবার মাথা খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়। বাবা আদ্ধাতে যে গৎটি বাজাতেন, তার নাম রেখেছিলেন দাদু নাতির গৎ। বাবার বড় নাতি আশিসের সঙ্গে এই গৎ বাজিয়ে বলতেন, এ হোল শৃঙ্গার রস। সবচেয়ে

বড় কথা, এই জলসায় বাবা আশিসকে নিয়ে এই গৎ বাজিয়েছিলেন। মৈহারে যাবার আগে, কাশীতে বাবা কণ্ঠে মহারাজের সঙ্গে অদ্ধার ঠেকা বলে দিয়ে বাজিয়েছিলেন। সমস্ত শ্রোতাদের আমি দুলতে দেখেছিলাম, সে কথা আগেই লিখেছি।

যাক এ তো গেল মূল ঘটনা। শুধু এইটুকু লিখে যদি জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ ক্ষান্ত হতেন, তাহলে হয়ত আমাকে কালি খরচা করতে হ'তো না। কিন্তু ভদ্রলোকের কপাল খারাপ। তাই আগ বাড়িয়ে আরো লিখে বসেছেন, 'যাই হোক রবিশঙ্কর তো কোলকাতায় চলে এলেন। কোলকাতায় এসে খাঁ সাহেবকে নিয়ে অ্যামবেসেডার হোটেলে আলি আকবরের কামরায় আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। এঁরা দুজনেই আমার বিশেষ বন্ধুও। স্নেহভাজন নিকটের লোক ছিলেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমার ঝগড়া করবার কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমি চেয়েছিলাম উনি যেন বুঝতে পারেন এই কাজটা ভাল করেন নি। আলাউদ্দিন খাঁ হোটেলে এসে, আলি আকবরের ঘরে ঢুকেই কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং স্বভাবতই আমার সংকোচ ও লজ্জার সীমা রইল না। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত থেকে নড়লাম না।' খাঁ সাহেব বললেন, 'না বাবা আমি কিছু করি নাই আপনার সঙ্গে, আপনি মাফ করুন।' আমি বললাম, 'মাফ করবো? কি সর্বনাশ। আপনি আমার বাবার চেয়ে বড়ো আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন? আপনি কি করেছেন যে ক্ষমা চাইবেন। যদি মনে করেন আপনি ক্ষমাপ্রার্থী, তাহলে কি অন্যায়টা আপনি করেছেন, নিশ্চয়ই কিছু করেছেন, কিন্তু সেটা কি আমি জানতে চাই?' উনি বললেন, 'না বাবা আমি আপনার সঙ্গে কিছু করি নাই।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তিনতালেই বাজাচ্ছিলেন তো?' উনি বললেন, 'হ্যাঁ বাবা তিনতালেই বাজাচ্ছিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি তো তিনতালের ঠেকা দিচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে আমি দেখলাম হঠাৎ আমার সোমের সময় আপনি খালি দেখাচ্ছেন, সেটা কি করে? আপনি কি ইচ্ছা করে নিজে বেতালা হয়ে আমাকে বেতালা প্রমাণ করতে চাইছিলেন নাকি? ঘটনাটা কি হচ্ছিল?' উনি বললেন, 'না বাবা, আমরা করে থাকি মাঝে মাঝে, তবে আপনার সঙ্গে করি নাই।' আসলে ওঁরা মাঝে মাঝে এমন বন্দিশ বাজাতেন যখন সোমের স্থানটা একবার ফাঁকে এসে পড়ে আবার ফিরে ফিরে যথাস্থানে পৌঁছে যায়। সে ক্ষেত্রে তবলাবাদকের ঘাবড়ে গিয়ে সোম ফাঁকের গণ্ডগোলে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যাইহোক শেষ পর্যন্ত উনি এর বেশী কিছু বললেন না। বার বার এক কথা, 'আপনার সঙ্গে করি নাই।' আমি তাঁকে প্রণাম করে ঐ ঘটনার ইতি টানলাম।

এটা পড়ে মনে মনে সাধুবাদ জানিয়েছি। ব্যাপারটা উটপাখির মতন হয়েছে। বালুতে মুখ গুঁজে ঝড়কে অস্বীকার করার মত। ইংরেজীতে হলে বলতাম, ফেস সেভিং। বাবার পক্ষে এটা খুব আশ্চর্য নয় যে পুত্রের বয়সী কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া। এতে তাঁর পিতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হ'তো না। কিন্তু কি দারুণ ধৃষ্টতা যে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভদ্রলোক, 'অপদস্থ করার কারণটা কি? অবাক হয়ে ভাবি সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবিশঙ্কর এবং আলিআকবর। তাঁরাই বা কেন? তাঁদের কোন সামান্য ছাত্রই এই উত্তরটা দিতে পারতো অবলীলাক্রমে। সবিনয়ে বলতে পারত যে যিনি অদ্ধার ঠেকা বোঝেন না, তাঁর কাছে সোম বিষমের গৎটা হিব্রু, তার জীবনে চামড়া পেটানই সার হয়েছে। বাদক হওয়া তো দূর অস্ত। কিন্তু কি

বেদনার, (যদি ভদ্রলোক সত্যি কথা লিখে থাকেন) বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, 'অন্যের সঙ্গে করলেও আপনার সঙ্গে করি নাই, আর সেখানে তাঁর যশস্বী পুত্র এবং জামাতা উপস্থিত ছিলেন ভাবতেও দুঃখ হয়। কারণ গুরু যদিও শান্তির স্বার্থে দুষ্টকে বিনয় করেছিলেন, কিন্তু বীর্যবান সন্ততিরা কি করে মুখ বুজে ছিলেন? এ ঘটনায় যে কোন ঘোষিত কাপুরুষ নিজেকে পুরুষ ভাববে এঁদের তুলনায়। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রতিবাদে এঁরা মুখর হয় নি কেন? কিম্ আশ্চর্যম!

কিন্তু এই জ্ঞান প্রকাশ ঘোষকে নিয়ে হোল আমার বিড়ম্বনা। এমন খুঁচিয়ে ঘা করলেন উনি, যে বহু যুগ আগেকার কথা মনে পড়ে গেলো। যখন বাচ্চারা দুলে দুলে পড়ত,

আপনারে যে বড় বলে, বড় সেই নয়
লোকে যাঁরে বড় বলে, বড় সেই হয়।

বাবা বাজালেন আদ্ধা আর তবলাবাদক বুঝলেন তিনতাল। বাবার সহজ সরলতার সুযোগ নিয়ে, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ কেস করার ধমকি দিলেন এবং করলেনও। আর যেই দেখলেন বাঁশটা ভাঙ্গতে রাজী আছে, মচকাতে নয়, তখন শঠের সাহায্যে আপোষের রাস্তা ধরলেন। ভাবটা এই ছিলো, যাক বয়সের বড় তাই মিটমাট করে নিচ্ছি, কিন্তু ঘটনাটা তো ভিন্ন। ঘোষ মশায়ের উকিলের চিঠির জবাবে, বাবাও দিলেন উকিলের চিঠি। নজরুলের কবিতার একটা পংক্তির মতো,

যেই বলি প্রিয়ে হাটে ভাঙ্গি হাঁড়ি
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।

এখানেও হোল তাই। আজকের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তথাকথিত রাজদূত রবিশঙ্কর 'ঘোষ' দূত হয়ে শান্তি পর্ব শুরু করলেন। তার সাথে সাথেই বাবার সেই উকিল অনুজটিকে টেলিফোন করলেন, ওখানেই ক্ষান্ত হতে। ইচ্ছে করলে সেই হলপনামার কপিটাও ছাপতে পারি। কিন্তু অপরে অধম বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

এ তো গেল বাবার প্রসঙ্গ। যদি ধান ভাঙ্গার সঙ্গে শিবের গীতের কোন সম্পর্ক থাকত, তাহলে লিখতাম ওঁঙ্কার নাথ ঠাকুর স্বমহিমায় যে পর্যায়ে উঠেছিলেন, তাঁর অনোখেলালকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বেতালা করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। বরেণ্য সরোদ বাদক উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ কখনই এত আর্থিক অভাবে ছিলেন না, বা যশের অভাব ছিলো না যে, তিনি একটি কিশোরের কাছে সোনার মেডেলের আকাঙ্খা করবেন। ঠিক সেইরকমই আলিআকবরের এ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারেও এই চর্মযন্ত্রী ভদ্রলোক কি বলে জানি না, যোগবলে বা গুণবলে স্বপক্ষে মুখর হলেন, আলিআকবরকে নিয়ে। কিন্তু নিজে যেহেতু খুব ছোট্ট খাট্ট, অর্থাৎ নিজের উপর বেশী ফেনান সম্ভব নয়, তাই সমকালীন শিল্পীদেরও তুলনাত্মক মূল্যাঙ্কনও তিনি করে ফেললেন। সেই করার ফাঁকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত গায়ের জ্বালা মিটিয়ে ফেললেন। এমন একজন শিল্পী অর্থাৎ আলি আকবর, যাঁকে বর্তমানে ভারতে কোন সঙ্গীত শিল্পী দুই নম্বর সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করবেন না। রাগের কারণ? যেহেতু আলিআকবর তাঁর ধামা ধরেন না। এই সংগ্রামে এমন একজন বয়স্ক শিল্পী অর্থাৎ সরোদ বাদক রাধিকা মৈত্রর সাথে তিনি

আলিআকবরের তুলনা করলেন, যাঁর বিরোধিতা করা আমার বা আলিআকবরের পক্ষে হোল ধর্মসংকট, কারণ যাঁকে উঁচু আসনেতে বসান হয়েছে, কয়েকটা আঙ্গিকের নিরিখে তিনি আমাদের বড় প্রিয়জন। আর তিনি আদৌ এই ধরনের ধৃষ্টতা পছন্দ করতেন না। ঘোষ মশায় আগ বাড়িয়ে লিখে ফেললেন, 'এটা হতেও তো পারে, আমাদের দেশে যে ভাবে সবাই দেখে বা বিচার করে। সঙ্গীতের তো কোন বিচারালয় নেই, কোন আদালত নেই, কোন আইন নেই, কোন আইনজ্ঞও নেই, কাজেই যাঁর যা খুশী তাই বলতে পারে।'

আমিও ঠিক সেই কথাই বলি। উস্তাদ বাবার গৎ এর ঠেকা বুঝতে না পেরে কেউ তাঁকে শঠ বলে, কেউ বা আলিআকবরের থেকেও রাধিকা মোহন মৈত্রকে অনেক জায়গায় চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে বা সঙ্গীতের কোন রাগরাগিনীর ব্যবহারিক যৌক্তিকতার দিকে, একটা উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সনাতনি পদ্ধতি অনুসারে, বাদনরীতিতে বেশী নম্বর দিতে পারে। আবার কেউ বা আধ মাত্রার তত্ত্ব না বুঝে গ্রাম্য উক্তি করে, এটায় আবার কি আছে? সত্যি বাক স্বাধীনতা ভালো কিন্তু বাচালদের জন্য নয়। পথচারীর স্বাধীনতা ভালো কিন্তু বেচালদের জন্য নয়। চিন্তার স্বাতন্ত্র ভালো কিন্তু পাগলদের জন্য নয়। আর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভালো কিন্তু স্বৈরতন্ত্রীর জন্য নয়।

লক্ষ্ণৌতে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে—

জিন্হে খড়ে হোনে কি অওকাত ন থি
ওহ ভি মহফিল সে উঠানে লগে।

এটাও লক্ষ্ণৌতে তহজীব-এ মৌসিকীর মধ্যেই পড়ে। আবার কে কোন বই লিখবে জানি না, তাই যে যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, যে কথাগুলো আমার ইংরেজী বইতে লিখিনি, ভাবছি এই বইতে যোগ করে দিই। তবলা তাড়নার পরিচ্ছেদ ইতি করতে ইচ্ছা থাকলেও একটা প্রসঙ্গকে এড়াতে পারছি না। তা হলো তহজীব এ মৌসিকীতে লেখা হলো, 'এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল তাঁর আগে দিলীপ রায় আমাকে বলেছিলেন, 'আলাউদ্দিন খাঁ কি ভাবে বিনা কারণে একটি আসরে পরেশ ভট্টাচার্যকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। কেবল অপমান করার জন্যই। পরেশ ভট্টাচার্যকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করে উনি উঁচুতে উঠবেন। এই রকম একটা প্রবৃত্তি ওঁর বরাবরই ছিলো। শুধু ওঁর নয় তখনকার দিনের অনেক উস্তাদেরই এই বদ অভ্যাসটি ছিলো।'

এই বদ উক্তিটি কে করেছে? কে এই দিলীপ রায়? এঁর কোন পরিচয় উল্লেখ নেই। কোলকাতার আশি লক্ষ বাঙ্গালীর ভিতরে এরকম নাম আর উপাধি যুক্ত লোক নিঃসন্দেহে সহস্রাধিক। আর যদি ইনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায় হন, তাহলেও একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যে, তিনি সৎসঙ্গে বাস করা সত্ত্বেও, এ ধরনের মিথ্যা কথা কি করে বলেছিলেন? আর একান্তই যদি বলে থাকেন তাহলে কিছু পুরোনো কবর খুঁড়ি। ওঁদের বাড়ীতে এরকম বলার অভ্যাস আছে। ওঁদের বাড়ীর চত্বরে, ওঁর পিতার জীবদ্দশাতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে নিয়েই নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই ক্যারিকেচার করা হ'তো। তা আমরা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা

'রবীন্দ্র স্মৃতির' একশো যোল থেকে একশো একুশ পাতার মধ্যে পাই। কিছু অংশ পাঠকদের অনুধাবনের জন্য হুবহু তুলে দিলাম। সুপণ্ডিত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলালের এ ধৃষ্টতা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি ঐ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখা লিখে প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে ললিত কুমার লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্যের কালমেঘরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য আকাশে উদিত।'

মানসী পত্রিকার অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত দ্বিজেন্দ্রলালের এ প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটা সার কথা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'রামায়ণ হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল সীতা নাট্য কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। সে নাট্য কাব্যে একটি দৃশ্যে রামচন্দ্র অত্যন্ত অপরাধীর মত বসিয়া আছেন, ...আর লব লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়িতেছেন। কি বলবো, তুমি বাবা ...তাই বয়সে বড় ...তাই তোমাকে মায়া করতে হচ্ছে ...না হলে যে অন্যায় করেছো তার জন্য দ্যাখো, লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তোমার ছেলে বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।' রাম সমস্ত দোষ কবুল করে বললেন, 'বাবা লব, আমার দোষ হয়েছ ...ঘাট হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মীকিকেও টেক্কা দিয়েছেন।"

এই সীতা নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে আর একজন সমালোচক লিখেছিলেন "এ রামচন্দ্রের ছেলে লব! আশ্চর্য! মুখের কথা মেথর-মুর্দা ফরাসের ঘরের ছেলের মতন।"

ডি. এল. রায়ের ঝাঁঝ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ যখন ওঁনার হাতে ক্ষমা পান নি, তো ওনার পুত্র বাবাকে যদি আক্রমণ করেন তা হলে সেটা কিছু নূতনত্বের কথা নয়। আসল কথা আক্রমণ করাটা ওঁদের পুরোনো স্বভাব। এই সব ঘটনা থেকে বাবার চরিত্রের প্রতি নিন্দাবর্ষণের কিছুটা রূপ পাঠকরা বুঝতে পারবেন। প্রশ্নটা হোল এই যে, আমি এখন যা লিখব তার ক্রনোলজি রাখা অত্যন্ত কঠিন। তথাপি চেষ্টা করব। সেই সময়টা তুলে ধরা যে সময়টা আমার মৈহার যাবার আগে এবং যে ঘটনাগুলো বাবার মুখে বহুবার শোনা, কিন্তু লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাই নি। উনপঞ্চাশ সালের পর থেকে সব কিছুরই একটা ধারাবাহিক হিসাব আমার কাছে আছে। যা ছিলো না, তা নিয়েই এতো মাথা ঘামানো। আজ পর্যন্ত যখনই বিরূপ মন্তব্য কখনও কোন ম্যাগাজিনে বা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, সেগুলোর কোন মহত্ব এঁরা দেয় নি। বললে, তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়েছে এই বলে, দুষ্ট লোকেরা এ রকম করেই থাকে। যখনই প্রতিবাদ করে বলেছি, 'যদি এই ধরনের ভুল তথ্য পত্র পত্রিকায় বেরোয় তাহলে কি ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা হচ্ছে না?' তারও উত্তর পেয়েছি, 'উপায় কি?' ভেবে দেখেছি, উপায় হোল লেখনী দিয়েই এর উত্তর দেওয়া, যাতে আগামীকালের সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা প্রকৃত তথ্য বুঝতে পারে।

৭৪

একবার মৈহারের বাঙ্গালী বাসিন্দা বাগচি বাবু (যাঁকে বাবা জামাই বলে ডাকতেন) বাবার কাছে এসে কথাচ্ছলে বললেন, 'বাবা আপনি তো ভারতে পদ্মভূষণ থেকে ভারতের সব জায়গায় বহু উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন। একজন শিল্পীর জন্য এর চেয়ে আর বড় কি হতে পারে? আপনার এই সব উপাধি পাওয়ায়, আমরাও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আচ্ছা

বাবা, এই সব উপাধি পেয়ে আপনার কি মনে হয়?' বাবা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'শিল্পীর কাছ থেকে ওই সব উপাধি তুচ্ছ। সঙ্গীতে সেই প্রকৃত শিল্পী, যে গান বা বাজনা বাজিয়ে নিজে কাঁদতে পারে এবং অপরকে কাঁদাতে পারে। আমি তো বাবা সে রকম শিল্পী এই জন্মে হতে পারলাম না। তবে এটা ঠিক, যে সত্যিকারের সঙ্গীতের পূজারী সে কখনই সঙ্গীতের বড় পুরস্কার পেয়ে ধন্য হয় না। সঙ্গীতের প্রশংসা বা পুরস্কার শিল্পীকে বিপথে চালিত করে। যখন সত্যিকারের সঙ্গীতের ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন মনে হোল এইবার রিয়াজ করি। কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি, সাধনা করবার শক্তি এখন নাই। তবে এটা ঠিক, যাঁরা এই ভূয়োসী প্রশংসা পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে তাঁরা কখনই সঙ্গীতের সমুদ্রে লীন হতে পারে না। ছোট পুকুর হয়েই থাকে। সঙ্গীতজ্ঞদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই পরমেশ্বরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করা যাতে সঙ্গীতের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।'

কথা প্রসঙ্গে বাবা বললেন, 'আগেকার যুগে সঙ্গীতজ্ঞরা সারা জীবন সাধনা করে তবেই পরমেশ্বরের কৃপা পেয়েছেন কিন্তু আজকালকার গায়ক, বাদক, সরফরাজরা কিছুদিন গান বাজনা করে জলসায় বাজিয়ে ভূয়ো প্রশংসা পেয়েই নিজেকে তালগাছের মত বড় মনে করে। অথচ তাঁরা বোঝে না, সঙ্গীতজ্ঞদের জন্য এই প্রশংসাই সবচেয়ে বড় শত্রু।

উপরোক্ত যে ঘটনাটা বললাম, এরকম বহু ঘটনা আছে, যা শুনে আমি বরাবরই অবাক হয়েছি, এই জীবন-দর্শন বাবা কোথায় পেলেন? বাবা লেখাপড়া করেন নি। বাবাকে যখনই জিজ্ঞাসা করা হ'তো এ সব কথা কার কাছে শুনেছেন বা পড়েছেন, উত্তরে বরাবরই বাবা বলতেন, 'মা সারদা দেবী বা আল্লাই এই সব কথা আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে দেন।'

শিক্ষাকালীন বাবা একটা কথা প্রায়ই বলতেন, 'এরোপ্লেনে চড়ে এক মিনিটে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায় অর্থাৎ জোরে দৌড়ান সহজ কিন্তু নদীর ভিতর ডুবকি লাগিয়ে পদ্মাসনে বসে কতক্ষণ থাকতে পারো দেখো তো? সাধনার সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে যে যতক্ষণ ডুবে থাকতে পারবে, সেই জানবে সত্যিকারের সঙ্গীতের ভিতর প্রবেশ করতে পারবে। অতি বিলম্বিতে এক ঘণ্টা একটা গৎ নানা রকমভাবে পুনরাবৃত্তি না করে বাজাও তো? যে দিন বাজাতে পারবে সে দিন বুঝবে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করেছ। তৈরী বাজাচ্ছ ফুরফুর করে অথচ 'ডা রা' বাজাবার সময় 'রা' টাই শোনা যাচ্ছে না। বোল বাজাচ্ছ, বোলও পরিষ্কার বেরোচ্ছে না। সে তৈরীর কোন মূল্য নাই। তা বলে এই নয় যে তৈরী বাজাতে বলছি না। তৈরী বাজাও, কিন্তু প্রত্যেকটা বোল দানা দানা হয়ে বেরোবে, তবেই সে বাজনা সার্থক।'

উনিশশো ঊনপঞ্চাশ সনে গোড়ার দিকে বাবা গেছেন বম্বে। বাবাকে একজন বলেছেন, এক ভদ্রলোক কয়েকজন শিল্পীর রেকর্ড করবেন, তাতে বাবাকে বাজাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বাাব রাজী হয়ে গিয়েছেন রেকর্ড করতে। বাবা গিয়ে বসে আছেন রেকর্ড হবে বলে। বাবার সামনে এক এক শিল্পীকে ডাকছে এবং তাঁর রেকর্ড হচ্ছে। সকলকেই ডাকা হচ্ছে অথচ বাবাকে ডাকা হচ্ছে না। মনে মনে বাবা চটছেন, কেননা যে ঘরে বাবাকে বসান হয়েছে, তার পাশেই ল্যাটরিন, যার জন্য দুর্গন্ধ আসছে। যে ভদ্রলোক এক এক করে শিল্পীকে ডাকছিলেন, তাঁকে দেখতে পেয়েই বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই রকম দুর্গন্ধ জায়গায় বসে থাকতে এই

বুড়ো বয়সে আমার কষ্ট হচ্ছে। দয়া করে আমার রেকর্ডটা আগে করে নিন।' বাবার এই কথা শুনে রেকর্ড করবার জন্য যিনি ডাকছিলেন তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'প্রত্যেক শিল্পীকে এক হাজার টাকা বাজাবার জন্য দিচ্ছি কিন্তু যেহেতু আপনি প্রবীণ, সেইজন্য সর্বশেষে ভালকরে আপনার রেকর্ড করব। আপনার পারিশ্রমিকও সকলের চেয়ে অনেক বেশী দেব।' বাবা এই কথা শুনে বললেন, 'আপনি কে?' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম মধু বোস। আমি হলাম সাধনা দেবীর স্বামী।' বাবা তাঁর শিষ্য তিমির বরণের কাছে সাধনা দেবীর নাম শুনেছিলেন, তাই মধু বোসের কথা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমার সর্বনাশ করবার জন্য আমাকে ডেকেছেন।' এই কথা বলেই বাবা সরোদ নিয়ে প্রস্থান করলেন। বাবার এই মেজাজ দেখে তিমির বরণ পালিয়ে গেলেন। আসলে সিনেমার প্রসিদ্ধ পরিচালক মধু বোস 'ইনস্ট্রুমেনটস অফ ইনডিয়া' এই নামে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরী করবেন বলে তিমিরবরণ ভট্টাচার্যকে বাবার কথা বলেন। তিমির বরণ বাবাকে ডকুমেটারি ফিল্ম-এর কথা বলেন নি। ভেবেছিলেন বাবা ভাল টাকা পাবেন, সেইজন্য কেবল রেকর্ড এর কথা বলেছিলেন। কিন্তু অঘটন দেখেই তিমির বরণের পলায়ন।

আলম থেকে আলাউদ্দিন, এবং সব শেষে বাবা। এ এক বিচিত্র ক্রমবিকাশ। যদিও ছাব্বিশ তারের যন্ত্র বাজাতেন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনটা ছিলো বাউলের একতারা। আর তাতে বাঁধা ছিলো 'নূর এ ইলাহি' বা দিব্য জ্যোতির অকৃপণ কৃপার প্রতি অকুণ্ঠ অভিবাদন। ঠিক জানা যায় না, যে কে বা কারা, এ তথ্য বাবাকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা বা প্রকাশ, শুধু মাত্র আকাশ থেকে ঝরে না, প্রাণীমাত্রের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব। তাই ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ, যে মানুষই বাবার জীবনে এসেছে, বাবা তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনীত আচরণ করতেন।

বাবা চেয়েছিলেন, সেই মাটির পরে লুটিয়ে থাকতে, সব যাত্রীদলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন,

'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার বাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে সব হারাদের মাঝে।'

সেইজন্য জীবনে যাঁর কাছে যৎসামান্য সাহায্য বা কৃপা পেয়েছেন, সেটাকে পরমের কৃপা মনে করে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করেছেন। আজীবন কৃতজ্ঞ চিত্তে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর ভেবে জনসমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে উদার ভাবে স্বীকার করেছেন, অমুক আমার জন্য যা করেছেন, তা অতুলনীয়।

এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। এর ভিতরে একটা মজার দিক আছে। বাবা বলতেন, 'সূর্য সম্পূর্ণ জগৎটাকে আলো দেয়। তাঁর হয়ত তোমার মতো এক আঁচলা জলের প্রয়োজনীয়তা নেই। তাবলে তুমি দেবে না কেন? তোমার যতটা ক্ষমতা সেটাকেই নিবেদন কর। আর এই দেওয়ার ব্যাপারে বাবার কোন কৃপণতা ছিলো না। আমি দেখেছি গৃহকাজের জন্য এক বস্তা বালি কেনার পর, যে সেটা দিয়ে গেল বাবা তাঁকে চারটে আতা দিতেন।

সে যদি বলতো, 'পয়সা তো দিয়েছেন, এটার আবার দরকার কি?' বাবার বিনীত উত্তর, 'সাথে করে নিয়ে এসেছ তো? তোমাকে দেখতে পেলাম। এটাই আমার আনন্দ।' লেন দেনের হিসাবের বাইরে মানুষকে এই যে ভালবাসা, এটাই বাবার বৈশিষ্ট্য। সকলকে ভালবেসে আনন্দ পেতেন। জগতের মধ্যে জগন্নাথ দর্শনের আনন্দ।

আর এই আনন্দের ঠেলায় মাঝে মাঝে ভ্রান্তিবিলাস হ'তো। কখনও পথ নিজেকে দেব ভাবতো, কখনও রথ, কখনও মূর্তি। আর অন্তর্যামী হতেন হতবাক।

শুধুমাত্র বস্তু দিয়েই নয়। বাবা সঙ্গীতের মাধ্যমেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাইতেন। কোলকাতায় দক্ষিণা রায়চৌধুরি বাবাকে পিতৃবৎ সম্মান করে শুধুমাত্র বাড়ীতেই রাখতেন তা নয়, অন্যান্য বহু ভাবে বাবাকে সাহায্য করতেন। তাই বাবাকে অনেক ভাবতে হ'তো কি ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো। বাবার মাথায় ঢুকলো সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্ভব। দক্ষিণারঞ্জনের ভগ্নি প্রতিমা রায় চৌধুরিকে সেতার শেখাতে লাগলেন। বাবা এতেই পরিতৃপ্ত। এরকম বিচিত্র পদ্ধতিতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। মৈহার থাকাকালীন সঙ্গীত জগতের শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ছিলো না। বাবা বলেছিলেন, 'মৈহার থেকে বাইরে গিয়ে দেখবে সঙ্গীতের মধ্যে কত পারটি।' মৈহার ছাড়ার এক বছরের পর থেকে আজ পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতা হোল। অবাক হলাম। এখানে সবাই যে যাঁর ধান্দায় ঘুরছে। অবাক হয়ে ভাবি, এ যাবৎ বাবার মত ঋষিতুল্য একটা শিল্পীকেও তো চোখে পড়লো না। মৈহার ছাড়ার পর সাতাশ বছরের মধ্যে, সঙ্গীত জগৎটার কত পরিবর্তন চোখে পড়ল। কোথায় গেল সেই সব সঙ্গীত শ্রোতা? কোথায় গেলো সেই বড় বড় কনফারেন্সের আড়ম্বর? কোথায় গেল সেই সব আত্মভোলা শিল্পীরা? এখন আর সেই পুরোনো দিনের ঐতিহ্য যেন চেনা যায় না। কিন্তু কেন এমন হোল? কারা এর জন্য দায়ী? আসলে এখন যুগ পালটেছে। একজন আমায় সাক্ষাৎকারে বললেন, 'আজকের যুগে আসল কথা হোল টাকা। টাকা থাকলে, জ্ঞান, বুদ্ধি, মান সম্মান, প্রতিপত্তি সব আপনার থাকল। আর টাকা না থাকলে নিজের জনেরাও চিবোনো ছিবড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আপনি ওই সব আদর্শের কথা ভুলে যান। যেন তেন প্রকারেণ টাকা কামান, যেমন সকলে করছে। আপনি কি সকলের থেকে বাইরে। আদর্শ নিয়ে থাকলে না খেতে পেয়ে মরবেন।' শুনে অবাক হলাম, টাকা কামাবার জন্য সেসব ঘৃণ্য উপায়গুলি ভদ্রলোক বললেন। কথায় আছে—'দারিদ্র দোষোগুণ রাশি নাশি'। অভাবের আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগেকার কালে কত সঙ্গীতজ্ঞের অন্তিম পরিণতি কতই দুঃসহ ছিলো ভাবলেও কষ্ট হয়। কিন্তু তখন শুনতাম সঙ্গীতের প্রাণ ছিলো। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে একটু শিক্ষা করেই শ্যোম্যানশিপ দ্বারা কিস্তিমাৎ করতে চায়। বোধ হয় এর জন্যই সঙ্গীতের এই অবস্থা। বাবার কথাই ঠিক। পারটি পারটি করেই সঙ্গীত রসাতলে যাচ্ছে।

বাবার জীবনের অনেক ঘটনার মণিমুক্তো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র লোকের জীবনে। মানুষের মনের খনিতে যে হীরের কণা কয়লার সঙ্গে মিশে আছে তাঁকে উদ্ধার করা কর্তব্য বলে মনে করছি। উদ্দেশ্য বাবার জীবনের বহুমুখিতাকে প্রদর্শিত করা।

গাছ পাথরের মত বাবা বাঁচেন নি। মানুষের মত বেঁচেছিলেন, মানুষের জগতে। বাবা

বলতেন, 'কারোর সাথে পরিচয় হলে তাঁকে শুধু নাম ধরে ডাকাটা অসভ্যতা।' তাই সম্বন্ধের কারণ প্রয়োগ করতেন—কাউকে বাবা, কাউকে মা, কাউকে ছেলে, কাউকে মেয়ে আবার কাউকে জামাই। এই সম্বন্ধগুলো শুধুমাত্র শাব্দিক ছিলো না। এগুলো ছিল বাবার অন্তরের অন্তঃস্থলের প্রকাশ। যে হেতু নামের সঙ্গে বাবা সর্বনাম যোগাড় করতেন, বাবা নিজেও বাবা শব্দের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন অজান্তে। উনি সব সম্বোধিতের কাছেই শ্রদ্ধা পেয়েছেন আর স্নেহ বিতরণ করেছেন। সকলকে শুধু একজনের অপরাধে সহ্যের চরম সীমা পর্যন্ত কণ্ঠরুদ্ধ রাখার পর, বাবা জীবনে একবার মুখর হয়েছিলেন তাঁর স্বরে 'কাফের' শব্দে।

লোকে বলে মহাপুরুষের জুতো খেলেও সম্মান বাড়ে। তাই সেই পাদুকা সেবী কৃতঘ্নের নাম নিয়ে তাঁকে গৌরবান্বিত করতে চাই না। আঁস্তাকুড় ঘাঁটলেও শরীর অপবিত্র হয়।

বাবার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শুনেছি মৈহারের বয়োবৃদ্ধ এবং ব্যাণ্ড পারটির বাদকদের কাছে। সেই সব ঘটনার সাক্ষী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুই তিনজন ছাড়া সকলেই পরলোক গমন করেছেন। মৈহারের প্রবীণ লোকেদের কাছে যে সময় সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তাঁদের কাছে সকলকেই দেখেছি অকপটে বাবার কথা বলেছেন। তাঁদের নিজের জয়ঢাক পিটোতে দেখি নি। যে সব কথা শুনেছি সেই সব ঘটনার থেকে বাবার চরিত্র পাঠকরা বুঝতে পারবেন। স্বাভাবিক নিয়মে চললে আমার লেখার গঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হ'তো। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ কি সব সময় নির্দিষ্ট খাতে বয়? বিশেষ করে সে যদি বাবার মত চরিত্র বিষয়ক হয়। এখানেও হোল তাই। যখন অজস্র সাক্ষাৎকার আর বাবার লেখা 'আমরা জীবনী' পেলাম, তখন উত্তর বাহিনী হতে হচ্ছে।

মাথায় ঢুকল, দেখি না একবার জল দুধকে আলাদা করে? কিছু ছিল বাদ আর কিছুটা বিবাদ। ভাবলাম সব বাদকেই খুঁজেই দেখি। আবার হোল বাবার দুই জায়গায় প্রকাশিত বিস্তৃত আত্মজীবনী, তাঁর নিজের লেখা, আমার নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলি আর অজস্র তথ্য— বিকৃত তথাকথিত 'ইন্টারভিউ'।

যে বইটার সাহায্যে ভুল বা ঠিককে স্থির করতে পারতাম, সেই রচনাটি অর্থাৎ বাবার লেখা 'আমার জীবনী' আমাকে পেতে হোল আলিআকবরের সৌজন্যে। মূল পাণ্ডুলিপিটা যদিও আমি ষাটদশকের মাঝামাঝি মৈহারে গিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু যখন আমি কপি পেলাম তখন দেখলাম নকলনবীশ নকল করার প্রাথমিক সর্তটাই ভুলে গিয়েছেন। অর্থাৎ হুবহু নকল না করে, তিনি হয় নিজের বুদ্ধিতে বা কারো নির্দেশে কপিটার সংক্ষিপ্ত সার করেছেন। যদিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি দ্বিতায়টাই সত্য। তার ফলে প্রচুর বেগ পেতে হোল। বেগ পাওয়ার মূল কারণ বাবা নিজে বিভিন্ন সময় নিজের সম্বন্ধে যে সব তথ্য পরিবেশিত করেছিলেন, তার সঙ্গে না মিলছে ঘটনায়, আর না মিলছে আঙ্গিকে।

বিস্তৃতভাবে আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একটা কথা না উল্লেখ করে পারছি না। তা হোল, যে বা যাঁরা বাবার লেখাটি এডিট বা এব্রিজড করার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা ব্যাঘ্র চর্মাবৃত গর্দভ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ বাবার কলমের কড়া চাবুক তাঁদের পিঠে পড়ামাত্র যে আর্ত্তনাদ হ'তো সে রাষভ স্বর বুঝতে কারোর অসুবিধা হ'তো না। যতটা এসটাব্লিসড

এবং এক্সপেকটেড সত্য, সে অংশগুলোকে পুনরাবৃত্তি দোষের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য হয় বাদ দেবো আর না হলে সংক্ষিপ্তসার করবো। মাত্র সেই বিষয়ই উল্লেখ করবো যা অনুল্লিখিত বা বিকৃতভাবে উপস্থাপিত।

শুরু করা যাক স্বলিখিত 'আমার জীবনী' থেকে। বাবার রামপুর অবস্থানকালীন যে কঠিন জীবনযাত্রা ছিলো, এবং যে বিষয়ে তিনি নিজের ছাত্রদের কাছে নিয়ত মুখর হতে কার্পণ্য করতেন না, বা এক কথায় বলা যায় প্রায় সব সময়েই উল্লেখ করতেন, বিচিত্রভাবে। সেই সব ঘটনাগুলি কেন তিনি নিজে লেখেন নি এই প্রশ্ন মনে জাগে। কখনও বাবা নিজেকে আচমকা বড় হয়েছেন এ প্রচার বাবা কখনও করেন নি। সেখানে এই তথ্যগুলোর লোভ আমাকে সংশয়াবিষ্ট করেছে। যেমন উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি রামপুরে থাকাকালীন শিক্ষার খুঁটিনাটি, বিভিন্ন রাতের বিবরণ, অহর্নিশি সাধনা, শিক্ষা সমাপন অন্তে কোলকাতায় গমন, মৈহারে আসার নিমিত্ত স্বরূপ ভদ্রলোকটি এবং মৈহারের প্রাথমিক দিনগুলো অজ্ঞাত কারণে লোপাট। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার সেইসব কথা একেবারেই নেই যা হোল তাঁর স্বজনদের কথা যেগুলো তিল তিল করে তাঁর প্রৌঢ়ত্ব আর বার্দ্ধক্যের দিনে জীবিত মানুষকে কফিনে শুইয়ে একটা একটা পেরেক পোঁতার মত ঘটেছে। বাবার মত জেদী দৃঢ়চেতা মানুষ কফিন ভাঙ্গতে পেরেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কলম দিয়ে মাকড়সার জাল ছিঁড়েছিলেন বিশ্বাস করি। সে তথ্য লোপাট।

প্রথম দিকের তথ্যগুলোকে লোপ করা হয়ত হীনমন্যতা বোধের জন্য, যা বাবার ছিলো না। ছিলো অনুলেখকের নির্দেশক মহাশয়ের আর শেষের তারগুলো ছিলো সত্যই ভয়ংকর, যা প্রকাশিত হলে এঁদের চাকচিৎকরে মাটির ভেতর থেকে খড় বেরিয়ে আসত।

বাবার জীবন থেকে ফ্যাক্ট গায়েব করে ফ্যানটাসির যোগ করা হয়ত নিজেদের স্বার্থে ভাল, কিন্তু শিক্ষানবিশের কাছে অশুভ। কারণ তাঁরা ধরে নেবেন সঙ্গীত আয়াসলব্ধ। বোধ হয় এর পেছনে একটা স্বার্থও আছে। আর তা হোল তথাকথিত কেষ্টবিষ্টুরা যে ভাবে সঙ্গীতকে মেড ইজি করছেন সেটা সম্ভব হ'তো না। মূল কথায় আসি।

সাধারণ অঙ্ক হিসাবে বাবার প্রাক্ রামপুর শিক্ষা বিভিন্ন জায়গায় মিলিয়ে বেশ কয়েকবছর হয়েছে। পূর্ণ যৌবনে গেছেন রামপুরে। সম্পূর্ণ আটতিরিশ বছর বা তার থেকে বাল্যে নটা বছর বাদ দিলে প্রায় তিরিশ বছর বাবার শিক্ষা জীবন। যে হেতু এই তিরিশটা বছর অত্যন্ত কঠিন, দুর্যোগপূর্ণ এবং বেদনাদায়ক ছিলো, তাই বাবার কাছে সেটা অন্ততঃ তিন যুগ ভাবা অস্বাভাবিক ছিলো না। একাদিক্রমে যদি আমরা মাস খানেক জাগি, তাহলে আমাদেরই মনে হবে বছর খানেক ঘুমোই নি। তাই বাবার পক্ষেও শোভা দেয় একুশ বছর রাত জাগার কথা। ধরলাম উনি দুবছর রাত জেগে ছিলেন সেটাও কি ছেলেখেলার পর্যায়ে পড়ে? রামপুরে উজির খাঁর কাছে গণ্ডা বাঁধবার পর থেকে যখন সত্যিকারের শিক্ষা শুরু হোল সেই সময়টার হিসাব 'আমার জীবনীতে' নেই। যেমন নেই, সেই সময় তাঁর খাই খরচা কি করে চলত? বাবার কাছ থেকে শোনা যে হিসাব আমি পেয়েছি তা অজ্ঞাত কারণে 'আমার জীবনীতে' নাই। আর নেই বলেই একটা প্রশ্ন জাগে, যে বাবা যেখানে কারো কাছে

এক পয়সার সাহায্য পেলে অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার করতেন সেখানে বহু লোকের কাছে শিখেছেন, সে কথা কেন লেখেন নি। আমার স্থির বিশ্বাস লেখা হয়েছিল কিন্তু যখন আমায় কপি করে দেওয়া হোল তখন শঠতা করে এডিট করা হয়েছিলো।

ঘটনা হোল বিভিন্ন অর্ধ সত্য এবং বিকৃত অর্থের মাঝখান থেকে সেটুকু তুলে ধরবো যা অসংখ্যবার বাবা নির্ভুলভাবে বলেছেন অর্থাৎ ভ্যারিয়েশন অফ স্টেটমেন্ট হয় নি। রামপুরে পৌঁছবার পর প্রথম কয়েকদিন নিঃসন্দেহে অর্ধাহারে এবং অনাহারে ছিলেন তার কারণ সে কটা দিন গুরু সন্দর্শন ঘটেনি এবং ঘটেনি নবাব সন্দর্শনও। কিন্তু যে মুহূর্তে নবাব সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরুর কাছে পৌঁছন, সে দিন থেকেই নবাব বাবার পূর্ণ যোগ্যতা বিচার করে, রামপুরে ব্যাণ্ডে এক সহকারী রূপে নিয়োগ করেন। মাইনেটা স্থির হয় যদিও অঙ্কটা সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব আছে। কুড়ি বা বারো যেটা হোক, সেটা কোন ব্যাপার নয়। মিতব্যয়ী বাবা তাই নিয়ে চালিয়ে নিতে পেরেছিলেন। এটাই বিশ্বাস করা যাক।

এ কথা ঠিক যে ছাত্র হিসাবে উজির খাঁর কাছে গণ্ডা বাঁধবার বহুদিন পরে, গুরুর কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এবং যে হেতু বাবার সে জীবনটা ছিল সাধনার জীবন, তাই মুহূর্তগুলিও নষ্ট না করে রামপুরে সমকালীন যে সঙ্গীত শিল্পীদের পেয়েছেন তাঁদের কাছে কিছু না কিছু শিক্ষা করেছেন। এমন কি নবাব সভায় বিদূষক গায়কবৃন্দ নক্কাল অর্থাৎ যাঁরা অপরের স্বরকে নকল করে নবাবের চিত্ত বিনোদন করত, তাঁদের কাছ থেকেও শিক্ষণীয় কিছু থাকলে গ্রহণে ত্রুটি করেন নি। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন, মহম্মদ হুসেন খাঁ এবং ব্যাণ্ড মাস্টার রাজা হুসেন খাঁ, লক্ষ্ণৌ-এর দৌলত খাঁর ছেলে, যাঁর নাম পাওয়া যায় নি। হৈদার হুসেন খাঁ, ইয়ারজী হুসেন খাঁ, দাড়িআলা বাহাদুর আলি আফাতুল ইত্যাদি।

যেমন আহমদ আলির সময়, বাবাকে গুরু সেবার নামে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ করতে হয়েছে, তেমনটাই উজির খাঁর বেলাতেও। দুজায়গাতেই এমন হবার কারণ বাবার বাঙ্গালী মুসলমান পরিচয়। ভাবটা ছিলো এরকম, যে উর্দ্দুই বলে না, নিষিদ্ধ মাংস খায় না, সে আবার কি ধরনের মুসলমান? যে হেতু সকলে বাঙ্গালীকে বাবু বলে সম্বোধন করে, সেইজন্য বাবাকে উজির খাঁ থেকে নিয়ে সকলেই বাবু বলে সম্বোধন করত। এমন কি আলাউদ্দিন খাঁ বলতেও এঁদের বাঁধত। তাই আলাউদ্দিন বা বাবু বলে সম্বোধিত হতেন।

উজির খাঁ সাহেব ভিন্ন, বাবা আর একজনের কাছেও কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি হলেন উজির খাঁর সাহেবের স্ত্রী। এর মূল অনুপ্রেরক ছিলেন উজির খাঁ সাহেব নিজে। গুরু মা ভাল সেতার বাজাতেন। তাঁর কাছে শেখা জিনিষগুলোর ভিতরে ঠুংরী, টম্পা, দাদরা প্রভৃতি উপশাস্ত্রীয় অঙ্গ যে রকম ছিলো, তেমনি ছিলো রাগ বিহারীর মত সুললিত রাগ। উস্তাদ পুত্র প্যাঁরে খাঁর মৃত্যুর পরে, বাবা উজির খাঁ সাহেবের কাছে কতদিন শিখেছেন, সেটা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং লোক প্রবাদ যাই থাক, উনিশশো আঠারো সনে রামপুর ছাড়বার পরে বাবা মাত্র দুবার গেছেন রামপুর উনিশশো ছাব্বিশের মধ্যে। প্রথমবার গুরু পুত্রের মৃত্যুর পর এবং দ্বিতীয়বার উস্তাদের মৃত্যুতে। এবং দ্বিতীয়বারেই রামপুরের

নবাবের উজির খাঁর স্থানে রাজসভা বাদক হবার প্রস্তাবকে (একহাজার টাকা মাসিক মাইনে) সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ যে আসনে তাঁর গুরু বসেছেন সেই আসনের দিকে চোখ তুলে তাকানই ধৃষ্টতা ও চূড়ান্ত বেআদবি। আর বসার কথা তো অলীক কল্পনা।

আজকের দিনের লোকেরা এটাকে কি ভাববেন জানি না, কিন্তু বাবা এটাকে কখনই ইডিওটিক ভাবেন নি। দেড়শো টাকা মাইনে থেকে হাজার টাকা হয়ে, হয়ত লৌকিক সুখ তাঁর বৃদ্ধি পেত, কিন্তু গুরুর আসনে বসে ধর্মভীরু বাবা তাঁর পরলোককে খোয়াতে রাজী ছিলেন না। সেইজন্যই গতানুগতিক হতে পারলেন না।

উনিশশো আঠারো সনে রামপুর ছাড়ার ধারাবাহিক প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যেটাকে না লিখলে, মৈহার আসার একটা লিংক মিসিং হয়ে যাবে। সেই মিসিং লিংকটি ছিলেন তৎকালীন ভারতবিখ্যাত কোলকাতার হারমোনিয়াম বাদক শ্যামলাল ক্ষেত্রী। এ বিষয়ে বাবার বক্তব্য যা কি বাবার লেখা 'আমার জীবনী'তে উল্লেখিত নাই। যা উল্লিখিত আছে সেটা যদি ঘটনা হয়, তাহলে বাবা শ্যামলাল ক্ষেত্রীর নামটা কেন বাদ দিলেন? অর্থাৎ কোলকাতা পর্বটা সারলেন চার লাইনে? আরও আশ্চর্য লাগে এইজন্য সেটা ছিলো তাঁর রামপুব থেকে সরোদ বাদক হিসাবে প্রথম কোলকাতা যাত্রা। এত সংক্ষেপে বাবা তো কোনদিনই কোন কথা সারেন নি। তাহলে কি উদ্দেশ্য ছিলো, বইএর নকল করার সময়, শ্যামলাল ক্ষেত্রীর নাম বাদ দেওয়া এই জন্য নয় কি, যে বাবার কৃতিত্বের ভাগীদার তিনি নিজেই হবেন? আর একটা কথা বিরাট ভাবে মনে জাগে যে বাবার মৈহারে যাবার নিমিত্ত বা কারণটা কি? প্রচুর দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে বাবা মৈহারে পৌঁছননি এটা একটা বিদিত ঘটনা। সেই সময় মৈহারের রাজা বা তাঁর কোন প্রতিনিধি কোলকাতায় ছিলেন এমনও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যোগাযোগটা তাহলে ঘটল কি করে?

বাবার কাছে বহুবার যে ঘটনাটা শুনেছি, সে কথাটি দিয়েই শুরু করি, বাবা বলতেন, 'আমার মতো পাড়াগেঁয়ে লোক, যখন গুরুর নির্দেশে রামপুর থেকে কোলকাতায় গেলাম সেই সময় সেখানে ছিলেন গনপৎ রাও এর শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী। আমি তখন ছিলাম হেদোর কাছে পুটিয়ারাণীর বাড়ীতে। সে সময় কোলকাতাতে উপস্থিত ছিলেন বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ, কেরামতুল্লা সরোদী, ইমদাদ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, দানীবাবু, রাধিকা গোঁসাই প্রভৃতি দিকপাল শিল্পীরা। ভবানীপুরে এক সঙ্গীত সম্মিলনিতে নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার সঙ্গে মৃদঙ্গে সঙ্গত করলেন কালীবাবু। সাজান গোছান কোলকাতা শহরে খুবসুরৎ জামাকাপড়ের বাহারের ভিতর, আমার রামপুরি কোট পরা উপস্থিতি নিশ্চয়ই ওঁদের কাছে হাসির খোরাক হচ্ছিল। কেউ আমাকে শিল্পী হিসাবে পাত্তা দিতে রাজী নয়। এমন কি যিনি সঙ্গত করবেন তিনিও পান চিবোতে চিবোতে তাস খেলতে ব্যস্ত। কিন্তু যখন বাজনা শুরু করলাম তখন অবজ্ঞার ভাব কেটে গেছে। লোকে গুরুত্ব দিলেন। সমঝদারেরা বললেন, 'সুখশ্রাব্য'। আর লক্ষ্মীপ্রসাদ বীণকার বললেন, 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।' কারণ এ তাবৎ সরোদে বীণ অঙ্গের এই জাতীয় বাজনা অকল্পনীয় ছিলো। সেই বাজনারই পরিণাম ছিলো শ্যামলাল ক্ষেত্রীর অযাচিত অনুরোধ, 'যান না মৈহারে। মধ্যপ্রদেশের ছোট স্টেট হলেও সেখানকার

রাজা সঙ্গীতপ্রেমী এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর আপনার মতই এক সর্ববিদ্যাপারদর্শী উস্তাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনাকে পেলে রাজা অত্যন্ত খুশী হবেন।' এ কথা শুনে বাবা বলেছিলেন, 'স্থায়ী বসবাস করব এ মানসিকতা না নিয়েই, নিছক কৌতুহলবশতঃ মৈহার যাত্রা করলাম। আমাকে উস্তাদ উজির খাঁ যা বলেছিলেন রামপুর ছাড়ার আগে, 'শিখা, দিখা, পরখা' সেই কথাটাই ভাবলাম। যাই না নিজেরই পরখ বা পরীক্ষা হবে।

দুর্গা পূজার সময় মৈহারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সপ্তমীর দিন রাজার দরবারে ডাক পেলাম। রাজার শিল্পী পরীক্ষার প্রথম পদ্ধতি দেখে তো ঘাবড়ে গেলাম। প্রায় সারাদিনই পালা করে আবদার, এটা শোনান, ওটা শোনান। যদিও শোনানোর স্থায়িত্ব কাল দুমিনিটের বেশী নয়। জীবনে এ ধরনের পরীক্ষা প্রথম। ঘাবড়ে না গেলেও বিরক্ত নিশ্চয়ই বোধ করছিলাম কারণ, আমার প্রিয় 'শ্রী' রাগে আলাপ শুরু করার একমিনিট পরেই যখন থামতে বললেন, তখন ভাবলাম এ কোন কূঢ় লোকের পাল্লায় পড়লাম। মনের রাগ তবুও মুখে আনলাম না, কারণ রাজা মহারাজাদের ব্যাপার। মুখের কথায় ফাঁসি হয়।'

সন্ধ্যে বেলায় ব্যাপারটা বোঝা গেল যখন রাজা আমাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, 'আপনি সঙ্গীতের সর্ববিষয়ে পারদর্শী। আমার কাছে যতরকম বাজনা ছিলো সব গুলোই আপনি বাজিয়েছেন এবং কণ্ঠেও আপনি অতুলনীয়। আজ থেকে আপনি আমার গুরু।' যখন রাজা শুনলেন আমার গুরু হবার অধিকার নাই কারণ আমি নিজেই শিক্ষার্থী তখন মহারাজ দূত পাঠালেন উজির খাঁ সাহেবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি মিলল। গুরু সানন্দে নিজে হাতে গণ্ডা তৈরী করে পাঠালেন আমাকে যা রাজার হাতে বেঁধে জীবনের প্রথম শিষ্য হিসাবে স্বীকার করলাম।

শিষ্যকে অর্থ নিয়ে শিক্ষা দেব না এই জিদে আমাকে অবিচল দেখে মহারাজও অনুভব করলেন এটা নিশ্চয়ই আমার ক্লেশকর শিক্ষার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা বলে তো অনাহারে থাকব না। তাই বৈকল্পিক ব্যবস্থা হোল সারদা মন্দির ট্রাস্ট হতে আমার মাসিক মাসোহারা দেড়শো টাকা। এই মৈহারে অবস্থানই, বাবার আমরণ জীবনকাল। যদিও বৃত্তি স্বার্থে দেশে যাওয়া ও হজ যাত্রা ভিন্ন মৈহারেই ছিলো তাঁর চিরকাল অবস্থান। উনিশ শো আঠারো সনে বাবার মৈহার আসার কিছুদিন পরেই প্লেগ মহামারী হয়ে দেখা দিল, বহু লোক মারা পড়ল, অনেক ছেলেমেয়ে অনাথ হোল। মৈহারের মহারাজ হিজ হাইনেস ব্রিজনাথ সিং কে, সি, আই, ই (নাইট কমাণ্ডার ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার) বাবাকে অনুরোধ করলেন এই সব অনাথ ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে একটা অর্কেষ্ট্রা তৈরি করতে।

মহারাজের ইচ্ছায় তৈরি হোল মৈহার বাদ্যবৃন্দ-এর সেনাপতি বাবা স্বয়ং। আর সৈন্যরা? তাঁদের আচমকা হাতে বাদ্যযন্ত্র ধরান হোল। এতদিন পর্যন্ত বাবা পাথরের খনি কেটে হীরে খুঁজেছেন, সঙ্গীতের হীরে। যে কটি রত্ন পেয়েছেন সাজিয়ে মালা গাঁথার আগেই আবার দায়িত্ব পড়লো নিরেট পাথরে ফুলগাছ গজানো। এ যেন তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা।

কিন্তু উপায় ছিল না। ভারতের প্রভু ইংরেজ হলেও সে যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তগুলির প্রভু ছিলেন সামন্তরাজেরা। গর্দান নেবার আইনগত অধিকার না থাকলেও সকলে ছিলেন

ছোটখাটো তুঘলক। শত হোক অন্নদাতা বলে কথা! বাবার পারিবারিক জীবনে একটা স্থিতি এসেছিলো, তাই খুঁচিয়ে ঘা না করে স্বীকার করলেন বেনে বনে মুক্তো ছড়ান। যে হেতু ছোটবেলা থেকে অভ্যাস ছিলো পরিস্থিতির উজান ভাঙ্গার, তাই বাদ্যবৃন্দ গড়ে উঠতে লাগলো।

মাঝপথে একটা হোঁচট খেলেন। প্রসন্ন বিশ্বাস নামেতে তিন দশক আগে অর্কেস্ট্রা বাজাবার অভিজ্ঞতা যখন মহারাজের খেয়ালিপনায় রাতারাতি ব্যাণ্ড নামে আভূষিত হোল, বিশেষণটা বাবার একদম পছন্দ হোল না। কিন্তু ওই বিরাট বাধা অন্নদাতা। আবার হজম করলেন। যদিও বোঝানর চেষ্টা করেছিলেন, এটা ঘোড়াকে শোনাবার বাদ্য নয় অর্থাৎ কি না রাজকীয় প্যারেডের সময় বাজবে না, কিন্তু কে করা কথা শোনে? কিন্তু মহারাজ তো বুদ্ধির বৃহস্পতি। তাঁর মাথায় তখন ঘুরছে, অন্য স্টেটে ব্যাণ্ড পারটি আছে। আমার কেন থাকবে না? এখন তাঁকে কে বোঝাবে? হীরেকে রাখতে সোনার আধার দরকার। গোবরে গুঁজলে চলে না। যাক একটা মঙ্গল, হীরের জাত যায় না।

এইভাবে দিন চলছিল গড়িয়ে, আবার বাবা ভীষণ বিষম খেলেন যখন শুনলেন তাঁকে গ্রাম্য মেয়েদেরও বাদ্যবৃন্দেতে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্যোপায়। তাঁর শান্তির জীবন যাত্রায় পথের মাঝখানে আবার এসে দাঁড়াল অন্নদাতার বিশাল দানব। শেখাতে হোল পাঁচটি মেয়েকে যাঁদের নাম যথাক্রমে যতিরন, বুন্নি, হাফিজিয়া, পত্তি এবং গিল্লি।

বারোটা ছেলে এবং এই পাঁচটা মেয়ে নিয়ে শুরু হোল প্রাথমিক শিক্ষার আসর। বাবা বলতেন, 'কে জানে, মৈহারের জলহাওয়াটা খারাপ। সতর্ক না থাকলে এখানে দেখি সকলেরই চরিত্র দোষ হয়।' পরবর্তীকালে সোজাসুজি না বললেও বাবা তৎকালীন রাজা সম্পর্কে বিশেষ করে তাঁর সর্বগামিতা (বোধ হয় বহু গামিতার সুপারলেটিভ ডিগ্রি) উপরে বিরক্তটা লুকোতে পারতেন না। নাবালিকা, বৃদ্ধাবণিতা, মহারাজের চোখে কুদৃষ্টির শিকার হ'তো এবং পরিণামে অনেক বিয়োগান্তক নাটক হয়েছে বাবা জানতেন, তাই বাবা অত্যন্ত বিরক্তিভাবে এই কথাগুলো বলতেন, 'বাবা এখানকার জলবায়ু ভালো না।' এটা আমিও পরে মৈহারের প্রবীণদের কাছে শুনেছি। কিন্তু যাক বাবার কথাতেই ফেরৎ যাই।

যেহেতু অনাথ ছেলেদের মাইনে মহারাজ ধার্য করলেন বারো টাকা, সেইজন্য অনাথ ছেলেদের সংখ্যা বেড়ে গেল। সর্বসমেত চল্লিশ জন সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েদের মধ্যে একজন লড্ডনবাই এসে বাবার পায়ে ধরে কেঁদে বলল, 'বাবা আপনি আমাকে বাঁচান। আমি এলাহাবাদের এক বারবণিতার কন্যা। আমার মা মারা গেছেন। আমি খারাপ পরিস্থিতিতে যেতে চাই না।' খারাপ পরিস্থিতিতে মেয়ে অথচ তাঁকে ভাল করতে হবে এই ভেবে বাবা বাড়ীর বাইরের ঘরে মেয়ের মত রেখে দিলেন। কয়েকদিন পরে অর্কেস্ট্রার মধ্যে ভর্তি করে দিলেন। এই সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের চড় চাপড় মেরে গাধাকে ঘোড়া বানাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শিক্ষা চলতে লাগল, ইতিমধ্যে চুনন্দি নামে এক এসরাজ বাদক একদিন আতর লাগিয়ে শিখবার সময় এলো। সেইসময় মেয়েরাও ছিলো। বাবা নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে আতরের গন্ধ পেয়েই, ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আরে

আরে কোথা থেকে বিড়ালের বিষ্ঠার গন্ধ আসছে?' ছেলেদের মধ্যে একজন সাহস করলো, 'বিষ্ঠার গন্ধ কোথা থেকে আসবে? আসলে চুনন্দি আতর লাগিয়ে এসেছে।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা একটি ছেলেকে বললেন, 'বাজার থেকে একটু কেরোসিন তেল নিয়ে এসো তো।' কেরোসিন তেল এল। বাবা সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন তেল চুনন্দির গায়ে ঢেলে দিয়ে চিৎকার করলে বললেন, 'শুয়ার কে বাচ্ছা। মেয়েদের সামনে আতর লাগিয়ে বাবু হয়ে এসেছ।' সকলের মুখে আর কথা নাই, মেয়েদের যখন দশ বৎসর, সেই সময় একদিন একটা মেয়ে দেরীতে আসায়, রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে বাবা বললেন, 'আজ আসতে কেন দেরী করলে?' মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাবা, আজ বেসন দিয়ে মাথা ঘসতে গিয়ে দেরী হয়ে গিয়েছে।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে একটি ছাত্রকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে একটি নাপিতকে ডেকে আনো তো?' ছাত্রটি একটি নাপিতকে ডেকে আনল। বাবা সঙ্গে সঙ্গে নাপিতকে বললেন, 'এই মেয়েটার চুল ন্যাড়া করে দাও।' সকলেই অবাক। ন্যাড়া করে দেবার পর বাবা মেয়েটিকে বললেন, 'এবারে আসতে দেরী হবে না। এই অল্প বয়সে সৌখিনি হয়ে রাজরাণী হতে চাও?' বাবা এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে গিয়ে বললেন, 'মেয়েদের বয়স হচ্ছে, সুতরাং এই সব মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে বাজান ঠিক নয়।' মহারাজ বাবার মেজাজ দেখে বললেন, 'ঠিক আছে। মেয়েদের তের চৌদ্দ বছর হলেই ছাড়িয়ে দেব।' অগত্যা বাবার কাছে শেষ পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে আঠারোটি ছাত্র নিয়মিত শিক্ষা করতে লাগল। ইতিমধ্যে বারোটি ছেলে মার খেতে খেতে ভয়ে মৈহারের কাছেই নাগোদ স্টেটের মহারাজের কাছে পালিয়ে গেল। বাবা খবর পেয়ে বারোটি কুকুর পুষলেন। বারোটি ছেলের নাম দিয়ে বারোটি কুকুরকে ডাকতে লাগলেন। প্রায় একমাস সমাপ্তির পর, মৈহারের মহারাজা নাগোদ স্টেটের মহারাজকে বলে, ছেলেগুলোকে ফেরৎ আনলেন। তারা আসার পরই, শিক্ষার সময় আবার শুরু হোল বেধড়ক মার। ছেলেগুলোর মাথাই ছিল না শিক্ষা গ্রহণ করবার। কিন্তু শেষমেষ বাবা অসম্ভবকে সম্ভব করলেন।

বাবা স্থিতি হয়ে মৈহারে রয়েছেন দেখে বড়ভাই আফতাবুদ্দিন মা'কে নিয়ে এই প্রথম মৈহারে এলেন। ইতিমধ্যে বাবার তিন কন্যা হয়েছে। প্রথম মেয়ের নাম আরজা, জন্মের সাতদিনের মধ্যেই মারা গিয়েছে। পরের দুই মেয়ে সুরিজা এবং জাহানারাকে নিয়ে মা মৈহারে এলেন। মৈহারে প্রায় এক বছর থেকে মা আবার শিবপুরে ফিরে গেলেন।

বাবার মনে সুখ নাই। সারা জীবন কষ্ট করে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। একটা ছেলে হলে মনের ম'তো করে শিক্ষা দেবেন। মেয়েদের শিখিয়ে লাভ নাই কেননা বিয়ে হয়ে গেলে শ্বশুরবাড়িতে হয়ত সঙ্গীত সাধনা করতে দেবে না। মনের মত করে তৈরী করবেন সে রকম ছাত্র কোথায়?

উনিশশো বাইশ এর পয়লা বৈশাখ বাবার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। মৈহারে পত্রযোগে খবর পেলেন বাবার ছেলে হয়েছে দেশে শিবপুর গ্রামে। গত শ্রাবণ মাসে নিজের দেশ ছেড়ে, আসবার আগে এক সন্ন্যাসীর কাছে পুত্রের জন্য আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। বাবা সেই সন্ন্যাসীকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন। কুমিল্লার সেই দৈবশক্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসী বাবাকে

এক চুটকি ভস্ম দিয়ে বলেছিলেন, 'নিজের স্ত্রীকে এই ভস্মটি খেতে দিও। তাহলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।' বাবা সেই ভস্ম মা'কে খাইয়ে মৈহারে চলে এসেছিলন। তখন ছিলো তাঁর চোখে জল। আর যখন পুবের হাওয়ায় ভেসে সন্তানের খবর তাঁর কাছে পৌঁছল, নববর্ষটা বাবার কাছে দারুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাবা মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়লেন। আল্লার কাছে প্রার্থনা করলেন, ছেলে যেন বেঁচে থেকে বাবার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। মৈহারের মহারাজ এবং স্থানীয় কিছু লোকদের কাছে পুত্র হওয়ার সংবাদ দিলেন এবং ব্যাণ্ড পারটির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিষ্টি খাওয়ালেন। কোরান শরীফে আলিআকবরের একটা নির্মল চরিত্রের নাম পাওয়া যায়। সেই কথা ভেবে মনে মনে ভাবলেন, ছেলের নাম রাখবেন আলিআকবর। আনন্দের আতিশয্যে ব্যাণ্ডের ছেলেদের, রাজার কন্যা মহেন্দ্র কুমারিকে, নিয়মিত শিক্ষা দিতে লাগলেন। ছেলেকে দেখবার জন্য বাবার মন আকুপাকু করতে লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আলিআকবরের যে সময় আঠারোমাস হোল, সেই সময় বড় ভাই আফতাবুদ্দিন মা এবং ছেলে মেয়েদের নিয়ে মৈহারে এলেন। বাবা সেই সময় মৈহারে মহারাজ রাজপ্রাসাদের কাছেই একটি বাড়ীতে থাকতেন। বাবার মৈহারে আসা যেমন তাঁর নিজের জীবনের স্থায়িত্বের সূচনা করল, ঠিক সেরকমই ভারতের বেশ কিছু শিল্পীর মনে আশার সঞ্চার করল। কারণ যে মৈহারে কয়েক দশক আগে সঙ্গীত শিল্পীদের কোন স্থান ছিলো না, সেখানে বাবার অভিষেক অনেকের জন্য পথ খুলে দিল। বাবার ছাত্র রাজা ব্রিজনাথ সিং-এর বাবা মহারাজ রঘুবীর সিং-এর সময় যদিও শিল্পীরা ছিলেন, কিন্তু মূলতঃ তাঁদের নিয়োগ করা হ'তো নাটকের দলে। কারণ রঘুবীর সিং-এর ঝোঁক ছিল সেদিকেই বেশী। সে যুগে লক্ষাধিক টাকার সাজসজ্জা এবং অন্যান্য উপকরণ জড় করেছিলেন তিনি। তিনজন শিল্পীর কথা জানি, যাঁরা বাবা আসার আগে স্টেট মিউজিসিয়ান হয়ে নাটকে কাজ করতেন। শিল্পীদের মধ্যে ঘুররে মহারাজ, আপ্টে সাহেব এবং ইলাহিবক্স অন্যতম।

মুখ্য দরবারী শিল্পী হিসাবে বাবার নিযুক্তির পরে প্রচুর শিল্পীরা আসেন। মহারাজ বাবার উপরে তাঁদের গুণাগুণ, প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা বিচার করার ভার দেন। তাঁদের ভেতরেই কিছু শিল্পীকে বাবা অনুমোদন করেন। তাঁরা হলেন, গায়ক মহাদেও প্রসাদ, ব্যাসদেও চৌবে, গণেশ প্রসাদ এবং শিবকুমারি বাঈ। মৃদঙ্গ, তবলা এবং সারেঙ্গীতে যথাক্রমে সুরদাস, মৌলা বক্স এবং বাদল খাঁ স্থান পান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়, বাবাকে কেবল শিল্পী নিয়োগই করতে হ'তো তা নয়, বাবা বহু ক্ষেত্রে শিল্পী চয়নও করতেন যাঁরা রাজার সামনে গাইবে বা বাজাবে। এবং সেখানেই ছিলো বাবার উদারতা যে সাধারণ শিল্পীও বঞ্চিত হ'তো না।

অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন প্রথম উনিশশো ষোল সালে বরোদার মহারাজ হিজ হাইনেস গায়কাওয়াড করেন। এর দুই বছর পরে দিল্লীতে রামপুরের নবাবের আর্থিক সাহায্যে সঙ্গীত সম্মেলন হয়। তার পরের বছর কাশীর মহারাজের ইচ্ছায় কাশীতে সঙ্গীত সম্মেলন হয়। কিন্তু এই তিনটি সম্মেলনে বাবা যোগদান করেন নি। আর্থিক অনটনের জন্য

দীর্ঘ পাঁচ বছর কোন সঙ্গীত সম্মেলনের উৎসব হয় নি। চতুর্থ অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন হোল উনিশশো পঁচিশ সনে লক্ষ্ণৌতে, রায় উমানাথ বলী জেনারেল সেক্রেটারির পরিচালনায়। দিন স্থির হোল এগারোই জানুয়ারি থেকে চৌদ্দই জানুয়ারী পর্যন্ত। সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীতজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করা হোল। প্রায় একশো শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল এই সম্মেলনে। বরোদা, বদায়ুন, অযোধ্যা, দারভাঙ্গা, দিল্লী, চোলপুর, ফিরোজপুর, গোরখপুর, ইন্দোর, লক্ষ্ণৌ, কাশী, রামপুর, গৌরিপুর, ওরছা, পাটিয়ালা, মৈহার, উদয়পুর, গোয়ালিয়র, লাহোর, নাগপুর, কোলকাতা, বর্দ্ধমান স্টেট, আমেদাবাদ, মথুরা, এলাহাবাদ, জয়পুর, নেপাল এবং আজমীর-এর শিল্পীরা একত্রিত হলেন। এত বড় সম্মেলন এর আগে কখনও হয়নি। ডাক এলো মৈহারে। মাত্র ছয়সাত বছর পার হয়েছে কিন্তু তার ভেতরেই বাবার কীর্ত্তির কস্তুরির গন্ধ বনজঙ্গল পাহাড় পেরিয়ে সব দিকেতেই ছুটেছে। এ বিষয়ে বাবা অবগতই ছিলেন না। কতকগুলো অনাথ শিশুদের রাজার আবদারে, বাবা যে অর্গলমুক্ত করেছিলেন ওঁদের জন্য সেটাকে মৈহারের রাজা ব্যাণ্ড পার্টিই বলুন, আর অর্কেষ্টাই বলুন বাবার কিছু যেতো আসতো না। কিন্তু যে দিন মহারাজ-এর কাছে শুনলেন যে লক্ষ্ণৌ থেকে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছে মৈহার ব্যাণ্ড, বাবা বেশ দুঃখিতই হলেন। কারণ আর কেউ না জানুক বাবা প্রসন্ন বিশ্বাসের জীবনে, যে অর্কেষ্ট্রার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো সেটা থেকে তিনি বুঝতে পারতেন যে তাঁর পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত বাদ্যবৃন্দ কোন ক্রমেই ব্যাণ্ড পারটির পর্যায়ে পড়ে না। কারণ চামড়ার ড্রাম বাজিয়ে, সেপাইদের কুচকাওয়াজ আর ড্রামের তালে ঘোড়াদের টগবগিয়ে ছোটা বা দেশী বিলিতি প্রভুদের সৈন্য পরিদর্শনের ব্যাকগ্রাউণ্ড হোল ব্যাণ্ডপারটি।

বিরক্তি প্রকাশ না করলেও বাবা বোঝাতে ক্ষান্ত হন নি যে, অর্কেষ্ট্রা আর ব্যাণ্ডে তফাৎ আছে। বাদ্যবৃন্দকে ব্যাণ্ড বললে গৌরব বাড়বে না, কিন্তু মহারাজের মাথায় তো তখন অন্য চিন্তা। সব রাজার ব্যাণ্ড পারটি আছে, আমার কেন থাকবে না? বাবার ঘাড়ে তখন ঝুলছে বাধ্যতার খাঁড়া। মনে ভাবলেন, নামে আর কি? লোকে কাজেতেই দেখবে।

লক্ষ্ণৌ যাত্রার আগে হোল আর এক ঝামেলা। উদ্যোক্তারা চেয়ে পাঠালেন এক গ্রুপ ছবি। যে হেতু গ্রুপটা মৈহার রাজার প্রতিনিধি, তাই রাজার আদেশ হোল সেজেগুজে ছবি তুলতে হবে। অর্থাৎ কি না মেডেলের মালা পরে আর বুকে তকমা এঁটে, বাবার ভাষায় সংসাজা। মনে যতই বিরক্ত হোন এ কথা ভেবে যে উনি ব্যাণ্ড মাষ্টার নন, অর্কেষ্ট্রার ডাইরেক্টার, আর তা ছাড়া নিজের সাধাসিধে জীবনে এই অকারণ জৌলুষ বিরক্তিকর। তথাপি কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম। ছবি তোলা হল।

শিষ্যরা ভাবল, বাবা যখন একবার তকমা এঁটেছেন সেই রাজবেশ লক্ষ্ণৌতেও পরবেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা একেবারে অন্য। ঋজু সোজা মাথায় বলে বসলেন, 'লক্ষ্ণৌর জন্য ছবি তোলানই ঢের হয়েছে। এখন আর এগুলো পরে বাজাব না। এখানে তো সব কাককেই দেখছি—সাদা রং করা, তাই কাক, হাঁস আর কোকিলের বিচার আওয়াজে হওয়াই ভালো।'

সত্যই আওয়াজে বিচার হোল। তিন মিনিট নির্দ্ধারিত ছিলো বাবার বাদ্যবৃন্দের জন্য। কিন্তু উদগ্রীব শ্রোতাদের চড়া স্বরে 'ওয়ানস মোর' চিৎকারের ঠেলায় উদ্যোক্তাদের মাথা ঘুরে গেল। আণ্ডারএস্টিমেট করার লজ্জায় তখন তাঁরা অধোমুখ। দোষ স্খালনের একটাই উপায় ছিল, সেটা হোল সেদিন বাজল অর্কেস্ট্রা একঘণ্টা আর স্থির হোল পরের দিনেও বাজবে।

দুদিনের অর্কেষ্ট্রায় শ্রোতারা শুনল ইমন কল্যাণ, তিলককামোদ, খাম্বাজ। আর বাবার বেহালায় শুনল তিলককামোদ এবং কাফি। শেষ দিনে শুরু হোল মেডেল আর পুরস্কার প্রদান। উপস্থিত প্রায় ডজন খানেক রাজা মহারাজারা স্বর্ণপদক ঘোষণা করতে মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করলেন না।

এই গোল্ড মেডেল আর সার্বিক স্বীকৃতি যেমন একদিক থেকে বাবাকে যশের শীর্ষে তুলে দিলো, তেমন আর একদিক থেকে দুঃখ দিলো। তা হোল মৈহার ব্যাণ্ড হয়ে গেল প্রপার নাউন যাকে বাবার নিজের জীবিত অবস্থায় অর্কেষ্ট্রা হিসাবে পরিচিত করাতে পারেন নি এবং আজও 'মৈহার ব্যাণ্ড' নামে বিখ্যাত। এই সম্মেলনে বাবার একক সরোদ বাদনও হয়েছিলো। সঙ্গত করেছিলেন খলিফা আবেদ হুসেন খাঁ। এই বাজনাটা ঐতিহাসিক ভাবে আজোও চিহ্নিত হয়ে আছে। দ্রুত লয়ে যে দরজায় বাজনা পৌঁছেছিল তার পরিণাম কি হবে ভেবে, বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এবং রামপুরের ঠাকুর মোহাম্মদ আলি খাঁ দুজনে এসে দুইজনের হাত চেপে বলেছিলেন, বাজনার ইতি করতে। এই বাজনার চর্চা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই সম্মানের বিশাল বোঝা নিয়ে যখন বাবা মৈহারে ফিরলেন, রাজা থেকে প্রজা সকলেই খুশী। একমাত্র ব্যথিত বাবা নিজে স্বয়ং, কারণ তাঁর সরোদ শিল্পী সত্তা অন্তরালে চলে গিয়ে, তাঁকে ব্যাণ্ড মাষ্টারের যশ এনে দিয়েছে। যেটা তাঁর কাছে হয় মূল্যহীন আর না হলে সেকেণ্ডারি।

শুধুমাত্র এই সম্মেলন উল্লেখনীয় এই জন্য নয় যে, এতে বাবার প্রসিদ্ধি হয়েছিলো। উল্লেখনীয় এই জন্য যে, সেবারই প্রথম সঙ্গীতের সাথে সাথে ফাইন আর্টসকেও মর্যাদা দেওয়া হয়েছিলো। এবং সর্বভারতীয়স্তরের চিত্র শিল্পীদের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিলো লক্ষ্ণৌতে। সেখানেও বাবা অর্কেষ্ট্রা বাজান।

সঙ্গীত সম্মেলনের সমাপনান্তে সংযুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) ছোটলাট স্যার উইলিয়াম সিনক্লেয়ার মরিস সাহেবের প্রেরণায় এবং ভাতখণ্ডেজীর প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌতে একটি মিউজিক কলেজ গড়ার পরিকল্পনা করা হোল। সৎ কাজে বাধা আসে না। প্রস্তাব মাত্রই জনগণ মুক্ত হস্তে এগিয়ে এলেন। অচিরাৎ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা জড় হোল। শুরু হোল সঙ্গীত কলেজ তৈরীর কাজ। নাম রাখা হোল 'মরিস কলেজ' যা কি না বর্তমানে ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় নামে খ্যাত। কিন্তু এই কলেজ করার পেছনে কার অবদান সে কথা লেখা দেখতে পাওয়া যায় না। আসলে ডাক্তার রায় রাজেশ্বর বলীর মত এক বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় মরিস কলেজ হয়েছিল। ছোটলাট সাহেব রাজেশ্বর বলীর বুদ্ধিমত্তায় প্রভাবিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদে তাঁকে নিযুক্ত করেন। রাজনীতির প্রতি

ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও রাজেশ্বর বলী ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুত্থানের জন্য শিক্ষামন্ত্রী হন। সাহিত্য, সঙ্গীত, এবং ফাইন আর্টের প্রতি রুচি ছিল রাজেশ্বর বলীর। রাজেশ্বর বলীই নিজের বাসস্থানে ভাতখণ্ডেকে ডেকে কনফারেন্স এবং কলেজের কথা বলেন। রাজেশ্বর বলীর প্রচেষ্টায় সঙ্গীতের কনফারেন্স এবং পরে ছাব্বিশ সনে যোলই সেপ্টেম্বার মরিস কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজেশ্বর বলী বহু পদ্য রচনা করেছিলেন। সেই পদ্যগুলি নিয়ে বহু রাগ ভাতখণ্ডে, রতনজানকার, বুদ্ধিজি এবং রাণী সাহিবা শ্রীমতি সুশীলা রাণী গান রচনা করেছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা প্রয়োজন। রাজেশ্বর বলী একটি চিত্র প্রদর্শনীও করেছিলেন। যার মধ্যে কোলকাতার নন্দলাল বোস, অসিত কুমার হালদার, কুমারি অমৃতা শেরগিল, গোবিন্দ এবং রোরিক-এর চিত্র প্রদর্শনীও হয়েছিলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গিয়েছিলেন এবং রাজেশ্বর বলীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। রাজেশ্বর বলীর ইচ্ছা ছিলো আর্টস এবং ক্রাফট-এর প্রধানাচার্য করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কিন্তু তা হয় নি, কারণ সে সময় ইংরেজ ছাড়া ভারতীয় লোকের হওয়ার অনুমতি ছিলো না। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস রাজেশ্বর বলীর নাম খুব কম লোকেই জানে। তিনি না হলে মরিস কলেজ হওয়া সম্ভব ছিলো না। যাক, যে কথা বলছিলাম। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেই বাবা মহারাজকে বললেন, মেয়েরা বড় হচ্ছে সুতরাং তাদের ছেলেদের সঙ্গে শেখান সম্ভব নয়। মহারাজ বুঝলেন। অর্কেষ্ট্রার থেকে মেয়েদের বিদায় করা হোল।

লক্ষ্ণৌতে অর্কেষ্ট্রা বাজিয়ে রাতারাতি বাবা 'ব্যাণ্ড মাষ্টার' নামেই পরিচিত হলেন। এর পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বাবার অর্কেষ্ট্রা হয়েছে। সুদূর কোলকাতায় অর্কেষ্ট্রার কথা ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৩৪ সালের শীতকালে এক সপ্তাহ ঐতিহাসিক সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন কোলকাতায় হয়েছিলো। এই সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ। এই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বেহালা হাতে, মৈহার ব্যাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন বাবা। শিল্পীর মধ্যে ছিলেন ইনায়েৎ খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরি, হীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দেব বর্মন এবং বালা সরস্বতী। এই অর্কেষ্ট্রা বাজাবার পরে, বাবার কথা উঠলেই সকলেই ব্যাণ্ড মাষ্টার বলত। সরোদে বাবার পাণ্ডিত্য সকলে স্বীকার করলেও, বাবাকে সকলেই ব্যাণ্ড মাস্টার বলত। বাবা ছিলেন অন্তরমুখী। যার জন্য সরোদে পারদর্শিতার খ্যাতি সকলে স্বীকার করেছিলেন বেশ কিছুদিন পরে। সেইসময় খ্যাতিমান শিল্পীরা জমিদার বাড়ী এবং ধনীর গৃহেই গিয়ে নিজের নাম প্রচার করতেন। কিন্তু বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। মৈহার ছেড়ে বাবা বিশেষ কোথাও যেতেন না এবং গেলেও সাধারণ সঙ্গীত প্রেমীর বাড়ীতেই উঠতেন। বাবার পাণ্ডিত্য ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো, যখন তাঁর কিশোর বয়স্ক পুত্র আলিআকবর সব জায়গায় বাজাতে লাগলো। তারপর যখন রবিশঙ্কর আলিআকবরের সঙ্গে দ্বৈত বাজান শুরু করল, সেই সময় ভারতবর্ষের সব জায়গায় সকলে বুঝতে পারলেন, বাবার পাণ্ডিত্যের কথা। বাবার জীবনে ব্যাপারটা দুখদ হলেও বাবা সহজভাবে তা নিয়েছিলেন। বাবা তাই বরাবর বলতেন, 'বহুদিন শিক্ষা এবং সাধনা করেই জনসমক্ষে বাজান উচিত। কেননা যার শেষ ভাল তার সবই ভালো।'

বাবা কাউকে কিছু দিলে তা প্রচার করতেন না। দান করা অসম্ভব হলে প্রতিশ্রুতি দিতেন না। কিন্তু আজকের যুগে ঠিক তার উল্টো। কেউ পরের জন্য কিছু করলে সর্বত্র প্রচার করে। এবং কিছু করবে না জেনেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে করব। বাবা কিন্তু যদি কিছু না করতে পারতেন স্পষ্ট বলে দিতেন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বাবা কারো উপকার করতে পারলে বা কিছু দিতে পারলে অত্যন্ত সুখী হতেন।

৭৫

বাবা নিজের জীবনে অর্দ্ধেকের বেশী শিক্ষা করেই কাটিয়ে দিলেন। যে সময় ভাবলেন একান্তে সাধনা করবেন সেইসময় মৈহারের মহারাজের কাছে এসে নাগপাশে বদ্ধ হলেন। মহারাজ, মহারাজের মেয়ে, অর্কেষ্ট্রার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে বাধ্য হলেন। এক কথায় সুরের রাজ্য থেকে অসুরের রাজ্যে। প্রথম শিক্ষার্থীর শিক্ষা দিতে যে নিদারুণ বেগ পেতে হোল তা অকল্পনীয়। বেগ পেতে হয়ত হ'তো না যদি ফাঁকি দিতেন। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে ফাঁকি দেওয়া তাঁর অভিধানে লেখা ছিলো না।

মৈহারে আসার পর মাঝে মাঝে কোলকাতায় গেছেন বাজাতে। সেই সময় কনফারেন্স হ'তো না। ঘরোয়া আসরেই সঙ্গীত হ'তো। একবার বিখ্যাত এসরাজি শীতল মুখোপাধ্যায় বাবার সঙ্গীতের আসরের আয়োজন করেছেন। সেই আসরে হাজির হয়েছেন তিমিরবরণ ভট্টাচার্য। কোলকাতায় সরোদের প্রচার করেছেন আমীর খাঁ। তিমিরবরণ পাঁচ বছর আমীর খাঁর কাছে শিক্ষা করেছেন। তিমিরবরণ আমীর খাঁ এবং তাঁর বাবা আবদুল্লা খাঁর কাছেও বাবার প্রশংসা শুনতেন। কিন্তু বাবার বাজনা শুনে বুঝলেন এ বাজনায় কত তফাৎ। শিক্ষা করবার জন্য বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু শিক্ষা দিতে বাবা রাজী হলেন না। বললেন, 'আপনি তো কোলকাতার উস্তাদ। এত গুণী আমীর খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছেন, আপনাকে ছেলের মত শিখিয়েছেন। আমি শেখালে তাঁর অভিশাপ লাগবে। আমার কাছে কি শিখবেন?' বাবা শেখাবেন না দেখে তিমিরবরণ গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির শরণাপন্ন হোল। যে হেতু বাবা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরিকে বাবা বলতেন এবং বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরিকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন, তাই তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। কিন্তু বাবা তিমিরবরণকে বললেন, 'তোমার গুরুর অনুমতি নিয়ে এসো, তা হলে শেখাব।' তিমিরবরণ আমীর খাঁর অনুমতি নিলেন। আমীর খাঁ উত্তরে বললেন, 'তোমার যখন শেখার ইচ্ছা যাও। আলাউদ্দিন খাঁ খুব গুণী লোক তাঁর কাছে গিয়ে শেখো কিন্তু আমার বাজ বাজাবে না।' তিমিরবরণ রাজী হয়ে উনিশশো পঁচিশ সনেই বাবার সঙ্গে মৈহারে গেলেন। বাবা তিমিরবরণকে তিনবছর শেখাবার পরই ত্রিপুরা মহারাজের স্টেটে বাজাবার আমন্ত্রণ পেলেন। বাবা তিমিরবরণকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দুজনে বাজালেন। তবলায় সঙ্গত করলেন প্রসন্ন কুমার বণিক। এই আসরে বাবার ভাই আফতাবুদ্দিন খাঁও উপস্থিত ছিলেন। আমি যে সময় ইংরেজী বই লেখবার জন্য তিমিরবরণের সাক্ষাৎকার নিই সেই সময় নানা কথা বলে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যদিও আমি আমীর খাঁর কাছে বলেছিলাম, তাঁর বাজ বাজাব না কিন্তু আমি দুই-ই বাজিয়েছি।'

যে কথা প্রথমেই লিখেছি বাবা কারো জন্য কিছু করলে কখনও প্রচার করতেন না, তিমিরবরণের ক্ষেত্রেও তাই। যদিও বাবার কাছে তিমিরবরণ সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলাম কিন্তু অনেক কথা বাবা আমাকে কখনও বলেন নি। কথা প্রসঙ্গে বাবা প্রায় বলতেন, 'যাঁরা একটু শিখে ভাবে খুব ভাল বাজায় তারপর যদি অন্যের কাছে শিখতে যায়, তাহলে তাঁকে নূতন ধাঁচে গড়তে যেমন বিপদ সেইরকম যে শেখে তাঁর জন্যও বিপদ। বিদ্যার অহঙ্কার না থাকলে প্রত্যেকের যা ভাল পাওয়া যায় শিক্ষা করা যায়। আর অহংকার থাকলে আগের শিক্ষা এবং পরবর্তীকালে যতই শিখুক জগাখিচুড়ি হয়ে যায়।

কোথায় বাবা ভেবেছিলেন একান্তে সাধনা করবেন কিন্তু তা হোল না। তিমিরবরণ মৈহারে শিক্ষার জন্য এলো। ইতিমধ্যে বাবা কন্যা জাহানারাকে গানের তালিম দিতে লাগলেন। বাবার ইচ্ছা জাহানারা ভজন শিখুক কেননা বড় হয়ে শ্বশুর বাড়ী গেলে যদি তাঁরা সঙ্গীত বিমুখ হয়। তিমিরবরণ মৈহারে আসার এক বছর পরেই বাবা আলিআকবরকে ছোট একটি সরোদ বানিয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। ঠিক সেই সময় বাবার একটি কন্যা হোল। পূর্ণিমার দিন জন্ম হোল বলে মহারাজ বাবাকে বললেন, 'আমার বোনের জন্ম হয়েছে পূর্ণিমার দিন, সুতরাং মেয়ের নাম রাখুন অন্নপূর্ণা।' বাবার দায়িত্ব বাড়ল। মহারাজ, মহারাজের মেয়ে, অর্কেস্ট্রা, তিমিরবরণ, জাহানারা এবং আলিআকবরের শিক্ষা দিতে বাবার মাথা গরম হতে লাগল। গরম হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিণত শিক্ষার্থীদের শেখাতে কষ্ট হয় না কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীদের শেখান বাবার মত লোকের পক্ষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গতে লাগল। কিন্তু কোন উপায় নাই।

এই অবস্থার মধ্যেও দুই বছরের মধ্যে কাশীতে রহিস কিশোরী রমনজীর নিমন্ত্রণে কাশীতে এসে অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে গেলেন এবং ত্রিপুরার মহারাজের অভিষেক উপলক্ষে পুরো অর্কেস্ট্রা নিয়ে বাজিয়ে এলেন। অর্কেস্ট্রার এত নাম হয়ে গেল যে আলোয়ার সঙ্গীত সম্মেলনেও বাজাবার ডাক পড়ল। এই অর্কেস্ট্রা শুনে অন্য ব্যাণ্ড পার্টির যাঁরা এসেছিলেন চোঙ্গা, ভায়োলিন এবং বিদেশী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তাঁরা সম্মেলনে যোগ না দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে পলায়ন করলো।

দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর কেটে গেল। তিমিরবরণ পাঁচ বছর শিক্ষা করে বাবার আদেশ নিয়ে উদয়শঙ্করের পার্টির অর্কেস্ট্রার ভার নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিলেন। একজন ছাত্র কমলো কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শেখাতেই বাবার সময় কেটে যায়। আট বছরের ছেলে আলিআকবরকে বাবা ঘড়ি দেখে নয় ঘণ্টা রিয়াজ করাচ্ছেন। একটু ভুল হলেই যে চড় চাপড় এবং লাঠির প্রহার চলতো তা কল্পনা করা যায় না। অন্নপূর্ণাদেবীর বয়স সেইসময় সবে চার বছর। একদিন বাবা সকালে যেমন নিয়মিত বাজার করতে যান গেছেন। বাড়ীতে ফিরে দূর থেকে শুনলেন অন্নপূর্ণাদেবী গলায় গান গেয়ে আলিআকবরকে বলছে, 'দাদা তুমি ভুলে গেছ, এইরকম করে বাজাও।' বাবা দূর থেকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শুনলেন। বাবা অবাক। বুঝলেন মেয়ের মধ্যে প্রতিভা আছে। হবে নাই বা কেন? বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে যাঁদের যাওয়া বারণ এবং সমবয়সী কোন বন্ধু নেই, তাঁরা যদি দিনরাত সঙ্গীতের পরিবেশের মধ্যেই থাকে তাহলে

সঙ্গীতের মধ্যে মন যাওয়া স্বাভাবিক। বাবা সেই সময় লক্ষ্ণৌ রেডিও থেকে বাজাতেন। লক্ষ্ণৌ থেকে একটা ছোট সেতার কিনে এনে ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণাকে শেখাতে লাগলেন।

এ এক বিচিত্র জীবন। লোকে বলে জন্মলগ্নে শনি। বাবারও তেমন জন্ম লগ্ন থেকেই শিক্ষা শব্দটা জড়িয়ে পড়েছে জীবনের সাথে। প্রথমে শেখা, পরে শেখান। এ থেকে মুক্তি পবার উপায় ছিলো না তাঁর। শুধু একটা ব্যাপারেই তফাৎ ছিলো, সেটা হোল তাঁর করুণ দুর্ভাগ্য। প্রথম জীবনে উস্তাদদের কাছ থেকে শিক্ষার জন্য খেটেছেন আর পরবর্তী জীবনে শিক্ষা দেবার জন্য। তাঁর ছিল অফুরন্ত সঙ্গীতের ক্ষুধা আর বেশীর ভাগ ছাত্ররই ছিলো সঙ্গীতের অগ্নিমান্দ্য। বাবার ভাষায় অপাচ্য। তাঁকে কেউ উজাড় করে না দিলেও তিনি উজাড় করে দেবার জন্য বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে একটা কথা মনে হয়, যদি বাবা নিজের উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মত একজন শিক্ষক পেতেন, তাহলে বাবা যেখানে শেষ করেছেন সেটাই হয়ত হ'তো তাঁর প্রথম সোপান।

যাঁরা বাবাকে শিক্ষক হিসাবে পেলেন শুরুর দিনে তাঁরা ইংরেজীর প্রবাদ বাক্য, প্রিন্স এনড পপার-কেই চরিতার্থ করলেন। শুরু করলেন মহারাজ আর ব্যাঙের রাখাল বালকেরা। তারপর একাধিক চল্লিশ বছর বাবার জীবনটা বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যালয় তলে, পাঠশালা যেন পান্থশালা। অভিমান করতেন, অভিযোগ করতেন রোজ রোজ স, প, স, প করতে ভালো লাগে না। কিন্তু তা বলে যাঁকে স্বীকার করেছেন তাঁকে শিখিয়েছেন। শুধু সকালে বিদায় সন্ধ্যা তাঁদেরই ঘনিয়েছিল যাঁরা বাবার ভাষায় হয় সরফরাজি করেছে আর না হয় আতাইপনা। উভয়ের অর্থ শরীরের বিশিষ্ট অঙ্গের পাকামিকে ইঙ্গিত করে।

মৈহারের বাইরের ছাত্র হিসাবে তিমিরবরণ বছর পাঁচেক শিক্ষা করে যখন প্রস্থান করলেন বাবার মনে হোল মৈহারের কটা ছেলে মেয়ে ছাড়া নিজের ছেলে মেয়েদের এবং নিজের বাজনার দিকে নজর দেবেন। কিন্তু তা হোল না। প্রচার মাধ্যমে অবিচলিত থাকা সত্ত্বেও বাবার যশগৌরব তখন ছড়াতে আরম্ভ করেছে। তাঁর শিক্ষার আলোর ছটাকে লক্ষ্য করে প্রচুর আলোর পিপাসী তখন মৈহারের দিকে ধাবিত।

কাশীর ধ্রুপদ গায়ক সুরেশ গাঙ্গুলির পুত্র, রাম গাঙ্গুলি কয়েকজনের সুপারিশ পত্র নিয়ে মৈহারে হাজির হোল সেতার শেখবার জন্য উনিশশো উনত্রিশ সালে। যদিও সেতারে হাতেখড়ি কাশীতে যৎসামান্য ছিল, কিন্তু বাবার কাছে কঠিন অনুশাসনে চারবছরের মধ্যেই হাত তৈরী হোল। মাঝে মাঝে কাশীতে আসত কিন্তু যে সময় সত্যিকারের শিক্ষার সময় হোল সেই সময় হোল বিপদ। উনিশশো তেত্রিশ সনে অখিল ভারতীয় যন্ত্রের কমপিটিশনে রাম গাঙ্গুলি বাবাকে না জানিয়ে নাম লিখে পাঠাল এলাহাবাদে। রাম গাঙ্গুলির বন্ধু কাশীর আশুতোষ ভট্টাচার্য অল্প বয়সেই কণ্ঠে মহারাজের কাছে তবলা শিখত। অবশ্য এই তবলা শিক্ষার প্রেরণা পেয়েছিলো কাশীর সেতারিয়া মুস্তাক আলির কাছে। যে হেতু মুস্তাক আলি খাঁ আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাবা কবিরাজ বীরেশ্বর ভট্টাচার্যকে বাড়ী গিয়ে এস্রাজ শেখান তাই বাড়ীতে একটা সঙ্গীতের পরিবেশ ছিলো। মুস্তাক আলি খাঁ-ই আশুতোষ ভট্টাচার্যকে কণ্ঠে মহারাজের কাছে তবলা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য যে হেতু রাম গাঙ্গুলির বন্ধু সেইজন্য রাম গাঙ্গুলির সঙ্গে রিয়াজ করত। এলাহাবাদের কমপিটিশনে আশুতোষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে রাম গাঙ্গুলি উপস্থিত হোল। কমপিটিশনে গিয়ে রাম গাঙ্গুলির আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। গিয়ে দেখল কমপিটিশনে জজ হয়েছেন বাবা। রাম গাঙ্গুলি, আশুতোষ ভট্টাচার্যের পরিচয় দিল খুব বড় কবিরাজের ছেলে এবং কণ্ঠে মহারাজের কাছে শেখে। বাবা আশুতোষ ভট্টাচার্যকে নাতি সম্বোধন করে পাশে বসালেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনলেন কমপিটিশনে রাম গাঙ্গুলি নাম দিয়েছে বাবা চটে গেলেন। বললেন, 'এখন তোমার শিক্ষা করা উচিত, ভাল করে শিক্ষা করো। তবে কমপিটিশনে যখন নাম দিয়েছ তখন যে ভাল বাজাবে তাকেই ফার্স্ট করব। তুমি আমার ছাত্র বলে তোমাকে ফার্স্ট করব না।'

কমপিটিশনে অনেকে সম্মিলিত হয়েছিলো। অনেকের মতে যদিও রাম গাঙ্গুলি সব চেয়ে ভাল বাজিয়েছিলো তা সত্ত্বেও বাবা তিমিরবরণের ভাইপো অমিয়কান্তি ভট্টাচার্যকেই (ডাক নাম ছিলো ভোম্বল) ফার্স্ট করলেন এবং রামগাঙ্গুলিকে সেকেণ্ড করলেন। এলাহাবাদে করালীবাবুর বাড়ী বাবা উঠেছিলেন। করালীবাবু বাবাকে যখন বললেন, 'আপনার ছাত্র এত ভাল বাজাল তবুও সেকেণ্ড করলেন কেন?' বাবার সহজ উত্তর, 'লোকে পাছে যেন না বলে আমার ছাত্র বলে তাকে ফার্স্ট করলাম। সেকেণ্ড করেছি সুতরাং এবার মন দিয়ে আরো সাধনা করবে।' কিন্তু রূপোলি পর্দার টানে রাম গাঙ্গুলি বম্বে চলে গেলেন এবং সিনেমার নায়ক পৃথ্বিরাজ-এর থিয়েটারে অর্কেস্ট্রাতে যোগদান করলেন।

বাবার জীবনে মৈহারের একটা ছাত্র চলে যাবার পরই আবার এক ছাত্র উপস্থিত হয়েছে। রাম গাঙ্গলি যাবার পরই দুইজন ছাত্র এল। একজন দিল্লীর শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপরজন এলাহাবাদের প্রজেশ ব্যানার্জি। দিল্লীর শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় মরিস কলেজে বত্রিশ সনে শিক্ষা করতেন সেই সময় বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়। বাবাকে অনুরোধ করলেন শেখাবার জন্য কিন্তু বাবা রাজী হয়ে বললেন যে, 'মৈহারে এলে শেখাবো।' তেত্রিশ সনে নবরাত্রির সময় শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবার কাছে শিখতে ধর্মশালায় উঠলেন। তিনবছর মৈহারে থেকে শিক্ষা করে দিল্লী চলে গেলেন। পরে তিনি কয়েকটা বই লিখেছেন এবং স্কুল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন।

যে সময় শ্রীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মৈহারে এসেছিলেন সেই সময় প্রজেশ ব্যানার্জিও এসেছিলেন। প্রজেশ ব্যানার্জি ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকাতে চাকরি করতেন। এলাহাবাদে বত্রিশ সনে বিজয়নগরম হলে বীণাপানীর দাদু এসরাজ বাদক শীতল মুখার্জির মারফৎ আলাপ হয়। প্রায় তিনবছর সপ্তাহে একদিন গিয়ে বাবার কাছে শিখে আসতেন। বাবাকে দেখে তিনটে কারণে প্রজেশ ব্যানার্জি আকৃষ্ট হন। প্রথম কারণ, বাবার সমসাময়িক যত উস্তাদ জাঁকজমক পোষাক পরে গাইতে বা বাজাতে বসতেন, কিছুক্ষণ পরেই শেরবানী খুলে জামার উপর মেডেল দেখা যেত। যা কি বাবা কখনও করতেন না। দ্বিতীয়তঃ কোন উস্তাদদের কাছে খালি হাতে যাওয়া যেতো না, গেলেও প্রায় উস্তাদরাই কিছু আনবার ফরমাস করত। কিন্তু বাবার কাছে ছিলো সকলের জন্য অবারিত দ্বার। বাবা কখনও কারো

কাছ থেকে কিছু নিতেন না। এ ছাড়া সকলের খাওয়া এবং চালচলন বাবার সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিলো। শ্রদ্ধার তৃতীয় কারণ, শিক্ষার ব্যাপারে বাবা অত্যন্ত উদার ছিলেন। বাবার কাছে এসে সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কোন লোক এসে জিজ্ঞাসা করলেই, সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে এত নিরহঙ্কারী লোক দেখেন নি। কারো সমালোচনা করতেন না। সকলকেই ভাল বলতেন। সর্বদাই বলতেন, 'যে যতটা শিখেছ তাতেই সারদা দেবীর পুজো তো করছে।' বত্রিশ সনে এলাহাবাদে এক বৃদ্ধ গায়ক মুজফ্‌ফর হুসেন কনফারেন্সে গেয়ে যে মুহূর্তে শেষ করেছেন, হঠাৎ বাবা মঞ্চে গিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রশংসা করলেন। তখনকার দিনে এ জিনিষ ছিলো বিরল। এই ধরনের বহু ঘটনা আছে। বাবা কত নিরহঙ্কারী ছিলেন এ সব থেকে বোঝা যায়। বাবা গুণীর কদর বরাবর করতেন।

মৈহারে বাবার একবার শরীর খারাপ হয়েছিলো ছাব্বিশ সনে। সে সময় সাতনার একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যতীন ব্যানার্জিকে একজন গিয়ে ডেকে আনলেন। বাবা অবাক, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের সঙ্গে ভায়োলিন নিয়ে যতীন ব্যানার্জি এলেন। বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'ডাক্তারি করো, আবার ভায়োলিন বাজাও?' সঙ্কোচে যতীন বাবু বললেন, 'একটু একটু বাজাই।' বাবা বললেন, 'বাজাও তো দেখি, কি রকম বাজাও।' বাজনা বাজিয়ে বললেন, 'বাবা যদি অনুমতি দেন তাহলে সপ্তাহে একদিন করে এসে শিখে যাব।' বাজনা শুনে বাবা বললেন, 'এ তো যাত্রাদলের বাজনা। এ সব বাজনা ভুলতে হবে।' যে হেতু বাবার হাজারও বলা সত্ত্বেও যতীন ব্যানার্জি কোন ফিস নিল না তার জন্য বাবা নিজের একটা বেহালা দিলেন এবং বললেন, 'ঠিক আছে সপ্তাহে একদিন শিখে যাবে।' সেই সময় তিমিরবরণ মৈহারে সরোদ শিখছে। যতীন ব্যানার্জি সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন। চিকিৎসার ফাঁকে সখ করে বাজাতেন। পরে যতীন ব্যানার্জির পুরো পরিবার বাবার পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। যতীন বাবুর স্ত্রীকে বাবা মেয়ের মত স্নেহ করতেন যার ফলে তাঁকে 'জামাইবাবা' বলতেন। পরবর্তীকালে তার দুই ছেলে সনৎ এবং রণজিৎ বাবার কাছে সরোদ এবং বাবার নিজস্ব আবিষ্কার চন্দ্র সারং শেখে। যে সময় যতীনবাবু বাবার কাছে এসেছিলেন সেই সময় বাবার দাদা আফতাবুদ্দিন মৈহারে ছিলেন। আফতাবুদ্দিন কয়েকবার সাতনায় গিয়েছিলেন। যতীনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী পরবর্তীকালে দীক্ষা নিয়েছিলেন কোলকাতার নৃপেন্দ্রনাথ দের নিকট। নৃপেন্দ্র নাথ দে যতীন বাবুর কাছে বাবার নাম শুনে বলেন, 'বাবা যখন কোলকাতা আসবেন সেইসময় তাঁকে নিয়ে যেন আমার কাছে এসো।

যতীন ব্যানার্জি একবার বাবাকে নিয়ে বাহান্ন সনে তাঁর গুরুদেবের কাছে যান। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবাকে দেখে নৃপেন্দ্র নাথ দে বললেন, 'তুমি তো গান্ধর্ব লোকের বাসিন্দা। কিন্তু তুমি পেয়েও হারিয়েছ। কিন্তু পাবে।' নৃপেন্দ্র নাথ তামাক খাচ্ছিলেন। বাবাকেও খেতে দিলেন। হঠাৎ নৃপেন্দ্র নাথ গেয়ে উঠলেন, 'মাগো আমি তামাক খাব। টানে টানে তব ধ্যানে মাগো আমি মিশিয়ে যাব।' এর পরেই নৃপেন্দ্রনাথ দে বাবাকে বললেন, 'সিদ্ধাই তিন রকমের। হঠাৎ সিদ্ধ, কৃপা সিদ্ধ এবং কষ্ট সিদ্ধ। তোমার সিদ্ধাই হোল কষ্ট সিদ্ধ।' বাবা ভক্তিভাবে প্রণাম করে চলে এলেন কিন্তু এরপর আর কখনও তাঁর কাছে যান নি।

বাবা বহু কথা যা বলতেন সে কথা দর্শনের, সংস্কৃতের এবং আধ্যাত্মিক বইতে পড়েছি। কিন্তু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় এই সব কথা শুনেছেন, উত্তরে বরাবরই বলেছেন, 'আল্লা বা সারদা মা বলিয়ে দেন। আমি তো বাবা লেখা পড়া করি নি, কোথা থেকে জানব?' মা'র বেলাও সেই এক কথা। বাবা এবং মা লেখাপড়া না করেও কি করে এই ধরনের কথা বলতেন ভাবলে অবাক হতে হয়। এখন বুঝি বহুদর্শী জীবনে বাবার মাধুকরি সত্যটা সার্থক হয়েছে। এ অনাথ শিশুদের ঝোলা সত্যই রত্নাকর। বাবার বহু স্বরচিত গানে আছে, 'জনম জনম করে সো ফল পাওয়ে।' তার মানে প্রতিভা মাত্রই নাকি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বিচরণ শেষে শিব আর সুন্দরের জগৎ-এ পৌঁছবে একদিন। তাই যদি হয় আবার এক তানসেন বা তাঁর শেষ বংশধর উজির খাঁ বা সঙ্গীত পাগল বাবার মত শিল্পীর আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি না কেন? কে জানে বাবার উক্তি কতটা সত্য। সত্য হোলে আনন্দের আর কি হতে পারে?

চৌত্রিশ সনে এলাহাবাদে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিল। ভারতের বহু গুণী সঙ্গীতজ্ঞ সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ, বিনায়ক রাও পট্টবর্দ্ধন, ভীষ্ম দেব এবং প্রাচীন এবং নবীন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সেই সম্মেলনে তরুণ হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছিলেন। তবলায় সোলো বাজাবেন পঞ্চম সওয়ারী তালে কিন্তু কোন সারেঙ্গি বাদকই লহরা দিতে পারছে না। এই পরিস্থিতি দেখে বাবা নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বাবা তোমার সঙ্গে আমিই লহরা বাজিয়ে দেব বেহালায়।' হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাবার এই উদারতা দেখে অবাক। আজকের লোকেরা কি কেউ এই জিনিষ কল্পনা করতে পারবেন? সেই যে পরিচয় হোল তারপর পরবর্তী জীবনে কোলকাতায় বাবার সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বহুবার বাজিয়েছেন। বাবার এত গুণমুগ্ধ লোক আমি কমই দেখেছি। তাঁর কাছে বাবার বহু গল্প শুনেছি আর অবাক হয়েছি, বাবার কথা বলতে বলতে চোখে জল ভরে গেছে। যে হেতু শিক্ষিত এবং নিরহঙ্কারী সেইজন্য বাবা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাবাকে, বাবার মতো শ্রদ্ধা করতে দেখেছি। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনে তিমিরবরণ ভট্টাচার্যের মারফত বিমান ঘোষ এর সঙ্গে বাবার আলাপ হয়। সেই সময় তিনি বাবার সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যেতেন। বাবা সব জায়গায় বিমান ঘোষকে দেখিয়ে বলতেন, 'আমার ছেলে।' এর পর যখন পঁয়তাল্লিশ সনে বিমান ঘোষ-এর কোলকাতার রেডিওতে চাকরি হোল, তিনি বাবাকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিতেন। এর জন্য বিমান ঘোষ বাবার খুব প্রিয়পাত্র ছিলো। যে সময়ে দিল্লীতে বিমান ঘোষ বদলি হোল, সেই সময় দিল্লীতে বাজাতে গিয়ে অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'এই বিমান ঘোষ তোমার বড় দাদা। কোলকাতায় আমার খুব সেবা করেছে।' কোলকাতায় যে সময় বিমান ঘোষ ছিলো সেইসময় বাবা সুরশৃঙ্গারে একবার শুদ্ধ কল্যাণ এবং নট বাজিয়েছিলেন। এই বাজনা রাধিকা মোহন মৈত্র এবং অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই বাজনা আমি মৈহার থাকাকালীন শুনেছিলাম। বাবা বাড়ীতে নিজের ঘরে একান্তে যেমন বাজাতেন, রেডিওতে শতকরা পঁচিশ ভাগ বাজিয়েছিলেন। কোলকাতার রেডিও স্টেশনে যদি এই রেকর্ড থাকে তাহলে বাবার বাজনার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যেতে পারে। জলসায় বাবার বাজনা এবং বাড়ীতে একান্তে

বাজনা আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। কোলকাতায় এই বাজাবার আগে স্টুডিওর দরজা বন্ধ করবার সময় আঙ্গুলে এত জোরে লেগে যায় যে রক্তারক্তি কাণ্ড। রেডিওর ঘোষিকা নীলিমা সান্যাল বরফ দিয়ে অনেকক্ষণ বুলিয়ে দেবার পর রক্ত বন্ধ হয়। তা সত্ত্বেও সুরশৃঙ্গার এত ভালো বাজিয়েছিলেন। বাবার উদারতা, শরণাগতের প্রতি কৃপা বা সহৃদয়তা ছিল অসাধারণ। আমি বড় শিল্পী অমুক ছোটো, এধারণা বাবা কখনই পোষণ করতেন না। ১৯৪৯ সালের ১লা জুন। হিন্দু মহাসভার বরেণ্য নেতা নির্মল চ্যাটার্জির ছোটো ভাই বিমলবাবুর কলকাতার বাড়ীতে বসেছে সারারাতব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর। বাবাও উপস্থিত। নবোদিতা সারাদবাদিকা কু. শিপ্রা ব্যানার্জির সাথে সামতাপ্রসাদের সঙ্গত করার কথা। কিন্তু যথাসময়ে এসে পৌঁছয়নি। শিপ্রা আতান্তরে। বাবা বললেন, 'মাভৈ। আমি বাজাব।' শিপ্রার ভয় আর আকুতিকে অভয় দিয়ে বাবা তবলায় সঙ্গত করলেন।

পঞ্চান্ন সনের পর দিল্লীতে রেডিওতে বাজাতে গিয়ে রাগ করে রবিশঙ্করের ওখানে ওঠেননি। বাবা কাউকে জানান নি। সেই জন্য স্টেশনে কেউ নিতে আসে নি। বাবা কোথায় উঠেছেন কেউ জানে না অথচ রেডিওতে সকালে প্রোগ্রাম আছে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। হঠাৎ সকাল সাতটায় সকলে দেখল রেডিওতে পিতলের টুলে বসে বাবা মুড়ি খাচ্ছেন। বাবাকে দেখে সকলে অবাক। বিমান ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগে খবর দেননি কেন?' বাবা বললেন, 'আগে এসে রবিশঙ্করের বাসায় উঠেছি, কিন্তু এবারে উঠিনি, কেননা শিষ্যের পয়সায় খেয়েছি বলে পাপ স্পর্শ করেছে।' বাবা কাউকে না জানিয়ে দিল্লীর এক সরাইখানায় উঠেছেন। বাজানর পর বিমান ঘোষ, দেবেন্দ্র মুদগরকর সকলে বাবার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু বাবা গেলেন না। বাবার মেজাজ খারাপ হয়েছে দেখে একজন বাবার প্রিয় চুরুট এক বাক্স নিয়ে এসে হাজির। অনুরোধে একটা চুরুট খেলেন। বহু অনুরোধের পর চুরুটের বাক্সটা নিলেন, কিন্তু জোর করে দাম দিলেন। বাবার মেজাজ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় রুদ্র ভৈরব। একমাত্র শান্ত তখনই হন, যখন কেউ সততার বেলপাতার সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। একই সঙ্গে শিব আর রুদ্র।

আঠারশো একাশিসনে যে শিশু পূর্ববাংলায় নিজের বাস্তুভিটেতে জন্মেছিল বলতে গেলে বাল্যকাল থেকেই সে বাউলের জীবন অতিবাহিত করেছে। তাই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে স্থায়ীত্বের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজা অস্বাভাবিক নয়। তাই বাবার মনে যে অব্যক্ত চিন্তাটা অস্তিত্বে ছিল হঠাৎ মুখর হোল। যে দিন থেকে চাকরি পেয়েছেন মৈহারে সেইদিন থেকে তাঁর একটাই বাসনা ছিল, চালা ঘরই হোক না কেন নিজের ছাদের নিচেই শুতে ভাল লাগে। সেই নিজের ছাদের কল্পনা তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল তিল তিল করে সঞ্চয় করতে। বছর পনেরোর সঞ্চয় যখন নিজের সামনেই খুলে ধরলেন তখন আশার একটা ক্ষীণ রেখা দেখতে পেলেন। একদিন মহারাজ বাবার বাজনায় প্রসন্ন হয়ে তাঁকে এক একর জমি রেজিষ্ট্রি করে দিলেন। এখন ছোট একটা বাড়ী হয়তো বানান যায় কিন্তু তারপর?

ঠিক সেইসময়ে তিমিরবরণ যোগাযোগ করে একটা বিরাট সুযোগের সন্ধান দিলেন। বাবা পড়লেন দোটানায়। তার আগে একটা প্রাক কথন আছে সেটাকে আগে সারি।

তিমিরবরণ দুই বছর উদয়শঙ্করের সঙ্গে বিদেশে কাটিয়ে ভারতবর্ষে চলে এলেন। কোলকাতায় এসে তিমিরবরণ সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টারের সুযোগ পেয়ে আবার বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা বাতিল করলেন। যদিও তিমিরবরণের সহকারী বিষ্ণুদাস শিরালি সঙ্গীতে পরিচালনা করতে পারতেন তাহলেও উদয়শঙ্কর বিপদে পড়লেন কেননা তিমিরবরণ অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা ছাড়াও, মাঝে মাঝে একক সরোদের কার্যক্রম করতেন। বিদেশে শ্রোতারা শুনে মুগ্ধ হতেন। যদি তিমিরবরণ না যান তাহলে একক বাজনা কে বাজাবে?

উদয়শঙ্করের অবস্থা বুঝে তিমিরবরণ বললেন, 'একবার চেষ্টা করে দেখি। আমার গুরুদেব যদি যান বিদেশে তাঁর বাজনা শুনে হৈ চৈ পড়ে যাবে।' উদয়শঙ্কর হাতে চাঁদ পেলেন কিন্তু বললেন, 'সাত্ত্বিক বিচার-আচারের লোক মনে হয়েছে। তিনি কি যাবেন?' তিমিরবরণ অশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমি মৈহারে গিয়ে দেখি রাজী করাতে পারি কিনা।' তিমিরবরণ এসে বাবার কাছে এলেন। তাঁর বিদেশে গিয়ে নাম হয়েছে শুনে বাবা খুশী হলেন। তিমিরবরণ বললেন, 'বাবা আপনি যদি উদয়শঙ্করের নাচের পার্টির সঙ্গে দুইবছর থেকে প্রতি অনুষ্ঠানে সরোদ বাজান তাহলে বিদেশে সরোদের প্রচারও হবে এবং আপনি অনেক টাকাও পাবেন।' বাবার ছোট বেলা থেকেই দেশ ভ্রমণের সখ ছিল। নানা জায়গায় কত গুণী আছেন, হয়তো কারো কাছে নূতন কিছু সঙ্গীতের রত্ন পাবেন। কিন্তু বিদেশে যাবার অনেক অসুবিধা। বললেন, 'বাজাতে তো যাব, কিন্তু নাচের অর্কেষ্ট্রা ঠিক করতে তো আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।' তিমিরবরণ বললেন, 'আপনার আশীর্বাদে আমি নাচের যে অর্কেষ্ট্রা করেছি তার দেখাশোনা করবেন বিষ্ণুদাস শিরালি। আপনাকে ঐ সব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আপনি কেবল একক সরোদ বাজাবেন। তবলায় আমার ভাই শিশিরশোভন আপনার সঙ্গে বাজাবে।' বাবা অর্কেষ্ট্রার ভার নিতে হবে না জেনে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু আরও অনেক সমস্যা আছে। বললেন, 'আমি দুই বছর বিদেশে থাকলে আলিআকবর ও অন্নপূর্ণার শিক্ষা হবে না। আমি না থাকলে আলিআকবর ফাঁকি দেবে।' তিমিরবরণ বললেন, 'আলিআকবরকেও বিদেশে নিয়ে যাবেন। সেখানে শিক্ষা দেবেন।' বাবা নিশ্চিন্ত হলেন কিন্তু তবুও দুটো সমস্যা আছে। বললেন, 'আমার অবর্তমানে বাড়ীর দেখাশোনা কে করবে? তা ছাড়া মহারাজ যদি বিদেশে যাবার অনুমতি না দেন।' তিমিরবরণও নাছোড়বান্দা। বললেন, 'মৈহারের রাজার দেওয়ান অর্থাৎ প্রাইম মিনিষ্টার শিক্ষিত লোক। আপনার বাড়ীর দেখাশোনা তিনিই করবেন। আর অনুমতির কথা? বিদেশে আপনি গেলে মৈহারের রাজারও তো নাম হবে।'

বাবার সব সমস্যার সমাধান হোল। বিদেশে যাবার আগে বহুদিনের যে ইচ্ছা মাথা গুঁজবার নিজস্ব একটা কুটির করার, সেটা মাথায় ভর করলো। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসী ফকিরচাঁদ চোপড়ার কাছে গিয়ে নিজের মনের কথা বললেন। ফকিরচাঁদ চোপড়ার স্ত্রী স্বর্ণলতা চোপড়া সেই সময় বাবার কাছে সেতার শিখতেন। চোপড়া দম্পতি বাবাকে আশ্বাস দিলেন। অচিরাৎ বাড়ীর নক্সা তৈরী হোল। চোপড়া গৌতম নামে এক কন্ট্রাক্টারকে ডেকে বাবার ইচ্ছানুযায়ী বাড়ীর নক্সা করালেন। বাবা ফকিরচাঁদ চোপড়াকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বললেন কাজ শুরু করতে। বিদেশে গিয়ে বরাবর টাকা পাঠাবেন। এক বছরের মধ্যেই বাড়ী

তৈরী করে দিতে হবে। বিদেশ থেকে এক বছর পরে ফিরে নূতন বাড়ীতেই বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ফকিরচাঁদ বাবাকে আশ্বাস দিলেন।

এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বাবা আলিআকবরকে নিয়ে ঊনিশশো পঁয়ত্রিশ সনে বিদেশ যাত্রার জন্য বম্বে গেলেন। বম্বেতে যাত্রার প্রাককালেই আলিআকবর অনুভব করলেন এটা হবে তাঁর কাছে স্টর্মিভয়েজ। সমুদ্র যতই অনুত্তাল হোক, উত্তাল বাবা তো সঙ্গে থাকবেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে সেই তান তোড়া পাল্টা যে শুরু হয়েছে তা অবিরাম চলেছে। রাগ শিক্ষার সাথে সাথে সুর আর লয়ের ভিত তখন মজবুত করছেন। কিন্তু সে বয়সেও যে আলিআকবর, প্রৌঢ় বয়স্ক যে কোন সাধারণ সঙ্গীতজ্ঞের মানের চেয়ে উন্নত ছিলেন তা অনেকেই বুঝতেন না। আলিআকবর, এ কথা বুঝেছিলেন যে মৈহারে হাজার কাজের ফাঁকে বাবার শিক্ষার চাপ যতটা ছিল, সেটা বিদেশে গেলে দশগুণ বেড়ে যাবে। কারণ দিনান্তে একবার বাজান ছাড়া বাবার সারাদিনই অবসর। তাই সারাদিনই শিক্ষা চলবে। আর বাবার শিক্ষা তো কেবল রসগোল্লার রস ছিটোন নয়। তাই বিদেশে জনসমক্ষে কিশোর আলিআকবরের হেনস্থা হবার ভয় ছিল।

কিন্তু উপায় কি? একটাই উপায় বম্বে থেকে মৈহারে ফেরৎ আসা। সেটা তখনই সম্ভব, যখন কোন একটা শক্তিশালী অজুহাত দেওয়া হবে। অনেক খুঁজে আলিআকবর পেয়ে গেল। হয়তো বা স্বাভাবিকও ছিলো। মায়ের জন্য মন কেমন করছে। বাবা যে কোন অজুহাত অস্বীকার করতে পারতেন কিন্তু এটাকে নয়। কারণ মা'র থেকে দূরে থাকার বেদনা তো তিনি নিজেও পেয়েছেন। তাই আলিআকবর মৈহার যাত্রা করল। আর বাবার জাহাজ নোঙ্গর তুলে যাত্রা করল ইউরোপের দিকে।

বাবার এই চমকপ্রদ দীর্ঘ বিদেশ যাত্রার প্রচুর খুঁটিনাটি লেখা যেতে পারে। কিন্তু শুধু সে কথাগুলিই লিখব যাতে বাবাকে প্রকৃত খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিত্বটা ধরা পড়বে। যেমন তাঁর একটা স্যুট। কিন্তু বাবা জানলেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের স্যুট পরতে হয়। হীনমন্যতা জাগল মনে, কিন্তু ওখানকার লোকেরা খারাপ ভাবে নিল না। চমৎকৃত হোল তাঁর সারল্যে, সময়ানুবর্তিতা, সঙ্গীত প্রীতি, আর বয়স্কর প্রতি সম্মান দেখে। সকলেই তাঁকে আদর করে গ্রাণ্ড পা বলে। প্রবাসে থাকাকালীন বাবার এক ছাত্র এবং এক প্রিয় ছাত্রকে লেখা দুটো চিঠি প্রণিধানযোগ্য, যার থেকে বাবার বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা বোঝা যাবে। বাবা কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেশে নিজের দুই ভাই নায়েব আলি এবং ছোট ভাই আয়েৎ আলিকে বরাবর লিখেছেন। সেই চিঠির মধ্যে হয়তো ভাষার কারুকার্য নেই কিন্তু আছে প্রাণের আকুলতা। বাবার পড়াশুনা ছিল পাঠশালার দুয়ার পর্যন্ত, তাই তাঁর চিঠির মধ্যে পাণ্ডিত্য নেই। তিনি বিদেশে যা দেখেছেন যা ভেবেছেন সহজ সরল ভাবে ভাইদের জানিয়েছেন। বাবা বিশ্ব সফরে বের হয়ে যে চিঠিগুলো লিখেছেন সেই চিঠিগুলোর সাহিত্যি মূল্য আছে কিনা তাঁর মূল্যায়নের ভার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। কিন্তু ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে হয়তো এই চিঠিগুলোর মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে। এখানে চিঠির অস্তিত্বই মুখ্য, ভাষা হবে গৌণ।

যদিও বাড়ি তৈরীর সব অর্থ বাবার রোজগার হয়ে গিয়েছিল তথাপি আরও কিছুদিন বিদেশে থাকলে আর্থিক অবস্থা আরও দৃঢ় হ'তো। কিন্তু অসৎ পরিবেশ বলে বাবা সেদিক থেকে মুখ ফেরাতে বাধ্য হলেন। যাক, নূতন বাড়ী, নূতন পরিবেশ বাবাকে ধাতস্থ করাল। কিন্তু এই শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হোল না। শ্বশুর বাড়ীর অকথ্য অত্যাচারে লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা হয়ে রুগ্ন অবস্থায় বাবার স্নেহের মেয়ে জাহানারা মৈহারে চলে এসেছে। বিষণ্ন, বিশীর্ণ জাহানারাকে তখন মৃত্যুর ঘুণ ঘিরে ধরেছে। বাবা সম্ভাব্য সব চেষ্টা করলেন, কোন ত্রুটিই রাখলেন না। তবু নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁর আদরের জাহানারাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

এই মৃত্যু বাবাকে কয়েকটা বিষয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করল। বুঝলেন যে সমমাত্রিক সংস্কারের অভাব থাকলে মেয়েরা কখনও শ্বশুর বাড়ীতে সুখী হয় না। যা জাহানারার মৃত্যুর কারণ। তাই ছোট মেয়ে অন্নপূর্ণার বিয়ে দেবেন না আর জাহানারার রিক্ত স্থান পূর্ণ করার জন্য কিশোর আলিআকবরের বিয়ে দেবেন স্থির করলেন। আলিআকবরের বয়স তখন বছর পনেরো।

শিবপুরের (পূর্ববঙ্গ) এক পুলিস কর্মচারীর মেয়ে জুবেদা খাতুনের সাথে আলিআকবরের বিয়ে দিলেন। বহুদিন পরে দেশে যাবার ফলে মনের ভারটা খানিক লাঘব হোল। তবুও বেশীদিন দেশে রইলেন না। কারণ আলিআকবরের শিক্ষা বিঘ্নিত হবে। বাবা যতই পুতুল বিয়ের মত ছেলের বিয়ে দেন না কেন, ছেলে বা ছেলের বৌ ততটাই ননসিরিয়াস ভাবে ব্যাপারটাকে নেন নি। তাই যখনই তারা সত্যিকারে স্বামী-স্ত্রীর মত আচরণ করতেন বাবার পারদ ঊর্দ্ধগামী হ'তো। সত্যই এ বড় বেদনার। দাঁত আছে কিন্তু চর্ব্য নিষেধ।

বাবা আবার শিক্ষার জগতে ডুবলেন। উজাড় করে শেখাতে লাগলেন আলিআকবরকে। অন্নপূর্ণার সঙ্গীতের ভিত তৈরী করে রেখেছিলেন কিন্তু জাহানারার মৃত্যু তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছিল সেটা বোঝা গেল যখন বাবা তাঁকে বললেন, 'মা তোমাকে তোমার যন্ত্রের সঙ্গেই বিয়ে দিলাম। তোমার সারা জীবনের ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাব। তুমি মনপ্রাণ দিয়ে বাজাও। জনতার সামনে বাজিয়ে তোমাকে অর্থ উপার্জন করতে হবে না। তুমি বাজনা বাজাবে নিজের আনন্দের জন্য এবং বাজনা শোনাবে সেই উপরওয়ালা সর্বশক্তিমান ভগবানকে। সঙ্গীতই হবে তোমার স্বামী।'

দিদির কাছে দুঃখের কথা শুনে শুনে অন্নপূর্ণাদেবীরও বিয়ের প্রতি জেগেছিল বীতরাগ। দিদির কথা কানে ভাসতো 'বোন বিয়ে করিস না।' মানসিক অবস্থা যখন এই রকম, তখন বাবা নিয়মিত শিক্ষা দিতে লাগলেন। অন্নপূর্ণাদেবী মন প্রাণ ঢেলে সঙ্গীতে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তখন কি তিনি জানতেন যে তাঁকেও বিয়ে করতে হবে এবং পরিণাম হবে জাহানারার চেয়েও খারাপ। জাহানারাকে তো একবারেই দগ্ধ করেছে আর তাঁকে চিন্তায় আজীবন দগ্ধ হতে হবে।

প্রথম প্রথম আমরা ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠি। তারপর যত দিন চলে যেতে থাকে ততই আমরা অন্য কোনও নূতন দুর্ঘটনায় আকস্মিকতায় পুরনো দুর্ঘটনাকে ভুলে যাই। ভুলতে ভুলতে একদিন আমাদের মন থেকে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শেষকালে

যত আমাদের বয়স বাড়ে একটার পর একটা আঘাত এসে আমাদের অসাড় করে দেয়। আমরা পাথর হয়ে যাই। বাবার জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

বাবা কত সাধ করে ছেলের বিয়ে দিয়ে ছোট পুত্রবধূ নিয়ে এলেন কিন্তু একটা বছর শেষ হবার আগেই বাড়ীতে যেন বজ্রাঘাত হোল। এই বজ্র পড়ার আগে থেকেই মেঘের কোলে মেঘ কিন্তু জমতে আরম্ভ করেছিল। সেই পূর্ব মেঘের একটু বর্ণনা প্রয়োজন। আগেই লিখেছি যে জুবেদা বৌমার মৈহারের বাড়ীতে প্রবেশ মূল চরিত্র হিসাবে যতটা, তার থেকে বেশি জাহানারার শূন্য স্থান পূরণে। তাই সাধারণতঃ কোন শ্বশুর শাশুড়ীর পুত্রবধূর কাছে যতটা কামনা থাকে, তার থেকে অনেক বেশি জুবেদার কাছে আশা করতে আরম্ভ করা হোল। গ্রাম বাংলার সরল কিশোরীর প্রাণ তখন খেই সামলাতে ওষ্ঠাগত। এই সময় বজ্রাঘাত হোল। পরম স্নেহের পুত্রবধূ যাঁকে বাবা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পাকা গৃহিণী করবার জন্য, কখনও শেখাচ্ছেন রান্না আর কখনও সেলাই। সেই জুবেদা হঠাৎ তাঁর চোখের বালি হয়ে উঠল। যার কড়কড়ানি সারাতে জুবেদাকে বাবার আমৃত্যু করতে হোল। কিন্তু তাতে সেরেছিল কি?

ঘটনার সূত্রপাত হোল এমনি ভাবে। বাবার পুরোদমে শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রাণঢালা শিক্ষা আর না পারলেই লাঠ্যৌষধি। আলিআকবর যদিও লাঠ্যৌষীতে অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু পরের মেয়ের উপস্থিতিতে আঘাতটা যত শরীরে হয় তার থেকে বেশি হ'তো মনে। পরিণাম হোল একদিন সকালে বাবা আবিষ্কার করলেন ছেলে রিয়াজ করছে না তো। খুঁজতে খুঁজতে দোতলায় ঘরে গিয়ে দেখলেন, খোলা জানালার গরাজে বাঁধা রয়েছে একটা দড়ির মাথা। সেই দড়ি বেয়ে যখন তার চোখ নিচে পৌঁছল বুঝতে বাকি রইল না এ পথেই পাখি উড়েছে। যন্ত্র, জামাকাপড় আর গোটা শরীরটাকে নিয়ে আলিআকবর একা একাই এ খেয়া পার করছে এই লয়টা বাবার মাথায় ঢুকল না। সুতরাং সুগ্রীব দোসরের উপর বাবার যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ল। যদিও ক্ষীণ কণ্ঠে পুত্রবধূ বোঝানোর চেষ্টা করলো যে সে অসুস্থা এবং এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। কিন্তু ততক্ষণে বাবার যা মানসিক অবস্থা তাতে যুক্তি তর্ক আর কাজ করছে না।

গ্রেট এস্কেপের পরে মুক্ত বিহঙ্গের মত আলিআকবর বোম্বাই-এর পথে ধাবিত। কোথায় আলিআকবরের গতিপথ আর কোথায় রাজারাজড়াদের ক্ষমতা। বাবা মহারাজের কাছে ছুটে গিয়ে সব কথা বলার পরই মহারাজের পেয়াদা ছুটল চারিদিকে। 'বিশ্ব-নিখিলের মাঝ মুক্তির সন্ধানে' ট্রেন ধরে যখন আলিআকবর বম্বে থেকে এলাহাবাদে যাত্রা করছে তখন মাঝপথে সাতনায় তাঁর যাত্রা ভঙ্গ হোল। রাজার পাইক বরকন্দাজেরা আলিআকবরকে বগলদাবা করে মৈহারে হাজির করলো। বাবার হাতে মারের ভয়ে আলিআকবর পলাতক হয়েছিল, ফেরৎ আসামাত্র বাবা চতুর্গুণ করে তা মিটিয়ে নিলেন। আলিআকবরের কাছে মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া নঃ পন্থা। যাক, আবার শিক্ষার নৌকার পালে হাওয়া লাগলো।

আঠারশো আঠারো সালে ইংলণ্ডে ঘটেছিল শিল্প বিপ্লব। সেই বিপ্লবের পরিণামে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যবসা এবং ব্যবসামানসিকতা। এই ছড়িয়ে পড়ার শ'খানেক বছর পর সেই মানসিকতা পাকা এবং পোক্ত অর্থাৎ কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয় বা

কিছু দিলেই তবে কিছু পাওয়া যায়। এই দেনা পাওনাটা সব অঙ্গেই ইউরোপে তখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যে ইউরোপে যায় তাঁর উপরেই এই মানসিকতার কমবেশী প্রভাব পড়ে। যাঁর নিজের রং কাঁচা, তাঁর উপর একটু বেশি গাঢ় ছোপ পড়ে। এই দেনা পাওনার আর একটা অঙ্গ আছে। তা হলো ওয়াইজ ইনভেষ্টমেন্ট। যার বাংলা করলে দাঁড়ায় চাতুর্যপূর্ণ বিনিয়োগ। অর্থনীতির এই পরিভাষাটি প্রাসঙ্গিক বলেই উল্লেখ করলাম।

উদয়শঙ্করকে দুটো জিনিষ প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। প্রথমতঃ বাবার সর্বব্যাপ্ত প্রতিভা আর দ্বিতীয়তঃ বিদেশে একক বাজনার প্রতি জনগণের আকর্ষণ। আর এই আকর্ষণকে বাস্তবায়িত করার আধার আর উৎসাহ ছিল তাঁর অনুজ অর্থাৎ রবিশঙ্কর। উদয়শঙ্কর মানুষ চিনতেন। বুঝতে পেরেছিলেন ছোট ভাই রবি উর্বরা মাটি। সঠিক কৃষি করলে হয়ত সোনা ফলতে পারে।

ভাইয়ের ভবিষ্যৎ বা সোনার ফসলের স্বপ্ন উদয়শঙ্করকে বাবার কাছে আসতে বাধ্য করলো। তিনি ষোল বছর বয়সের রবিশঙ্করকে সাথে নিয়ে মৈহারে এসে পৌঁছলেন। যদিও মৈহারে আসার আগে রবিশঙ্করের জীবনে অল্পকালীন সঙ্গীত শিক্ষা তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালি এবং গোকুল নাগের কাছে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মনে কোন বড় ফসলের কামনা ছিল না। তাই না পেরেছিলেন পূর্বোক্ত শিল্পীরা গুরুর গুরুদায়িত্ব নিতে আর না পেরেছিল রবিশঙ্কর তাঁদের শিষ্যপদবাচ্য হতে। বাবার কাছে আসার পরে বাবার সোজাসুজি আদেশ, 'যদি শিখতে হয় তাহলে অনেক কিছুই ছাড়তে হবে। যেমন সঙ্গীতের বহুধা মানসিকতা অর্থাৎ আজ নাচ, কাল সেতার, এসরাজ, জলতরঙ্গ বাজনা, পরশু গান। সবচেয়ে বড় জিনিষ ইউরোপীয় কু-প্রভাব যদি আদৌ প্রবেশ করে থাকে শরীরে অর্থাৎ প্রজাপতি ভাব, তাকে পত্রপাঠ দূর করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা সম্ভব নয়।' উদয়শঙ্কর এই তত্বটি ভাল করেই ভাইকে বোঝালেন। না হলে সম্ভব ছিল না বাবার চরণে ঠাঁই পাওয়া। রবিশঙ্কর বুঝল যদি শিখতে হয় তবে এ সত্যকে স্বীকার করে নিতেই হবে।

শিক্ষা শুরু হোল। বাল্যকাল থেকে সারা ইউরোপ চষা ঝোড়ো হাওয়া মৈহারের পরিবেশে এসে মন্দবায়ু হোল। রবিশঙ্কর বাস্তবকে স্বীকার করে নিল। যদিও বাবা ঊনচল্লিশ সনে প্রাপ্তবয়স্ক আলিআকবরকে নির্যাতিত করতে ছাড়েন নি। নবীন রবিশঙ্কর কিন্তু গুরুকরস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলেন। বাবার কথায় ফর্সা মুখটা লজ্জায় লাল হলেও পিঠ লাল হ'তো না। যদিও রবিশঙ্করের জন্য ছেলে বকুনি খেত। অপটু হাতের শিক্ষানবিশে বাজনা শুনে কেউ হাসে এটা বাবা পছন্দ করতেন না। যাই হোক, এখানেই প্রথম মিত্রবৎ অবতীর্ণ হোল আলিআকবর। যেমন আলিআকবর পেল বন্ধু, রবিশঙ্কর পেল পথনির্দেশক। রবিশঙ্করের দেওয়ার মধ্যে ছিল বিদেশে ঘোরা নন্দনতত্ত্বের জ্ঞান আর আলিআকবরের কাছে ছিল এক যুগের বেশী সঙ্গীত শিক্ষা। তাই স্টেজ রিহার্সাল আলিআকবর করিয়ে দিত যাতে বাবার মঞ্চে রবি পাঠ না ভুলে যায়। যদিও এ কথা সখাভাবে শেখায়, একপক্ষ চেপে যেতেই পছন্দ করেছে জীবনভোর, যাক সে ভিন্ন কথা।

চৌদ্দ পনের বছর বয়সে আলিআকবর কি ছিল এটা নিয়ে অনেকে অজ্ঞ উক্তি করেন। কেউ লেখেন ছেলেটা তখন ভালই বাজাচ্ছিল। আবার কেউ লেখেন সেই সময়কার বাজনা শুনে বোঝাই যেত না ওর মধ্যে এত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। সব চেয়ে মজার কথা এক ভদ্রলোক আগ বাড়িয়ে লিখেছেন, কিশোর আলিআকবর প্রণাম করতে এলো বাবার আদেশে ইত্যাদি। এখানে জানিয়ে রাখা ভাল সেই সময়কার আলিআকবর একমাত্র সমকালীন দুজন সরোদবাদকের কাছে যথার্থ ভাবে মাথা নত করার যোগ্য ছিল। তাঁরা হলেন বাবা স্বয়ং এবং উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ। এতদভিন্ন সমকালীন কোন সরোদবাদক বা যে কোন সাধারণ প্রাচীন বা অর্বাচীন বাদকরা, আলিআকবরের সমতুল্য ছিলেন না।

এর পরে বাবার জীবনে খুব দ্রুত পট পরিবর্তন হয়েছে। জুবেদার একটি ছেলে হয়েছে। বাবার শিক্ষায় আর আলিআকবরের সাহচর্যে রবিশঙ্কর পরিণত হচ্ছে। মা সারদা দেবীর মন্দিরে উদয়শঙ্করের করবদ্ধ প্রার্থনা বাবা ফেলতে পারেন নি তাই অন্নপূর্ণার বিবাহ রবিশঙ্করের সঙ্গে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই বিয়ের পর অন্নপূর্ণাদেবী প্রথম ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভিন্ন, পরপুরুষ দেখলেন।

রবিশঙ্কর প্রাক্‌বিবাহ যে কয়েকটা বছর শিক্ষা করেছিলো, তা নির্দিষ্ট সময় অন্য বাড়ীতে থেকে এসে শেখা। সে শিক্ষার সময় বাবা যে মেজাজের মানুষ তাতে আলিআকবরই সামনে থাকতে পারত না, অন্নপূর্ণাদেবী তো অনেক দূরের কথা। তাই প্রাক্‌বিবাহ রবিশঙ্কর কোনদিন পুরো চোখ খুলে অন্নপূর্ণাদেবীকে দেখেছিল এটা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বিড়ম্বনা এই, যেহেতু লোকে মৈহারের পরিবেশ জানে না, তাঁরা জানে শুধু রবিশঙ্করের অতীত আর বর্ত্তমান, তাই ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান সিদ্ধান্ত 'বহ্নিমান ইতি ধূম্র'কেই প্রয়োগ করতে থাকে। পরিণাম, অসংখ্য জায়গায় এই ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছিল বা হচ্ছে যে নিশ্চয়ই প্রাক্ পরিণয় প্রণয় ছিল। তাঁদের কি করে বোঝাই অনুমানের ব্যতিক্রম হয়। যেমন শীতকালের মধ্যেরাত্রে পরিপূর্ণ সরোবারের জল থেকে ধূম্র ওঠে। কিন্তু সেখানে আগুন নেই। তেমনি কন্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার মত পালিতা আলাউদ্দিন দুহিতা অন্নপূর্ণা হরিণ ভিন্ন কোন পশুই দেখেন নি। ব্যঘ্র বা ব্যঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ তাঁর কাছে নূতন ব্যাপার।

কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হোল বাবার চারিত্রিক মহত্ত্ব। যে কোন শিল্পীকে যে কোন পর্যায়ে গিয়ে সাহায্য করতে বাবার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। সেটা তবলাবাদকের খারাপ লহরার অভাব, আর কখনও ঠুংরী গায়কের তান খরাাপ হবার ভয়ে, বাবার তবলা বাদকরূপ। কোন ক্ষেত্রেই বাবা নিজেকে হীন অনুভব করতেন না। এর একটা ব্যতিক্রম ছিল। আর সেটা হোল বিদ্যাজনিত বিনয়ের স্থানে, অবিদ্যাজনিত অহঙ্কার দেখলে বাবার মাথা ঠিক থাকতো না। তৎক্ষণাৎ গর্বকে খর্ব করার জন্য মুষল হতেন। এই ঘটনাগুলোকে আরো ভালভাবে জানা যায় কয়েকজন অনুগতের এবং কয়েকজন উদ্ধতের ঘটনা অনুধাবন করলে। কয়েকটা ঘটনার কথা লিখলেই পাঠকরা বাবার চারিত্রিক মহত্ত্বটা বুঝতে পারবেন।

ছত্রিস সনে লক্ষ্ণৌতে এক সঙ্গীত সম্মেলনে একজন মহিলা শিল্পী বিষ্ণু যুগেশিয়া ঠুংরী গাইছিলেন। যে তবলায় বসেছিল ঠিকমত সঙ্গত করতে পারছিল না। হঠাৎ বাবা স্টেজে গিয়ে ছেলেমানুষ তবলাবাদককে বললেন, 'বেটা আমি একটু বাজাই, গায়িকা এবং

তবলাবাদক বাবাকে দেখে অবাক। তরুণ তবলাবাদক সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে বাজাতে আহ্বান করলেন। যদিও বাবা নিজে ঠুংরী দাদরা বাজাতেন না। যেহেতু সঙ্গতের অভাবে গানটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেইজন্য বাবা বাজাতে লাগলেন। দাদরা কাহারবাতে বাজাবার পর গায়িকাকে নিভৃতে ডেকে বাবা বললেন, 'বেটি তুমি যা গাইলে, পাপিহা পিয়া কি বোলী বোল, এই গানের ভাবটিই তুমি নষ্ট করে দিলে। কিছু মনে করো না আমার কথায়। গানের ভাবার্থের মধ্যে ঢুকতে হবে।' তাঁকে বাবা গানটা গেয়ে শোনালেন। তারপর বললেন, 'তোমার গলাটা মধুর কিন্তু ভাবের অভাব। গানের ভাবটা ঠিক হোলে আরো রস হবে।'

ছত্রিশ সনে একবার বাবা বাজাতে গেছেন পাটনাতে। বাজনা শেষ হবার পর একটি পরিণত বয়স্ক লোক বাবার সঙ্গে দেখা করল। লোকটি গরীব, তাঁর দেশ কুমিল্লাতে। বাবার কাছে একটি সরোদ চায়। বাবার অনেকগুলো সরোদ ছিল। যে হেতু দেশের ছেলে, সেইজন্য মৈহারে নিয়ে গিয়ে লোকটিকে একটি সরোদ দেন। সেই লোকটি পরবর্তীকালে নিজের ছেলে কাঞ্চন নন্দীকে সরোদটা দেয়। দীর্ঘ আঠার বছর পরে বাবা যে সময় পাটনায় যান, শুনতে পেলেন কাঞ্চন নন্দী সরোদটা বিক্রি করে দিয়েছে হরি নারায়ণ কর্মকার বলে একটি লোককে। এ কথা শুনে বাবা অত্যন্ত চটে যান। কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা বাবার সেই সরোদটা পাটনায় উপস্থিত সমরজিৎ মুখার্জির কাছে আছে। কালীমূর্ত্তি অঙ্কিত এই সরোদটি আমার পাটনায় থাকাকালীন আমার সেতারের ছাত্র অরূপরতনের বাবা আমাকে দেখিয়েছিলেন। আরও শুনেছিলাম, উস্তাদ বাবা পাটনায় এসে অরূপরতনের মামার বাড়িতে উঠেছিলেন।

বাবার কাছে মৈহারে এসে অনেকে শিখেছেন, আবার অনেকেই মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। তেতাল্লিস সনে বাবার দেশের একটি ছেলে বাবার সঙ্গে দেখা করল লক্ষ্ণৌতে শিক্ষাকালীন। লক্ষ্ণৌতে বাবা গিয়েছিলেন বাজাতে। ছেলেটি বাবার বাজনার পর গিয়ে বলল, 'আমি যখন কুমিল্লাতে পড়তাম তখন আপনাকে দেখেছিলাম একবার। উপস্থিত আমি ভাতখণ্ডে কলেজে সেতার শিক্ষা করি। আমার একান্ত বাসনা মৈহারে গিয়ে আপনার কাছে শিখি।' ছেলেটির নম্র স্বভাব এবং দেশের লোক ভেবেই বাবা মৈহারে যেতে বললেন। মৈহারে কয়েকবছর তাঁকে সেতার শেখালেন। অন্নসংস্থানের জন্য কয়েকটি টিউশান ঠিক করে দিলেন। পরবর্তীকালে দিল্লীতে তাঁকে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সেই ছেলেটি বাবার মৃত্যুর পর এসেছিল। ছেলেটি উপস্থিত বয়স্ক। বাবা তাঁকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তাঁর নাম রেবতী রঞ্জন দেবনাথ।

আশুতোষ ভট্টাচার্যকে একবারমাত্র বাবা নিজের ছাত্র রাম গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখলেও দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আটত্রিশ সনে এলাহাবাদ কনফারেন্সে তাঁকে দেখেই চিনতে পারলেন। যখন জানতে পারলেন যে কণ্ঠেজীর কাছে শিখেছে সঙ্গে সঙ্গে তরুণ এ্যামেচার বাজিয়ে আশুতোষকে বাজাবার সুযোগ দিলেন। বাজাতে বসে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'আরো বাজাও, আরো বাজাও।' যে হেতু আশুতোষ 'দাদু' বলে সম্বোধন করে বিনীত আচরণ করেছিল তাই বাবার স্নেহ পেল। কয়েক বছর পরে বাবার নাতিটি যখন কবিরাজ হোল, তখন থেকে দীর্ঘ দশ বছর বার বছর দিল্লীর ছোট ছোট আসরে এবং কলকাতার সঙ্গীত সম্মিলনীতে বহু বাজাবার সুযোগ দিয়েছেন।

দিল্লীতে ঊনচল্লিশ থেকে প্রায় চার বছর আশুতোষ তাঁর ঠাকুরদার শিষ্যের বাড়ীতে থেকে কবিরাজি শিখত। সেই সময় বাবা দিল্লীতে রেডিও কিংবা কোন জলসায় বাজাতে গেলে শিল্পপতি ভরতরামের বাড়ীতে উঠতেন। ভরতরামের স্ত্রী শীলা বাবার কাছে সেতার শিখতো। সেই সময় রেডিও স্টেশন ছিল টিমারপুরে। বাবা আশুতোষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে সবজায়গায় বাজাতেন। রেডিওর ডাইরেকটারকে বলে দিয়েছিলেন যেন তার নাতি আশুতোষকে বাজাতে দেওয়া হয়। সেই সময়ে ইয়োরোপিয়ান ডাইরেক্টার ছিলেন, আর হাবিবুদ্দিন খাঁ রেডিওর ষ্টাফ আর্টিষ্ট ছিলেন। একবার ডাইরেক্টার বাবাকে বললেন, 'হাবিবুদ্দিনের সঙ্গে বাজাতে।' বাবা বললেন, 'আমার নাতি কবিরাজ আশুতোষ বাজাবে। এ বড় ঘরের ছেলে। রেডিওর গাড়ীতে আমাকে নিয়ে আসে, পৌঁছে দেয়।' আশুতোষ ভট্টাচার্যই বাবাকে অনুরোধ করে বললেন, 'হাবিবুদ্দিন খুব ভাল বাজায়, ওঁর সঙ্গেই বাজান।' বাবা রাজী হলেন। আশুতোষকে নিয়ে রেডিওর স্টেশনের মধ্যে ঢুকে দেখলেন হাবিবুদ্দিন তিরকিটি সাধছে। আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা বাহাবা দিচ্ছে। ঈদের সময় রোজার পর, বাবা যাবার পরই এই দৃশ্য দেখে নিজের যন্ত্র মেলালেন। একটু আলাপ করেই দ্রুত গৎ ধরলেন। হাবিবুদ্দিনকে ইসারা করলেন বাজাতে। কিন্তু ঠেকা ছাড়া সেই দ্রুত দরজায় কিছুই বাজালেন না। অতি দ্রুত গৎএ কেবল কোনরকমে বিট রাখলেন। বাজনার পরই হাবিবুদ্দিন কিছু না বলে উঠে চলে গেলেন। বাবা আশুতোষকে বললেন, 'কি দাদু, এত ভাল বাজায় বলছিলে, অথচ কিছুই তো বাজাল না।' যে হেতু নাতির সম্বন্ধ সেই জন্য আশুতোষ বলল, 'দাদু আপনি তো বাজাতেই দিলেন না।' বাবা বললেন, 'আসলে কি জান, এখন অল্প বয়স, শিক্ষা করছে। অহঙ্কার থাকলে উন্নতি করা যায় না। বাজাবার আগে বড়র থেকে ইজাজাৎ নিতে হয়। ও তো আমার ছেলের বয়সী। এর আদব নাই বলেই শিক্ষা দিলাম বাজিয়ে।'

বাবা বরাবরই নূতন তবলাবাদকের বাজাবার সুযোগ দিতেন, যা সেই সময়কার গায়কবাদকরা দিতেন না। পঁচিশ সনে কলকাতার রাইচাঁদ বড়ালকে নিয়ে বাবা লক্ষ্ণৌ অখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে বসলেন। রাইচাঁদ বড়াল বাড়ীতে অনেকের সঙ্গে বাজিয়েছেন কিন্তু সঙ্গীত সম্মেলনে বাবার সঙ্গে প্রথম বাজান। এর পর চুয়াল্লিশ সনে এলাহাবাদে শামতাপ্রসাদকে নিয়ে কেউ বসছেন না দেখে বাবা শামতাপ্রসাদকে নিয়ে বাজালেন। এর পর ঊনপঞ্চাশ সনে প্রথম কিষণকে নিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায়, কাশীতে বসে বাজালেন। এ সব লেখার একমাত্র কারণ যাঁরা বাজাবার সুযোগ পেত না, সেই নবীন শিল্পীদের বাবা সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে সঙ্গে নিয়ে বাজাতেন।

বাবা কয়েকটা গান গাইতেন যা ভাবপ্রধান। মৈহারে এক সন্ন্যাসী বাবার কাছে এলেন। বাবা গো-শালায় তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাসন এবং রান্নার সব সামগ্রী দিলেন। কয়েক দিন থাকবার পর যখন সন্ন্যাসী যাবার কথা বললেন, বাবা হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে তিলক কামোদ রাগে রূপক তালে গেয়ে উঠলেন, 'হে কান্হা, হিল মিল কে বিসর না যাইও।' অর্থৎ হে কৃষ্ণ, এত মিলে মিশে যাবার পর আমাকে যেন ভুলে যেও না।

একদিন বেহালা বাজিয়ে ঝিঁঝিট রাগে আবেগের সঙ্গে গাইলেন,

'মা আমারে শিখিয়ে দেরে
কেমন করে তোকে ডাকি।
এক ডাকে ফুরিয়ে দেরে
জনম ভরার ডাকাডাকি।
এর পরই পাহাড়ী রাগে গাইলেন
'কইও দুষ্ক বন্দের নাগাল পাইলি গো,
নিরলে কইও দুষ্ক বন্দের নাগাল পাইলি।'

এই গানটির ভাষা পূর্ববঙ্গের। দুষ্ক মানে দুঃখ। বন্দের মানে বন্ধু। নিরলে মানে চুপ চাপ। উপরোক্ত গানের অর্থ, সখি গো আমার বাড়ীর উপর দিয়ে প্রাণের বন্ধু চলে গেল দুঃখ দিয়ে, তাঁকে চুপচাপ বলো আমাকে কি তাঁর বন্ধুর কথা মনে পড়ে নি?

মাঝে মাঝে ভাবে বিহ্বল হয়ে গাইতেন, 'পুরান কথা জাগাই এ দোরে, নূতন হয়ে উঠুক ভেসে।' আবার গাইতেন। 'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।' বাবা ঝিঁঝিট, পাহাড়ী, পূর্ববঙ্গের ভাষার গান এবং তুমি হে ভরসা মম, শিখেছিলেন মেজভাই আফতাবুদ্দিনের কাছে। এই গান শিক্ষার একটা ইতিহাস আছে।

বাবার গ্রামের পাশে সাতজোড়া নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে মনমোহন দত্ত নামে এক সাধু বাস করতেন। আফ্তাবুদ্দিন তাঁর সংস্পর্শে আসেন। মনমোহন দত্ত সুন্দর গান রচনা করতে পারতেন। লবচন্দ্র পাল নামে এক শিষ্য, গানগুলো সংরক্ষণ করতেন। আফতাবুদ্দিন সেই গানগুলির সুর দিতেন। এই তিনজনের আদ্যক্ষর দিয়ে ম-ল-আ নামে পরিচিত ছিলেন। 'ম' মানে মনমোহন দত্ত। 'ল' মানে লব চন্দ্র পাল এবং 'আ' মানে আফতাবুদ্দিন। এই গানগুলি বাবা বৃদ্ধ বয়সেও ভোলেন নি, যা আগেই লিখেছি।

মৈহারের ব্যাণ্ডপার্টি থেকে একবার নিজের আস্তানায় ফিরছেন। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। নমাজ পড়বার সময় হয়ে গিয়েছে। জল চাই অজু করবার। বাবার এই অবস্থা দেখে এক মহিলা বাবাকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নমাজ পড়বার জন্য বললেন। নমাজ পড়া হয়ে গেলে মেয়েটি নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমার অপরাধ নেবেন না। আমার নাম অঞ্জলি বাঈ।' বাবা সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন, 'ধ্যান লাগি রহে তুয়া চরণ মে।'

কথায় বলে, যদি কেউ ভাল করে মাজতে পারে তা হলে পেতলের বাসনও সোনার বাসন বলে মনে হয়। বাবাও এই কথাটা বরাবর বলতেন কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লোকে শিক্ষা নিতো না। কারণ তাঁদের মাথায় ঢুকে গেছে যে তাঁরা খলিফা। হাঁ, এ কথা ঠিক যে রিয়াজ করলে তাঁরই হবে যাঁর ভেতরে কিছু তত্ত্ব আছে। পায়েস হলেও নিঃসন্দেহে তা সুস্বাদু হবে না। বাবার আসলে রাগ ছিল এ্যামেচার শব্দের ওপর। ওনার ধারণা ছিলো এ্যামেচারদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু আর্থিক লাভ নেই, তাই অসতর্ক এবং উদাসীন হয়ে থাকে। সেখানেও তিনি একটা প্রোফেসনালিজম কামনা করতেন। বিদ্যা অর্থকরী হোক, এটা না চাইলেও বিদ্যার অর্থবোধ হোক এটা তিনি চাইতেন। সেই রকম বহু শিল্পীকে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সুশিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা করতে ক্ষান্ত হতেন না। বাবা বামা কণ্ঠ ধ্রুপদ

গায়ককে বলতেন, 'ধ্রুপদের জন্য মর্দানা আওয়াজ চাই, তাই ঠুংরী গাও।' আবার কখনও প্রিয়জনদের মাধ্যমে বলতেন, 'আরে অমুককে বোলো, কি ছাইএর তবলা বাজায়? খালি তো বকুম্ বকুম্ আওয়াজ শুনি। নিজের গুরুর কাছে ভালভাবে শিক্ষা করে না কেন?' এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা আছে যা লিখে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে ছোট করতে চাই না।

আলিআকবরের বয়স তখন সবে একুশ বছর। বাবা বরাবরের মতোই লক্ষ্ণৌ রেডিওতে বাজাতে যাচ্ছেন। সেই সময় ব্রিটিশ শাসনকাল। ইংরেজ স্টেশন ডাইরেক্টার খবর পেয়েছেন, ছোট থেকে আলিআকবর সরোদ বাজাচ্ছে, তাই বাবাকে বললেন, 'আপনার ছেলেকে রেডিওর অর্কেষ্ট্রার প্রাধান হিসাবে নিয়োগ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।' রেডিওর চাকরি সম্মানজনক, সেইজন্য বাবা রাজী হয়ে গেলেন। আলিআকবর তখন থেকে মৈহার ছাড়ল। তাঁর বাজনা রেডিও থেকে হতে লাগল এবং ধীরে ধীরে সঙ্গীতপ্রেমীরা ছোট ছোট জলসায় তাঁর বাজনা শুনে প্রশংসা করতে লাগল। কয়েক বছর চাকরি করতে না করতেই আলিআকবর যোধপুর যাবার সুযোগ পেল। যোধপুর যাবার কারণও কিন্তু বাবাই। যোধপুর মহারাজের দরবারে বাবা বাজাতে গেছেন। বাজনা শুনে যোধপুরের মহারাজ বাবাকে অনুরোধ করলেন যোধপুরের কোর্ট মিউজিসিয়ান হবার জন্য। অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বাবা বললেন, 'মৈহারের মহারাজের কাছে দীর্ঘদিন আছি। সুতরাং সেই জায়গা ছেড়ে আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। তবে আপনি যদি আমার ছেলেকে উপযুক্ত মনে করেন তা হলে তাঁকে রাখতে পারেন।' এই কথা শুনেই সঙ্গীতপ্রেমী যোধপুরের মহারাজা আলিআকবরকে কোর্ট মিউজিসিয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। রাজা আলিআকবরকে সরোদ নওয়াজ উপাধিতে ভূষিত করলেন। আলিআকবর যোধপুরের মহারাজার জীবিতকালীন যোধপুরেই ছিলেন।

শিক্ষা বা শিক্ষা শেষে শিষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব, উভয়ই যথার্থ কাঁধে ন্যস্ত, এ কথা বাবা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই পুত্র আলিআকবরকে যেমন শিখিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি পরের ছেলে রবিশঙ্করকেও।

তেতাল্লিশ সনে দিল্লীর ভরতরাম পরিবারের সঙ্গে রবিশঙ্করের পরিচয় করিয়ে একটা বন্দোবস্ত করে দিলেন। পরবর্তীকালে এই ভরতরাম পরিবারের বিরাট অবদান আছে রবিশঙ্করের উজ্জ্বল খ্যাতির পেছনে। যাক সেটা বিষয়ান্তর।

লক্ষ্ণৌ থাকাকালীন আলিআকবর এলাহাবাদের বেহালাবাদক জীবন মজুমদারের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দেন। জীবন মজুমদার সাতাশ সনে এলাহাবাদে মেয়র কলেজে বাজিয়ে বাবার হাতে প্রাইজ পায়। এর প্রায় ছয় বছর পরে জীবন মজুমদার বাবার বেহালা শুনে প্রভাবিত হয় কিন্তু সাহস করে বাবার কাছে যেতে পারে নি। আলিআকবর পরিচয় করিয়ে দেবার পর বাবা এলাহাবাদে গিয়ে কয়েকবার জীবন মজুমদারের বাড়ী উঠেছেন।

একবার এলাহাবাদে সিনেট হলে জীবন মজুমদার বেহালায় তোড়ি বাজিয়ে, পরে ঠুংরী অঙ্গে ভৈরবী বাজায়। এই বাজনা বাবা সামনে বসে শুনেছিলেন। এনায়েৎ খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ সাহেব প্রভৃতি গুণী সঙ্গীতজ্ঞরাও বসেছিলেন। বাজনার পরের দিন কনফারেন্সের কর্ণধার দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গিয়ে বাবাকে দেখতে পেয়ে, জীবন মজুমদার বাবাকে

প্রণাম করে। সংবাদপত্রে পরের দিন বাজনার প্রশংসাও বেরিয়েছে। জীবন মজুমদারের বাবাও সঙ্গে গিয়েছেন। তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল জীবনের ভৈরবী কেমন লাগল আপনার?' বাবা বুঝলেন ব্যাপারটা। ছেলের বাজনার প্রশংসা কাগজে বেরিয়েছে সুতরাং পুত্রগর্বে কোন বাবার না ভাল লাগে। কিন্তু বাবা জীবন মজুমদারকে ডেকে বললেন, 'তুমি গতকাল যে ভৈরবী বাজিয়েছ ওকে কি ভৈরবী কও? যে দিন ভৈরবী বাজিয়ে ঐ রকম প্রশংসা পাবে সে দিন বুঝবে সঙ্গীতে প্রবেশ করেছ। শুদ্ধ ভৈরবী অতি গম্ভীর রাগ। মালকোষ, দরবারী, শুদ্ধ কল্যাণের মত।' তারপর শুদ্ধ ভৈরবী বাজিয়ে বোঝালেন কোমল স্বরের শ্রুতির প্রয়োগ। পরে বললেন, 'এই ভাবে বাজিয়ে পরে আমাকে শুনিও।' এই ঘটনার প্রায় এক বছর পরে বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই, বাবা জীবন মজুমদারকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভৈরবীর কি হোল?' সঙ্কোচে জীবন মজুমদার বলল, 'চেষ্টা করছি।' আবার বাবা বেহালায় অনেকক্ষণ শেখালেন। বাবার এই শিক্ষা, জীবন মজুমদার জীবনের অন্তিমলগ্নে ভোলেন নি। ছেচল্লিশ সনে সেই সময় এলাহাবাদ স্পোর্টিং ক্লাব বাবার সম্বর্দ্ধনা করল। লোকের হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও বাবা বললেন, 'আমি কুলিকাবারি লোক, প্রথম সারিতে বসব না। কত গুণীজন শিক্ষিত লোক এসেছেন তাঁরাই বসুন।'

উনিশশ ঊনপঞ্চাশ সনের পয়লা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে প্রথম যখন রেডিও স্টেশন খুলল, বাবা বাজালেন। সে বারেই, জীবন মজুমদারের বাবার অনুরোধে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। বাবা পারতপক্ষে কারও বাড়ীতে উঠতে চাইতেন না। কিন্তু যেহেতু জীবন মজুমদারকে ভালবাসতেন এবং সে যুগে একটি বাঙ্গালী পরিবারে সঙ্গীতের সখ আছে বলেই গেলেন। রেডিওতে বাজাতে যাবার সময় সকলকে রেডিওতে নিয়ে গেলেন। বাবা খুশী হয়ে জীবন মদুমদারের বাবাকে বললেন, 'আপনার বাড়ীর প্রতিটি ইঁটে সঙ্গীতের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।'

১৯৩৯ থেকে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত বাবা লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে পরীক্ষা নিতে যেতেন। সেই সময় শিক্ষার্থী ভি. জি. যোগের শ্রদ্ধা দেখে শেখাতেন। একচল্লিশ সনে যোগ একবার বাবার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ থেকে মৈহারে এলেন। সময়টা ছিল শীতকাল। রাত্রে ট্রেনে বাবা নিজের কম্বল দিয়েছেন যোগকে। পালটা, সরগম এবং ভায়োলিনের কিছু টেক্‌নিক্ শেখালেন। বাষট্টি সনে ভুলক্রমে বাবার যে সময় শতবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল, সেই সময় যোগ আবার মৈহারে এসেছিলেন। বাবা খুশী হয়ে নিজের একটা বেহালা দিয়েছিলেন। যোগও বাবাকে বরাবর গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন।

মৈহারে শিক্ষালাভের পরে রবিশঙ্কর যখন বাজাতে শুরু করলেন, তখন ১৯৪৪ সালে একবার বাবা লক্ষ্ণৌয়ে সমস্ত গুণীসঙ্গীতজ্ঞদের সামনে রবিশঙ্করকে বাজাতে বললেন। বাজনা শুনে মরিস কলেজের সরোদ শিক্ষক সখাওয়াৎ খাঁ বললেন, 'ইয়ে তো সরোদ কা বাজ সিতার মেঁ বজ্ রহা হ্যায়।' একথা শুনে বাবা উত্তর দিলেন, 'আপ লোগ তো বাজ কে অবতার হ্যাঁয়। এতনা দিন তো জানতা রাহা কবুতরবাজ, রাণ্ডিবাজ, লৌণ্ডেবাজ। ঔর অব শুনতে হ্যাঁয় সরোদবাজ, সেতারবাজ। হাম বাজাকে ভিতর কোই ফরক্ নেহি সমঝতে হ্যাঁয়। হম তো এক

বাত জানতে হ্যাঁয়—সঙ্গীত মা সারদাকে আরাধনাকে চিজ হ্যাঁয়। হর বাজামে সব কুছ বাজায়া যা সকতা হ্যাঁয়। ঔর ম্যাঁয়নে বীন কে কঠিন অঙ্গকা হর বাজামে প্রয়োগ কিয়া।'

পঁয়তাল্লিশ সনে যোধপুর মহারাজের কথায় আলিআকবর যোধপুরে একটি বিরাট সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। ভারতের বহু শিল্পীকে ডাকা হয়েছিল। বাবা, দবীর খাঁ, বিলায়েৎ খাঁ প্রভৃতি বহু শিল্পীই গিয়েছিলেন। দবীর খাঁ যে সময় ধ্রুপদ গাইতে গেলেন সেই সময় ভাল মৃদঙ্গবাদক ছিলো না। বাবা নিজের থেকে গিয়ে মৃদঙ্গে সঙ্গত করলেন দবীর খাঁর সঙ্গে। আলিআকবর সব শিল্পীদের যা প্রাপ্য ঠিক করা হয়েছিল, মহারাজের হাত দিয়ে দেওয়ালেন। কিন্তু বাবার বেলায় আলিআকবর মহারাজকে বললেন, 'প্রত্যেক শিল্পীর যা প্রাপ্য আমি আগে থেকে চুক্তি করেছি কিন্তু বাবাকে আমি ডেকেছি। বাবাকে আপনি যা উপযুক্ত পারিশ্রমিক মনে করেন তাই দিন।' মহারাজ বাবাকে যে অর্থ দিলেন তা বাবার কাছে সেই সময় অকল্পনীয়। যোধপুরে যাবার সময় বাবার দিল্লীর এক ছাত্র দিল্লী থেকে যোধপুরে গিয়েছিল। বাবা টাকা পেয়ে কখনও গুণে নিতেন না। নিজের স্থানে এসে বাবা ছাত্রকে বললেন, 'দেখ তো কত টাকা?' অর্থের রাশি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা শুনে বাবা ছাত্রকে বললেন, 'তোমার ভাগ্যেই এত টাকা পেয়েছি। আমার ভাগ্য ভাল না।' ছাত্র যতবার সঙ্কোচের সঙ্গে বলছে, 'একি কথা বলছেন?' বাবা ততবারই সেই একই কথা বলছেন। ভাল খাবার, অর্থ, কিংবা যে কোন শুভ সংবাদ পেলেই, যে থাকত তাঁকেই এ কথা বলতেন। তোমার ভাগ্যেই খেলাম, পেলাম বা এত শুভ সংবাদ শুনলাম। বাবার জীবনের এ এক বিচিত্র স্বভাব।

উপরোক্ত সম্মেলনে বিলায়েৎ খাঁ বাজাবার পর, প্রায় পনের দিন যোধপুরেই রয়ে গেলেন এবং আলিআকবরের সঙ্গে বাজাতে লাগলেন। শিক্ষার ব্যাপারে অন্য ঘরের কাউকে আগেকার দিনে কোন গায়ক বাদক শিক্ষা দিতেন না। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে বাবার মত উদারচেতা পুরুষ দেখা যায় না। যে কোন লোক সঙ্গীত সম্বন্ধে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেই অকপটে সব বলতেন। আলিআকবর যতই হোক বাবারই তো ছেলে। এই ব্যাপারে আলিআকবরও বাবার মত উদারচেতা। তা না হলে নিজের বাড়ীতে রেখে আলিআকবর বিলায়েৎ খাঁর সঙ্গে বাজাতেন না।

কনফারেন্সের কয়েকদিন পর একদিন মহারাজের ইচ্ছায় আলিআকবর বিলায়েৎ খাঁকে নিয়ে যুগলবন্দী বাজান। একটা রাগ শেষ হবার পর হঠাৎ মহারাজ বললেন, 'মেঘ রাগ বাজান।' এই কথা শুনে বিলায়েৎ খাঁ ধীরে আলিআকবরকে বললেন, 'দাদা আমি তো মেঘ রাগ জানি না।' আলিআকবর রাগের চলনটা বলে দিয়ে দুজনে বাজালেন।

আলিআকবরের একটা মহান্‌গুণ দেখেছি। কখনও তাঁকে হামবড়াই করতে দেখি নি, ঠিক বাবার মত। উপরোক্ত ঘটনার সময় যে দু'জন সাক্ষী ছিলেন তাঁদের কাছে এই ঘটনাটা শুনেছি। তাঁরা আজও জীবিত। কিন্তু আলিআকবর কথাচ্ছলে কখনও এ কথা আমাকে বলেন নি। বিলায়েৎ খাঁ এইজন্যই আলিআকবরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধা যে করেন তার প্রমাণ আমি দেখেছি আটান্ন সনে, যে সময় তাঁরা বম্বেতে বাজান। সে কথা আগেই বিস্তৃত লিখেছি। কোলকাতাতেও একবার যুগলবন্দী বাজানর আগে বিলায়েৎ খাঁ আলিআকবর

সম্বন্ধে দর্শকদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আপনারা এটাকে যুগলবন্দী ভাববেন না। আমি দাদার সঙ্গে বাজাবার উপযুক্ত নই। উনি স্নেহ করে আমাকে নিয়ে বসেছেন। সুতরাং আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন।' বিলায়েৎ খাঁর এই কৃতজ্ঞতা বোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ কৃতজ্ঞতা বোধ সেই সময় কয়জনের ছিল বা আজকের যুগে আছে?

মৈহারে ফকির চাঁদ চোপড়া এবং তাঁর স্ত্রীর কথা আগে অনেক কিছুই লিখেছি। যে কথা লিখিনি সে কথাটা লেখা প্রয়োজন, সেতার, সুরবাহার শিল্পীর কথা ভেবে। স্বর্ণলতা চোপড়ার আগ্রহে বাবা এলাহাবাদ থেকে সেতার আনিয়ে শিক্ষা দেন। স্বর্ণলতা বয়সে অনেক বড় হলেও সেই সময় অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গে শিখতেন। দীর্ঘদিন সেতার শিক্ষার পর বাবা মেয়েকে সুরবাহার শেখাতে আরম্ভ করলেন। স্বর্ণলতা শিখতে গেলেই বাবা বলতেন, 'দেখি তোমার আঙ্গুল।' আঙ্গুল দেখেই বলতেন, 'কিছুই বাজাও না? বাজালে আঙ্গুলে দাগ হয় না কেন?' স্বর্ণলতার আঙ্গুল নরম হওয়ার জন্য একটু বাজালেই কেটে যেত। বাবা তখন স্পিরিট লাগিয়ে দিতেন।

কেউ শ্রদ্ধা সহকারে বাবার কাছে, শিখবার বা শুনবার বাসনা নিয়ে যদি আসত, বাবা কাউকে নিরাশ করতেন না। দুটো দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

বাবা যে সময় এলাহাবাদ রেডিওতে বাজাতে যেতেন সেইসময় সুপ্রভাত পাল বাবার সঙ্গে থাকত এ কথা আগেই বলেছি। এলাহাবাদে এক স্বর্ণকার বৃদ্ধ মুন্নুলাল সেতার শিখবার বাসনা নিয়ে বাবার কাছে আসত। বাবা যদিও জানতেন এঁর দ্বারা কিছু হবে না, তবুও বৃদ্ধকে কখনও নিরাশ করেন নি। বাবা বলতেন, 'সারাদিন দোকানে বসে ব্যবসা করেও যদি নিজের আনন্দের জন্য একটু বাজিয়ে আনন্দ পায় তাঁকে নিরাশ করা উচিত নয়।' মৈহারের বাইরে এই ধরনের কত শিক্ষার্থীকে যে শিখিয়েছেন তা লিখতে গেলে একটা বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যাবে।

শ্রদ্ধা সহকারে কেউ বাজনা শুনতে গেলে, সে মৈহারেই হোক বা মৈহারের বাইরে হোক কাউকে নিরাশ করেন নি। কাশীর বিজয়নগরম-এর রাজার লিগ্যাল এডভাইজার প্রতুল কুমার মিত্র, একবার সাঁইত্রিশ সনে রেমণ্ড বারনিয়ার, এলিস বোনার, এলেন ড্যানিলিউ, এলফ্রেড উরকেলকে (ফার্ষ্ট কালচারাল সেক্রেটারি, জার্মান এমব্যাসী) নিয়ে মৈহার গেলেন। বাবার কাছে বাজনা শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বাবা বললেন, 'আপনারা এত কষ্ট করে এসেছেন, আজ গেস্ট হাউসে থেকে বিশ্রাম করুন। আগামীকাল আপনাদের নিশ্চয়ই শোনাব।' বাবা মৈহার গেষ্ট হাউসে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পরের দিন বাজনা শোনালেন।

এরপর একবার বাবা এলাহাবাদে রেডিওতে বাজাতে গিয়েছেন। কৈলাস হোটেলে উঠেছেন। প্রতুল কুমার মিত্র বিজয়নগরম-এর মহারাজকে নিয়ে এলাহাবাদে নিজের বাড়ীতে গিয়েছেন। খবর পেলেন বাবা এসেছেন। অসময়ে বাবার কাছে গিয়ে বললেন, 'যদি অসুবিধা না হয় তা হলে দয়া করে যদি একটু বাজনা শোনান।' বাবা খেতে বসবার আয়োজন করছিলেন, কিন্তু অতিথিদের আগ্রহ দেখে সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজিয়ে শোনালেন। সে যুগে, কিংবা আজকের যুগে এ জিনিষ কোন শিল্পীর কাছে কল্পনা করা যায় কি?

বাবার অনেক ভক্তের মধ্যে সুনীল বোস এবং তাঁর স্ত্রী সুবর্ণ বোস অন্যতম। সুনীল বোস দীর্ঘদিন রেডিওতে চাকরি করেছেন। বাবা একবার সুনীল বোসের লক্ষ্ণৌ-এর বাড়ীতে এবং দুবার পাটনার বাড়ীতে ছিলেন। কেননা রেডিওতে সুনীল বোস সেই সময় স্টেশন ডাইরেক্টারের পোস্টে ছিলেন। বাহান্ন সনে পাটনাতে বাবাকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ফেলোসিপ নির্বাচন করেন। বাবা সুনীল বোসকে বললেন, 'আমি তো মূর্খ। আমি জীবনভোর সঙ্গীতের সেবা করেছি।' কিন্তু বাবাকে মঞ্চেতে যখন সঙ্গীত সম্বন্ধে বলবার জন্য অনুরোধ করা হোল, তখন বাবা অবলীলাক্রমে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নিজের জীবনের সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা বলে গেলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলেন। বাবার প্রিয় খাদ্য কি বারবার জিজ্ঞাসা করাতে, বাবা পায়েস, দুধ ও খিচুড়ির কথা বললেন এবং খেলেন তৃপ্তির সঙ্গে। নিরামিষ খাবার বাইরে খেতেন বলেই, লোকে ভাবতেন বাবা নিরামিষ খান। মৈহারে তো মুড়ি পাওয়া যেত না, তাই বাইরে অন্যের বাড়ী গেলে বলতেন, 'আপনারা মুড়ি খান না?' সকলেই অবাক হতেন। বাবা বলতেন, 'বাঙ্গালীর নাস্তার সময় খাবার তো হল মুড়ি। আর দুপুরে ডালভাত আড়াই হাত।'

বাবা বেশ মজাদার মানুষ ছিলেন। দিল্লীতে বেয়াল্লিশ সনের শেষে একদিন ঘুরতে ঘুরতে গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির। মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার মৌডগুল্লে। বাবাকে কেউ চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন?' বাবা বললেন, 'গান বাজনার আওয়াজ শুনে চলে এসেছি। আমি একটু আধটু বাজাই, তাই দেখতে এসেছি।' সকলের আগ্রহে নিজের নাম না বলে বাঁ হাতে ভায়োলিন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের অবাক হবার পালা। এর পর বাবার সোজা প্রস্থান। কিছুদিন পরে মৌডগুল্লে ভরতরামজীর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন বাবা আলিআকবর এবং রবিশঙ্করকে শেখাচ্ছেন। মৌড়গুল্লে বাবার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিন্তু আগে কখনও দেখেননি। সেই দিন থেকে বাবার পরমভক্ত হয়ে গেলেন। এরপর বাবাকে দিল্লীতে কয়েকবার বাজাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। বাবার সম্বর্দ্ধনা সভা করে বাবাকে মানপত্র দিয়েছেন। এই প্রোগ্রামে বাবার সঙ্গে কণ্ঠে মহারাজ বাজিয়েছিলেন। পান্নালাল ঘোষ তানপুরা বাজিয়েছিলেন। বাবাকে সেই দিন গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের এডভাইসরি বডির মেম্বার করলেন।

সাঁইত্রিশ সনে বাবা এলাহাবাদে বাজাতে গেছেন। দেখলেন এক তরুণ ছেলে সরোদ বাজাবে। খবর নিয়ে জানলেন শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলেটার নাম রাধিকা মোহন মৈত্র। ছেলেটা আমির খাঁর কাছে শিখেছে। বাবা ছেলেটিকে দেখে বললেন, 'আমার সঙ্গে বাজাও।' তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য সঙ্গে নিয়ে বসলেন এবং বাজাবার পর একটি বাজাবার জবা উপহার দিলেন। রাধিকা মোহন মৈত্রর এরপর বাবার কাছে শিক্ষা করবার উৎসাহ জাগে। একবার কোলকাতায় নিজের বাড়ীতে বাবাকে দেখে পুরিয়া ধ্যানেশ্রী শিখলেন, এবং আরো শিক্ষা করবার জন্য প্রার্থনা করলেন। বাবা বললেন, 'আপনি তো কোলকাতায় থাকেন। মৈহারে কি করে যাবেন? এক কাজ করুন। আমার ছাত্র তিমিরবরণের কাছে শিখুন।' রাধিকা মোহন মৈত্রের ইচ্ছা হয় নি তিমিরবরণের কাছে শিক্ষা করবার জন্য। কিন্তু আজীবন বাবাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

বাবা মৈহারে প্রথম গিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কারো বাড়ী যেতেন না। বাবার আবাহনও নাই, বিসর্জনও নাই। মৈহারে প্রথম গিয়ে প্রায় কুড়ি বছর সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েই কাটিয়েছেন। সে সময়ে ইংরেজদের রাজত্ব। মৈহারেও কংগ্রেসের কিছু সদস্য চাঁদা ওঠাতে লাগল। বাবা কিন্তু মনে প্রাণে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তখন বাবা নীলটুপি মাথায় পরতেন। মৈহারের মহারাজা কংগ্রেস কর্মীদের নির্যাতন শুরু করতো। এমন সময় বাবা ছেলে মেয়েদের কাপড় চাদর ইত্যাদি যে দোকান থেকে কিনতেন, চল্লিশ সনে সেই দোকানদার শেঠপূরণচন্দ্র জৈন-এর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হোল। পূরণচন্দ্র জৈন কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। একদিন বাবাকে সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'বাবা মহারাজ কংগ্রেস কর্মীদের নির্যাতন করছে। এর একটা প্রতিকার করুন।' বাবা বললেন, 'চিন্তা কোরো না। রাজার বিরুদ্ধে যাওয়া ভাল না। কিন্তু একটা কাজ করো। রাজাকে বুঝতে না দিয়ে রাজার দিকে মুখ করে তাঁর আনুগত্য দেখাও, এবং পেছন থেকে লুকিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের চাঁদা দাও।' এই কথা বলেই বাবা চাঁদা দিলেন। মাঝে মাঝে রাত্রে পূরণ চন্দ্রের দোকানে গিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের খবরাখবর নিতেন। পূরণচন্দ্র জৈনকে বাবা ছেলের মত ভালবাসতেন। দেশ যেদিন স্বাধীন হোল, তার কিছুদিন পরেই মহারাজ জব্বলপুরে গিয়ে নিজের বাড়ি বানালেন। বাবাও সেই দিন থেকে খদ্দরের টুপি, লম্বা খদ্দরের পাঞ্জাবী, পায়জামা এবং কাপড়ের জুতো পরতে লাগলেন। সেই যে খদ্দর পরলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাবার পরিধান তাই ছিলো। বাবা পূরণ চন্দ্র জৈনের দোকানে কাপড় চোপড় কিনতে গেলেই কিছু সময় গল্প করতেন। পূরণ শেঠের ছেলেদের নাতির মত স্নেহ করতেন। এই পূরণ শেঠের ছেলে হোল দীপচন্দ জৈন। দীপচন্দ-এঁর সবচেয়ে ছোট ভাই কৈলাসকে, বাবা বালগোপাল বলতেন, পূরণ চন্দ্রের চার ছেলেকেই বাবা অত্যন্ত স্নেহ করতন। ছোট ছেলে যাঁকে বালগোপাল বলতেন, পরবর্তীকালে মৈহারের মত জায়গায় পড়াশুনা করে বিলেত থেকে ডাক্তার হয়ে এল। ছেলেদের মধ্যে দীপচন্দ বাবার কাছে প্রায়ই আসত। বাবার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রকৃত নাতির মত কর্তব্য করে গেছে।

বাবার বিষয়ে বই লিখতে গিয়ে বহু লোকের সাক্ষাৎকার নিয়েছি যাঁরা বাবার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাবার কাছে সঙ্গীতের অনুরাগটাই ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স। বাবা বলতেন, 'চরিত্র যদি ঠিক না রাখতে পার তাহলে সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। শয়নে স্বপনে সব কামনা ত্যাগ করে সঙ্গীতের স্বপ্ন দেখতে হবে। তা যদি করতে পার জীবনের শেষে তার ফল পাবে।' উপরোক্ত কথাটি বাবার কাছে কতবার যে শুনেছি, বলতে পারব না। বাবার এই সঙ্গীত দর্শনের কথা ভেবে ভারতের একজন যশস্বী সঙ্গীতজ্ঞকে, যিনি কিনা অর্থ সম্মান এবং খ্যাতির শিখরে, কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনার এত যশের কারণ কি?' বরেণ্য শিল্পী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, 'উইমেন, ওয়াইন এণ্ড মানি।' অবাক হয়ে বলেছিলাম 'তার মানে?' উত্তরে বললেন, 'চমকাবার কিছু নেই। সঙ্গীতের মধ্যে নবরস আছে তো? সেই নবরসকে জানতে গেলে সেক্সটাকে বাদ দেওয়া যায় না। আর সেক্সটাকে জানতে গেলে মানি আর ওয়াইন অপরিহার্য।' আমার অবাক হওয়া মুখটা দেখে শিল্পী

অম্লানবদনে বললেন, 'সাধে কি ড্রিঙ্ক করি মাঝে মাঝে। ড্রিঙ্ক করে দৃষ্টিটা ঘোলাটে হলেই ঘুম পায়। ঘুমলেই স্বপ্ন, আর স্বপ্ন উইদাউট উইমেন বড় পানসে লাগে। এই স্বপ্ন দেখবার পরের দিন, নিজের পরিচিত মহিলাদের সামনের আসনে বসিয়ে বাজাতে প্রেরণা পাই।' উত্তরে বললাম, 'মেয়েদের দেখলে আপনার মতিভ্রম হয় কেন?' নামই শিল্পী হেসে বললেন, 'চেঞ্জ ইস্ দ্য সল্ট অব লাইফ। আসলে কি জান? মেয়েদের শরীরটা হোল এক অদ্ভুত রহস্য। কারো স্তন সুগঠিত, কারো কঠিন, কারো নিম্নমুখী, কারো বা বর্তুলা। শরীরের গঠনেও কত বৈচিত্র্য। ভাব কত রকমের। কেউ বিষাদময়, কেউ বা উজ্জ্বল, কেউ উদ্ধত। কারো শরীর মসৃণ, কারো বা রোমশ, কারো শরীরে পুরুষের মত পেশী, কারো বা নরম, আবার কারো কারো বড় বেশী কোমল। মুখের গড়নেও কত বৈচিত্র্য। এ এক নূতন রকমের স্বাদ। এক মেয়ের মধ্যে এত সব পাওয়া কি সম্ভব? তাই আগেই বলেছি চেঞ্জ না হলে সঙ্গীতের নবরস বোঝা যায় না।' শিল্পীর কথার উত্তরে বলেছিলাম, 'নামটা মনে পড়ছে না, তবে এটা মনে আছে একজন ইংরেজ প্রেমিক বলেছিলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে একশ রমণীর রমণের আনন্দ পাই।' আমার কথা শুনে শিল্পী মুচকি হেসে বলেছিলেন, 'এ সব আদি যুগের কথা। এখন সঙ্গীতটা গৌণ হয়ে গিয়েছে। আগের যুগের মত সাত্ত্বিক নেই। সুতরাং যুগের সঙ্গে না চললে পেছিয়ে পড়তে হবে। যে যুগে যে স্টাইল, তা তো মানতে হবে।' এ কথা শুনে মনে হয়েছে কি আশ্চর্য! এও এক মনোবিকারের লক্ষণ। বাবা বরাবর বলতেন, 'আমরা শুধু চোখ দিয়ে দেখি না, মন দিয়েও দেখি। এ হচ্ছে দুটো দৃষ্টি কোণের প্রশ্ন। সঙ্গীত বুঝতে গেলে শিল্পীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হবে। সঙ্গীতের মধ্যে প্রকৃত প্রেম আর ঈশ্বরানুভূতিতে তেমন তফাৎ নেই। দুটো পথই মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যে প্রেম শুধু দেখতেই আবদ্ধ সে প্রেমে কোন গভীরতা নেই, তাতে শুধু স্বার্থটাই আছে। আছে ভোগ। পুরোটাই লালসা। সুতরাং প্রকৃত প্রেমের মধ্যে অবগাহন কর।' বাবা এই ধরনের কত আদর্শের কথা বলতেন। অথচ সঙ্গীতের যশস্বী শিল্পী, যাকে ভাঁড় ছাড়া আর কোন উপাধি দেওয়া যায় না, তাঁর কথা শুনে অবাক হয়েছি। আজ জীবনের শেষে এসে বুঝতে পেরেছি কেন সঙ্গীত এত নিম্নগামী হয়ে গেছে এবং দিন দিন ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ দেখা হলে সেই নামী শিল্পীকে বলতাম, 'তোমার নবরসের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। ভুলো না সব সঞ্চয়ই একদিন ক্ষয় হয়। উন্নতির পরে পতন হয়, মিলনের অন্তেও বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। কাল কারও প্রতি উদাসীন নয়। কাল সকলকেই আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। তোমাকেও নিয়ে যাবে, কিন্তু বাবা চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন তাঁর যোগ সাধনার জন্য।'

৭৬

মজার ব্যাপার, বাবা নিজ নিজ মহিমায় দেশকালাতীত হতে পেরেছিলেন এ কথাটাকে আমরা অনেকেই অস্বীকার করি। তাই দেশ ভাগের পরে যাঁরাই বাবার জীবনী লিখেছেন, তাঁরা কেউই বাবার দেশের স্বজনদের নিয়ে মাথা ঘামাননি, যাঁরা বাবার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন। এমন কি বাবা নিজেও এটাই কামনা করতেন ওই দেশেতেই জন্ম যেন, ওই দেশেতেই মরি। যে দেশের প্রতি তাঁর এত টান ছিলো সেই দেশ এবং দেশের বাড়ীর

স্বজনদের নিয়ে কেউ চিন্তা করেননি। লোক বিস্মৃত হলেও পূর্ব বঙ্গে বাবার যে সন্ততিরা রয়েছেন অর্থাৎ সবকটি সহোদরের বংশধরেরা, তাঁদের তরফ থেকে বাবার সঙ্গীত ধারাকে বহন করে প্রচারের কার্য নেহাৎ ক্ষুদ্র অবদান নয় সঙ্গীতের জগতে।

বাবার ছোট ভাই আয়েৎ আলি খাঁর তৃতীয় পুত্র মোবারক হুসেন খাঁ ঘটনাক্রমে পরিবারে অর্থাৎ বলতে গেলে তিন পুরুষে প্রথম আক্ষরিক অর্থে পড়াশুনা জানা বা বিদ্বান। তাই এই মোবারক না থাকলে, বা কলম না ধরলে একটা বিরাট অধ্যায় অনুল্লিখিত থেকে যেতো। অর্থাৎ মোবারক বহু ঘটনার মিসিং লিংক। যে হেতু পড়াশোনাতে মেধা ছিল, বাবা এই মোবরককে যখনই দেশে যেতেন কাছে টেনে নিতেন।

মোবারকও ওই কিশোর বয়সে বাবা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝেছিল। তাই তিরিশ দশকে বিদেশ থেকে বাবার দেশের বাড়ীতে ছোট ভাই আয়েৎ আলিকে লেখা চিঠিগুলো ও যত্ন করে রেখেছিল। বাবার হার্ট এটাকের পর যখন কোলকাতায় বাবা আলিআকবরের বাড়ীতে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময় মোবারকও ঘটনাক্রমে হাজির। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও বাবা মোবারককে প্রচুর আত্মবৃত্তান্ত শোনান এবং নিজের পূর্ব পুরুষের কথা বলেন। কারণ তাঁর মনে মনে হয়তো এ আকাঙ্খা ছিলো যে মোবারকই বোধ হয় তাঁর পরিবারের একমাত্র যোগ্য প্রতিনিধি, যাঁর ভেতরে এ পরিবারের ইতিহাস লেখার যোগ্যতা আছে। বাবা যে মানুষ চিনতে ভুল করেন নি সেটা যথার্থ। কারণ মোবারক নিজে লেখাপড়ায় ইতিহাস নিয়ে এম. এ পাশ করেছে। এ ছাড়া ছোট থকেই সঙ্গীতের পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে নিজের বাবার কাছে সুরবাহার শিখেছে। পরবর্তীকালে সঙ্গীত গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, শিশু সাহিত্য লেখক এবং বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশের একস্‌টারনাল সার্ভিসের ডিরেকটার জেনারেলের পোস্টে কার্যরত।

এই মোবারকের সৌজন্যেই আমরা জানতে পারি যে বাবা বিদেশে থাকাকালীন যতটা মৈহারের জন্য চিন্তিত ছিলেন, ততটাই শিবপুরের জন্য। চিঠিগুলোকে সোজাসুজি উদ্ধৃত করার আগে, প্রাপ্তি উৎস মোবারক ভাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাবা বিদেশে প্রায় একবছর উদয়শঙ্করের সঙ্গে ঘুরেছেন। বিদেশে যাবার প্রাক্‌কালে বাবা আয়েৎ আলিকে যে চিঠিগুলো দিয়েছিলেন। তা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করছি এবং তাঁর সাথে আরো কয়েকখানা চিঠিও পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলী—'হতে ১নং

(নোট : বাবা নিজের ভাইকে ছাড়াও আরো অন্যকেও চিঠি লিখেছিলেন—দ্রষ্টব্য-সঙ্গীত বিজ্ঞান-প্রবেশিকা, ১৯৩৬)

উস্তাদ বাবার বৈচিত্র্যময় জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এই বিশ্বসফর। তিনি নিজের হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন, আমেরিকার আর আফ্রিকার মানুষদের। তাঁদের তিনি ভালোবাসতে চেয়েছেন আপন জনের মতো। বিস্মিত হয়েছেন পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি দেখে। অভিভূত হয়েছেন তাঁদের অতিথি-পরায়ণতা দেখে। সহজ-সরল মানুষটি তাঁর অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন আয়েত আলি খাঁ ও নায়েব আলি খাঁর

কাছে লেখা চিঠিতে। ভাষা তাতে নেই, আছে প্রাণের আকুলতা। সাহিত্য তাতে নেই, আছে প্রকাশের সাবলীল গতি। তাঁর পড়াশোনা ছিল পাঠশালার দুয়ার পর্যন্ত। নিজে বলতেন, 'বাল্যশিক্ষার বিদ্যার অধিকারী আমি।' তাই ভাষার জটিলতা বা পাণ্ডিত্য নেই। তিনি যা দেখেছেন, যা ভাবছেন সহজ সরলভাবে তাঁর সেই দেখা আর মনের কথাগুলো চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি একটা চিঠিতে লিখেছেন ঃ

প্রথম চিঠি প্যারিস হইতে

১৮ই মে

দোয়ারপর,

আরব ও ইুরোগের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ফ্রান্সে, প্যারিসে আসিয়াছি। বাড়িঘর মানুষ সবই খোদার অসীম সৃষ্টি। এইসব দেখিয়া মনে হয় তাহাদের নিকট আমরা শিশু। এই দেশের মানুষ সব যেন মেশিন। মানুষ দ্বারা যে সব কাজ হয় ধারণা করা যায় না। শিশুকালের গাজির গান, শ্যামারূপ কন্যার পালা, পরিস্থানের কথা শুনিতাম, এইখানে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়ে জীবন সার্থক করিলাম। এই দেশের মেয়ে যে কিরূপ সুন্দর পত্রে লিপিবদ্ধ করা সাধ্যাতীত। যেইদিকে তাকাই সেইদিকে পুতুলের মত চাহিয়া থাকি। পাতালের মাটির নিচে, নদীর নিচে, রেলগাড়ী চলে। যেন একতালা, দোতালা, তেতালা। প্রথমে দুই হাজার ফুট নিচে রেলগাড়ি চলে, তার উপর মাটির রাস্তা। এর উপরেও আবার মাটি, তার উপরে রেল চলে। চৌতালায় আবার মাটি। এর উপর ট্রাম, মোটর, বাস, আর মানুষ চলে এবং শহর। কাল এক বাড়িতে গিয়াছিলাম। এই দেশের যে সমস্ত রাস্তা, বড় বড় শিল্পী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই বাড়িতেই তাঁহাদের মোমের পুতুল গড়িয়া রাখিয়াছে। জীবন্ত মনে হয়। রাত্রি বারোটায় ঐ গাড়ির উপর তলায় যাই, সেইখানে গিয়া দেখি সেটা গ্লাসের তৈয়ারী। কতরকম দৃশ্য যে সেইস্থানে দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। মনে হয় যেন সমস্তই তিলিসমাত। যদি বাঁচিয়া ফিরিয়া আসি সমস্তই বর্ণনা করিব।

এই দেশের কুলি, মজুর সবাই শিক্ষিত। ঘোড়া দিয়া হালচাষ করা হয়। এথেন্স, ভিয়েনা, বুদাপেষ্ট, প্রাগ প্রভৃতি বড় বড় শহরের সংগীতের জন্মস্থান। আমার সরোদ শুনিয়া বড় বড় প্রফেসার আমার সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাজনা শুনিয়া তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হন। এই দেশের ভাষায় খবরের কাগজে খুব লিখিয়াছে।

এক একটি সঙ্গীত হল কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া তৈয়ার করিয়াছে। ইহার মধ্যে চার-পাঁচ হাজার লোক আসে। এতগুলি লোকের সামনে যখন সরোদ বাজাই তখন মনে হয় এখানে মানুষ নাই, আমি একা। যেইমাত্র বাজনা শেষ হয় তখন করতালির আওয়াজে মনে হয় প্রলয় বুঝি আরম্ভ হইল। আট-দশ মিনিট শুধু করতালির শব্দই শোনা যায়। তাহারা বাজনা এত মনোযোগ দিয়া সুনে যেন সবাই ধ্যানমগ্ন। যে সময় বাজনা আরম্ভ করি সে সময় হলের সমস্ত আলো নিভাইয়া দেয়, শুধুমাত্র আমার চেহারার উপর একটি আলো আসিয়া পড়ে যাহাতে সবাই দেখিতে পায়। যেদিন ভালো বাজনা হয় সেদিন ফুলের তোড়ার বৃষ্টি পড়িতে থাকে এবং দ্বিতীয়বার যে কিরূপ বাজনা শোনার জন্য পাগলের ন্যায় চিৎকার

আরম্ভ করে। তখন সরোদ বাজাইয়া যে কিরূপ আনন্দ পাই তাহা বুঝান কষ্ট। এক একটি 'মিড়ে' সমস্ত হল ভরপুর হইয়া উঠে। এরা (শ্রোতারা) অবাক হয়, হাতে কি করিয়া এমন শব্দ বাহির হয় আশ্চর্য মনে করে।

স্বাস্থ্যের কথা জানাইতেছি, খাদ্যের অভাব শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে শুকরের মাংসই বেশি আহার করে। যে হোটেলে যাই সেখানেই এই সমস্ত। খাওয়া প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি। আলু সিদ্ধ, মটর কলি সিদ্ধ, মাখন, রুটি খাইয়া থাকি, আর খাই ফলমূল। শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে আধাসিদ্ধ মাংস খায়। আধপোড়া গন্ধে বমি আসে। এইসব দেখিয়া খাইতে পারি না। এই সমস্ত কারণে শরীর দুর্বল হইয়া গিয়াছে। শরীর প্রায় রক্তশূন্য হইয়া যাইতেছে। উদয়শঙ্করবাবু এইসব দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিরূপে দেশে পাঠাইবেন সেই চেষ্টা করিতেছেন। খাওয়ার জন্য আমার খুব কষ্ট হইতেছে। এক জায়গায় থাকি না। নানা দেশ ঘুরে বেড়াই। নিজে রান্না করিয়া খাওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না। এদেশের লোকেরা মাংস আর সরাব না খাইয়া বাঁচিতে পারে না। জলের মত সরাব খায়। আমাদের দেশে যেমন জল তেমনি সরাব ব্যবহার হয়।

পাড়াগাঁয়ে যাই। তাহাদের চাষবাস দেখি। ঘোড়া দিয়া চাষ করে। এদেশে আমাদের দেশ হইতে বেশী চাষ হয়। জমি এত পরিপাটি যে আমাদের বাসস্থানের অপেক্ষা আরও বেশী পরিষ্কার। এদেশের গোশালায় যাই। গরু-বাছুর কিভাবে রাখে দেখিতে। দোলানের ভিতর গাভীগুলিকে এত যত্নে রাখে যে আমাদের দেশের বড় বড় লোকেরাও এইরূপে থাকে না। দালানের পাকা ভিটির উপর কাঠের পাটাতন পাতিয়া হাটু পর্যন্ত উঁচু খড় দিয়া তাহার উপর মোটা পাটের কার্পেট পাতিয়া গরুবাছুরকে থাকিতে দেয়। মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থানে রাবারের বিছানা পাতা থাকে। গরুগুলি এত অভ্যস্ত যে রাবারের বিছানা ছাড়া অন্যত্র মলমূত্র ত্যাগ করে না। ইলেকট্রিকের দ্বারা ঘর গরম রাখে। এক একটি গরু আট-দশ সের দুধ দেয়। দুধ গাঢ় হয়। গৃহস্থ পরিবারে রান্না ঘর দেখিতে যাই। তাহারা ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। আমাদের দেখিবার জন্য গ্রামের লোক জড় হয়। আমাদের দেশে কোন ইংরেজ গেলে দেশবাসীরা যেমন কৌতূহলের দৃষ্টি লইয়া দেখে এরাও আমাদের সেইরূপ দেখে। গ্রামবাসীরা সবাই শিক্ষিত। লেখাপড়া, সঙ্গীত, যুদ্ধবিদ্যা, চাষকর্মে সবাই শিক্ষিত। পুরুষ মেয়ে সমান। গ্রামে ছোট বড় নাই। সবাই এক। এইসব দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। আমাদের মত বিচার হয় না, তাহাদের পার্লামেন্ট আছে। এইসব দেশে আমরা বাসে যাতায়াত করি। এজন্য বিভিন্ন গ্রাম ও গ্রামবাসীর সহিত আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে পারি। মেয়েরা আমাদের দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হয়। এই দেশের মেয়েরাই গৃহকর্ম করে। আমি মনে করিতাম আমাদের দেশের মেয়েরাই বুঝি বেশি খাটে, সেটা আমার ভুল ধারণা ছিল। এই দেশের মেয়েদের পরিপাটি কাজকর্ম দেখিয়া অবাক হইয়াছি। এধ দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের অপেক্ষা বেশি খাটে। এরা রূপবতী, অপ্সরা বলিলেই হয়। এই দেশের গৃহস্থের কথা অনেক লিখিবার আছে। প্রত্যেক গ্রামে গীর্জা আছে। নিয়মিত তাহারা উপাসনা করে। এখানকার বাড়িঘরও দেখিবার মত। এক একটা বাড়ি এত সুন্দর যে, চাইলে আর দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে

মন চায় না। এখানকার ইঞ্জিনিয়াররা সত্যিই ধন্যবাদের পাত্র। এইখানে যন্ত্র খুব ভাল বাজে। বরফের জন্য চামড়া টান থাকে। আমার যদি আসিবার বন্দোবস্ত হয় তাহা হইলে শীঘ্রই চলিয়া আসিব। নতুবা এইখান হইতে আমেরিকা যাইব। এক প্রকার। ইতি

তোমার দাদা
আলাউদ্দিন।"

ঊনিশ শ' পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ সালে শ্রীউদয়শঙ্করের নৃত্যদলের সঙ্গে বিশ্ব সফরকালে তাঁর বায়তুল মোকাদ্দেস যেয়ারত করার সৌভাগ্য উস্তাদ যেয়ারতের বিবরণ দিয়েছিলেন তেল-আবিব থেকে তাঁর ছোট ভাই আয়েত আলিকে লেখা এক চিঠিতে ঃ

"আমি এখন উপরের ঠিকানায় আরব দেশে আছি। বায়তুল মোকাদ্দেসের নিকট। ২৯শে জানুয়ারী আমরা বায়তুল মোকাদ্দেসে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের শো হইয়াছে। প্রায় দুই হাজার লোকের জমায়েতে সরোদ বাজাইয়াছি। একটা খুশী-আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। আমার জীবন সার্থক খোদাবন্দ করিম করিয়াছেন। বেহেস্তের দ্বার দর্শন করিয়াছি। খোদার দরবারে যাইবার দরজা পর্যন্ত যেয়ারত খোদাবন্দ করিম করাইয়াছেন। যেয়ারত করিবার বিষয় জানাইতেছি। বায়তুল মোকাদ্দেসে হিন্দু যাইতে পারে না। আমাদের কোম্পানীতে সকলেই হিন্দু। কাহাকে লইয়া যাইব। এজন্য ??শে জানুয়ারী রাত্রে খুব ভাবনায় পড়ি। ৩০শে জানুয়ারী ফযরের নাময পড়িয়া কাঁদিয়া একাই চলিলাম। আরবী ভাষা বুঝি না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? উর্দুও বোঝে না। মহামুশকিলে পড়িলাম। খোদার নাম লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর গিয়াছি পর আমার পিছন হইতে একজন গরীব বেশধারী আমাকে বলেন—মেহেরম্ শরীফ? আমি কিছু বুঝিলাম না। আমাকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য। আমি ভয়াতুর হৃদয়ে চলিলাম। মনে মনে বলি, ঐ লোকটা আমাকে ধোঁকা দিয়া না মারিয়া ফেলে টাকার জন্য। আবার মনে করি, এই পবিত্র জায়গায় মরিলেও আমার পাপী জীবন সার্থক হইবে। এই কথা মনে করিয়া পিছন পিছন চলিলাম। শিবপুর (ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্মস্থান) হইতে বিদ্যাকুট (পাশের গ্রাম) হইবে, অতটুকু দূরে যাইয়া লোকটি আমাকে ইশারা করিয়া বলেন ডান দিকে—সামনে মেহেরম্ শরীফ। আমি সামনে পা বাড়াইয়া পিছনে নজর ফিরাইয়া দেখি ফকির বেশধারী লোকটি নাই। তারপর 'হায় হায়' করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করি। দেখা পাইয়াও পাইলাম না, আমার দূর দৃষ্ট। খোদা নিজে আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। এই কথা ভাবিয়া অধীর হইয়া গেলাম। কতক্ষণ পরে স্থির হইয়া সামনে দুইশত কদম যাওয়ার পর বায়তুল মোকাদ্দেসের গেট পাইলাম। সামনে একজন মৌলভী তালবি এলেম্ পাঠ করিলাম, তারপর যা কিছু সুরা জানি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পড়িবার শেষে মৌলভী সাহেব আমার বাঁ হাত ধরিয়া 'মারহাবা আলহামুদ বিল্লাহ' বলিয়া উপরে লইয়া গেলেন। তারপর বায়তুল মোকাদ্দেসের মুক্তাদি মালিকের নিকট আমাকে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিকট কলেমা-সুরা সব পড়িবার পর আদেশ করিলেন যেয়ারত করাইবার জন্য। প্রায় দুই ঘণ্টা পর্যন্ত যেয়ারত করিলাম। প্রথমে, যত পয়গম্বর এবাদত করিয়াছেন সব জায়গায় যেয়ারত করিলাম। হযরত রসুলের (সঃ)

এবাদতখানা, ফতেমা জিন্নতের এবাদতখানা, হযরত আলির এবাদতখানা, ইমাম হাসান ও হোসেনের এবাদতখানা যেয়ারত করিলাম। বেহেস্তের দ্বার, খোদার দরবারে যাইবার দরজা, সব আনন্দের সহিত যেয়ারত করিলাম। দরবারে খাদেম যিনি মালিক তিনি আসিয়া বংশনামা জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা-মাতা-দাদা সকলের কল্যাণের জন্য কোরবানীর খরচ আদেশ করিলেন। যাহা কিছু পারি দিয়া দিলাম। মসজিদে লইয়া গেলেন। দুই হাজার বছর হইয়াছে এই মসজিদ। এতুবড় মসজিদ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। বেহেস্ত মনে হয়। ভিতরে যা কিছু কারুকার্য দেখিলাম তাহা মানুষের অসাধ্য। এই মসজিদে কত লক্ষক্রোর লোক নামায পড়িতে পারে তাহার কিছু তারদাদ্না নাই। বেহস্ত মনে হয়। ভিতরে গিয়া ছয় রাকাত নফল নামায পড়িয়া বাহির হইলাম। কয় ঘণ্টা ছিলাম তাহা স্মরণ নাই। ইহার পর একজন তালবি এলেম আমাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমার জীবন সফল হইয়াছে। বায়তুল মোকাদ্দেসের যিনি কর্তা তিনি আমাকে দোয়া করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমার হজ্ব হইবে। এই কথা শুনিয়াই মহানন্দে কর্মক্ষেত্রে কর্ম করিতেছি। বায়তুল মোকাদ্দেসে গান-বাজনা-নাচ খুব হয়। মুসলমান আরবীতে গান গায়। ইহুদী হিব্রু ভাষায় গান হয়। আরবের গান আমাদের রাগরাগিণীর সঙ্গে অনেক মিলে। একদিন আরবের মেয়েদের নাচ দেখিতে গিয়া একটি গৎ শিখিয়াছি। তাহা পাইলাম। সঙ্গে কাগজ পেন্সিল ছিল না বলিয়া অন্য গৎ লিখিতে পারিলাম না। নীচের গৎটি নাচের। কাহারবা তাল।

সা পা-পা মা জ্ঞা রে সা রে জ্ঞা মা- -জ্ঞা রেজ্ঞা রে সা মা জ্ঞা রে সা-।।
ণি্ ধা্ ণি সা জ্ঞা-মাজ্ঞা রে জ্ঞা সা মা জ্ঞা রে সা- - -।।

কি মধুর করুণ রূপ বাজাইয়া দেখিবে।

বায়তুল মোকাদ্দেস বড় শহর। প্রায় কোলকাতার অর্ধেক হইবে। পরীস্থান বলিলেই হয়। এখানে পুরুষ-মেয়ে অতি সুন্দর। গোলাপ ফুলের মতন রং। ভাষা আরবী। বুঝিনা কিছু শুনিতে ভাল লাগে। এখানকার লোক সব সুরেলা ও লয়ধার। দিবারাত্র আনন্দে থাকে। যীশুর জন্ম-মৃত্যু এখানেই হইয়াছে। তাঁহার সব জায়গা দর্শন করিয়াছি। এখানে আমাদের দেশের মত সব জিনিষ পাওয়া যায়। এ দেশে ইহুদী জাতিই ঐশ্বর্যবান। শিক্ষিত। ইহুদীরা বড় বড় আমীর—সাহেবের বেশে চলে। ইহুদী পুরুষেরা ইংরেজের মতন পোশাক পরে, ইহুদী মেয়েরা মেমের পোশাক করে। চাল-চলন-খাদ্য সব ইংরেজী। আমরা ইংরেজী বড় হোটেলে থাকি। অনেক খরচ পড়ে।

এখান হইতে মিশরে যাইব। মিশর হইতে বিলাত যাইব। বিলাতে গিয়া পত্র লিখিব। বিশেষ আর কি জানাইব। এক প্রকার আছি। তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। ইতি

তোমার দাদা
আলম।”

ছোট ভাইকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন,

“শ্রীমান আমি খোদার ফজল করমে শারিরীক ভাল আছি। আরব হইতে মিশরে গিয়াছিলাম সেখান হইতে গ্রীক দেশে আসিয়াছি। পরে ফ্রান্স যাইব। গ্রীকে রাতে ও দিনে

বরফ পড়ে। দিনেও অন্ধকার থাকে। এই সময় এ দেশে বর্ষা, ভয়ানক শীত। অতি চমৎকার দেশ ও শহর। মক্কা শরীফে যাইতে পারিলাম না। কোম্পানী যেখানে যায় আমাকেও সেখানে যাইতে হয়। বায়তুল মোকাদ্দেস খোদার কৃপায় দৈব বলে যেয়ারত হইয়াছে। খোদার অসীম কৃপা আমাদের উপর। পূর্বের পত্রে যেয়ারতের বিষয় লিখিয়াছি; বোধহয় পত্রখানা পাইয়া থাকিবে। বায়তুল মোকাদ্দেসে প্রায় মুসলমানের দাড়ি নাই। এক হাজার মুসলমানের মধ্যে দুই-একজন দাড়িওয়ালা দেখিলাম। বায়তুল মোকাদ্দেসে জুম্মার নামায পরিয়াছি। বেহেস্ত মনে হয়। বায়তুল মোকাদ্দেসে গান বাজনা খুব হয়। আরবী গান ও বাদ্য। দোতারার মত—প্রায় মেণ্ডোলিনের মতন যন্ত্র, অতি সুন্দর বাজায়। যোগিঞা রাগে গান গায় এবং বাজায়। অতি করুণ সুর। আরবী গানের সঙ্গে বাজনা শুনিয়া কাঁদিয়াছি। এদের গান শুনিয়া কান্না আসে। বেহস্তের সঙ্গীত মনে হয়। দ-। -পা-মা-মা-গা-ঋসা-ঋ। -পা-দা-পা-।-।-।-দা-র্সা-ণি-ধা-পা-মা-মা। -ঋমা-দপ-পা-মা-গা-ঋসা-ঋসা-।—এই রকম সুরে গান গায়। তাছাড়া, কালেংড়া রাগেও গান গায়। মিশরেও এইরূপ গান-বাজনা হয়। মিশরে আরও বেশি। কায়রাতে গিয়াছিলাম। সেখানেও নাচ-গান খুব হয়। কায়রোতে জুম্মার নামায পড়িতে গেলাম। মুক্তাদি মৌলভীর দাড়ি নাই। ইংরেজী ফ্যাশানে নাকের নীচে একটু গোঁফ আছে মাত্র। সব ইংরেজী ফ্যাশন।

সেখানকার লোক অতি সুন্দর। ইংরেজের রং হইতে আরও সুন্দর। লালে-সাদা মিশ্রিত রং। মুসলমান মেয়েরো গাউন পরে। মেমদের জুতা পরে। মাত্র মাথা কাল রুমালে ঢাকা। আমার দাড়ি দেখিয়া সকলে আমাকে ঘিরিয়া দেখে। হিন্দ্ মহাদ্দিন আল্-হামদুলিল্যা বলিয়া হাত মিলায়। আরবীতে কথা বলে। আমি বুঝি না। তাহারা হাসে।

এইসব ঘোরাফেরাতে ভয়ানক কষ্ট হয়। শ্রীমানকে (আলি আকবরকে) না আনিয়া ভাল করিয়াছি। এক জায়গায় থাকিলে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঘোরাফেরা শুরু হইলেও কষ্ট। বিলাতে আসিবার নামও করিবে না। ঘরের ধন ঘরে থাক। তিন মাস ঘুরেই আমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে। বড় বড় হোটেলে থাকি। দৈনিক দশ হইতে বিশ টাকা খরচ লাগে। খাওয়ার মধ্যে খাই রুটি, মাখন, ডিম, মোরগ, মাছ, দুধ, চা ও ফল। এইজন্য বেশী খরচ পড়ে। গো-মাংস ও শুকরের মাংস যারা খায় তাহাদের কম লাগে। যা কিছু পাই সব খরচ হইয়া যায়। বাঁচেনা কিছু, আয় ব্যয় শূণ্য স্থিতি। সপ্তাহে দশ পাউণ্ড পাঁচ শিলিং বেতন পাই। এর দ্বারা খাওয়াপরা চলে। যাহা হউক, টাকা পয়সা না আনিতে পারি, দেখিয়া জীবন সার্থক করিতেছি। এক বৎসর ঘুরিয়া আসিব। যাহা থাকে বরাতে। দেশ দেখিবার জন্য কত লোকে কত টাকা খরচ করে, আমি বিনা অর্থে দেখিতেছি, এটাই সার্থক মনে করি। ফ্রান্সের ঠিকানায় পত্র দিবে। তোমাদের জন্য মন কাঁদে। খোদা তোমাদের বাঁচাইয়া রাখুন এই প্রার্থনা করি। একপ্রকার আছি। তোমাদের কুশল চাই। মাইহারের খবর নিবে। ইতি—

তোমার দাদা
আলাউদ্দিন।’

দোয়াপর,

ইউরোপ ঘোরা শেষ হইয়াছে।

এখন আমেরিকা যাইব। দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে। আমার দেশের মত স্থান পৃথিবীতে নাই। আমার সোনার বাংলা। একটা স্বপ্ন ভাল দেখি নাই। এজন্য বাড়ীর সকলের জন্য মন অস্থির। স্বর্গীয় মধ্যম দাদা ফকির আফতাবউদ্দিনকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। তিনি মখমলের সাদা কোট-পেন্ট পরিয়া আমাকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখা দেন। কিছু বলেন না, কেবল হাসেন। দেখিয়া মনে হয় আনন্দে গদ-গদ হইয়া চলাফেরা করিতেছেন। চিন্তিত আছি। দেশের খবর অতি শীঘ্র জানাইবে। এখানে বাজনা শুনিয়া পত্রিকায় সমালোচনা লিখে। মে মাসের পাঁচ (৫) তারিখে প্যারিস ও আমেরিকার কয়েকটি মেয়ে দিন তিনটার সময় বাজনা শুনিতে আসিয়াছিল হোটেলে। তাঁহারা এখানকার নর্তকী ও গায়িকা। প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম তাঁহারা কি আমার বাজনা পছন্দ করিবে? আমি অবহেলার ভাব লইয়া 'মূলতানী' বাজাইতে আরম্ভ করি। বিলম্বিতে পাঁচ-সাতখানান তান বাজাইবার পর তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দেখি সকলের চোখ হইতে জল পড়িতেছে। তখনই আমার চৈতন্য হইল আমি কি অন্যায় করিতেছি। তারপর মন দৃঢ় করিয়া এক ঘণ্টা 'মূলতানী' শুনাইলাম। যতক্ষণ বাজাইয়াছিলাম ততক্ষণ তাঁহাদের চোখের জল পড়া বন্ধ হয় নাই। তারপর 'ভিমপলাশ্রী' ও 'পিলু' বাজাইয়া প্রায় তিন ঘণ্টা পরে বাজনা শেষ করি। তাঁহাদের কান্না তখনও বন্ধ হয় নাই। বুঝিলাম তাঁহারাই সত্যিকারের সমঝদার—সঙ্গীতের পরম ভক্ত। যাইবার সময় গুরুজনকে যেইভাবে ভক্তি করে সেইরূপ করিয়া বলিয়া গেল ঃ "আমাদের মৃতাদেহে প্রাণ দান করিলেন। জীবনে কখনও ভুলিব না। দয়া করিয়া আর একদিন শুনাইবেন।" ভালবাসা নিও। ইতি

তোমার দাদা
আলাউদ্দিন।'

সন্তানদের শিক্ষার প্রতি বাবা খুবই সচেতন ছিলেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তারা সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকরূপে পরিচয় লাভে সমর্থ হয় তার তাগিদ তিনি অনুভব করতেন। আর ছোট ভাইদেরকে যখনই চিঠি-পত্র লিখতেন সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলতেন না। সুদূর প্যালেস্টাইনে গিয়েও তিনি এক পত্রে সে কথা ছোট ভাই আয়েত আলিকে স্মরণ করিতে দিতে ভুলেন নি ঃ

"...আফ্রিকা হইতে আরব দেশে আসিয়াছি। যেখানে যীশুখৃষ্টের জন্ম হইয়াছে সেখানে আসিয়াছি। যীশুখৃষ্টের জন্মস্থান, যেখানে যীশুখৃষ্টকে মারিয়াছে—এসব স্থান দর্শন করিলাম। এখানে বেশ গান-বাজনা হয়। লোকে অতি শিক্ষিত ও ভদ্র। প্রায় মক্কাশরীফের কাছেই আসিয়াছি অদৃষ্টে যদি থাকে তবে মক্কাশরীফও যেয়ারত করিব। তোমরা সকলে খোদার দরবারে প্রার্থনা করিবে। আরবে গান-বাজনা হয় না বলিয়া মৌলভীদের মুখে শুনিতাম—সব মিথ্যা। এদেশে হিন্দু-মুসলমান সকলেই গান গায়। বাদ্যযন্ত্র দেখিলাম। আমাদের দোতারা-সংগ্রহের মত, মুসলমানেরা বাজায়। হিন্দুরা বাজায় ইংরেজী যন্ত্র। তাদের চাল-চলন

ইংরেজদের মত। পোশাক সাহেবী। চেহারাও ইংরেজ হইতে উত্তম। মুসলমানদের প্রায় দাড়ি নাই বলিলেই হয়। দাড়ি কামানো দেখতে পাই। কফিখানায় মুসলমান কফি খায়, আরবী রেকর্ডের গান-বাজনা শুনে। আমি তাহাদের গান শুনি। এদের ভাষা আরবী। কাল এক থিয়েটারে তাহাদের প্লে দেখিয়া অবাক হইলাম। গানের সুর ইংরেজী ধরনের। একটি গানের নোটেশান পাঠাইলাম। বাজাইয়া দেখিবে (অবিকল চিত্ররূপ মূল চিঠির সঙ্গে ছাপা হলো)। শ্রীমান (আকবর) আসিলে ভাল হইত। দেখিবার, শিক্ষা করিবার অনেক আছে। ঘোরা-ফেরাতে কষ্ট হয় বলিয়াই সে চলিয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চিন্তে চলিলাম। খোদার সৃষ্টি দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়া লই। যাহা কিছু পাইতেছি খাওয়াতে-খোদার খরচ হইতেছে। উদয়শঙ্কর বড় হোটেলে ছাড়া থাকে না। আমরাও থাকি। দৈনিক দশ টাকা খাওয়াতে যায়। তার উপর অন্য খরচ পৃথক। যাহা হউক, এর জন্য চিন্তা নাই। এরপর কি দেখি পরে জানাইব। আরব, মিশর ঘুরিয়া পরে বিলাত যাইব।

মাইহারে চিঠি-পত্র লিখিয়া সকলের খবর লইবে। শ্রীমানকে (আলি আকবরকে) রেওয়াজ করিতে, পড়াশোনা করিতে উপদেশ দিবে। অবহেলায় যেন সময় নষ্ট না করে।...বাবাজীবনদের শিক্ষার যেন ত্রুটি না হয়। ভিক্ষা করিয়া হইলেও তাহাদের মানুষ করিবে। যদি বাঁচিয়া ফিরিয়া আসি ফের সাক্ষাৎ হইবে। খোদার কৃপার উপর নির্ভর করি। ইতি

তোমার দাদা
আলাউদ্দিন।"

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার বিলাতে গিয়েও বাবা এক চিঠিতে শান্তি নিকেতনের কথা লিখেছিলেনঃ

"...তোমার পত্র এইমাত্র পাইলাম। সকলে ভাল আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসার সকলের অসুখ হইয়াছিল জানিয়া চিন্তিত ছিলাম। খোদা সকলের মঙ্গল করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। ছোট খোকার অসুখ জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। খোদা এর অসুখ দূর করুন দোয়া করিতেছি। তার শারিরীক কুশল জানইয়া চিন্তা দূর করিবে। বাড়ীতে মাটি ভরাট করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু মাটির প্রয়োজনের থেকে বেশী ভরাট করিবে। কারণ এই মাটি যাহাতে চাপিয়া গিয়া সমান থাকে কিংবা উঁচু থাকে। মাটি ভরাট হইলে পরে কত খরচ পড়িল জানাইবে। আমি টাকা এখান হইতে পাঠাইব। শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছেন না। সে বলেঃ আপনি আমার পিতার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইবেন। যত সময় আমাদের বিদেশ থাকিতে হইবে ততদিন আপনাকেও থাকিতে হইবে। আপনি থাকাতে আমাদের বল কত, আমরা ছায়াতলে আছি। আরও কত কিছু বলে, নিখিলে পত্র বিস্তারিত হইবে বলিয়া লিখিলাম না। এই কারণে আসিতে পারিব না। লণ্ডন ছাড়িয়া উপরের ঠিকানায় ডেভনশায়ারে আছি। এখানে আমরা দুইমাস থাকিব। কারণ এখানে নতুন নাচ, নতুন নাচের গৎ ও কনসার্টের গৎ, সব নতুন করিয়া রিহার্সেল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এইসব তৈয়ার

হইয়া গেলে অন্যত্র যাইব। বোধহয় প্রথমে লণ্ডনে দুই-এক মাস প্লে হইবে। তারপর রাশিয়া যাইব। সেখানে কতদিন থাকিতে হয় তার নিশ্চয়তা নাই। আসছে বছর আমেরিকা, জাপান, চীন হইয়া দেশে ফিরিব। আরও দুই বৎসরের ধাক্কা মনে হয়। কি হয় পরে জানাইব।

যে জায়গায় আছি এটাও শান্তি নিকেতন। যাঁহার বাড়িতে আছি তিনি এখানকার জমিদার। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি নিকেতন তাঁহার অর্থেই চলিতেছে। প্রথম এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। প্রত্যেক বছর ৪০ হাজার টাকা শান্তি নিকেতনে দিয়া থাকেন। আমাদিগকে তিনি বড়ই যত্ন করিতেছেন। একটি বাড়ি, এক মাইল বেড় হইবে, সেই বাড়ি আমাদিগকে থাকিবার জন্য দিয়াছেন। খাওয়া-দাওয়া বাংলাদেশের মত করিয়া দিয়াছেন। মনে হয় দেশেই আছি। বাড়িখানার চিত্র পাঠালাম (ছবিটি আমার কাছে নেই)। অর্থাৎ পাই নি। থাকলে ছাপিয়ে দেয়া যেতো)।

আমার স্বপ্ন বৃথা যায় নাই। শ্রীমান নায়েব আলিকে বলিবে আবুর কল্যাণের জন্য একজন গরীব-দুঃখীকে যেন খাওয়াইয়া দেয়। তুমি ছেলেপিলে সকলের জন্য গরীব-দুঃখীকে খাওয়াইবে। শ্রীমান আমার বাবা জীবন বাহাদুরের জন্য বই লিখিতেছি। আমি আসিয়া তাহাকে দিব। তাহাকে সুর সাধাইব।......সাহেব বেশে আমার ফটো পাঠাইলাম (ফটো পাইনি বলে ছাপানো গেল না)। এসব পোশাক না পরিলে সাহেবদের নিকট লজ্জিত হইতে হয়। এসব দেশে ধুতি পরিলে জংলি বলে। এজন্য পোশাক পরি। একসঙ্গে চলাফেরা করিতে হয়। একসঙ্গে খাইতে-বসিতে হয়। মহাবিপদ। ইংরেজী জানি না। ভূত হইয়া বসিয়া থাকি। অপরের দ্বারা কথাবার্তা বলি। তোমার হাতের যন্ত্র সকলেই দেখিয়া তোমাকে প্রশংসা করে। চন্দ্রসারং দেখিয়া, সুর শুনিয়া বড়ই আনন্দ পায়। বড় বড় প্রফেসর আসিয়া দেখে এবং বাজনা শুনিয়ে এর সুরে বড় আনন্দ পায়। সরোদের মীড় ও গৎ শুনিয়া উচ্চ মানের বাদ্যযন্ত্র বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমি একজন প্রফেসরকে বলি, আপনাদের পিয়ানো যন্ত্র খুব ভাল। তিনি আমাকে বলেন, পিয়ানো মত গান্ধা (বাসি) যন্ত্র আর নাই। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র খুব শ্রুতিমধুর। ...মাইহারে বাটি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। মাত্র কেওয়ার (দরজা) লাগানো বাকি আছে। কি রকম বাটি হইল খোদাই জানেন। কাহার জন্য তৈয়ার করিলাম তিনিই জানেন। শ্রীমানের (আলি আকবরের) ইচ্ছা নাই মাইহার থাকিবার। তাহার জন্য পার যদি দেশে ছোট একখানা বাটি তৈয়ার করিয়া দিবে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে সুবিধারকম জায়গার চেষ্টায় থাকিবে। যে সময় সুবিধা দরে পাও রাখিয়া দিবে। ভদ্র মেলে। আমি ভাল আছি। আমার জন্য চিন্তা করিও না। তোমাদের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকি। সদা সুখে থাক এই প্রার্থনা করি। হিন্দু-মুসলমান ভদ্র মহোদয়দিগকে আমার আদাব জানাইবে। আশীর্বাদ-দোয়া করিতে বলিবে। তোমাদের কুশল চাই। শ্রীমান নায়েব আলিকে ও বাসার সকলকে আমার দোয়া জানাইবে। ইতি

তোমার দাদা
আলাউদ্দিন।"

ফ্রান্সের রাজধানী আলোর-রাণী প্যারিস থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ

"শ্রীমান তোমার নিকট তিন-চারখানা পত্র দিয়াছি, এ যাবৎ একখানা চিঠিরও উত্তর পায় নাই বলিয়া দুঃখিত আছি জানিবে। আরব, গ্রীক, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, বুদাপেস্ট, ভিয়েনা, প্রাগ ও জার্মানী হইয়া প্যারিসে আসিয়াছি। ইউএরাপের প্রায় সব দেশ দেখিয়া আসিলাম। ইহার পর বেলজিয়াম যাইব। তারপর লণ্ডনে তিনমাস থাকিব। তারপর আমেরিকা যাইব। এইসব দেশ দেখিয়া নতুন জীবন ধারণ করিলাম। তাহারাই মানুষ তাহাদের কার্যকলাপ দেখিয়া মানুষের কর্ম মনে হয় না। দৈব মনে হয়। শহর, বাড়ি, রাস্তা, বাগান, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা সব। রেলগাড়ী পাতলে তিন প্রকারে চলে। নীচে গাড়ী, তারপরে উপরে জমি, তার উপরে আবার রেলগাড়ী, এরপর জমি, উপরে রেলগাড়ী, এর উপরে জমি, তার উপরে ট্রাম, মোটর, বাড়ী-ঘর আর মানুষ চলাচল করে। উপরে যত কারবার পাতালেও তদ্নুরূপ। ধারণার অতীত।

এ দেশ সঙ্গীতে মত্ত। সঙ্গীতের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে। সেখানে কেবল সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু হয় না। দুইশত-তিনশত লোক নানা যন্ত্র লইয়া ব্যাণ্ড বাজায়। এ সব শুনিলে অবাক হইতে হয়। মেয়ে-ছেলে সকলে মিলিয়া বাদ্য করে। মনঃস্থির হয় তাহাদের বাদ্য শুনিলে। আমাদের বাদ্য এরা অতি মনোনিবেশে শোনে। চার হাজার লোকের সামনে যখন বাজাই তখন মনে হয় এখানে মানুষ নাই। শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে না। হাজার আলো সেই রঙমহলে। সব বাতি নিবাইয়া দেয়। যেখানে বসিয়া বাজাই সেখানে আলো রাখে। বাদককে দেখিবার জন্য। বাদ্য শেষ হইলে দশ মিনিট পনের মিনিট পর্যন্ত সময় তালি দিতে থাকে বাজাইবার জন্য। এত পছন্দ করে। যে দিন খুব ভাল বাদ্য হয় সেইসময় ফুলের তোড়া, মালা, ছুঁড়িয়া ফেলে। স্টেজ ভরিয়া যায়। এতো শ্রোতা পৃথিবীতে কোথাও দেখি নাই।

এইরূপ সম্মান প্রত্যেক জায়গাতেই পাইতেছি। বাদ্য করে মনে শান্তি পাই। আলাপ শুনে, গৎ শুনে আর উদয়শঙ্করের নাচ দেখে খুশী হয়। কিন্তু খাওয়া নিয়ে বড় কষ্ট পাইতেছি। যে হোটোল যাই সে হোটেলেই শুকরের মাংস থাকে। এজন্য খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। মাত্র দুধ, মাখন, রুটি, ফল, সিদ্ধ তরকারী খাইয়া থাকি। আর চা খাই। ইহাতে অনেক খরচ পড়ে। আমার খাওয়ার কষ্টের দরুণ সকলেই দুঃখিত। এজন্য দেশে আসিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি ছাড়িয়া দেয় তবে আসিব।

দুইশত লোক এক সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজায়। বেহালাই প্রায় ৩০-৪০ খানা, চেলু ১০ খানা, বেস বেহালা ৫টা, পিয়ানো, কর্ণেট, ক্ল্যারিওনেট যাবতীয় যন্ত্র লইয়া যখন আরম্ভ করে তখন মন অস্থির করিয়া তুলে। সকলে এক সঙ্গে বাজায় না। পৃথক পৃথক পার্ট আছে। মাঝে মাঝে গান। এক অদ্ভুত ব্যাপার। এখন ইচ্ছা হয় বাড়ীর ছেলে-পিলে সকলকে ইংরেজী মিউজিক শিক্ষা দেই। আমার সময় নাই, অল্প আছে, কবে কি হয় তিনিই জানেন।

আমার ইচ্ছা হয় বেসের জন্য বেহালার অনুকরণ না করিয়া আমাদের দেশী যন্ত্র করা যায় কিনা। নীচের দিকটা সারেঙ্গী কিংবা এসরাজ যন্ত্রে নমুনা রাখিয়া উপরের খাড়াটা

চন্দ্রসারংগের মতন করিলে কিরূপ হয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। নীচটা পাতলা তক্তা দ্বারা করিতে হইবে, যাতে বড় আওয়াজ হয়। তারপর বেহালার পরিবর্তে এসরাজ। একহাত দেড়হাত লম্বা। পিয়ালি থাড় মোটা হইবে। যাতে চড়া স্বর বেহালার মত হয়। এরূপ করিয়া এসরাজ তৈয়ার করিতে হইবে। দ্বিতীয় চন্দ্রসারং হইবে, বেসের জন্য বড় এসরাজ কিংবা সারেঙ্গী হইবে। ...এসব তৈয়ার করিবার জন্য একটু চিন্তা কর। আমি তোমার নিকট আসিয়া এসব চিন্তা করিয়া দেখিব। যদি বাঁচিয়া আসি তবে। সেতার, বেঞ্জু ও থাকিবে, ছোট সেতার থাকিবে। এসব যন্ত্র যদি করিয়া দিতে পার, গৎ নানাভাবে তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিব। বেসের যন্ত্রের জন্যই চিন্তা। এ যদি করিয়া দিতে পার তবে আমার ইচ্ছা পূরণ খোদা করিবেন। আমি যাহা কিছু লিখিলাম, প্রাণের আবেগে। তুমি চিন্তা করিবে। তোমার মাথা আছে। প্রথমে ক্ষতি করিলে পরে লাভ হইবে। ছবি আঁকিয়া দিলাম। যে নমুনাটি পছন্দ হয় তাহাই করিবার চেষ্টা করিবে। বেহালার মত পৃথক পৃথক কাঠের দ্বারা উপরে ও নীচে বেহালার মত তক্তা দিয়া করিতে হইবে। ইহাতে খুব মোটা তার লাগে। রামপুরের ব্যাণ্ডে দেখিয়াছ। এঁদের নয়। তোমার মাথা হইতেও চিন্তা করিয়া বাহির কর। যত শীঘ্র পারি দেশে চলিয়া আসিব। দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। যার জন্য আসিয়াছিলাম। তবে কিছুই বাঁচেনা। যা পাই সব খরচ হয়। এক পয়সাও বাঁচে না। খুব দেখিয়াছি। তবে আমার দেশের মতন পৃথিবীতে কোথাও নেই। সোনার বাংলা। একপ্রকার আছি। ঠিকানা মত পত্র দিয়া কুশল জানাইয়া চিন্তা দূর করিবে। ইতি

আলাউদ্দিন।”

ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ার থেকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ

“শ্রীমান তোমার পত্র একখানা পাইলাম। অনেক জায়গা ঘুরিয়া আসিয়াছি।......২৬শে মে আমরা প্যারিস ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিয়াছি। লণ্ডনের নিকটেই উপরের ঠিকানায় (ডেভেনশায়ার) আছি। এখানে আমরা তিন মাস থাকিব। এখানে নতুন নাচ, নতুন গৎ ও কনসার্ট করিয়া আমেরিকাতে যাইব। তুমি লিখিয়াছ, প্যারিস রিড (হারমোনিয়ামে ব্যবহৃত হয়) যেখানে তৈয়ার হয় সেই কোম্পানীর ঠিকানা দেওয়ার জন্য। আমরা প্যারিস ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন ঐ কোম্পানী খোঁজ করিয়া বাহির করা আমার কার্য নয়। হারমোনিয়াম কি যন্ত্র, কিসের নাম, তাই জানে না, আমাদের দেশের জন্য রিড তৈয়ার করে। এ সকল খোঁজ এখানকার বাসিন্দা যারা তারাই জানে না। এক বৎসর ঘুরিয়াও খোঁজ পাইব না। এত বড় শহর। বিলাতি তার (যন্ত্রে লাগাবার) খুঁজে পাই না। বড় বড় যন্ত্রের দোকানে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমরা জানি না। রিড কিংবা তার আমাদের দেশের জন্য তৈয়ার করে। সেসব জিনিস এদেশে আবার চলে না। তাদের প্রয়োজন হয় না। কোলকাতার বড় বড় দোকানে খোঁজ করিলে কোম্পানীর ঠিকানা জানিতে পারিবে। বেহালা এখন তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই। যখন দেশে ফিরিয়া যাইব তখন করিবে।

উদয়শঙ্কর আমাকে ছাড়িতে চায় না। বলে, আপনাকে একা আমি কিছুতেই পাঠাইতে

পারি না। আমেরিকা ঘুরিয়া এক সঙ্গেই সকলে যাইব। এজন্য আমেরিকা ঘুরিয়াই আসিতে ইচ্ছা করি। আমি ভালো আছি। তোমাদের মঙ্গল জানাইয়া চিন্তা দূর করিবে।...

শ্রীমান বাহাদুর হোসেনকে গান শিক্ষা দিও। আমি তার জন্য বই লেখা আরম্ভ করিয়াছি। লেখা শেষ হইলে পাঠাইব। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গানও শিক্ষা দিবে। মারপিট করিবে না। তাদের খেলার সঙ্গে যেমন লেখাপড়া ও সঙ্গীত সব চলে এই রকম শিক্ষা দিতে হইবে। আরেকখানা পত্র লিখিয়াছি বোধ হয় পাইয়া থাকিবে। ইতি

আলাউদ্দিন।”

ইংল্যাণ্ড থেকে লেখা এক চিঠিতে ঃ

“তোমার পত্র পাইলাম। সব বিষয় অবগত হইয়া সুখী হইলাম। শ্রীমান বাবা জীবন বাহাদুর হোসেনের বিষয় জেনে অতিশয় সুখী হইলাম। খোদা তাকে দীর্ঘজীবি করুন। তার চঞ্চল স্বভাবের দরুন ত্যক্ত-বিরক্ত হইবে না। মারপিট করিবে না। তার ইচ্ছা অনুসারে তাকে শিক্ষা দিবে। তার শিক্ষা না দিলেও সে সব পারিবে। ঐশ্বরিক ক্ষমতা তার মধ্যে আছে। তাকে বাঁধা দিবে না। মাদক কোনো পদার্থ পান না করে এই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। লেখাপড়া যা কিছু পার, তার ইচ্ছামত পড়াইবে।

আমি সমুদ্রের ধারে কতেক দিন বাস করিতে গিয়াছিলাম। পহেলা আগষ্ট আবার এখানে (ডেভনশায়ার) আসিয়াছি। সাত-আট মাস হইল আমার কাশি হইয়াছে। কিছুতেই যায় না। কাশির সঙ্গে চারদিন রক্ত বাহির হইয়াছে। আমার সন্দেহ হইলে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করি। ডাক্তার বলেন, বুকে কাশি জমিয়া গিয়াছে। ধূমপান কমাইতে বলেন। তাহাও করিয়াছি। ওষুধ সেবন করিতেছি। কাশি যায় না। পাঁচ-সাত দিন যাবৎ রক্ত আসে নাই। এর জন্যই সমুদ্রের ধারে গিয়াছিলাম। চিন্তার কারণ কিছু নাই। খোদা যা করেন তিনি করিবেন। মাইহারে এসব জানাইবে না।

বাটিতে মাটি ভরাট হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। যা করিতে হয় তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সব কর। আমাকে জানাইবার প্রয়োজন নাই। ছেলেপিলে হইয়া যদি ঘর করিয়া ওখানে থাকিতে পার তোমার ইচ্ছামত বাসা করিয়া ঐখানে বাস করিবে। ....মাইহারের বাড়ির জন্য মহারাজার নিকট ৯০ পাউণ্ড পাঠাইয়াছি।........... বেতন সম্বন্ধে যেরূপ কন্ট্রাক্ট হইয়াছে তাতে আমার ঠক হইয়াছে। এ সব বিষয়ে আমি কিছু জানিতাম না। মাসিক বেতন নয়, সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন পাই। ইউরোপে সপ্তাহে ১৩ পাউণ্ড পাইব। আমেরিকাতে সপ্তাহে ১০০ ডলার পাইব। এর মধ্যে আবার অন্য হিসাব—এক সপ্তাহে ৩টা করে শো হইলে ১৩ পাউণ্ড পাইব, সপ্তাহে ১টা কিংবা ২টা শো হইলে অর্ধেক পাইব। সাড়ে ছয় পাউণ্ড। শো না হইলে অর্ধেক বেতন। এসব বিষয়ে অবগত ছিলাম না। যা কিছু বেতন পাইতেছি, এর দ্বারা কেবল খাওয়া খরচ চলে। সঙ্গে যতজন আছে সকলেরই এই দশা। লাভের মধ্যে দেশ দেখা। নিজের বিদ্যা প্রকাশ করা। অর্থের আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের হাতেও এক পয়সা থাকে না। বহু ব্যয় হয়। যাতায়াত ও মালপত্রের ভাড়া দিয়া এক পয়সা বাঁচে না। এসব দেশগুলি দেখিতেছি। অন্য দেশ যা কিছু বাকি বিস্তারিত করিয়া।

তোমার পত্র পাইলে কি আনন্দ হয় তা জানান অসাধ্য। বাড়ির বিষয়, জমাজমির, পুকুরের, মসজিদের, গ্রামের সকলের কুশলাদি জানাইবে। বড় সাদা, মেজ বৌদির, অবস্থা জানাইবে। তিনি কেমন আছেন, তাঁর প্রতি তোমরা দৃষ্টি রাখিবে। ইতি, আশীর্বাদক—

তোমার দাদা
আলম।"

পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে, বাবার প্রেরিত উপরের এই বিদেশযাত্রার পত্রগুলির বানান, আমাকে পাঠানো তাঁর পত্রগুলি থেকে ভিন্ন। কারণ, মোবারক বাবার পত্রগুলির অশুদ্ধ বানানগুলিকে শুদ্ধ করেই আমার কাছে পাঠিয়েছিল।

৭৭

যে রকম ভাবে এই চিঠিগুলো থেকে আমরা বাবার একটা রূপ পাই, ঠিক সেই রকম বাবার রূপ অসংখ্য লোকের কাছে আছে। সেটা তখনই জানা সম্ভব যখন তাঁদের সাথে যোগাযোগ হয়। অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিস্তীর্ণ অঙ্গ নদীর মত বাবার জীবন, যা একক ভাবে কারও কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই অজস্র লোকের দ্বারস্থ হয়েছি। কেউ দিয়েছেন কণামাত্র, কারো কাছে ছিল কুবেরের ধন, আবার কেউ কেউ মিথ্যার গিল্টিকে সোনা বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। বাবার স্বজন এবং শিষ্যদের বাইরে এক বিশাল ভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। যখন তথ্যের আশায় বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কাছে গেলাম, অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে নিজের ভাগ্নে বিমলাকান্তের নাম উল্লেখ করলেন। বললেন, 'বাবার বিষয়ে অনেক সামগ্রী আছে তাঁর কাছে, আর ও দিতেও কৃপণ নয়।' বাবার জীবনী নিয়ে বই লিখবার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে বিমলাকান্ত বললেন 'আমার দীর্ঘদিনের বাসনা ছিল বাবার উপর একটা বই লেখা। এ যাবৎ বাবার বাজনার সমালোচনা যা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, সবই আমার কাছে আছে।' এক বাণ্ডিল সংবাদপত্র এনে আমাকে দিলেন। যদিও বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী এনায়েৎ খাঁ সাহেবের কাছে সেতার এবং সুরবাহারের তালিম নিয়েছিলেন, কিন্তু বাবার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা দেখে মুগ্ধ হলাম। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর মা এস্রাজ বাজাতেন। বাবা নিজে হাতে লিখে বহু গানের স্বরলিপি বিমলাকান্তের মাকে দিদি সম্বোধন করে পাঠিয়েছিলেন।

আমি একটা জিনিষের খোঁজে ছিলাম। মৈহারে যাবার আগে কাশীতে জ্যোতিষ রায় চৌধুরীর কাছে যে 'মিউজিসিয়ান অব ইণ্ডিয়া' বইটা দেখেছিলাম। সেই বইটা কোন সনে ছাপা হয়েছিলে সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কাশীতে জ্যোতিষ রায়চৌধুরীর কাছে যখন গেলাম, তখন জানলাম বইটা তিনি কাউকে দিয়ে ফেরৎ পান নি। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কাছেও বইটা ছিল না। বইটা পেলাম বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছে। দেখলাম মৈমনসিংহ এর জমিদার হরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী 'মিউজিসিয়ান অব ইণ্ডিয়া' বইটা প্রকাশ করেছিলেন ৩.১০.১৯২৯ সনে। অর্থাৎ বাবার যে সময় বয়স ছিল আটচল্লিশ বছর। এই বয়সে বাবার সন ভুল হবার কথা নয়। পরবর্তীকালে বয়স হওয়ায়, বাবা বিস্মৃতির ফলে নানারকম কথা বলেছেন যার জন্য শতবর্ষ ভুল হয়েছিল। যাইহোক এর পর বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী যে

জিনিষ আমাকে দেখালেন তা আমি আগে কখনও দেখি নি। কেবল সেই সময় নয় আজও ভারতবর্ষে কারো কাছে দেখি নি। জিনিষটা হোল বাবার মৈহারের ব্যাণ্ড পার্টির রেকর্ড এইচ্-এম-ভি. করেছিল। বাবার ব্যাণ্ড পার্টি বিখ্যাত হবার পরই এই রেকর্ড করা হয়েছিল। এইচ্-এম-ভির রেকর্ডের নম্বর জি, সি, আট, দশ হাজার একশ সাতাত্তর, দশ হাজার একশ আটাত্তর এবং পি ছ' হাজার ছ'শো তেষট্টি। রেকর্ডে লেখা ছিল "মৈহার স্টেট স্ট্রি ব্যাণ্ড" ইন দি টিউনসঃ মজুমা সাজা-সিতার খানি খাম্বাজ—একতাল, মজুমা সাজা তিলক কামোদ ঠা দুন চৌতাল, মজুমা সাজা হিন্দুস্থানী পোস্তা দাদরা, মজুমা সাজা হিন্দুস্থানী পোস্তা একতাল।" রেকর্ডগুলো আমি সব শুনেছিলাম। যেহেতু রেকর্ডগুলো আমি বাহাত্তর সনে বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছে দেখেছিলাম যা আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা সেই রেকর্ডগুলো পরে আর রেকর্ড করা হয় নি। রেকর্ড করা থাকলে তা জাতীয় সম্পত্তি হ'তো। উপস্থিত সেই রেকর্ডগুলো তাঁর ছাত্রের কাছে আছে। সেই সময় যাঁরা রেকর্ডে বাজিয়েছিলেন তার মধ্যে বর্তমানে গিরিধারীলাল এবং জলতরঙ্গ বাদক ঝুর্‌রা আজও জীবিত আছে। কিন্তু উনিশশো নববই এর মে মাসে মৈহারে গিয়ে শুনি জলতরঙ্গ বাদক ঝুর্‌রাও মারা গেছে। বাবার বহুজিনিষের প্রত্যক্ষদর্শী গুলগুলজী, তিনিও ছিয়াত্তর সনে গত হয়েছেন। বাবার এত পরিশ্রমে তৈরী করা ব্যাণ্ডে পরবর্তীকালে নূতন নূতন ছেলেদের নিয়ে গুলগুলজী শিখিয়েছিলেন। তবে বাবার সময়ে যা ছিল আর বর্তমানে যা আছে তা আকাশ পাতাল তফাৎ। শুনেছি আলিআকবর বাবার জীবনের অবসানের পর নূতন নূতন ছেলেদের দ্বারায় যে অর্কেষ্ট্রা হয়েছে সেগুলো আমেরিকায় রেকর্ড করে নিয়ে গিয়েছে।

বাবার উপর বই লিখতে গিয়ে পড়েছি বিপদে। প্রচণ্ড কন্ট্রাডিক্‌শান অছে। বাবার জীবনী সম্বন্ধে অনেকেই ইতিপূর্বে লিখেছেন। এখনও লিখছেন। এবং ভবিষ্যতেও অনেকে লিখবেন। কিন্তু প্রমাণ্য কতটুকু তা বিচার্য বিষয়। বহু কাল কেটে যাবার দরুণ অনেক লোকই অনেক কিছু ভুলে গেছেন। অথবা এখন একালে অন্যকে পছন্দ করেন না, তাই তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করছেন। এ ধরনের ঘটনায় আমার হয়েছে বিরাট সমস্যা। তাই আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে বিশ্লেষণে এবং ক্রমাগত বেদান্তের থিওরী এপ্লাই করতে হয়েছে। 'ন ইতি ন ইতি আত্মগ্রাহ্যং'। এটা যে কি দুরূহ কাজ সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। তথাপি আমার মনে হয়েছে, কিছু লোক নিজের নামকে উজ্জ্বল করবার জন্য নিজেকে মুখ্য করে বাবাকে গৌণ করেছে।

প্রবাদ আছে 'শত্রুরও গুণ বলা উচিত এবং প্রয়োজনে গুরুরও দোষ বলা উচিত।' তাই সত্য কথা যা উদ্ধার করেছি তা অকপটে বলাই ভাল। আমি মৈহার ছেড়েছিলাম সেই সময়, যে সময় বাবার কাছে নিঃসঙ্গতাটাই ছিল সব থেকে বেশি বেদনাদায়ক।

একদিকে একাকীত্ব অন্যদিকে স্বজনহীনতা। এই নিয়ে চারটে বছর বাবা এবং মায়ের যে কি ভাবে কেটেছে তার আভাষ পেতাম তৎকালীন মৈহারের ছাত্রবৃন্দের কাছ থেকে, যাঁদের বাবার প্রতিনিধি হিসাবে আমাকে শেখাতে হয়েছিল। বাবা বলতেন মাটিগুলো ভাল। মূর্তির আদল তৈরী কর, আমি পরে চোখ, কান, মুখ সব এঁকে দেব এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব।

মাঝপথে চলে এসেছিলাম বলে আমার গড়ার কাজই পুরো করতে পারি নি। আর মন ভাঙ্গার ফলে বাবা না তুলির টানে আদল তৈরী করেছিলেন আর না প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

ওদের দোষ কোথায়? কি আকুলতা নিয়ে ওরা শিখতে গিয়েছিল আর কি পুঞ্জীভূত হতাশার মধ্যে ওঁরা রয়েছে তা জানতে পারতাম, হয় আমার ছাত্র ডেভিড-এর কাছ থেকে অথবা অন্যান্য আবাসিক ছাত্রদের কাছ থেকে, যারা চিঠির মাধ্যমে আমার কাছ থেকে সঙ্গীত সাহায্য চাইতো।

আমার মৈহার থেকে চলে আসার পর এবং বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বহু ঘটনার উল্লেখ আমি আগেই করেছি। তথাপি কিছু ঘটনা থেকে গিয়েছিল অনুল্লিখিত। যে ঘটনাগুলোকে ইচ্ছে করেই আগে উল্লেখ করি নি। কারণ এই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমার কাছে উপলব্ধ। যাঁদের সামনে ঘটছে বা যাঁরা ঘটনার কুশীলব তাঁরাই আমাকে বলেছেন, তাই হুবহু তাঁদের বক্তব্যকেই তুলে ধরব। এর আগে একটা কথা না লিখে পারছি না। মানসিক অশান্তিগ্রস্ত বাবাকে ফেলে এসেছিলাম। ছয় বছর পরে সেই বাবা রুগ্ন। কোলকাতায় আরোগ্যলাভ করে মৈহারে ফিরেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এটা আশা করা যেতে পারতো, যে কয়েকজন শিক্ষানবিশ তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করছে কিন্তু তা হোল না। পরিত্যক্ত খনিকে ফেলে যেমন খননকারী অন্য খনির সন্ধানে চলে যায়—এখানেও তাই হোল। ওরা জানলও না যে ওরা যে খনিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেই খনিতে অনন্ত রত্নরাজি তখনও রয়েছে যা অল্প প্রচেষ্টাতেই পাওয়া যেতে পারতো। কিন্তু ওরা তা করল না। তার ফলে বাবার সেবা হোলই না আর তারাও কিছু পেলো না। শিক্ষানবিশদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হোল ডেভিড। যে মনে প্রাণে একলব্যের সাধনা করে চললো। কিন্তু তার কি দুর্ভাগ্য! বাবার অকৃতজ্ঞ স্বজনরা কোনদিনই তার সামান্য প্রশংসা করল না। যাক অপরের জন্য যে কাঠ কাটে, তাকে বাঘের মুখে কে ফেলে গেল তাতে কিছু যায় আসে না। যাক এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েই শুরু করা যাক।

আমি যে সময় মৈহার ছেড়ে চলে আসি সেই সময় কেবল বাবা, মা ও একটি চাকর অত বড় বাড়ীতে ছিলো। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কলেজের ডেভিড এবং রবিন ছাড়া সেই সময় ইন্দ্রনীল, হীরেণ মুখার্জি, বিবেক রঞ্জন সিংহ এই কয়েকজন ছিল। এরা বাবার কাছে শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে সেই সময় ডেভিডের কাছেই শিখতো। বাবার প্রথম হার্ট এ্যাটাকের সময় এরাও ছিল।

কিছুদিন পরে আলিআকবরের নির্দেশে শরণরাণী দুই বছরে মাত্র দুই বার শিক্ষার জন্য দিল্লী থেকে মৈহার গিয়েছেন। আলিআকবরের বিদেশেই বেশী সময় কাটত। ভারতে এলেও শরণরাণীর শিক্ষা হ'তো না। সেইজন্য আলিআকবর শরণরাণীকে মৈহারে বাবার কাছে গিয়ে শিখতে বলেন। যে হেতু শরণরাণী বিবাহিতা এবং তাঁর সংসারধর্ম আছে। সেইজন্য কয়েকদিন বাবার বাড়ীতে থেকেই শিক্ষা করে দিল্লী ফিরে যেতেন। বাবা তাকে কন্যার মত স্নেহ করে শেখাতেন। কয়েকবার শরণরাণী তাঁর স্বামী সুলতানসিং বাকলিবালকে নিয়েও মৈহারে গিয়েছেন। বাবা শরণের স্বামীকে জামাই সম্বোধন করে যে আতিথ্য

দেখিয়েছেন, সে কথা তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। আসলে বাড়ীতে যেই আসুক না কেন বাবা বলতেন, 'খুদা কোন বেশে এসেছেন বুঝতে পারি না। আমার তো সেই ত্রিনেত্র খোলে নি।' যার ফলে বাবার বাড়ীতে যিনিই যেতেন তিনিই এই মনোভাব নিয়ে ফিরতেন যে বাবা তাঁকে যে স্নেহধারা বর্ষণ করেছেন, এ রকম অন্য কাউকে করেন নি। এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে যে কথা আগেই লিখেছি। তবে এও ঠিক, শিক্ষার সময়ে বাবা অতিথি সৎকার ভুলে যেতেন। একবার শরণের অনুরোধে বাবা তাঁকে "শ্রী" রাগ শেখাচ্ছেন। সেই সময় যাদের নাতি সম্বোধন করতেন তেমন শিষ্যও ছিল। শেখাবার সময় কিন্তু বাবা অতিথি ভগবান ভুলে যেতেন। "শ্রী" রাগ শেখাবার সময় বাবা শরণরাণীকে এমন বকাবকি করলেন তা শুনে ছাত্ররা অবাক, কেননা যতই হোক মেয়ে শিক্ষার্থী তো। বকুনি খেয়ে শরণরাণী মাথা নিচু করে রইলেন।

আমার মৈহার থাকাকালীন মৈহারের মহারাজা কখনও আসেন নি। রাজাদের রাজত্ব যাবার পর সেই যে জববলপুরে চলে গিয়েছিলেন তার পর আর আসেননি। কিন্তু আমি মৈহার থেকে চলে আসবার পর খবর পেয়েছি মহারাজা কয়েকবার এসে বাবার সঙ্গে দেখা করেছেন। একবার শরণরাণী মৈহারে গেছেন শিখতে সেইসময় মহারাজা এসে উপস্থিত। বাবা শরণরাণীকে মহারাজের সামনে আসতে দিতেন না কিন্তু ভাগ্যচক্রে এবার সামনাসামনি হয়ে গেল।

আর একবার শরণ রাণী মৈহারে শিখতে গেছে। হঠাৎ এক ছোট বাঁদরের বাচ্চা শরণের ঘরে গিয়ে টাঙান শাড়ি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। বাবা এটা দেখেই বললেন, 'আরে আমার অতিথিকে অপমান করছে।' বাবা বাঁদরটাকে ধরে গলায় একটা ঘণ্টি লাগিয়ে দিলেন। আদর করে তাকে নিজের বাড়ীতেই রাখলেন। যখন বড় হোল বাবার একটা কুকুর, তাকে কামড়ে দিল। শরণরাণীর কাছে ওষুধ ছিল বাঁদরটাকে লাগিয়ে দিল। বাবা রাগ করে কুকুরটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন এবং তার খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কুকুরটা খাবার না পেয়ে চিৎকার করায়, বাবা তাকে ছেড়ে দিয়ে লাঠি নিয়ে বেরোলেন মারবার জন্য, কেবল তাই নয় ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন মারবার অভিনয় করতে, মারতে নয়। বাবার বুলি 'শুয়ার কে বাচ্চা', 'কামচোর' শুরু হয়ে গেল। বাড়ীর ভিতরে সকলকে এই সম্বোধন করলেও বাইরে কিন্তু কখনও বলতেন না। বাবার এই সম্বোধন শুনে, শরণ একেবারে স্তব্ধ কেননা এ যাবৎ বাবার কাছে এ ধরনের কথা কখনও তো শোনেননি। জানি না কি মনে করে কুকুরটাকে আবার বেঁধে রাখলেন। কিন্তু কুকুরটার আওয়াজে শরণ বাজাতে অসুবিধা বোধ করতে লাগল তাই বাবাকে অনুরোধ করল, কুকুরটা বেঁধে না রাখতে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাকে বন্ধন মুক্ত করলেন। আসলে বাবাও চান নি কুকুরটাকে কষ্ট দিতে কিন্তু শরণরাণীকে দেখাতে চাইলেন যেহেতু বাঁদরকে কামড়েছে তাই তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। আসলে জন্তু জানোয়ার এমন কি সাপকেও বাবা কখনও মারতেন না। বাবা বলতেন, 'ভগবানের সৃষ্টি যেমন মানুষ, তেমনি জন্তু জানোয়ারও তাঁরই সৃষ্টি।' তাই যখন কোন বড় অফিসার বা শিকারী এসে বলতেন, 'যে তাঁরা হরিণ বাঘ শিকার করেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা

বলতেন, 'একজনের প্রাণ যখন দিতে পারেন না তখন সখের জন্য বাহাদুরী করে একজনের প্রাণ নেন কি করে? যাঁদের হৃদয় অত্যন্ত কঠোর তাঁরাই শিকার করে আনন্দ পায়।' এ কথা যখন বলতেন তখন সেই সব বীরবাহাদুরের মুখটা সত্যই দেখবার মত হ'তো।

ভারত সরকারের তরফ থেকে বাষট্টি সনে ভুলক্রমে বাবার শতবার্ষিকী ভূপালে যে সময় হয়েছিল, সেইসময় রবিশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই শতবার্ষিকী মৈহারে যে সময় স্থানীয় নাগরিকেরা বিশেষ করে রতনলাল শেঠ এবং দীপচন্দ প্রভৃতির সাহায্যে হোল, সে সময় কিন্তু রবিশঙ্কর যান নি। সে সময় আলিআকবর উপস্থিত ছিলেন। চিন্তা করার বিষয় এই যে শতবর্ষ পালনের ব্যাপারে দুজনাকে বর্জন করা হয়েছিল। এক অন্নপূর্ণাদেবীকে, দ্বিতীয় আমাকে। রজক মনোরঞ্জনের জন্য সীতা নির্বাসিতা হয়েছিলেন। আর এখানে রবিরঞ্জনে অন্নপূর্ণা। একটাতে স্বামী করেছিল আর একটাতে ভাই। আর আমাকে ডাকা হয়নি এইজন্য যে আমি কোদালকে কোদাল বলতাম। ওঁদের যে কোন উপায়ে পাবলিসিটি দরকার, তা শবযাত্রায় শববাহী হিসাবেই হোক বা অকালের শতবর্ষ পালনের সভায় বসা অবস্থাতেই হোক। চতুরটি সরকারী প্রচার যন্ত্রে নিজের নাম দাখিল করিয়ে সুনীল সাগরের কিনারা ধরল; আর অপেক্ষাকৃত অপরিণত বুদ্ধিটি চতুরের কথায় সাত সাগর পার করে এসে মৈহারের সামিয়ানার নিচে বসল।

বুদ্ধিমান আর শঠের তফাৎ হোল, বুদ্ধিমান নিজের অংশটাকে গুছিয়ে নিতে জানে। আর শঠ অন্যের অংশটাকে কেড়ে নেয়, এবং যাবার সময় বলে যায় তোমার অংশ ওখানে ঢাকা আছে। এইসব জারিজুরি আমার সামনে ধোপে টেকে না। তাই আপদ থাক দূরে দূরে। কিন্তু আমি দুরে থাকলেই কি মিথ্যা সত্য হয়ে যাবে? তা তো হয় না।

বাবার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একানব্বুই বছরের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখলেও এত তথ্য আছে যা লেখা সম্ভব নয়। আমি বাবার সংস্পর্শে যে সময় এসেছি সেই জায়গা থেকে লেখা শুরু করে দিলাম। মৈহারে সাত বছর থাকাকালীন রোজনামচা যা লিখেছি, তার মধ্যে বহু ঘটনা বাদও দিয়েছি। বাবার নির্দেশে যখন বাবার জীবনী লেখবার জন্য আজ্ঞা হোল সেই সময় বহু লোকের ইন্টারভিউ নিয়েছি সে কথা আগেই লিখেছি। এই সাক্ষাৎকারের সময় যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হোল সে কথা বলতে গেলে মৈহার থাকাকালীন একটা ঘটনার কথা না লিখলে বাবার চরিত্রের একটা দিক বুঝতে পারবেন না। কথাটা হলো সাক্ষাৎকারের সময় প্রায় সবাই বলেছেন, 'আপনার উস্তাদ বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন এবং খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতেন।' আমি বলেছি, 'বাবা একজন মেথরকেও যখন শ্রদ্ধা ভাব দেখাতেন, তখন আপনাদের মত গুণীদের শ্রদ্ধা ভাব দেখাবেন এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে?' যাঁরা নিজেদের বাবার শ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করতেন, তাঁরা বাবার বৈষ্ণব বিনয়টার গভীরতা বুঝতে পারতেন না। যেমন আমার মৈহার থাকাকালীন যে কোন বয়স্ক লোক এলেই আশিসকে বলতেন প্রণাম করতে। বাবার কথায় আশিস প্রণাম করলে সেই বয়স্ক লোককে বলতেন, 'আমার নাতি যেন দীর্ঘজীবি হয়ে সাধনা করতে পারে তার জন্য আশীর্বাদ করুন।' এর থেকে যদি সেই বয়স্ক লোক নিজেকে একজন দিগ্‌গজ মনে করেন তা হলে বাবার কি

আছে? ছোটবেলায় বাবা আলিআকবরকেও বয়স্ক লোক দেখলেই প্রণাম করতে বলতেন বলে শুনেছি। কিন্তু বয়স্ক লোক যাঁদের প্রণাম করতে বলতেন, তাঁরা এর অর্থ অন্য ভাবে নিয়েছেন। অনেকে আমাকে এ কথা বলে নিজের পদমর্যাদা বাড়াতে চেয়েছেন। বাবা বাড়ীতে কোন অতিথি এলেই বলতেন, 'ভগবান কোন বেশে এসেছেন বুঝি না।' কিন্তু যদি কেউ সঙ্গীত সম্বন্ধে বেচাল কথা বলেছেন, বাবার অতিথি এ কথা ভুলে গিয়ে রুদ্র মূর্তি প্রকাশ করে ফেলতেন।

মৈহারে থাকাকালীন বাবার এই ভাব দেখেছি, কিন্তু মৈহার ছাড়ার পর আজ পর্যন্ত কত অভিজ্ঞতাই না হোল। এ যুগে অবাক হয়ে ভাবি কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আজকালকার নব্য শিল্পীরা বাপের বয়সের লোকের সঙ্গে দেখা হলে, হাত মেলাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। এর চেয়েও অবাক হই যখন দেখি শিল্পী তাঁর গুরুর পায়ের হাঁটু পর্যন্ত হাত কোন রকমে নিয়ে গিয়ে প্রণামের ভাব দেখায়। বাহাত্তর সনে যখন আমি শিল্পীদের সাক্ষাৎকার নিই সেই সময় কোলকাতায় আমার এক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গুরুভাই-এর শিষ্যের ওই ধরনের প্রণাম দেখে আমার চোখে বিসদৃশ লেগেছিল। সেই ছাত্রটি যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার গুরুভাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দার্শনিকের মত বলেছিলেন, 'দেখ আমরা যখন বাবাকে প্রণাম করতাম বা বাবাকে কোন কথা বলতে ভয় পেতাম, তা যদি আজকের ছাত্রদের কাছে আশা করো তা হলে কষ্ট পাবে। আজকাল ছাত্রদের প্রণামের সময় যদি কোন কারণে অন্যমনস্ক থাকে, তা হলে তাদের হাত কোনখানে গিয়ে যে ঠেকবে ভাবলে আতঙ্ক হয়।' আমার ওই একটা দোষ মন যুগিয়ে কথা বলতে পারি না, তাই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরে বলেছিলাম, 'আজকালকার ছাত্রদের দোষ নেই। আজকাল গুরুদেবদের সে গ্রাভিটি নেই। গুরুরা ছাত্রদের সঙ্গে ইয়ারকি করে। তাঁদের কাছে অর্থ এবং অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু বাবা কখনও ছাত্রদের কাছে অর্থের দাবী অথবা তাঁদের দলবদ্ধ করে নিজের গুণগান করার জন্য কোন ট্রিক্স্‌ করতেন না। তাই এখন গুরু শিষ্যের এত পার্থক্য।' যাক যে কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এসে গেছি, সেই ছোট ঘটনার কথাটা বলি।

আগেই বলেছি, চাকরকে বলা ছিল বাবা যখন আমাকে বা আশিসকে শেখাতেন, সেই সময় কোন লোক এলে অন্য সময় আসতে যেন বলে দেয়। এ কথা বলার কারণ প্রথমতঃ শিক্ষা দেবার সময় কেউ এলে শিক্ষায় ব্যাঘাত হয়। দ্বিতীয়তঃ লোক এলেই বাবা আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হতেন এবং আমাকে দেখিয়ে বলতেন, 'কাশীর ব্রাহ্মণ শিখতে এসেছে। একে শিখিয়ে নিই তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।' শিক্ষার সময় বাবার ধমকটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু লোকের সামনে ধমক দিলে নার্ভাস হয়ে পড়তাম।

কিন্তু একদিন হোল বিপদ। সন্ধ্যায় আশিস এবং আমাকে যখন শেখাচ্ছেন হঠাৎ দরজায় আওয়াজ হোল। চাকর সেই সময় বাড়ীর ভেতরে কাজের মধ্যে ছিল। ঘরের দরজায় আওয়াজ শুনেই বাবা বললেন, 'দেখ তো কে এসেছে?' দরজা খুলেই দেখি আট নয়জন বাঙালী। ইতিমধ্যে বাবাও দরজার কাছে এসে গেছেন। বাবাকে দেখেই বাঙালী ভদ্রলোকেরা বললেন, 'বম্বে থেকে কোলকাতায় মোটর গাড়ীতে ফিরবার সময় ভাবলাম আপনার দর্শন

করে যাই। সেইজন্য আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। মৈহার গেষ্ট হাউসে উঠেছি এবং এখন আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।' বাবা বললেন, 'এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা দয়া করে আমার মতো অধমের গৃহে পদধূলি দিয়েছেন। কিন্তু আমাকে দর্শন করবার কি আছে? আগামীকাল সকালে সারদাদেবীর দর্শন করবেন।' বাবার কথা শুনে আগন্তুকরা বললেন, 'বম্বে থেকে বিকেলে এসেই প্রথম সারদা দেবীর দর্শন করেছি। উপস্থিত আপনার দর্শন করতে এসেছি। আজ রাত্রেই গাড়ী করে কোলকাতা যাত্রা করব।'

ভদ্রলোকরা সারদা দেবীর দর্শন করে এসেছেন শুনে বাবা খুশী হয়ে বললেন, 'মৈহারের আসল জিনিষটিই দর্শন করেছেন। আমার মত ম্লেচ্ছের কাছে দর্শন করতে আসার মানে হয় না।' এটা হোল বাবার বৈষ্ণব বিনয়। যেমন তিনি বরাবর করেন এবারেও তাই করলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'এ হোল কাশীর ব্রাহ্মণ।' এই কথা বলেই বরাবরের মত বললেন, 'পৈতে দেখাও।' আমিও পৈতের একটা অংশ দেখালাম। বাবা বললেন, 'আমি তো ম্লেচ্ছ, আমার এখানে খেলে আপনাদের জাত যাবে, তাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ আপনাদের চা দেবে।' বাবার কথা শুনে সকলেই বলে উঠলেন, 'এ কি কথা বলছেন? এখানকার খাবার আমরা প্রসাদ মনে করেই খাব।' বাবা বললেন, 'আরে আরে এ কি কথা বলেন?' এই হোল বাবার বৈষ্ণব বিনয়।

শিক্ষার সময় বাধা পড়লে মেজাজটা খারাপ হয়ে যেত, সে যে কেউ আসুক না কেন? বুঝলাম বাজনার বারোটা বেজে গেল। কিছুক্ষণ পর চা জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলাম, বাবাকে একজন বলছেন, 'আলিআকবর আমার খুব বন্ধু।' বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'আলিআকবর আপনাদের বন্ধু না হলেও আপনাদের জন্য এই বাড়ী অবারিত দ্বার।' তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমরা এসে আপনার বাজনায় বিঘ্ন করলাম, যদি দয়া করে একটু বাজান।' বাবা আশিসকে আর আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার নাতি আর বুড়ো বয়সের ছেলেকে শেখাচ্ছিলাম, আপনাদের যদি ইচ্ছা থাকে নিশ্চয়ই শোনাব।' যিনি বলেছিলেন আলিআকবর তাঁর বন্ধু, বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবাজি আপনি কোলকাতায় কি করেন?' ভদ্রলোক বললেন, 'কোলকাতার নিউএম্পেয়ার সিনেমার বার-এ আমি চাকরি করি।' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেটা কি?' ভদ্রলোক বোঝালেন চাকরিটা কি। এই কথা শুনেই বাবার মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেল। বললেন, 'শুনতে পাই আজকাল আলিআকবর সরাব খায়। আপনি যখন তাঁর বন্ধু আপনিও খান।' বাবার এই কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখটা দেখবার ম'তো হয়েছিল। ধীরে ধীরে বাবার মেজাজের পারদ নামল। বললেন, 'আপনার মত বন্ধুরা আলিআকবরকে সরাব খাইয়ে নষ্ট করে দিলেন। নইলে ভগবান তাঁকে শক্তি দিয়েছিলেন। বাজনার দ্বারা সে সকলকে কাঁদাতে পারত যা আমি পারি নি। কিন্তু এই সরাব খাবার জন্যই তার বাজনা খারাপ হয়ে গিয়েছে।' বাবার সঙ্গীতের অনাঘাতে 'ধা' সকলের বোধগম্য হ'তো না বলে, ভদ্রলোক বললেন, 'এটা ঠিকই আপনার বাজনার মধ্যে যা আছে আলিআকবরের তা নেই।' এই কথা শুনে, সঙ্গে সঙ্গে বাবা ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আপনি মন রেখে কথা বলেন। চাটুকারিতা করেন। আলিআকবরের বাজনা খারাপ

হয়ে গিয়েছে, কি খারাপ হয়ে গিয়েছে বলুন তো? গলায় 'সা' করুন তো? কতটা সঙ্গীত বোঝেন দেখি।' এই কথা শুনে ভদ্রলোকের অবস্থা কাপড়ে চোপড়ে মাখামাখির ব্যাপার। মুখে আর শব্দ নেই। বাবার গলার শব্দ একটু বাড়ল। বললেন, 'আপনার মত কিছু লোকই সঙ্গীতের শত্রু। লোকের মন রেখে কথা বলেন। এ ধরনের লোক ভাল হয় না।' এই কথা বলেই বাবা বৈষ্ণব বিনয়ে ফিরে গেলেন। বললেন, 'বাবা কিছু মনে করবেন না। আপনি অতিথি ভগবান, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন।' এই হোল বাবার চরিত্র। ভদ্রলোকের অবস্থা তখন চরমে পৌঁছেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন কারো মুখে কথা নেই। যাক চা খাওয়া হয়ে গেলে বাবা বাজালেন। বিদায়কালে সেই ভদ্রলোককে বাবা বললেন, 'আপনি চাকরি করেন সরাবের। আপনি যখন আলিআকবরের বন্ধু, দেখবেন সে যেন সরাব না খায়। বন্ধুর কর্তব্য বন্ধুর ভাল করা, খারাপ করা নয়।' ভদ্রলোক তখন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'না না আলিআকবর মদ খায় না।' বাবা বললেন, 'না খেলেই ভাল।' সকলে চলে যাবার পর বাবা বললেন, 'এই সব লোক ভয়ঙ্কর! এই সব লোক থেকে দূরে থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। বেশী হলে তাকে সামাল দেওয়া কঠিন। দেখ না, আগে রাজাদের ঘোড়া, হাতি, ঝাড় লণ্ঠন দেওয়া বাড়ী থাকত। কি করে সম্পত্তি বাড়বে ভাবত শুধু। তাঁরা লোভী ছিল। কিন্তু রাজত্ব যাবার পর ঘোড়াও নাই, হাতিও নাই এমন কি বাড়ীতে ঝাড় লণ্ঠন পরিষ্কার করার চাকরও নাই। যাঁরা অর্থ এবং নামের কাঙাল তাঁরা এগুলোকে ইহকাল পরকালের সুখ মনে করে। অর্থ লোভে জঘন্য কাজ করতে বিরত হয় না। তাঁরা যা পেয়েছে, সেই আদরের সঙ্গীতের পূজা অর্থলোভে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না। মানুষের জন্য সাধ্যমত চিরকাল কাজ করেছি। এর জন্য প্রশংসা আশা করি নি। প্রশংসা শুনলেই আমার ভয় লাগে। স্বার্থবাজ লোকেরাই অহেতুক প্রশংসা করে। এই প্রশংসা করেই লোককে বিপথে নিয়ে যায়। এদের থেকে সর্বদাই সাবধান থাকবে। একটি কথা মনে রেখো, প্রণয়, স্ত্রী, রাজ্য, ধন এই কয়েকটা বিষয়ের লোভ ভীষণ ক্ষতিকর। এই লোভে লোকের ধর্ম পুণ্য, সাধুতা, পবিত্রতা সব নষ্ট হয়ে যায়। মূর্খ এবং লোভীর ভালবাসায় বিশ্বাস নেই।'

বাবা এত কথা এক নাগাড়ে কখনও বলেন না। আসলে ভদ্রলোক যে আলিআকবর সম্বন্ধে দুটো মন্তব্য করেছেন, তার জন্যই বাবার উষ্মার শেষ হচ্ছিল না। এবারে তিনি বললেন, 'এই সব লোকদের আসায় তোমাদের শিক্ষা হোল না। খাবারের সময় হয়ে গিয়েছে সুতরাং খাবারের জন্য তোমার মাকে বলো।' একটা ছোট ঘটনা বলেই এ প্রসঙ্গের ইতি করছি। এ ধরনের বহু ঘটনা আছে।

ইতিহাসটা মাথার চুলের মত। সত্যের তৈল-সিক্ততা ভিন্ন আঁচড়ান যায় না। অর্থাৎ এর বিন্যাস সম্ভব নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সৎ পরিচর্যার অভাবে জট পাকিয়ে গেছে। সরোদের ইতিহাসের বেলাতেও এই উদাহরণটা খাটে। এমন জনা চারেক বিশিষ্ট লোকের সাথে এতাবৎ পরিচিত হয়েছি যাঁদের বক্তব্য সরোদের স্রষ্টা তাঁদেরই পূর্বপুরুষ। এর পেছনে যতটা ঐতিহাসিক তথ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা আছে তার থেকে অনেক বেশি

আত্মঘোষণা রয়েছে। এখন সরোদ প্রথম কে তৈরী করেছেন, কে প্রথম বাজিয়েছিলেন বা সরোদের নামের উৎস কি, এ নিয়ে বিভিন্ন ঘরাণার বিভিন্ন ধরনের দাবী রয়েছে।

সঙ্গীতের অধিবিদ্যাকে (মেটাফিজিক্স্) আধার করলে মানুষ স্রষ্টা হয় না। স্রষ্টা ঈশ্বর তথা দেবদেবী। আর ভৌতিক ইতিহাসকে (ফিজিকাল হিস্ট্রি) স্বীকার করলে ক্রমবিকাশের সিদ্ধান্তকেও স্বীকার করতে হবে। যার আধার হবে ডারউইনের বিকাশবাদ। ইংরেজ নন্দনতত্ত্ব বিশারদ ক্রিস্টোফর করডেওয়েল-এর ইলিউশন এণ্ড রিয়্যালিটি পুস্তকে সঙ্গীতের যে উল্লেখ আমরা পাই, সেই অনুসারে সুন্দর ধ্বনিকে পাওয়ার তাগিদে মানুষ ভৌতিক জগতে উপলব্ধ বস্তুর মৌলিক সংমিশ্রণ বা যৌগিক সংমিশ্রণ ক্রমাগত ঘটিয়েছিল। আর এই কম্বিনেশন পারমুটিশনের পরিণাম, এক একটি যন্ত্র। আগে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে তার পরে সংজ্ঞা। সুতরাং সরোদ বা সেই অর্থে কোন যন্ত্রই কোন ঘরাণার একক সৃষ্টি হতে পারে না। যেমন প্রাণী জগতে হয় নি। একই গুচ্ছের প্রাণী গিবন, গোরিলা, ওরাংওটাং, শিপাঞ্জি। কিন্তু এদের সকলেরই পূর্ণ বিকাশ মানুষে হয় নি। ঠিক তেমন প্রথমে হয়ত এক বা একাধিক ব্যক্তি সরোদের একটি আদিম রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন। যার পর একাধিক পরিবার এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং যথাসাধ্য সংযোজন করেছেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যেখানে সরোদের তার ছিল সর্বসাকুল্যে ষোলটি সেখানে বাবার নিজের সৃজন-ধর্মিতার সাহায্যে সংযোজনের ফলে হল ছাবিবশটা। বাবা তরফের তার বৃদ্ধি করলেন ছয়টা। খরজ পঞ্চমের একটি নূতন খুঁটি লাগালেন আলাপের অতিমন্দ্র বিস্তারের জন্য। এ ছাড়া জোয়ারির কাজের জন্য চারটে কান ভিন্ন ভাবে লাগালেন যা বাবার পূর্বে কেউ করেন নি। এবং সেটাই এনে দিল প্রচলিত গঠনতন্ত্রের থেকে ক্লারিটি এবং ডিস্‌টিংশাং। এছাড়া, সরোদ নিয়ে বাজাতে বসবার আসন সম্বন্ধেও বাবার মতামত ছিল সকলের থেকে আলাদা। সেই সময় সরোদ বাজাতে বসবার আসন অনেক রকমের ছিল। বিভিন্ন ঘরানার উস্তাদেরা বিভিন্নভাবে সরোদ নিয়ে বসতেন। যেগুলির মধ্যে গোমুখাষন বর্তমানে বেশী প্রচলিত, কিন্তু বাবা সর্বদা সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক দিক্‌টিকেই বেশী গুরুত্ব দিতেন। সেজন্য বাবা ধ্যানাসনকেই শ্রেষ্ঠ আসন মনে করতেন এবং ধ্যানাসনেই সর্বদা বাজাতে বসতেন। অবশ্য এই আসনের আর একটি সুবিধা হোলো, তার সপ্তকে যাওয়ার সময় কোনো অসুবিধা হয় না। অন্য আসনগুলিতে বসলে তার সপ্তকে যাওয়ার সময় সরোদটিকে সামান্য ওঠাতে হয়। সে দৃষ্টিতে বাবা নিজেই একটি ঘরাণা। যাক্ এ প্রসঙ্গে পরে আসব।

প্রথমে বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর বক্তব্য থেকেই শুরু করি। তাঁর কথায় সরোদ শব্দটি এসেছে পারসিয়ান শব্দ স্বরুদ থেকে, যার অর্থ 'মিউজ' অর্থাৎ সঙ্গীত। এতদভিন্ন চারটি ঘরাণার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁদের বক্তব্য তাঁরাই সরোদের স্রষ্টা। তা ছাড়াও কিছু লোক আছেন যাঁরা বলেন সরোদ অন্যতম পৌরাণিক যন্ত্র, কারণ বিভিন্ন প্রাচীন দেবালয়ের প্রস্তর মূর্তিতে এ জাতীয় যন্ত্রে শিল্পকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। যার যন্ত্রের আদল আর বসার ভঙ্গিমা আজকের পদ্ধতির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলে। যদিও উপরোক্ত এই মতটি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক, এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করাই ভাল।

প্রসংগত বলে নিতে চাই যে স্বরুদ শব্দ থেকে কোন ভাষাতত্বের জোরে সরোদ হয়েছে কিনা জানি না, যেমন এ কথা বোঝা ভার যে পুরাকালে সরোদ কোথায় ছিল।

যদিও চারটি ঘরাণার বক্তব্য তাঁদের পূর্বপুরুষ সরোদ সৃষ্টি করেছিলেন। একটি জিনিষ কেউ অস্বীকার করেন নি যে তাদের পূর্বপুরুষ শিক্ষা পেয়েছিলেন তানসেনের পুত্রবংশ রবাবীদের কাছে এবং কন্যাবংশের বীণকারদের কাছে।

সরোদের স্রষ্টা হিসাবে চারটি পরিবার যাঁরা বলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ সরোদ প্রচলন করেন, তাঁদের নাম ক্রমানুসারে গুলাম আলি, নিয়ামতুল্লা, এনায়েৎ আলি এবং আবেদ আলি। প্রথমে দেখা যাক গুলাম আলির বংশধরেরা কি বলেন। গুলাম হাসিমি খাঁ বঙ্গেশ আফগানিস্তান থেকে এসে রেওয়াতে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র গুলাম আলি রবাবী ঘরাণার জাফর খাঁ এবং পেয়ার খাঁর তালিম পেয়ে, প্রথমে ফরাক্কাবাদ দরবারে গিয়ে পরে স্থায়ীভাবে গোয়ালিয়রে বসবাস করেন। সেই কারণে এই ঘরাণাকে গোয়ালিয়র সরোদী ঘরাণা বলা হয়। গুলাম আলি খাঁর তিন পুত্র হুসেন খাঁ, মুরাদ আলি এবং নান্নে খাঁ তিনজনেই সঙ্গীত জগতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন। মুরাদ আলি নিঃসন্তান হওয়ায় পোষ্যপুত্র নেন আবদুল্লা খাঁকে। এই আবদুল্লা খাঁর পুত্র ছিলেন মহম্মদ আমীর খাঁ। আমীর খাঁ বাংলাদেশেই বেশী সময় কাটান এবং প্রথম ছাত্র তিমিরবরণ, রাধিকা মোহন মৈত্রকে তৈরী করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের রংপুর এবং অন্য প্রান্তেও অনেক শিষ্য তৈরী করেন। কোলকাতায়ও সরোদের প্রচার করেন। গুলাম আলির তৃতীয় পুত্র নান্নে খাঁর পুত্র হাফিজ আলি খাঁ নিজের পিতা এবং কয়েকজনের কাছে শিক্ষা করে সর্বশেষে সেনী ঘরাণার ওয়াজীর খাঁর কাছে শিক্ষা করে, বিংশ শতাব্দীর চার দশকে ভারতবর্ষের সেরা সরোদ বাদক হিসাবে স্বীকৃতি পান। হাফিজ আলি খাঁর পুত্র মুবারক আলি, রহমৎ আলি এবং আমজাদ আলি খাঁ বর্ত্তমানে গোয়ালিয়র ঘরাণার প্রতিনিধি। এ কথা অনস্বীকার্য যে আমজাদ আলি বর্ত্তমানে গোয়ালিয়র ঘরাণার যোগ্য অধিকারী। অত্যন্ত আনন্দের কথা আমজাদ আলি খাঁ তাঁর দুই পুত্র আয়ান আলি বঙ্গেশ এবং আমান আলি বঙ্গেশকে নিয়মিত কঠোর শিক্ষা দিয়ে এই ঘরের প্রতিনিধির ভিত তৈরী করে দিয়েছেন এবং তাঁদের নিয়মিত শিক্ষা চলছে। গোয়ালিয়র ঘরাণার এই দুই বালক পরবর্তীকালে যোগ্য অধিকারী হবে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় ঘরাণার যাঁরা সরোদের স্রষ্টা বলে দাবী করেন তাঁর নাম খুদাদাদ খান্। খুদাদাদ খাঁন-এর পুত্র আফদাদ খাঁন। এঁর দুই পুত্র নিয়ামতুল্লা এবং হুসেন আলি খাঁর নাম পাওয়া যায়। নিয়ামতুল্লা লক্ষ্ণৌ এর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ-এর দরবারেই বেশির ভাগ দিন কাটান সভাবাদক হিসেবে। হুসেন আলির পুত্র ফিদাহুসেন খাঁ সরোদে জম্‌জমা অঙ্গ বাজিয়ে খ্যাতি প্রাপ্ত হন। প্রথম জীবনে রামপুরে থাকলেও জীবনের শেষ ভাগে বেরিলিতে জমিদারের আশ্রয়ে দিন অতিবাহিত করেন। বেরিলিতে সকলের কাছে ফিদ্দা খাঁ বলে পরিচিত ছিলেন। নিয়ামতুল্লার দুই পুত্র এবং কন্যা সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে আছেন। দুই পুত্র করামতুল্লা এবং কুকুভ খাঁ সরোদের স্বমহিমায় বিরাজমান ছিলেন। ককুভ খাঁ কোলকাতায় বেশির ভাগ সময় কাটান। নিয়ামতুল্লার কন্যার বিবাহ হয় শাহাজানপুরের

সাফায়াৎ খাঁর সঙ্গে। করামতুল্লার পুত্র ইস্তিয়াক আহমদ খাঁ সরোদে নাম করেছিলেন কিন্তু অল্প বয়সেই ছেষট্টি সনে পরলোকে গমন করেন। ইস্তিয়াক অহমদ এর দুই পুত্র মুক্তার আহমদ খাঁ এবং গুলাম আহমদ খাঁ বর্ত্তমানে এই বংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এই ঘরাণার প্রথম প্রতিনিধি খুদাদাদ খাঁ আফগানিস্থান থেকে এসেই শাহজাহানপুরে বসবাস করেন। এই ঘরের বর্ত্তমান প্রতিনিধি মুক্তার আহমদের মতে, এঁদের পূর্বপুরুষ নিয়ামতুল্লা খাঁ প্রথমে সরোদে স্টীলের তার লাগান। আজকাল যেমন নারকেলের মালার জবায় সকলেই বাজান, এই ঘরের প্রতিনিধিরা নিয়ামতুল্লা আবিষ্কৃত মিসরাব দিয়েই বাজান, যদিও ধরবার জায়গাটা গালা দিয়ে ঢাকা থাকে। এই ধরনের জবা দিয়ে রবাব এবং সুর-শৃঙ্গারে বাজান হয়। এ ছাড়া এই বংশের প্রতিনিধিরা দাবী করেন যে এঁদের প্রথম প্রতিনিধি হাকিম সুকরাদ দার্শনিক ছিলেন। পারস্য দেশ থেকে ইউনান দেশে সরোদ তৈরী করে ভারতবর্ষের শাহাজানপুরে এসেই বসবাস করেন। মুক্তার আহমেদের কথায় জানা যায়, বর্তমানে শাহাজানপুরে গিয়ে রিক্সাওয়ালাকে যদি বলা হয় সারদেমহল্লাতে চল, রিক্সাওয়ালা তাঁদের আদি বাস্তু ভিটেয় নিয়ে যাবে।

সরোদের তৃতীয় ঘরাণার দাবীদার শাহাজানপুরের হুসেন আলির নাম পাওয়া যায়। হুসেন আলির পুত্র এনায়েৎ আলি। এনায়েৎ আলির পুত্র সুখাওয়াৎ খাঁ বিবাহ করেন নিয়ামৎ উল্লার কন্যা অর্থাৎ কুকুভ খাঁর ভগিনীকে। সখাওয়াৎ খাঁ দীর্ঘদিন মরিস কলেজে চাকরি করেন। তিনি সরোদ বাদক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র ওমর খাঁ এবং ইলিয়াস খাঁ যথাক্রমে সরোদ ও সেতার বাজালেও, উনপঞ্চাশের গোড়ার দিকে ওমর খাঁ সরোদ নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে বসবাস করেন। ইলিয়াস খাঁ মরিস কলেজে দীর্ঘদিন চাকরি করে ঊননব্বই সনের দোসরা মার্চ একমাত্র পুত্র ইদ্রিস খাঁকে রেখে প্রয়াত হয়েছেন। সরোদ বাদক ওমর খাঁর কোলকাতায় যাবার কারণ ছিল। ওমর খাঁর বাবার মামা কুকুভ খাঁ জলপাইগুড়ির এক নবাব পরিবারের সভাবাদক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর জলপাইগুড়ির পরবর্তীকালের বেগম সাহেবাকে, সকলে সঈদা জীজব্বর বলে সম্বোধন করতেন, যাঁর কোলকাতায় নিবাস ছিলো। তিনি সরোদ প্রেমিক ছিলেন সেইজন্য কোলকাতায় ওমর খাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি ওমর খাঁর কাছে শিক্ষা করতেন এবং শর্ত রেখেছিলেন, ওমর খাঁ অন্য কোথাও বাজাতে পারবেন না। নিজের অবসর সময়ে শিক্ষা করা ছাড়াও ওমর খাঁর বাজনা শুনতেন। সেইজন্য ওমর খাঁ বাজনা পরবর্তীকালে শোনা যেত না। ওমর খাঁর তিরাশি সনে এক পুত্র শহীদ খাঁকে রেখে পরলোকগমন করেন। এই ঘরের শহীদ খাঁ বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌতে বসবাস করেন এবং সরোদ বাজান।

চতুর্থ ঘরাণা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামপুরে আবিদ আলি খাঁ ছিলেন একজন অতি বিশিষ্ট সরোদ বাদক, যাঁর পুত্র সমকালীন ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সরোদ বাদক আহমেদ আলি খাঁ। এঁর সন্ততিরা সরোদ বাদক হিসাবে পরিচিত না হলেও, আহমেদ আলির শিষ্য আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর গুরুর গৌরব রক্ষা করেছেন আর বর্ত্তমানে তাঁর পুত্র, পৌত্র ও শিষ্যেরা। মজার কথা চারটি ঘরাণার মধ্যে একটি ঘরাণা, যাঁরা দাবী করেন যে তিনটি ঘরাণাই তাঁদের বংশের। ঠিক বিপরীত অন্য তিনটি ঘরাণার বক্তব্য। তাঁরা বলেন, আমাদের প্রথম ঘরাণার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। অবাক হই এই কথা ভেবে যে, পুরানো দিনের যত সরোদবাদক ছিলেন, তাঁরা কিন্তু কোনোদিনই কোনো জায়গায় দাবী করেন নি যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা বা তাঁরা সরোদের প্রথম স্রষ্টা। গত কয়েক বছর যাবৎ সরোদের কে স্রষ্টা ছিলেন সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হৈ চৈ শুনতে পাচ্ছি।

তবে প্রত্যেক ঘরাণার ইতিহাস পড়লেই দেখা যাচ্ছে যে, হয়ত যন্ত্রটা তাঁরা শুরু করেছিলেন বা আবিষ্কার (বিকাশ) করেছিলেন। কিন্তু সকলেরই শিক্ষা অর্থাৎ তালিম রবাবী, বীণকার, বা সুরশৃঙ্গার বাদকের কাছে। এবং যে পাঁচ বা ছয় পুরুষের নাম পাওয়া যায় তাঁদের আনুপাতিক বয়স যোগ করলে, কোন ঘরাণারই বয়স দুশ থেকে আড়াইশ বছরের বেশী হওয়া উচিত নয়। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠিত ঘরাণাদের বাইরে যে ঘরাণাটা সেটা সাত দশকে পরিণত। যদিও ঘরাণা বলতে বাবা গর্ব বোধ করতেন না। তাঁর আনন্দ ছিল সেনিয়া ঘরাণার প্রতিনিধি হিসাবে। সাংবাদিকতার শব্দকোষে অফ দ্য রেকর্ড বলে একটা কথা আছে। ঠিক সেই রকমই সরোদের ঘরাণা সম্পর্কে আমার কিছু অফ দ্য রেকর্ড মন্তব্য আছে। তা হোল ইতিহাস জানা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরম্পরাগত স্মৃতি অর্থাৎ চলে আসা পৌরাণিক গল্পকে তথ্য হিসাবে স্বীকার। যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ বা বিচার করা যায়, তাহলে বলতে হয় ক্রিয়া আগে ঘটে তবেই তার সংজ্ঞা আসে। অর্থাৎ আগে বাদ্য যন্ত্রটা বাজত পরে পারসি শব্দে নামকরণ হোল স্বরূদ। কিন্তু এই মতামত প্রণেতার সাথে বাংলার মহান সঙ্গীতমর্মজ্ঞ রাজা স্যার সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতামত একদম ভিন্ন। "সহস্র বৎসর পূর্বে আরব্য দেশের বসুর গ্রামবাসী, আবদুল্লা 'রুবেব' নামক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ইহাই পরবর্তীকালের 'রবাব'। এবং বোধ হয় রবাবেরই ক্রমবিকাশ সরোদ।" সুতরাং সরোদ একটি বয়স্ক বাদ্য যন্ত্র এবং আনুমানিক সহস্র বৎসর এর বয়স। অতএব আধুনিক সরোদ ঘরাণাদের এই দাবী যে সরোদের উৎপত্তিস্থলে তাদেরই বংশ এ কথা অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা নাস্যাৎ হয়ে যায়।

আমার মতে এর একটা মধ্য পন্থা আছে। তা হোল সরোদ প্রাচীন যন্ত্র হলেও প্রথম কিছু পরিবার একে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন আর সেই গ্রহণ করার বয়সটা হতে পারে দুই তিনশ বছর। এ ছাড়াও সরোদকে বহু জায়গায় শারদীয়া বীণা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু শিল্পীর মতে সরোদ আফগানিস্থানের কান্দাহার শহর থেকে এসেছে। আবার অনেকে বলে ইরান থেকে সরোদ এসেছে। আর এক মতে, গুজিস্তা লখনউ লিখেছেন যে, ফার্‌সি গায়ক আব্বাসীকালকে সরোদ আবিষ্কার করেছেন।

এসব তথ্যের কচ্‌কচিতে কোন লাভ নেই। যেটা দ্রষ্টব্য বিষয় তা হোল, যিনি বা যাঁরাই এ যন্ত্রে বিকাশ করেছেন, সংযোজন করেছেন, রূপায়ন করেছেন তাঁরা সকলেই প্রাতঃস্মরণীয়। মালাটা এই জন্যেই সুন্দর, যেহেতু বিভিন্ন বর্ণের ও গন্ধের ফুল এতে গাঁথা। আর এই মালা সদৃশই হোল সরোদ।

৭৮

ইতিহাস বরাবর সিধে চলে না। বাঁক ফেরে। বাবা ছিলেন তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজেই ছিলেন একটা ইতিহাস। একটা নূতন যুগের স্রষ্টা। তাঁর সাক্ষাৎকার অনেকে নিয়েছেন, অনেকে লিখেছেন। তাঁর সাক্ষাৎকার 'আমার কথা' বলে সাপ্তাহিক পত্রিকাতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বড় করে সাতান্ন সনে 'আমার জীবনী' বলে যা বাবা নিজে লিখেছিলেন তা পুরো হাতে না পেলেও, বাবার মুখে কথাচ্ছলে যা শুনেছি, তাও কম মূল্যবান নয়। যে কথা ইতিপূর্বে বাবা কোন সাক্ষাৎকারে কাউকে বলেন নি, সেই কথারই একটা জিস্ট করা যাক্। সেগুলো থেকেও পাঠকরা বাবার জীবনের একটা দিক বুঝতে পারবেন। অতীতকে খুঁজবার চেষ্টা করছি তাঁর শুরু থেকে। তার শুরু খুঁজে না পেলে শেষটা লেখা কঠিন। বাবার জীবনের আদি ইতিহাস, মানে জীবনের প্রলোগ, আসল উপাখ্যান আরম্ভ হওয়ার আগের ব্যাপারটা প্রথমে লিখছি।

বাবার জন্মস্থান শিবপুর গ্রাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত। বাবা ছিলেন ছোটবেলো থেকেই প্রকৃতি প্রেমিক। ছোট বয়সেই প্রকৃতির মাঝে খুঁজে বেড়াতেন সুখ। গানের সুর খুঁজতেন প্রকৃতির মধ্যে। ছোটবেলাকার কথা বাবার ভাষায় বললেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। বাবা বলতেন, 'একদিন বাবার সঙ্গে গোকর্ণ গিয়েছিলাম। গোকর্ণ আমাদের গ্রাম থেকে দু' তিন ক্রোশ দূরে। তিতাস নদীর পারে। নদীতে নৌকা বাইচ হয়। সেবার বাবার সঙ্গে নৌকা বাইচ দেখতে গিয়েছিলাম। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে সেদিন বাবা রিয়াজে বসলেন না। মা তাড়াতাড়ি পিঠা গরম করে খেতে দিলেন। মায়ের হাতের পিঠা যে কি সুস্বাদু ছিল তা বলে শেষ করতে পারব না। সারা জীবন আমার দুঃখ রয়ে গেল মায়ের হাতের পিঠা বেশী দিন খেতে পারি নি কারণ বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য সে তো পরের কথা। সে দিনের কথাই বলি। পূব আকাশে রোদ দেখা দিতেই আমরা রওনা হলাম। শিবপুর থেকে পায়ে হেঁটে গোকর্ণ পৌঁছলাম। তিতাস নদীতে তখন নৌকা বাইচের তোড়জোড় চলছে। বেলা দশটা নাগাদ নৌকা বাইচ শুরু হোল। প্রতিযোগিদের হাতের বৈঠা তালে তালে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সারিসারি নৌকা আমার চোখের সামনে দিয়ে তালে তালে ছুটে যাচ্ছিল। কি সুন্দর সে তাল। প্রতিবার বৈঠা পড়ছিল আর পানিতে তালের ছন্দ উঠছিল। আমার চোখের উপর বাবার সেতারটা ভেসে উঠল। বাবার সেতারেও সুরের ছন্দ ঠিক এমনি তাল তোলে। সেদিন ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে পরে বুঝেছিলাম ওটা ছিল সুরের প্রতি আমার মনের তাগিদ। আমি ছিলাম প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির সুর আর ছন্দ যাঁর ভাষা অন্যরা বুঝত না, আমি যেন ঠিক বুঝতে পারতাম। প্রকৃতিকে ভালবেসেই হয়ত অন্য ছেলেদের থেকে আমি পৃথক ছিলাম। আমার দেশ আমার প্রাণ। শৈশবের কথা মনে হলে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।'

সব ভাইদের মধ্যে বাবার গায়ের রং ছিল কাঁচা হলুদের মত। যাঁর জন্য বাবার সব ভাইপোরা লাল জেঠা বলত। বাবা নিজের জীবনীতে একথা উল্লেখ করেন নি। বাবা 'আমার জীবনী'তে পিতামহের কথা লিখেছেন। কিন্তু বংশের প্রথম পুরুষের নাম লেখেন নি। যে বিষয়গুলি বাবা লেখেন নি, কিন্তু মুখে বলেছেন, সেগুলিই কেবল জুড়বার চেষ্টা করব।

বাবার পূর্বপুরুষের ইতিহাস খুবই রোমাঞ্চকর। তাঁর বংশের প্রথম পুরুষ ছিলেন হিন্দু। তাঁর নাম ছিল দীননাথদেব শর্মন। তাঁর ছেলে যখন বড় হোল, তখন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময়। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের উপর ইংরেজরা ভয়ানক অত্যাচার শুরু করে। সে সময় মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, কৃপানাথ, নুরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, অনুপনারায়ণ, শ্রীবিলাস প্রমুখ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতারা ইংরেজদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। তাঁদের সঙ্গে দীননাথ দেব শর্মনের প্রথম ছেলে সামস ফকির ইংরেজ দমনে বিদ্রোহে যোগ দিল। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী ফকিরদের সঙ্গে দীননাথ দেব শর্মনের যুবক পুত্র বিদ্রোহী নেতা আসামের জঙ্গলে আশ্রয় নিল। একদিন শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে এই যুবক নেতা আহত হোল। বেহুঁশ সর্দারকে কাঁধে তুলে বিদ্রোহীরা পালিয়ে গেল। কিছুদূর যাবার পর সকলে মনে করল যুবক নেতার প্রাণ নেই। তাই তাঁরা অচৈতন্য দেহখানা মাটিতে রেখে বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক বৃদ্ধ ফকির এই সময়ে বনের মধ্যে বাড়ী ফিরছিলেন। যুবকের অচৈতন্য দেহখানা দেখে, নিজের বাড়ীতে এনে কিশোরী কন্যা নয়তনকে বললেন, ছেলেটির সেবা করতে। কিছুদিনের মধ্যেই যুবক সুস্থ হয়ে উঠল। ইংরেজের হাত থেকে রক্ষার জন্য বৃদ্ধ ফকির বিদ্রোহী যুবককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে নিজের কন্যা নয়তনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। বিদ্রোহী যুবকের নামকরণ হোল সিরাজুদ্দিন খাঁ। সিরাজের জীবনে এক নূতন মোড় নিল। গৃহত্যাগী যুবক সংসার ধর্মে বন্দী হোল। সিরাজের মধ্যে বিদ্রোহীর ভাব মাঝে মাঝে চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেখে নয়তন জোর করে আসামের বনভূমি ছেড়ে ত্রিপুরার শিবপুর গ্রামে এসে নূতন করে সংসার পত্তন করল। কিছুদিন পরে সিরাজের দুই পুত্র হোল। তাদের নাম রাখা হোল অজহর অহমদ এবং ছালি অহমদ।

শিবপুর গ্রামে সিরাজ নিজের সঞ্চয় দিয়ে কিছু জমি কিনলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সিরাজ গ্রামের লোকেদের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহী যুবক এখন কৃষিজীবি হয়ে বংশের পত্তন করলেন শিবপুর গ্রামে। শিবপুর গ্রামে খাঁ বংশের প্রতিষ্ঠা হোল।

সিরাজ খাঁর বড়ছেলের ডাক নাম ছিল মিরাজ এবং ছোটছেলের নাম ছিলো ছালি মোহম্মদ। মিরাজ যখন বড় হোল তখন সিরাজ তাঁর বিয়ে দিলেন নসিমন নামের একটি কিশোরী বধূর সঙ্গে। অজহর মোহম্মদের (মিরাজের ভাল নাম) পর পর তিনটি ছেলে হল। সিরাজ নাতিদের নামকরণ করলেন আলি মোহম্মদ, সালি মোহম্মদ এবং জাফর মোহম্মদ খাঁ। সিরাজ বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলেন। জীবন অবসানে রেখে গেলেন এক ঐতিহ্যবাহী পরিবার।

আলি মোহম্মদের যথাসময়ে এক পুত্র হোল। নামকরণ হল মাদার হুসেন খাঁ। এই মাদার হুসেনের ছেলে হলেন বাবার বাবা। যার নামকরণ করা হয়েছিল সবদর হুসেন খাঁ বলে। আলি মোহম্মদ আদর করে নাতি সবদর হুসেন খাঁকে সদু বলে সম্বোধন করতেন। গাঁয়ের লোকেরা তাকে ডাকত সাধু খাঁ বলে।

বাবা নিজে 'আমার জীবনী' বলে যা লিখেছেন তার মধ্যেই পূর্বপুরুষের কথা না লিখে একবারেই লিখেছেন আমার পিতা সাধু খাঁ ঠাকুরদাদার খুব প্রিয় ছিলেন। এতটা লিখবার পর

বাবা নিজের বাবার সম্বন্ধে ঠিক লিখে গেছেন। কিন্তু যেখানে লিখেছেন, 'বাবা যে গৎ বাজাতেন তখনই শুনে শুনে মুখে গেয়ে গেয়ে খেলা করতাম। শিশু কালের গৎ এখনও আমার স্মরণ আছে। আমার ছেলে আলিআকবর ও জামাই রবিশঙ্করকে ঐ গৎ শিক্ষা দিয়েছি। ঐ সব গৎ ভারতবর্ষে কোন বাদকের কাছে শোনা যায় না।' উপরোক্ত কথাটা সত্য হলেও এক জায়গায় বাবার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। বাবার বাবা সাধু খাঁ যে গৎটি বাজাতেন, সে রাগের নাম ছিল শুদ্ধ কল্যাণ। গৎটি অন্যরকম ভাবে বাজালে ইমন রাগও হতে পারে। গৎটির সম 'ঋষভ' এ পড়ে। ইমন কিংবা শুদ্ধ কল্যাণে 'ঋষভ' গৎ এর মুখরার সোম, এ যাবৎ সত্যই শোনা যায় না। আমি মৈহারে যাবার কিছুদিন পরেই বাবা আশিসকে এই গৎটি শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা হোল আমার বাবার গৎ, যে গৎ তিনি শিখেছিলেন কাশীম আলি খাঁর কাছে। এই গৎটি যে সময়ে আমি প্রথম আমার গুরু ওয়াজীর খাঁর নিকট বাজিয়েছিলাম, সেদিন আমার গুরু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই গৎ তুমি কোথায় শিখেছ? যখন এই গৎ-এর ইতিহাস বলি সেইসময় আমার গুরু বলেন, 'এ গৎ তো তোমার মামা কাশীম আলির কাছে তোমার বাবা শিখেছেন।' বাবা যে লিখেছেন 'এই গৎ ছেলে এবং জামাইকে শিখিয়েছি' তাও যেমন সত্য তেমনি এই গৎ পরে আমাকে ও আশিসকে শিখিয়েছিলেন তাও সত্য। সেই সময় অন্নপূর্ণাদেবী মাইহারে ছিলেন। তিনি বহুপূর্বে এই গৎ শিখেছিলেন। উপরোক্ত গৎটি ইমন বলে শিখিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'ইমন রাগে গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, নিষাদ এ গৎ এর সোম শোনা যায় কিন্তু ঋষভ এ সোম শোনা যায় না।' অবশ্য বহুপরে উপরোক্ত গৎটি কি ভাবে মীড় দিয়ে বাজালে ইমন রাগটি, শুদ্ধ কল্যাণ হয়ে যায় শিখিয়েছিলেন। যাক এ প্রসঙ্গ।

বাবা নিজে 'আমরা জীবনীতে' নিজের ঠাকুরদা সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমার ঠাকুরদাদা মাদরা হুসেন যখন স্বর্গবাসী হন তখন আমার পিতা সাধু খাঁ সংসারী হন।' এই কথা লেখার পর বাবা নিজের এক ভাই আফতাবুদ্দিন প্রসঙ্গে লিখেছেন এবং তার পরই 'এখন আমার জীবন আরম্ভ' করে লিখেছেন। কিন্তু তিনি নিজের বাবার সম্বন্ধে অন্যান্য ভাইদের শিক্ষা এবং ভাইপোদের কথা কিছুই লেখেন নি। এ ছাড়াও যা লেখেন নি, সেই কাহিনীগুলো কম রোমাঞ্চকর নয়। সুতরাং বাবার লেখা 'আমার জীবনী' এই সম্পর্কে যা বাদ পড়েছে, তা আমি সংযোজন করবার চেষ্টা করছি। আমার আহরিত তথ্যগুলি পড়লে পাঠকরা অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

বাবা শৈশব কাল থেকেই ছিলেন প্রকৃতির প্রেমিক। বাবার বাবা সাধু খাঁ কি প্রকৃতির ছিলেন তা বাবার মুখ থেকে শোনা ভাষায় লিখলে বুঝতে সুবিধা হবে। বাবা বলতেন, 'তিতাস নদী তো অনেক দিনের পুরনো নদী। আমার জীবনে যেমন একদিন দোলা জাগিয়েছিল তিতাস নদী তার আরো অনেক আগে আমার বাবার মনেও একদিন এমনি দোলা জাগিয়েছিল। আমার বাবার রক্তইতো আমার মধ্যে বয়ে চলেছে। রক্তের টান আর কি! আমার ঠাকুরদা মাদার হুসেনের সঙ্গে আমার বাবা রসুলপুরের হাটে একবার গিয়েছিলেন। সেই সময় আমার বাবার বয়স দশ বৎসর প্রায় ছিলো। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসত

রসুলপুরে। আমার ঠাকুরদা একাই যেতেন। এই প্রথম আমার বাবাকে নিয়ে গেলেন। হাট থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ আমার বাবা থমকে দাঁড়ালেন। একটা মিষ্ট সুর তাঁর মনে বার বার দোলা দিচ্ছিল। সেই সুরেলা কণ্ঠ বাবাকে আনমনা করে দিল। নদী থেকে গান ভেসে আসছে। বাবা তাকিয়ে দেখলেন একজন মাঝি বৈঠা টানছে আর গলা ছেড়ে গান গাইছে। ভাটিয়ালী গান (অবশ্য গানটা যে ভাটিয়ালী সেটা বাবা পরে জেনেছিলেন)। বাড়ী ফিরে আমার বাবা কিন্তু গানটা গুন গুন করে গাইতে লাগলেন। আমার বাবার গলা ছোটবেলা থেকেই খুব মিষ্টি ছিল এবং স্মরণশক্তিও খুব তীক্ষ্ণ ছিল। গান শুনতে পাবেন বলে পরের বার আমার ঠাকুরদার সঙ্গে বাবা আবার হাটে গেলেন। হাটের মধ্যে না গিয়ে বাবা তিতাস নদীর পারে বসে রইলেন। ঠাকুরদা হাটে গেলেন জিনিষ কিনতে। বাবার মনোস্কামনা পূর্ণ হোল। কিছুক্ষণ পরেই বাবা শুনতে পেলেন তিতাস নদীর বুকে একটা নৌকা থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। ভাটিয়ালী গানের সুর। বাবা গানটা কেবল শেখাই নয় একবারে যেন গিলতে লাগলেন। নিজের মনে কতক্ষণ যে গুন গুন করে গাইছেন খেয়াল নাই। আমার ঠাকুরদা হাট থেকে এসে ছেলের গুনগুন করে গান চুপ করে শুনলেন এবং বিস্মিত হলেন। ছেলের গুণ দেখে ঠাকুরদা খুশী হয়ে ছেলেকে ডাকলেন। ঠাকুরদার ডাকে আমার বাবা চমকে উঠে ভাবলেন, উনি না জানি কি ভাবছেন। ঠাকুরদা বাবার কুণ্ঠার কথা বুঝে কিছু বললেন না। আমাদের পরিবারে কিন্তু সেই দিনই গান প্রবেশ করল। ধীর ধীরে আমার বাবা বড় হলে ঠাকুরদা হরসুন্দরী বেগমকে পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন। কিন্তু সংসারের প্রতি আমার বাবার টান ছিল না। বাবা সংসার দেখতেন না বলে, আমার মা সংসারের হাল ধরলেন। আমার মায়ের নাম সংক্ষেপ করে সকলে 'সুন্দরী বেগম' বলে ডাকত।

আগরতলার রাজদরবারে সেই সময় গান বাজনার খুব চর্চা ছিল। রাজদরবারের সভাবাদক ছিলেন উস্তাদ কাশেম আলি খাঁ। তিনি ছিলেন আমার গুরু গুয়ারজীর খাঁর মাতুল। এ কথা অবশ্য আমি বহুপরে জেনেছিলাম রামপুরে গিয়ে। যাইহোক আমার বাবা কাশেম আলির কাছে নাড়া বেঁধে শিখতে লাগলেন। আমার বাবা ছিলেন নীরব সাধক। দিনের পর দিন বাবা অভ্যাস করতেন কিন্তু কোনদিন নিজেকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি। আমার বাবা সঙ্গীতকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। নীরব সাধনার ভিতর দিয়ে আল্লার করুণা লাভই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। আমার বাবা বলতেন, সঙ্গীত হোল সাধনার ধন। যত সাধনা করবে মনে হবে আরো অনেক সাধনার দরকার। ও যে অধরা। সাধনাই জীবন এবং জীবন হোল সাধনা।' ছোটবেলায় এই তত্ত্ব কথা না বুঝলেও বাবার কথাটা ছিল আমার কাছে মন্ত্রের মত। আজ এই বৃদ্ধ বয়সে বুঝতে পারি বাবার কথাটা। সারা জীবন তো সাধনার মধ্য দিয়েই কেটে গেল। মৃত্যুর ডাকও আসছে। এখন মনে হয় আল্লা যদি আমার জীবনটা ফিরিয়ে দেন তা হলে নূতন উদ্যমে এখন সাধনা করি। জীবনের শেষে এসে বুঝেছি সাধনা ছাড়া সিদ্ধি লাভ হয় না।'

বাবা নিজে 'আমার জীবনী'তে ভাইদের নাম কেবল লিখেছেন কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গীতের শিক্ষা যে নিজের বাবার কাছে তাঁরা পেয়েছিলেন সে কথার উল্লেখ করেন নি।

এমন কি বাবা নিজের দুই ভাইপো এবং ফকির সাহেবের কন্যার ছেলে ফুলঝুরিকে মৈহারে নিয়ে এসে শিক্ষা দিয়েছিলেন সে কথাও উল্লেখ করেন নি।

বাবা ছোটবেলায় বাড়ী থেকে পালালেও কিন্তু বাবার চার ভাইই সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বাবার বড়ভাই ছমিরুদ্দিন খাঁ, আফতাবুদ্দিন খাঁ, নায়েব আলি খাঁ এবং ছোট ভাই আয়েৎ আলি খাঁর সঙ্গীত প্রতিভার প্রকাশ দেখে সাধু খাঁ নিজের ছেলেদের সঙ্গীতের তালিম দেন।

এবারে বাবা নিজের ভাইদের সম্বন্ধে যে ভাবে বলতেন সেই ভাবেই বলি। বাবা বলতেন, 'আমার বড় দাদা ছমিরুদ্দিন খাঁ বাবার কাছে শিখেই তালযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তার পরের দাদা আফতাবুদ্দিন খাঁ বাবার কাছে সঙ্গীতে প্রথম পাঠ নেন আমি যখন খুব ছোট ছিলাম। পরে আফতাবুদ্দি খাঁ, যাঁকে সকলেই ফকির সাহেব বলে ডাকতেন তিনি একাধারে বাঁশী, তবলা, বেহালা, জলতরঙ্গ, ও হারমোনিয়াম যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুরসাধক। জীবনে দীর্ঘদিন অন্নগ্রহণ করেন নি। ফকির সাহেব সুরের ভেতর দিয়ে আল্লার উপাসনা করতেন ;তা ছাড়া পল্লীগীতি খুব ভাল গাইতেন। সাধারণ ভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। আমার পরের ভাই নায়েব আলি বাবার কাছে ক্ল্যারিওনেট শিখে খুব ভাল বাজাত। কিন্তু তাঁর শরীর খারাপ হওয়ার জন্য সঙ্গীত সাধনা থেকে বিরত হয়ে আমার ভাইপোদের গান শিখিয়েছে। এরপর আমার সবচেয়ে ছোটভাই আয়েৎ আলি আমার বাবার কাছে সুরবাহার শেখে। আয়েৎ আলির প্রতিভা ছিল। নানা রকম যন্ত্র তৈরী করেছে। ব্রাহ্মণ বাড়ীয়াতে আমার ডাক নাম নিয়ে 'আলম ব্রাদার্স' বলে একটা যন্ত্রের দোকান খোলে। আয়েৎ আলি নিজের ছেলে বাহাদুর এবং ভাইপো আলিআকবরের সরোদ নিজে হাতে তৈরী করেছে। আমারও কয়েকটা ছোট সরোদ যা দেখছ, সেগুলো আয়েৎ আলিই তৈরী করেছে আমার নির্দেশে।'

অন্নপূর্ণাদেবী বাবার সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। এ নাম ভারতের সকলেরই জানা। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবীর নামকরণ প্রথম বাবা করেছিলন রোশনআরা বেগম বলে। কিন্তু মৈহারের মহারাজের অনুরোধে, যে হেতু পূর্ণিমার দিন অন্নপূর্ণাদেবীর জন্ম হয়েছিল, নামকরণ হয়েছিল অন্নপূর্ণা। মহারাজ বলেছিলেন, 'দেবী অন্নপূর্ণা যেরকম অন্ন দান করেন, আমার এই বোনটি বড় হয়ে সেরকম সঙ্গীতের অন্নপূর্ণা হয়ে উঠুক।' জন্মের পর রোশন আরার নামকরণ হলেও পরবর্তীকালে ওই নামে কেউ ডাকেনি এবং সে নাম কেউ জানেও না। বাবা নিজে পরিবারের প্রতিটি সন্তানের নাম রেখেছিলেন। ছোটভাই নায়েব আলি এবং আয়েৎ আলিকে বাবা খুব ভালবাসতেন। ছোট ভাইদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরই চিঠি আসত বাবার কাছে নামকরণের জন্য। সন্তানের নামকরণ চাই। ফেরৎ পত্র যেতে বিলম্ব হ'তো না। বাবা ভাইপো ভাইঝিদের নাম সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠাতেন। এই নামেই চিহ্নিত হয়ে থাকত নবজাতক। পরিবারের প্রতিটি নামের ইতিহাস খুঁজলে এই সত্য উদঘাটিত হবে।

বাবা ভাইপো ভাইঝিদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। বাবার দুই ভাইপো এবং ফকির সাহেবের কন্যা এবং কামালউননিসারের পুত্র ফুলঝুরিকে বাবা মৈহারে এনে শিক্ষা

দিয়েছিলেন। নায়েব আলির ছেলে খাদেম হুসেন খাঁ এবং আয়েৎ আলিব ছেলে বাহাদুরকে যথাসময়ে মৈহারে নিয়ে এসে শিক্ষা দিয়েছিলেন পুত্রবৎ।

বাবা যে কথা কখনও কোন সাক্ষাৎকারে বলেন নি, সে কথাটা বলা প্রয়োজন। বাবা স্থায়ীভাবে মৈহারে বসবাস শুরু করবার পর, পূর্ব পাকিস্থান হবার আগে পর্যন্ত প্রতি বছরই একবার দেশের বাড়ী কুমিল্লার শিবপুর গ্রামে যেতেন, ভাইদের এবং পরিবারবর্গের সকলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। বাবা ফুলঝুরিখাঁকে সর্বপ্রথম মৈহারে নিয়ে আসেন। মৈহারে যে সময় তিমিরবরণ শিখতে গিয়েছিলেন। যদিও ফুলঝুরিখাঁ এসরাজ এবং অন্যান্য বাজনা বাজাত, বাবা তাঁকে তবলিয়া করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার সময় বাবার কাছে সকলেই সমান। ফুলঝুরিখাঁ তিমিরবরণের সঙ্গে সঙ্গত করত লুকিয়ে লুকিয়ে। বাবা একদিন দেখতে পেয়েই তিমিরবরণকে খুব বকলেন এবং ফুলঝুরি বাবার শিক্ষাকালীন অগ্নিমূর্তি দেখে কিছুদিন পরেই দেশে ফিরে যান। বাবার কাছে মৈহারে কত যে ছেলে এসেছে গুণে বলা সম্ভব নয়। বাবার বকুনি প্রায় সকলেই খেয়েছে। শুনেছি শিক্ষা দেবার সময় ভুল হোলে তাঁর যে রাগ হ'তো, তা কল্পনা করা যায় না। তবে এ কথাও ঠিক, যাঁরা সেই সময় মার খেয়ে কিছুটা শিক্ষা করেছে, তার মধ্যে সকলেই পরবর্তীকালে সঙ্গীত নিয়ে জীবন কাটিয়ে সুনাম অর্জন করেছে।

ফুলঝুরি চলে যাবার কয়েক বছর পরে বাবা নিজের ছোট ভাই নায়েব আলির ছেলে খাদেমহুসেনকে মৈহারে নিয়ে আসেন। খাদেমহুসেন খাঁ, আলি আকবরের চেয়ে দু মাসের বড় ছিল। শিশু কালেই খাদেমহুসেনের প্রতিভা দেখে বাবা নায়েব আলিকে প্রথমে গান শেখাতে বলেন। বাবা যখন দেখলেন খাদেমহুসেন গান শিখেছে, সেই সময় নায়েবআলিকে বললেন, দাদা ফকির সাহেবের কাছে তবলা শিখতে অর্থাৎ যাতে লয় ঠিক হয়। বাবার নির্দেশ কোন ভাইএর অগ্রাহ্য করবার সাহস ছিল না। পরের বারে বাবা যখন দেশে গেলেন, গ্রামের জমিদার বাবাকে একদিন বাজনা বাজাতে বললেন। বাবা রাজী হয়ে খাদেমহুসেনকে তবলা সঙ্গত করতে বললেন। কিশোর খাদেমের মাথায় বাজ পড়ল কারণ কয়েকদিন বিরামহীন রিয়াজের ফলে তাঁর আঙ্গুল ফুলে উঠেছিল। ফলে তবলায় হাত ছোঁয়াতে পারছিল না। বাবাকে সে কথা বলায় রেগে গেলেন। শেষ পর্যন্ত খাদেমকে তবলায় সঙ্গত করতে হোল। গৎ যখন দ্রুত লয়ে উঠল সেই সময় খাদেমের আঙ্গুল কেটে গেল এবং রক্তে তবলার ছাউনি ভিজে গেল। তবলা ভিজে সুর নেমে গেল। বেসুরো বাজতেই বাবার মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে উঠলো। খাদেমের মুখে অসহায়তা। বাবা ব্যাপারটা বুঝে বাজনা থামিয়ে খাদেমকে বুকে টেনে আদর করে বললেন, 'তোমার পরীক্ষা নিলাম বাবা। আঙ্গুল কেটে গেছে তাই না? ও থাকবে না? দু দিন পরেই ভাল হয়ে যাবে। যাক তুমি তাল মাত্রায় এখন ঠিক হয়েছ। তবলা সাধনা আর নয়। এবারে তুমি সেতার তুলে নাও। কিছুদিন আয়েৎ আলির কাছে সেতার শেখ তারপর তোমাকে মৈহারে নিয়ে যাব।' পরের বছর বাবা যখন দেশে গেলেন খাদেমের প্রতিভা দেখে মৈহার নিয়ে এসে সেতার আর সরোদের ঢং সংমিশ্রণ করে একটা নূতন ঢং উদ্ভাবন করে শেখাতে লাগলেন। যে ঢংটি পরবর্তীকালে বাবা রবিশঙ্করকে শিখিয়েছিলেন। বাবা খাদেম হুসেনকে সুরবাহার, সরোদ ঢং এবং সংমিশ্রণে

সেতার রিয়াজ করাতে লাগলেন। খাদেম হুসেন, আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণাদেবী সেই সময় বাবার কাছে নিয়মিত রিয়াজ করছেন। এর কিছুদিন পর অল্প বয়সেই আয়েৎআলির মেজ ছেলে বাহাদুরকে বাবা মৈহার নিয়ে এলেন।

অত্যন্ত এক কঠিন নিয়মের মধ্যে সকলের তালিম চলতে লাগল। বাহাদুরের বয়স তখন প্রায় সাত বছর। আলিআকবরের এবং খাদেম হুসেনের সেইসময় মাত্র পনেরো বছর বয়স। অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা প্রয়োজন। একজন আগ বাড়িয়ে লিখেছেন আমরা একসঙ্গে বাবার কাছে শিখতাম। কথাটা ভুল। ছোট বেলায় বাবা আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণাদেবীকে আলাদা একক ভাবে শেখাতেন। যাক সে কথা।

আসবার আগে খাদেম হুসেন স্বপ্নেও ভাবেননি যে মৈহারে গিয়ে তাঁকে আহার এবং নিদ্রার সময়টুকু ছাড়া কেবল রিয়াজ করতে হবে। একটু ভুল করলেই সঙ্গে সঙ্গে বকুনিই কেবল নয় লাঠি পেটা চলত। কয়েক বছর শিক্ষার কঠোর পরিশ্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ঠিক করল পালাবে। ঠিক করলেই তো পালান যায় না। পয়সার দরকার। শেষ পর্যন্ত ফিরে যাবার জন্য নিজের বাবা নায়েবআলিকে লিখলেন টাকা পাঠাবার জন্য। কিন্তু তাঁর কাছে চিঠি বা টাকা এল না। বাড়ীর বাইরে যাবার হুকুম নেই। তা হলে পালাবে কি করে? খাদেম হুসেন মারের চোটে পুতুল চৌধুরী এবং মিলন দে নামে দু'জন স্থানীয় লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা দু'জন মাঝে মাঝে বাবার কাছে শিখতে আসতো। পুতুলের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে সে পালাল। রেললাইনের দুদিকে তখন গভীর জঙ্গল। হাঁটতে হাঁটতে মৈহারের পরের স্টেশন উচেঁহারা পর্যন্ত গিয়ে রেলের এক লাইনম্যান-এর সঙ্গে দেখা হোল। লাইনম্যান কিশোর ছেলের সব কথা শুনে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেতার শুনল। খাদেম হুসেন নিজের পরিচয় দিল না, কারণ, বাবার নাম শুনলে যদি মৈহার পৌঁছে দেয়। পরের দিন ট্রেনে করে সোজা এলাহাবাদ এসে পৌঁছল। এলাহাবাদে ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ীতে উঠে আলিআকবরকে চিঠি লিখে সব জানাল। আলিআকবর বাড়ীর বাইরে বেরতে পারে না। চিঠিটা বাবার হাতে পড়ল। চিঠি পড়েই বাবা এলাহাবাদে গেলেন। ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জনের অনুরোধে খাদেমকে কিছু বললেন না। মৈহার ছেড়ে খাদেম চলে গেছে এ সংবাদ বাবার ভাই নায়েব আলি জেনে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। সেইজন্য বাবা মৈমনসিং এর একজন পরিচিত লোককে বললেন, খাদেমকে দেশে পৌঁছে দাও।' খাদেম হুসেন দেশে চলে গেলেন। দেশ থেকে মাঝে মাঝে কোলকাতায় এলে খাদেম কখনও কখনও দবীর খাঁ এবং বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কাছে শিখতেন। খাদেমের সঙ্গীতের ভিত তৈরী হয়ে গিয়েছিল। যদি কিছুদিন বাবার কাছে মার খেয়েও থাকতে পারত তাহলে সারা পৃথিবীতে, সেতারের জাদুকর হয়ে বিশ্ববন্দিত হ'তো। তবে যেটুকু শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন সেই বাজনা শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছিল।

দেশ বিভাগের পর বাহান্ন সনে নৃত্য শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে খাদেমের পরিচয় হোল। এই বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গেই এক সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে বিদেশ যাবার সুযোগ পেলেন। খাদেম হুসেন লণ্ডনে পৌঁছে বাবার আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি আমি দেখেছিলাম মৈহার থাকাকালীন।

বাবা চিঠি পেয়ে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন, 'সারা পৃথিবীতে সঙ্গীত প্রচার করো।' মৈহার থাকাকালীন বাবার কাছে খাদেম হুসেনের গল্প শুনেছিলাম। খাদেম হুসেন যে সময় মৈহার আসেন, বাবা মহারাজের একটি বাড়ী লালকুঠিতে থাকতেন। খাদেম হুসেন পূর্ব বাঙ্গলায় এক নামে পরিচিত। নানা কাজের মধ্যে তিনি 'আলাউদ্দিন লিট্‌ল অর্কেস্ট্রা' সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। এ ছাড়া বাঙ্গলা দেশ রেডিওর অন্যতম অর্কেষ্ট্রা পরিচালক হয়ে কাজ করেছেন। একটা কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। বাবার পরিবারের যে ক'জন প্রতিভাবান শিল্পী কয়েকযুগ ধরে সঙ্গীতকে জীবিত রেখেছেন তার মধ্যে খাদেম হুসেনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। নিজের বংশের প্রায় আট দশজনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে তাঁদের সঙ্গীতের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রত্যেকেই রেডিও বা টিভি-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছেন।

আজকাল ক' পুরুষ ধরে কে বাজাচ্ছেন তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের প্রচার হয়। বেশির ভাগ লোকই হামবাগের মত আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে বাজাচ্ছি আবার কেউ বা 'এটা হোল আমাদের ঘরাণার সপ্তম পুরুষ' ইত্যাদি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। এখানে বাবা ছিলেন বিপরীত। যদিও তাঁর পরিবারের পিতাই ছিলেন সঙ্গীত সেবক, তথাপি তাঁর বক্তব্য ছিল অন্যরকম। বাবা বলতেন, 'চৌদ্দপুরুষ ধরে ছাতার বাজনার থেকে এক পুরুষ ঠিক করে বাজানই যথেষ্ট।'

বাবার বাজনা শুনলে তাই মনে হয়, তিনি একাই বহু ঘরাণার চৌদ্দপুরুষের সমতুল্য। বহু ঘরাণার চৌদ্দপুরুষ নিজের ঘরাণার সঙ্গীতে যা সংযোজন করতে পেরেছে, বাবা নিজের জীবনে এক পুরুষে তার থেকে বেশি করেছেন। এই বেশী করতে পারার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হ'তো বলেই বাবার গুরু উস্তাদ উজির খাঁ মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন তোমার কীর্তি এবং তোমার সঙ্গীত সন্তান সন্ততির মাধ্যমে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে থাকবে।'

পাঠক যুক্তিযুক্ত ভাবে এ প্রশ্ন করতে পারেন যে বহু লোকেই কষ্ট করে সঙ্গীত শেখে। বাবাও শিখেছেন, তাতে এমন হাতি-ঘোড়ার কৃতিত্বটা কি? ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু লোকই কষ্ট করে বিদ্যা অভ্যাস করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর একজনই হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র থেকে বিদ্যাসাগর হবার ক্রমিক ইতিহাসটার সাথে আলম থেকে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ হওয়ার ইতিহাসটা অনেকটা মেলে। পড়াশোনা করলে অনেকেই বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু কজন স্রষ্টা হতে পারেন? বাবাও সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, কিন্তু তিনি বাদক হয়েই ক্ষান্ত হন নি। তিনি স্রষ্টার পর্যায়ে উঠেছিলেন। বাবার সময়ে সরোদ বাজত এবং তার আগেও বাজত, কিন্তু ক'জন সরোদ-বাদক সে যুগে ছিলেন যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপ ছিল? বাবা সরোদের মধ্যে একটা নূতন জিনিষ সংযোজন করলেন। কি ভাবে করলেন জানতে গেলে একটু পিছন দিক থেকে দেখতে হবে। ছোটবেলা থেকেই বাবা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। যা একবার শুনতেন তা কখনও ভুলতেন না। কিশোর অবস্থায়, নিজের বাবা যে গৎ বাজাতেন তা যেমন ভোলেন নি, ঠিক সেই রকম ছোটবেলায় যাঁরা প্রভাতকালীন গান গাইতে গাইতে ভিক্ষা করত, সে গানও ভোলেন নি। পল্লীগীতি, কীর্তন, নাট্যসংস্থার গান জীবনের শেষ দিনগুলোতেও সব

গেয়ে শোনাতেন। এরপর সে সময় উস্তাদের কাছে একের পর এক গান, বেহালা, সানাই, মৃদঙ্গ, তবলা, সরোদ, রবাব, সুরশৃঙ্গার, ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা, তরাণা, ঠুংরী, টপ্পা ইত্যাদি শিখেছেন, সেগুলি কম্পিউটারের মত নিজের মনের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। বাবা 'আমার জীবনী'তে যাঁর কাছে শিখেছেন প্রায় সকলেরই কথা লিখেছেন। কিন্তু যে কয়েকটা জিনিষ ভুলক্রমে বাদ পড়েছে সেটা বলা দরকার। বেহালাতে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যেমন লোবো সাহেব এবং হাবু দত্তর কাছে শিখেছিলেন, ঠিক সেইরূপ বেহালাতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন সেই সময়কার বিখ্যাত বেহালা বাদক অমর দাসের কাছে। যদিও হাবু দত্তর কাছেও সর্বপ্রথম বেহালাতে ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে প্রায় বারোজন গুণীর কাছে শিক্ষা করেছিলেন যা তিনি নিজেই লিখেছেন। যে কথা লেখেন নি তা হোল, বাবা উজির খাঁ-এর কাছে টপ্পা এবং ঠুংরীও শিখেছিলেন। শিক্ষা করলেও টপ্পা এবং ঠুংরী বাজাতেন না, কারণ এই দুই শ্রেণীর গান নিম্নস্তরের গায়িকারা বিশেষ করে গাইতেন।

তিনি শিক্ষাকালীন সঙ্গীতের দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তা সংগ্রহ করে প্রায় সব কিছুই সরোদের মধ্যে সংযোজন করেছিলেন। বীণ, সুরবহার এবং সেতার নিজে না বাজালেও, তিনটি বাজনার যে বৈশিষ্ট্য তাও সরোদের মধ্যে সংযোজন করে একটা নূতন স্টাইল আবিষ্কার করলেন, তা অকল্পনীয়। এর জন্যই নিঃসন্দেহে বাবাকে বলা যায় নূতন যুগের স্রষ্টা। কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলি। তাঁর জনসমক্ষে বাজাবার পূর্বে এবং পরে তাঁর সমকালীন যাঁরা সরোদ বা অন্য যে কোন যন্ত্র বাজাতেন, প্রত্যেকের বাজনার মধ্যেই একটা বিশেষত্ব থাকত। কেউ আলাপের জন্যই বিখ্যাত হতেন। কেউ বা সপাট তান, ঝালা ইত্যাদির জন্য প্রশংসা পেতেন। বাবার চিরকালই অজানাকে জানার সখ ছিল। তিনি ছিলেন এক্সপেরিমেন্টালিষ্ট। কিছু কিছু জিনিষ আছে যা একটি যন্ত্রে বাজান সহজ কিন্তু অন্য যন্ত্রে সেই জিনিষটি বাজান অত্যন্ত কঠিন। সেই কঠিন কাজগুলোই তিনি করেছিলেন। হাজারো দৃষ্টান্তের মধ্যে শুধু একটির কথা বললেই সেতার এবং সরোদ বাদকরা বুঝতে পারবেন। সেতারে সরগ, রগম, গমপ, মপধ, পধন, ধনস পালটাটি বোল দিয়ে ডারাডা রাডারা ডারাডা রাডারা ডারাডা রাডারা বাজান কঠিন নয় কিন্তু সরোদের জন্য কঠিন। সেই কঠিন কাজগুলোই বাবা করেছিলেন। সরোদ বাদকের উপরোক্ত পালটাটির বোল ডারাডা, ডারাডা ডারাডা ডারাডা ডারাডা ডারাডা ডারাডা বাজান সহজ। সেতার বাদকের পক্ষে উপরোক্ত বোলটি বাজান কঠিন। বাবা এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তিনি বলতেন, 'কঠিন অঙ্গ অত্যন্ত পরিশ্রম করে সাধনা করো। সকলে যেটা করতে পারে না, সেটা যদি তুমি করতে পারো তাহলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।' এ প্রসঙ্গে আমার, বাবার এক স্মৃতিচারণ মনে পড়ে। প্রথম প্রথম মৈহার গিয়ে ডান হাতের বোলের অঙ্গে শুধু ডা ডা, বা রা রা, বা ডিরি ডিরি ই বাজাতাম। কিন্তু দেখতাম, বাবা আর একটা কিছু বাজাচ্ছেন যা না বুঝতে পারতাম, না নকল করতে। একদিন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ডা রা বাজাও।' বলেই আদেশ করলেন, 'আজ থেকে মূর্চ্ছনা ডা রা দিয়ে বাজান অভ্যাস কর।'

আরোহীতে
স র গ ম প ধ নি স
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

তেমনি অবরোহীতেও হবে। তবেই পরে সপাটের তান বাজাতে পারবে। সাহস করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি আর আলিআকবর ছাড়া আর কারো সরোদে তো ডারা শুনিনি।' বহুদিন পর বাবাকে এত প্রাণখোলা হাসতে দেখলাম। একগাল হেসে বললেন, 'আমিও শুনিনি।' ঘাবড়ে গেলাম। ওঁর কথার মাথামুণ্ডু বুঝলাম না। আমার ভেবাচাকা মুখ দেখে বাবা অতীত অভিজ্ঞতার ঝুলির মুখ একটু আল্‌গা করে বললেন, "সেই তখন, আহ্‌মদ আলি খাঁ সাহেবের কাছে শিখছি। আমার উদগ্র জানার ইচ্ছার জ্বালায় উস্তাদ প্রায় বিরক্ত। যা শেখান, তাই তুলে ফেলি। উস্তাদ ভাবতেন আমাতে জিন্ ভর করেছে। তাই প্রাণ বাঁচাতে বা বোধহয় আমাকে বিদায় করতে, হঠাৎ একদিন বললেন, ডা রা দিয়ে সরগম বাজাও। তুলতে পারলে তবেই আবার আসবে। গুরু বাক্য বেদবাক্য মনে করে রিয়াজ করতে লাগলাম। একদিন দেখলাম এতাবৎ সরোদে যা হোতই না, বা লোকে অসম্ভব ভাবতো, তা আমি পারছি।"

পরবর্ত্তীকালে এই অপরূপ বোল সংযোজনকে অন্যান্যদের নকল করতে দেখেছি কিন্তু ব্যাপারটা যে নকল তা ধরা পড়তো কারণ তাঁরা আরোহীতে বাজাতেন

স র গ ম প ধ নি স
ডা রা ডা ডা ডা ডা ডা রা

এবং অবরোহীতে বাজাতেন—

স নি ধ প ম গ র স
ডা রা ডা ডা ডা ডা রা

"মা"তে তার বদলানোর সময় রা কে ডা করে নিতেন। কারণ 'মা' তে 'রা বাজান পরিশ্রম সাপেক্ষ্য। আমার বক্তব্য হোল, সরোদের কে জন্মদাতা বা ধাত্রীমাতা জানি না, শুধু এটুকুই বুঝি বাবা না জন্মালে সরোদের বর্তমান স্বরূপই হ'তো না।

পূর্বে সেতার এবং সরোদে একটাই ঝালা বাজত। বীণ অঙ্গে ঝালার বোলকে বলা হ'তো ঘেনে নানা, ঘেনে নানা, ঘেনে নানা, ঘেনে নানা। সরোদে ঘেনে একটা স্বরে ডারা বাজান হ'তো এবং না না চিকারিতে বাজান হ'তো। সেতারে ঘে শব্দটি একটি স্বরে এবং না না না চিকারিতে বাজান হ'তো। বীণ যন্ত্রে ঝালার নানা প্রকার বাজত। বাবা সেই কঠিন অঙ্গগুলি সরোদে ঝালার মধ্যে সংযোজন করলেন। এ ছাড়া আলাপ, অতি বিলম্বিত মসীদ খানি গৎ, বিলম্বিত উজির খানি গৎ, মধ্য এবং অতিদ্রুত গৎ তিনি যা বাজাতেন আগে কখনও শোনা যায় নি। তাঁর বাজনার সঙ্গে পূর্বের সরোদ বাজনার যে কত পার্থক্য তা রেকর্ড শুনলেই বোঝা যায়।

বাবার বাজান আলাপের মধ্যে যে বিশেষত্ব ছিল প্রথমে সেটা বিশ্লেষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে বাবার পূর্বে কিংবা সমকালীন কোন সঙ্গীতজ্ঞই এ ধরনের আলাপ করেন নি। তিনি আলাপ বাজাতেন ধ্রুপদ এবং খেয়াল মিশিয়ে। ধ্রুপদ অঙ্গে আলাপ ক্রমান্বয়ে

স্থায়ী, অন্তরা, আভোগ এবং সঞ্চারী বাজিয়ে আলাপের লয়টা বাড়াতেন মধ্যলয়ে। এই মধ্য লয়ে সুত (সেতারে যাকে মীড় বলে) স্পর্শ, কৃন্তন্, ছুট্‌তান এবং গমক প্রয়োগ করতেন। এর পর বোল দিয়ে বিস্তার করা হ'তো। এই বোল বিস্তারের মধ্যে লড়ী, লড়গুথাও, লড়লপেট বাজান হ'তো। এর পর ঝালার মধ্যে ঠোক ঝালা, উল্টো নানা প্রকারের ঝালা, তারপর ধুয়া, মাঠা এবং পরমাঠা দিয়ে আলাপ শেষ হ'তো। সংক্ষেপে আলাপের ক্রমবিকাশ লিখলেও আলাপের শুরু কয়েকভাবে বাবা করতেন। যেমন প্রথমে ছেড় বাজিয়েই, কি রাগ বাজান হচ্ছে বুঝিয়ে দিয়ে তারপর ওঁম শব্দের ম কে দেখালেন। আবার কখনও কৈদ আলাপ দিয়ে শুরু করতেন। প্রচলিত রাগ-বোঝা যেত না কি রাগ বাজাচ্ছেন। অনেক পরে একটি বিশেষ স্বর লাগানতে রাগটা বোঝা যেত।

আলাপ বাজাবার সময় বাবাকে দেখেছি সর্বদা চোখ বন্ধ করে, সুরে মগ্ন হয়ে বাজাতে। বাবা বলতেন, 'আলাপ হচ্ছে মা সরস্বতীর ধ্যান।' তাই বাবা চোখ বন্ধ করে আরাধনায় ডুবে যেতেন। কিন্তু মৈহারে যাওয়ার আগে যত বড় বড় গুণী গায়ক কিংবা বাদকদের দেখেছি, তাঁরা কিন্তু সর্বদা চোখ খুলেই গাইতেন বা বাজাতেন। বর্তমানে অবশ্য সব ঘরাণার শিল্পীরাই চোখ বন্ধ করে সুরে মগ্ন হবার চেষ্টা করলেও ভুলক্রমে অভ্যাসবশতঃ মাঝে মাঝে চোখ খুলে পেলেন। অনুকরণ করলেও কি সব অনুকরণ করা যায়?

আলাপ শেষ হবার পর মসীদখানি গৎ সকলেই বাজান। মসীদখানি গৎ শুরু হয় বার মাত্রা থেকে। ত্রিতালে নির্দ্ধারিত বোল সকলেরই জানা যেমন, ডিরি ডা রি ডা রা ডা ডা রা ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডা রা। ডা, রা, বা ডিরির মধ্যে কৃন্তন, সুত জম্‌জমা দিয়ে ভরাট করে বাজাবার সময় বোলটির শুদ্ধতা বাবা বজায় রাখতেন। ভুল হলেই বাবা বলতেন, 'আতাই এর মত বাজিও না। ডা এর জায়গায় রা লাগাবে না। এ রকম আবোল তাবোল বাজালে যদিও মাত্রায় ঠিক হবে, যাঁরা সমঝদার গুণী তাঁরা বুঝবেন যে শিক্ষা না করে, শুনে শুনে ভুল বাজাচ্ছে। সঙ্গীতের মধ্যে সভ্যতা অসভ্যতা অর্থাৎ কিনা তমিজ আর বদ্‌তমিজি আছে। ডিরির জায়গায় অনেকে ডাডাডা করেন। ডা এর জায়গা 'রা' করেন। এই রকম করাকে সঙ্গীতের অসভ্যতা বলে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজকাল কাউকে এই নিয়ম পালন করতে দেখি না, যা বাবা করতেন। এই মতামত প্রকাশ করার সময় সংখ্যায় উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু তাতে কি আর চোর ধর্মের কথা শুনবে? তবুও একটা মঙ্গল যে আজকাল মসীদখানি গৎ উল্লেখ করে কেউ বাজায় না। বাজাবার আগে বলেন, বিলম্বিত গৎ বাজাচ্ছেন কারণ গোঁজামিলটা জাস্টিফায়েড হয়ে যায়। কিন্তু বুঝি না, কেন বাজায় না।

বাবা মসীদখানি গৎ, এই জন্য বজায় রাখতেন যে এই রকম অন্যান্য আরো গৎ এর বোল সমষ্টি, নির্দিষ্ট রয়েছে নিজের গুরুর নামে বিলম্বিত উজিরখানি গৎ এ। এই বিলম্বিত গৎ এর স্রষ্টা ছিলেন উজির খাঁ। তিনি ধ্রুপদকেই ত্রিতালে পরিবর্তিত করেছিলেন। বিলম্বিত উজির খানি গৎ এর বোলও বাঁধা থাকত। মসীদখানি গৎ এর যেমন বারো মাত্রা থেকে গৎ এর মুখরা ওঠে, উজিরখানি গৎ কখনও সোম থেকে আবার কখনও বিভিন্ন জায়গা থেকে হ'তো। বাবা মসীদখানি গৎ বাজাতেন, আবার উজির খানি গৎও বাজাতেন। খেয়াল অঙ্গে

ও বাবা অতি বিলম্বিত গৎ বাজাতেন। আর বোল ছিল নির্দিষ্ট। কিন্তু খেয়াল অঙ্গের গৎ বাবা শেখালেও বাইরে কখনও বাজাতেন না। আমাদের ঘরেও কেউ কখনও বাজান না। খেয়াল অঙ্গের গৎ না শিখলে ভিৎ কখনও মজবুত হয় না। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে এই অঙ্গ গুণীরাই কদর করবে। সাধারণ শ্রোতার জন্য নয়। সাধারণতঃ সকলেই মসীদখানি গৎই বাজান। বাবা কিন্তু প্রথমে অতি বিলম্বিত, তারপর বিলম্বিত এবং পরে মধ্য বিলম্বিতের শিক্ষা দিতেন। এই মধ্য বিলম্বিতই বর্তমানে সকলে বাজান। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, বাবার সমকালীন অনেক সেতার এবং সরোদবাদক আলাপ, জোড়ের পরেই মধ্যলয়ে গৎ শুরু করতেন। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরীরা বর্তমানে মসদিখানি গৎ কি করে বাজাচ্ছেন তা আমার বোধগম্যের বাইরে।

এ তো গেল বিলম্বিত গৎ এর কথা। এবারে রজাখানি গৎ অর্থাৎ দ্রুত গৎ। পূর্বে নির্দিষ্ট বোলদিয়ে দ্রুত গৎ বাজাত, যার নাম ছিল রজাখানি। কিন্তু বাবা মধ্য বিলম্বিত গৎ-এর পর, মধ্য লয়ের গৎ বাজাতেন। তারপর লয়ের গতি বাড়িয়ে মধ্যদ্রুত, দ্রুত, অতিদ্রুত একহারা গৎ বাজিয়ে শেষ করতেন। অবশ্য যে সব ক্রমবিকাশ অতিবিলম্বিত থেকে দ্রুত একহারা গৎ-এর বিষয়ে লিখলাম, সেই শিক্ষা সকলে পেত না। যাঁর যতটা শিক্ষা করার ক্ষমতা সেই বুঝেই বাবা শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে ধৈর্য্যের পরীক্ষায় পাশ করলে তবে এই সব শিক্ষা দিতেন।

তিনি যেমন প্রচুর পরিমাণে পুরনো বন্দিশ এর সরগম এবং গৎ শিখেছিলেন, সেই রকম নিজেও অজস্র তৈরী করেছেন যার তুলনা নাই। পায়ে তাল দিয়ে এত কঠিন বন্দিস-এর গৎ তৈরী করতে দেখেছি যার ঠেকা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

বাবা স্বরাধ্যায়ের সঙ্গে তালাধ্যায়ের প্রতি জোর দিতেন। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রথমে সুর এবং লয়ের প্রতি জোর দিতেন। অপ্রচলিত তালের যে নাম এবং ঠেকা বাবার কাছে পেয়েছি, এ যাবৎ কোন সঙ্গীতের পুস্তকে বা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শুনি নি। বহু অপ্রচলিত তাল আছে, সব লেখা সম্ভব নয়। সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের জন্য কয়েকটি অপ্রচলিত তালের নাম এবং মাত্রা যথাযথভাবে সাজিয়ে দিলাম—

	অপ্রচলিত তাল	মাত্রা
১।	চপকতাল	৩
২।	সারংতাল, ভরতাঙ্গতাল, দুবিতাল	৪
৩।	নন্দনতাল, সৃষ্টিতাল, রাজবিজয়তাল	৫
৪।	লঘুকিরতাল	৬
৫।	গার্ন্ধব্য তাল	৭
৬।	কন্দর্প তাল, খামস তাল	৮
৭।	লীলাবিলাস তাল, উপরান তাল, রাম তাল, মত্ততাল	৯
৮।	কুন্তল তাল, আশুতাল	১০
৯।	শ্রীশেখর তাল	১১
১০।	গণেশতাল, হেমানিতাল	১২

১১।	জয়মঙ্গল তাল	১৩
১২।	কাক তাল, ফিরদোস্ত তাল	১৪
১৩।	চন্দ্রতাল, জগমিল তাল, পঞ্চম সওয়ারী তাল	১৫
১৪।	শ্রীঅঙ্গ তাল	১৬
১৫।	উদয়সিন তাল, কোকিলা তাল, শিখর তাল	১৭
১৬।	ব্রহ্মযোগ তাল	১৮
১৭।	দীপকতাল, পরাদ তাল	১৯
১৮।	রাজবেদ তাল	২০
১৯।	বেকয়ামৎ তাল	২১
২০।	শ্রী কৃৎ তাল	২২
২১।	সুলফ তাল	২৪
২২।	বেরাম তাল	২৯

উপরোক্ত অপ্রচলিত তাল ছাড়া অর্দ্ধমাত্রার কয়েকটা তালের কথা লেখা প্রয়োজন। বাবা অর্দ্ধমাত্রার তালও বাজাতেন। অর্দ্ধ মাত্রার তালের নাম এবং মাত্রা যথাযথভাবে, অথচ সংক্ষেপে কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার্থীর জন্য লেখা প্রয়োজন বোধে লিখছি।

	তালের নাম	মাত্রা
১।	মোহন তাল	৩ ১/২
২।	রাজবেশ তাল	৪ ১/২
৩।	উদয়সিন তাল	৫ ১/২
৪।	বিজয় তাল	৬ ১/২
৫।	বিজয়ানন্দ তাল	৭ ১/২
৬।	উপরাল তাল	৮ ১/২
৭।	বিক্রম তাল	৯ ১/২
৮।	লঘুকির তাল	১০ ১/২
৯।	রঙ্গ তাল	১১ ১/২
১০।	রঙ্গ বরণ তাল	১২ ১/২
১১।	রঙ্গরয়াত তাল	১৩ ১/২
১২।	অভিনন্দ তাল	১৪ ১/২

এই তালের বিবরণ উল্লেখ করার পিছনে আমার তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ বাবা কত তাল জানতেন। দ্বিতীয়তঃ এই তালের জন্য কত তবলাবাদকের সঙ্গে বাবার মনোমালিন্য হয়েছে। আর তৃতীয়তঃ তালের প্রতি আমার ঝোঁক আমাকে কতটা ভুগিয়েছে।

অর্থাৎ আমি কি পরিমাণ ভুক্তভোগী। অর্দ্ধ মাত্রা শেখানর পর বাবা বলেছিলেন, 'তুমি তো লেখাপড়া করেছ, সুতরাং পৌনে এবং সওয়া মাত্রা কি করে করতে হয় করো। মৈহার ছাড়ার পর, সেই পৌনে এবং সওয়া মাত্রা করেছিলাম। কোন পিতার দ্বিতীয় পুত্র যদি এই

তর্ক করেন যে আমাকে বড় ছেলে বলা হবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কোন সুস্থ মানুষ দিতে পারে না। তেমনি কোন তবলা বাদক সঙ্গতকার না হয়ে, মূলবাদকের সমতুল্য বা অগ্রজতুল্য ভাবে কেন বাজাবেন না এরও কোনও উত্তর নেই। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে বলা যেতে পারে এটাই বিধির বিধান যে এঁদের অনুগমনই করতে হবে। এবং সেখানেই সৌন্দর্য। কিন্তু যাঁরা এই এথিক্স্‌টা ভাঙ্গতে চান বা ভাঙ্গেন তাঁদের হয় হাঁড়ির হাল।

এই হাঁড়ির হাল হ'তো যখন বাবার সঙ্গে কোন সঙ্গতকার বদ্ধকক্ষে পক্ষ লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা করতেন। বাবা তৎক্ষণাৎ পক্ষপাতন করতেন। প্রথম যুগে আমর মনে হ'তো, বাবা বোধ হয় এটা খামোকা করেন। কিন্তু যখন নিজের জীবনে পক্ষধর পেতে লাগলাম, তখন বুঝলাম বাবাই যথার্থ ছিলেন। আমার ব্যথা পরে লিখব। তার আগে ভাববাচ্যে কয়েকজন তবলাবাদকের কথা উল্লেখ করি, যাঁরা ভাড়া করে জটের সাহায্যে নিজেদের বৃদ্ধ বট বলে ভাবেন।

এরকমই এক বৃদ্ধ বট নিজের অজ্ঞতাকে চাপতে গিয়ে আত্মভোলা স্টাইলে বলেই বসলেন, 'এ অর্দ্ধমাত্রা তালের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। যদিও আমার ছাত্ররা বাজায়।' ভাবখানা এরকম, যে তালের আঙিনায় অর্দ্ধমাত্রা আদৌ পাদপ নয়, পরগাছা বা গুল্ম। এখন প্রশ্ন উঠবে গুরুই যখন অর্দ্ধমাত্রা বোঝেন না, তাহলে শিষ্যরা শিখলই বা কোথা থেকে আর বাজায় বা কেমন করে? তবলা শাস্ত্রে এরকম ঘটনার উল্লেখ অন্ততঃ এ শতাব্দীতে নেই। আসল কথাটা হোল, বটমশায় সৎ ভাবে অসৎ হলেন এই কথাটা লুকিয়ে যেতে যে, 'আমার ছাত্ররা বাবার মন্ত্রী-পুত্রদের কাছে দিনের পর দিন এই চক্র ব্যূহে প্রবেশ ও নির্গমনের মন্ত্র রিয়াজ করেছে।' যাক পেঁচা দিনের বেলায় চোখ বন্ধ করে সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে, সূর্যের বয়েই গেল।

এতো গেল অর্দ্ধমাত্রা আর ব্যক্তি বিশেষের মতামত। কিন্তু এর থেকেও বেশী বেদনার কথা হোল যে অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন তবলাবাদক ভিন্ন, কেউ স্বীকার করেন না যে তাঁদের তবলা শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গত করার কৌশল কারা শিখিয়েছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য এই যে তবলার গুরু হাত সেট করাতে পারেন। বোল আর কায়দা শিখিয়ে সুপক্ক স্বতন্ত্র তবলা বাদক গড়ে তুলতে পারেন অথচ চতুরঙ্গ তবলাবাদক হতে গেলে গান, বাজনা এবং নাচের সঙ্গে, সুদীর্ঘ দিন অভ্যাস প্রয়োজন বা কেউই অভ্যাস ভিন্ন সফল হতে পারেন না, এ কথাটাকে চেপে যাওয়া যায়। ভাবটা এরকম, বাসনও আমার হাতও আমার, তোমার ছোবড়া ও ছাই দিয়ে মাজলাম, বাসনও ঝক্‌ঝকে হোল কিন্তু তাতে তোমার কৃতিত্ব কোথায়? এটাকে লোকে বলে অকৃতজ্ঞতা দোষ, যা বর্ত্তমানে মহামারী পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

বাবা বলতেন, 'একজন নিজস্ব তবলা বাদক তৈরী করে নাও। বাজিয়ে সুখ পাবে। কারণ তৈরী করার ফাঁকে তাকে বিভিন্ন তাল এবং ছন্দ শিখিয়ে নিতে পারবে।' কিন্তু আমার কয়েকজন সমকালীন শিল্পীকে এই মানুষ গড়ার কারিগর হতেও দেখেছি এবং ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের হাতে অপমানিত হতেও দেখেছি। আমার মনে হয় তাঁতির তাঁতই ভালো, এঁড়ে বাছুরে দরকার নেই। কেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম? সেটাও লিখেই ফেলি, না হলে পাঠকের বুঝতে ঠিক সুবিধা হবে না। কি বেদনার কথা, জনা তিনেক যুবককে বাড়ীতে ডেকে শেখাতে

শুরু করলাম। দেখা গেল দু তিন বছর পরেই তাঁরা নিজেদেরকে বিদগ্ধ বাজিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। পায়ে হাঁটা আরম্ভই করল না, অর্থাৎ স্থলচর হবার আগেই নভোচর হয়ে গেল। সুতরাং তাঁদের পত্রপাঠ ইতি করলাম। আর বেশ কয়েকটি জুটেছিল গ্রীণরুমে যাঁদের লয়ের গতিপথ বুঝিয়ে দিলাম, কিন্তু স্টেজে যখন বাজাবার সুযোগ এলো, তখন উল্টোই করে বসল তারা। যা করার নয় সেটাই করল। আর পরে যখন লোকনিন্দার সম্মুখীন হোল তখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে নির্লজ্জের মত বলে বেড়াল, 'আমি তো ঠিকই বাজাচ্ছিলাম, উনি যদি ঠিক মত বাজতে না পারেন তাহলে আমি কি করব?' এটা হোল বক্সিং-এর সেই থিওরী, যে মার খেলেই, সেটা হয় আনডার দি বেল্ট। কি করি, আমি তো বাঁচাতে চাই কিন্তু লয়ের মার যে অমোঘ। তাই এখন ঠিক করেছি, যখন যোদ্ধাই নাই তো ব্রহ্মাস্ত্র চালাব কার উপরে? আগে ঠেকা কায়েম করুক পরে তো চক্রদার হবে।

৭৯

সঙ্গীতের সৃষ্টিধর্মিতা দুই রকমের। একটা গুরুর কাছে শেখা, রাগের বিন্যাসের সময় নূতনত্ব যোগ করা। যাঁকে সঙ্গীতের ভাষায় উপজ অঙ্গ বলা হয়। এতে শিল্পী ইম্প্রোভাইস্ করেন। আর দ্বিতীয় সৃষ্টিধর্মিতা হোল রাগ সৃষ্টি করা। প্রথমটির জন্য দৃষ্টি থাকাই যথেষ্ট অর্থাৎ রাগটা চিনতে পারাই যথেষ্ট আর দ্বিতীয়টির জন্য হওয়া দরকার দ্রষ্টা, যিনি নিজের সৃষ্ট রাগের অবয়বকে দেখতে পান। যাঁরা মাত্র দৃষ্টি নিয়ে রাগ তৈরী করেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠ রাগ অচিরাৎ ধুলোতে পর্যবসিত হয় আর অবয়াবিক দৃষ্টি সম্পন্ন শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন, তা দেশ কাল পরিধির বাধা ভেঙ্গে রাগ হিসাবে অমর হয়। যেমন মিঁয়া তানসেনের কথাই ধরা যাক। সে সময়কার একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে তানসেনের যশোভাগ্য সহ্য করতে না পেরে, পাঞ্জাবের তিলমণ্ডির বাসিন্দা দুই গায়ক চাঁদ খাঁ আর সুরজ খাঁ বাদশাহ আকবরের দরবারে উপস্থিত। তাঁদের বক্তব্য তাঁরা যে রাগগুলো গেয়ে শোনাবেন, তদ্‌ভিন্ন যদি মিঁয়া তানসেন কোন রাগ রাগিনী শোনাতে পারেন তা হলেই তানসেন শ্রেষ্ঠ। এই দুইটি ভাই-এর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, চাঁদ খাঁ রাতের চার প্রহরের আর সুরজ খাঁ দিনের চার প্রহরের সব রাগের জ্ঞাতা ছিলেন। আকবর বাদশাহ দুরু দুরু বক্ষে অনুমতি দিলেন। কি জানি তানসেন পারবেন তো? শুরু হোল, চাঁদ এবং সুরজ ভাইদের গান। সুদীর্ঘ দিন সময় নিয়ে তাঁরা সব রাগ রাগিনী গেয়ে শোনালেন। যেমন সুললিত কণ্ঠের স্বর তেমনি তাঁদের গানে রূপ। তানসেন বিরোধী শিল্পীকুল মহা খুশী। এবারে তানসেন জব্দ। যে দিন গান শেষ হোল সে দিন সকলে তানসেনের দিকে চেয়ে দেখলেন, তানসেনের চেহারায় চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠেছে। সকলেই ভাবলেন, এবারে তানসেন হার মানবেন।

কই হার মানলেন না তো? চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলেন, তানসেন একপক্ষ কাল সময় চাইছেন। তাঁরা মুখ টিপে হাসলেন, বোধ হয় পালিয়ে যাবার ফিকির খুঁজছেন। কিন্তু একপক্ষকাল পরে সারা শরীরে ক্লান্তির অবসাদ অথচ মুখে এক উদ্ভাসিত ভাব নিয়ে তানসেন সভায় প্রবেশ করলেন। দিনটা সঙ্গীতের ইতিহাসে এক যুগ সন্ধিক্ষণ। কারণ সে দিন তানসেন অষ্টপ্রহরেরই এক রাগ তৈরী করে, খাঁ ভাইদের মুখই শুধু বন্ধ

করলেন না, সৃষ্টির আনন্দে আরো যে কটা রাগ তৈরী করেছিলেন, তাও গাইতে বসলেন। অরাজনৈতিক কারণে সেই বোধ হয় প্রথমবার বাদশাহের দরবার যথাসময়ে ভাঙ্গল না। চলল ততক্ষণ যতক্ষণ তানসেন গাইতে লাগলেন। শ্রোতারা একে একে শুনল কৌশি ভৈঁরো, কৌশি ভৈরবী, মিয়াঁকি তোড়ি, পুরিয়া ধ্যানেশ্রী, বরারী, সুহা সুঘরাই কানাড়া, দরবারী তোড়ি, শুদ্ধ বিলাবল, মিয়াঁ কি সারং, মিয়াঁ কি মল্লার, দরবারী কাহ্নড়া ইত্যাদি।

রাগ কৌশিক ভৈরব শিক্ষা করাকালীন উপরোক্ত গল্পটি বাবার কাছে শুনি। তিনি এই গল্পটি শুনেছিলেন তাঁর গুরু উজির খাঁ সাহেবের নিকট। বংশানুক্রমে এই গল্পটি সেনী ঘরাণার পূর্বজরা উত্তরাধিকারীদের শুনিয়েছেন। তানসেনের রচিত সব রাগই প্রচলিত কিন্তু কৌশি ভৈরব এবং কৌশি ভৈরবী এ যাবৎ বাবা ছাড়া কারো কাছে শুনিনি। তানসেন যে রাগ রাগিনী সৃষ্টি করলেন, তার পর থেকে নূতন রাগ সৃষ্টির সূত্রপাত হোল। যেমন তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ, বিলাসখানি তোড়ি সৃষ্টি করলেন। তারপর থেকে অধুনা কাল পর্যন্ত বহু জ্ঞানী, গুণী গায়ক বাদকরা নূতন রাগ সৃষ্টি করেছেন, এবং বর্ত্তমান গায়ক বাদকরাও করেছেন। কিন্তু নূতন সৃষ্ট রাগ সর্বজনগ্রাহ্য কতটা হয়েছে বিচার্য বিষয়।

বাবা বলতেন, 'সব রাগ শিক্ষা করবার পর রাগ তৈরী করাটা খুব বড় কথা নয়। তান যেমন তৈরী হয় সেই রকম রাগও তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু দেখতে হবে যে রাগটা তৈরী হোল, তার মধ্যে ভাব সম্পদ আছে কিনা।' কখনও কখনও তিনি বলতেন, 'জীবন শেষ হতে চলল একটা রাগই ঠিক মতো হোল না। আরো যদি একশটা বছর বেঁচে থাকি তা হলে হয়তো কিছুটা হ'তো।' আবার কখনও বলতেন, 'সৃষ্টির তাগিদে যখন যে ভাব হয়েছে, সেই সময় মা সারদা রাগ তৈরী করে দিয়েছেন।'

বাবা সঙ্গীত নিয়ে, মনন, চিন্তন একান্তে থেকে সর্বদাই করতে ভালবাসতেন। কবে থেকে যে তিনি নূতন রাগ সৃষ্টি করেছেন বলা কঠিন। তবে নূতন কিছু ভাল লাগলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা লিখতেন। তার প্রমাণ পাই, বিদেশে উদয়শঙ্করের সঙ্গে গিয়ে যে সময় আরব গিয়েছিলেন সেই সময় আরবী গান শুনে মুগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছোট ভাই আয়েৎ আলিকে চিঠি লেখেন তা জানিয়ে। সেই চিঠিটার কথা আগেই লিখেছি। তারমধ্যে নোটেশন করে লিখেছেন, 'কি মধুর রূপ বাজাইয়া দেখিবে।'

আমি মৈহারে যাবার আগে বাবার রেডিওর সব বাজনা শুনতাম এবং রাগের নামগুলো লিখে রাখতাম যে কথা আগেই লিখেছি। সেই সময় রাগ অর্জুন, ভীম এবং বরারি বহুবার শুনেছি। মৈহারে গিয়েও শুনেছি। পরে বুঝছিলাম রাগ অর্জুন এবং ভীম বাবারই তৈরী। আমার মৈহার থাকাকালীন বাবা যে সব রাগ তৈরী করেছিলেন তা পূর্বেই লিখেছি। তিনি সারাজীবনই যেখানে যা পেয়েছেন সযত্নে সংগ্রহ করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় বাবার কৌতূহল এবং অধ্যবসায় সম্বন্ধে। এই অধ্যবসায় ছিল বলেই তিনি যে রাগ তৈরী করেছেন তার সংখ্যা কম নয়। আমার মৈহারে থাকাকালীন তিনি কত রাগ তৈরী করেছেন, নিজে দেখেছি এবং লিখেছিও। কিন্তু মৈহারের বাইরেও বাবা মাঝে মাঝেই রাগ তৈরী করতেন। সামনে যে থাকত তাঁকে বলতেন এ কথাও শুনেছি। তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আশিসকে

নিয়ে গিয়েছিলেন সেই সময়কার একটা ঘটনা বললেই বোঝা যাবে, বাবা কি ভাবে নূতন রাগ তৈরী করতেন। শান্তিনিকেতন থেকে বাবা যখন আশিসকে নিয়ে মৈহারে এলেন সেই সময় আশিসের কাছে শান্তিনিকেতন থাকাকালীন বহু গল্প শুনলাম। কথাচ্ছলে আশিস বলল, 'একদিন সকলের সামনে বাজিয়ে গল্পচ্ছলে নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন।' সকলে চলে যাবার পর দাদু একলা রাত্রে বাজাতে লাগলেন। পরের দিন আমাকে বললেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে এসেছি সেই কথা ভেবে রাত্রে একটা রাগ রচনা করেছি। রাগের নাম দিয়েছি 'রবীন্দ্র কল্যাণ'। এই রাগটা শিখে রাখ এই কথা বলে শেখালেন।' আশিসের কথা শুনে আমার নূতন রাগ বলে কৌতূহল হোল। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাগের চলনটা কি রকম?' আশিস অম্লানবদনে বলল, 'কাকা ভুলে গিয়েছি।' আশিসকে বললাম, 'ঠিক আছে, আজ রাত্রে জিজ্ঞাসা করব বাবার কাছে।' আশিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কাকা, দাদুকে বলবেন না। দাদুকে বললেই আমাকে বাজাতে বলবেন, আর আমি ভুলে গিয়েছি বলে দাদুর কাছে মার খাব।' আশিসের পরিস্থিতি বুঝে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম না। বাবাকে কখনও 'রবীন্দ্র কল্যাণ' বাজাতে শুনিনি। এই ধরনের কত রাগ যে বাবা তৈরী করেছেন তার হিসবে নেই। তবে একথাও ঠিক, যে কয়টি রাগ বাবা তৈরী করেছেন তারও নজির মেলে না। তাঁকে নিজের তৈরী রাগ এলাহাবাদ রেডিও থেকে বাজাতে শুনেছি। পরবর্তীকালে এলাহাবাদের ডাইরেক্টারকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বাবার বাজনা টেপ করা রেকর্ড আছে কিনা।' শুনে অবাক হয়েছিলাম দিল্লী রেডিওর নির্দেশে বাবার সব রেকর্ড দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে দিল্লীতে খবর নিয়ে সেই সব রেকর্ডের কোন হদিস পাই নি। সেই রেকর্ডগুলো থাকলে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের জন্য একটা বিরাট সম্পদ হয়ে থাকত। একজন উচ্চপদস্থ লোকের কাছে শুনেছি বাবার বহু টেপ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সত্যিই যদি তা হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে এখানেও বাবার ভাষায় সেই 'পার্টি, পার্টি...

যাক যে কথা বলছিলাম বাবার তৈরী রাগে যে গান এবং গৎ আমি শিখেছি, সেগুলি হোল—প্রভাকেলী, মদনমঞ্জরী, রাজবিজয়, মোহম্মদ, সুরসতি, শুভাবতী, ধবলশ্রী, হেমন্ত, হেমবিভাগ, হেমন্ত ভৈরো, হৈমন্তী, মাধবগিরি, ভুবনেশ্বরী, ভগবতী, গান্ধি, গান্ধি বিলাবল, নটকাম্বোজী, মল্লার, মাঝ খম্বাজ, তিলক মাঁঝ, ইমনি মাঁঝ, কেদার মাঁঝ, কৌশি, পাহাড়ী ঝিঁঝিট। উপরোক্ত রাগ ছাড়া বাবার আরও দশটি তৈরী রাগ আছে। একক জীবনে এত রাগ তৈরী করেছেন এমন কোন গুণী গায়ক বা বাদক দেখিনি। এদিক দিয়ে বিচার করলে বাবা এক অনন্য প্রতিভা।

বাবা যে সব রাগ তৈরী করেছেন তার প্রতিটির নাম দিয়েছেন হিন্দু নামে। কেবল একটি রাগ ছিল ব্যতিক্রম, যার নাম রেখেছিলেন মোহম্মদ। এই রাগটির নামকরণের পিছনে একটা কারণ ছিল। আমি মৈহার যাবার প্রায় দুই বছর পরে বাবার ভাইপো মোবারক বাবাকে একটা চিঠি লিখল। বলা চলে আবদার করল তাঁর লাল জেঠার কাছে। হিন্দুদের নামের আগে যেমন শ্রী থাকে, সেই রকম মুসলমানদের নামের আগে প্রায়ই মোহম্মদ থাকে। সুতরাং যদি একটা রাগ তৈরী করে দেন। বাবার পত্রাবলীর মধ্যে সেটা আগেই উল্লেখ করা আছে। বাবা

পত্রোত্তরে দুই প্রকার করে রাগটি তৈরী করে দিলেন। তিনি আমাকে লিখে নিতে বললেন। কিছুদিন পরে একদিন আমাকে বললেন, 'চারসুর দিয়ে ভাতখণ্ড রাগ তৈরী করতে বারণ করেছেন। তা সত্ত্বেও একটা চারসুরের এবং পাঁচ সুরের রাগ তৈরী করে মোবারককে দিয়েছি। কিন্তু মোহাম্মদ রাগটির হিন্দু নামকরণ করে নাম দিয়েছি মাধবশ্রী। এই মাধবশ্রীকে মোহাম্মদ নাও দিতে পারে। এই বলে রাগের চলন আবার বদলে দিলেন। চলন

আরোঃ স র গ ম প নি স

অবরোঃ স নি প ম গ র স

অথচ আগে মোহম্মদের চলন করেছিলেন আরোঃ স র গ প নি সা

অবরোঃ স নি প গ র স

গানটি আগে যা লিখেছিলেন তাই থাকল। গানটির স্থায়ীঃ

ইদ মুবারক গাইয়ে ইসলামী
খুদা কে বন্দে মুহম্মদ
অন্তরা
অরস কুরসে জমিন আসমান
সব হি পুকারত অল্লাহো আকবর।

বাবা সময়ে সময়ে এই ধরনের কত গান যে রচনা করেছেন প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রাগে ভাবলে অবাক লাগে। মোবারক আবদার করে মোহম্মদ রাগ তৈরী করতে বলেছিলো। কিন্তু বাবা প্রথমে দুই রকম চলন লিখলেন। পরে অন্য রকম চলন লিখে মুসলমানী এবং হিন্দু নাম রাখলেন যথাক্রমে মোহম্মদ এবং মাধবশ্রী। ঠিক এই রকম বাবা কখনও কখনও নিজের সৃষ্ট রাগের চলন বদলে দিতেন কিন্তু তাই বলে শুদ্ধকে কোমল কিংবা কোমলকে শুদ্ধ স্বরে রূপান্তরিত করতেন না। তাই তাঁর রচিত রাগকে যখন কেউ বিকৃত করেন অবাক হই। কেউ কেউ বাবার সৃষ্ট রাগ কৌশি বাজিয়ে বললেন, কৌশিক কান্থাড়া। কৌশি এবং কৌশিক কান্থাড়ার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। এক সময় ছিল যখন গায়ক বা বাদকরা একটি রাগের নাম অন্য একটি বলে বাজাতেন বা ছাত্রদের শেখাতেন, পাছে আসল নাম লোকে জেনে যায়। কিন্তু যে দিন ভাতখণ্ডেজী শাস্ত্র এবং বহুগুণী গায়ক বাদকের সঙ্গে আলোচনা করে রাগের রূপ লিখলেন, সেই সময় মালকোষ বাজিয়ে চন্দ্রকোষ বললে তাঁর সমালোচনা হ'তো। যদিও ভাতখণ্ডেজীর বহু রাগের সঙ্গে সেনী ঘরাণার মিল নেই, তা হলেও একটা কথা বলতে পারি যে অমিলটা আছে সেই নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন। সারা ভারতে এত সঙ্গীত কলেজ আছে, কলেজে সেমিনারের মধ্যে এই রাগের বিচার হয় না কেন? এর উত্তর আমার জানা নেই। যতদূর জানি সেমিনারে লোক দেখানর জন্য নিজের লোক ডেকে একটি আড়ম্বর করে দল বৃদ্ধি করাই হয়। সেমিনারের জন্য যে ডাকল সকলকে কলেজের পক্ষ থেকে, পরিবর্তে তাঁকেও ডাকা হোল অন্য জায়গায়। টি-এ, ডি-এ পাইয়ে দেওয়া হোল। একটা কথাই বলতে পারি এক জীবনে ভাতখণ্ডেজী যা করেছেন তার তুলনা নাই। তিনি যদি আরো বেঁচে থাকতেন তা হলে সঙ্গীতের অনেক ক্রমবিকাশ হ'তো। তাই যে কথা আগেও

বলেছি, পুনরায় সেই কথাই বলি পার্টি বাজি ছেড়ে যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ গুণী শিল্পী, তাঁদের ডেকে প্রতি সঙ্গীতের কলেজে সেমিনার করে তাঁদের মতামত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

বাবাকে বহুবার বলতে শুনেছি, 'জানি না কি করে লোকে বলে কাফী, পিলু, খম্বাজ, পাহাড়ী, সিন্ধু, ভৈরবী, তিলং প্রভৃতি হোল হালকা রাগ। গম্ভীর ভাব নিয়ে এ সব রাগ বাজাতে গেলে শিক্ষার দরকার।' বাবা উপরোক্ত সবকটি রাগ গম্ভীরভাব নিয়ে বাজাতেন এবং প্রতিটি রাগেই কি অদ্ভুত উজিরখানি গৎ বাজাতেন। সে সব জিনিষ বাবার সঙ্গেই চলে গেছে। বর্ত্তমানে এই সব রাগে ধুন বাজান হয়।

বাবার সময় যেহেতু বাঈজীদের মধ্যে ঠুংরী এবং টপ্পা সীমাবদ্ধ ছিল, সেইজন্য তিনি ঠুংরী এবং টপ্পা বাজাতেন না, ঠুংরী এবং টপ্পার প্রশংসা করতেন। সরোদে সুতের এবং সেতারে মীড়ের অভ্যাস করলে প্রকৃত টপ্পা এবং ঠুংরী বাজান সম্ভব। কিন্তু সে যুগের হাওয়া বদলেছে। তাঁর প্রথিতযশস্বী শিষ্যরা যদি ঠুংরী বা টপ্পা বাজাতেন তা হলে সঙ্গীতের শ্রোতারা এবং শিক্ষার্থীরা একটা নূতন রাস্তা দেখতে পারতেন।

এই জিনিষ বাবার সঙ্গীতের বিখ্যাত ধারকরা না করুন তাতেও দুঃখ নেই, কিন্তু অবাক লাগে যখন দেখতে পাই, বাবার রচিত রাগকে অন্যান্য সুর লাগিয়ে তাঁরা বাবার নামেই চালান। দৃষ্টান্ত দিয়ে একটি রাগের কথা বলি। মা'র নামে বাবা রচনা করেছিলেন মদনমঞ্জরী রাগ। গানও রচনা করেছিলেন। হিন্দোল এবং বিলাবলের মিশ্রণে রাগটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু যখন একটা জগাখিচুড়ি করা মদনমঞ্জরী রাগটি অন্য নামে শুনলাম তখন অবাক হয়ে ভেবেছিলাম একদিকে ভালই হয়েছে, আজ বাবা জীবিত নেই। তিনি জীবিত থাকলে তাঁর হাতে বাদক মার খেত। এ ধরনের কথা কত বলব।

বাবা বলতেন, 'সঙ্গীত নিয়ে জ্যাঠামি কোরো না।' অথচ এই সত্য কথা বলবার জন্য সৎ সাহস দরকার, আজকের যুগে যার বড় অভাব। বাবার তৈরী রাগ ইমনিমাঁঝ। তিনি দিনের পর দিন আমাকে ও আশিসকে শিখেয়েছেন। মসীদখানি এবং দ্রুত গৎ-এর উঠান এবং বন্দিস্ এক কথায় অপূর্ব। দ্রুত গৎ এ তাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। অন্যমনস্ক হলেই কুপোকাৎ। অথচ এই রাগটির উপর আগ বাড়িয়ে বাবার এক ছাত্র লিখল, 'ইমনি মাঁঝ রাগের কাঠামো আমি বাবার কাছে শুনি। পরে নিজে সেটাকে সুবিস্তৃত, পূর্ণ রূপ দিয়ে বাজিয়ে থাকি।' এই কথা থেকে কত বড় ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়! বাবা নিজের ছাত্রকে ঠিক চিনেছিলেন, যার ফলে জীবনের শেষে তাকে 'কাফের' বলেছিলেন। সত্যিই তো কাফের না হলে বাবার ভাষায় এ ধরনের জ্যাঠামো করবার সাহস কেউ করত কি? নিজেকে তানসেনের পর্যায় মনে করলেই এ ধরনের কথা কেউ বলতে পারে। এই রকম হবে ভেবেই বাবা তাঁর গণ্ডা বাঁধেন নি।

বাবা যে ছাত্র যতটা বাজাতে পারে তাঁকে সেইভাবে শিক্ষা দিতেন। শেষ স্তরে গিয়ে বাবা শেখাতেন ষড়জ পরিবর্তন এবং ষড়জ সংক্রমণ। সংক্ষেপে ষড়জ পরিবর্তন এবং ষড়জ সংক্রমণের কথা বলি। ষড়জ পরিবর্ত্তনের মূল নিয়ম এইরূপ—'র' কে খরজ করলে গান্ধার 'র' হতে পারে, কেননা 'র' হতে গান্ধার পূর্ণস্বর। এই মতে একটি পূর্ণ স্বর আবার একটি অর্দ্ধস্বর হয়ে ক্রমান্বয়ে কড়ি 'ম' হয়।

ষড়জ সংক্রমণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, রাগের মধ্যে 'সা' এর ষাড়জিকতা ত্যাগ, অন্যান্য সুরকে খরজ রূপে আশ্রয় করে এবং পরে পুনরায় 'সা' এর খরজে ফিরে এসে তাতেই সমাপ্ত হয়। এই জন্যই একে ষড়জ সংক্রমণ বলা হয়।

এ সব জিনিষ, লেখা পড়ে বোঝা যায় না। শিক্ষা না করলে এর মধ্যে প্রকাশ করা যায় না। যেমন রাগ তৈরী হয়, সেইরূপ ষড়জ পরিবর্তন এবং ষড়জ সংক্রমণ করা যায়। এই সব সাধনা করতে গেলে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়। বাবা এই জিনিষ যথেষ্ট করতেন এবং ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকজন শিক্ষার্থীকেই মাত্র শিখিয়েছেন। এ কথা নয় যে তিনি শেখাতে চান নি। বাবার ভাষায় বলি, 'দিতে তো সব চাই, কিন্তু বাবা সব উগলিয়ে দাও।' তাই বাবা যে কয়েকজনকে এই জিনিষ শিখিয়েছেন তা মুষ্টিমেয়। দুটো দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখলে সঙ্গীতের গুণীজন বুঝতে পারবেন। যেমন পঞ্চমকে 'সা' মনে করে খাম্বাজ বাজালে বেহাগ হয়ে যায়। আবার যেমন মারওয়ার মন্দ্র সপ্তকের ধৈবত কে 'স' মনে করে মারওয়া বাজালে ভূপালী হয়ে যায়। এ তো গেল ষড়জ পরিবর্তন। এবারে ষড়জ সংক্রমণের কথা বলি। ষড়জ সংক্রমণ হোল, যেমন ইমন কল্যাণের কড়ি'ম' যোগে 'প' এর খরজে সংক্রমণ হয়। আবার যেমন খাম্বাজ রাগে কখনও কখনও কড়ি'ম' যোগে 'প' এর খরজে সংক্রমিত হয়। এই ষড়জ সংক্রমণ রাগ মালাতে নূতনত্ব সৃষ্টি করে।

এই ষড়জ পরিবর্তনের কথা লিখতাম না, যদি বাবার শেখান ষড়জ পরিবর্তনকে কেউ অতি পাকামি করে এই কথা না লিখত, 'বাবা আমাদের মধ্যমকে 'স' মেনে কালেংড়া বাজাবার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। এবং সেটা ছিল ঠুংরী বা ধুনের আমেজ। আমি তার মধ্যে একটা বড় রাগের সম্ভাবনা দেখেছিলাম। সেটাকেই বাড়িয়ে তুলে আমি প্রচলন করি।' এই কথা পড়ে আমার একটা কবিতার কথাই মনে পড়েছে। 'কোই নাম করতা হয়, কোই কাম করতা হয়। জলতা হয় তেল বত্তী দিওয়া কা নাম হোতা হয়।' ভাগ্যের জোরে নাম করেছে সঙ্গীতে, কিন্তু কামের বেলায় শূন্য। এ কথা না হলে কি করে লিখত, বাবার 'মধ্যম' কে 'স' মেনে 'কালেংড়ার' মধ্যে ঠুংরী বা ধুনের আমেজ ছিল। আর কত বড় ধৃষ্টতা যে বাবার রচিত রাগ 'মধ্যম সে কালেংড়া' না বাজিয়ে নূতন নামকরণ করল। এতে প্রমাণ করল নিজেকে মস্ত বড় একটা 'কম্পোজার' বলে, কিন্তু একথা কেন বুঝল না সঙ্গীতের গুরুকে কত ছোট করলো। এই সব নানা কারণে বাবা তাঁর সেই ছাত্রকে বিশেষ ভাবে বুঝেছিলেন, তাই তাঁকে 'কাফের' বলেছিলেন। যাক প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন। এমনও দেখেছি, এক ছাত্র নিজে একটা রাগ তৈরী করে বাবার রচিত রাগ বলে প্রচলন করেছে। কে দেখতে গেছে বাবা রাগ তৈরী করেছেন, না অন্য কেউ তৈরী করেছে। বাবা রাগ তৈরী করেছেন বললেই সাতখুন মাফ। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আজকের যুগে শ্রোতারা মূর্খ নয়। খবরের কাগজে সমালোচনা না হলেও লোকের মুখে সমালোচনা হয়। এই ধরনের কয়েকটা প্রশ্ন সঙ্গীতের কয়েকজন বোদ্ধা আমাকে করেছেন। আমি অবাক হয়েছি। এর কি উত্তর দেব? আমার অবস্থা শাঁখের করাতের মতো।

কথায় আছে ভূতের ঘরে পাওয়া লাঠি 'থাম' না বলা পর্যন্ত পেটাতেই থাকে। আমার

কলমটারও সেই দোষ। যতক্ষণ না আমার বিবেক তিনবার 'থাক' বলে, এ হতভাগা থামতে চায় না। পেটানির একটা আনন্দ আছে, সাইকোজলিস্টরা বলে থাকেন। বিশেষ করে দুষ্ট গোরু হলে গোপেটান পরম সুখকর। আমার কলম এটা বুঝে ফেলেছে। আর তাই পিটুনি দেয়।

বৃহস্পতি শব্দটা সুন্দর। নাম হিসাবেও ভাল কিন্তু যদি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি হয় তা হলে চিন্তার কথা। এ রকমই এক সঙ্গীতের বৃহস্পতি ঘটনাক্রমে বাবার সঙ্গীতের গোশালায় বহুদিন জাবর কেটেছিল। জাবর ভাল, গোগ্রাস ভোজনের রিভাইস হয়, তাতে হজম হয়। কিন্তু একটা বিড়ম্বনাও আছে। পাকনালী দিয়ে রসগোল্লা আর করলা যদি একসঙ্গে ঢোকে তাহলে জাবরে করগোল্লা হয়।

সেই মহানুভবটি বাবার তৈরী মাঝে খাম্বাজ রাগটা বেমালুম চালিয়ে দিলেন উজির খাঁর কৃতিত্বে। এক দিক দিয়ে ভাল, কারণ যেখানে বাবা সম্পূর্ণ ভাবেই উজির খাঁর শিষ্য সেখানে তাঁর 'এ্যাসেট' এবং 'লায়েবিলিটি' দুটোই উজির খাঁর। কিন্তু কথার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা তপ্ত শলাকা। 'সেটা হোল মাঝ খাম্বাজটা শিখি বাবার থেকেই যেটা উনি শিখেছিলেন রামপুরে। আমি আর অমুক, রাগটিকে অত্যন্ত ভালবেসে বড় করেছি ও মানুষ করেছি। এখন তো এই রাগ সবাই বাজায়।'

যিনি একথাটি বয়ান করলেন, হয় তাঁর বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে বা বিবেককে 'মর্টগেজ' করে দিয়েছে। কারণ এ কথাটা বলা মাত্র অর্থ এই দাঁড়ায় যে বাবা এই রাগটি শিক্ষা করে যে রূপ দাঁড় করাতে পেরেছিলেন, সেটা একটা 'জড়শিশু' যাঁকে এই তথা কথিত জীয়ন কাঠি বাবুটি প্রাণদান করলেন, মানুষ করলেন এবং ভালবেসে ফেললেন। বাবা বলতেন, 'নিজের ছেলেকে মানুষ করতে পার না আর অনাফলয়ের দপ্তরী হবার সখ।' মূল কথাটা হোল বাবা সেনীয়া ঘরাণার তালিম পেলেন রাগ 'মাঁঝ'। বাবা তৈরী করলেন রাগ মাঁঝ খাম্বাজ। কিন্তু এক আত্মপ্রসাদতুষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বিশেষজ্ঞ তথ্য দিয়ে বললেন, 'রাগ মাঁঝ খাম্বাজ সেনীয়া ঘরাণার প্রাচীন সৃষ্টি।' তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাবাকে ছোট করা। তাতে বাবার গোয়ালের গোরু শরিক হোল। সেও বলে বসল, মাঁঝ খাম্বাজ উজির খাঁর তৈরী। এই পণ্ডিত মূর্খকে কি করে বোঝাই ঐরাবতের লঘুত্তম দোষের হয় না। ইতিহাসের স্বার্থে এক নাগাড়ে এক-ঝুড়ি কটু কথা লিখতে হোল। তার জন্য যদি অহংবাদী হয়ে থাকি সে আচরণের নিন্দা করছি। আমার উদ্দেশ্য আত্মপ্রচার নয়, বিকৃত তথ্যকে শুধরে দেওয়া মাত্র। সংস্কৃতে একটা শ্লোক প্রচলিত রয়েছে—

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিম্ করিষ্যতি।

অর্থাৎ, যাঁর জ্ঞান নাই বা মূঢ় তাঁকে শাস্ত্র কি সাহায্য করবে? যেমন দৃষ্টিহীনের জন্য দর্পণ মূল্যহীন। সুতরাং 'লাঠি,—থাক্, থাক্, থাক্।'

ভিতের পাথর যদি মাথা বের করে বলে আমিই ভিতের পাথর, তা হলে বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়তে দেরি হবে না। ঠিক সেই রকমই আমাদের এই বাহ্য জীবনের অন্তরে, কিছু জীবনের অন্তরে, কিছু জীবনের অস্তিত্ব থাকে। যাঁরা কখনই প্রকট হয়ে বলে না তাঁরা মালার সুতো। এত সুসংবদ্ধভাবে মালাটা গাঁথা হয় যে সুতোটা থাকে অদৃশ্য। যেহেতু বর্তমান দেখতে পায় না সেই পাতাগুলো, পুরনো হয়ে ইতিহাস হলে সেখানেও নীরব সত্য অদৃষ্টই থেকে যান।

হয়ত কয়েকজন এ রকম চরিত্রকে কাব্যের উপেক্ষিতা হিসাবে লেখকরা লিখেছেন, কিন্তু তার বাইরেও বেশ কিছু চরিত্র রয়ে গিয়েছে। যেমন সঙ্গীতে মদনমঞ্জরী দেবী অর্থাৎ শ্রীমতি উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ আমাদের মা, যাঁর সম্পর্কে বাবার অনুভূতিগুলো চক্ষুলজ্জায় মুখর হতে পারে নি, আর যাঁদের কণ্ঠে উদাত্তভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত, তাঁরা আত্মপ্রচারের পঙ্কে মজ্জিত, তাই মা জনসমক্ষে অজ্ঞাত। অথচ তাঁর কথা উল্লেখ না করলে বা তাঁর অস্তিত্বকে যথোচিত মর্যাদা না দিলে বাবার ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে না। তাই বাবার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা মানে মা'রও উল্লেখ করা। আর উল্লেখ করতে গেলেই বহু সত্যের সম্মুখীন হতে হবে যেখানে প্রিয়ভাষণ সম্ভব নাও হতে পারে। যেহেতু আমার বই এই রচনা প্রয়াস নিছক নান্দনিক নয় তাই মিষ্ট বাক্য নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই না।

ন্যাভারোনের কামান বিশ্ববিখ্যাত। এই কামানের যোগানদার বারুদ যে শস্ত্রাগারে থাকত সেটাও নিঃসন্দেহে দর্শনীয় বা উল্লেখনীয়। বাবা নিজে এক অসাধারণ সঙ্গীতবর্ষী কামান আর তাঁর কিছু ছাত্র সমবর্ষী না হলেও বর্ষণে সক্ষম। এঁদের সকলের যোগানদার ছিলেন মা। বাবা তাঁর সন্তানেরা বা শিষ্যেরা সকলেই এই ফল্গুধারার অস্তিত্বকে অনুভব করতেন। মা অলকানন্দার মত প্রবল স্নেহময়ী অস্তিত্ব বজায় ছিলেন, আর স্নেহ প্রস্রবণ বলতে গেলে সংস্পর্শে আসা আবালবৃদ্ধ-বণিতার জন্য সমমাত্রিক ছিল। আট বছরের বালিকা বধূরূপে বাবার সংসারে এসেছিলেন আর প্রায় নয় দশকব্যাপী ঝড় ঝাপটায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। আজও এক অম্লান অস্তিত্ব স্বরূপ তিনি।

রায়পুরের (অধুনা বাংলাদেশের) বশীর আহমদ খাঁ সাহেবের আট বছরের মেয়ে মদন্নিসা খাতুন কোন মাসে কোন তারিখে সাধুখাঁয়ের তৃতীয় পুত্র বধূ হিসাবে শিবপুর গ্রামে এসেছিলেন সে বিষয়ে কোন দিনপঞ্জি মেলে না। ওনার প্রথম পদক্ষেপ যেমন বাবার বাড়ীতে মঙ্গলের সূচনা করেছিল, তেমন কিন্তু মায়ের নিজের জীবনটায় মঙ্গল সূচিত হয় নি। যাক সে পরের কথা পরে বলব।

মা'র পিতা বশীর আহমদ অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন। বাবা নিজে 'আমার জীবনীতে' যা লেখেন নি সে কথাগুলোই বলি। মা সাধুখাঁয়ের পুত্রবধূ হয়ে বাল্যকালে এলেন এবং বিয়ের রাতেই বাবা মায়ের গয়না নিয়ে দেশান্তরী হলেন। মা আট বৎসর বয়সে কোথায় খেলা করে বেড়াবেন তা আর হোল না। মায়ের কথাতেই বলি, 'বাবা, ছোটবেলায় বাবা, মা, দাদার জন্য কাঁদতাম। আমার জীবন বড়ই কষ্টের জীবন। তোমার বাবা তো দেশান্তরী হলেন আর আমি নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে ঘরকন্নার কাজ করতাম। আমার মনে হ'তো বাবা, মা আমাকে যেন জলে ফেলে দিলেন। সেই ছোট বয়স থেকে এখনও মনে হয় যেন আগুনের মধ্যে বাস করলাম।' গল্প আর ইতিহাস এক নয়। গল্প কখনও কখনও আধা মিথ্যে আবার কখনও হয় ডাহামিথ্যে। কিন্তু মা কিংবা বাবার জীবন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু সাংবাদিকের জন্য গল্প হলেও ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে।

বাবা যেমন নিজের বড় দুই ভাই ছমিরুদ্দিন এবং আফতাবুদ্দিনকে ভয় করতেন এবং

তাঁদের আদেশ অমান্য করবার সাহস ছিল না, সেই রকম বাবার পরে দুইভাই নায়েব আলি এবং আয়েৎ আলি বাবার আদেশ অমান্য করতে পারতেন না।

প্রথম মেয়ে আরজা যখন জঠরে এলেন মা'কে তখন বাড়ীর সব কাজ করতে হ'তো। একদিন ঘড়া করে জল আনতে গিয়ে পড়ে গেলেন। যার ফলে পেটে থাকাকালীন শিশুর মৃত্যু হয়। কয়েক দিনের জন্য মা বাপের বাড়ী চলে গেলেন। বাপের বাড়ী গিয়ে মা'র আমাশয় হয়। কিছুদিন পরে বাবার বড়ভাই ছমিরুদ্দিন মা'কে রায়পুর থেকে আনতে গেলেন। তিনি যখন আনতে গেলেন, তখন মা'র বাবা বাড়ী ছিলেন না। শ্বশুর বাড়ী গেলে সাড়ী মিষ্টি দিয়ে মেয়েকে বিদেয় করতে হবে সেইজন্য মায়ের মা নিবেদন করলেন, মা'র বাবা এবং ভাই এলে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন। এই কথা শুনে ছমিরুদ্দিন অপমানিত বোধ করলেন। তিনি বাড়ী এসে বাবাকে ডেকে কৌশলে এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে দিলেন। এই ভেবে যাতে বাবার বাড়ীর প্রতি টান হয়। বাবার ইচ্ছা না থাকলেও বড় ভাইএর মুখের উপর কথা বলার সাহস ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে বিবাহ করলেন। কিন্তু বিবাহের পর আবার পাড়ি দিলেন শিক্ষার জন্য। বাবা মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। দ্বিতীয় পত্নী কিছুদিন পরেই মারা যান। মা কিন্তু সেই সময় নিজের বাবার কাছেই ছিলেন। বাবার দ্বিতীয় পত্নী মারা যাবার পর, বাবার মা প্রথম পত্নী অর্থাৎ মা'কে নিয়ে দেশে এসে বললেন, 'তুমি হলে আসল পাটেশ্বরী মা, তোমার বিহনে বাড়ী অন্ধকার থাকত।'

ইতিমধ্যে বাবা মাঝে মাঝে দেশে আসতেন কিছুদিনের জন্য। পরে মা'র সুরিজা, জাহানারা, আলিআকবর এবং অন্নপূর্ণার জন্ম হোল। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। শ্বশুর বাড়ীতে মা রাত্রি বারোটা অবধি ধান ভানতেন। ধান ভানতে ভানতে ঘুম এসে যেত। কেবল ধান ভানাই নয় খাবার তৈরী করা, বাসন মাজা ইত্যাদি সব করতে হ'তো। গ্রাম্য সরল মেয়ে চোখ কান বুজে সবই করতেন। কি কষ্টই না করেছেন কল্পনা করা যায় না। মা যে সময়ে মৈহারে এলেন সে সময়ও সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছেন। ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছেন। বাবাকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সেবা করতেন কিন্তু তার জন্য মা'র মনে ক্ষোভ ছিল না। মা'র মুখে কোন কথা নাই, কোন অভিযোগ নাই। এই সব কথাগুলি, বাবার জীবনী লেখবার সময় যখন মায়ের কাছে তাঁর জীবনী শুনতে চেয়েছিলাম, তখন মা দুঃখ করে বলেছিলেন। কিন্তু আমার মৈহার থাকাকালীন তিনি কোনদিন এইসব কথা বলেন নি। বাবার কথায় তাঁর জীবনী লেখবার সময় যখন অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তখন মা'র কাছে এই সব কথা শুনতে পাই।

মৈহারে আসার পর, মা আলিআকবরের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ, যোধপুর, বম্বে, কোলকাতা এবং অন্নপূর্ণাদেবীর বিবাহের সময় আলমোড়া গিয়েছিলেন। এ ছাড়া মা আর কোথাও যান নি। বাবাও পছন্দ করতেন না, মা কোথাও যান। কিন্তু আলিআকবরের অনুরোধে মা মৈহারের বাইরে গিয়েছিলেন। বেশীদিন কোথাও থাকেন নি। বাবা একা মৈহারে থাকেন বলে, মা'ও কিছুদিন বাইরে থেকে মৈহারে চলে এসেছিলেন। যদিও বাবা বলতেন, 'ছেলের কাছে আরো কিছুদিন থাকলে না কেন?' কিন্তু সেটা ছিল বাবার পরীক্ষা। মৈহারে না থাকলে বাবার

মেজাজ গরম হয়ে যেত। আলিআকবর ব্যাপারটা বুঝতেন, তাই কিছুদিন পরেই মা'কে মৈহারে পৌঁছে দিতেন, যাঁর ফলে বাবার মেজাজ ভাল হয়ে যেত। মৈহারে মা না থাকলে বাবা দিশেহারা হয়ে যেতেন। কেন না মায়ের মত কে সারাদিন সবদিক সামলাবে?

মায়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয় সঙ্গীত শিক্ষা না করলেও ছোট থেকে সঙ্গীতের পরিবেশে থাকবার ফলে নিজের মনে হারমোনিয়াম এবং সেতার বাজাতেন। মা শুদ্ধ স্বর কোমল স্বর বুঝতেন না। কিন্তু বাবা ছাত্রদের কিছু শেখালে কিংবা নিজে কিছু বাজালে সেটা শুনে শুনেই রাগের একটা রূপ খাড়া করতেন। নিজের মনে দুপুরে এবং রাত্রে কি মনোযোগ দিয়ে যে বাজাতেন কল্পনা করা যায় না। মা যদি শিখতেন, তা হলে একজন নামী শিল্পী হতে পারতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যোধপুরে আলিআকবর মা'কে একটা সেতার কিনে দেন। নিজের মনে সারাদিন কাজের ফাঁকে হারমোনিয়াম এবং সেতার বাজাতেন, আমি মৈহার থাকাকালীন দেখেছি এবং আগেই বলেছি।

মায়ের মত এত নীরব কর্মী বড়ই বিরল। আমার জীবনে এমন চরিত্র আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় আর একটি দেখি নি। বাবার নিজের পুত্র, কন্যা, এবং শিষ্যরা কখনও শিক্ষা পেতেন না, যদি না বাবা মায়ের মত নীরব নিপুণা গৃহিণী পেতেন। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ধর্ম সম্বন্ধে মায়ের নিষ্ঠা ছোটবেলা থেকেই ছিল। তিনি বিয়ের আগে থেকেই নমাজ পড়তেন। তাঁর জীবনের বিরানব্বই বৎসর বয়সে যখন তাঁকে অন্নপূর্ণাদেবীর বাড়ীতে দেখি, সে সময়েও পাঁচবার নমাজ পড়তেন। তিনি সারদা দেবীরও ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কোনদিন মৈহারে সারদা দেবীর মন্দিরে যান নি। তিনি যখন মৈহারে যান সেই সময় সে মন্দিরে ওঠা অত্যন্ত কঠিন ছিল। মৈহারের মহারাজা বলেছিলেন, যে দিন মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ি ভাল হবে সেই দিন মা'কে দর্শন করাবেন। কিন্তু তা না হবার ফলে মা কখনও সারদা দেবীর মন্দিরে যেতে পারেন নি, কিন্তু দেবীর চিত্রকে নিত্য মালা পরাতেন।

বাবার জীবনে শতবার্ষিকী ভুল হয়েছিল মা তা পূর্ণ করলেন। অষ্টআশি সনে মার শতবর্ষ পূর্ণ হোল। কিন্তু মা'র শতবর্ষ পালন করবার কথা কারো মনে পড়ল না। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস। সেই বয়সে দুই চোখে ছানি পড়লেও বছরে একবার মৈহারে আসেন। বাবার কবর দেখে মনে মনে গুমরে ওঠেন এবং বাকী সময় আলিআকবরের কোলকাতার বাড়ীতে বৌমা, নাতিনাতনি নিয়ে দিন অতিবাহিত করেন। যদিও অন্নপূর্ণাদেবী মা'কে বম্বে নিজের কাছে রাখতে চান, কিন্তু প্রিয় কন্যার দুঃখ দেখে সর্বদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং কাঁদেন বলে বাধ্য হয়ে অন্নপূর্ণদেবী তাঁকে আলিআকবরের বাড়ীতে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। মৈহারে বাবা জমি কিনে ধান গমের ব্যবস্থা করেছিলেন। জমির উৎপন্ন ফসল বার্ষিক বিক্রী করবার জন্য বাবার উত্তরাধিকারীরা একবার মৈহারে আসেন। এর জন্যই মাকে বছরে একবার নিয়ে আসেন বাবার কবর দেখাবার জন্য।

এবারে মায়ের একটা কথা বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। মা লেখাপড়া শেখেন নি। বুঝতে পারি না কি করে জ্ঞানগর্ভ কবিতা বলতেন। মাকে যে সময়ই বলেছি এ কবতি কোথায় শিখেছেন, বলতেন 'আল্লাই বলে দেন।' অবশ্য এও ঠিক ছোটবেলায় দেশে শুনে শুনে

কবিতাগুলো শিখেছিলেন, যা আজ পর্যন্ত আমি কোথাও পড়ি নি। তাঁর কবিতাগুলোর ভিতর কি অন্তর্নিহিত ভাব রয়েছে, ভাবলে অবাক লাগে। তাঁর কয়েকটি কবিতা পাঠকদের অবগতির জন্য লেখা দরকার। এগুলো মা আবৃত্তি করতেন ঃ—

১। মনের মানুষ পাইনা বলে
আমি সদাই কেঁদে মরি
মরি মরি।

২। গাঁজার নিশা, মদের নিশা
কোন নিশাতে হইলি ভুল,
ভাবের নিশা হইলে পাগল
দিশা নাই না মূলে।

৩। নয়ন হল জলের ভাণ্ড,
চিত্ত হোল অগ্নি কুণ্ড,
মন হোল সমুদ্রের মত,
বালুর বাঁধে রাখব কত?

৪। বিন্দে তোর কপাল ভাল
পুষ্প তুলতে কৃষ্ণ পেলে
আনগো ছুরি কপাল চিরি
বিধি কি লিখে গেছে আমার কপালে।

৫। কোথায় রে তোর জমিদারী,
কোথায় রে টাকা পয়সা,
কোথায় তোর নীল ঘোড়া,
একদিন দেখবি রে মন কবরে ঘোর অন্ধকার।

৬। জীতে যখন অনেক পিরীতি
মরলে কি সঙ্গে যাইবে মন
কার লাগি বানাইলাম সোনার ঘর?

৭। যতক্ষণ থাকে মায়া,
ততক্ষণ থাকে কায়া।
কি করব স্ত্রী পুত্র
কি করব ভাই
মন উড়িয়া গেলে সঙ্গে কেহই নাই।

এই ধরনের অনেক কবিতা মা বলতেন। কয়েকটা মাত্র লিখলাম। এই সব কবিতা থেকে দার্শনিক তথ্য পাওয়া যায়।

৮০

বাবার যুগটা বিরল যুগ। যেমন সে যুগে লোকে শিক্ষা করত তেমন শিক্ষিতও হ'তো।

আজকে আমরা শিক্ষা করেও অশিক্ষিত থাকি। দৃষ্টির মালিন্য দূর হয় না। পরিণামে আমরা স্বজাতীয় শিল্পীদের নিন্দা করেই ক্ষান্ত থাকি না, গুরু ভাই বা সহোদরদের প্রতিও ঈর্ষা বা দ্বেষ পোষণ করি। বাবার যুগে এটা হতো না। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাবা এবং উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ। সঙ্গীতের জীবনের তত্ত্বকোষ বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কাছে জানতে পারি, সমকালীন এই দুই মহান শিল্পী যদিও একই সরোদ বাদন বৃত্তিতে ছিলেন কিন্তু একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। তাঁদের একের অপরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের মতে, 'আমি তো কুলি কাবাড়ি। উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ হচ্ছেন জাত শিল্পী। তাঁর হাত দিয়ে যে সুর বের হয় তা যদি আমার বেরত তা হলে আমি লোককে কাঁদাতে পারতাম। তাঁর সঙ্গীত আমাকে কাঁদায়। তাঁর হাতের টিপ কত মিঠে।' কিন্তু হাফিজ আলি খাঁ তা মনে করতেন না। বাবা সম্বন্ধে বীরেন্দ্র কিশোরের কাছে হাফিজ আলি খাঁ বলতেন, 'বাবু (অর্থাৎ বাবা) এত জীবন ভোর শিখেছেন যে তিনি সঙ্গীতের সমুদ্র ছিলেন। তিনি সঙ্গীত শিখতে যে কষ্ট করেছেন তা লোকে কল্পনাও করতে পারবে না। বাবুর সঙ্গীত বুঝতে হলে অনেক অন্তর্দৃষ্টি থাকা দরকার। তাঁর মেধা, মন ও সিদ্ধি সকলে বুঝতে পারে না। আমি তো কেবল উজির খাঁ সাহেবের কাছে ইমন, দুর্গা, বাগেশ্রী এবং দরবারী রাগই শিখেছি।'

কথাটা সত্যি। অনেকের বোধ শক্তির উর্দ্ধে বাবার প্রতিভার অবস্থান। যেমন যাঁরা জানতেন তিনি লোবো সাহেবের কাছে বেহালা শিখেছেন, তাঁদের মত ছিল তিনি একজন উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য বেহালা বাদক। আর যাঁরা জানতেন তিনি বেহালা বাদক হাবুদত্ত এবং রামধনের ছাত্র, তাঁদের মত ছিল প্রাচ্য দেশীয় বাদনে বাবা এক নম্বর।

এ বিষয়ে উভয় মতাবলম্বীদের জ্ঞানই পূর্ণ হয়। কারণ বাবা যখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে বাজাতেন তখন মনে হ'তো এটাই বুঝি তাঁর বাল্যকাল থেকে শিক্ষার ফসল। আবার প্রাচ্য প্রণালীতে বাজালেও ঠিক তেমনি মনে হ'তো। শুধু মাত্র যন্ত্রটা ধরার ব্যাপারে বা ছড় চালনের পাশ্চাত্য পদ্ধতিটা বাবার বেশী বৈজ্ঞানিক মনে হয়েছিল।

শুধু মাত্র বেহালাই নয় অন্যান্য পাশ্চাত্য যন্ত্রের উপরেও তাঁর দখল ছিল অবিসংবাদিত। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার ববা দিল্লী রেডিওতে বাজাতে গিয়েছেন। সেই সময় নিউ থিয়েটার্সের আলি হুসেন ষ্টাফ আর্টিষ্ট হিসাবে পিয়ানো বাজাতেন। বাবা ষ্টুডিওতে পৌঁছলে এক শ্বেতাঙ্গনা বাবাকে বললেন, 'আপনি কি পিয়ানো বাজাতে পারেন?' বাবা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'একটু একটু বাজাতে পারি।' এ কথা শুনে আলি হুসেন পিয়ানো ছেড়ে উঠলেন। বাবা যে সময়ে কোন রেডিও স্টেশনে বাজাতে যেতেন সে সময় সকলেই বাবার বাজনা শুনতে উপস্থিত হতেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হোল না। বাবা পিয়ানোতে যে লয় ও ছন্দে বাজালেন তা শুনে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। ষ্টুডিওতে তখন সকলে বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, সরোদ বাদক হয়ে এ রকম পিয়ানো বাজান কি করে?

আবহমান কাল থেকে নাস্তিকেরা আস্তিকের পৌত্তলিক আচরণকে ঠাট্টা করে আসছেন। 'সূর্যাস্তের জল কি সূর্যে পৌঁছয় বা তাতে কি সূর্যদেবের পিপাসা নিবারণ হয়?' হয় না ঠিকই,

কিন্তু অনেকের ঋণ স্বীকার করার জন্য, বিবস্বান সূর্যকে জল দিয়ে ভক্ত তাঁর অনুকম্পার মহিমাকে স্বীকার করেন।

ঠিক তেমনি শিষ্যরা গুরুর জন্য কি করেছেন, তাতে গুরুর বিশেষ কিছু এসে যায় না। কিন্তু শিষ্যের এই কৃতজ্ঞ আচরণ পরবর্তী শিষ্যসন্ততিকে শেখায় কৃতজ্ঞ ও অবণত চিত্ত হওয়া। এটাই আবহমান কালের পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে বাবা তো তাঁর শিষ্যদের অকৃপণভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরিবর্তে কোন জাগতিক বস্তু কামনা করেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত প্রসাদ ভোগীরা তাঁর স্তুতিতে কি করছেন? তাঁরা যথার্থই কি কোন সৎকার্য করছেন? নাকি মূঢ় গড্ডলের মত আত্মপ্রসাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে নিজেকে স্বয়ম্ভু ভাবছেন।

ভারত হুজুগের দেশ। কেউ জিগির তুললেই লোকে কিছু করে বসে। সুরহীন শ্রীকণ্ঠের অধিকারীরাও হুজুগের মাথায় তানসেন জয়ন্তী পালন করেন। তাতে আদৌ সঙ্গীতের কল্যাণ বা তানসেনের মর্যাদা বাড়ে কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু যথার্থই যদি কোন সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের স্মৃতি পালন করেন, তাহলে তাঁর ফাঁকে অন্যান্য সঙ্গীত পিপাসুরা তানসেনকে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ নিশ্চয়ই পান, আর তা ছাড়া এতেই তানসেনের স্মৃতি অম্লান থাকে।

বাবার ব্যাপারেও তাই। কিছু হুজুগে মানসিকতার অপ্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা মিলে অসময়ে বাবার এক শতবার্ষিকী পালন করে স্মৃতিচারণের গুরু ভারের বোঝা চিরকালের জন্য ঘাড় থেকে নামিয়েছেন। এই আহাম্মক গোষ্ঠির সদস্যরা বাবার জীবিতাবস্থায় নিজেদের নামে পাঠশালা এবং স্কুল খুলতে আরম্ভ করেছিলেন। একজন উচ্চাকাঙ্খী আবার স্কুলে ঘোলের স্বাদ মেটেনি বলে নিজের বাড়ীটাকে স্বনামে ইনস্টিট্যুট ঘোষণা করে বসলেন।

হিন্দীতে প্রবাদ আছে 'পৈদলসে ফর্জি ভয়ো ঢেড় ঢেড় চলি যায়।' অর্থাৎ দাবার বোড়ে যখন প্রতিপক্ষের মন্ত্রীর ঘরে পৌঁছে যায় তখন সেই নব্য মন্ত্রীটি একটু যেন বেশি এঁকে বেঁকে চলে। ঠিক সেই রকমই বাবার সেই বোড়ে ছাত্ররা নিজেদের মন্ত্রী ভাবতে আরম্ভ করল। তাই আত্মঘোষণা ভিন্ন আর কিছু তাঁদের শুনতে ভালই লাগত না।

এতক্ষণ এক নাগাড়ে যা মনে এসেছে লিখে গিয়েছি। আজ মনে পড়ছে ছোটবেলায় আমার গলির মাষ্টার মশাই-এর কথা। মাষ্টারমশাই আমাকে ডাইরিতে রোজকার ঘটনা লিখবার জন্য বলে বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন নিজের সমস্ত অতীতটা পরিক্রমা করতে ইচ্ছে হয়।' তিনি বলতেন, 'প্রার্থনা করি দীর্ঘজীবি হও। যদি ডাইরি লেখার অভ্যাস রাখতে পার তা হলে দেখবে জীবনের শেষে অতীতটাই বারবার মনে পড়বে এবং তখন ভবিষ্যৎটা ছোট হয়ে যাবে। অবশ্য যৌবনে সকলেই ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন দেখে। সেই সময় সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, কামনার স্বপ্ন দেখবে। যৌবনে কামনার জোয়ার সকলকে তাচ্ছিল্য করতে শেখাবে। কিন্তু জীবনের শেষে আসবে প্রত্যয়। তখন বুঝবে জীবনের প্রত্যাশা এবং প্রত্যয়ের সমন্বয়। প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে যখন প্রত্যয়ে পৌঁছতে পারবে, তখন জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে।' ছোটবেলায় যদিও মাষ্টার মশাই-এর আদেশে ডাইরি লেখা শুরু করেছিলাম কিন্তু সেই বয়সে উপদেশের অর্থটা বুঝতে পারি নি। আজ কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছি অনেক দিন পরে।

বর্তমানে যা হচ্ছে তা ত হবেই। ভবিষ্যৎ অজানা কিন্তু অতীত? বাবার কথাগুলো বার বার মনে হচ্ছে। তাঁর কত সাধই না ছিল, কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর জন্য কে কি করল? এখন ভাববার সময় এসেছে। বাবা যে জীবন ভোর উজাড় করে বিদ্যা দিয়ে গেলেন, তাঁর জন্য কে কতটা কি করল এবং মনে রেখেছে দেখা যাক। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যায়। কে কতটা মনে রেখেছে জানি না তবে ব্যতিক্রম আছে।

মাত্র কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম আছেন যাঁরা বাবার স্মৃতিতে কিছু করেছেন। আগেই লিখেছি বাবার জীবিত কালীন ফকির সাহেবের শ্যালক আলি আহম্মদ 'আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজ' খুলেছিলেন। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের বাবার ভাইপো খাদেম হুসেন বাবার নামে 'আলাউদ্দিন লিটল্ অর্কেষ্ট্রা' খুলেছিলেন, তাঁর নাম অমর করে রাখবার জন্য।

পূর্বেই লিখেছি বাবার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য অন্নপূর্ণাদেবী বম্বেতে 'আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সার্কেল' স্থাপন করেছেন। গুরু শিষ্য পরম্পরা হিসাবে নিজের বাড়ীতে কিছু ছাত্র ছাত্রীকে নিয়মিত শেখান। এ ছাড়া আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সার্কেলের তরফ থেকে কোলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের হাজার টাকা দিয়েছেন। সেই টাকার সুদে একটি গোল্ড মেডেল বাবার নামে প্রতি বছর দেওয়া হবে তাঁকে, যিনি সঙ্গীতের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন। এ ছাড়া বম্বের স্বর সাধনা সমিতির মাধ্যমে দুই হাজার টাকা বার্ষিক নগদ পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেছেন, উদীয়মান শিল্পীদের জন্য। বাবার একটি অর্দ্ধাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপনার জন্য মূর্তিও তৈরী করিয়েছেন।

হাজার পনের কুড়ি টাকা খরচা করে যখন অন্নপূর্ণাদেবী বাবার মূর্তি তৈরী করাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়েই বাবার কিছু ছাত্র নিজের মূর্তি তৈরী করাতে ব্যস্ত। কি করুণ অবস্থা! নিজের গুরুর স্মৃতিকে অমর করার চেষ্টা না করে, নিজেই অমর হতে চাইছেন। তাঁরা অমর হবেন, সন্ন্যাসী হিসাবে নয়, ব্রতত্যাগী সন্ন্যাসী হিসাবে। লোকেরা মনে রাখবে অর্থের আর ক্ষুদ্র যশের জৌলুষের পেছনে ধাবিত হয়ে এঁরা গুরুকেও অস্বীকার করতে ক্ষান্ত হন নি। কৃতঘ্নদের সূচিতে আরও কিছু নাম বাড়বে। এঁদের নাম উল্লেখ করে গৌরবান্বিত করব না।

বাবার স্মৃতি রক্ষার জন্য কে কি করেছেন তার একটা সূচী মাত্র দিলাম কিন্তু বাবার সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কে কি করেছেন তা ভাবলে কষ্ট হয়। সকলকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার সময় বাবার স্বভাব ছিল ভয়, প্রীতি এবং নীতি। অগ্রণীদের মধ্যে একমাত্র নিজ কন্যা অন্নপূর্ণাদেবীর প্রতি প্রীতির স্বভাব ছিল তাঁর মেধার জন্য। অন্নপূর্ণাদেবী কিছু ছাত্র ছাত্রীকে বাবার সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে তাঁর সঙ্গীত যাতে বেঁচে থাকে তার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাকীরা? বাকীরা আজকাল শিক্ষার সময় গল্প এবং নিজেদের হামবড়াই করছেন। শিক্ষার ব্যাপারে রাগের চলন দেখিয়ে নিজের বাজান টেপ দিয়ে দিচ্ছেন। এর পরিণাম তাই প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে। কারণ কপি হলেও তার কোন মূল্য নেই, এ কথাটা কেউ বোঝে না। উপস্থিত কেবল শিষ্যের সংখ্যা বাড়ানর দিকে ঝোঁক, কারণ তাঁরা বাজনার সময় সামনে বসে বাহবা দেবে। অবাক হয়ে ভাবি বাবা কি নিজের জীবন দিয়ে এই সব ছাত্র তৈরী করেছিলেন সঙ্গীত নিয়ে ধ্যাষ্টামো করবার জন্য।

বাবার বিষয়ে বই লিখছি অনেকেই জানতে পেরেছেন সংবাদ পত্রের কয়েকটা ইন্টারভিউ পড়ে। এ ছাড়া কোলকাতায় টিভিতে লেকচার কাম ডিমনস্ট্রেশানের ফলেও অনেকে জেনেছেন। আমার এক শুভানুধ্যায়ী এই সংবাদ শুনে বললেন, 'এই সব লিখে কেন শত্রুতা বাড়াচ্ছেন। আপনি স্পষ্ট কথা বলে এমনিতেই শত্রুতা বাড়িয়েছেন এবং অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়েছেন। এ ছাড়া কত লোকে আপনার অপবাদ রটিয়ে সঙ্গীতের ক্ষতি করেছে।' আবার অনেকে বলেছেন, 'বাবার বিষয়ে লিখে কি লাভ? তিনি তো আর দেবতা নন? তিনি তো সাধারণ আর সকলের মত মানুষ।' উত্তরে আমি কটা কথাই বলছি, 'গাছের গাছ হওয়াটা শক্ত নয়, পশুর পশু হওয়াটাও শক্ত নয়, কিন্তু মানুষের মানুষ হওয়াটা ভীষণ কঠিন। অনেক তপস্যায়, অনেক নিষ্ঠায়, অনেক সাধনায় তবে মানুষের মত মানুষ হওয়া যায়। বাবা ছিলেন সেই প্রকারের মানুষ। সাধারণ মানুষের থেকে বাবা ছিলেন আলাদা। সেইজন্যই বাবার বিষয়ে লিখছি।'

অনেকে আবার আমাকে বলেছেন, 'বাবার বিষয়ে এই সব লিখে আপনার কি লাভ? এই সব লিখে আপনি কি পাবেন?' উত্তরে আমি বলি, 'এ কথা কেন ভাবেন যে কিছু পাই নি? অর্থ, সম্মান, স্বাস্থ্য কিংবা প্রতিষ্ঠা পাওয়াটাই কি সংসারে বড় কথা? এত যে দেখেছি, এত যে শুনেছি, দেখে শুনে যে এত অভিজ্ঞতা হয়েছে, লাভ হয়েছে, জ্ঞান হয়েছে এর দামই কি কম?' অবশ্য এটা ঠিক যে বাবার বিষয়ে আবার নতুন করে লিখতাম না। কিন্তু যে দিন থেকে দেখলাম একের পর এক তিনজন সঙ্গীত সেবক মিথ্যার বেসাতি করে সঙ্গীতের ইতিহাসকে কলঙ্কিত এবং নিজেদের আত্মপ্রচার করে বাবার সম্বন্ধে ভুল তথ্য লিখছে, সেই লেখাগুলো যদি না পড়তাম তা হলে আমার লেখার বোধ হয় প্রয়োজন বোধ হ'তো না। বহু লোকের উপরোক্ত সঙ্গীত সেবকদের লেখা পড়ে আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। সেটাও আবার নূতন করে লেখবার একটা কারণ।

এতদিন চুপ ছিলাম। এঁরা নিজের চামচেদের মত আমাকে বোধ হয় ভেবেছিল দেশলাই কাঠির বারুদ। কিন্তু এঁদের বোঝাতে হবে, বাবার আশীর্বাদে এঁদের কাছে যদি এ্যাটম বম্ব থাকে, তা হলে আমার কাছে হাইড্রোজেন বম্ব আছে। আর চুপ করে থাকা চলে না।

বাবার মৃত্যুর পর থেকেই কত মুখরোচক আলোচনা হয় চারিদিকে, তাঁর কোন রেকর্ড থাকে না বলে, কেউ জানতে পারে না সেই সব কথা। কিন্তু ইতিহাস বিধাতার চিত্রগুপ্ত। কিছুই ভোলে না। তাঁর খতিয়ানের পাতায় তা অক্ষয় হয়ে থাকে বলেই, আজও চন্দ্রসূর্য ওঠে। আজও চন্দ্র সূর্য ডোবে।

আমার জীবনে সমস্ত দেখে শুনে জীবনের শেষ মুহূর্তে সব লিখলাম। কিন্তু দেখলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন মনে হয় শুরু থেকে জীবন সম্বন্ধে যদি এটা জানতে পারতাম, তা হলে অন্যভাবে জীবন আরম্ভ করতাম। জীবনের শেষে বুঝলাম, বেশির ভাগ লোকই বাইরে একরকম ভেতরে একরকম। যা মুখে বলে তা কাজে করে না। ভেতরের সঙ্গে বাইরের এই আকাশ পাতাল ফারাকের জন্য, আমরা এত কষ্ট পাই। কিন্তু বাবার কাছে তো এ শিক্ষা পাই নি। এখন মনে হয়, নিয়তির দোষে বাবার সর্ব উপদেশগুলো সকলে ভুলে গেছে।

বাবা বরাবর বলতেন, 'এ কথা লোকে কেন ভুলে যায় যে সকল সঞ্চয়ই শেষে ক্ষয় পায়। উন্নতির অন্তে অবনতি হয়। মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়। জীবনের শেষে মৃত্যু হয়। সুতরাং কি নিয়ে লোকে অভিমান করে বুঝি না। কোন জিনিষের অভিমান করলেই পতন অনিবার্য।' তিনি কতদিন আগে এই সব কথা বলেছিলেন। তারপর কতদিন কেটে গেছে। তিনিও নেই, সে মৈহারও নেই। সবই বদলে গেছে। বাইরের ঠাট ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু ভেতরে জীবন যখন অনেক পথ পরিক্রমা করে অনেকদূরে এগিয়ে যায়, তখন বোধ হয় পিছন ফিরে একবার দেখতে ভালো লাগে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক, সে সব পরে।

বাবাকে সকলে সঙ্গীতজ্ঞ বলেই জানেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে তিনি একজন সমাজ সেবক ছিলেন। তিনি যে সমাজ সেবক ছিলেন তা জানতেন পূর্ববঙ্গের দেশের লোকেরা। আগেই লিখেছি দেশ বিভাগের আগে কর্মজীবনে প্রতি বৎসরই একবার দেশের বাড়ীতে যেতেন। তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। দেশের মাটি এবং মানুষর টান তিনি কখনও উপেক্ষা করতে পারতেন না। দেশের লোকেদের অনুরোধে তিনি যে কত মহান কাজ করেছেন, তা লিখতে গেলে একটা উপন্যাস হয়ে যাবে। তিনি দেশে গেলে সকলের আবদার পূরণ করতেন। একবার তিনি দেশে গিয়েছেন। গ্রামবাসীরা বললেন জলের বড় অভাব। যদি তিনি একটা পুকুর দেন যাতে জলের অভাব হয় না। এ ছাড়া নমাজ পড়বার জন্য মসজিদও ছিল না। আমি মৈহার থাকাকালীন বাবা দেশে মসজিদ এবং পুকুর তৈরী করেছিলেন যে কথা আগেই লিখেছি। তিনি চিঠিতেও আমাকে লিখেছিলেন, কিন্তু মৈহারে এসে তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বললেন না। আজকাল কেউ যদি কিছু করেন সব জায়গায় নিজের গুণগান করে বেড়ান। বাবা ছিলেন ব্যতিক্রম। কত লোককে কত সাহায্য করেছেন কিন্তু নিজে মুখে কখনও বলতেন না। লোক মুখে শুনেছি তিনি কত লোকের উপকার করেছেন যা কল্পনা করা যায় না। বাবার ভাইপো মোবারকের কাছে শুনেছি, দেশে যে পুকুর কাটিয়েছিলেন তার জল কত মিষ্টি ছিল। গ্রামের সবাই বলত 'মিঠা পুকুরের পানি'।

তিনি দেশে গিয়ে বহু জায়গায় বাজিয়েছেন কিন্তু সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতেন না। আজকাল দেখি অনেকেই কোথাও বাজালে সকলকে বলে বেড়ায় কি দারুণ বাজিয়েছি, লোকেরা মোহিত হয়েছে। কিন্তু বাবাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত কি রকম বাজনা হোল তিনি বলতেন, 'ওটা কি বাজনা? ওটা হোল বাজনার ধ্যাষ্টামি। বাধ্য হয়ে বাজাতে যেতে হয় নাতিদের ভবিষ্যৎ ভেবে। কোথাও এই বুড়ো বয়সে বাজাতে যেতে ইচ্ছে করে না। বাধ্য হয়ে যাই।' পূর্ববঙ্গে বাবার কয়েকটি অলৌকিক প্রোগ্রাম আজও লোকে মনে রেখেছে। ঊনিশশ চুয়ান্ন সনে কুমিল্লায় বাবার বাজনা শুনে সকলে সম্মোহিত হয়েছিলেন। মুগ্ধ শ্রোতাদের মনে হয়েছিল তাঁরা যেন এতক্ষণ ঘুমন্ত পুরীতে বসেছিলেন।

বাবা প্রকৃত শিল্পীকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন। আগরতলা শহরে এক বিরাট সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। ভারতের বহু গুণী শিল্পী সেই সম্মেলনে গিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে যাঁর তবলা সঙ্গত করার কথা ছিল, কোন কারণে তিনি আসতে পারেন নি। অগত্যা কোলকতার গায়ক তারাপদ চক্রবর্তী তবলা নিয়ে বসলেন। তারাপদ বাবু

মূলতঃ গায়ক, তবলা শিল্পী নন। কিন্তু বাবার উৎসাহে তিনি সুন্দর সঙ্গত করলেন। বাজাতে বাজাতে বাবা তারাপদ বাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। বাবার প্রশংসা পেয়ে তারাপদ বাবু নিজেকে ধন্য মনে করলেন। শিল্পীর প্রতি শিল্পীর এই শ্রদ্ধা বোধই, বাবাকে সঙ্গীত জগতে শ্রেষ্ঠতর আসনে বসিয়েছিল।

নিরহংকারী তবলাবাদক সাধারণ হলেও বাবা তাঁর সম্মান রেখে সম্মান রেখে প্রশংসা করতেন। কিন্তু অহংকারী ভাব দেখলেই বাবার মাথা গরম হয়ে যেত। যার ফলে তবলাবাদকের অবস্থা হ'তো লেজে গোবরে। এ রকম অনেক দৃষ্টান্তের কথা আগে উল্লেখ করেছি। কোলকাতায় আধুনিক নজরুল গীতি ইত্যাদির সঙ্গে তবলা বাজিয়ে এক তবলা বাদক খুব নাম করেছিলেন। হাতটাও ছিল মিষ্টি। একবার বাবার সঙ্গে এক ঘরোয়া আসরে তাঁর বাজাবার সুযোগ হোল। সুযোগ পেয়ে তিনি ধরাকে সরা দেখলেন। বাবা ব্যাপারটা বুঝলেন। তবলা বাদকের অহংকার নিমেষেই নিশ্চিহ্ন হোল কেননা যন্ত্রের সঙ্গে বাজাবার অভিজ্ঞতা ছিল না। যাঁরা তবলাবাদককে গুণী ভাবতেন, তাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন। কিন্তু কথাটা ঘোরাল করে একজন লিখলেন, 'আমি এক কর্তা ব্যক্তির কাছে শুনেছিলাম যে আলাউদ্দিন খাঁ তবলাবাদককে কি ভাবে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। কেবল অপমান করবার জন্যই। তবলাবাদককে নিকৃষ্ট প্রমাণ করে উনি উঁচুতে উঠবেন এই রকম একটা প্রবৃত্তি ওঁর বরাবরই ছিল।' এই লেখাটা পড়ে সেই দিগ্‌গজ তবলাবাদককে বলতে ইচ্ছে করে যে, যার সঙ্গত করবার যোগ্যতা নেই, সে কেন জলসায় বসে? আর যদি বসেও, চেলা চামুণ্ডেদের সামনে বসিয়ে নিজের বিদ্যা জাহির করে কেন? সুতরাং সেই সব অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী তবলাবাদকদের, যদি বাবা নিরংহকারী হবার উপদেশ দেন বাজনা বাজিয়ে তা হলে সেটা কি দোষের? যেখানে বড় বড় বাঘা তবলাবাদকরা বাবার সঙ্গে বাজাতে গিয়ে হিমসিম খেতেন, সেখানে এই সাধারণ তবলাবাদকের প্রশ্ন আসে কি করে? আসলে তবলাবাদকরা যখন বাজাতে না পেরে লোক সমাজে হেয় হয়, তখন মূল শিল্পী সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য করে নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য।

অথচ আধুনিক গানের সঙ্গে তবলার যাদুকর সঙ্গতকার রাধাকান্ত নন্দী, একবার তবলাবাদকের অনুপস্থিতিতে বাজাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে বাজাবার অনুমতি চেয়ে বলেছিলেন, 'আমি যে আধুনিক গানের সঙ্গে বাজাই। আপনি দয়া করে নিজের পুত্র মনে করে আমাকে পরিচালনা করবেন।' এই বিনয়বাক্য শুনে বাবা বাজাবার খুব সুযোগ দিয়ে প্রশংসা করলেন। এই হোল বাবার চরিত্র। এখন যুগ পালটেছে। উল্টো পাল্টা কাজ করাটাই প্রায় নিয়ম দাঁড়িয়েছে। সেখানে সঠিক কাজের হিসেব কে রাখে? এখন যে যার নিজের ঢাক পেটাতেই ব্যস্ত।

এ সব অনেক দিন আগেকার ঘটনা। তবু এতকাল পরে বাবার সেই সব অমূল্য উপদেশগুলি মনে করবার চেষ্টা করছি, যেগুলি তিনি গল্পচ্ছলে বলতেন। এগুলি লিখবার কারণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীরা যদি এগুলি মনে রাখেন, তবে নিশ্চিত লাভবান হবেন। তিনি বেশির ভাগ উপদেশ শিক্ষাকালীন গল্পচ্ছলে দিতেন যা আগে উল্লেখ করেছি।

এ ছাড়া তাঁর কাছে কেউ এলে এমন অনেক গল্প বলতেন, যা মূল্যবান উপদেশাবলী বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। মৈহার ছাড়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যখন বাবার কথাগুলো মনে পড়ে, অবাক হয়ে ভাবি তিনি কত বড় দূরদ্রষ্টা ছিলেন। নিজের জীবনে দেখে শুনে এবং ঠেকে তাঁর যে জ্ঞান হয়েছিল, সেইগুলোই খুব সহজ সরলভাবে বলতেন। তিনি বলতেন, 'সঙ্গীতের কোন শিক্ষার্থী বা কোন সঙ্গীতজ্ঞ যদি তোমার কাছে কিছু জানতে চায়, নিঃসঙ্কোচে তাঁকে বলবে। আমার জীবনে দেখেছি, সঙ্গীতজ্ঞরা নিজের ঘরের ছেলে মেয়ে ছাড়া অন্যদের শিক্ষা দিতে চায় না।' রামপুর থাকাকালীন তিনি এক উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সাদরা' গানে কি তৈরী তান গাওয়া উচিত।' উত্তরে সেই উস্তাদ বলেছিলেন, 'নিজের ঘরাণার পুত্র এবং ছাত্র ছাড়া আমরা অন্য কাউকে এ সব বলি না।' এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে। তিনি বলতেন, 'কত কষ্ট করে এক একজনের কাছে যা শিক্ষা পেয়েছি তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু এই সব কষ্ট পেয়েছি বলেই আমার ভিক্ষার ঝুলিতে যা সংগ্রহ করেছি যা দিতে কখনও কার্পণ্য করি নি। যাঁর জানবার কৌতূহল তাঁকে না বলা পাপ। তবে একটা কথা মনে রাখবে, কেউ যদি জিজ্ঞাসা না করে, উপযাচক হয়ে কাউকে উপদেশ দিতে যেও না। এ রকম করলে অহঙ্কার বাড়ে। জীবনে বহুলোক দেখবে যাঁরা কেবল পরনিন্দা পরচর্চা করে, তাঁদের সঙ্গে কখনও মিত্রতা করবে না। নিজের দোষ বরাবর দেখবে। পরের দোষ দেখবে না। লোকের মন রেখে কখনও লোকের কথাতে হাঁ বা না করবে না। কোন মতামত প্রকাশ করবার আগে, যে জিনিষ প্রিয় নিজে মনে করবে, সেই হিতকর কথাই বলবে। যাঁরা বয়স্ক, তাঁদের থেকে যদি নিজে অনেক বেশি শিখেও থাক, তা হলেও তাঁদের কটু কথা বলবে না, মিথ্যা কথা বলবে না। যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে নিজেকে বড় বলে জাহির করতে চায়, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিবাদ করবে। মিথ্যার আশ্রয় নেবে না নিজের মতলবের জন্য। সত্যের রাস্তায় চললে যদিও অনেকের বিরাগভাজন হবে তবুও নিজের বিবেক যা বলবে, অপ্রিয় সত্য হলেও বলবে। লোকের মন রাখার জন্য কখনও মিথ্যা স্তুতি করবে না। সত্যের আদর্শে চললে দেখবে মন পরিষ্কার থাকবে। মন পরিষ্কার থাকলেই তো সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। সঙ্গীত অপরংপার। সঙ্গীত নিয়ে কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না। নম্র হয়ে কথা বলবে। যদি সঙ্গীতে কারো কাছে কিছু পাও, তা হলে গুরুর আশীর্বাদ বলে ভক্তি দেখাবে।'

এই ধরনের কত কথাই তিনি বলতেন, ভাবলে বিস্ময় লাগে। তবে বাবা আবার এ কথাও বলতেন, 'যখন বাইরে বাজাতে যাবে তখন নানা অভিজ্ঞতা হবে। আজকাল এই সব কথা শুনলে লোকে হাসবে। বাইরের জগতে গিয়ে দেখবে অন্য রূপ।'

মৈহার থেকে ফিরে আজ পর্যন্ত অনেক দেখলাম, অনেক শিখলাম। যে অভিজ্ঞতা হোল সেটা লেখা দরকার। এক কথায় বলতে গেলে আমি অবাক হয়েছি দেখে, নপুংসকের যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপ দর্শন, সঙ্গীতের বালখিল্যর সাধারণ শিক্ষা পেয়ে মূর্খদের সামনে কি রকম গুরুর মত পুজো পাচ্ছে। অর্থও কামাচ্ছে। ভারতে যাঁর নাম কেউ শোনে নি, তারাও ভেক ধরে পয়সা কামাচ্ছে। আবার এমন কিছু শিল্পী আছে যাঁরা বিনা পয়সায়

বাজালেও লোক সমাগম হয় না। কিছু নামী শিল্পী আছে যাঁরা বিদেশে অদ্ভুত উপায়ে অর্থ উপার্জন করছে। দেখে সত্যিই অবাক হয়েছি। এতো গেল বিদেশের কথা। বর্তমানে ভারতে আত্মাভিমানী শিল্পীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে হেতু তাঁরা গোলে পড়ে হরিবোল বলেন না, তাই তাঁরা এক ঘরে।

বেশ কয়েকটা বড় বড় প্যাঁচার বাসা আছে। এ প্যাঁচা-তন্ত্রে সুদৃষ্টি সম্পন্ন বিদূরের কোন স্থান নেই। আছে ধৃতরাষ্ট্রের স্থান। গোষ্ঠীপতি প্যাঁচার কথায় রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবাভাগেও এই সম্প্রদায়ভুক্তরা সূর্যকে অস্বীকার করেন। এই সরকারী আর অর্দ্ধসরকারী সঙ্গীত উত্তোলক (প্রোমোটার) সংস্থাগুলি সঙ্গীতের উন্নয়ন করছেন, না উৎপাটন করছেন বুঝে পাই না।

এই পেচক সংস্থার একজন একদিন আমাকে বললেন, 'দাদা আপনি কি শিখেছেন সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হোল হাউ ইউ প্লেস ইট।' বুঝলাম মনিহারিকে মনোহরণ করতে বলছে। কিন্তু আমি যে বুঝেছি সেটা বোঝার বোধশক্তি ওঁর নেই। তাই দম দেওয়া পুতুলের মত বলে চলতে থাকল। 'আপনি তো গোঁয়ার গোবিন্দ। যা শিখেছেন হতে পারে সেটা খুব ভাল কিন্তু ভাল দিয়ে কি হবে? যদি না প্রকাশ করবার সুযোগ পান? আর সুযোগ যাঁদের হাতে অর্থাৎ যারা বসে আছে এ্যাকাডেমির শীর্ষে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের নৈবেদ্যের ডগায় তাঁদের যদি মনোরঞ্জন না করতে পারেন, তাহলে বঞ্চিত হবেন। কারণ লোকরঞ্জনের সব মাধ্যমের উপরই এইসব কর্তা ব্যক্তিদের ছত্রাক জন্মে আছে। এঁরা যা যা পছন্দ করে না, আপনি তাই করছেন। দেবেন এঁদের উপদেশ, বলবেন অপ্রিয় কথা, প্রকাশ করবেন বিরুদ্ধ মত, কোন ব্যাপারেই হাঁয়ে হাঁ মেলাতে চান না। স্তুতি করতে বললে বলেন বাপের জন্মে করিনি, তা হলে দাদা আপনার উন্নতি কি করে হবে? এঁদের একজনকে চটাবেন, এঁরা আর একজনের সাহায্যে আপনার ভিটেতে আগুন লাগাবে। আপনি ভাবেন এঁদের শেষ করে দেবেন। ক্ষমা করবেন, কিছু মনে করবেন না, এঁদের শেষ আপনার উস্তাদ করতে পারেন নি।'

বুঝলাম ও উস্তাদ বললেও, আসলে বলতে চেয়েছে, 'আপনার বাবার সাধ্য নাই। বাপ পর্যন্ত তুলল তা ছাড়া এতগুলো কথা বলল, তা হলেও ওকে পাদুকা পুরাণ পাঠ করালাম না, কেন পাঠক ভাবতে পারেন। কারণটা এই যে ঐ দুর্মতিটি একদা আমারই ছাত্র ছিল। এই ছাত্রটির ভবিষ্যৎ কিছু হবে না ভেবেই, এক চালিয়াৎ শিল্পীর কাছে পাঠিয়েছিলাম, যাতে তাঁর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়। ছেলেটি চালিয়াতি করে নিজের ভবিষ্যৎ তৈরী করে নিয়েছে। যে হেতু আমার কাছে কিছু শিখেছিল তাই আমার যশবৃদ্ধি হোক এটা ওঁর কাম্য। যদিও বর্তমানে ও যাঁদের তল্পিবাহক, তাঁদের আমি বলতে গেলে, নর পর্যায়ে ফেলি না।

ছাত্রটি চলে যাবার পর বহুবার ভেবেছি, হয়তো লোকরঞ্জনের সুযোগ হারিয়েছি হয়তো বা ইহলোকও হারালাম। কিন্তু পরলোক আমার কাছে সুরক্ষিত। বাবার একটা কথা সর্বদাই আমার মনে হয়। বাবা বলতেন, 'সত্যের আদর্শে চললে কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে ভণ্ড, কেউ বলবে পণ্ডিত, কেউ বলবে মূর্খ। কেউ তোমাকে বলবে জ্ঞানী, কেউ তোমাকে বলবে নির্বোধ। কিন্তু তুমি কারও কথা শুনবে না। তুমি নিজে যে পথটাকে সত্য বলে মনে করবে, সেই পথটাই স্মরণ করবে। কারো কথা শুনবে না। এরজন্য অনেক ত্যাগ

স্বীকার করতে হবে।' তাঁর কথা আমার কাছে অমূল্য বলেই আমি বিশ্বাস করি। শিল্পীর সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে, সেই সত্যের গৌরব সৃষ্টি নিজেরই মধ্যে। দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাঁকে স্বীকার করে নি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার দরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্য মূল্যের কমতি হয় না।

এটা স্পিডের যুগ। যে যুগে গরজের তাড়ায় দলে দলে অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায়, সে যুগে প্রয়োজনের, প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। আধুনিক এই ত্বরা তাড়িত যুগে, প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতই সঙ্গীতের মধ্যেও ভুরি ভুরি ঢুকে পড়েছে। টাকার জন্যেই যাঁরা বাজায়, তাঁরা বাস করতে আসে না। সমস্যা সমাধানের দরখাস্ত হাতে ধর্ণা দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক, তবুও সে খাঁটি সঙ্গীত নয়। সে দরখাস্তই। তাঁরা বোঝে না যে তাঁদের দাবী মিটলেই তাঁরা অন্তর্দ্ধান হয়ে যাবে।

সৎ সঙ্গীত শিক্ষা মানে, তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সম্যক সমন্বয়। তাই একাধারে লিখে যেমন বাবার এক হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলাম, তেমনি অন্য দিকে পাঠক ছাড়াও যে শ্রোতারা আছেন তাঁদের সামনে বাবার প্রয়োগাত্মক মহত্বকে স্বমর্যাদায় প্রকাশিত করার দায়িত্বও আমার মত ঋজু স্কন্ধের লোকের উপর বর্ত্তাবে তা ভাবি নি।

একাশি, বিরাশি সালে শতবর্ষ পালনের সময় বিপুল অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও যে হেতু বিপুলতর অর্থব্যয় হয়েছিল, এর ধারের বোঝা ঘাড়ে চাপে। ধার সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদ আছে, প্রথমবার করার সময় দ্বিধা থাকে কিন্তু তারপর লজ্জার অবগুণ্ঠন খুলে যায়। তাই এতে বোঝা থাকা সত্ত্বেও, আবার বাবার স্মৃতি উৎসব পালন করার উদ্‌যোগ শুরু করলাম। এবার স্থান কোলকাতা, শীতের শেষে কলামন্দিরে।

আমার বাজনাও হোল। তবলায় ছিল কিষণ। পুরো ব্যাপারটা সসম্মানে উত্তীর্ণ হোল, বিশেষ করে ঋণ হয়নি যদিও অর্থাগম ততটা প্রতুল হয়নি যাতে পূর্ব ঋণ শোধ হয়। ভাবলাম পাট চুকলো। কিন্তু তা তো হবার নয়, কদিন পরে তা বুঝলাম।

কাশীতে এসেই বাজাতে হোল অ্যানা পাভলোভার বাড়ীতে। যদিও তিনি পরলোকে, কিন্তু তাঁর মানস কন্যা ছিলেন। আয়োজনের কারণ শীতে এসেছেন অস্ট্রীয়ার রাজদূত। উদ্যোক্তা আমার বিশিষ্ট বন্ধু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষায় সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ। পুরনো স্মৃতি মনে পড়লো, অ্যানা পাভলোভাকে বাজনা শুনিয়েছিলাম বহু বছর আগে, তখন সঙ্গত করে ছিলেন মৃদঙ্গে অমরনাথ মিশ্র। তিনিও আজ নেই। বাজাবার পর উপহারে পাভলোভা দুহিতা দিলেন, একটা ছবি। উদয়শঙ্করের ট্রুপে গিয়ে বাবা ও পাভলোভার একসাথে তোলা ছবি। সত্যই অমূল্য সম্পদ পেলাম বলে মনে হোল। বাবার সঙ্গে অ্যানা পাভলোভার ছবি।

কিছুদিন পরে আমার এক পরিচিত লোকের কাছে এক বিচিত্র সংবাদ পেলাম। শুনলাম কোলকাতায় বাবার নামে এক উৎসব হয়েছিলো, তাঁর কয়েকদিন আগে নাকি কোন এক তথাকথিত ঐতিহাসিক সঙ্গীত কার্যক্রম হয়েছিলো। যাতে বাবারই এক কৃপাপুষ্ট লোকের সাথে কিষণ বাজায়। কিষণকে আমাদের সেই ঘরের লোকটি বলেছিল, 'এই ঐতিহাসিক

কার্যক্রমের পর কেন তুমি যতীনের সঙ্গে বাজাচ্ছো?' উত্তর ছিলো, 'যদি তিনি কিষণের মত শিল্পীর সাথে বাজাবার পর, প্রশিষ্য তুল্য বাদকের সাথে বাজাতে পারেন, তাহলে উস্তাদ বাবার স্মৃতিবাসরে বাজানোতে দোষ কোথায়।'

এ কথা শুনে আমি অবাক হলেও সত্যাসত্য স্থির করার জন্য কিষণের সাথে যোগাযোগ করলাম। আমার প্রশ্ন শুনে একটু বিব্রত হয়ে কিষণ জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে জানলেন?' যখন বললাম যে শুনেছি যথার্থ লোকের কাছে, আর বিচার না করে কোন ধারণা পোষণ করি না, তখন আম্‌তা আম্‌তা করে স্বীকার করলো কথাটা ঠিক।

অবাক্ হলাম বাবার শিষ্য হয়ে ও বাবার নামে কোন ভাল কাজকে বিরোধ কি করে করেন? বাবাকে হিংসে করে। এঁরা কি মানুষ? এঁদের বিচার চিত্রগুপ্তের দ্বারাই হবে। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই ফল পাবে। হয় একটু আগে বা একটু পরে। তথাপি ঈশ্বরের কাছ এঁদের জন্য সুমতি প্রার্থনা করি।

কিছুদিন পরেই ইউরোপ টুরের আমন্ত্রণ পেলাম। উদ্যোক্তা হোলো ফ্রান্সের 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্রাডিশনাল মিউজিক অফ ইণ্ডিয়া'। ভারত মহোৎসবের জন্য সার্বজনিক প্রোগ্রাম হচ্ছে বলে, ওঁরা কয়েকটা লেকচার কাম ডেমন্সট্রেশন রেখেছে। সেই সঙ্গে বার করবে একটা লং প্লেইং রেকর্ড। এ ছাড়া ইউরোপের আরো কয়েকটা দেশে বাজাতে হবে। সব শেষে সময় থাকলে, হবে একটা ভিডিও ফিল্ম।

যাবার আগে অন্নপূর্ণাদেবীকে চিঠি লিখলাম। চিঠিতে জানালাম আমার ছেলে এম.এ. পড়ছে। সময়ে চলে যাচ্ছে, তাই বিদেশ থেকে ফিরেই ছেলেকে নিয়ে বম্বে গিয়ে গণ্ডা বাঁধাব এবং তাঁর চরণে দিয়ে দেবো।

মাস দুয়েকের দ্রুত লয়ের বিদেশ যাত্রা করে ফিরলাম। অভিজ্ঞতার ঝোলায় প্রচুর নতুন জিনিষ জমা পড়েছে। কিছু অভিজ্ঞতা আগের বারেও হয়েছিল। এবার তার প্রবল পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যেমন নিত্য বিকাশ করে সঙ্গীত বিশ্লেষণ করার প্রচুর আধুনিক উপকরণ। নবীন দৃষ্টিভঙ্গী জানার ইচ্ছা আর উৎসাহ। অপরদিকে আগের থেকেও বিকশিত চাম্চাদের রূপ। এক বীজমন্ত্র সবাই পাঠ করে চলেছে, "একবার এলোমেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই"। আর চলেছে সঙ্গীতের বড় কর্মকাণ্ডের পুরোহিতদের কাছে অল্প শিখে বেশ কিছু আধুনিক সঙ্গীত পুরুৎদের সঙ্গীত যাজনিক ক্রিয়া। এঁরা শুধুই শিখেছে 'সিধা উচ্ছুগুর মন্ত্র'। বড় সিধা দেখলে বলে, নমঃ গন্ধমাদন পর্বতায় নমঃ! আর তা দেখতে না পেলে বলে, উড়ো খই, গোবিন্দায় নমঃ। আর গুরু শিষ্য মিলে যখন ভক্তের মাথায় হাত বুলোয় তার তো জবাবই নেই।

যাক্, এবার এত নতুন কথা শুনলাম প্যারিসবাসী তবলাবাদক শ্যামল মৈত্রের কাছে। যেহেতু ফ্রান্সে, বিশেষ করে প্যারিসে, সেই একমাত্র তবলাবাদক, তাই সেখানে যে কেউই গাইতে বাজাতে যায় ওর ডাক পড়ে, যদি না সঙ্গতকার সাথে গিয়ে থাকে। শ্যামল বলল, একবার বিদেশে বাজিয়ে যাঁরা স্বদেশে গিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক বলে প্রচার করে, তাঁরা যে বিদেশে কি করে তা শুনলে দেশের লোকের পিলে চম্‌কে যাবে।'

বিদেশ প্রসঙ্গে কয়েকটা বিশেষ ঘটনার কথা লিখেই যবনিকা টানবো। বিদেশে প্রায় সব জায়গায় সঙ্গীতের উপর লেকচার কাম ডেমনস্ট্রেশন হয়। ভারতের নামী শিল্পীরাও মাঝে মাঝে এতে অংশগ্রহণ করেন।

আমস্ট্রাডাম্-এর রয়েল ইনস্টিটিউট এ আমার বাজনা সহযোগে বক্তৃতা ছিল। প্রথমদিন বাজনা আর দ্বিতীয় দিন সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা চক্র। সঙ্গে রয়েছে শ্যামল মৈত্র। সে প্রচুর ঘুরেছে। অনেক দেশ দেখেছে, দেখেছে মানুষও। কিন্তু চেনা বলতে যা বোঝায় তা এখনও অল্প বয়স বলে পুরো হয় নি।

আবার ঘুরে ফিরে উস্তাদ বাবার কথাই মনে পড়ে। বাবা খানিকটা জোর করেই বলতেন, 'বাবা আমি বাঙ্গাল, লেখা পড়া করি নাই, কিন্তু একটা কথা জীবন দিয়ে শিখেছি, এস্তক দুনিয়ায় দুইটি বস্তু পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান ও বোকা। এঁদের কোন দেশ আর জাতি নাই।'

এদুটি প্রজাতি সম্পর্কে বাবার নিজস্ব পরিভাষা ছিলো। বুদ্ধিমান অর্থে, যাঁরা বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ, লোক ঠকানোর জন্য করে। আর বোকা অর্থে যাঁরা পূর্বোক্তদের ফাঁদে পড়ে।" এখানে এসে উভয় প্রজাতির মনিকাঞ্চন যোগ দেখলাম।

এক প্রবাসী বাঙ্গালী মহিলা যিনি আমাদের ঘরেরই এক স্বয়ম্ভু বিদ্যাধর "বুদ্ধিমানের" ছাত্রী বেশ কিছু শাংকরি বিদ্যা হাসিল করে বসেছেন পাট জমিয়ে। ব্যাপারটা অনেকটা সঙ্গীত বৃক্ষ শূন্যতার নৈরাজ্যে ভ্যারেণ্ডার গাছ।

শ্যামলের সরস উক্তি, "উনি মাল্টি ফেরিয়াস্"। বাজনা শেখান, রান্না শেখান, কেশ বিন্যাস শেখান, এক কথায় জাত শিক্ষক। ভৌতিক "আবরণ থেকে আভরণ" সর্ববিষয় বিশেষজ্ঞ। সরল শ্যামল পূর্ব পরিচয়ের কথা ভেবে ভদ্রমহিলাকে ফোনে বাজনা শুনতে আসার অনুরোধ করল।

কিন্তু তাঁর আসা হোল না, কারণ তাঁর সঙ্গীতগুরু এসেছেন। ভাবলাম, রাবণ লোকটা ভালই ছিলো হয়তো, কিন্তু কপালে জুটেছিলো কালনেমী। সন্ধ্যাবেলায় আরো স্থির বুঝলাম যখন দর্শকের পংক্তিতে কালনেমী প্রেরিত দুটি মারিচ গোত্রের মেষশাবককে দেখলাম। আগমন হেতু বুঝতে পারলাম একটু পরে। যখন ওঁদেরই একজন শ্রোতাদের মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যদি 'চারতাল' কী সওয়ারি তে একটা গৎ বাজান, ধন্য হবো।'

আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সরল অনুরোধ। কিন্তু আকাশে ওড়া ঘুড়ির লাটাইটা কার হাতে, বুঝতে দেরী হোল না। তাই যথাসম্ভব বিরক্তি গলাঃদ্ধকরণ করে বলতে হোল, 'চারতাল' কী সওয়ারী বলে কোন তালই নেই। কেউ যদি প্রাচীন ভারতীয় তাল ১১ মাত্রার শেখর তালকে নামকরণ করে বলে এটাই চারতাল কী সওয়ারী, সে কথা স্বতন্ত্র। তাই একটু রূঢ় হয়েই বলেছিলাম, 'ইউ মে কল ইট্ আমস্টের্ডম্ তাল, ইনস্টেড্ অফ কলিং ইট্ চার তাল কি সওয়ারি। ইট হার্ডলি ম্যাটার্স, হাউ ইউ কল্ বাট্ আই রিগ্রেট টু সে দ্যাট এ্যান্ ইণ্ডিয়ান মিউজিসয়ন্ হ্যাভ বিন্ চিটিং দি গ্লোবল মিউজিক লাভার্স, সেইং ইট্ ইজ্ এ্যান ওল্ড তাল। দি অভিয়াস রেজল্ট ইজ্ ইন্ ফ্রন্ট অফ ইউ্।'

ছেলেটার কণ্ঠটা বার কয়েক ওঠা নাবা করলো। করুণা হোল ছেলেটাকে দেখে, রামের

সঙ্গে সমরে রাবণ নিজে না এসে খরভূষণকে পাঠিয়েছে? যাই হোক্ ওঁদের সাধ পূর্ণ করলাম। দুঃখ এই যে ওঁরা ছন্দে হাতে তালি দেওয়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু সেটা হাতের তালি না হয়ে হাততালি হচ্ছিল।

বিদেশে বহু পোগ্রাম আমি বাতিল করেছিল কারণ আমার মন সাড়া দেয় নি। বাবার একটা কথা আমার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। বাবা বলতেন, 'সঙ্গীতকে কখনো মানুষের কাছে খাটো করো না। তাতে না তোমার মঙ্গল হবে, আর না সঙ্গীত বা দেশের হবে।'

সঙ্গীতকে পেতে গেলে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। বাজনা শেখা বা বাজাবার আগেই যদি অর্থের স্বপ্ন দেখতে থাকি তাহলে ভক্তি আর সাধনা শেষ, শুধুই থাকবে নাইট্ ক্লাবে হোক্ আর ন্যুড ক্লাবেই হোক্ বাজাব আর পয়সা পাব। আগে কিছু শিল্পী নিষিদ্ধ পল্লীতেও বাজিয়ে পয়সা কামাতেন আর এখনও বিদেশে তাই দেখছি। প্রফেসানালিজ্‌মের নামে এঁরা পতিতালয় থেকে সৌণ্ডিকালয় পর্যন্ত যেতে দ্বিধা করে না। পয়সা পেলেই হোল।

বাবার বক্তব্য ছিলো, "যতটুকুতে মানুষের পেট ভরে, তার বেশি যে চাইবে সে সঙ্গীতের সেবক নয়, সে পেশাদার চোর বা প্রতারক।" ওঁর মতে আনন্দ ও প্রগলভতা এক বস্তু ছিলো না। অথচ আজকের যুগে লোকে প্রগলভতাকেই আনন্দ ভাবে।

বাবা মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন, 'জমিজমা, টাকাপয়সার পেছনে ছোটো, কত জমি লাগবে তোমার মাজারের (কবরের) জন্য?" বিনা অধ্যয়নে বাবা কি করে যে এসব কথা বলতেন, ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে। মনে হয় এ যেন অনাথপিণ্ডদের ভিক্ষার ঝুলি। এতে সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের অংশ এসে জুটেছে। বহুদর্শীর মাধুকরী যথার্থই সার্থক।

যাক্, এবার একটা নতুন অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে, যা একাধারে যেমন আনন্দ দিয়েছিলো, অন্যদিকে অপরিসীম লজ্জা। ঘটনাটা ঘটেছিলো সুইজারল্যাণ্ডে।

এক বাঙ্গালী পরিবারের অতিথি হয়েছি। সন্ধ্যাবেলা বাজনা। বাজাবার আগে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ এলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে এখানে বহুকাল রয়েছেন। ভারতের যে শিল্পীরাই এখানে এসেছেন তাঁদের সাথে পরিচিত। সকলকেই তুমি বলে সম্বোধন করেন। বললাম, 'তা আমি বাদ কেন?' একগাল হেসে বললেন, 'ভায়া বড় শিল্পীদের ল্যাজ মোটা হয়, কিন্তু তোমার পেটে বিদ্যা আছে, তাই দ্বিধা হচ্ছিল।'

বললাম, 'বিদ্যা তো বিনয় দেয়।' ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই সেকেলে পাঠশালায় পড়েছো। যাক্ কি রাগ বাজাবে যদি একটু বিস্তৃত করে বলে দাও, তাহলে শ্রোতাদের জার্মান ও ফ্রেঞ্চে তর্জমা করে বলে দেব।'

বাজনার সময় আমার রাগ সম্পর্কে সবিস্তারে বললাম।

ঘণ্টা তিনেক বাজাবার পরেও শ্রোতাদের তাগিদায় শুদ্ধ ভৈরবী বাজালাম, যে গৎ বাবা নিজের মেয়ে জাহানারার জন্য তৈরী করেছিলেন। বৃদ্ধভদ্রলোক সজল চোখে আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। হাতদুটো ধরে বললেন, 'এত মর্মভেদী গৎ কখনো শুনিনি।' শ্রদ্ধাবনত হলাম মনে মনে অন্নপূর্ণাদেবীর চরণে। কারণ এ গৎ তাঁর কাছে শেখা।

যাবার সময় বললেন, 'কাল আমার সাথে একটু চা খেতে এসো। সেই ফাঁকে তোমার

লেখা ইংরেজি বইটা নিয়ে কিছু আলোচনা করবো। তোমার ভেতর মানুষ আছে। এ তাবৎ বেশীর ভাগ মাল যা পেয়েছি, সঙ্গীতে জিনিয়াস হলেও ভেতরে মস্ত স্কাউণ্ড্রেল। তাই সঙ্গীতকে ভালবাসলেও সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গ এড়িয়ে চলি।' বাজনার শেষে যেমন সুরের রেশ থাকে তেমনিই কথার শেষে কথার রেশ। ভদ্রলোক চলে যাবার পরেও, ওঁর কথার রেষ কানে বাজে, 'ওঁদের এড়াই কারণ চাকচিক্কের মলাট দিয়ে ওঁরা ব্যক্তিগত জীবনের যে বইটাকে ঢেকে রেখেছে, সেটা না তো শ্রীমৎ ভাগবৎ, আর না বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ। ওটা আসলে ধোপার খাতা। যাতে থাকে শুধু তামামী হিসাব। কত ময়লা কাপড় কাচতে গেছে, কটার দাগ ছেড়েছে, কটা পরিষ্কার হয়েছে, কটা ফেরৎ আসে নি আর বাকী কটায় কৃতকার্যের বিবর্ণ দাগ তোলাই যায় নি। বড় স্থূল, বড় অশ্লীল বলে মনে হয়েছে এরা আমার কাছে। এঁরা ভেতরে এক আর বাইরে এক। এঁদের বাইরেটা খুব সহজ সরল কিন্তু ভেতরটা তীক্ষ্ণ সজাগ, সচেতন স্ব-স্বার্থে।"

পরদিন পৌঁছলাম ওঁর বাড়ী। সকাল নটায় গিয়েছিলাম, কিন্তু কথায় কথায় যে কখন দিনমণি মাঝ আকাশে চলে গিয়েছেন জানতেই পারিনি। এই পুরো সময়টায় আমি কথা বলেছি শতকরা এক বা দুই, বেশীরভাগই ওঁর কথা। ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল সেই অমর আপ্তবাক্য, 'তমশো মা জ্যোতির্গময়ঃ।' মানুষের চিরন্তন প্রার্থনা, আমাকে অজ্ঞান আর অন্ধকার থেকে জ্ঞানের জ্যোতির পথে নিয়ে চল। লিড মী টু দাই হেভেনলি লাইট। কেন এই কাতর প্রার্থনা। সঙ্গীতজ্ঞ মানুষের জীবনের সব থেকে বড় অভিশাপ। তাঁদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই অনন্ত আলোর করুণা ধারায়।

এ কথা কেন মনে এলো, সে কথা বলতে গেলে একটু পেছন দিকে তাকাতে হবে। যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, ঘটনাটা না লিখলে সঙ্গীতের একটা বিরাট ইতিহাস অনুল্লিখিত থেকে যাবে।

আমার খুব ইচ্ছা ছিল, বরং বলা যায় প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। আমার ব্যক্তিগত জীবনের পঞ্জিকায় সেই উত্তম (?) পুরুষটির নাম লিখে রাখি, কিন্তু পক্ককেশ ভদ্রলোকটি আমার আবদারকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'কার বিষয়ে এবং কে বলেছে না জেনে, কি বললাম তাই শুধু জানলেই হবে। উৎস দিয়ে কি প্রয়োজন? সলিলের স্বচ্ছতাটাই কি যথেষ্ট নয়। আর তা ছাড়া উত্তর-মেঘের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি জীবন আকাশে। তাই ফেলে আসা সঙ্গীতের নামের পেছনে চরৈবেতি করার আর সাধ নেই।'

বুঝলাম, খাণ্ডবদহন দেখেছেন এই বৃদ্ধ নিজেকে অদগ্ধ রেখে, কিন্তু বিদগ্ধ করে। বাবা বলতেন, 'মানুষের মধ্যেও হিমালয় আছে। কিন্তু মানুষ গিরিরাজ স্বভাবের হন। সোজা আর মাথা উঁচু করে হাঁটা দেখলেই এঁদের চেনা যায়। এঁদের দেখলে মাথা নীচু কোরো।' আজ আবার একবার মাথা নীচু করলাম।

যাক্ প্রসঙ্গে ফিরি। ভদ্রলোক বললেন, "ভাই তোমার যখন বছর ছয় সাত বয়স এ ঘটনা সে যুগের। তোমার জানার কথা নয় বা সম্ভবও নয়। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'বিদেশী গান

শোনো? বা এই গানটা শুনেছো?' "হোয়েন দ্য গার্ল ইজ্ ইন্ ইওর আর্ম, ইজ্ দ্য গার্ল দ্যাট ইউ লাভ্?" মাথা নেড়ে বললাম, 'শুনিনি।' ভদ্রলোক বললেন, 'বিদেশে এ ব্যাপারটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু ভারতীয় শিষ্টাচারে ব্যাপারটা অপ্রচলিত বা নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতের কয়েকজন নামজাদা শিল্পীকে দেখেছি বিয়ের নাম করে বিদেশী, আবার কখন স্বদেশী মেয়েদের অর্থ আত্মসাৎ করেছে বা সতীত্ব হরণ করেছে। এঁরা আমার কাছে ঠগ্ জোচ্চোর বা প্রফেশানাল লেডি কীলার। সেই সব মেয়েরা যখন বিয়ের প্রস্তাব করেছে, তখনই শিল্পীর উত্তর 'বিয়ে? বিয়ে করে কি হবে? আমাদের বিয়ে, মনের বিয়ে। বিয়ে করে কি হবে? আমরা আদর্শ দম্পতি। নাটুকে সামাজিক বিয়ের কি দরকার? আমাদের আস্থার ভিত্তি প্লুটোনিক্‌লাভ। আমরা সকলের সামনে গর্বের সাথে বলবো, উই আর মেড ফর ইচ্ আদার্স। কেন ছকে বাঁধা রাস্তা ধরতে চাইছো? ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। সামনে এখন অনেক কাজ। অনেক পরিকল্পনা। বোঝোনা কেন? আমার সম্পূর্ণ সত্ত্বটাই ক্রিয়েটিভ্।' এই সব নব্য স্রষ্টাদের জন্য যে মেয়েগুলো ঠকেছে তাঁদের অভিমান অর্থহীন। কারণ বন্ধুত্ব যেখানে লোভের মুখোশ, ত্যাগ যেখানে দ্বিগুণ আত্মসাতের ছল, সেখানে বিশ্বাস আর হৃদয় থাকতেই পারে না। আর তাই হৃদয়হীনের ওপর অভিমান নিরর্থক। ধন্য আদর্শ দাম্পত্য! এরকম স্বর্ণ মৃগ দোলনায় যে কত মেয়েই ঠকেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ হোল শকুনীর মায়াবাদী বেদান্ত। এর ফলে কত যে শয্যশ্যাম কুরুক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে তাঁর খবর কজন রাখে। আমি এমন অনেক বিদেশী মহিলাদের কথা জানি যাঁরা প্রভূত অর্থ একদা ব্যয় করেছিলেন, শিল্পীর শিল্পকর্মকে রূপায়িত করার জন্য। যে হেতু এই সব মহিলারা সহজলভ্যা ছিলেন, তাই শাব্দিক বিবাহই যথেষ্ট ছিল। ধাপ্পার খেলায় বেদবাক্য হোল 'শতম্ বদঃ মা লিখ' বা কর! এত চতুর শিকারী হওয়া সত্ত্বেও একবার এক মার্কামারা বরেণ্য শিল্পীকে ঝামেলায় পড়তে হোল। কন্যাসমা একটি মেয়েকে কুমার সম্ভবা করে ফেলার ফলে এবং মেয়েটার আইনের আশ্রয় নেবার ধমকের ফলে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতেই হোল।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর?' ভদ্রলোক বললেন, 'সবে তো আলাপ করছি, দ্রুত গৎ শোনার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সবে তো বিসমিল্লা করলাম।'

সত্যি বলতে কি আমার তখন দেরী সইছে না। ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'এখন উতলা হলে চলবে না। সবে তো কাহিনী শুরু। এ হোল রসঘন রোমহর্ষক কাহিনী। এতে খুনী আছে আর গোয়েন্দাও আছে। অনেক রকমের শেষ হতে পারে। খুনীকে গোয়েন্দা ধরবে বা পারবে না। বা এও হতে পারে গোয়েন্দা ও খুনী একই ব্যক্তি। তোমার গুরু আলাউদ্দিন খাঁও ভারতীয় শিল্পী ছিলেন। আর আমি যে চরিত্রটার অবতারণা করবো, সেও ভারতীয়, কিন্তু চারিত্রিক পার্থক্যটা যে কত বেশী সেটা বলার জন্যই আমার এই ঘটনা বলার ইচ্ছা। তোমার ইংরাজী বইটায় তোমার গুরু সম্পর্কে পড়েছি। অতীত, সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের শিল্পীদের চরিত্র পঙ্কের ভেতরে, তোমার গুরু, মাত্র কয়েকটা প্রস্ফুটিত কমলদের অন্যতম। তাই বলছি হাতে মিষ্টি নিয়ে বোসো।'

বললাম, 'হাতে মিষ্টি? গল্প শোনার সঙ্গে মিষ্টির কি সম্পর্ক?' ভদ্রলোক রহস্যমান হাসি

হেসে বললেন, 'গল্প যখন শেষ হবে তখন তোমার মুখ কটু তিক্ত হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম হাতে মিষ্টি রাখতে। যদিও আমি যা যা বলছি তার কিছু কিছু তোমার নিশ্চয় জানা আছে। কিন্তু তিক্ততা এড়াতে, তা নিজের বইতে তুমি লেখ নি।'

সবিনয়ে বললাম, 'আপনার কথাটা সত্য। তবে আমার ইংরেজী বইতে অনেক কথা লিখিনি, তার কারণ এমন বহু ঘটনা যা আমার সামনে ঘটেছে, তার বিষয়ে লিখতে গেলে মহাভারত হবে সে আমি দেখেছি। তাই ভাবলাম, লিখলে পাঠকরা ভাববেন, নিজের ঢাক্ পিটিছে।'

উত্তর শুনে ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, 'তাহলে ঝেড়েই কাশি। মিষ্টির দরকারটা তো আমার হবে না। হবে তোমার। শোনো তাহলে আদ্যোপান্ত। সেই চতুর শিকারী শিল্পীর গল্প।'

...এক যে ছিল জাত শিকারী। ভাগ্যচক্রে বৃহস্পতি তুঙ্গে থাকায় সে হোল শিল্পী। এসব হল বহুদিন আগের কথা। তারপর কত কাণ্ডই না ঘটে গেছে পৃথিবীর বুকে। নদীর কতই না জল সাগরে গিয়ে মিশেছে। তার কোন ইয়ত্তা বা হিসাবও নেই।

'শিকারী এলো সঙ্গীতে, সাথে নিয়ে এলো শিকারের ছল ও চাতুরী। যেখানে ছল থাকে, সেখানে তার দোসর পাপও আসে। পাপ এলে আসে বঞ্চনা আর বঞ্চনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হোল পলিটিক্স্।

পলিটিক্স যখন সঙ্গীতে ঢুকলো, তখন পাপের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হয়ে তা মহাপাপ পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সৃষ্টি হোল সঙ্গীতে, নতুন প্রতিষ্ঠান, পার্টি অর্থাৎ পরস্পর পৃষ্ঠ শিহরণ সৃষ্টিকারী মনুষ্যরূপী মৃগ। শুরু হোল উটের বিয়েতে গাধার গান আর একে অপরের সুর আর রূপের প্রশংসা।'

ভদ্রলোকের কথার বাঁধুনির হাত ধরে যখন রূপ কথার পথে হাঁটছিলাম, তখন হঠাৎ ভদ্রলোক এক বেমক্কা প্রশ্ন করে বসলেন, 'তুমি তো দর্শন আর মনোবিজ্ঞান পড়েছো, কিন্তু কখনো কি শুনেছ কোন লোক, নিজের ছাত্র বা সহোদরদের সামনে কোন মহিলার সাথে রতি করেছেন, প্রয়োগাত্মক শিক্ষা দেবার নামে? কখনো কি শুনেছ নিজের সম্পর্কের বোনকে বহু বল্লভ তত্ত্ব বোঝানোর জন্য, তিন ভাই মিলে অনঙ্গ নৈবেদ্য নিবেদন করেছন। এও কি কখনো শুনেছ যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ডুএল এ্যালান্স অর্থাৎ অলিখিত চুক্তি হোল, একে অপরের জৈবিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধনার্থে কচি পাঁঠা পাঁঠী (মনুষ্যরূপে) ধরে আনবে?'

বললাম, 'দাদা ব্যক্তির বা ব্যক্তিগত বিকৃতির অনেক ঘটনাই পড়েছি। যুদ্ধের সময়ে সাময়িক পারভারশন্ও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শান্তির বা সঙ্গীতের পরিবেশে এরকম 'এন্ মাস্' অর্থাৎ গণবিকৃতির বিষয়ে আমার জ্ঞান শূন্যাঙ্কেরও নীচে।'

বললেন, 'আপনি আমার কথা শুনছেন তো? কারণ, 'গাধার কান নাড়ার জন্য, কুকুরের কান খাড়ার জন্য আর মানুষের কান শোনার জন্য।' বুড়োদের উপমা দিয়ে কথা বলার অভ্যাস আছে। কিন্তু এঁর আবার রূপকের প্রতিই ঝোঁক বেশী। বললাম, 'কি শুনবো? শুনছিই তো।'

বললেন, 'আরে না, না, আমার কথা নয়। দেয়ালের আর অতীতের কথা। এত তো দিল্লী,

বম্বে কর, পুরোনো কথা শুনতে পাও না? শোনোনি সেই আত্মহত্যা করে মরে যাওয়া চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালকের বম্বের দিনগুলোর কথা। যাঁর স্ত্রীর একপতি আনুগত্যের জীবনে চন্দ্র বিন্দু লাগিয়ে দিল। গল্প করার সুযোগ নিয়ে সেই বড় ভাই-এর পাঠশালা থেকে কামবিধ্ উপাধি প্রাপ্ত করা ছোট ভাই। ওঁরই মত এক সমব্যথীর কাছে ভদ্রলোককে খেদ প্রকাশ করতে দেখেছি, "আই ওয়াজ এ ভিকটিম ইন ইট।" প্রত্যক্ষদর্শীরা মারা গেলেও ঘটে যাওয়া ঘটনা হারিয়ে যায় না, থাকে ইতিহাস হয়ে। প্রশ্নটা হোল জিজ্ঞাসু ইতিহাসের ছাত্র কজন হয়।'

ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে বললেন, 'সংসারে মানুষের যেমন মহত্বের সীমা নেই তেমনি সীমা নেই নীচতার, দৈন্যের, হীনতার, দুর্বলতার, হিংসা ও দ্বেষের।'

যাবার আগে বললেন, 'বলেছিলাম না মিষ্টি রাখতে হাতে। চেষ্টা কর বৃদ্ধের প্রলাপ ভেবে ভুলে যেতে। বিদায়!' আবার দেখা হবে কি না জানি না, কিন্তু এরকম লোক জীবনে কমই দেখেছি।

মনে মনে ভাবলাম, বৃদ্ধ উন্নতমানের চতুর। বিরাট গড়নের একটা আলাপ বাজাবার পর চলতি একটা ছোট্ট গৎ বাজিয়ে বাজনা শেষ করে বিদায় দিলেন। যা বলার ইচ্ছা ওঁর মনে পুরো মাত্রায় ছিলো, তার ইঙ্গিত মাত্র করেছেন। একবারও পূর্ণমাত্রিক উচ্চারণ করেন নি। কারণটা হয়তো আমার সাথে নতুন পরিচয়, বা বয়সের পার্থক্যটা বেশী ছিলো। তাই হয়তো আসল কটু কথা অব্যক্তই রয়ে গেল।

যাক্, একদিক থেকে, আমার পক্ষে মঙ্গলই হোল। কারণ জলের আওয়াজ শুনে বুঝতে অসুবিধা নেই যে উৎস কোন শিল্পী।

মনে পড়ে গেল ছাত্র জীবনের কথা। তদানিন্তন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের উদাত্ত কণ্ঠে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা, "জীবনের কিছু কথা আছে যা শুধু মনই জানে। মুখ তা উচ্চারণে ভয় পায়। কারণ নিজের কান পাছে শুনে ফেলে সেটা।"

ভদ্রলোকের কথাগুলো বোধহয় সেই পর্যায়ের গোপন। তাই আধ খ্যাঁচড়া গল্প বলার জন্য ওঁকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। থাক না গোপন কথাটি গোপনে। কারণ এটা প্রকাশ হোলে সেই শিল্পী ব্রাদার্স-এর কি, বা কতটা অসম্মান হবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমার চিন্তা যদি এসব প্রকাশ পায়, তাহলে সার্বিক ভাবে প্রত্যেকটি শিল্পী সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা হবে, শিল্পী মাত্রেই তঞ্চক, বিকৃতকামী, ব্যভিচারী এবং নীচ।

মৈহারে থাকাকালীন বাবাকে বলতে শুনেছি, "চরিত্র খারাপ হলে সাত পুরুষ গালাগালি খায়। সংযম না থাকলে যতবড়ই ক্ষমতাবান হও না কেন, হয় সামনে না হয় পেছনে গালাগালি খেতে হবে।" যাক এ প্রকরণের এখানেই ইতি।

ভারতে ফেরার আগে শেষ বাজনা বাজালাম গঙ্গাফাউণ্ডেশনে। বাজনার আগে গঙ্গার ওপর একটা তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হোল। পরিচয় হল বৈজ্ঞানিক এ্যমাডো পিয়ারোর সাথে। ভদ্রলোক ভারত প্রেমী। গত তিন দশকেরও বেশী কাল ধরে ভারতে এসেছেন বহুবার। এঁর প্রসঙ্গ এলো কেন? পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন।

বাজনা শেষ হবার পর ভদ্রলোক এসে পরিচয় করলেন। বললেন পঞ্চান্ন সালে বাবার বাজনা শুনেছেন কোলকাতায় ডোভার লেন কনফারেন্সে। আর আমি যেহেতু বাবার শিষ্য এবং আজকের বাজনা ওঁর ভাল লেগেছে, তাই আমাকে একটা অতি মূল্যবান বস্তু দিতে চান। বললাম, 'জিনিষ পত্রের ওপর আমার লোভ নেই।' উনি বললেন, 'এটা কোন সামান্য জিনিষ নয়, আজ পর্যন্ত কাউকে দিই নি দেখতে বা শুনতে।'

বললেন, পঞ্চান্ন সালে বাবার বাজনা উনি টেপ করেছিলেন, যদিও শুরুর আগেই নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু লোভ সামলাতে না পারায় করে নেন। বাজনা শেষ হবার পর সটাং এক দোভাষীকে সাথে নিয়ে গ্রীণ রুমে পৌঁছলেন বাবার কাছে। ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'মানা সত্ত্বেও টেপ্ করেছেন যদিও কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নেই এর পেছনে।' বাবা পুরো ব্যাপারটা শুনলেন।

এ্যমাডো টেপ্‌টা বাবার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার অপছন্দ হলে, এটাকে রেখে দিতে পারেন। আমি তো শুধু মনের শান্তির জন্য মাঝে মাঝে বাজাব বলে করেছিলাম।' কিছু উপস্থিত বুদ্ধিদাতা বাবাকে বোঝালে, 'মুখে ভাল ভাল কথা বলছে আসলে কামানোর ধান্দা, তাই টেপ্‌টা যেন বাবা ফেরৎ না দেন।' কিন্তু বাবার বক্তব্য হোল, 'ওতো আমাকে এসে নাও বলতে পারতো, না বললে আমি জানতাম কি করে? ও ভাল লোক।' এ্যমাডোকে বললেন, 'আপনি সৎ লোক। তাই এটা আপনার কাছে থাকলে ক্ষতি নেই।' মানুষ বিচারের সহজ সরল পন্থা দেখে এ্যমাডো মুগ্ধ।

এ্যমাডো বললেন, 'হতে পারে এটা সামান্য টেপ্। বাবার অনেক বাজনাই হয়তো আপনি শুনেছেন, কিন্তু এর সাথে জড়িত রয়েছে এক মহান মানুষের, মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও অকপট সরলতা, তাই এটা আমার কাছে অমূল্য।' যাবার সময় এ্যমাডো বললেন, 'আগামী শীতে ভারতে যাবো আর সেই সময় আপনার পাওনা উপহার আপনি পেয়ে যাবেন।'

৮১

ভারতে ফিরেই প্রথমে অন্নপূর্ণাদেবীর সাথে যোগাযোগ করলাম। লিখলাম, বিদেশ যাবার আগেই লিখেছিলাম আমার ছেলে অমিতকে গণ্ডা বেঁধে শেখাতে হবে। সুতরাং দিন, তিথির স্বীকৃতি পত্র পেলেই ছেলেকে নিয়ে বম্বে যাত্রা করবো। কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর পেলাম। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

6.1985

যতিনবাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার লেখা একটা চিঠি পেয়েছিলাম তারপর আর অন্য কোনো চিঠি পাই নি। ফ্রান্সে আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না

আপনার ছেলে আমার কাছে ধ্যানেষ আশীষের মতো ওর দাবী আমার ওপর আছে। তবে যদি সরদ না ছাড়ে তবেই আমি শেখাবো, সরদ ওকে সারা জীবন বাজাতে হবে। আর বেগার খাটতে ভালো লাগে না। মাকে দিয়ে আপনাকে গণ্ডা বাঁধতে হবে। এবং ছেলেকে মার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। খোঁজ নিন মা কোথায় আছেন।

আপনার খবর অনেকদিন না পেয়ে চিন্তায় ছিল্যুম।

মানুষ মানেই কষ্ট্য, মানুষের কষ্ট্য ছাড়া জীবন হয় না। জানি না চিঠি পড়তে পারবেন কিনা অনেক দিন লিখিনি।

আমার শুভেচ্ছা আশির্ব্বাদ আপনি নেবেন।

ইতি—
বৌদি

পুঃ—কি করলেন জানাবেন

চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিলাম। লিখলাম, 'কোলকাতায় না যাবার কারণ তো আপনার কাছে অজানা নয়। মা যদি মৈহারে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই যেতাম ওঁর কাছে গণ্ডা বাঁধাতে। আর এও জানি যে অদ্যাপি আপনি কারো গণ্ডা বাঁধেন নি। কিন্তু আমার জন্য এটা আপনাকে করতেই হবে। আপনার পায়ে ছেলেকে সমর্পণ করে আমি নিস্কৃতি পাব।'

চিঠিটা লেখার পর মনটা আশঙ্কায় ভরে উঠলো। অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে পার্থিব বস্তু কত লোককেই না চাইতে বা পেতে দেখেছি কিন্তু আমি তো সঙ্গীত ছাড়া অন্য কিছু চাইনি যদিও অনেক সময় উনি অনেক কিছুই দিতে চেয়েছেন। এই না নেওয়ার জন্যই বোধহয় আমার প্রতি ওঁর মনে বিশেষ স্নেহ ছিলো। চাওয়ার সাথে পাওয়ার হিসাব সাধারণতঃ মেলে না কিন্তু ওঁর কাছে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পেতে অভ্যস্ত। তাই শঙ্কিত হলাম কারণ এই প্রথম আমার চাওয়া বোধ হয় নাকচ হোল। যদিও শেষ পর্যন্ত আমার আবেদন বিফল হয় নি।

অন্নপূর্ণাদেবী আমার পরিস্থিতিটা বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গেই চিঠির উত্তর পেলাম। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম।

27th, 1985

স্নেহের যতিনবাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি ত জানেন চিঠি লেখা আমার কাছে ভীষণ কষ্টের জিনিষ, আজ কাল করতে করতে কখোন যে বছর পেরিয়ে জায় বুঝতে পারিনা। আশা করি এর জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার ছেলেকে নিয়ে আসুন তখন সামনে বসে কথা হবে। আপনার পাঠানো পত্রিকা পেয়েছি। মাঝে মাঝে চিঠি দেবেন ও উত্তরের আশা না রেখে। ভগবান আপনার সব কষ্ট্য জেন দূর করেন। আমার কাছে বেঁচে থাকাটাই মস্ত্য বড় পরিক্ষা। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আর কি লিখি। ছোটদের স্নেহ ভালোবাসা দেবেন। আপনি আমার স্নেহ ভালবাসা নেবেন

ইতি—
বৌদি

যাক গ্রীণ সিগন্যাল পেলাম। চিঠি দিলাম। ২৯ ডিসেম্বর বম্বে পৌঁছবো এবং পরের দিন গণ্ডা বাঁধা হবে।

যাবার কয়েক দিন আগে বীরভদ্র মিশ্রজী অর্থাৎ মহন্তজীর কাছে এক চমক লাগানো

খবর শুনলাম। শোনামাত্র আমার মনে শনি ক্রিয়া শুরু হোল। কারণ যাঁকে বহুদিন ধরে সম্মুখ সমরে আশা করেছিলাম এবার তাকে পাচ্ছি, হাতের মুঠোয়। ভাবলাম এ কর্ণ বধটা অর্জুনের হাতে না হয়ে যদি অভিমন্যু করকমলেষু হয় তাহলে অসাধারণ হবে।

ব্যাপারটা হোল ভারতীয় এক স্বঘোষিত জগদগুরু বহুদিন ধরে কাশীতে আসছেন, এবং যতবারই আসেন সঙ্কটমোচন যান। বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজের এক গুরুভাই-এর সাহায্য নিতেন তিনি, কারণ মহন্তজী পরিবারের সাথে সেই গুরুভাই-এর আত্মীয়বৎ যোগাযোগ ছিল।

যে হেতু সুদীর্ঘ দিন ধরে মন্দিরে আসেন সেই শিল্পী, তাই একটি গরীব ছাত্রদের কল্যাণকল্পে নির্মিত শিক্ষায়তনের কল্যাণ করে যদি একবার নিঃশুল্ক বাজান এমন অনুরোধ করলেন মহন্তজী। অতীতের সুবিধার কথা আর ভবিষ্যতের ব্যবস্থার কথা মনে রেখে শিল্পীর নর্মসহচরী বুদ্ধি দিলেন দিয়ে দাও কথা। ভাবটা হোল বচনে কিম্ দরিদ্রতা। তা ছাড়া বেনারসের জনজীবনে বীরভদ্রজীর প্রভাব সেই শিল্পীও খুব ভাল করেই বোঝেন।

ঠিক হোল, রাবণ অবসর সময় পেলেই স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করবে। গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেল। শুধু এলো না অবসর। মহন্তজীও আত্মসম্মানের বিস্মৃতির মাধ্যমে ভুলে যেতে চাইলেন বৃথা অঙ্গীকারকে। কিন্তু কালের ভবি তো ভোলে না। তাই কালের তাগিদায় মহান শিল্পীকে পঁচাশী সালে অর্থাৎ দীর্ঘ সাত বছর পর খবর পাঠাতে হোল মহন্তজীর কাছে, যে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা এই যে এবার ধ্রুপদ সম্মেলনে বাজাবেন। যদিও সাধারণতঃ যে সময়ে সম্মেলন হয়ে থাকে সে সময় হোলে তাঁকে বিদেশে চলে যেতে হবে, তাই একটা বিশেষ অধিবেশন করা যদি সম্ভব হয়। শিল্পীর সুবিধার কথা মনে রেখে দিন স্থির হোল আঠারোই ফেব্রুয়ারী।

যখন মহন্তজী আমাকে খবরটা বললেন, আমি বললাম, 'ঠেকেছে।' মহন্তজী রীতিমত চমকে বললেন, 'কার কি ঠেকেছে?' বললাম, 'স্বার্থের চরে নৌকো ঠেকেছে। আপনি তো ওকে চেনেন না, আমি চিনি। নিশ্চয়ই আপনার কাছে কোন কাজ পড়বে নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে, আর তাই এই মাখামাখির চেষ্টা।' মহন্তজী বললেন, 'আমার কাছে আবার কি কাজ পড়তে পারে?' বললাম, 'এও তো হতে পারে, আপনার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যে প্রভাব আছে সেটাকে এন্‌ক্যাশ করে একটা অনারারী ডি.লিট হাতাবার তালে আছে। শুধু ডি. লিট্ই বা কেন, হয়তো দেখবেন কোন দিন তদ্‌বিরের জোরে পার্লামেন্টের ফাটক পার করে ঢুকে পড়বে।' মহন্তজী তখন তো হেসেছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকার করেছিলেন আমি দ্রষ্টা। আমি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

রাত আটটায় প্রোগ্রাম হবে তাই আগে একটা কিছু রাখলে ভাল হয়, মহন্তজীর এ কথা বলা মাত্র আমার মাথার পোকা নড়ে উঠলো। বললাম, 'আপনার ছেলে বিভূতির বাজনা আগে রাখুন।' মহন্তজী বললেন, 'ভাল কথা, যদি আপনি উপযুক্ত মনে করেন।'

ছেলেকে নিয়ে বম্বে যাত্রা করলাম বিশে ডিসেম্বর।

বম্বে পৌঁছে সোজা গেলাম অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে। ছেলেকে নামিয়ে দিলাম হোটেলে। তারপর সোজা পৌঁছলাম অন্নপূর্ণাদেবীর ফ্লাটে। বললাম, 'ছেলেকে নিয়ে এসেছি। আগে

কাল একবার শুনুন তারপর যোগ্য মনে করলে শেখাবেন।' অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'আসামাত্র মারমুখী কেন? বলেছি তো শেখাব। শুধু একটাই কিন্তু করছিলাম তা হোল নিজে গণ্ডা বাঁধা, কারণ এ তাবৎ মা'র কাছেই সকলে গণ্ডা বেঁধে আসে, আমি আজ পর্যন্ত কাউকে গণ্ডা বাঁধিনি। আপনার অনুরোধের চাপে আমার নিয়ম ভঙ্গ করতে হোল। তাই বলছি, শেখাব যখন বলেছি, গণ্ডা বেঁধেই শেখাব। কাল ছেলেকে নিয়ে সকাল এগারোটায় আসুন।' বললাম, 'কাল ছেলেকে কিছু না খাইয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে নিয়ে আসবো।'

অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'কিছু খেয়ে যান!' মৈহার ছাড়ার পরে এটাই আমার গুরুগৃহ, বিশেষতঃ বাবা মারা যাবার পর, তাই এখানে আসলে প্রথম দিনে এখানেই খেয়ে থাকি। কিন্তু আজ ব্যতিক্রম করে বললাম, 'খেয়ে এসেছি।' বিকেল পাঁচটায় ওঁর স্নান, সন্ধ্যা বন্দনার সময়। আমার খাওয়া মানেই ওঁর দেরী। তাই শুধু চা খাব।

চা খেতে খেতেই রুশী এলো। ওকে দেখে ভাল লাগে। যে হিপ্‌নসিস এবং সেল্‌ফ ওয়ারনেস-এর মত কঠিন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, তাঁর কথা ও জীবন কত সরল। অল্পক্ষণ কথা বলেই উঠতে হোল, কারণ এখানে কি হোল জানার উৎকণ্ঠায়, ওদিকে ছেলে ব্যস্ত হচ্ছে।

পরের দিন মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদী বন্ধন সূত্র, মালা এবং ফুল নিয়ে ছেলেকে সঙ্গে করে অন্নপূর্ণাদেবীর ফ্লাটে পৌঁছলাম বেলা এগারোটায়। ছেলে প্রণাম করা মাত্র বললেন, 'যাও প্রথমে (উস্তাদ বাবার) ছবিতে মালা দিয়ে প্রণাম করে এসো।' তারপর বিধিমত গণ্ডা বাঁধলেন। বললেন, 'কি শিখেছ বাজাও তো!'

ছেলে শুদ্ধ ভৈরবীতে আলাপ, জোড় এবং ঝালা বাজাল। অন্নপূর্ণাদেবী বললেন, 'গৎ বজাও। রুশীকে বললেন, তবলায় ঠেকা দিয়ে যেতে। বিলম্বিত গৎ বাজানর পর যেই দ্রুত গৎ শুরু করল হঠাৎ অন্নপূর্ণাদেবী একটা আটচল্লিশ মাত্রার তেহাই গেয়ে বললেন, 'বাজাও তো।' ছেলে অমিত প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল, বারদুই শোনার পর বলল, 'বাজাচ্ছি।' তেহাই ওঁর গলায় শুনে ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। যাক বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর তেহাইটা ওঠালো। অমিতের বারবার বাজানো দেখে উনি বললেন, 'তোলো! আমি একটু রান্না সেরে আসি।'

যখন ঠিকমত উঠেছে তখন এসে বললেন, 'দেখলে তো বাবা, বাজালে হতে পারে। আমি কখন কারো গণ্ডা বাঁধিনি। এই প্রথম তোমাকে বাঁধলাম তোমার বাবার কথায়। ঠিকমত সাধনা করলে নিশ্চয়ই কিছু হবে, তবে অহঙ্কার, দম্ভ, মদ ও নারী থেকে সাবধান থাকবে। এই লাইনে যখন চারিদিকে বাজাবে তখন এই বদ দোষগুলো থেকে নিজেকে বাঁচাবে। হয়তো হোতে পারো লাখপতি বা কোটিপতি যদি ভাগ্যে থাকে, আবার এও হতে পারে যে টাকার মুখই দেখতে পেলে না। তবে ঠিক মত যদি সাধনা করে যেতে পার ভগবানের দয়া নিশ্চয়ই পাবে। সকলেই কি আর সব কিছু পায়? যদি অল্পও পাও তা নিয়ে বিলাপ কোরো না। এক মনে সাধনা করলে দেখবে শ্রম ব্যর্থ যায় না। বিদেশে নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু মনে যদি স্থায়ী বসবাসের বাসনা থাকে তবে শেখাব না।'

অমিত সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ও সব আমার হবে না।' শুনে বললেন, 'না হলেই ভাল, কিন্তু

সাধারণতঃ দেখা যায় একটু ওপরে উঠলেই এই সব বদ্‌গুণ আসে আর তার পতন হতেও দেরী লাগে না। উপস্থিত বাইরে বাজাবে না।'

অমিত হঠাৎ ওঁর পা ধরে বলল, 'আমি আপনার কাছে শুরু থেকে শিক্ষা করব।' অমিতের কথা শুনে অন্নপূর্ণাদেবী হেসে বললেন আমাকে, 'আপনার ছেলের ভিতরে একটা নিষ্পাপ সরল ভাব রয়েছে। এটা সচরাচর দেখা যায় না।'

অমিতকে বললেন, 'তোমার লয় ও বিডার অঙ্গে বাজনা তো ভালো, তবে এখনো অনেক শিখতে হবে।' ছেলেকে বললাম, 'ফুলে ফেঁপে যেও না ওঁর কথা শুনে। কারণ এও এক পরীক্ষা।'

আমার কথা শুনে অন্নপূর্ণাদেবী হেসে ফেললেন। বললেন, 'একটা কথা চিরকাল মনে রেখো। এই গণ্ডা বন্ধন অত্যন্ত পবিত্র প্রাচীন প্রথা এবং পদ্ধতি। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। গুরুরা যে সিদ্ধি লাভ করতেন, তাঁর সেই জ্ঞানকে গণ্ডা বেঁধে শিষ্যকে দেবার জন্য অঙ্গীকৃত হতেন। এই ভাবেই সত্যের পথে চলমান পথিকের যাত্রা নিরবচ্ছিন্ন থাকত। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ছিলো অব্যবসায়িক। এর জন্য দেশ জোড়া প্রচার চলতো না শিষ্য দোহনের।' মনে মনে বলি, আমার ধারণাও ওঁর সঙ্গে মিলছে, বর্তমানে এক শ্রেণীর অসাধু লোক নিজেদের প্রবঞ্চক রূপকে গুরু বস্ত্রে আবৃত করে শিষ্য লুণ্ঠন চালাচ্ছে। যাঁর যত বড় মায়াবী রূপ তাঁর লোভ তত বড়। এক শিল্পী তো আবার হীরের আংটি না নিয়ে গণ্ডাই বাঁধেন না। এরকম গুরুদের পাল্লায় পড়ে শিষ্যরা তো কিছু শিখতেই পারেন না শুধু নাস্তানাবুদ হয়। গুরুরাই যখন অধ্যাত্মশূন্য তো শিষ্যরা কেনই বা অসাধু হবে না। একটু বিরতির পর ছেলেকে বললেন, 'সৎ পথে চলবে। আমি বাবার কাছ থেকে যে অমূল্য সম্পদ পেয়েছি, তোমাকে আমি যা জানি সব কিছুই শেখাব, তবে এ আয়ত্ত করতে গেলে কঠিন সাধনা করতে হবে।'' কথাগুলো বলে অন্নপূর্ণাদেবী সকলকে খেতে ডাকলেন।

খেতে বসে আজ আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম, মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা বা আদর্শের চাইতে জন্মগত সংস্কার অনেক প্রবল ও শক্তিশালী। এর গভীরতা অনেক বেশী ব্যাপক।

খাবার পরেই ছেলে বাজনা নিয়ে বসল। আমি যাত্রা করলাম হোটেলে, কারণ বাজাতে হবে রাতে। পথে আসতে আসতে ভাবছিলাম গণ্ডা বাঁধা নিয়ে কত রকমই দেখলাম এ জীবনে। প্রায় চার দশকে কত রূপই দেখলাম। লিখে রেখে যাই, কারণ আগামী প্রজন্মের কাছে এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মূল্যবান এবং জ্ঞাতব্য বিষয়।

মৈহারে আমার গণ্ডা বন্ধন সম্পর্কে আগেই লিখেছি। মৈহার ছাড়ার তিরিশ বছর পর, কতই না গণ্ডা বন্ধন দেখলাম। হাজারো পদ্ধতি বদলাচ্ছে। নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। ব্যাপারটা ভাবতেই অবাক লাগছে। আগেও দেখেছি বেশ কিছু গুরু গণ্ডা বাঁধার আগে ছাত্রদের কাছে থেকে বিরাট অঙ্ক দাবী করতেন। এ যুগেও তাই, শুধু একটু প্রকারান্তর ঘটেছে। হয়তো বা ভবিষ্যতেও থাকবে। শুধু দোহন পদ্ধরি ঢং বদলাবে। এর মধ্যে আমার দেখা ব্যতিক্রম হলেন বাবা ও অন্নপূর্ণাদেবী। আজকের যুগে এঁরা হলেন বিরল ব্যতিক্রম।

গণ্ডা বন্ধন পদ্ধতিটি অত্যন্ত প্রাচীন। ধর্মীয় গুরুরা যেমন কানে মন্ত্র দেন এবং তার জন্য

একটা বিরাট অঙ্কও খরচা হয়ে থাকে, তেমনি সঙ্গীতের গুরুরা শিষ্যের হাতে রঙিন সুতো বেঁধে শিক্ষা শুরু করান। দেয় প্রকরণটা প্রায় একই পর্যায়ের।

মৈহারে যাবার আগে কাশীতে আমার পাশের বাড়ীর বীরু মহারাজকে দেখেছি। নামমাত্র অর্থে গণ্ডা বাঁধতে। যদিও সে সময় অন্যান্য উস্তাদরা অর্থ ভিত্তিক গণ্ডা বাঁধতেন। মৈহারে গিয়ে দেখলাম অন্য জগৎ। আবার সে জগৎ থেকে বেরিয়ে অন্য আর এক জগৎ দেখলাম।

যে কথা বলছিলাম, গণ্ডা বন্ধন একটা অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতি। এই পবিত্র সংস্কারের আজকের রূপ দেখে মনে পড়ে একটা প্রথার কথা। বাংলা কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শতাধিক বিবাহ করতেন। স্ত্রীকে মনে রাখার ব্যাপারটা থাকতো খাতায় লেখা, উদ্দেশ্য থাকতো বাৎসরিক আদায় করা।

বর্তমানে গুরুদের গণ্ডা বন্ধন তো পালা-পার্বণের মত। লোকজনের ভিড় জড়ো করে ফটো তুলে গুরু শিষ্য পরস্পরকে মিষ্টি খাইয়ে এক অতি নাটকীয় ব্যাপার।

কথায় বলে শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। যেমন গুরু তাঁর তেমনি চেলা। আজীবন শেখে অন্যের কাছে, তারপর বড় গুরুর আই. সি. এস. মোহর মারায় গুরুর ও শেখাবার দায় নেই। আর শিষ্য ও গুরুর একটা বড় ছবি টাঙিয়ে সঙ্গীত শেখানোর মনিহারী দোকান খুলে বসে। মাঝে মাঝে দক্ষিণা পাঠাতে হয়। এ যেন লুঠের বখেরা।

কিছু গুরু আছেন যাঁদের দোহন পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন। এঁরা 'ক্যাশে' না নিয়ে 'কাইণ্ডে' চালান। অর্থাৎ 'ধন সে সেবা নহী তো তন্ সে সেবা করো।' কিন্তু কেউই চায় না মন সে "সঙ্গীত কী সেবা"। এ যেন "গতানুগতিঙ্ক লোকে কিম্ লোকে পরমার্থিকঃ"।

বাবা যে কত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তা আজ যখন লিখতে শুরু করেছি তখনই বুঝলাম। একটা নয় অনেক কথাই বাবা ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিলেন তা আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি।

স্থির করেছি আমার লেখার সমাপ্তি করব তাড়াতাড়ি। তাই বাবার কি স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্নের পরিণতি কোথায় দাঁড়িয়েছে, সেই সব প্রসঙ্গই লিখে যবনিকা টানব।

বাবা কিছু দেখতে চেয়েছিলেন, অথচ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। কিছু জিনিষ যা তিনি দেখেন নি, তা ভগবানের পরম আশীর্বাদ। যদি তিনি তা দেখতেন তাহলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল করতেন। যদিও বাবার মনের জোর ছিল অসাধারণ, কিন্তু মনের ভিতর কত কোমল ছিলেন, তা মনে হয় তাঁর সঙ্গে যাঁরা বসবাস করেছেন তাঁরাই একমাত্র জানেন।

আমার সামনে উপস্থিত বিরাট সমস্যা, কোথা দিয়ে শুরু করব এবং কোথায় শেষ করব। শুরু তো করতেই হবে তাই সঙ্গীত-এর কথা দিয়েই শুরু করি।

যদিও বাবার সৃষ্টিধর্মিতার বিষয় কিছু লিখতে গেলে একটা সম্পূর্ণ গ্রন্থই রচনা করা যেতে পারে, যা আপাততঃ এখানে সম্ভব নয়। তাই আলাউদ্দিন হিমালয়ের গোমুখ থেকে নিঃসৃত এবং পূর্ণতার নীল সমুদ্রের মিলনের প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত, তাঁর সুর-গঙ্গার যে প্রসার ও বিস্তার, তার থেকে কয়েক পাত্র জল তোলার চেষ্টা করব। প্রতিপাদ্য বিষয় হবে শুধু এইটুকুকেই প্রমাণিত করা যে সর্বাংশেরই জলধারা স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র।

প্রথম যৌবনে বাবা কি গান বা রাগ রচনা করেছেন এ সম্বন্ধে তাঁর সন্তান-সন্ততির বা ছাত্রদের বিশেষ কোন ধারণা নেই। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস বাবার প্রচুর রচনা ছিল। বাবা যেন সমুদ্র ছিলেন, নিজের গর্ভেই ঝিনুক ছিল আর তাঁর মনটা ছিল স্বাতী নক্ষত্র। নতুন সৃষ্টির আনন্দে পুরোনো মুক্তোগুলো বাবা আঁকড়ে থাকতেন না, ছড়িয়ে দিতেন। যেহেতু অন্নপূর্ণাদেবী ছাড়া সঙ্গীতের দীন আর্তি নিয়ে কোন শিষ্যই আশে পাশে থাকত না, তাই ছোট ডালায় শরতের সব শিউলিকে কুড়ানো সম্ভব হয় নি।

আর যখন আমি মৈহার গেলাম, তখন অনুধাবনের ক্ষমতা থাক বা না থাক, ছিল কাঙালের সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা। আমার মৈহারের কিছু অভিজ্ঞতা আগেই লিখেছি। সুতরাং যে কথা আগে লিখিনি, সে কথাগুলি লিখছি।

এখন বক্তব্য হোল সঙ্গীত অতীতে কি ছিল, বর্তমানে কেমন চলছে এবং ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য একশো বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিন ভাগে ভাগ করছি। অর্থাৎ ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সঙ্গীতের স্থান কি ছিল, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ অর্থাৎ স্বাধীনতার দু'দশক পর্যন্ত সঙ্গীতের স্থান কি ছিল, এবং ১৯৬৭ থেকে বর্তমানে এবং ভবিষ্যৎ ২০০৭ এ সঙ্গীতের স্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখা যাক।

আগেও লিখেছি, আবার লিখছি সঙ্গীতের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। সংক্ষিপ্ত সঙ্গীতের সমীক্ষা করেই বর্তমানের কথা এবং ভবিষ্যৎ-এর কথাই লিখব। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে সঙ্গীত সীমাবদ্ধ ছিল দরবারে এবং বারাঙ্গনাদের মধ্যে। সর্বসাধারণের জন্য সঙ্গীত শোনাও অপরাধের বিষয় ছিল। ভারতবর্ষের রাজার দরবারে একজন সঙ্গীতজ্ঞ থাকতেন। এ ছাড়া বারাঙ্গনাদের শিক্ষা দিয়ে অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞ নিজের ভরণপোষণ করতেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক জমিদার নিজের কাছে কিছু সঙ্গীতজ্ঞদের রাখতেন। সেই সময় গুরু শিষ্য পরম্পরাই ছিল সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যম। ১৯০১ থেকে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য আবদুল করিম খাঁ, বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর, মৌলাবক্স ইত্যাদি অনেকেই স্কুল করেছেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্য। পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর ১৯০১ সনে লাহোরে গান্ধর্ব বিদ্যালয় খোলেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় এর পূর্বে প্রথম ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বরোদার স্টেট মিউজিসিয়ান মৌলাবক্স, বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড়ের উৎসাহে একটি স্কুলের স্থাপনা করেন এবং একটি পুস্তকও লেখেন। এরপর ১৮৮৯ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়া সঙ্গীতের জন্য আন্দোলন করেন ও সঙ্গীত সংস্থা স্থাপন করেন। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়ার ছাত্র পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর ১৮৭২ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সঙ্গীতের শিক্ষা দিলেও, আগেই বলেছি ১৯০১ এ লাহোরে বিদ্যালয় খোলেন। ১৯০৮ এ বম্বেতে গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় খোলেন যাঁর উদঘাটন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য করেছিলেন। এরপর ১৮৬০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী সঙ্গীত শাস্ত্রকার হিসাবে সম্মানিত হন। এরপর ভাতখণ্ডেজী বরোদাতে ১৯১৮ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। মাধব সঙ্গীত বিদ্যালয় নাম দিয়ে গোওয়ালিয়রেও একটি বিদ্যালয়ের উদঘাটন করেন। ভাতখণ্ডেজীই

প্রথম ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২৪ এবং ১৯২৫ পর্যন্ত বরাবর সঙ্গীত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা, রাগের মতভেদ ইত্যাদি নিয়ে সেমিনার করেন সেই ১৯১৬ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ভারতের নানা প্রান্তে, যেমন বরোদা, দিল্লী, কাশী, লক্ষ্ণৌতে। বরোদার মহারাজ সয়াজীরাও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর শিক্ষা পদ্ধতি দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজের বরোদার শিক্ষালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত করেছিলেন। এরপর ১৯২৬ সনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ঠাকুর নবাব আল, এবং বলী বন্ধুর সহযোগে মরিস কলেজ (যার বর্তমান নাম ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ) স্থাপনা করেন। কোলকাতার ঠাকুর পরিবার প্রভাবিত হয়েছিলেন শিক্ষা পদ্ধতির উপর। যাইহোক ভাতখণ্ডেজী ১৯২৬ সনে সরকারী অনুদানে প্রথম লক্ষ্ণৌতে কলেজ স্থাপনা করেন। তাঁর প্রমুখ নির্দেশক হোল ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজানকার।

এর মধ্যে উস্তাদ আবদুল করিম খাঁন ১৮৭২ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষার প্রচেষ্টা করেন এবং ১৯১০ এর ১০ই মে বেলগাঁওতে আর্য সঙ্গীত বিদ্যালয়ের স্থাপনা করেন এবং পরে পুনাতে এটি স্থানান্তরিত করেন। ১৯১৪ সনে 'সঙ্গীত বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুলেরও স্থাপনা করেন। যদিও এরই মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য স্বর্গীয় ভাতখণ্ডেজী ১৯২৬ সনে লক্ষ্ণৌতে কলেজ খুলে ভারতে একটি আদর্শ স্থাপনা করলেন। যা পূর্বে কল্পনার বাইরে ছিল, স্কুলের মাধ্যমে ভাতখণ্ডেজী নূতন পথ দেখালেন। অর্থাৎ স্কুলের পাঠক্রমের জন্য মহিলাদের সঙ্গীত একটা ঐচ্ছিক বিষয় হোল। এর ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোল। সঙ্গীতের কনফারেন্স এবং রেডিওর মাধ্যমে সর্বসাধারণ সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্ত হোল।

সময় নিজের গতিতে চলে, এর মধ্যে রাজাদের রাজত্ব গেল। রাজাদের সময় যে সব সভা গায়ক ছিলেন, ভারত সরকার মাসিক বেতন হিসাবে সেই সব সঙ্গীতজ্ঞকে টাকার মঞ্জুরি দিলেন। ১৯৪৭ পর্যন্ত সঙ্গীতের একটা স্থান ছিল। গুরুশিষ্য পরম্পরার যুগ ছিল। আবার স্কুল কলেজের পাঠ্য বিষয় হওয়াতে অনেক সঙ্গীতজ্ঞদের জীবন ধারণের যেমন উপায় হোল তেমনি সঙ্গীতের প্রচার বাড়তে লাগল।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সালটা সঙ্গীতের জন্য যেমন ভাল, তেমনি সঙ্গীতের মধ্যে রাজনীতি ঢুকল। রাজনীতি আগেও ছিল কিন্তু তাতে নোংরামী ছিল না। উস্তাদ বাবার কথা এখনও কানে বাজে, 'পরমার্থকে পাবার রাস্তা হোল সঙ্গীত। কিন্তু এখন কেবল পার্টি পার্টি।' বাবার কথাটা মৈহার ছাড়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

যাক যা বলছিলাম, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত যেমন সঙ্গীতের বিকাশ হয়েছে ভারতবর্ষে এবং বিশ্বের দরবারে, তেমনি পতনের দিকেও মোড় নিয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত, একটা পালা বদলের পালা বললে অতিরঞ্জিত বলা হবে না। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত পালা বদল হোল। বর্তমানে এই পালা বদলের ভুল কার? ত্রুটি এই প্রজন্মের নিজের মধ্যেই। এই প্রজন্ম বুদ্ধিমত্তায় আর বিদ্যাবত্তায় অনেক ক্ষমতা আয়ত্ত করে ফেলেছে। তবে তার মাশুল জোগাতে একটা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তা হোল, ভালবাসার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা দিনের দিন দেউলের খাতায় নাম লিখেছে। তাই তাঁদের

মধ্যে জন্ম নিচ্ছে ক্ষুদ্রতা, তিক্ততা, নীচতা আর বিদ্বেষ। ভালবাসার সঞ্চয়হীন দেউলে হয়ে যাওয়া এই প্রজন্ম তাই সঞ্চয় করে চলেছে বিদ্বেষ আর বিষের পুঁজি। নিজেরা ভালবাসতে পরে না, জানেও না। শিল্পীদের মধ্যে আজ দেখা যাচ্ছে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা।

অতীত আর বর্তমানের কথা বলতে গেলে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বরাবরই একটা যোগাযোগ আছে। Reality বদলাচ্ছে বলেই Situation বদলাচ্ছে। দশ বৎসর আগে যা সত্য ছিল, এখন তা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে।

আসলে সঙ্গীতের ইতিহাস যিনি লেখেন, তাঁর কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ধর্তব্য হয়ে ওঠে। তাঁর উপাদানের উৎস খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা, কোন লেখকের বই। এখন কথা হোল এগুলি কতখানি নির্ভরযোগ্য? সঙ্গীতের সংবাদদাতারা নিছক ঘটনা তথা বাস্তবের কথা লেখেন না, তার উপরে একটা নান্দনিক রংও চাপান। উদ্দেশ্য থাকে 'মা ব্রুয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম্', কিন্তু অর্বাচীনতাকে বহুক্ষেত্রে বাঁচানোর জন্য কথা সরিৎ সাগরের সাহায্য নেওয়া হয়। ফলে সঙ্গীতের রসের বিচার থেকে অনেক বেশী হয় মদিরার বর্ণনা। আসলে ইতিহাস লেখকরা দূরে বসে প্রতীয়মান বাস্তবকেই লক্ষ্য করেন। প্রকৃত বাস্তবকে জানতে হোলে ঘটনার মধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু ঘটনার মধ্যে থাকারও একটা ব্যাপার আছে। এই উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে যাঁরা একটুও থাকেন তাঁরা যখন বর্ণনা করেন, তখন তিনিও ভাষার নিজস্ব নিয়মের অধীন হয়ে পড়েন তো বটেই, উপরন্তু মানুষের সাধারণ স্বভাব বশে তিনি তাঁর কীর্তির রঙ চড়ান।

উপরোক্ত লিখবার একমাত্র কারণ উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত নানা লেখকের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় লেখা পড়বার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য হয়েছে। সে বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করবার জন্য একটা সমীক্ষা করা যাক্।

সাঁইত্রিশ বছরে বাবার জীবনী, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সমালোচনা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে, মাসিক পত্রিকায় নানা ভাষায় বেরিয়েছে। বাবার প্রথম জীবনী লিখেছিলেন রামগোপালপুরের (মৈমনসিং), জমিদার হরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরি। তিনি ইংরাজিতে 'The Musicians of India' বইটি ছাপিয়েছিলেন ৩.১০.১৯২৯ সনে। এর পর বাংলা ১৩৩৮ সন থেকে ১৩৬৮ পর্যন্ত কোলকাতা থেকে মাসিক সঙ্গীত-পত্রিকা 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'তে বাবার সম্বন্ধে বিদেশ থেকে লেখা নানা চিঠি, বাবার রচনা এবং সফর নিয়ে অনেক কিছুই বেরিয়েছিল। এক কথায় ১৩৩৮ থেকে ১৩৬৮ পর্যন্ত বাবার সম্বন্ধে অনেক কিছুই বেরিয়েছে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর পর্যন্ত যা বেরিয়েছে তার মধ্যে তর্ক বিতর্কের বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না।

উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে ভুল তথ্য কোলকাতার এক বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকাতে প্রথম বেরোল ১৯৫১ সনে। কয়েকটা ফটো দিয়ে বাবার দৈনন্দিন জীবন এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী ভুল তথ্যে প্রকাশিত হোল। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম হোল যে রচনাকার সত্যবর্জিত ভাবাবেগের ঠেলায় বাবাকে রূপায়িত করলেন 'Fantdom Musician', সঙ্গীতের 'অরণ্যদেব'। বীররস ছিল, বাৎসল্যের অভাব ছিল না। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অনেকটা মাধুকরি করে ছেড়েছিলেন। ফলে বাবাকে প্রচুর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। সকলেই গানের ঝরণাতলায়

স্নান করতে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। বাবার গৃহস্থ জীবন 'ডকে' উঠার দাখিল। বিশদ বিবরণ আগেই উল্লেখ করেছি। শুধু এই নয়, বেশ কিছু লোক বাবাকে দেখেছেন দীর্ঘ বা অল্পকালের জন্য, কিন্তু তাঁরা যখন ক্ষীণ স্বাস্থ্য-স্মৃতির রোমন্থন করেন, তখন সেই জাবরকাটায় প্রচুর আত্মনেপদী লালা মিশে যায়। তার ফলে সেটিও সত্য ঘটনার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়। আর কিছু লোক যাঁদের নিজের জন্মদাতা পিতা ভিন্ন অন্য কোন বাবার সঙ্গে পরিচয় হয় নি, তাঁরাও শ্রুতি নির্ভরশীল হয়ে অর্থাৎ কানে কানে কানাকানি করে বাবার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেন। সেটা দাঁড়ায় অনেকটা অন্ধের হস্তি-জ্ঞানের মত। লেজ ধরলে হাতিটা দড়ির মত, কান ধরলে হাতিটা কুলোর মত, আর দাঁত ধরলে হাতিটা মুলোর ম'তো। এঁদের কাছে হাতিটা কখনও হাতির ম'তো নয়।

আর একটা ব্যাপার যেটা অনেকটা Global Phenomena অর্থাৎ সার্বভৌম ঘটনা, সেটা হোল বড় মানুষের সাথে নিজের নামটাকে জড়িয়ে 'ইগো' অর্থাৎ অহংকে চরিতার্থ করা। এটাতে স্বজন দুর্জনের পার্থক্য একই। বাবার বহু তথাকথিত স্বজনদের এই অন্যায় করতে বা সইতে তাঁরা ভুলে যান রবীন্দ্রনাথের বহুপ্রচলিত দুটি পংক্তি—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তাঁরে তৃণ সম দহে।'

যাক, যে কথা বলছিলাম। সঙ্গীতের স্থান বর্তমানে এক কথায় ভয়াবহ। সঙ্গীত বলতে আমি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কথা বলছি। ভারতের প্রাক্-স্বাধীনতা কালে সঙ্গীতের স্থান আগেই বলেছি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ এর মধ্যে সঙ্গীতের প্রচার নিশ্চয়ই বেড়েছে কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ভারতে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে কিছু শিক্ষার কেন্দ্র—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ লেখাপড়ায় যেমন ডিপ্লোমা-ডিগ্রি আছে, সেই রকম সঙ্গীতেও ডিগ্রির জন্য বেশ কিছু সাধারণ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হোল। যদিও ১৯২৬ সন থেকে ভাতখণ্ডেজীর মরিস কলেজ লক্ষ্ণৌ থেকে ডিগ্রি দেওয়া হ'তো। কিন্তু সে সময় লক্ষ্ণৌর কলেজে গুণী সঙ্গীতজ্ঞ শিক্ষা দিতেন। সেই সময় ভারতবর্ষে এত ভাতখণ্ডে কলেজের শাখা ছিল না। কিন্তু আরও দুইটি সঙ্গীতের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হোল। একটি হোল 'প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি এলাহাবাদ' এবং দ্বিতীয়টি হোল বম্বে এবং দিল্লীতে 'গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়'। ব্যবসার ক্ষেত্রে এলাহাবাদের প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি বর্তমানে উত্তর ভারতের প্রতিটি জায়গায় সেন্টার খুলেছে। যার ফলে কিছু সঙ্গীতজ্ঞদের জীবিকার রাস্তা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতকেও কবর খুঁড়ে শুইয়ে দিয়েছে।

পূর্বেই লিখেছি, পুনরায় লিখছি সঙ্গীতের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। ভাতখণ্ডে কলেজ লক্ষ্ণৌতে কবে খুলেছে, তার অধ্যাপকরা কে কে ছিলেন, প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি কোন সনে এলাহাবাদে স্থাপনা হোল, গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের ভারতবর্ষে কত শাখা, এ সব লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। হয়ত এই বিষয়ে বহু ব্যক্তি থিসিস লিখে ডক্টরেট করে নিয়ে নামের আগে ডাক্তার উপাধি লিখবে।

অনেকে হয়ত ভাববেন উস্তাদ বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে, এই সব আবোল তাবোল লিখবার কি প্রয়োজন। প্রয়োজন একটু আছে বলেই এই গৌরচন্দ্রিকা করতে হোল। কারণ

উস্তাদ বাবাও লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে পরীক্ষা নিতে যেতেন। আমার মৈহার যাবার আগের থেকেই যেতেন এবং আমার থাকাকালীনও ১৯৫৪ পর্যন্ত গেছেন। ১৯৫৫ থেকে যাওয়া বন্ধ হতেও দেখেছি। এই পরীক্ষার ব্যাপারে বাবার কাছে যা শুনেছি সেই কথাই লিখব।

লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে বাবা পরীক্ষা নিয়ে আসার পরই বলতেন, 'এই শেষ জীবনে কত পাপ করছি। কত ছাত্র ছাত্রী প্রতি বছর ডিগ্রি নিচ্ছে সঙ্গীতের, কিন্তু কত অন্ধকারে তাঁদের রাখা হচ্ছে।' বাবার বিবেক বাধা দিতো কিন্তু ডাক্তার রতনজানকারের অনুরোধেই এই পরীক্ষা নিতে যেতেন।

বাবা বলতেন, 'যাঁরা তানপুরা বা সেতার এবং বিভিন্ন যন্ত্র মেলাতে পারে না, তাঁরাই সঙ্গীত নিপুণ হয়ে যাচ্ছে প্রতিবছর। এই সব ছাত্রী এবং ছাত্র একদিন কোন স্কুলে এবং কলেজে মাষ্টারি করবে। যে নিজে যন্ত্রই মেলাতে পারে না, সে আবার কি শিক্ষা দেবে?' মনে মনে বিরক্ত হলেও ডাক্তার রতনদানকারজীর অনুরোধ অস্বীকার করতে পারতেন না। তবে বাবার মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। পরীক্ষকের আসনে বসলেও বাবাকে যখন নম্বর দেবার জন্য রতনজানকারজী অনুরোধ করতেন, তখন বাবা সবিনয়ে বলতেন, 'এ পাপ আমাকে দিয়ে করাবেন না।' পরীক্ষক থাকতেন তিনজন। কিন্তু বাবাকেই চূড়ান্ত মত দেবার জন্য অনুরোধ করা হ'তো। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলতেন, 'এই সব ছেলেমেয়েদের জেনে শুনে জীবনটা নষ্ট মন করতে চায় না। একটা 'রাগ' জীবনে ঠিক মত করতে কত বছর লেগে যায়। অথচ এখানে প্রথম বছরে এত 'রাগ' থাকলে কোন ছাত্রের পক্ষেই ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না।'

ডাক্তার রতনজানকারজী বলতেন যে এ কথা তিনিও উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই পরীক্ষার ফলে সঙ্গীতের রুচি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলতেন, 'ঠিক আছে আপনারা যা ভাল বোঝেন করেন। তবে যত ইচ্ছে নম্বর আপনারা লিখে দেন, আমি সই করে দেব। এই নিয়ম বরাবরই চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে।

১৯৫৪ সালে বাবা গেলেন পরীক্ষা নিতে লক্ষ্ণৌ। কয়েকদিন পরে ফিরে এলেন মৈহারে। মৈহারে ফিরে আসবার পরের দিনই সকালে আমাকে বললেন, 'আর এ পাপ কাজ করবো না। এই আমার শেষ পরীক্ষা নিতে যাওয়া। আর ভবিষ্যৎ এ যাবো না।'

আমি নীরব শ্রোতা। জানি বাবা নিজের থেকেই বলবেন। বুঝলাম কিছু হয়েছে। কিছু পরেই বাবা বললেন, 'যে গায়ক গায়িকা সুরই বোঝে না, তাদের কোর্সে পঞ্চাশটি রাগ আছে। কাউর ভাল না করতে পারলেও কাউকে বিপথে জেনে শুনে গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। এতে পাপ হয়।'

হঠাৎ বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো যে জিনিস বিবেক চায় না অথচ লোকের কথায়, সামান্য পাথেয় খরচা নিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করা উচিত কি না?'

বাবার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে বিরাট সমস্যা। উত্তর দিলেও বিপদ, আবার না দিলেও বিপদ। বেশী যদি কিছু বলি সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলতেন, 'হায় হায় তুমি কত বড় মূর্খ পণ্ডিত!' আর যদি উত্তর না দিই তা হলে বলবেন, 'এর উত্তরও দিতে পারো না, কেমন লেখাপড়া করেছো? নিশ্চয়ই টুকে পাশ করেছ?'

সেই জন্য বাবা যখনই আমাকে কোন প্রশ্ন করেছেন, চিরকালই হাত জোড় করে বলেছি, 'যদি অনুমতি করেন তাহলে বলি।' এ কথায় কিন্তু বাবা খুশীই হতেন কিন্তু বাইরে কখনও প্রকাশ করেন নি।

যাক যা বলছিলাম, বাবা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে জিনিস বিবেক চায় না, স্বার্থের খাতিরে করা উচিত কিনা?'

সবিনয়ে হাত জোড় করে বললাম, 'যদি অনুমতি করেন তাহলে বলি।'

সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আরে আরে এর মধ্যে অনুমতির কি আছে? যা সত্য তা বলবে।'

উত্তরে বললাম, 'সংসার অভিজ্ঞ লোকের নির্দেশ সবাই যদি মেনে চলত তাহলে এই দুনিয়ায় ইতিহাসটা অন্য রকম ভাবে লেখা হ'তো। তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, বুদ্ধদেব রাজসিংহাসনে বসতেন, সুভাষ বোস আই. সি. এস. চাকরিতে পেনসন নিতেন, এ রকম অনেক আছে। কিন্তু যাঁরা সত্যের পূজারী তাঁরা মিথ্যা বা টাকার হাতছানিতে ভোলে না। তাই যাঁরা সত্যের পূজারী তাঁরা নিজের বিবেককেই প্রাধান্য দেয়।

বাবা হঠাৎ বললেন, 'ভাল কথা বলেছ। আচ্ছা বলো তো তুমি হলে কি করতে?'

হাতজোড় করেই বললাম, 'আপনার কাছেই শিখেছি, আত্মসম্মানের থেকে বেশী কোন কিছুই আমার কাম্য নয়। আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করাকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি।'

আমার কথা শুনে বাবা খুশী হয়ে হা হা করে হেসে বললেন, 'এ তো বেশ ভালো কথা বলেছ। কিন্তু সঙ্গীতের মধ্যে এইরকম ভাল কথা অর্থাৎ রস পৈদা করতে পার না কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম, একেবারে চুপ! কিছুক্ষণ পরে বাবা বললেন, 'সঙ্গীতের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে, এর পরিণাম কি? সে কথা কেউ ভাবে না। বলবার সময় সব বড় বড় কথা বলবে, অথচ কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ঠিক তোমার মতো, লেখাপড়ায় পণ্ডিত আর সঙ্গীতে মহামূর্খ।' এ কথা বহুবার বাবার কাছে শুনেছি তাই চুপ করে রইলাম।

বাবা কিছুক্ষণ গড়গড়ায় তামাক টানলেন, তারপর বললেন, 'লক্ষ্ণৌর মরিস কলেজে গিয়ে অনেক পাপ করেছি আর পাপ করব না। পরের বছর থেকে আর পরীক্ষা নিতে যাব না।'

বাবা আবার গড়গড়ায় তামাক খেতে লাগলেন। বুঝলাম বরফ গলছে। লক্ষ্ণৌতে কি ব্যাপার হয়েছে এইবারে প্রকাশ পাবে।

কিন্তু বাবা যে এবারে লক্ষ্ণৌতে এরকম কাণ্ড করে বসবেন তা কল্পনাও করতে পারি নি। সেই কথাই বলি।

বাবা বললেন, 'সঙ্গীত নিপুণ' পদবী নেবার জন্য যন্ত্রেতে যে পরীক্ষা দিচ্ছে, তিন সুরের একটা পালটা মীড়ে বাজাতে পারে না। তাই রতনজানকারকে বললাম, 'এঁদের কি পরীক্ষা নেই? বরঞ্চ প্রত্যেক শিক্ষককে ডাকুন, সেই শিক্ষকেরা পরীক্ষাতে বসুক! যাঁরা সেই পরীক্ষায় পাশ করবে, তাঁদেরই অধিকার থাকবে এই সব ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া। যাঁরা যন্ত্রই মেলাতে পারে না, তাঁরা সঙ্গীত নিপুণ হচ্ছে, পরে একটা স্কুলের অধ্যাপক হবে। এই সব অধ্যাপকদের হাতে পড়ে নূতন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কি হবে? এই শিক্ষা পদ্ধতিতে কেবল

ডিগ্রি পাবে, ডক্টরেট হবে, আর সঙ্গীতও রসাতলে যাবে। সঙ্গীত হোল গুরুমুখী বিদ্যা। কলেজে কেবল থিওরী শিখবে? শ্রুতি কাকে বলে? আরে বাবা শ্রুতির নাম জানলেই শ্রুতি বোঝা যায়? সাকারাত্মক 'র' কেমন তা কি কোনো বইতে পাওয়া যাবে, গুরুর কাঝে বার বার শুনে তবে আয়ত্ত করতে হবে। অবশ্য থিওরী জানা ভাল, জ্ঞান বাড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় 'নিপুণ' হয়ে যদি আরো কয়েক বছর গুরুর কাছে শেখে, তবে কিছুটা সঙ্গীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। আজকাল লিখে সকলেই ডক্টরেট হচ্ছে, তাকে কি লাভ? বাজনায় কি রকম ভাবে টোকা দিলে গোল আওয়াজ বেরোবে, যন্ত্রের মধ্যে কোন তার লাগালে ভাল আওয়াজ বেরোবে, এই সব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবে তাঁরাই পাবে সত্য ডক্টরেট। স্পষ্ট বলে এসেছি রতনজনকারকে আর যাব না পরীক্ষা নিতে। বুড়ো বয়সে এ পাপ কার্য আমার দ্বারা হবে না।'

বাবার কথায় বুঝলাম যে এবারে রুদ্ররূপ সকলেই দেখেছে। যদিও পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো পঞ্চান্ন সনে বাবাকে পরীক্ষক হিসাবে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু বাবা যান নি কেননা সেই সময় পূর্ব পাকিস্থানে গিয়েছিলেন। তার পরের বছর যখন আবার পরীক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ এলো, বাবা গম্ভীর হয়ে আমাকে বললেন, 'লিখে দাও, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই এ পাপ কাজ আর করবো না।' অবশ্য আমি পাপ কাজের কথা লিখি নি। আমি লিখে জানিয়েছিলাম যে বার্দ্ধক্যের জন্য বাবার কষ্ট হয়, তাই বাবার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তারপর থেকে বাবা আর পরীক্ষা নিতে যান নি।

যে কথা বাবা বলেছিলেন উনিশশো চুয়ান্ন সনে, সে কথা কত দূরদৃষ্টির পরিচয়, আশা করি উপস্থিত লোকে বুঝলেও তার প্রতিকার কিছু এখনও হয় নি। জানি না কবে হবে?

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সকালবেলায় চার-পাঁচজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এ্যামাডো পিয়ারো বেনারসে আমার কাছে এলেন। এসেই আমার হাতে তুলে দিলেন ডোভারলেনে বাবার বাজানো অনুষ্ঠানের ক্যাসেট। সঙ্গে সঙ্গেই বাজিয়ে সেটা শুনলাম। বাবা বাজিয়েছেন তাঁর স্বরচিত রাগ শুভাবতী এবং তবলায় সঙ্গত করেছেন আল্লারাক্‌খা। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'আপনার দেওয়া এই উপহারটি সত্যই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ।' কি করে যে তিনচার ঘণ্টা কেটে গেল জানি না। তারপর সেই ভদ্রলোকেরা বিদায় নিলেন।

যাক এ প্রসঙ্গ। এখন পূর্ব প্রসঙ্গেই ফিরে যাই।

দেখতে দেখতে আঠারই ফেব্রুয়ারী এসে গেল। মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের নিকট খবর পেলাম একজন নামীদামী শিল্পী, ধ্রুপদ সম্মেলনে তবলার সঙ্গে বাজাবে বলে খবর পাঠিয়েছে। এ যাবৎ ধ্রুপদ সম্মেলনে তবলা সঙ্গত হয় নি। ধ্রুপদ সম্মেলনের সঙ্গতে, ভারতের সব মৃদঙ্গ বাদকই এসেছেন। অতীতে যত ধ্রুপদ গায়ক বা বীণকার বাজাতেন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গতে মৃদঙ্গ বাদকই বাজাতেন। ধ্রুপদ মৃদঙ্গ চিরকালই বেজেছে। বীণ, সুরবাহার এবং রবাবেও মৃদঙ্গের সঙ্গত হ'তো। সুরবাহারে, মৃদঙ্গের সঙ্গত দুই প্রকারে হ'তো। জোড়ের সময় চৌতলাতে কেবল ঠেকা লাগত এবং ঝালাতে সমাপ্তি হ'তো। অনেকে

আবার ঝালাতেই মৃদঙ্গের সঙ্গত করতেন। বীণ এবং রবাবেও, চৌতালা এবং ধামারের গৎ এর সঙ্গে মৃদঙ্গের সঙ্গত হ'তো।

সরোদে যদিও হাফেজ আলি খাঁ সাহেব মৃদঙ্গের সঙ্গে বাজাতেন কিন্তু সেটা কেবল ঝালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উস্তাদ বাবাই প্রথম ব্যতিক্রম এই সঙ্গত-এর ব্যাপারে। চৌতাল, ধামা, সুতাল এবং নানা তালে গৎ এবং ঝালাতে মৃদঙ্গের সঙ্গে একটা নূতন স্টাইল সৃষ্টি করলেন। সুরশৃঙ্গার খুব মিষ্টি যন্ত্র। বাবা কেবল আলাপ, জোড় এবং ঝালাই বাজাতেন। বাবার মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সুরশৃঙ্গার এবং রবাবেরও সমাপ্তি হয়ে গেল। বর্তমান যুগে এখন সুরশৃঙ্গার এবং রবাবের কোন শিল্পী নেই।

এ সব কথা এই জন্য লিখলাম যে এত বড় নামী এবং দামী শিল্পী ধ্রুপদ সম্মেলনে, তবলার সঙ্গে কেন বাজাবেন? এতে ধ্রুপদ সম্মেলনের মান কোথায় থাকবে? এ যাবৎ কোন তবলা বাদককে ধ্রুপদ সম্মেলনে বাজাবার সুযোগ দেওয়া হয় নি। যদিও তবলাতে চৌতাল, ধামার এবং অন্য তাল বাজানো হয়, তবুও প্রাচীন মত অনুসারে ধ্রুপদ মেলায়, তবলাকে স্থান দেওয়া হয় নি। সেই নামী দামী শিল্পী সঙ্কটমোচনে মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রের স্কুলের চ্যারিটিতে বাজাবার স্বীকৃতি দিয়েও বাজায় নি, অথচ নিজের থেকে ধ্রুপদ সম্মেলনে বাজাবার আগ্রহ দেখাল। কিন্তু তখন কে জানত সঙ্কটমোচনের হনুমানজীর কি ইচ্ছা ছিল?

হঠাৎ আঠারো ফেব্রুয়ারী সকালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু অঘটন ঘটে গেল। যাঁর জন্য সকালেই মাইকে ঘোষণা করা হোল একশো চুয়াল্লিশ ধারা, কেবল তাই নয় একেবারে কারফিউ অর্ডার। এত তোড়জোড় সব বিফলে গেল। ধ্রুপদ সম্মেলনের সামিয়ানা কেবল টাঙ্গানই রইল, অথচ ধ্রুপদ মেলা হোল না। হনুমানজীর এমন লীলা, নামী দামী শিল্পীর এত তোড়জোড় সব বিফলে গেল। পরের দিনই নামী দামী শিল্পী নিজের স্থানে প্লেনে চলে গেলেন।

মার্চ মাসে ছয় সাত আট শিবরাত্রির দিন ধ্রুপদ মেলা হোল। এরপর যথারীতি সঙ্কটমোচনের উৎসব আঠাশে এপ্রিল থেকে পয়লা মে পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে হোল।

নামী দামী শিল্পীর কথা আগেই বলেছি। যে হেতু সঙ্কটমোচনের জলসায় প্রায় দশ বারো হাজার শ্রোতা থাকে সেই জন্য চতুর শিল্পী নিজের স্থান করবার জন্য বিশেষ ধ্রুপদ মেলায় বাজাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু বিধি বাম। যদিও ধ্রুপদ মেলায় বাজনা হোল না, সঙ্কটমোচনের বার্ষিক সর্বভারতীয় জলসায় নিজের কয়েকজন ছাত্রকে বাজাবার জন্য মহন্ত বীরভদ্র মিশ্রকে অনুরোধ করলো। এর কারণ আর কিছুই নয়, ছাত্ররা বাজালে গুরুর নাম করবে, তাতেও নিজের নাম প্রচার হবে। কিন্তু সত্যিকারের গুরু হওয়া কি অত সোজা? তাঁকে অনেক ত্যাগ করতে হয়, তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তুমি কিছু না করেই মাথায় উঠতে চেয়েছিলে? প্রকৃত পক্ষে কিছু না শিখিয়েই, নাম মাত্র শিখিয়েই গুরু সাজতে চায় আজকাল গুরুরা। মনে মনে ভাবে এই সব ছাত্র দ্বারাই সম্মান বাড়বে। কিন্তু তাঁরা বোঝে না এইসব ছাত্ররাই গুরু নিন্দা করে।

আজকের দিনে ছাত্ররা গুরুর নিন্দা করে এবং কিছুটা শিক্ষার পরই কার্যসিদ্ধির কথা

চিন্তা করে। তাই আজকের দিনে যেমন গুরু তেমন চেলা। আগে কখনও এই প্রকার গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ছিলো না। যাক এ প্রসঙ্গ। এবার অন্য কথায় আসা যাক।

৮২

যে কথা আগে লিখেছি বাবার বিষয়ে ভুল বহু তথ্য ১৯৫১ সনে কোলকাতার এক বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশ পায়। ১৯৮০ সনে একজন সঙ্গীতবিদ নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে নিজেকে তানসেনের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করে একটা বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের মধ্যেও বাবার সম্বন্ধে কিছু ভুল তথ্য ছিল। এর পর ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত বাবার সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা কোলকাতার কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এত বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হোল যা পড়ে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ১৯৭৯ সনে যখন আমি ইংরেজীতে 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এনড হিজ মিউজিক' গ্রন্থ প্রকাশিত করি তারপর থেকে ভারতের বিশেষ করে বিদেশ এবং উত্তর ভারতের বহু ছাত্র ছাত্রী বাবার বিষয়ে ডক্টরেট করবার জন্য আমার কাছে এসেছে। এতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

কিন্তু যখন ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত নানা ভুল তথ্য কোলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হোল, সেই সময় আমার মনে হোল এইসব লেখাই অদূর ভবিষ্যৎ এ প্রামাণ্য পঞ্জী হয়ে দাঁড়াবে। যাঁরা আজ থেকে কুড়ি বছর পরে উস্তাদ বাবার সম্বন্ধে রিসার্চ করবে, তাঁরা এই ভুল তথ্যকেই সত্য বলে গ্রহণ করবে। বাবার এতো সব ছাত্ররা আছে, যাঁরা বাবার নাম ভাঙ্গিয়ে নাম করেছে, অথচ সকলেই নির্বিকার। তাঁদের মতে, কে এই সব লেখা পড়ে? এর উত্তর কি দেবো? আমার কেবল অবাক হবারই পালা। কি দেখলাম? নিজের আখের গুছোবার জন্য এমন হীন কাজ নাই, যা করতে পারে না। মিথ্যা কথা বলতে মুখে একটু বাধে না।

আমার ধারণা ছিল বাবার নিজের লোক এবং ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করবে কিন্তু যখন দেখলাম কেউ উচ্চবাচ্য করছে না, তখনও অপেক্ষা করে থেকেছি, দেখি না কার দৌড় কত দূর? কিন্তু ১৯৮৬ সনের তিরিশে এপ্রিলে ইংরেজী একটা মাসিক পত্রিকায় একটা লেখা পড়ে নিজেকে সামলাতে পারলাম না, কেননা সে লেখাটা লিখেছে আমাদের ঘরেরই একজন।

এই সব ভুল তথ্য পড়ে হঠাৎ আমার মনে হোল এঁর প্রতিবাদ পত্রিকায় করে কোন লাভ নেই, কেননা পত্রিকা আমার কথা ছাপবে না। এ ছাড়া যদি পত্রিকায় ছাপায়ও তাহলেও বইএর আকারে এই সব ভুল তথ্যের বেরোবার সম্ভাবনা রয়ে গেল, কেননা কোন একটি সংখ্যা প্রমাণিত প্রতিবাদ, কতজনের আর নজরে পড়বে? ১৯৮৬র ১লা জুন আমি বই লেখার সঙ্কল্প করে লেখা শুরু করে দিই। ১৯৮৬র ৩০শে এপ্রিল ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় ওই ভুল আমাকে বাধ্য করল হাতের যন্ত্র কয়েক দিনের জন্য নামিয়ে কলম তুলে নিতে গুরু কর্তৃক সত্য প্রকাশের আদেশানুযায়ী।

এই বই লিখবার যখন পরিকল্পনা করছি তখন আমার কিছু শুভাকাঙ্খীর সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেকেই আমাকে উপদেশ দিয়েছে সত্যি কথা বলা ভাল, কিন্তু সময় বিশেষে সত্যি বলা ক্ষতিকর হতে পারে। যদিও জানি শাস্ত্রে আছে, 'শতং বদঃ মা লিখঃ' কিন্তু কি করব?

বাবারই তো 'বুড়ো বয়সের ছেলে' আমি, যা মনে আসে স্পষ্ট বলে দিই। বাছ বিচার করি না। এর জন্য অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়েছি কিন্তু মনে স্বস্তি পেয়েছি।

একজন আমার বই লেখার সঙ্কল্প এবং কিছু অংশ শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ সব লিখে কি লাভ? কেবল শত্রু বাড়ানো!' হেসে জবাব দিয়েছিলাম, এটা আমার মৃত্যুর অভিসারের প্রেমিক।' উত্তরে বলেছিলেন, 'জেনে শুনে মৃত্যু দূতকে ডেকে আনার কি দরকার?' এর উত্তরেও সহজ ভাবেই বলেছিলাম, 'গুরুর আশীর্বাদ সহায় থাকলে মৃত্যুদূতকে ভয় করব কেন?'

সময় কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। যাঁদের প্রতিবাদ করার প্রয়োজন ছিলো, তাঁরা চুপ করে বসে আছে। প্রতিবাদ না করে কি তাঁদের সম্মান বাড়ছে? যাঁরা আমাকে লিখতে বারণ করে তাঁদের তো আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বাবার বংশধরদের প্রত্যেকেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অথচ প্রত্যেকেই আমাকে বলে, এ সব লিখে কি লাভ? লাভ লোকসানের কথা জীবনে কোনদিনই ভাবিনি, মন যা চায় তা করেছি।

ভাবতেও অবাক লাগে কোলকাতার প্রাচীন নামী একটি মাসিক পত্রিকায় কি করে এত বড় মিথ্যা সংবাদ ছাপা হোল উস্তাদ বাবার বিষয়ে। অবাক আরও লাগে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কি কোনো দায়িত্ব নেই? এখানেও সেই বাবার ভাষায় পার্টি, পার্টি। এ না হলে দুদিনের বৈরাগী হয়ে ভাতেরে কয় অন্ন। সাংবাদিকতায় যাঁর হাতে খড়ি হয়েছে কয়েক বছর মাত্র, সে কোন এক অর্বাচীনের কাছে যা শুনেছে, নিজের ভাষায় আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছে। এটা কোন নূতন নয়। পূর্বেও হয়েছে এবং পরেও হবে। লোকের মুখে সাংবাদিক যা শুনেছে ভুল তথ্য দিয়ে লিখে দিয়েছে। এবং তাঁদের হাতের লোক যে সাংবাদিকরা এই সব কথা লেখে, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, সরোদে ও সেতারে উস্তাদ বাবা যে নূতন পদ্ধতিটি ধ্রুপদ এবং খেয়ালের মিশ্রণ করে আলাপে, প্রথমে বিলম্বিতে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী আভোগ বাজিয়ে আলাপের ক্রমবিকাশ, মধ্য তান, বোলের তান, ঠোক ঝালা, তারপর ধুয়া, মাঠা, পরমাঠা দিয়ে যে সমাপ্তি, এর প্রবর্তক বাবাই। বাবা যখন প্রথম গুণী সমাজে বাজান তখনকার দিনে বড় যন্ত্রকাররা অবাক হয়ে মাথা নত করতে বাধ্য হতেন যদিও বাইরে প্রকাশ করতেন না। যন্ত্রে, আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে, সকলেই এক একটা কাজের জন্য প্রশংসা পেতেন। যেমন কোন উস্তাদকে বলা হ'তো খুব ভাল আলাপ বাজায়, আবার কোন উস্তাদকে বলা হ'তো খুব তৈরী তান বাজায়, এ ছাড়া অনেককে বলা হ'তো খুব ভাল তৈরী ঝালা বাজায় ইত্যাদি। কিন্তু একটা বিরাট মালা, নানা রংয়ের ফুল দিয়ে বাবা যা তৈরী করেছিলেন, তাঁর সৌন্দর্য কেউ অস্বীকার করতে পারত না। তারপর বাবার হাতে গড়া আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর সারা দেশে বিদেশে যে সঙ্গীতের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। গত পঞ্চাশ বছরে, যে যত বড়ই যন্ত্র বাদক হোন না কেন, যতই তাঁরা নিজের ঘরাণা বলে মিথ্যা দাবী করুন, তাঁরা মনে মনে জানেন এই ঘরাণার নকল না করে উপায় নাই। যাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র ঘরাণা বলে দাবী করেন, তাঁদের পূর্বপুরুষের রেকর্ড শুনলেই বোঝা যায় তাঁরা কি ছিলেন।

বাবা বলতেন, 'ঠিক মত শিক্ষা করে সাধনা করে নিজস্ব একটা সৃষ্টি করতে হবে। আকৃতি দেখলেই বোঝা যাবে তাঁর মধ্যে পিতার ছাপ আছে। তা যদি না থাকে তাহলে বলতে হবে জারজ সন্তান।'

জানি না কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা কারণ বোঝান কাজটা সম্পূর্ণ আমার হাতে নেই। যাঁর বোঝবার সে ঠিকই বুঝবে। যদি বুঝেও না বোঝার ভান করে তাহলে আমি নিরুপায়। সঙ্গীতে বাবার কি অবদান, সংক্ষেপে যথাস্থানে লিখবো শেষে।

হঠাৎ একদিন আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'আপনি কি India Today তে এবারের সংখ্যায় যা বেরিয়েছে, তা কি পড়েছেন?' উত্তরে বললাম, 'পড়ি নি।' সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে ম্যাগাজিনটা দিলেন।

ম্যাগাজিনটা পড়লাম। পড়বার পর হঠাৎ আমার মনে হোল যেন আকাশ থেকে পড়লাম। সেই ১৯৫৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত যে গুঞ্জন, লোকের কাছে উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ১৯৮৬র তিরিশে এপ্রিলের ম্যাগাজিন সেই গুঞ্জনের সমাপ্তি ঘটেছে। বাবার মুখ চেয়ে একজন ১৯৪২ থেকে ১৯৮২র ডিসেম্বর পর্যন্ত, নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করে গেছেন পাছে বাবার গায়ে কাদা না লাগে। ১৯৮২র ডিসেম্বরে যন্ত্রণার শেষ করে দিয়েছিলেন। তিনি হয়ত ভাবতে পারেন নি, নিজের লজ্জা কেউ এরকম ভাবে প্রকাশ করতে পারে। যদি সত্য ব্যাপারটা প্রকাশিত হ'তো, তাহলে দুঃখ ছিল না, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই কাদা ছোঁড়া হোল।

এক মাসের মধ্যে কোলকাতা, এবং কয়েক জায়গায় যেখানেই গিয়েছি সকলেই ম্যাগাজিনের লেখাটি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে।

আগে লিখেছি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত অনেক লেখা ম্যাগাজিন পড়েছি যা আমাকে পীড়া দিয়েছে কিন্তু এবারে ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬-র তিরিশে এপ্রিলের লেখাটি পড়ে স্থির করলাম, না আর চুপ করে থাকা যায় না। আজ থেকে দশ কুড়ি বছর পরে এই লেখা যাঁরা পড়বে, তাঁদের কাছে এটাই তো প্রামাণ্য হয়ে পড়বে।

ওই লেখাটা পড়ে 'ইগো স্যাটিসফ্যাকসান' এবং 'পারভারসান' ছাড়া আর কি বলতে পারি? যা স্বপ্নেও ভাবিনি, তাই হোল।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। India Today-তে Photo Essay বলে একটা নূতন বিভাগে মাঝে মাঝে এক এক শিল্পীর শিল্প এবং জীবন সম্বন্ধেই লেখা হবে। প্রথম কিস্তিতে 'A Lonely Journey' শিরোনামে এক শিল্পী সম্বন্ধে লিখছে। নানা প্রচারমুখী ছবি দিয়ে সর্বশেষে কাশীর অসি ঘাটের কাছে দুটো ফটো দিয়ে ফটো অ্যালবাম শেষ হয়েছে। লেখাটা লিখেছে 'Indarjit Badhwar in Varanasi' সকলেই জানে উত্তরে বরুণা ও অসি নদীর সংমিশ্রণে বারাণসী নামটি হয়েছে। সেই অসি নদীর দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের শেষ দেখছেন, এই ভাবে ছবি ওঠান হয়েছে। নিজের আত্মপরিচয়ে অনেক কিছুই লিখেছেন। কিন্তু আত্মপরিচয় লেখা কি এতই সহজ? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লিখিত 'আত্মপরিচয়ে' লিখেছেন, 'আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকের থাকে আমার তাহা নাই। সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই

জ্ঞানগর্ভ বাণী যদি জানা থাকত, তাহলে বোধহয় দুইবার আত্মপরিচয় লিখে লোকের কাছে হেয় হতেন না।

A Lonely Journey-তে যে জায়গাটি আমাকে পীড়া দিয়েছে, সেই জায়গাটাই উদ্ধৃত করছি—I Have Lived my life like a sailor. I had a marriage and children. But there was never enough time for them. I got divorced and that hurt...Now I am really alone in the true sense of the word, because I have thought that for sometime now I don't to involved...এ ছাড়া এক জায়গায় লিখেছেন—I have an ego, I want to be remembered as one of the best who have his best.

এই লেখাটার ভেতরে অনেকগুলো প্রচারের কলা কৌশল আছে। শিল্পীকে যখন তাঁর স্ত্রী ডিভোর্স করে দিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থাটা এই ছবির মধ্যে যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর কেমন যেন রঙছুট চেহারা হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যই দুঃখের তবু কেমন যেন সহানুভূতি বোধ হোল। মনে হোল জীবনে ভুলের গুরুত্বটা বোধহয় উপলব্ধি করেছে।

মানুষের যত বয়েস বাড়ে ততই সে অতীতে ফিরে যায়। মানুষের ভবিষ্যৎ মুছে যায় বলেই বোধহয় অতীতটা নিয়ে শেষ বয়সে বেশী নাড়াচাড়া করে।

সকলের জীবনেই প্রায় এমন একটা বিপর্যয় ঘটে, যা সারা জীবনে কখনও ভোলা যায় না। সেই ভুলতে না পারার যন্ত্রণা সারা জীবন পীড়া দেয়, সারাজীবন তাঁর পিছু নেয়, সারাজীবন তাঁকে নাড়া দেয়। অবাক হয়ে ভাবি হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ না করে সকলের চোখে ভালই আছে। কিন্তু সত্যই কি ভালো আছে? কি জানি!

'A Lonely Journey'র যেটা পীড়া দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে যদি সত্য কথা প্রকাশ করতেন তাহলে আমার বলার কিছু ছিল না। কিন্তু আত্মচরিত লেখা সহজ নয়। আত্মচরিতের মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নিলে সেটা নিশ্চয়ই দোষনীয়। কোথায় দোষনীয় হয়েছে? শিল্পীর 'A Lonely Journey'র লেখা I got divorced and the hurt পড়ে মনে হোল, চিরকাল সকলেই এ দেখে অভ্যস্ত স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে। কিন্তু স্ত্রী কখনও স্বামীকে ত্যাগ করে নাকি? কেমন যেন উল্টোকথা, অথচ সত্য এটাই! আর আঘাত শিল্পী পান নি, আঘাত তিনিই বরাবর দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বাক্য যেটি আমাকে পীড়া দিয়েছে তা হচ্ছে শিল্পী লিখেছেন, 'I have an ego...'।

সেই শিল্পীর সঙ্গে ১৯৭৮এর পর আজ পর্যন্ত আর দেখা হয় নি।

লোকে কেন ভুলে যায় বুঝি না, অর্জুনের মত বীরও শেষ সময়ে দ্বারকায় দস্যুদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন এবং প্রিয় গুরু কৃষ্ণকেও দেখতে পেলেন না। সুতরাং ইগোর পরিণতি যা হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে। এখন কাল পূর্ণ হয়েছে। প্রস্থানের শুধু দেরী। একজন শিল্পীকে দেখেছি নিজের কার্য উদ্ধার করবার জন্য অনেক অনেক মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে। কত লোককে ঠকাতে হয়েছে, কত লোকের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা

নেই। কেন এই সব করেছে? তার একমাত্র কারণ নাম ও টাকা। অফুরন্ত টাকা এবং নাম পাওয়ার জন্যই এই সব মিথ্যাচরণ করতে হয়েছে তাকে। তার পুরস্কার তো সে পেয়েছে। তবু আরও নাম এবং টাকার জন্য সে এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর এই নেশা কি কোন দিন মিটবে? অথচ এই শিল্পীকেই পরবর্তীকালে একজনকে বলতে শুনেছি, 'আমার ব্যাঙ্কের পাশবইতে অনেক টাকা আছে। গাড়ী, বাড়ী, নাম, যশ পেয়ে সম্রাট হয়েছি। এর জন্য কি কিছু মূল্য দিতে হবে না? তাই জীবনের ব্যালেন্স শীটে ক্রেডিটের পাতাটি শূন্য হয়ে গিয়েছে। জীবনের দিক থেকে একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছি।' জানি না একেই সঙ্গীতের রাজনীতি বলে কিনা। দু হাজার বছর আগে রাজা ভর্ত্তৃহরি বলে গিয়েছিলেন 'বারাঙ্গণেব নৃপমতি অনেক রূপা'। অর্থাৎ রাজনীতি বেশ্যাদের মতো বহুরূপী। খুঁজলে এরকম বহু বহুরূপী এ যুগেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু উপস্থিত যাঁর উপর পূর্বে রাগ, বিতৃষ্ণা হ'তো এখন সেই মানুষটার উপর রাগ কিংবা বিদ্বেষ হয় না। এখন হয় করুণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মপরিচয় লিখেছেন, 'প্রত্যেক শিল্পীর খোরাকি এবং বেতন এই দুই রকমের প্রাপ্য আছে। তাঁরা প্রতিদিনের ক্ষুধা মিটাইবার মত কিছু যশের খোরাকী প্রত্যাশা করিয়া থাকেন—নিতান্তই উপবাসে দিন চলে না। এমন শিল্পীও আছেন তাহাদের আপখোরাকীর বন্দোবস্ত—তাঁহার নিজের আনন্দ হইতে নিজের খোরাক জোগাইয়া থাকেন। গৃহস্থ তাহাদিগকে এক মুঠো মুড়ি মুড়কিও দেয় না। এই তো গেল দিনের খোরাকী—ইহা দিন গেলে জোটে এবং দিনের সঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তার পরে বেতন আছে। কিন্তু সে তো মাস না গেলে দাবী করা যায় না। সেই চিরদিনের প্রাপ্যটা বাঁচিয়া থাকিতেই আদায় করিবার রীতি নাই। এই বেতনটার হিসাব চিত্রগুপ্তের খাতাখানাতেই হইয়া থাকে। সেখানে হিসাবের ভুল প্রায় হয় না।

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতেই যদি আগাম শোধের বন্দোবস্ত হয় তবে সেটাতে বড় সন্দেহ জন্মায়। সংসারে অনেক জিনিষ ফাঁকি দিয়া পাইয়াও সেটা রক্ষা করা চলে। অনেকে পরকে ফাঁকি দিয়া ধনী হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত একেবারে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু যশ জিনিষটাতে সে সুবিধা নাই। উহা সম্বন্ধে তামাদির আইন খাটে না। যে দিন ফাঁকি ধরা পড়িবে সেই দিনই ওটা বাজেয়াপ্ত হইবে। মহাকালের এমন বিধি। অতএব জীবিত কালে শিল্পী যে সম্মান লাভ করে, সেটি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' এক জায়গায় লিখেছেন, 'অহংটাই (ego) পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবী করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই জন্যই তো দুবৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন। এই জন্যই তো মনু বলিয়াছেন, সম্মানকে বিষের মতো জানিবে—অপমানই অমৃত। সম্মান যেখানে লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাঁহার সংস্রব পরিহার করা ভালো।'

রবীন্দ্রনাথ এ কথাও লিখেছেন, 'অমরত্বের তরণীতে স্থান বেশী নাই। এই জন্য বোঝাকে যতই সংহত করিতে পারিব বিনাশের পারের ঘাটে পৌঁছিবার সম্ভাবনা তাই বেশী হইবে। যিনি অমরত্ব রথের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠি, মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না।

'আত্মপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথের অতি মূল্যবান উপদেশ লোকে যদি মনে রাখে তাহলে তাঁর পরিণাম সুখদ হবে বলেই মনে করি।

'আত্মপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে, সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধা ভাজন। যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে।'

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা যদি শিল্পীরা মনে রাখে—মনে হয় তাঁরা বিপথে কখনও যাইবেন না।

তিনি একটি কবিতা লিখে সাবধান করে দিয়েছেন যাঁরা (ego) রোগে ভোগে তাঁদের।—

'আপনারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন মাঝে
তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।'

এই কথা যে মানে সে মানুক, যে মানে না তাঁকে জোর করে মানানোরও দরকার নেই।

কেউ যদি মনে করেন আমি বিশেষ কোনো লোককে দেখতে পারি না বা ঘেন্না করি—তাঁর উত্তরে সবিনয়ে বলব, সবার সব কাজ পছন্দ না করতে পারি, কিন্তু তার জন্য দেখতে না পারা বা ঘেন্নার কথা ওঠে না। এ দার্শনিক তথ্য অবশ্য জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অনুভব করেছি। Ego বা অহঙ্কার সম্বন্ধে বাবাকে বরাবর বলতে শুনেছি, 'ভুলেও কখনও কোনো বিষয়ে অহঙ্কার কোরো না। নিজেকে কখনও সব চেয়ে বড় মনে কোরো না, কেননা তুমি যতই বড় হও, তোমার থেকে একজন বড় ওই উপরওয়ালা আছে কখনও ভুলো না এবং কখনও দম্ভ কোনো জিনিষের কোরো না। কি নিয়ে দম্ভ করবে? যে কোনো শিল্পে মনে করো তুমি মস্ত গায়ক, তোমার গলা বসে গেল, তখন তুমি কি নিয়ে দম্ভ করবে? মনে করো তুমি বড় বাজিয়ে—হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় দুটো হাত ভেঙে গেল, তখন আর বাজাতেই পারবে না, তবে কি নিয়ে দম্ভ করবে?'

একবার এক শিল্পীর বাড়ীতে গীতা ও রামচরিত মানস দেখেছিলাম। এ ছাড়া লোক দেখানো বহু বিষয়ের বই সাজানো দেখেছিলাম। নামেই বই রাখা, কিন্তু বিদ্যা হোল ক্লাস টু। লোকে বই দেখে ভাবে কত বিষয়ে পড়াশোনা করে, কিন্তু আসলে অষ্টরম্ভা। সেই শিল্পীর মত পরশ্রীকাতর এবং অহঙ্কারী আমি খুব কম লোকের মধ্যেই দেখেছি।

একবার সেই শিল্পীকে বলেছিলাম, 'গীতা তো বাড়ীতে দেখছি কিন্তু গীতার মর্ম কিছু বোঝেন?' কথাটা ভাল লাগেনি শিল্পীর। শিল্পী বলেছিল, 'নিজেকে খুব বড় মনে করো? তুমি কি গীতার বোঝ?'

হেসে বলেছিলাম, 'শুনুন, গীতার এক একটা কথার অজস্র অর্থ এবং নানান ব্যাখ্যা। তবে সংক্ষেপে আপনার মঙ্গলের জন্য দুই একটা কথা বলি। গীতাতে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছে, 'মানুষ যদি জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হতে চায়, তার জন্যে কতদিনের মধ্যে

কতটা অভ্যাস সাধনা করলে সিদ্ধি হতে পারে। এর সীমা কতদিন।' কৃষ্ণ উত্তরে, কতদিন, কতমাস অথবা কত বছর সাধনা করলে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতা আসবে বলেন নি। তিনি বলেছেন, 'এর সময়ের কোনো সীমা নাই। তাই লক্ষ্য প্রাপ্তি করবার জন্য নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজের দুর্গুণ সমাপ্ত করবার চেষ্টা করতে হবে। তারপরও স্পর্দ্ধা করে কেউ বলতে পারে না এতদিনে হবে। যে বলে তার অহঙ্কার এবং ধৃষ্টতাই প্রমাণ হয়, যার থেকে বিভ্রান্তি উৎপন্ন হয়।'

শিল্পীর কাছে রামচরিতমানস দেখে বলেছিলাম, 'রামায়ণে বালির অহংকারের জন্য মৃত্যু হয়ছিল এত বীর হয়েও, এটা কি পড়েন নি? বালি দুন্দভি দৈত্যকে মেরে সমাধিস্থ করে নি কিংবা দাহও করেন নি। ইচ্ছা করে ঋষ্যমূক পর্বতে ঋষিদের আশ্রমের কাছে ফেলে দিয়েছিল যাতে লোকে দেখে তার পরাক্রম কতটা। এর ফলে ঋষিদের আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ পেয়েছিল। যদি এই পর্বতে যে মেরেছিল সে যদি আসে তাহলে তার মৃতু হবে। নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল কেবল অহঙ্কার এবং exhibitionism অর্থাৎ প্রদর্শনকারিতার জন্য। যাঁর ভেদ বুদ্ধি অর্থাৎ আমার তোমার, সেই এই ধরনের গর্হিত কাজ করতে পারে। মন্থরার রীতি অনুসারে 'আমার এবং তোমার' ভেদ করায় সংসারে অশান্তি এনে দিলো।'

এখন ১৯৮৬-র তিরিশে এপ্রিল-এর India Today-তে রবিশঙ্করের 'A Lonely Journey' পড়ার পরে আজ যদি সেই শিল্পীর সঙ্গে দেখা হ'তো তাহলে উপরোক্ত কথাগুলোই বলতাম। এই অপ্রিয় সত্য বলবার মধ্যে মুখের চেহারা কি রকম হ'তো তাও জানি। আরো জানি প্রতিবাদ করত না, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'তো। কিন্তু নিজের লোককে স্পষ্ট বলাই তো ভাল। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয় কেননা সে পাট চুকিয়ে দিয়েছি। India Today-তে যে লেখাটা বেরিয়েছে সেই লেখাটা বার করে নিশ্চয়ই ভেবেছে, তাঁর স্ত্রীও হয়ত দেখেছেন। অন্য কোন মহিলা হলে অনেক সত্য কাহিনী প্রকাশ করে দিতো। কিন্তু জানে তাঁর স্ত্রী কখনও প্রতিবাদ করেন নি এবং করবেন না।

আসলে আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েরা জন্মসূত্রে Third person, Singular Number, governed by the prepositons পিতা, then স্বামী, at last পুত্র ও পুত্রবধূ। কিন্তু প্রথম কয়েকটা হলেও পরেরগুলো সবই ব্যতিক্রম অন্ততঃ অন্নপূর্ণাদেবীর ক্ষেত্রে, এবং সেই জন্য আমার চোখে তিনি অনন্যা। আমি তাঁর কাছে শিখেছি বলে এ কথা বলছি না। যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছে, সকলেই এক বাক্যে তাঁকে মহীয়সী নারী বলেই স্বীকার করে। যার জন্য সকলেই প্রায় তাঁকে দিদি কিংবা মা বলেই সম্বোধন করে।

India Today-র লেখাটা পড়ে বহু লোকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। যে কথা আগেও লিখেছি যার জের শুরু হয়েছিল সেই ১৯৫৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত।

সংসারের চারিদিকে কত যে মিথ্যে কথা লেখা আছে তার ঠিক নেই। যাঁরা সত্যের জয়জয়কার করে সেখানেই মিথ্যে নিয়েই সবচেয়ে বেশী কারবার চলে। অথচ এ নিয়ে কেউ প্রতিবাদও করে না। এ নিয়ে আলোচনাও হয় না কোথাও। এই রকম একটা ঘটনার কথা বলি—

India Today-র লেখা বেরোবার কিছুদিন পর কোলকাতা থেকে আমার এক ছাত্রের শ্যালক কাশীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। আমার ছাত্রের শ্যালক, কোলকাতার Excise Department-এর এক সিনিয়ার অফিসার। আমার কাছে এসে একসাইজ অফিসার, এ কথা সে কথার পর হঠাৎ বলল, 'সঙ্গীতের মধ্যে আজকাল কি হচ্ছে বলুন তো?'

প্রশ্ন করলাম, 'কি হচ্ছে?' উত্তরে বলল, 'সঙ্গীতের মধ্যে দুর্গুণের মধ্যে অভিমান যাঁর থাকে, লজ্জা বা সঙ্কোচ থাকে না, উপরন্তু অপরকে কষ্ট দিয়ে যে প্রসন্ন হয়, তাঁকে কপট বলা হয়। কিন্তু দুর্গুণের সহিত যেখানে নম্রতা থাকে তাঁকে রোগী বলা যেতে পারে অর্থাৎ মানসিক রোগী।

আমি বললাম, 'এ সব কথা কেন বলছেন।' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তো সাইকোলজির স্টুডেন্ট ছিলেন! আপনার তো না বোঝার কথা নয়।' কোন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক বললেন, 'এতদিন জানতাম যাঁরা সঙ্গীতের পূজারী, তাঁরা সঙ্গীত ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। অথচ আজকাল দেখছি সঙ্গীতজ্ঞরাও আজ সঙ্গীত ছেড়ে পার্টিবাজি করে এবং এম. পি. হচ্ছে। আগে এই কোলকাতায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে কি শ্রোতাই না দেখেছি অথচ বর্তমানে সঙ্গীত কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। আজকাল গজল, ছায়াছবির গান প্রাধান্য পাচ্ছে, কারণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রোতা সীমিত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণ করতে গেলে কিছুটা গানের তালিম থাকা দরকার। শিক্ষিত কানও চাই। কথা সুন্দর বলেই গজল, আধুনিক গান, সিনেমার গান এত জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতের আসল যে ভীত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, তার ভীতে নাড়া পড়েছে।'

হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, 'প্রকাশের সাফল্যের মধ্যেই রয়েছে, ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তি। আর সব গোলক ধাঁধা। এ না হলে সেতার শিল্পী কেন আজকাল গজল গেয়ে পয়সা উপার্জন করে। প্রখ্যাত সারেঙ্গী শিল্পীকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান, বাজনা শেখাতে দেখেছি। এ সব তো আগে ছিল না। এরকম জগাখিচুড়ি অনেক বলতে পারি যা কিনা আপনিও জানেন। বলুন তো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এটা ভাবার সময় কারো নেই। আপনার সামনে এসব কথা বলছি বলে ক্ষমা করবেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি Oscar Wilde-এর কথায় Advice is bad, good advice is fatal।' সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ক্ষমা করবেন এ সব কথা আপনাকে বলছি না, আপনার কথা অনেক শুনেছি, আমি ভগ্নি এবং ভগ্নিপতির কাছে। এসব সেই সব শিল্পীদের ভেবে বলছি, "They never taste who always drink, they always talk who never think"?

আজ জীবনের শেষে সকলের মুখোমুখি হয়ে কি বলতে পারবে আমি যা করেছি সব ন্যায় করেছি। যা কিছু ভেবেছি সব ঠিক ভেবেছি। আসলে কি জানেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যতটা না ভবিষ্যতের দিকে চায় তার থেকে বেশী চায় অতীতের দিকে। অতীতের দিকে চাইলেও পুরোন কথা মনে পড়ে। অতীত মরে গিয়েও ছাড়ে না। যতদিন বাঁচে ততদিন জ্বালায়। যার ফলে হৃদয়ের রোগ। নানা রকম abnormality পীড়া দেয়।'

হঠাৎ আমার ছাত্রের স্ত্রী এসে নিজের ভাইকে বললেন বাড়ীতে যাবার জন্য। ভদ্রলোক সবিনয় বললেন, 'ক্ষমা করবেন আবেগের মাথায় হয়ত অনেক কথা বলে ফেলেছি। আসলে সঙ্গীতকে খুব ভালবাসি বলেই, তার অনাদর দেখলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়।'

আমার মনে হোল ভারতে সব বড় বড় ডিপার্টমেন্টের অফিসার যদি এই প্রকারে সঙ্গীতপ্রেমী হতেন, তাহলে হয়ত এঁদের সাহায্যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আবার নিজের স্থানে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার একটা কথাই কেবল মনে হোল, বাইরে তো পরিবর্তনের মহা সমারোহ। সেটা চোখে দেখা যাচ্ছে। যেটা দেখা যাচ্ছে না সেটা ভিতরে ভিতরে আঁচড় পড়ছে। তাঁর জ্বালাও আছে যন্ত্রণা আছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই। কিন্তু সেই ভেতরটা মানুষের মনেই। পূর্বজন্মে বিশ্বাস করলে মনে হয়, হয়ত পূর্বজন্ম সত্য। হয়ত মীর্জাফর, উমিচাঁদ, হিটলা, চেঙ্গিস খাঁন এবং নাদির শাহের দলটা পৃথিবীর সব দেশে ভিন্ন নামে জন্ম গ্রহণ করে গেছে। সিংহাসনে বসে যুগ যুগ ধরে সকলেই আধিপত্য করতে চায়, কিন্তু জীবনের শেষে তাঁরা ভুল বুঝতে পারে। নেপোলিয়ান-এর মত যোদ্ধাও জীবনের শেষে আক্ষেপ করে গেছেন। 'The throne is lent or piece of wood covered with velbet'।

উস্তাদ বাবার সেই উপদেশটি কেবল বার বার মনে পড়ে, 'আমি হলাম বুদ্ধিমান আর সব গরু। জান না যে যাঁরে ঠকাতে চায় সে তাঁর গুরু।' এ কথাটা কেন মনে হোল সেই কথাটি এবারে বলি। কে জানত দীর্ঘ সতেরো বছর পরে উস্তাদ বাবার কন্যার পক্ষের নাতি শুভ শঙ্কর সেতার নিয়ে মঞ্চে বসবে বারাণসীর সঙ্গীত সম্মেলনে। যাক এ তো পরের কথা।

আজকের যুগে দরদ ভালবাসা বলে কি কিছু আছে? ও সব মানুষ ভোলাবার জন্য কথা। মুখেই ভালোবাসা আর পেছনে তাকে হেয় করার জন্য হীন প্রচেষ্টা। হিংসা যার বীজ হিংসেই তার ফসল। বীজ নিয়ে খেলা সম্ভব, ফসল নিয়ে নয়। কাশীর সঙ্গীত সংস্থা রিম্পার এ পরিণতি হোল কেন? কে এর জবাব দেবে?

মানুষ জীবনে যদি কোনও জিনিষ বেশী পায়, তার জন্য অন্যদিক থেকে কিছু বেশী খেসারৎ দিতে হয়। তৈমুরলং-এর অত খ্যাতি, অত বীরত্বের কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু তাকে খেসারৎ দিতে হয়েছিল খোঁড়া হয়ে। পৃথিবীর যেখানে যত বেশী পাওয়ার ঘটনা দেখা যায়, খুঁজে দেখলে সেখানেই একটা না একটা হারানোর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। উস্তাদ বাবা বেশী পেতে চান নি। বাবা প্রায়ই বলতেন, 'খোদার অনেক মেহেরবানী, খোদা অনেক দিয়েছেন আর কিছু চাই না। যা পেয়েছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট।'

এ কথা তো সত্যি, অনেককে দেখেছি কোটি টাকার মালিক, অথচ তার একমাত্র ছেলে কিংবা স্ত্রী পাগল। হয়ত অন্য জায়গায় দেখেছি মেয়ে বা বিধবা ভগ্নির জন্য প্রয়োজনের বেশী দিতে চাইলেই, বাজার দরের চেয়ে বেশী দাম দিতে হয়। আবার এমন লোকও দেখেছি, যার রূপ, গুণ, টাকা সবই আছে, এরা পাখী হয়ে উড়ে উড়ে চারিদিকে আত্মপ্রচার করে। এরা লোককে জানিয়ে দেয় তার সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু খেসারৎটা লুকানো থাকে, কেননা কথাটা লজ্জার বিষয়। ওটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাই নিয়ম। হীরের আংটি,

জড়োয়ার নেকলেস কিনলে সর্বত্র প্রচার করে আনন্দ পায় তারা। কিন্তু নিজের জীবনের গৌরবের পেছনে যে খেসারৎ দেয়, সেটা প্রচার বিমুখ হয়ে থাকে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটো মন আছে। একটা মনকে আমরা জানি, অপর মনটা একান্ত ব্যক্তিগত, সেটা জানা যায় না। সেটা নিজের কাছে অমূল্য সম্পদ।

উপরে উঠে পড়ে যাওয়াকে পতন বলে। কিন্তু উপর থেকে যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে তাকে অবতরণ বলে। পড়ে যাওয়া আর নেমে এসে কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এক নয়। যারা সহজে নেমে আসে তা গুনে বলা যায়। কিন্তু উপরে উঠে পতনই বেশী দেখা যায়। বছরের শেষের দিকে সেই পতন, কাশীর লোক দেখে হতাশ হোল। কেন কাশীর সঙ্গীতপ্রেমীরা হতাশ হোল সে কথাই এবার বলি।

কখনো কখনো মনে হয় এ বিশ্ব একটা নাট্যমঞ্চ। একজন পরিচালক পেছন থেকে সকলকে নাচাচ্ছে। কাশীর আটবছরে যা কখনো হয় নি কেন এই বিপর্যয় ঘটলো ১৯৮৬-র ১৫ই নভেম্বরে।

সন ১৯৭৯ সনে রবিশঙ্কর নিজের জন্মস্থান কাশীতে RIMPA অর্থাৎ Research Institution for Music and Performing Arts-এর স্থাপনা করে প্রথম মিউজিক কনফারেন্স ১৯৭৮ এ করলেন। কাশীর সঙ্গীতপ্রেমীরা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। RIMP-র আদর্শ ছিল সারা পৃথিবীর সঙ্গীত প্রেমীরা কাশীতে এসে সঙ্গীত শিক্ষা করবে। সঙ্গীতের প্রচারের জন্য দুইবিঘা জমির উপর বাড়ী হোল। ল্যাণ্ড সিলিং-এর আওতায় পড়লেও উত্তর প্রদেশ সরকার মঞ্জুরি দিলেন। প্রতি বছর কনফারেন্স হতে লাগল, কিন্তু সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে যদিও কাশীর দুই সঙ্গীত শিল্পীকে লোক দেখান শিক্ষার জন্য রাখা হোল, কিন্তু কাশীর বা ভারতের কোন শিক্ষার্থীর কোন লাভ হোল না। প্রতি বছর কেবল কনফারেন্সই হতে লাগল।

১৯৮৬-র নভেম্বরের প্রথম দিকেই কাশীর লোকের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল, যখন সংবাদপত্রে দেখল এই প্রথম রবিশঙ্কর তাঁর পুত্র শুভ শঙ্করকে নিয়ে একসঙ্গে বাজাবে। এবারের শিল্পী তালিকায় বেশীর ভাগই তেমন নাম করা শিল্পী ছিল না। কয়েকদিন শিক্ষা করে, যাঁরা রবিশঙ্করের শিষ্য বলে জাহির করে তাঁরাই স্থান পেল। কিন্তু প্রধান আকর্ষণ ছিল পিতা পুত্রের দ্বৈত সেতার বাদন।

বারাণসীর করপোরেশন হলে এবারে সঙ্গীত সম্মেলন হোল। রবিশঙ্কর তাঁর পুত্রকে নিয়ে বাজাবে জানা সত্ত্বেও এত কম ভীড় রবিশঙ্করের জীবনে কখনো হয় নি। কাশীর স্থানীয় লোকের যত ভীড় ছিল, তার থেকেও বেশী বিদেশীরা বাজনা শুনতে গিয়েছিল খবর পেলাম।

কনফারেন্সের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবিশঙ্কর এবং তাঁর পুত্র। এ ছাড়া শিবকুমার শর্মার সন্তুর বাদন এবং আমাদের ঘরের আশিস খাঁর সরোদ ছিল। খবর পেলাম শিবকুমার শর্মার এবং আশিস-এর বাজনা ভালই হয়েছিল। বারাণসীর হিন্দি আটটি সংবাদপত্রে খুব প্রশংসা বেরোল। আমার কিছু পরিচিতরাও কনফারেন্স শুনতে গিয়েছিল। রবিশঙ্কর এবং শুভ শঙ্করের বাজনার সমাচার শুনে স্তম্ভিত হলাম। ভি. আই. পি. পুলিশের লোক এবং দর্শক

থেকেও হল ভর্ত্তি ছিল না। যা কি ভাবা যায় না। কারণ, অনুষ্ঠান স্থলটি কাশীর জনবহুল এলাকা থেকে দূরে ছিল।

আমার নিজের লোক যাঁরা গিয়েছিল তাঁদের মুখে শুনলাম রবিশঙ্কর প্রথমে একলা বাজিয়েছে আলাপ এবং গৎ। তারপর ছেলে শুভ শঙ্করের মঞ্চে প্রবেশ। প্রথমে রাগ চারুকেশীতে আলাপ বাজিয়ে গৎ, এবং পরে সিন্ধু ভৈরবী বাজিয়ে সম্মেলন শেষ হয়েছে। আমার এক বিদেশী ছাত্র এই বাজনার টেপ পরের দিন আমাকে শোনায়। অবাক হলাম রবিশঙ্করের বাজনা শুনে। এ বিষয়ে কিছু বলা নিজেদের ঘরেরই বদনাম হবে। তবে রবিশঙ্কর নিশ্চয়ই জানি নিজের বাজনা টেপে শুনেছে, কেননা দীর্ঘদিন ধরে জানি রবিশঙ্কর যেখানেই বাজাক নিজে টেপ করে নেয়। রবিশঙ্করের কাছে এ জিনিস স্বপ্নেও ভাবা যায় না। গৎ এর অংশে যা বাজিয়েছে তা কল্পনার বাইরে। প্রত্যেকের মুখেই এক আলোচনা। অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগ রবিশঙ্করই বাজিয়েছে এবং নাম মাত্র শুভ বাজিয়েছে। দীর্ঘ ষোল বছর পর, শুভ আর্ট লাইনে থেকেও সেতার কতটা আর রিয়াজ করতে পারে? তবুও তিন চার জায়গায় কয়েকটা যে কঠিন মীড়, এবং গমকের কাজ করেছে, যাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরা অবাক হয়েছে শুভর বাজনা শুনে। কয়েকজন সঙ্গীতের লোক আমার কাছে এসে বলল, ‘আচ্ছা বলুন তো, রবিশঙ্কর ছেলেকে নিয়ে যখন বসেছেন, তখন একটা গম্ভীর রাগ যেমন মালকোষ, দরবারী, কিংবা শুদ্ধ কল্যাণ না বাজিয়ে, চারুকেশী কেন বাজালেন?’ এর উত্তর দিতে গেলে নিজের ঘরের অনেক কথা বলতে পারতাম। কিন্তু কিছুই না বলে একটা কথাই বললাম, ‘কি করে বলব বলুন। ইচ্ছা হয়েছে তাই চারুকেশী বাজিয়েছে।’ শুভর শিক্ষার সম্বন্ধে আগেই লিখেছি, এটা তো ধ্রুব সত্য শুভ এই সব কর্ণাটক রাগ অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শেখে নি। কেননা অন্নপূর্ণাদেবী আদপেই কখন এসব রাগ কাউকে শেখান না কিংবা নিজেও বাজান না। তিনি বরাবরই বলতেন, ‘যা বাবার মুখে শুনেছি, ইমন, খাম্বাজ, পূর্বী, দরবারী, শুদ্ধকল্যাণ, মারোয়া, তিলক কামোদ, মালকোষ, এসব তো সকলেই বাজায়। এই সব রাগ বাজিয়ে শ্রোতাকে বোঝাও, সকলেই যা বাজায় তার থেকে কত তফাৎ তোমার বাজনার মধ্যে।’ শুভর ভিৎ এত মজবুত অন্নপূর্ণাদেবী করে দিয়েছিলেন যার জন্য চারুকেশী কিংবা যে কোন রাগের চলন একটু জানলেই শুভর পক্ষে বাজান কোন ব্যাপারই নয়।

পরের দিন বাজনার সমালোচনা সব কাগজেই বের হোল। রবিশঙ্করের সম্বন্ধে সব সংবাদপত্রে বেরিয়েছে এবারের বাজনা যে কোন কারণেই হোক হৃদয়গ্রাহী হয় নি। শ্রোতারা যে আশা নিয়ে এসেছিল তা পূর্ণ হয় নি।

হঠাৎ ১৬ই ডিসেম্বর এই প্রথম আমার বাড়ীতে এক ভদ্রলোক এসে রিম্পার সমারোহের সুভেনির দিলেন। অবাক, কেননা দীর্ঘ আট বছর ধরে রিম্পা সমারোহের কোন সুভেনির বা নিমন্ত্রণ আমার কাছে আসে নি। বাজান তো দূরের কথা। নিমন্ত্রণ এলেও যেতাম না, কেন না আগেই লিখেছি ১৯৭৮ এর পর রবিশঙ্করের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনি। সেই জন্য অবাক হলাম। সুভেনিরের মধ্যে লেখা আছে পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উপহার। তলায় সই রয়েছে অশোক মিশ্র সাময়িক। অবশ্য লেখাটা হিন্দিতেই ছিল।

অশোক সাময়িক রিম্পার একজন বিশেষ সদস্য এবং কর্মী এটা আমার জানা ছিল।

সুভ্যেনিরটি খুলে দেখলাম। দেখে অবাক হলাম সব শিল্পীরই পরিচয় লেখা আছে, কিন্তু শুভর একটি ছবিই কেবল দেওয়া আছে, তার নীচে লেখা আছে 'জীবতু শরদঃ শতম'। শেষ দিনের প্রোগ্রামের তালিকায় শিল্পীদের ক্রমানুসারে নাম লেখার পর শেষে লেখা আছে Pd. Ravi Shankar assisted by Sri Shubho Shankar (son)। আর একটা শব্দ চোখে পড়ল RIMPA-র R-এর জায়গায় Research-এর বদলে Ravi Shankar অর্থাৎ Ravi Shankar Institute for Music and performing Arts। সুভ্যেনিরটা দেখে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রিম্পার কার্যকর্তা অশোক সাময়িকের হঠাৎ আট বছরের পরে এখন এটা আমাকে উপহার দেবার কারণ কি?' সাময়িক হেসে বললেন, 'রবিশঙ্কর এটা পাঠান নি। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি আপনার সামনে উপস্থিত।' অবাক হলাম ভদ্রলোকের নিজেই অশোক সাময়িক। ঠিক বিশ্বাস হোল না। মনে হোল এটা কি দাবার, বোড়ের চাল? কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ আপনি কি মনে করে?' তিনি বললেন, 'আমি হিন্দিসংবাদ পত্রের সহ সম্পাদক। আমি এসেছি আপনার একটি ইন্টারভিউ নিতে।' আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু আমি বৃথা সময় নষ্ট করতে রাজি নই। কারণ আমার ইন্টারভিউ নিলেও আপনার সম্পাদক তা ছাপবেন না। জানি না ইন্টারভিউতে আপনি কি জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু এটা তো ঠিক, আমার বিষয়ে কিছু জানতে চাইলে একজনের বিষয় আমাকে বলতেই হবে। আর সেই লোকটির সর্বত্র এমন প্রভাব যে আমার বক্তব্যটি চাপা পড়ে যাবে। আজ পর্যন্ত বহু পত্রিকায় কয়েকটা লেখার প্রতিবাদ করে চিঠি দিয়েছি রেজিস্ট্রি করে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ পত্র বের হয়নি। বলুন তো কেন বেরোয় নি? কারণ যাঁর বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি তাঁর সঙ্গে উপর মহলের ওঠা বসা। এমন কি যে লোকটির সম্বন্ধে বলব, তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন লোককে বলেছি, আমার এই কয়েকটা কথা জানিয়ে দিতে, কারণ সেই লোকটির সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি নেই দীর্ঘ আটবছর। এ কথা শুনে সেই ঘনিষ্ঠ লোকগুলি পরে দুঃখের সঙ্গে বলেছে, 'এই সব কথা বলে অপ্রিয় হতে চাই না।' যখন এ সব কথা কেউ বলবেই না, তাই নিজের একটা বই লিখেছি বাংলায়। পরে এই বইটির হিন্দি রূপান্তর করব।'

অশোক সাময়িক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা দিতে পারি। সাক্ষাৎকার নিতে যখন এসেছি, তখন নিশ্চয়ই ছাপা হবে। আর যদি না ছাপে আমি সাংবাদিকতা ছেড়ে দেব।'

মনে আমার গভীর সংশয়। ভাল করেই জানি, যে আমার কাছে এসেছে সে তাঁর অন্তরঙ্গ লোক। অশোক সাময়িককে আমি জানি রিম্পার এক সদস্য। সুভ্যেনিরে তাঁর লেখাও আছে। হিন্দি বহুল প্রচারিত 'দৈনিক জাগরণ'-এর ইনি সহসম্পাদক। সম্পাদক যদি না ছাপে, কথাটা তো তাঁর কানে যাবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অশোক সাময়িক আমাকে বললেন, 'আপনার ইংরেজী বই "উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এনড হিজ মিউজিক" আমি পড়েছি। বহুদিন ধরে ভেবেছি আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করি কিন্তু নানা কারণে সেটা সম্ভব হয় নি। আপনার সম্বন্ধে

কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণা আমার মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে আছে, আজ এসেছি সেই ধারণার নিরসন করতে।'

বললাম, 'আগে চা খান, তারপর কথা হবে।' ভদ্রলোক জলযোগ করছেন আর আমি নিজের মনেই ভেবে চলেছি, যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা জানেন ধরাধরি করাটা আমি আমার জীবনে এক অতি জঘন্য বৃত্তি মনে করি। আজকের যুগটা হোল 'পপিচুস'এর যুগ অর্থাৎ পরস্পর পিঠ চুলকানি সমিতি। এক কথায় একে 'পপিচুস' বলা হয়। তুমি আমার জন্য কিছু কর তবেই তোমার জন্য আমি কিছু করব। পরের জন্য কিছু করবার সাধ্য কতটা আমার পক্ষে? আমি তো সঙ্গীতের সেবক। যেহেতু আমি 'পপিচুস' করতে পারি না সুতরাং পুরস্কার প্রাপ্তি আমার জীবনে কখনই ঘটবে না। যদিও এ বিষয়ে আমি ক্ষুব্ধ নই। লোভও নেই। আমি বিশ্বাস করি, 'সাকসেস্ ইজ দি গ্রেটেস্ট এনিমি ফর এ মিউজিসিয়ান।' আমি যা পেয়েছি নিজের লোকের কাছে, সেই হোল সবচেয়ে বড়। আজকালকার যুগে মুখোশধারী লোকদেরই জয়জয়কার। যাঁরা সত্য সঙ্গীত সেবক তাঁদের কোন সম্মান নেই। লোকে আমাকে বলে অভিমানী, অহঙ্কারী, নির্বোধ। ওই সব বিশেষণে আমার কোন ক্ষতি নেই। আজ আমি সব লাভ ক্ষতির সীমানার বাইরে একান্তে থাকতে চাই। আজ আমার নিজের জন্য আর কিছু কাম্য নেই। শুধু কামনা করি মানুষ সৎ হোক। এবং সর্বশেষে উস্তাদ বাবার স্বপ্ন সার্থক হোক! তাঁর কথা ও সুর যেন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বাবার নাম অমর হয়ে থাকুক! আর বাবা যে কথাগুলো আমাকে লিখতে বলেছিলেন, সে কথাগুলি আমার বাংলা বইতে স্থান পেয়েছে। সে কথা ইংরেজী বইতে আমি লিখতে পারিনি বা এড়িয়ে গেছি।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম নিজের মনে নিজের থেকে কেন এ সব কথা ভেবে যাচ্ছি। অশোক সাময়িককে দেখলাম চুপ করে আমাকে দেখছেন। মনে মনে লজ্জিত হলাম। বললাম, 'কিছু মনে করবেন না আমি তো লেখক নই, সেইজন্য উস্তাদ বাবার ওপর বই লিখতে গিয়ে দিবারাত্র চিন্তা করে করে, আমার ঘুম চলে গেছে। যাক বলুন, আপনি কি জানতে চান আমার কাছে।'

অশোক সাময়িক বললেন, 'আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি। কয়েকটা প্রশ্ন লিখে নিয়ে এসেছি। দয়া করে সেগুলির উত্তর দেবেন।' সম্মতি জানালাম। তিনি সত্যিই চতুর সাংবাদিক। এমন প্রশ্ন করলেন, যা আমি ভাবতে পারিনি। সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। অশোক বাবু চলে যাবার পর অধীর আগ্রহে সুভ্যেনারটি পড়তে আরম্ভ করলাম। যবনিকার অন্তরাল থেকে রবিশঙ্কর শুভকে বের করেছে। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তাঁকে গণ্যই করা হয়নি। তা যদি করাই হ'তো, তাহলে তো লিখতে হ'তো, শিল্পী গড়ার কারিগর অন্নপূর্ণাদেবীর কথা। রবিশঙ্করের কাছে একটা 'ডা' বা 'রা' শেখেনি। এই স্বীকৃতিটা দিতে গেলে রবিশঙ্করের অহঙ্কারে লাগত। তাই ভাবখানা এরকম ছিল যেমন তানপুরা বাদকের পরিচয় হয় না, তেমনি শুভর পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা নেই।

কয়েকদিন পর আমার এক ছাত্র এসে বলল, 'রিম্পার সুভ্যেনিরে সকলের পরিচয় আছে

অথচ শুভ শঙ্করের পরিচয় কেন লেখা হয়নি, যখন রবিশঙ্কর নিজের ছেলেকে প্রথম বারাণসীতে Introduce করলেন।'

১৯৫৬ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের ঘরের কথা নিয়ে নানা জনে নানা প্রশ্ন করেছে। সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আজও যখন এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, উত্তর জানা থাকলেও ছাত্রকে বলতে সঙ্কোচ বোধ করলাম। মনে পড়ে গেল বাবার কথা, 'পার্টি পার্টি!' এই পার্টিবাজী যে কত নীচে নামতে পারে, এ কথা ভাবতে দুঃখ লাগে। ছাত্রকে উত্তর দিলাম, 'ছেলের পরিচয় দিতে রবিশঙ্কর হয়ত সঙ্কোচ বোধ করেছে।' আর কথা বাড়ালাম না। আমার ছাত্রদের সঙ্গে আমি কখনই বাজনা ছাড়া অন্য আলোচনা করি না। যেহেতু এটা সঙ্গীতের ব্যাপার এবং আমাদের ঘরের ব্যাপার, তাই এ প্রশ্ন। সুতরাং আমাকেও বাধ্য হয়ে উত্তর দিতে হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ছাত্রের প্রস্থান।

আমার ছাত্রটি চলে যাবার পর শুভর কথা ভেবে মনে হোল, এখনো যদি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে দুটো বছর সেতার বাজায়, যেমন বম্বেতে নিয়মিত বাজাত, তাহলে হয়ত কেবল ভারতই নয়, পৃথিবীর লোকেরাও বুঝত, সেতারে এই সব দুরূহ মীড়, গমক, সপাট তান এবং ঝালা কি সম্ভব? কিন্তু কোনটা সুর কোনটা অসুর তা শুভ এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। বারাণসীর জনসাধারণ এরপর থেকেই রবিশঙ্করের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে গেল। মনে হয় রবিশঙ্করও সেটা বুঝতে পেরেছে।

দুঃখ হয় একটি প্রতিভার অপমৃত্যু দেখে। এমন মনে হয় উস্তাদ বাবা পুনর্জন্ম নিয়েও যদি পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তাহলেও তাঁর স্নেহের নাতি শুভকে বিপথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হতেন না। এ কথাটা এই জন্য লিখলাম, কেননা আমার এই লেখা পড়ে যদি শুভর জেদ হয় এবং দুষ্টের প্রেরণায় নিজের Inferiority Complex যা তাঁর মধ্যে Inject করে দেওয়া হয়েছে, দূর করে দিয়ে তাঁর মা'র প্রদর্শিত পথে যদি একক বাজায়, তাহলে আমার মত আনন্দিত বোধ হয় আর কেউ হবে না। যতই হোক তাকে সাত বছর বয়স থেকে দেখছি। আর তাকে আমি কিছুটা লেখাপড়াও করিয়েছি। সেইজন্য সে যদি তার দাদু উস্তাদ বাবার নাম রাখতে পারে, এর চেয়ে কি বড় কাজ হতে পারে। যাক এ প্রসঙ্গ।

কয়েকদিন পরে কাশীর বহুল প্রচারিত 'দৈনিক জাগরণ'-এ অশোক সাময়িকের নেওয়া আমার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হোল। সেই বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার পড়ে দেখলাম অশোক সাময়িক তাঁর কথা রেখেছেন। কোন তথ্যই গোপন করেন নি। বুঝলাম তিনি সত্যিই একজন নির্ভীক সাংবাদিক। ঘটনাচক্রে আমার সাক্ষাৎকারের নায়কও কাশীতে এসে সেদিন উপস্থিত হোল। কিন্তু যা সত্য তার প্রতিবাদ করার সাধ্য কারো ছিল না।

৮৩

'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' এই রচনাটি এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু সঙ্গীতের এমন একটা সৌন্দর্য আছে যা সঙ্গীত শেষ হলেও রেশ থেকে যায়।

১৯৮৬র পয়লা জুন যখন বইটা লেখা শুরু করেছিলাম, ভেবেছিলাম ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত যা দেখেছি যা শুনেছি, আমার বইতে তা লিখব, কিন্তু ১৯৮৭র ২৩শে

নভেম্বর যখন বেশ খানিকটা লিখেছি, মনে হোল এখনও তো অনেক লেখা বাকী রয়ে গেল। কেননা ১৯৮৭র মধ্যেও তো কিছু ঘটনা আছে আর তাছাড়া বাবার নানা উপদেশ এবং বাবার স্বপ্ন কি ছিল, সেটা কোথায় দাঁড়িয়েছে, সে কথা না লিখলে তো আমার বই লেখার কোন অর্থই হবে না। এছাড়া বইটার নাম দিয়েছি 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' তখন আমরা অর্থাৎ বাবার সন্তান, কন্যা, ভূতপূর্ব জামাতা এবং বাবার ভাষায় বৃদ্ধ বয়সের সন্তান স্বয়ং আমি বাবার জন্য কি করেছি?

বাবার আজ্ঞায় গুরু দক্ষিণা হিসাবে ইংরেজী বইটা Ustad Allauddin Khan And his Music লিখেছিলাম, কিন্তু সে বইয়ে সব কথা তো লিখতে পারিনি। বাবা সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখবার আজ্ঞা দেন নি, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম বাবার ভারতীয় সঙ্গীতে কি অবদান তা যদি না লিখি, তাহলে বাবার জীবনীর কোন অর্থ হবে না।

ভেবেছিলাম ছয় মাসের মধ্যেই লেখা শেষ করে ফেলব কিন্তু দেখতে দেখতে একবছর ছয়মাস হয়ে গেল তবু আমার লেখা শেষ হোল না।

'উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও আমরা' শেষ পর্যন্ত কোন বক্তব্যে গিয়ে দাঁড়াবে এখনো জানি না।

যতটা লেখা হয়েছে তারপর পূর্ণচ্ছেদ টানতে পারতাম। কারণ যতটুকু লেখা হয়েছে তা থেকে বিচিত্র জীবনের জীবন বৈচিত্রকে যথেষ্টভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

সাধারণত পূর্ণ সত্য লোকে পছন্দ করে না কারণ তীব্রতা অত্যন্ত বেশী হয়। কিন্তু যাঁর ওপর ইতিহাস লেখার ভার সে কি করে মনোরঞ্জনের ভাষা লিখবে? রঞ্জনের ভাষায় সত্য মারা যায়। আর সত্য মারা গেলে, বাবাকে দেওয়া কথার কি হবে?

নেপোলিয়নের একটা কথা মনে পড়ে, 'তোমরা ভাব সময় যায়, সময়ই থাকে, আসলে যায় মানুষ।' একদিন আমরা কেউই থাকবো না, কিন্তু আমার এই লেখা ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে। মনে পড়ে লোকেন পালিতকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটা চিঠি। সেই চিঠিটা আমাকে ন্যুজো বিশেষ করে লেখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছে।

"মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে। তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকছে না। কেবল সাহিত্য থাকছে। সঙ্গীতে, চিত্রে, বিজ্ঞানে, দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এর জন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই জন্য প্রত্যেক জাতি আপন সাহিত্যকে এত অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।"

এক সময়ের ইতিহাসের পরেও অন্য সময়ের ইতিহাস থাকে। আমি সেই ইতিহাস এখন লিখছি। প্রথমে উস্তাদ বাবার মধ্যে যা দেখেছি, যা শুনেছি, বা যা অনুধাবন করেছি, সেই কথাই আগে লিখবো। তারপর বাবার ভূতপূর্ব জামাতা রবিশঙ্কর, পুত্র আলিআকবর এবং কন্যা অন্নপূর্ণাদেবীর ভেতরে যা দেখেছি বা পেয়েছি, সে কথা লিখব। সব শেষে লিখব নিজের কথা এবং কিছু মন্তব্য। তারপর? যাক সে তো পরের কথা।

বাবার কাছে সঙ্গীত ছিল সাধনা। শুধু সাধনা বললে কম হবে। সঙ্গীত ছিল তাঁর জীবনের পূজার উপকরণ ও আরাধ্য। মা সরস্বতীর কাছে তাঁর আত্মসমর্পণ সঙ্গীত ছিল তাঁর অন্তরের

ধন, ব্যবসায়িক মূলধন নয়। অতীত ও বর্তমানের শিল্পকলার মাঝে একটা সেতু রচনা করার জন্য ছিল তাঁর ব্যগ্র ব্যাকুলতা। গুণীজনের কাছে তাঁর প্রতিভা সম্মান পেত, টাকার জন্য প্রতিভার অপব্যয় করতে বাবাকে কখনো দেখিনি। হিন্দী সাহিত্যে একটা চলতি কবিতা এখানে প্রাসঙ্গিক। "কোই কাম করতা হ্যায়, তো কোই নাম করতা হ্যায়, জলতা হ্যায় তেল বত্তি, লেকিন দিয়া কা নাম হোতা হ্যায়।"

অর্থাৎ অনেকের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যশ হয় না। সেই সব প্রতিভাধরদের যদি কেউ বলে, 'আপনাদের নাম কেন হোল না?' তৎক্ষণাৎ জবাব পাওয়া যাবে, 'স্বীকৃতি, হতচ্ছাড়াদের জন্য কোন কালেই নয়।'

মধুও রস আর তাড়িও রস। মধু বিকোয় ভরির দরে আর তাড়ি বিকোয় ভারে ভারে। মধুর এক বিন্দুর সম্মান এক ঘড়া তাড়ির সমতুল্য। তাই তাড়ি আর মধুর কৌলিন্য এক নয়। মধু খেয়ে কেউ মাতলামি করে না। তাড়িকে নিয়ে অদ্যাপি কোন বৈদিক মন্ত্র শোনা যায় নি। তাই সংখ্যামাত্রিক জনগ্রাহিতা দিয়ে মধু আর তাড়ির কোন তুলনা করা সম্ভব নয়। তাহলে কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুলতে পারেন, বাজিয়ে কি লাভ?' সোজা উত্তর, 'প্রথমতঃ না বাজিয়ে থাকা যায় না। দ্বিতীয়তঃ প্রচুর অর্থ রোজগার করে বাঁচার জন্য অল্প পেয়েও লোকের মনে বেঁচে থাকা অনেক সুখকর ও কাম্য।'

কিছু লোক বাঁচার কামনা নিয়ে রোজ একটু একটু করে মরার দিকে এগিয়ে চলেছে, আর এঁদের থেকে ভিন্ন কিছু লোকও আছেন যাঁরা যোগ্য মৃত্যুর কামনা নিয়ে বেঁচে থাকেন। উর্দু সাহিত্যের দুটো লাইন এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

"ইন্সান কী কমর ঝুকতি নহী হ্যায় বেবজহ,
অর্শসে তলাশ হ্যায় জমীন মজারে কাবিল।।"

অর্থাৎ, মানুষের কোমর অকারণে ন্যুব্জো হয় না। ন্যুব্জো হবার কারণ হোল সুদীর্ঘ দিন ধরে নিজের কবরের যোগ্য মাটির সে খোঁজ করে। তাই যোগ্য বাঁচা হোল সবার সাথে, সবার মাঝে, রথচাইল্ডের বাঁচা আর পল্ গঁগার বাঁচা এক নয়। প্রথমজন বেঁচেছিলেন বিপুল অর্থ নিয়ে সবার থেকে আলাদা হয়ে, আর গঁগার জীবন সবার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে এক সার্বিক বাঁচা। এক সর্বত্যাগী ছন্নছাড়ার জীবন সঙ্গীত গঁগা শুনিয়েছেন।

বাবার জীবনটাও ছিল শ্রেষ্ঠ ছন্নছাড়া ও 'রুদ্রের প্রসাদের' মত। বাবার কামনা ছিলো যোগ্য মৃত্যুর। বাবা বুঝতেন, বাঁচার মত বাঁচা মানে যোগ্য মৃত্যু পাওয়া। মনে পড়ে টমাস্ কার্ললাইলের কবিতা—

হোয়াট্ ইজ্ ম্যান্ এ ফুলিশ বেবী,
ডেলি স্ট্রাইভ্স এণ্ড ফাইট্স এণ্ড ফ্রেট্স
ডিমাণ্ডিং অল, ডিজর্ভিং নাথিং
ওয়ান স্মল গ্রেভ, ইজ্ হোয়াট হী গেট্স।

তথাকথিত বিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলেও বাবা ছিলেন জীবনের পাঠশালায় পড়া এক জীবনদ্রষ্টা দার্শনিক। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা তাঁকে বুঝতে পেরেছেন। সঙ্গীত

শিক্ষা দেবার সময় যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দিতেন তা ভাবলে অবাক লাগে। রামায়ণ, মহাভারত বা উপনিষদ্ না পড়লেও বাবার কথাগুলো অত্যন্ত তত্ত্বোত্তীর্ণ এবং শিক্ষামূলক হ'তো। বাবার কথাগুলো সঙ্গীত শিক্ষার মতই সারগর্ভ ছিলো। প্রায় তেইশ বছর একাদিক্রমে বাবার কথা শুনেছি। সেই অসংখ্য কথার মণি মুক্তোর যেটুকু বুঝতে পেরেছি বা মনে আছে, তাই লিখলাম। বাকী অনেকটাই তো হারিয়ে গেল। কোথাও তাঁর লিখিত নিরিখ রইল না। বহুদর্শীর জীবন বৃত্তান্তের থাকল আংশিকরূপ। আংশিকই সই, কিন্তু সত্য তো প্রকাশিত হবে। আগামী দিনের বিদ্যার্থীরা তাতেই লাভান্বিত হবে।

বাবার স্বপ্ন ছিলো তাঁর জীবন দর্শন তাঁর ছেলে, মেয়ে, জামাতার (বর্তমানে ভূতপূর্ব) এবং ছাত্ররা (এমন কি তারাও যাঁরা স্বঘোষিত) সঙ্গীত জনমানসে প্রচার করবে। তা হয়েছে কিনা, এর তামামী পরে করবো। তার আগে বাবার কথামৃত বিষয়ক কয়েকটা কথা লিখে এ প্রসঙ্গের ইতি করি, কথামৃতকে আমি জীবনভর পালন করার চেষ্টা করেছি যা যখনই সঙ্গীত প্রেমী পেয়েছি তাঁদের বলেছি।

বাবার মত নিরহঙ্কারী মানুষ আমার জীবনে অত্যন্ত কম দেখেছি। কোন ছাত্র বা পরিচিতদের মধ্যে অহঙ্কারের প্রকাশ দেখামাত্র বলতেন, 'তুমি বড় হও বা ঐশ্বর্য্য পাও এতো আনন্দের কথা, কিন্তু অহঙ্কার কোরো না কারণ মহৎ (ঈশ্বর)-এর ঐশ্বর্য তোমার থেকে অনেক বড়।"

বাবার দুঃখ এবং দুঃখের দর্শনও ছিলো বিচিত্র। কোন কারণে দুঃখ হলে বলতেন, "দুঃখ আমরা প্রারব্ধ থেকে পেয়েছি। বাহক ব্যক্তি নিমিত্তমাত্র। তাঁর প্রতি রাগ না করে দয়া করবে। কেননা অযথাই সে পাপের ভাগী হয়। কেউ আমায় দুঃখ দিচ্ছে, কেউ অপমান করছে, কেউ নিন্দা করছে, কেউ কষ্ট দিচ্ছে, কেউ আমার ক্ষতি করছে, এই সব চিন্তা করা কুবুদ্ধির পরিচয়। দোষ তাঁর নয়। দোষ আমার কর্মের। পাপের ফল কেটে গেলেই আমি শুদ্ধ হবো। যাঁরা শত্রুতা করছে তাঁরা আসলে পাপের নাশ করছে। এই ভেবে তাঁর উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। প্রসন্ন হওয়া উচিত। এই সব দুঃখ প্রারব্ধের ফল।"

মৈহারের গোবিন্দ সিং অর্থাৎ বাবার স্নেহধন্য চিকিৎসক, মাঝে মাঝেই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে বাবার কাছে এসে বসতেন। বাবার কাছেও ডাঃ গোবিন্দের উপস্থিতিটা ছিল অত্যন্ত সুখকর। কারণ কেউ না কেউ বাড়ীতে অসুস্থ থাকতোই, তাই ডাক্তার বাবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয়।

এর জন্য বাবা নিজেকে ঋণী বোধ করতেন। তাই কিছু না দিতে পারলেও ওঁর আনন্দই হ'তো না। ডাঃ গোবিন্দ সিং সঙ্গীতপ্রেমী। তাই বাবা কিছু দিতে চাইলেও বলতেন, 'আপনার সঙ্গীত ভাণ্ডার থেকে কিছু দিন, ওটাই আমার কাছে রোগ আর রুগীদের মাঝখানে রুগ্ন হয়ে যাওয়া মনের জন্য টনিক্। আপনার কাছে যে দিন এসে সঙ্গীত শুনতে পাই সেদিন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গেই বলতেন, 'আমি তো সঙ্গীতের 'সা'-ও ঠিক মত লাগাতে পারি না। ওঁকার হোল নাদ ব্রহ্ম, সেই 'ওঁ' এর সুর তো আমার আসে না।' জানি না ডাক্তার এঁর অর্থ বুঝতেন

কিনা। যাক তবুও ডাক্তারই বাবার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করার সাহস পেত, যা অন্যের পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। একদিন ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'বাবা সুরশৃঙ্গার, সরোদে ও সেতারের নামকরণ কে করেছিলেন?' আমার কাছে প্রশ্নটা বিচিত্র ও নতুন বলে মনে হয়েছিল। বাবার উত্তর, 'বাদ্যযন্ত্রের নাম কারা রেখেছিলেন জানি না। কিন্তু যাঁরাই রেখে থাকুন অত্যন্ত চিন্তা করেই রেখেছিলেন। ঠাকুর দেবতার যেমন শৃঙ্গার হয়, তেমনি সুরের শৃঙ্গার হয় বলে নাম হয়েছে সুরশৃঙ্গার। সুরের বাহার আছে, তাই সুরবাহার। স্বর দান করে তাই সরোদ। আর সেতার সে কারও নয়, সে তাঁর (লৌকিক অর্থে পতি আর গূঢ় অর্থে ঈশ্বর)।'

বাবা ঠাট্টা করে বললেন 'সাধারণত সেতার হোল জনানা অর্থাৎ মহিলা বাজ। আর সরোদ হোল মর্দানা বাজ। অর্থাৎ পুরুষের বাজ। আওয়াজেই বোঝা যায় সরোদ গম্ভীর আর সেতার মিনমিনে।' এরপরেই বাবা নিজের ব্যাখায় খুশী হয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। ঠিক পরমুহূর্তেই আবার গম্ভীর হলেন। আপন মনে গুনগুন করে গান রচনা করে গাইতে শুরু করলেন। চেহারায় এক নৈসর্গিক ভাবের উদয় হোল। তিলককামোদে গাইতে লাগলেন—

স্থায়ী—

ভক্তি বিনা কোই গতি নাহি
রপ মগ সর গস ন-
গু ণী জ ন
প্ ন্ সর গস

অন্তরা—

যো- করে গুরু ভক্তি
মপ ন- পন স-
সো- ফল পাও য়ে।।
সপ ধম গস ন-

এ ধরনের কত গান এবং কথা বাবা রচনা করেছেন, তা লিখলে একটা আলাদা বই লেখা যায়। প্রসঙ্গ থাকে বলেই প্রসঙ্গান্তর ঘটে। বাবার জীবন হোল লক্ষ্ণৌয়ের ভুল ভুলাইয়া। ঢুকি এক পথ ধরে, একটু পরেই সামনে উপস্থিত তিনটে পথ। কোনটা ধরে এগোনো যায় নিজেই বুঝতে পারি না। তখন বাবাই যেন পথ দেখান।

সঙ্গীত নিয়ে অভিজ্ঞতার ঝুলি কম ভরেনি। তিন দশকের যাত্রাপথে কত কিনা দেখলাম। আমার দেখার কথা তো পরে লিখব। আগে লিখি বাবার সঙ্গীত অভিজ্ঞতা। বাবা বাইরে থেকে বাজিয়ে আসলে, সাহস করে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতাম, বাজনা কেমন হয়েছে? বা কে তবলায় সঙ্গত করেছেন? সঙ্গে সঙ্গে বাবার উত্তর, 'কি বাজাব? আলাপ বাজানোর সময়ই তবলা বাদককে উস্‌খুস্ করতে দেখি, কখন সুযোগ পাবে আর উঠান ওঠাবে। এ দেখলেই বাজনা তখন মাথা থেকে চলে যায়।'

আজকাল অবশ্যই তবলা বাদকরা অনেক কিছুই রদ বদল করেছেন, যা অতীতের বহু বাদকদের মাথা খারাপ করতো। যেমন আলাপের সময় দু তিন সুরের বিস্তার করার পর যেই

মিলানের মুখে যন্ত্রী এসে পৌঁছতেন, তবলাবাদক বাঁয়াতে দুম করে চাঁটি মারতেন, (উদ্দেশ্য ছন্দ মেলান, না বিরক্ত করা ঈশ্বরই জানেন?) আর এই আওয়াজে আলাপের মেজাজ নষ্ট হয়ে যেত। বাবা অত্যন্ত বিনীতভাবে নিষেধ করতেন, "আলাপের মুখড়ায় দুম্‌দাম্ করবেন না।" বারণ সত্ত্বেও যাঁরা সংযত হতেন না, তাঁদের গৎ বাজানোর সময় বাবা লয়ের উত্তম মধ্যম দিতেন। প্রাণান্তকারী নাজেহাল হ'তো।

একবার এক ভারত বিখ্যাত তবলাবাদক লক্ষ্ণৌ রেডিওর সঙ্গীত সভাতে বাবার বারণ সত্ত্বেও আলাপের সময় মুখড়াতে বাঁয়াতে বাজাতে লাগলেন। তখন রেকর্ডিং সিস্টেম ছিলো না। বহু গায়ক বাদক বসে বাজনা শুনছেন। দ্রুত লয়ে যখন একটা কঠিন বন্দিস্ শুরু করলেন, তবলাবাদক কোথায় সম্ খুঁজে না পেয়ে চুপচাপ বসে রইল। হঠাৎ বাবা বলে উঠলেন, "অব কেউঁ নহী বজাতা এতনা দেরী সে ফুরফুরী করতা রহা"। বাবার হিন্দিতে অর্দ্ধেক বাংলা মেশানো থাকতো। বাবা আসলে বললেন, 'এখন বাজাচ্ছো না কেন? এতক্ষণ তো বাঁয়াতে খুব কেরামতী করছিলে, এখন চুপ কেন?' রেডিওতে লাইফ্ আইটেম্ বাজানোর সময় কথা বলা হয় না, এ নিয়মটা আজকালকার মত সে সময়েও ছিলো। কিন্তু মেজাজ খারাপ হলে কত তবলা বাদকই লাইফ্ আইটেমে মিঠে কড়া সেবন করেছেন তাঁর ইয়ত্ত্বা নেই। বাবা রেডিওর নিয়ম ভুলে যেতেন, আর স্টেশন ডাইরেকটার মনে করাতে সাহস পেতেন না।

বাজনা বা গান হোল মাটির প্রতিমা। সঙ্গীত হোল চালচিত্রের খড়। সুরের মাটির নীচেই এর অনুগামী অস্তিত্ব। যেই খড় মাটিকে ভেদ করে, নিজেকে প্রকাশ করে মূর্তি হয় বিকৃত। তাই অনুগমের বদলে যদি তবলাবাদক লহরা বাজাতে আরম্ভ করে, বাজনা বা গানের 'গয়া গঙ্গা' হয়ে যাবে। সঙ্গীতের ব্যাকরণে এই প্রয়োগ নিন্দনীয়। বাবা বলতেন, 'আমি যে ছন্দে বাজাচ্ছি, তোমারও উচিত সেই ছন্দকে অনুকরণ করা। তুমি যদি সেই ছন্দটি না বাজাতে পারো, তাহলে সুন্দর ঠেকা দিয়ে অথবা ছোটো একটা টুকড়া বাজিয়ে তোমার কর্তব্য সাধন কর। কিন্তু আমি যখন যন্ত্রে ঝুলনার ছন্দ বাজাচ্ছি তখন যদি সঙ্গতকার তবলায় আড়ির ছন্দ বাজাতে আরম্ভ করে, তা আমার পক্ষে হবে হত্যার সামিল।'

বাবা বরাবরই সহযোগী বা অনুগত তবলাবাদকদের প্রশংসা করতেন। উৎসাহিত করতেন। কিন্তু যদি কারও মধ্যে, কেরামতী দেখাবার চালাকি দেখতে পেতেন তা হলে ল্যাজে গোবরে করতে কার্পণ্য করতেন না। বাবাদের যুগে গ্রীণরুমে তবলাবাদকের সাথে গতের রূপের প্রাক পরিচয় হ'তো না। একে অপরের সাথে দেখা হ'তো সোজাসুজি মঞ্চে।

কিন্তু গত চল্লিশ বছরে অনেক নিয়মই বদলেছে। এখন গায়ক বাদকরা তবলা বাদক পোষেন। রোজ বাড়ীতে বসে বোঝাপড়া হয়। এ যেন মূল গায়ক আর দোহার। দেশেই হোক বা বিদেশেই হোক সেই পেটোয়াই পিটবে। দশ আনা দুই আনার বখরা হয়। এঁরা সঙ্গতকার কম হয়, এঁরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থমূল্যে কেনা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কারণ সর্ত থাকে পতি আনুগত্য বদলানো চলবে না। এতে তবলাবাদকের জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। শিল্পমূল্যের বাজার দর শূন্যে নেমে পড়ে।

এরকম বাঁধা খুঁটির সঙ্গতকারকে হঠাৎ শ্রোতারা যখন অন্তর্ধান হতে দেখে, তাঁরা বুঝতেই পারেন না আড়ালে কি ঘটলো। এর পেছনে যে রহস্য রয়েছে বা ঘটে থাকে, প্রকাশ করে দেওয়া ভাল। রহস্যটা হোল এই যে 'বাইন' বা 'গাইন' যখন দেখে যে তাঁরই তবলাবাদক তাঁর সাথে বাজিয়েই প্রচুর নাম করে ফেলেছে এবং যোগ্যতার অহঙ্কার করছে, ভাবটা অনেকটা খ্যাতিটা স্বোপার্জিত, তখনই তাঁর অস্তিত্বটা অসহ্য হয়ে ওঠে এবং ফলে স্বর্গ হতে বিদায়। অলিখিত সহঅবস্থানের বিষম পরিসমাপ্তি ঘটে।

বাবা ছিলেন এ ব্যাপারে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর নিজস্ব কোন তবলাবাদক ছিল না। বরং অন্যদের অবহেলিত পরিত্যক্ত এবং অনাদৃত, যে সব তবলাবাদক নিরুপায় জীবন যাপন করতো, তিনি তাঁদের অত্যন্ত সমাদরে সঙ্গত করার সুযোগ দিতেন। সমকালীন শ্রোতারা এর প্রত্যক্ষদর্শী।

বাবার আবার সঙ্গীত শ্রোতা সম্পর্কে একটা নিজস্ব ধারণা ছিলো। নীরব প্রশংসাকেই বাবা যথার্থ ভাবতেন। বলতেন, 'লোকে যখন হাততালি দেয়, তখন বুঝি কত মূর্খ শ্রোতা। সঙ্গীতটা কি সারকেস? বাজনা তো এমনি হবে যে লোকে মন্ত্রমুগ্ধ, মৌন ও সম্মোহিত হয়ে শুনবে। তবে বুঝবে সত্যিকারের সঙ্গীত হচ্ছে। এখন তো উল্টো। শিল্পীরা লোক লাগিয়ে হাততালি দেওয়ায়। সেই ব্যাঘ্র চর্মাবৃত গর্ধবদের রাষভ শুনে মূর্খ শ্রোতারাও হাততালির ধ্বনি তোলে। এও এক প্রকার পার্টি।'

সঙ্গীতের আদর্শ বোধটা বাবার জীবনে একটু ভিন্ন ছিল। আমার পরিভাষায় মহানতম। যদিও সঙ্গীত-বণিকসূতদের কাছে তা ছিল মূর্খতা। কিন্তু কে মূর্খ, সেটা তো ইতিহাসের বিচার্য। বাবা সঙ্গীতের বৃহত্তর স্বার্থে অনেক আপাতলাভ ও অর্থকে বিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করতেন, লোভের কুকুরকে লাই দিতেন না। সাধারণতঃ কোন লোককেই বাবা ছোটো বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না। শুধু ব্যতিক্রম ছিল আত্ম সুখলোভী ভোগীদের ব্যাপারে। যাঁরা জীবনের সব মূল্যবোধকে বিয়োগ করে শুধুই ভোগের উপকরণ যোগ করে, যাঁদের সম্মানের মোটা ভাতে পেট ভরে না, সম্মানের মোটা কাপড় যাঁদের চামড়ার কমনীয়তাকে আঘাত পৌঁছয় বা যাঁদের কাছে ভোর থেকে রাত শুধুই ভোগবিলাসের জন্য অর্থাৎ এক কথায় যাঁরা অর্থজ, তাঁদের দেখলেই বাবা বলতেন, 'বাঈ বাড়ীর পিকদান। নীচদের উচ্ছিষ্ট ভোগী। এঁরা আবার সঙ্গীতের কি সেবা করবে? এঁরা নিজেরাই শিশু খেয়ে নেয় কারণ এঁদের মরার পর জলপিণ্ড দেওয়ারও কেউ থাকে না।'

এঁদের দলকে বাবা সবসময় এড়িয়ে চলতেন। এবং নিজের পরিচিত প্রিয়জনদেরও বলতেন, 'লাভই হোক বা ক্ষতি, অর্থের বিকিকিনিতে সঙ্গীতের ব্যবসা কোরো না।'

কথায় বলে পথে বা কাজে নামলেই বন্ধু চেনা যায়। বাবার ওপর বই লিখছি। শুধু মাত্র এটা জেনে কেউই শঙ্কিত হন নি। কিন্তু যখন মনে একথা জাগলো যে কি রকম লিখছি, তখন আমার এক শুভেচ্ছু মঙ্গলাকাঙ্খী বোঝালেন, 'এ সব লিখে কি লাভ? অকারণে শত্রুতা বাড়বে। আপনি কি দুনিয়ার খারাপ শোধরানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। আর তাছাড়াও, এই বইএর মাধ্যমে নিজেদের ঘরের কথা বাইরে যাবে, লোকের চোখে ঘরের লোকেরা ছোটো

হবে। এ সব কেচ্ছাকাণ্ড এড়ানো যায় না কি?' আমার উত্তর ছিল, 'যেত, যদি না আমাদের ঘর ঐতিহ্যমণ্ডিত হ'তো। পয়সা দিয়েও যে ইতিহাস লেখকদের অতীতে রাজা-মহারাজা, বাদশাহরা পুষতেন, তাঁরাও কিন্তু মুখে অন্নদাতার জয় বললেও, লেখার সময় সততার আলোকেই লিখতেন সত্যকে। মেগাস্থেনিস লিখেছিলেন আলেকজাণ্ডারের ব্যভিচার ও যৌনরোগে পরিসমাপ্তির কথা।'

ইতিহাস বিকৃত হওয়া ও করা ভাল নয়। তাই আমার এ বই লেখা। আমার এই আশঙ্কা যে কত পরিমাণে সত্য তা প্রমাণিত হোল, যখন বিলিতি লেখক মারকুইস এর লেখা বই (এর প্রথম সংস্করণে) "হু ইজ্ হু ইন দি ওয়ার্ল্ড"-এ দেখলাম বাবার জন্মসন ১৮৬২। আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখলাম। লেখক ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিলেন, 'পরের বার শুধরে দেব।' এখন যাঁরা এই তথ্যকে ভিত্তি করে গবেষণা করবেন তাঁরা তো ভুল পথে হেঁটে, ভুল পরিণামেই পৌঁছবেন। এটাই কি ইতিহাসের স্বার্থে বই লেখার যথেষ্ট যৌক্তিকতা নয়।

কথায় বলে ফলের গাছ লাগাও উত্তরসূরীদের জন্য আর ফলদান কর পূর্বসূরীদের জন্য। বাবার প্রসাদপুষ্ট যাঁরা, তাঁদের কাছে বাবা যদিও কিছুই কামনা করতেন না, তবুও কিছু প্রসাদ ধন্যকে কৃতজ্ঞ হতে দেখেছি। যেমন বাবার বড় ভাই ফকির সাহেবের শ্যালক আলি আহমেদ খাঁ বা অন্নপূর্ণাদেবী। এঁরা বাবার প্রতি অকৃতজ্ঞ হন নি। তাই নিজেদের যশের প্রচার না করে, বাবার নামে বা স্মৃতিতে সঙ্গীত সংস্থা এবং বিদ্যালয় খুলেছেন। বরং আমার মত সাধারণ ব্যক্তিও নিজের সীমিত ক্ষমতার ভেতরে বাবার স্মৃতি রক্ষার চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাবার যশ ও কৃতিত্বকে অক্ষয় করে রাখা।

ব্যক্তির জীবনে যশের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এ নিয়ে অদ্যাপি সারা বিশ্বে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক আছে। সেকেলে কবি যদিও লিখেছেন, 'লোকে যারে বড় বলে সেই বড় হয়।' এখন ধরা যাক সারা দেশের লোক বলতে ভুলে গেল। তা হলে কি বিনা যশেই জীবন বৃথা যাবে? এ কখনই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। তাই স্বঘোষ ক্রিয়াপদের আত্মনেপদে যশের ধাতুরূপ বেশীরভাগ লোকেই পাঠ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা উক্তি প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছিলেন "যশঃ"। পৃথিবীতে এমন কেহ নাহি যাঁহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর তাঁহারও বুদ্ধির সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কসাইয়েরও যশ শুনিয়াছি। মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখনো মেষ মাংস বলিয়া কাহাকেও কুকুর মাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে, আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুসখোর অপবাদ, সক্রেটিস অপযশ হেতু দণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণ বধে মিথ্যাবাদী। অর্জুন বভ্রুবাহন কর্তৃক পরাভূত। কাইসরকে যে বিথীনিয়ার রাণী বলিত সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত। সেক্সপিয়রকে ভলটেয়ার ভাঁড় বলিয়াছিলেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়েই বিচারক নহে। কেননা সাধারণ লোক মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ স্থূল বুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আত্মার কি সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই। যে দু'চারি জন আছে

তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান-অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান কেবল দাসত্বের প্রাধান্য চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহিনা। মান চাই কেবল আপনার কাছে।'

এত কথা লেখার মাত্র একটাই উদ্দেশ্য। এটা খতিয়ে দেখা, যে বাবা আপনার জনদের কাছে কি মান আর যশ পেয়েছেন। সত্যি বলতে জগৎ দুনিয়া কি দিয়েছে তাঁর থেকে স্বজনদের দেওয়ার মূল্য অনেক বেশী নয় কি?

যেমন বাজনার ভেতরে অনেক রকমের তার আছে। মন্দ্র, মধ্য বা তার সপ্তকের, সবেতেই আলাদা আলাদা সুর। মন্দ্রে গম্ভীর, মধ্যতে হাল্কা, আর তারে তীক্ষ্ণ। কিন্তু সুর যেমনই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মধ্য সপ্তকের 'সা' তে এসেই স্থির হবে। বাবাও এই মধ্য সপ্তকের 'সা'-তে এসেই স্থির হয়েছিলেন। এই ওঁকারের সা-তেই ওঁর স্থিতি হয়েছিল। তিনি জীবনে নাদের, ব্রহ্মের যে স্বাদ পেয়েছিলেন তা সারা জীবন অকাতরে সবাইকে বিলিয়ে ছিলেন। তাই তিনি মহৎ ছিলেন।

সংসারে সকলে যে মহৎ হতে পারে বা এই মহত্বের দাবী করতে পারে, তা নয়। কিন্তু মহত্বের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকাও তো এক রকমের মহত্ব। বাবার শিষ্য বলে অনেকেই তো নিজেকে প্রচার করে কিন্তু সেই মহত্ব কি তাঁদের আছে? কে জানে? যাঁদের আছে তাঁরা সঙ্গীতে ভাগ্যবান। যাঁদের নেই, তাঁদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলতে পারি।

বহু বছর আগে লক্ষ্ণৌয়ের প্রবাসী ইঞ্জিনিয়র প্রয়াত অভিনেতা পাহাড়ী সান্যালের অগ্রজ শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন সান্যাল বলেছিলেন, 'বাবার সমসাময়িক উস্তাদদের যে সব পরিবেশ ছিল তার থেকে বাবা একেবারে স্বতন্ত্র ছিলেন। যুগের হাওয়ার সাথে প্রত্যেক লোকেই নিজের পেশায় কিছু না কিছু পরিবর্তন করে থাকে বা অন্যের সাথে মিল থাকে এবং থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু বাবা সত্যই বিচিত্র। কোন মিল ছিলো না। কারো সাথে না বেশভুষায়, না খাওয়া দাওয়ায়, না চালচলনে, না মন মেজাজে। এ কথায় স্বতন্ত্র, একক অনন্য!'

এ যুগে যেমন একটু গান বাজনা করতে শুরু করলেই নক্সা করা পাঞ্জাবী, গলায় সোনার চেন আরো নানা রকমের আনুসঙ্গিক জিনিষ থাকে। সে রকম বাবার যুগেও ছিলো কিন্তু বাবা সব থেকে আলাদা। বাবার বক্তব্য ছিল ঝুটো মণির পেছনে না দৌড়ে, সেই মণি খোঁজো যা চিন্তামণির সন্ধান দেয়। সঙ্গীত হোল সেই মণি।

বাবার সম্বন্ধে কথা উঠলে আমার সর্বদাই মনে হয়, তিনি ছিলেন বহুর ভেতরে এক। অসংখ্যের ভেতরে একক সংখ্যা। আমার চোখে আর অন্য পড়েনি। সব নদীই যেমন গঙ্গা নয়, সব পাহাড়ই যেমন হিমালয় নয়, সব মৃগই যেমন কস্তুরী নয়, তেমনই সব উস্তাদই উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ নয়।

এগুলো লিখতে বসে বারবার একটা কথা মনে পড়ছে। বাবা তখন অন্তিম শয়নে শায়িত। মৈহারের নির্জনে বাসকারী এক মৌলভী বাবার মৃত্যুর পর রোজ মাজারে এসে ধূপ জ্বালিয়ে কিছু বিড়বিড় করে বলতেন। মোমবাতির আলোয় সেই ভাবগম্ভীর মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে বাধতো কি বলছেন। তথাপি একদিন জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম।

বাবার ছাত্র হিসাবে জানতেন বলেই কৃপাপরবশ হয়ে বললেন, "আল্লা নূর-এ-ইলাহী বাবার মাধ্যমে আলো পাঠিয়েছেন।"

নতজানু হয়ে বলে চললেন, "তোমরা এসো, এই আলো বুক ভরে নাও। সমস্ত সত্ত্বা ভরে এই আলো পান কর। এই আলোয় সকলে মিলে একবার অন্তরের জগৎ সৃষ্টি কর। যে যেখানে আছো এসো। আলো থেকে এসো। অন্ধকার থেকে এসো। গৃহ থেকে এসো। গুহা থেকে এসো। বাবারা, মায়েরা, ভাইরা, বোনেরা, এসো হে সুধীজন তোমরাও এসো। হে বেদনাহত তোমরাও এসো। হে শক্তিমান, হে পদানত তোমরাও এসো। হে ভোগশ্রান্ত, হে কর্মক্লান্ত তোমরাও এসো। হে জীবনতাড়িত হে মরণতাড়িত তোমরাও এসো। জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছেন।"

হিন্দি উর্দুতে মিশিয়ে কথাগুলো বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন মৌলভী সাহেব। সেই দিব্যজ্যোতিকে যাঁরা আলেয়া ভেবে তথাকথিত বেলওয়ারির ঝড়ের রোশনাই-এর পেছনে দৌড়েছেন, তাঁরা কি পেয়েছেন জানি না, কিন্তু কি হারিয়েছেন বুঝি। সময়ের সাথে অনেক বস্তুরই পরিবর্তন হয়। সুবিধাবাদীরা আদর্শেরও পরিবর্তন করে। অবশ্য আসলে সেটা আদৌ কোন আদর্শ নয়, কারণ আদর্শ কোনদিন বদলায় না। আদর্শ চিরকালের। পিতা, মাতা বা গুরুভক্তিও চিরকালের। যদিও ভক্তি প্রকাশের ভঙ্গীটা যুগের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যেতে পারে। তবে এটা ঠিক যে, যা হীন, তা চিরকালই হীন। যা মহৎ, তা চিরকালই মহৎ। যদিও এ নিয়ে তর্ক করার অবকাশ আছে, কিন্তু তর্ক মনকে বড় তিক্ত করে তোলে।

পৃথিবীর যে কোন জাতি বা বিশেষ ব্যক্তির উত্থান পতনের সত্য কাহিনীকে নিয়েই ইতিহাস রচিত হয়। তাই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কখনো বদলানো যায় না। যে ঘটনা এককালে ঘটে গেছে, সে ঘটনার ইতিবৃত্ত অটুটই থেকে যাবে। যদিও মাঝে মাঝে পরিবর্তনের বাতুল চেষ্টা হয়ে থাকে।

শিক্ষার সময় বাবা বলতেন, 'জীবনের দিন আর সঙ্গীতের তান কখন ফেরৎ আসে না। যদি আসে তা হলে তা হয় একঘেঁয়ে আর রোজ নতুন মানে জীবন্ত।' অনুতাপ দগ্ধ অশ্রুকে বাবা চিনতেন, তাই এর ব্যতিক্রম চিনতেও সময় লাগত না। সে রকমের চালাকি দেখলেই বলতেন, 'হায় হায়, কুমীরের চোখে জল।' বাবার বিশ্বাস ছিল, লজ্জা নারীর আর কর্ম পুরুষের ভূষণ। এর অন্যথা হলেই মাথা গরম। বারবার বলতেন, 'কর্মাধীন ভগবান আর কর্মহীন পশু। যে যাঁর মতে পুজো করে। কারো উপাদান ফুল চন্দন, কারো সঙ্গীত। মোদ্দা কথা উপাদান নয়, ভক্তি, নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধাই হোল আসল। সেটা না থাকলে সবই ব্যর্থ।' তেমন আলস্য আর অসৎ আচরণের উপদেশ বাবা একদম সহ্য করতে পারতেন না।

মৈহারের ডাক্তার গোবিন্দ সিং একদিন আমাকে দেখিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যতীনদাদা তো সব কিছু ছেড়ে আপনার কাছে বাজনা শিখতে এসেছেন। কতদিনে বাজনা শেখা শেষ হবে?' বাবা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বাবার ভয় পাছে আমি চলে যাই। বাবা বললেন, 'সঙ্গীতবিদ্যা অপরমপার। তিরিশ বছর বাজানোর পর এঁর ভেতর প্রবেশ করা যায়।' আমি তো অবাক। বাবা বলেন কি? হঠাৎ গোবিন্দ সিং বাবাকে বললেন, 'বাবা আপনি

তো বলেন যতীনদাদা আপনার বুড়ো বয়সের ছেলে। আপনার বড় ছেলে আলিআকবর তো জ্ঞানী, ছোটো ছেলে হোল ভক্ত। বড় ছেলে নিজের পায়ে চলে, আর ছোটো ছেলে তো বাপের কাঁধে চেপে চলে। সুতরাং আপনার ছোটো ছেলেই নিশ্চয়ই সঙ্গীতে প্রবেশ করবে।'

এ কথা শুনেই বাবা ছোটো শিশুর মত খুশী হয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি তো বড় ভাল কথা বলেন।' সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু বললেন, 'এ আমার কথা নয়। রামায়ণে হনুমানজীর কথা।' বাবা হনুমানজীর উদ্দেশ্যে করজোড় করে বললেন, 'আপনার মাধ্যমে কত ভাল কথা শুনি।' বাবা বলতেন, 'দুরকমের শিক্ষাই করতে হয়, যন্ত্রের আর মন্ত্রের। মন্ত্র বলতে বাবা বোঝাতেচাইতেন সুশিক্ষা সদুপদেশ। তাই রোজ শিক্ষার পর কিছু কথা বলতেন। এখন হয়ত কেউ তর্ক করতে পারেন, আপনার গুরু আপনাকে বলেছেন আমাদের তাতে কি? আমি বলব প্রয়োজনীয়তা আছে বৈকি। যুগ বদলাচ্ছে, মানুষ বদলাচ্ছে। এ কথাগুলোই তো তাদের বোঝাবে, সব নতুনই ভাল নয়।

৮৪

অতীতের ন্যায় অন্যায়-এর মান আজ বদলে গেছে। লোকে এখন ভাবে জীবনটা মাত্র কয়েকটা বছর। আগে ভাবা হ'তো বা বিশ্বাস ছিল অনন্ত জীবন প্রবাহ। এই বিশ্বাসে যেই আঁচড় খেল লোকের মনে হোল 'সারভাইভেল অফ দী ফীটেস্ট'। যে যত যোগ্য সেই বেঁচে থাকবে। তা সে ছলেই হোক, বলেই হোক বা কৌশলেই হোক। মাঝখান থেকে একটা কথা লোপ পেল। "হিউম্যান ইজ্ র‍্যাসনাল।"

বাবা বিশ্বাস করতেন সদ্গুণ ঈশ্বর দত্ত। তাই একে ধরে রাখার জন্য কোন মানবীয় প্রচেষ্টার দরকার নেই। সৎকে ধরে রাখে সততা। আর সততার জন্য অন্যকে বঞ্চনা করার দরকার নেই। ওঁর বক্তব্য ছিল সততা থেকেই আসে ভক্তি। ভক্তি আসলেই আস্থা জাগে। আস্থা থেকে জন্মায় মমত্ব। এই মমত্ব না থাকলে বাজনা শুনিয়ে চোখে জল আনা যায় না। বহুসময়ে বিশেষ করে শেখানোর সময় বাবার রুদ্ররূপ থাকতো কিন্তু তার ফাঁকেও নিজে বাজাতে বাজাতে কাঁদতে আরম্ভ করতেন। এ প্রত্যক্ষ করেছি। প্রবাদ আছে, 'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।' বাবা ছিলেন এর ঠিক উল্টো। সারা মৈহার মানলেও কিন্তু বাবা নিজে গায়ে পড়ে কারুকে কোন জ্ঞান দিতেন না। একান্তই যাঁরা ওঁকে অভিভাবক ভেবে অত্যন্ত আতান্তরে পড়ে আসতেন, বাবা তাঁদের যথাসম্ভব বুদ্ধি, প্রবোধ এবং সৎ পথে চলার নির্দেশ দিতেন। সে সময়ে বোঝা যেত বাবার সমস্যার গুরুত্ববোধ এবং সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি। এ প্রসঙ্গে দুএকটা ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মৈহারে এক ভদ্রলোক এসে একদিন বাবাকে বললেন, 'ওমুক ভদ্রলোক অত্যন্ত মন্দ।' নানা অভিযোগ শোনার পর বাবা বললেন, 'ভাল মানুষ আছে, মন্দ মানুষ আছে, সংসার এই দুই নিয়েই। সবাই টাকার আর স্বাচ্ছন্দের জন্য ঘুরছে। সেই ভাল, যে জীবন-মূল্যের বিনিময়ে অর্থ-মূল্যকে চায় না। আর সেই মন্দ যে অর্থমূল্যের স্বার্থে জীবনের মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়। পার তো সেই সব মানুষদেরই দেখবে যাঁরা জীবন দিয়ে মূল্যবোধকে ধরে রাখে। নিজেও চেষ্টা করো মূল্য যেন হারিয়ে না যায়। তারপর সে যখন চলে গেল, বাবা

আপন মনে বলে উঠলেন, "মন তুমি বুঝ বড়, নিজের ছিদ্রের নাই পারবার, পরের ছিদ্র তালাশ কর।"

একবার এক ধনী ব্যবসায়ী বাবার কাছে এসে নিজের নানা দুঃখের কথা বলতে থাকলেন। বাবা সব শুনে বললেন, 'সুখের পেছনে তো সবাই দৌড়চ্ছে। কিন্তু দুঃখ? দুঃখ সর্বদাই গভীর ও ব্যাপক। দুঃখ মানুষকে ব্যক্তিত্ব দেয়, স্বাতন্ত্র দেয়। দুঃখ মানুষকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে। দুঃখ অশেষ। তাই দুঃখ দুর্লভ। সেই জন্য দুঃখ কেউ চায় না। সুখ সকলেই কামনা করে, আর না চাইতেই দুঃখ পাওয়া যায় বলে দুঃখের এত অনাদর। কিন্তু এই অনাদরের সামগ্রীকে মূলধন করে খাটিয়ে কত মানুষই বিরাট অঙ্ক লাভ করে মনুষ্য সমাজে মহাজন হয়েছেন এর ভূরিভূরি উদাহরণ আছে।' এই কথা শোনার পর সেই ব্যবসায়ী বাবার পা ধরে বললেন, 'আপনার বলায় আমার চোখ খুলে গেছে।' বাবা বললেন, 'আরে আরে কি কর? আমি মহামূর্খ। আমার কথায় তোমার কি জ্ঞানলাভ হোল?'

বাবার এক অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ব্যবসায়ী অত্যন্ত মুহ্যমান অবস্থায় এসে একদিন বললেন, 'একজনের উপর বিশ্বাস করে ব্যবসার ভার দিয়ে মাস দুয়েকের জন্য বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখলাম সর্বসান্ত।' বাবা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। যে ঠকায় তার মন সর্বদাই কলুষিত থাকে। সবসময়েই সে নিজেকে অপরাধী মনে করে। আর যে ঠকে, তাঁর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে সে জীবনে পরশপাথর হয়ে যায়। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই, যে সরলভাবে কাউকে বিশ্বাস করে ঠকেনি।'

সব শেষে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের ইতি টানব। একবার একটি লোক লোকনিন্দার ভয়ে মৈহার ছেড়ে চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হবে মনস্থির করে বাবার সাথে শেষ দেখা করতে এলো। সবকথা বলার পর আশীর্বাদ চেয়ে প্রণাম করামাত্র বাবা বললেন, 'আরে আরে এ কোন পাগলামীর কথা! চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবে কেন? যাঁরা নিন্দা করে তাঁরা হিতৈষী নয়, তাঁদের কথা শুনে নিজের সর্বনাশ করার কোন মানে হয় না। তাঁদের নিন্দা গায়ে মাখবে, তাঁরা তোমরা স্বজন। আর স্বজনকে ফেলে কেউ যায় নাকি?'

বাবার কথা শুনে লোকটি পা ধরে বলল, 'আপনি সত্যই বাবা। বাবা না হলে এ রকমের উপদেশ কে দেয়।' সঙ্গে সঙ্গে বাবা বললেন, 'আরে নানা, আমি কি উপদেশ দেব। আমার যা মনে হয় তাই বলি। আমি তো লেখাপড়া শিখিনি। আমি জ্ঞানীগুণী নই। তবে আল্লা আমার মুখ দিয়ে কি বলিয়ে দেন জানি না।'

মৈহারে নিয়ম ছিলো সন্ধ্যায় বাবার নমাজ পড়া শেষ হলেই তাঁকে প্রণাম করে বাজাতে বসা। আমি সর্বদাই দূরে দাঁড়িয়ে ওঁর নমাজ পড়া দেখতাম। যে মুহূর্তে নমাজ শেষ হ'তো গিয়ে প্রণাম করতাম। ঠিক সেই সময়ে বাবার চেহারায় এক অদ্ভুত ভাব দেখতাম। এ কথাটা আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। কাউকে বলিনি। বাবার জন্ম-উৎসব পালন হচ্ছে কোলকাতায়। খবর পেয়ে গেলাম। দেখা হোল সর্বজন শ্রদ্ধেয় তবলাবাদক শ্রীযুক্ত

হীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি মশাই এর সঙ্গে। তাঁর কাছে একটা ঘটনার কথা শুনে মুগ্ধ হলাম। যা শুনলাম হুবহু লিখছি।

"উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে কোলকাতার আশুতোষ কলেজে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে বাবার সাথে বাজনা ছিল। বাবার বাজনা ভোর রাতে। যদিও বাবা এসে গিয়েছেন রাত বারোটায়। বসে গান শুনছেন। সারা রাত বসে গান শুনলে বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। এ কথা সকলে বুঝতে পারলেও, বাবাকে বিশ্রাম করতে যাওয়ার কথা বলার কারও সাহস নেই। যেহেতু বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন তাই সকলে আমাকেই বললেন, বাবাকে বিশ্রাম করার কথা বলতে। বলামাত্র বাবা ওপরে এসে বসলেন। রাত শেষ হয়ে আসছে।' বাবা বললেন, 'একটু নমাজ পড়ে আসি।' কি বলবো ভাই, সে দিনের কথা আজো মনে আছে। মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাবার নমাজ পড়ার সময় হঠাৎ মনে হোল একটা তেজ বেরোচ্ছে। জ্যোতি! তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

এখন মনে হয় অলৌকিক। এ শুধু একান্তে সাধনা করলেই সম্ভব হয়। আর তাই বাবা বারবার বলতেন, একান্তে সাধনা করবে। সাধনার সময় কেউ থাকলেই শোনাবার প্রবৃত্তি জাগে। যে জিনিষটা হাতে তুলতে পারছো না সেটাই বারবার বাজাবে। কিন্তু সামনে যদি কেউ বসে থাকে, একাগ্রতা ভঙ্গ হবে। তাই সাবধান! সাবধানেরই আর এক নাম সাধনা। শিক্ষা দেওয়ার সময় বাবা একটা কথা বারবার বলতেন, 'বাজালেই বাদক হয় না। কিন্তু যে অভ্যাস করে, শোনে বা চর্চা করে, তাঁর সমস্ত অশুভ সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গীদের দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। পাপ থেকে নিবৃত্তি হয়। সুখ প্রাপ্ত হয় এবং পরম পদের সামিপ্য প্রাপ্তি হয়। তাই সাধনা করতে যাও, ফল পাবেই।'

জীবন তো আর বালুর চর নয় যে সব দাগই মুছে যাবে। দিনগুলো মুছে গেলেও ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আমাকে হাতছানি দেয়, পিছু ডাকে। বাবা বলেছিলেন 'দলে নাম লিখোলে হালে পানী পাবে, আর পার্টির বাইরে হলেই মরেছ, খেতে পাবে না। ওঁরা পেটেও মারে পিঠেও মারে। দলে মিললে ইহকাল সুরক্ষিত হয়, কিন্তু পরকাল নষ্ট হয়। আর পরকাল বাঁচাতে গেলে সারাটা ইহকাল কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। এ বড় কঠিন কাজ কারণ যেখানে 'জয়' বললে লাভের বাতাসা পাওয়া যায়, সেখানে প্রতিকূলতার চাবুক কারো কি ভাল লাগে?' বাবার সব উপদেশ মনে নেই। যতটা আছে তার সবটার অর্থ বুঝতে পারি না আর যতটা বুঝি তার অনেক অংশই পালন করতে পারি কি যথার্থ ভাবে? বাবার বক্তব্য ছিল একটি কথাই, আমরা এতদিন জানতাম, 'সদা সত্য কথা বলিবে আর 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' অর্থাৎ অপ্রিয় সত্য বলিবে না।' কিন্তু ওঁর ধারণা ছিল সত্য মানেই শিব, সুন্দর, পূর্ণ এবং শাশ্বত। তাই সত্য আনন্দময় ও প্রিয়তম। তাই অপ্রিয় সত্য কথাটা ভুল, আসলে ওটা আপাত সত্য, মূলে অসুন্দর। তাই অপ্রিয় সত্য হতেই পারে না। এ দুটো পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব।

একদিন ডাক্তার গোবিন্দ সিং কিছু লোকদের নিয়ে এসেছেন বাজনা শুনতে। বাবা বাজাতে বাজাতে কাঁদতে লাগলেন। সেই বাজনা ও জলসার বাজনা আসমান জমীন তফাৎ। হঠাৎ বাবা বললেন, "সঙ্গীত হোল তপস্যা। যাঁরা মহাত্মা তাঁরাই তপস্যা করে। সিদ্ধিলাভ

করতে পারে। আমার তো সারা জীবনই চলে গেল কিন্তু সেই সত্যকে পেলাম না। আপনারা তো ব্রাহ্মণ, পৈতে হয়, মন্ত্র পান। জপ হয় দুই ভাবে, হাতে আর মনে। মনের সাধনাই কঠিন তপস্যা। উঁচু ডালের ভাল ফল খেতে গেলে গাছে কষ্ট করেই চাপতে হয়।"

নিঃসন্দেহে বাবা সঙ্গীতের প্রত্যেকটা ফলকে অত্যন্ত কষ্ট করে পেয়েছিলেন। বাবার পাওয়াটা পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা ছিল না। সবটাই ছিল কঠিন তপলব্ধ। কিন্তু আমরা সহজেই তাঁর কাছ থেকে পেয়ে পাওয়ার গুরুত্বটা কম করে ফেলেছি। মৈহার যাবার প্রাক্কালে, আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক আমার বিষয়ে বাবাকে পরিচয় দিতে গিয়ে চালাকীর বিষদাঁত ফুটিয়ে বলেছিলেন, 'সবে কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে, একটু চঞ্চল।' এঁর জের বহুদিন চলেছে। বাবা প্রায়ই বলতেন, 'সে ঠিকই বলেছিলো, তোমার মন চঞ্চল।'

চঞ্চল মনকে লাগাম দেওয়ার কথা বলতেন বাবা। গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'সকলেরই মন চঞ্চল। বৈরাগ্য এবং অভ্যাসের দ্বারাই মনকে বশে আনা যায়। মনকে বশে আনলে, তবেই সঙ্গীতের সাগরে ডুব দেওয়া যায়। রিয়াজের প্রতি ছেনির আঘাতে চঞ্চল পাথুরে মনকে কেটে ধীরে ধীরে মূর্তি গড়বে। মনে রাখবে, মূর্তি কোন না কোন রকমে সকলেই গড়তে পারে, কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা সেই করতে পারে, যাঁর কাছে আছে মায়ের মমত্ব। তাই নিজের সাধনা করে চল। অহংকারকে, নিজের মনে স্থান দেবে না। আমি করছি, এই ভাবনাই বিরাট বোঝাস্বরূপ। এই ভাবনা এলেই মানুষের পতন হয়। জ্ঞানের দ্বারাই মন বিশাল হয়। যাঁরা সত্যকারের কর্মযোগী তাঁদের কখনও অহঙ্কার হয় না। জ্ঞানভক্তি কর্ম দিয়ে যদি ঠিকমত সাধনা করতে পার, তাহলে নিজেকে দীন মনে হবে। দুহাত খালি করে, দুহাত তুলে না ডাকলে, তাঁকে পাওয়া যায় না। এই বলেই বাবা গাইতেন—

স্থায়ী

দীন বন্ধু দীননাথ দয়াসিন্ধু মধুসূদন
নারায়ণ শবসিংহ বামন জগদীশ

অন্তরা

মচ্ছ, কচ্ছ, বরাহরূপ রাম রাম পরশুরাম
কৃষ্ণ গিরিধর গিরিধারী গোপাল তাঁকে তাদিশ।।

যদিও এই ধ্রুপদ আগে শিখেছি, কিন্তু এখন বুঝি বাবার ছিল দৈন্যযোগ। তাঁর বিশ্বাস ছিল পূর্ব আস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ায়। অরূপ রতন পাওয়ার কোন সর্টকার্ট বাবা জানতেন না, তাই শেখাতেও পারেন নি। তাই সকলের জীবনেই সাগর আছে, কিন্তু কজন ডুবুরী বা কজনই মণি মুক্ত তুলতে পেরেছে বাবার মত।

কতকাল আগের কথা। তারপর সময়ের কত পলি পড়েছে। স্মৃতি শক্তি প্রবল হওয়াও এক অভিশাপ। সবাই যেটাকে অচিরাৎ ভুলে গেছে, সেটাকেই আমি অতীত সুখ স্বপ্নের স্মৃতি হিসাবে ধরে রেখেছি। সকলকেই দেখি বিস্মরণের ঝাঁটা দিয়ে অতীতকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে। কিন্তু আমি পারি না কেন? যেটাকে বাতিল মেনে সবাই নিশ্চিন্ত, আমি কেন সেটাকে পরম যত্নে বুকে জড়িয়ে রেখেছি। বোধহয় এই জন্যই যে, ইতিহাসকে ঝেঁটিয়ে সাফ করা যায়

না। গেলে হিন্দুরাজ পুষ্যমিত্র সুঙ্গ সব অশোক স্তম্ভ লোপাট করে দিতেন। আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লীর বুকে কুতুবুদ্দিনের স্মৃতি, কুতুবমিনার থাকতে দিতেন না। থাকতো না তাজমহল। শেষ হ'তো মনুমেন্ট। তাই অতীতও থাকবে আর থাকবে তার স্মৃতিও।

আমার সঙ্গীত-স্বজনদের স্মৃতিশক্তি যে দুর্বল তা বলব না। তবে 'মনে নেই' বলে, কথাটা অনেকেই না জানার ভান করেন। আসলে সত্য কখনও কেউ ভুলতে পারে না সম্পূর্ণভাবে। বই লেখা পর্বে যাকে যখনই যা প্রশ্ন করেছি, বেটক্কর হলেই জবাব পেয়েছি, ভুলে গেছি, মনে নেই। কিন্তু মুখ, মুখে তো ফুটে উঠেছে-মিথ্যার প্রতিচ্ছবি। অভিনয় ধরা পড়ে যায়। আসলে তাঁরা কোন দ্বন্দ্বের ভেতরে যেতে চান না। ওঁদের জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পেয়েছি, 'পুরোন কথা মনে রেখে কি লাভ? ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করাই বুদ্ধির কাজ।' এ কথার উত্তর আমার ঠিক জানা নেই। সকলেই যেখানে অতীতকে ঝুটো কাঁচের টুকরোর মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম অন্নপূর্ণাদেবী। যদিও তাঁর মুখ থেকে কথা বার করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন প্রসঙ্গ উঠলেই মুখে কুলুপ আঁটেন। বাবার ওপর বই লিখছি, এঁর দোহাই দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

আমার কাছে বাবার প্রত্যেকটা কথাই অত্যন্ত মূল্যবান ছিলো। আমার কাছে ছিল কথামৃতের মত। তাই পরিচ্ছেদ অন্ত করার কথা যতবার ভাবি ততবার নতুন করে কিছু কথা মনে পড়ে। বাবা বলতেন, 'সঙ্গীতের দুই পুত্র, কলাকার আর সেবক। কলাকার সঙ্গীতের কলা খায় আর ধীরে ধীরে কদাকার হয়ে যায়। সেবকের ধর্ম হচ্ছে সব রকমের প্রচার থেকে নিজেকে নেপথ্যে রেখে, ঘরে বসে শুধু সাধনা করা। হৈচৈ করা সাধকের কাজ নয়। ঠিকমত সাধনা করলে ভগবান নিশ্চয়ই অন্নের সংস্থান করে দেবেন। অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। সঙ্গীত সেবকের জীবনের সব থেকে বড় শত্রু হোল সাচ্ছন্দ। অর্থই পরম অনর্থ। সুর সৃষ্টি করতে গেলে স্রষ্টা হতে হবে। যে সৃষ্টি করে তাঁকে আড়ালেই থাকতে হয়। যেমন জগতের স্রষ্টা অদৃশ্যই থাকেন।'

বাবা বলতেন, 'সঙ্গীতের কোন শিল্পীকেই ছোটো ভেবো না। কারণ তাঁর সীমিত ক্ষমতা নিয়েই সে সঙ্গীত বা মা সরস্বতীর সেবা তো করছে। হতে পারে তুমি হয়তো একটু বেশী জান, কিন্তু তার জন্য অহংকার কোরো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি পৃথিবীর সব থেকে বড় বাদক হও। কিন্তু মনে রেখ সবার ওপরে ভগবান রয়েছেন। আর তিনি সব থেকে বড় বাদক, কারণ তাঁর হাতে রয়েছে বিশ্ববীণা। কারও বাজনা শুনে হেসো না বা নিন্দা কোরো না। তুমি নিজে কি বাজাও তাই দেখ। পরনিন্দা, পরচর্চা না করে নিজের বাজনার ভুল ত্রুটি সংশোধন কর।'

এ ছাড়া বরাবরই বাবা বলতেন, 'মৈহার থেকে বেরিয়ে, বাইরে যখন বাজাবে, তখন হতে পারে কোন জায়গায় বহু শ্রোতা থাকবে, আবার কোন জায়গায় মুষ্টিমেয় শ্রোতা। সংখ্যা দিয়ে কখন বিচার কোরো না। একজন থাকুক আর হাজার জন থাকুক, শুদ্ধ অন্তঃকরণে সকলকে সমমর্যাদা দিয়ে বাজাবে। কাউকে মূর্খ শ্রোতা ভাববে না। হয় তো দেখলে খুব কম শ্রোতা আছে তাই যা তা করে বাজালে, কিন্তু এমন তো হতে পারে যে তারই মধ্যে একজন গুণী শ্রোতা রয়েছেন, আর তাঁর হয়তো জীবনে আবার পরে তোমার

বাজনা শোনার সুযোগ হবে না। সে ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই যাবে। জীবন ভর তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই সে তাঁর পরিচিত মহলে বলবে, অমুক জঘন্য বাজায়। এছাড়া যাঁরা গুণী তাঁরা তো রাগ, তাল সুর বিচার করবে, কিন্তু যাঁরা কিছুই বোঝেন না, তাঁদের এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে পারলে, সেটাই হবে যথার্থ সঙ্গীত।' বাবার কাছে ধীরে ধীরে জমা হয়েছিল সঙ্গীত কিংবদন্তীর অসংখ্য গল্প ও ঘটনা। সুদীর্ঘ দিন ধরে প্রভূত লোকের সান্নিধ্যে এসে বাবা একে একে জড় করেছিলেন। যখন মন মেজাজ ভাল থাকতো, গল্প বলতেন। তানসেন বিষয়ক বহু গল্পের ভেতরে এ গল্পটি অন্যতম।

একবার তানসেন নিজের বাসস্থানে বিভিন্ন গুণী সমাজকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সঙ্গীত সভার আয়োজন করলেন। গানের শেষে সকলেই প্রশংসা করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক ভবঘুরে ক্ষত্রিয়ও বসেছিলেন। সেই ভবঘুরে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ রাগ আর কখনো গাইবেন না তানসেনজী।' কথা শুনে তো অন্যান্য শ্রোতাদের চক্ষু চড়কগাছ, তানসেনের মুখ ফ্যাকাসে। ভবঘুরে তখনও থামেন নি, বললেন, 'গোয়ালিয়রে গিয়ে যদি আপনার গুরুকে জীবিত দেখতে পাই, বলব তাঁর এককালের প্রিয়তম শিষ্য ভারতের প্রাচীনতম দুটো রাগকে হত্যা করেছে। অবশ্য যদি আপনার গুরুদেবের দেখা আদৌ পাই। তাই অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছি সাধনালব্ধ রাগগুলোকে ভবিষ্যতে বিকৃত করবেন না। বিকৃতির ভয় এজন্য যে, বাদশাহের দরবারী হওয়ার পর, আপনি আর সঙ্গীতের স্বপ্ন দেখেন না। সঙ্গীত কি আজকাল আপনাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিতে পারে? আসলে সস্তা বাহ্‌বার মোহে এই রাগ দুটোকে মোচড় দিয়ে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছেন যে এদের এখন আর চেনাই যায় না। এদের আসল স্বরূপ কি ছিল তা আপনি নিজেও ভুলে গিয়েছেন।'

তানসেন করজোড়ে বললেন, 'আপনি কোন দুটো রাগের কথা বলছেন?' ভবঘুরে বললেন, 'মেঘ আর হিন্দোল।' তানসেন শুনে স্তব্ধ হয়ে যান। ভবঘুরে তখনও বলে চলেছেন, 'যখন গোয়ালিয়রের নির্জন স্থানে বসে সাধনা করতেন, তখন ছিল রাগ আপনার কাছে সাধনার বিষয়। কিন্তু দরবারে এসে সেই সধনালব্ধ বস্তুকে ভাঙ্গিয়ে অর্থ-উপার্জন করেছেন। গোয়ালিয়রের সেই বনফুলকে তুলে এনে প্রাসাদের শ্বেত পাথরের বেদীর ওপর রাখা স্বর্ণনির্মিত পাত্রে রাখায়, হয়তো কৃত্রিম সৌন্দর্য কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু মূল সৌন্দর্য লোপ পেয়েছে। এর মূল কারণ সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি না করে নিজের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি সচেতন হয়েছেন। আরামের স্রোতে একবার গা ভাসালে তখন আর ফেরা যায় না।'

শ্রোতাদের মধ্যে বাদশাহ আকবরও ছিলেন ছদ্মবেশে। তিনি ভবঘুরেকে প্রশ্ন করে বললেন, 'আপনার সঙ্গীত জ্ঞান দেখে আমার ধারণা হচ্ছে আপনি একজন বড় গুণী।' ভবঘুরে বললেন, 'আমি গুণী নই, সঙ্গীত পথিক। তবে কিছু গুণী লোকের পরিব্রাজক হওয়া প্রয়োজন। কারণ সবাই যদি দরবার অলঙ্কৃত করে, তবে দেশের সাধারণ লোক কি করে শিখবে?' তানসেন না চিনতে পারলেও ভবঘুরে বাদশাহকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, 'সবাই দরবারী হয়ে গেলে আপনার বংশধরদের সভায় দরবারী পদে অলঙ্কৃত করার কোন প্রজন্মই আর থাকবে না।'

বাবা যখন যে ভাবে থাকতেন, তখন সে রকমের কথা বলতেন। একটাই উদ্দেশ্য থাকতো, তাঁর থেকে আমরা যেন কিছু শিখি। বাবার সঙ্গীত যেমন অনন্ত ছিলো, তেমনি ছিল তাঁর শিক্ষামূলক গল্প বা উদাহরণ। যাঁর একটাকে অনুকরণ করে জীবন কাটালেই পূর্ণতা আসে।

একবার এক ভদ্রলোক গোয়ালিয়র থেকে সপরিবারে মৈহারে এলেন বাবার সাথে দেখা করতে। নিজের ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, 'গান শিখছে একুট আশীর্বাদ করুন। কিছু উপদেশ দিন যাতে ওর কিছু উন্নতি হয়।'

বাবার সরল উত্তর, 'আমি তো বাবা লেখাপড়া করি নি। কিছুই জানি না। কি উপদেশ দেব? আমি শুধু বুঝি, সঙ্গীত বিদ্যা অপরম্পার। নিজে যতটুকু পেয়েছি বা বুঝতে পেয়েছি তা থেকে এই উপলব্ধিই হয়েছে যে, সোজা পথে না চললে সঙ্গীত হয় না। তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবে। সততা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখবে এবং বিচার করবে, মনন করবে। নিজেকে স্থির দৃষ্টিতে দেখবে। সব চিন্তাগুলোকে জড় করে কপালের মাঝখানে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে আনবে, সেটাই চৈতন্য। যাঁর চৈতন্য আছে সেই চিন্তা করতে পারে। আর যে চিন্তা করতে পারে সেই মানুষ। সব থেকে আলাদা হয়ে একা হবে। তারপর একা থাকবে না। সঙ্গীতকে সঙ্গী করে নেবে। গাছ, জীবজন্তু, চিরসবুজ থাকে। দিতে শিখবে, নিতে নয়। আমি আমি করবে না। আমি বলে কিছু নাই, সবই তুমি। ভেতরটাকে বড় করলে বাইরেটা বড় হয়। নকল থেকে আসল বেছে নিতে শেখো। নিজের সাধনার স্থানকে অপবিত্র কোরো না। মনে রেখ, প্রতিষ্ঠা মানে সত্যের প্রতিষ্ঠা। চরিত্রই হোল একমাত্র ঐশ্বর্য্য। যুদ্ধ হোল নিজের সঙ্গে। জয় হোল নিজেকে জয়। সব সময়ে মনে রাখবে তুমি কোন পরিবারের ছেলে। পিতা, মাতা এবং গুরুকে ভুলো না।'

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে বাবা থামলেন। জানি না সেই ভদ্রলোক বা তাঁর ছেলে কতটা অনুধাবন করতে পেরেছিল বাবার কথা। কিন্তু আমি একটা কথা বুঝেছিলাম, বাবার প্রত্যেকটা কথা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। আর তা না হলে এভাবে বলা কখনই সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। তা হোল, বাবা অন্যের সাথে খুব রসিকতা করতেন কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা চলে যেতেন বাবা একেবারে চুপ। বাড়ীতে আর কোন শব্দ শোনা যাবে না।

বাবার অতিথি সেবা নিয়ে এঁর আগেও অনেক ঘটনা লিখেছি। তবুও একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। একদিন এক বাঙ্গালী বৃদ্ধ সাধু 'নমঃ নারায়ণ' বলে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বাবা তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এসে ঘরে বসালেন। মৈহারের মত জায়গায় সব শুদ্ধ কজন বাঙ্গালী বাবার কাছে এসেছেন শুনে বলা যায়। যাক সে কথা। বাবা ফুল, ফল দিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। তারপর বললেন, 'মহাত্মন্ আমার চিরকালটা তো বৃথাই গেল। ছোট থেকে সঙ্গীতের পেছনে ছুটতে ছুটতে তো বুড়া হয়ে গেলাম। প্রথম জীবনে নিজে

শিক্ষার জন্য দৌড়েছি, আর পরে শেখাতে হয়েছে। যখন নাদব্রহ্ম সঙ্গীত সাধনার জন্য মনের দিক থেকে প্রস্তুত হলাম, তখন দেখি সব শক্তিই ফুরিয়ে গেছে। আপনিই আমাকে বলুন নাদব্রহ্ম কি? কি করলে তাঁর স্বাদ পাবো?'

তত্ত্ব কথা শুরু হবে ভেবে আমি পালাবার কথা চিন্তা করছিলাম, বাবা সেটা আন্দাজ করেই বললেন, 'শুধু শুনলে বুঝবে না, লিখে নাও।' আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার বুড়ো বয়সের ছেলে।' সন্ন্যাসী পাতঞ্জলী যোগ রহস্যের মাধ্যমে শরীর চক্র ভেদ বোঝালেন। সত্যই সুন্দর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং কথাগুলো মনে হোল উপলব্ধি জাত।

এক নাগাড়ে উনি বলে গেলেন আর আমি শ্রুতি লেখকের কাজ করলাম। যে মুহূর্তে কথা শেষ হোল হঠাৎ বাবা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, 'মহারাজ মহারাজ' বলে কাঁদতে লাগলেন। আমিও স্তম্ভিত বাবার প্রণাম ও কান্না দেখে। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই দেখি সাধুবাবা বাবার হাত ধরে বলছেন, 'গৃহীর ঘরে তো আমার আসাই উচিত নয়, তবুও এসেছি কারণ আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।'

সন্ন্যাসী চলে যাবার পর বাবা বললেন, 'কে জানে কোন বেশে এসে ভগবান দেখা দেয়, বুঝতে পারি না। আমার ত্রিনেত্র তো খোলেনি।' খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'যে যতই সাধনসম্পন্ন হোক না কেন, যতক্ষণ বৈরাগ্যের সাথে ঈশ্বরের কৃপা না হয়, ততক্ষণ কোন কাজেই সত্যকারের জয়ী হওয়া যায় না। এই সাধুবাবা সত্যিকারের মুক্ত পুরুষ, তা না হলে এত ভাল কথা কি করে বলেন? একবার পড়ে শোনাও তো কি কি বললেন।' পড়লাম। বাবা দ্রবীভূত হয়ে বললেন, 'রোজ একবার করে পড়বে।'

প্রশংসা এমনি একটা জিনিষ যে কার না ভাল লাগে। কিন্তু বাবার কাছে বরাবর দেখেছি, প্রশংসা শুনলেই 'তোবা তোবা' বলতেন। বাবা বলতেন, 'প্রশংসা হলেই জানবে ধানের পাশে ঘাস জন্মেছে। সুতরাং অবিলম্বে ঘাস কেটে ফেলতে হবে, না হলে ধান অধিক হবে না। প্রশংসার সুখ যাঁরা পেয়েছে তাঁরা কখনো একা থাকতে পারে না। সর্বদাই সরফরাজের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, কিন্তু যাঁরা প্রশংসকদের মন থেকে হটিয়ে দিতে পারে, তাঁরাই সঙ্গীতে প্রবেশ করতে পারে। কারণ একান্তে না থাকলে সঙ্গীত হয় না। প্রশংসকরা আসলে নিজেদের আখের গোছায়।' তাই বাবা লোকজনের অকারণ সমাগম দেখলেই বলতেন, 'লোক দেখলেই ত্রস্ত হই।'

আসলে বাবা সরফরাজ বলতে বুঝতেন বা বোঝাতেন, ওপর চালাকি বা চামচাগিরি। তাই কেউ ওঁকে প্রশংসা করলেই, বলতেন, 'সরফরাজীর কোন প্রয়োজন নাই। কি প্রয়োজনে এসেছেন বাবা? খুন করতে? এই সব লোক দেখলে ত্রস্ত হই।' যাঁরা প্রশংসা করতেন, তাঁদের অবস্থা তখন বেহাল হ'তো।

মৈহারের কাছের শহর কাটনী। সেখান থেকে বাবার এক পূর্বপরিচিত ডাক্তার এলেন দেখা করতে। একথা সে কথার ফাঁকে বলে ফেললেন, 'জীবনে কিছুই হোল না। সুখ পেলাম না।' বাবা বললেন, 'সারা জীবন রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কত লোককে জীবন দিয়েছেন। এর থেকে বড় কাজ আর কি হতে পারে? আর সুখ তো শুধু ভূমায়।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভূমা মানে কি?' বাবা বোঝালেন, 'ভূমা হোল মহৎ। মানুষই ঈশ্বর। তাই মানুষের সেবাই তাঁর সেবা।' সত্যই অবাক হবার মত কথা। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডী না পার করে বাবা কি করে এসব কথা বলতেন।

কাট্‌নী প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক নিজের ছেলেকে নিয়ে উপস্থিত। বললেন, 'আমার ছেলে অত্যন্ত প্রতিভাধর। যা শোনে তাই গাইতে পারে। নিজে থেকেই অদ্ভুত গান গায়। অসাধারণ মেধাবী। তাই আপনি যদি দয়া করে ওকে একটু শেখান কৃতজ্ঞ হব।'

বুঝলাম ভদ্রলোকের দুর্গতি রয়েছে কপালে। কারণ বাবা তখন বলতে আরম্ভ করেছেন, 'বাবাজী এই বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাধর ছেলেমেয়েরা আছে। কিন্তু তাঁদের বাবা মায়েরা নিজের সন্তানদের অহেতুক প্রশংসা করে বিগড়ে দেয়। তাঁদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিভার যাচাই অত সহজে হয় না বা সকলে করতেও পারে না। যেমন কয়লা খনির মধ্যে যে হীরে থাকে তাকে জহুরীর চোখ দিয়ে খুঁজে ধীরে ধীরে বের করতে হয়। তাতে সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ হয় না।' এ কথা বলেই বাবা খাম্বাজ রাগে একটি স্বরচিত পদ গাইতে আরম্ভ করলেন, "রে মনা ধীরে চল্, ছলাং লগাকে আগে বড়।।" তারপরেই বললেন, 'আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। ছেলের ভেতরে যখন প্রতিভা আছে তখন প্রথমে লেখাপড়া শেখান, তারপরে গান। সঙ্গীত হোল করতব বিদ্যা, অর্থাৎ করো তবে বিদ্যা পাবেই।'

আমার মৈহারে থাকাকালীন যাঁরাই বাবার কাছে এসেছেন, জানি না তাঁদের কি লাভ হয়েছে, কিন্তু আমার তো প্রতিবারেই অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কিছু না কিছু জিনিষ জমা পড়েছে। যেমন একদিন কাকভোরে পোঁটলা পুটলী হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোক হাজির বাবার কাছে। বাবা বললেন, 'কৈসে আনাহুয়া ইস্ গরীব কে কুটরীমে।' বাবার হিন্দি মানে তো আদ্দেক বাংলা।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি জৌনপুর নিবাসী তবলাবাদক। বড় আশা নিয়ে এসেছি।' নাম জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'লৌকী মহারাজ।' নাম শোনামাত্র বাবা চমকে উঠে বার দুয়েক আমার দিকে চেয়ে অভ্যাস মত বললেন, 'কেমন কেমন!' বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লৌকী মানে তো লাউ। কি জানি বাবা, এরকম নামও হয় নাকি?'

বললেন, 'কার কাছে শিখেছেন?' উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, গুরু ও তস্য গুরুর নাম। দুজনেরই নামের পর মহারাজ রয়েছে। শোনামাত্র বাবা বলে বসলেন, 'সব মহারাজ লোগোঁ কাতো রাজ গয়া, আউর আপলোগ মহারাজ বন বৈঠা।' আমাকে বললেন, 'দেখ কি ঔদ্ধত্য। মহারাজ হওয়াটা কি চারটি কথা। চিরকাল বাঈজী বাড়ীতে বাজিয়ে মহারাজ বলে নিজেকে। মুসলমানদের ভেতরে সঙ্গীতে একটু পাখনা গজানো মাত্র, নামের আগে লাগাবে উস্তাদ। যেমন তোমাদের কাশীতে সবাই পণ্ডিত। আর কোলকাতায় একটু গাইতে বা বাজাতে শিখলেই, নামের আগে লেখে প্রফেছর।' বাবা প্রফেসারকে প্রফেছর বলতেন। ততক্ষণে কথার গতিপ্রকৃতি দেখে আমি রীতিমত উদ্বিগ্ন। বুঝতে পারছি বাবার মেজাজ বিগড়েছে।

হঠাৎ বাবা সেই তবলাবাদককে বললেন, 'আপ তো মহারাজ হৈ, আউর ম্যাঁয় তো দাস, আপকে সাথ কৈসে বজায়েগা।' বাবার কথা শুনে তবলাবাদকটি বলল, 'এ কি কথা বলছেন, সবাই আপনাকে উস্তাদ বলে। আপনি এত বড় 'উস্তাদ', কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বাবা বললেন, 'ভুল করে লোকে আমাকে উস্তাদ বলে। আর যে সব উস্তাদ আছে তাঁরা সত্যই উস্তাদ। কিন্তু আমি হলাম দাসানুদাস।' তবলাবাদককে ইশারায় বোঝালাম, সেও ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছে। তাই আবার আসবো বলে, দরজামুখো হোল। যদিও আর আসেনি।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর বাবা আমাকে বললেন, 'উপাধির আর শেষ নেই। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ আর কি বিভীষণ যেন? এই সব উপাধিই মানুষের গুণকে নষ্ট করে। অনন্তশ্রী, মহারাজ, সম্রাট, প্রফেসর, উস্তাদ প্রভৃতি উপাধিকে কুটিলের শিরোমণি ভাবা উচিত। এই সব কুটিলতাকে কখন পার্ষদ করবে না। এঁরা বন্ধু সেজে কুমন্ত্রণা দেয়। নিজেকে সারা জীবন ছাত্র ভেবে থাকতে হবে। তাহলেই দেখবে সুখ পাবে। নিজের ভেতরে জিজ্ঞাসা থাকলে দেখবে ভিৎ মজবুত থাকবে। বড় হলেই বিপদ। বড় না হওয়ার জন্য নিজেকে আগলে রাখতে হবে। যেমনি বড় হবে, দেখবে নানা জিনিষ এসে ঘিরে ধরবে। পরনিন্দা, পরচর্চা করবে। টাকা, বিষয় সম্পত্তি আর লোভের আগাছা জন্মাবে। নেই, আর হোল না, এই দুই মিলে জীবনকে বিষময় করে দেবে। তাই বিষয়ী লোকেদের কাছ থেকে শত হস্ত দূরে থাকবে। অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। "বেশী চাই" কথাটা কখন মনে ঠাঁই দেবে না। খুদা যা দিয়েছেন, সেটাই তাঁর অসীম মেহেরবাণী।'

এই উপাধির বিড়ম্বনা মৈহার থেকে বেরিয়ে দেখেছি। উপাধি বর্তমানে দম্ভ ও দর্পের বস্তু। ভারতে সব জায়গায় দেখেছি ভাল ক্রেতা হতে পারলে উপাধি যেন কিনতে পাওয়া যায়। একবার যদি কেউ কোনক্রমে ভারতের বাইরে যায়, সে ফেরৎ আসার পর নিজের নামের আগে লিখবে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত। একদা গুণীদের সম্মান করে উপাধি দেওয়া হ'তো। সেটাও সকলে নামের আগে লিখতেন না। যদিও লিখলে আপত্তির কিছু ছিলো না। কিন্তু বর্তমানে তো সবাই 'বিদ্যার দিগগজ'! এরকম লোক দেখলেই বাবা বলতেন, 'দু দিনের বৈরাগী। ভাতেরে কয় অন্ন। কেমন, কেমন।' কেমন কেমন বলতে বাবা বোঝাতে চাইতেন, বোঝো ব্যাপারটা।

৮৫

বাবার ছিল জগৎ সম্পর্কে এক নিজস্ব হাইপথেসিস্। তাঁর বিশ্বাস ছিল সেই পাওয়াই, যাঁর সাথে না পাওয়া জড়িত আছে। সঙ্গীতে যতক্ষণ পাওয়ার ক্ষোভ ও বেদনা জড়িত না হয়, পাওয়া কখনো পূর্ণ হয় না। তাইতো রোজ খিদে পায়। একদিন পেট ভরে খেলে চিরকালের খিদে মেটে না। বাবা বলতেন, 'শরীরের টিকেতে রিয়াজের চক্‌মকী পাথর ঠুকে রোজই তো সুরের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করি। কিন্তু জ্বলে কই। যে দিন সত্যিকারের সুরের আগুন জ্বলবে সে দিন তো সব কালো পুড়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। সে দিন বলবার ভাষা থাকবে না। সুরের শেষ খেয়ায় চেপে চলে যাব চিরসুরের দেশে।' বাবার ছিল থিওরী অফ্ নেগেশান

অর্থাৎ নেতির সিদ্ধান্তে বিশ্বাস। সম্পূর্ণ বহির্জগৎ থেকে একে একে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একক আর একান্ত হওয়া। কারণ তা না হলে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঙ্গীতে সঁপে দেওয়া সম্ভব হয় না। জীবন ধারণের জন্য অর্থ চাই, কিন্তু উপার্জনের পদ্ধতি আর পরিমাণ সম্পর্কে বাবার বিশেষ এক অভিমত ছিল। বাবা বলতেন, 'মালি আর মদের দোকানদার উভয়ই ব্যবসা করে। মালির লাভও কম, লোভও কম। প্রকৃতির ফুল ছেঁড়া ছাড়া আর কোন বিকৃতি নেই। অল্পক্ষণের পসার। জীবনের নবরসের সাথে জড়িত তাঁর পণ্য। ঈশ্বরের অর্ঘ্য, বরের মালা, বীরত্বের বিজয়মালা বা শবের অন্তিমসাজ মালির পণ্যে থাকে। কিন্তু মদের ব্যবসায় থাকে শুধু তিল তিল করে মরার বিষ বেচা পয়সা।' বাবার কথায় ফুল বেচলে অল্প অর্থ আসে কিন্তু পরমার্থের পথ চিরতরে বন্ধ হয় না। মদে আছে শুধুই অর্থ। তাই সঙ্গীতের মাধ্যমে মালির মত অর্থ উপার্জন করো, মদ্য ব্যবসায়ীর মত নয়। এতটা বাণিজ্যিক হয়ো না যে অর্থ আর স্বস্তির জন্য সঙ্গীতের নির্বেদ শান্তি হারিয়ে যায়। লোভের হাত ধরে হাঁটলে কানাগলিতে ঢুকতে হবে, যে গলির শেষ হয়েছে পতনের চোরাবালিতে। দুহাতেই যদি নিজের উপলব্ধির ফসল ধরে থাকো তা হলে হাত জোড়া অবস্থায় সঙ্গীতকে আঁকড়ে ধরবে কি ভাবে?' এ কথা বলার পরই বাবা বলতেন, 'লোকে হয়তো আমার মতে চললে তোমাকে বোকা বলবে। কিন্তু এ মূর্খতা বড়ই সুখের।' কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'এ বিগ্ বুক ইজ এ বিগ্ ডেভিল।' বাবার ওপর লিখতে গিয়ে কলেবর বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে। এমনটা হ'তো না যদি বাবার সন্তান বা ছাত্ররা কিছু কিছু সবাই লিখতো। তাহলে আমি শুধু 'আমার জীবনে বাবা' লিখেই ক্ষান্ত হতাম। কিন্তু আমায় তো লিখতে হচ্ছে 'বাবার জীবনে সবাই'।

রংঢং-এ বাহারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখলেই বাবা বলতেন, 'এক টাকার প্রতিমা আর একশো টাকার ভোগ। ফুলের জন্য পরের বাগানে চুরি! এ ছাতার পুজো। আমি বাবা যে শিক্ষার খুদকুঁড়ো কুড়িয়েছি তাই তোমাদের দিয়েছি। তোমরাও অকৃপণভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তা অন্যকে দিও। পাত্র বিচার করবে প্রতিভায় আর আন্তরিকতায়, আর্থিক ক্ষমতায় নয়। পাপের টাকার বোঝা ঘাড়ে করে ঘুরে মরো না।'

বাবার সেই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই শুরু করেছিলাম 'উস্তাদ আলাউদ্দিন খান মিউজিক সার্কল'। এ এক দুরূহ কাজ। নিজের সঙ্গতিতে সম্ভব নয় আর অনুদান চাওয়ায় অভ্যস্ত নই। তবুও সার্কেলের সচিব মহন্ত বীরভদ্র মিশ্র চেষ্টা চরিত্র করে ইন্‌কামট্যাক্স্ ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করলেন। ছাত্র তো আসতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আবাসিক হবে কি করে? থাকা খাওয়ার সংস্থান চাইতো। সান্ত্বনা আর মনোবল এই যে বাবা যদি নিজের বাবা-মা'র স্মৃতিতে আদি গ্রামে পুকুর খোঁড়াতে বা মসজিদ নির্মাণ করাতে পেরে থাকেন, তাহলে আমিও এ কাজ পারবো। যদিও একটু বেশী সময় লাগবে।

এরকম 'হা-টাকা'র মুহূর্তে বি.বি.সি.-র প্রতিনিধি এ্যান্ড্রু স্টিভেন্‌শন বেনারস এসে হাজির। পরিচয় দিয়ে বললো, 'আমি আপনার পূর্বপরিচিতা ব্রিটিশ সাংবাদিকা লুসি নিকলশনের বন্ধু। ওঁর কাছে আপনার লেখা বই পড়েছি, ক্যাসেট শুনেছি। আমার অনুরোধ এই যে বি.বি.সি. নিউবীর বিখ্যাত রচনা "জী. টি. রোড" বইটাকে নিয়ে একটা দেড় ঘণ্টার

ডকুমেন্টারি ফিল্ম করছে তাতে আপনি সঙ্গীত পরিচালক হোন। আবহ সঙ্গীত ছাড়া কাশীর গঙ্গার ওপর বজরায় আপনি বাজাচ্ছেন, এরও পাঁচ মিনিটের শট্ থাকবে।'

কিছুক্ষণের জন্য দোটানা হলাম কারণ বাবা সিনেমায় সঙ্গীত দেওয়া পছন্দ করতেন না। শেষ পর্যন্ত এ্যান্ড্রু বোঝালো আপনাকে শুধু সরোদই বাজাতে হবে একক ভাবে, অন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োগ থাকবে না। রাজি হলাম কারণ সার্কেলের তাতে কিছু আর্থিক সঙ্গতি বাড়বে।

বি.বি.সি.-র হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বৃত্তি স্বার্থে পশ্চিম ভারতের কয়েক জায়গায় যেতে হোল। সব শেষে বম্বে। গিয়েই প্রতিবারের মত অন্নপূর্ণাদেবীর সাথে দেখা করি। এবারও গেলাম। ওঁর জীবনযাত্রা ও ছন্দ এখনো একই পথে চলছে।

এ যাবৎ কোন দিন অন্নপূর্ণাদেবীর দিন চর্যা নিয়ে কোন প্রশ্ন করিনি, যা দেখেছি তাই জেনেছি। কিন্তু এবার প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা সারাদিন কি করেন বলুন তো?' সাদামাটা উত্তর দিলেন যা যা করেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'খান কখন, শোন কখন আর রিয়াজইবা কখন করেন? বললেন, 'বিকেল পাঁচটায় একবার খাই। রাত একটা থেকে ভোর সাড়ে চারটে পর্যন্ত বাজাই। তারপর শোয়া।'

সত্যই বিস্ময়করী প্রতিভার অশ্রুতপূর্ব জীবনযাত্রা। নিছক কৌতূহলবশতঃ সবকটা দেওয়ালে চোখ ঘোরাই কিন্তু কৈ? পদ্মভূষণের মানপত্রটাও কোথাও ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝোলানো নেই তো? বাবার কথা মনে পড়লো। বাবা বলতেন, 'সঙ্গীতই তো বাবা ঈশ্বরের পদ্মভূষণ। তাঁর পাদ্মপদ্ম থেকেই তো এর উৎপত্তি। তাই সেই পদ্মভূষণকে যে সেবা করে, তাঁকে আবার কি করে পদ্মভূষণ দেওয়া যায়? আসলে এটা পদ্মভূষণ নয় পদভূষণ। অর্থাৎ সোজা বাংলায় জুতো। ওঁরা আমাকে জুতো দিয়েছে।' বাবার মত অন্নপূর্ণাদেবীও উপাধি বা সম্মানকে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গ্রাহ্য করেননি বা নিজের অন্তরে স্থান দেননি। কারণ এতে অহঙ্কারের যে বিষ রয়েছে তার প্রদাহ ছিল এঁদের কাছে অসহ্য।

আজ পর্যন্ত বহু মানুষ আমাকে একই প্রশ্ন করেছেন, 'বাবার সঙ্গীত সন্ততিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' এ ব্যাপারে আমার মতামতের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ এর উত্তর বাবা স্বয়ং দিয়ে গিয়েছেন। বাবা সব জায়গায়ই বলেছেন, 'অন্নপূর্ণা শ্রেষ্ঠ।' আলিআকবর এবং রবিশঙ্কর সব সময়ে এ কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু তিনি কি শুধু সঙ্গীতেই শ্রেষ্ঠ? না। আমার মনে হয় বহু মানবীয় ব্যাপারেও তিনি বহু অসামান্য রমণীর মধ্যে বিরল, একক বা অনন্যা।

সত্যই অনন্যা। কারণ আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রশংসা থেকে নিজের সত্তাকে সর্বদা দূরে রেখেছেন অন্নপূর্ণাদেবী। কারণ উনি জেনেছেন সংসারে সঞ্চয়ই মানুষকে সব থেকে বেশী ঠকায়। তা সে ধনই হোক, খ্যাতিই হোক বা পুণ্যই হোক। উপলব্ধি করেছেন, প্রয়োজন বা সঞ্চয় যেখানে কর্মের উৎস সেখানে মানুষ স্বরচিত কারায় বন্দী। আর প্রেম বৈরাগ্য যেখানে কর্মের আহ্লাদিনী শক্তি সেখানেই মুক্তি।

সাধারণতঃ প্রায় সব মানুষের মধ্যেই নিজের সম্পদকে জাহির করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু অন্নপূর্ণাদেবী সেই গড্ডল প্রবাহের বাইরে। যার ভেতরে সঙ্গীত, দয়ামায়া সর্বোপরি মনুষ্যত্ব সবই আছে, কিন্তু বাইরে কিছুই প্রচার করেন না। অনেক সাধনার পরই অন্তরের

ভাবাবেগকে এ ভাবে সংযত রূপ দেওয়া সম্ভব। একেই বোধহয় যথার্থ বৈরাগ্য বলে। সমাস করলে বৈরাগ্যের দুটো ব্যাখ্যা হয়। প্রথম বীতরাগের ভাব বৈরাগ্য আর দ্বিতীয় সব রাগ অনুরাগকে একত্র করে তাঁর চরণে সমর্পণ। অন্নপূর্ণাদেবী জীবনের সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবসান্তে নিবেদন করেছেন আর তাই তাঁর ব্যথার পূজা সমাপন হয়েছে।

বেনারসে তুলসীদাস কৃত রামায়ণের পাঠক প্রচুর। ছোটোবেলা থেকে বাড়ীতে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণের চল থাকলেও তুলসীদাসজীর রামায়ণ পড়েছিলাম। ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানস গ্রন্থে প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রতীক ধর্মিতাকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর কাছে রামায়ণ ছিল দ্ব্যর্থক তত্ত্ব। যার শাশ্বত আবেদন অদ্যাপি প্রাসঙ্গিক। তুলসীদাস বিশ্বাস করতেন আজকের যুগেও মানুষ তত্ত্ব ও শান্তিস্বরূপা সীতাকে বাঁদরের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সীতাকে তুলসীদাস তিন রূপে দেখেছেন। জনকপুরে দুহিতা, অযোধ্যার পুত্রবধূ আর বনবাসী জীবনে বাৎসল্যময়ী মাতৃস্বরূপা। অর্থাৎ শান্তি, ভক্তি আর মহাশক্তির আশ্রয়। রামচরিতমানসের উল্লেখমাত্র এইজন্যই করলাম যে অন্নপূর্ণাদেবীর জীবনের সাথে অনেক মিল আছে। শুধু রামায়ণে তথাকথিত লোকনিন্দার নামে সীতা রাম দ্বারা অকারণে পরীক্ষিতা, আর আজকের সীতা রাম দ্বারাই অপহৃতা হয়ে অশোক কাননে নির্বাসিতা। রাম রাবণের এরকম চারিত্রিক সন্ধি বিরল।

যাঁরা অন্নপূর্ণাদেবীকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা সুজন, দুর্জন, স্বজন যাই হোন আমার কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। যাঁর ভেতরে বাবার গুণরাশির প্রায় পূর্ণমাত্রিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ইতিহাস ভাঙ্গে এবং গড়ে কিন্তু অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তাঁর মর্মবাণী। একটা কথা আমাকে জীবন গজাল মেরে বুঝিয়েছে যে কারও অন্য কেউ যদি কিছু করে সেটাকে অচিরাৎ বিস্মৃত হওয়াটাই নাকি এ যুগের ধর্ম। কিন্তু ক্রম থাকলেই ব্যতিক্রম হয়। আর তা না হলে হঠাৎ কেন চিঠি এলো আমার নামে। চিঠির প্রেরিকা শ্রীমতি উমা গুহ। সচিব আলিআকবর কলেজ অফ মিউজিক কোলকাতা। চিঠি পড়ে তো অবাক। চিঠিতে আমাকে লেখা হয়েছে আগামী ১৩ ও ১৪ নভেম্বর বাবার ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে কলেজে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি সাদরে আমন্ত্রিত। তাছাড়া এই জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ স্মারিকা প্রকাশিত হবে, তাতে যদি আমি লেখা পাঠাই ওঁরা বাধিত হবেন।

সত্যই চমকপ্রদ। আমাকে ডাকা হচ্ছে? কি মাজরা? বাবার ভাষায় মাজরা অর্থাৎ ব্যাপারটা কি? এ তাবৎ অচ্ছ্যুৎ অপাংক্তেয় ডাক এলো কেন ব্রাহ্মণ ভোজনে? যাক লেখা পাঠানোর ঝুঁকি নিলাম না। কারণ জন্মতিথি নিয়ে কোন কথা লেখা চলবে না। লিখলেই কলম চলবে থামবে না। তাই ভাবলাম যা বলার মুখেই বলব। আর যদি উৎসব উপলক্ষে আলিআকবর আসেন, তাঁকেও আবার সত্য বোধ করাবার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাক্টেরিয়া যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন কোন না কোন মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বর এ্যান্টিবায়োটিক রূপে নেমে আসেন। ঈশ্বরের আর কি? যাঁর ঘাড়ে চাপেন তাঁর হয় প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ। বাবা বলতেন, পার্টি, পার্টি আর আমি দেখছি, এবং অনুভব করছি মর্মে মর্মে। মাঝে মাঝে ভাবি পার্টিতে গা ভাসাই। আবার ভাবি আদর্শের কি হবে?

কাজটা ভাবা যত সোজা, আসলে সেটাকে করে ওঠা কি তত সোজা? টাকা, মান, যশ, সকলেরই তো দরকার। কিন্তু ভাবি, তাঁর জন্য কি নীচে নামার দরকার আছে? মানুষকে ভালবাসলে বা শ্রদ্ধা করলে যদি অপরাধ হয়, তালে আমি অপরাধী। মানুষকে উপকার করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি অপরাধী। এবং অপরাধ বা পাপের যদি কোন শাস্তি হয়, তাহলে আমি সে শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

অবাক হয়ে ভাবি, মানুষের সবচেয়ে আনন্দ কিসে হয়? মানুষের মত মানুষ হয়ে না অমানুষ হয়ে? কেউ টাকা উপায় করে আনন্দ পায়, কারো আনন্দ খ্যাতিতে, আবার কেউ শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাতেই আনন্দ পায়, কেউ আনন্দ পায় তোষামোদে, কেউ নিজেকে জেনে আবার কেউ নিজেকে জানিয়ে। এসব ছাড়াও আনন্দ অন্য প্রকারও আছে তা হোল নিয়ম মানার বা নিয়ম ভাঙ্গার। ঠিক সঙ্গীতের সুর বিস্তারের ম'তো। এ আনন্দে আছে চেষ্টা, আকুলতা আর আগ্রহ। এঁর টানেই জগৎ বিশ্বের মহাপুরুষেরা সংগ্রাম করেছেন এবং লাভ করেচেন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে।

ছোটোবেলায় আমাদের সংস্কৃতের অধ্যাপক একটা কথা স্কুলে মাঝে মাঝেই ঠাট্টার ছলে বলতেন, 'নিজেকে নিয়ে এত মাতোয়ারা হয়ে পড়ো না যে তোমার বাবার নাম জয়কৃষ্ণ থেকে জ্যাক্‌শন হয়ে যাক, অথচ তোমার খেয়াল নেই। হিট্‌লারের প্রচার কর্তা গোয়েবলস বলতেন, 'একটা মিথ্যাকে একশ বার বললে তা সত্য রূপে প্রতীত হয়।'

আশ্চর্য! এমনি যুগ আমাদের যে মিথ্যেটাই চিরকালের মত সত্য হয়ে রয়ে গেল, তাঁর জন্য কারও মাথা ব্যথা নেই। বাবার জন্ম সন্ সত্য বোঝানোর দায় শুধু আমারই? কি আর করা যাবে? যাঁদের আগামী দুবছর পর্যন্ত সবকটা দিনেরই নির্ঘন্ট নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে, কোথায় বাজাবে, কোথায় লেকচার দেবে, কোথায় পুরুষদের শিক্ষা দেবে, কোথায় মহিলাদের শিক্ষা দেবে, তাঁদের কাছে এসব ছেঁদো কথা চিন্তা করার সময় কোথায়? ওঁদের জীবন অশ্বমেধের ঘোড়া, লাগাম না ধরলে থামে না। তাই স্থির করলাম, বাবার ১২৫ই হোক বা ১৫০ই হোক যাব এবং যদি আলিআকবর আসেন, তাঁকে বলব, কিছু চালাক আপনাকে না জানিয়েই আপনার দল ছেড়েছে, এক চতুর শিরোমণি গোপনে সবার চোখ বাঁচিয়ে চার্চে ঢুকে কন্‌ফেশনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পাপ স্বীকার পদ্ধতিতে কাশীতে গিয়ে হিন্দি খবরের কাগজ মহলে চুপিসাড়ে স্বীকার করে কবুল করেছে "১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বাবা আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম শতবর্ষ পড়া উচিৎ।" তাঁর মনে এই ধারণাই ছিল যে যাক বাবা, দোষ মুক্ত হলাম, আর আলি আকবর ভারতেও নেই আর থাকলেই বা কি? ওতো আর হিন্দি কাগজ পড়বে না।

আরো একটা কথা আলিআকবরকে বলব স্থির করলাম, সাধারণ মানুষের জীবন বা তাতে ঘটে যাওয়া ঘটনা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ইতিহাসে বদলায়। জার, রাসপুতিন, লেনিন, স্ট্যালিন বা ক্রুশ্চেভ সবার যুগেই অতীতের মেরামতি ঘটেছে। কিন্তু সেই রাশিয়ার লিও টলস্টয়?

টলস্টয় হলেন সূর্য। সে চিরকাল পূর্বে উজিত হয় আর পশ্চিমে অস্ত যায়। যে আমলই

আসুক না কেন, টলস্টয়ের সেই সূর্যের সত্যের হেরফের হয় না। সে অজেয়, অমর, অক্ষয়, অপরিবর্তনীয়। তাঁর প্রকাশ ঔজ্জ্বল্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। একেই বলে ট্রুথ। ওস্তাদ বাবা ছিলেন সঙ্গীত জগতের ট্রুথ। আমাদের কারো ক্ষমতা নেই যে সেই সূর্যকে বা সত্যকে বদলায়। তা তাঁর শিষ্যেরা যতই জেঠামি করে কেতাব লিখুক।

যথা সময়ে কোলকাতা যাত্রা করলাম। কার ডাকে কোথায় যাচ্ছি তার ভাবনা না করেই। কারণ যেখানে বাবাই প্রধান বিষয়, সেখানে যাবই। তাতে জন্মতিথির বিকৃত হিসাব থাক আর না থাক। কোলকাতায় গিয়ে জানলাম প্রথম দিন সভাপতিত্ব করছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বক্তাদের ভেতরে রয়েছেন হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অমলাশঙ্কর। প্রথমদিনের সমাপন হবে মৈহার ব্যাণ্ড পার্টির বাজনায়। দ্বিতীয় দিন আমাদের ঘরের কিছু ছাত্রছাত্রীর গান ও বাজনা রয়েছে।

প্রথম দিনের ঠাসা ব্যস্ততার ফাঁকে আমার চার মিনিটের বক্তব্য ঠাঁই পেল না। স্বভাব বিনয়ী উমা গুহ বললেন, 'ঠিক আছে কাল যদি পারি আপনাকে সুযোগ দেব। কিন্তু একটা কথা, তা হোল বাবার বয়স সম্বন্ধে কিছু বলবেন না, কারণ বাবার সহস্ত লিখিত বয়সটার বয়ান আলিদার কাছে আমেরিকায় আছে।'

যাঁরা ওস্তাদবাবার ছাত্র যতীন ভট্টাচার্যকে চেনেন, তাঁরা হয়তো ভাবছেন এরপরেই জ্বালামুখীর অগ্ন্যুদগার আরম্ভ হোল। যে কথা যে ভাবে বলা হয়েছিলো তা অতীতে হলে, ভদ্রমহিলা কেন, তাঁর গুরু বা তৎস্থানীয় লোকেদেরও 'ইন্দ্রায় স্বাহাঃ, ইন্দ্রায় তক্ষকায় স্বাহাঃ' হয়ে যেত। কিন্তু এখন করুণা হোল কারণ মহিলা যে ভাবে নিঃস্বার্থে ভূতের বেগার খাটছে তাতে ওঁর ওই অজ্ঞতা দোষ ক্ষমার্হ। তাই বলতে পারলাম না যে যাঁরা বক্তা রয়েছেন তাঁদের সর্বপ্রথমে আমার নাম না থাকলেও সর্বশেষেও নয়। নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করলাম কারণ খামোকা কটু সত্য কেন বলি, আর তা'ছাড়া অকারণে পিতৃঋণ স্বীকার করতে এসে অহঙ্কার কেন প্রকাশ করি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ঋণ স্বীকার' বিষয়ক এক মন্তব্য মনে পড়লো।

"মানুষ আর পশুতে ভেদ কোথায়? এই যে আমরা, পৃথিবীর অনেক কিছুই বিনামূল্যে ভোগ করি। এ ভোগ মানুষও করে, পশুও করে। এই চাঁদের আলো, এই বাতাস, এই রোদ, এই বৃষ্টি, এর জন্য কাউকেই কোন মূল্য বা ট্যাক্স দিতে হয় না। পশুরা তো নির্বিবাদেই ভোগ করে। তাতে তাদের কোন দায় নেই। কিন্তু দায় আছে মানুষের। মানুষকে সেই ঋণ শোধ করতে হয়। শোধ করতে হবে নানা ভাবে। কেউ ঋণ শোধ করে শিল্প সৃষ্টি করে, কেউ বা গান গেয়ে, কেউ বা ঈশ্বরের নাম করে, আবার কেউ বা সমাজ সেবা করে। আসলে মানুষই একমাত্র জীব যার ঋণ শোধ করার দায় থাকে, পশুর সে দায় নেই।"

তাই ঋণ শোধ করতে গিয়ে নিজের নামের প্রচার কেন চাইব? আসলে আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁরা সকলেই আত্মকেন্দ্রিক। যে প্রাপ্য দেবতার, তাতেও আমরা স্বার্থের ভাগ বসাতে চাই। আমরা পুরুত হয়ে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করি। আমরা নিজেদেরই প্রবঞ্চিত করি। প্রবঞ্চনা করি আমাদের দেবতাকেও তাই আমরা কড়ায় গণ্ডায় নিজেদের পাওনা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করি। তাই শুধু নয় যেটা আমার নয়, সেটা পাওয়ার জন্যও দৌড়ঝাঁপ করে মরি।

বাবার বিষয়ে বলতে গেলে আমার সময়ের জ্ঞান থাকে না। আর সময় নির্দিষ্ট হয়েছে কয়েক মিনিট। তাই স্থির করলাম, লিখে পড়বো। সমস্যা হোল, কটা কথা লিখব? অনেক কাটছাঁট করে একটা খসড়া তৈরী করলাম। পরের দিন যখন ডাক পড়ল তখন বাবাকে মনে করতে করতে মঞ্চে গিয়ে পৌঁছলাম। যা পড়েছিলাম তার হুবহু নকল তুলে দিচ্ছি, "মাননীয় সুধীবৃন্দ এবং সঙ্গীত অনুরাগীবৃন্দ—এটা আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের অর্থাৎ আমাদের উস্তাদ বাবার জন্ম মহোৎসবেতে আমাকে আপনারা বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়েছেন। যদিও কোন বক্তব্য রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কারণ এই শিল্পের উপজ অঙ্গের কোন জ্ঞান আমার নেই। বাকপটু না হওয়ার ফলে আমি সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলাতে ঠিক দক্ষ নই। কারণ যে বয়সে লোকে সাধারণতঃ পুশিং, ড্যাশিং আর বাগজাল রচনা করতে শেখে, সেই কৈশোরোত্তর ও যৌবনের বেশীর ভাগ বছরই আমার কেটেছে উস্তাদ বাবার কাছে মৈহারে যেখানে একমাত্র যন্ত্রেরই সরব হবার অধিকার ছিল, মুখের নয়। তাই বক্তৃতা আমার কাছে অনভ্যাসের চন্দনের ফোঁটা। তবুও এক জায়গায় থেকে সাহস পাই আর তা হোল যে বর্ণবিষয়—বাবা।

একটা আট বাই বারোর ঘর, দুদিকের আটফুটের চওড়া দেওয়ালের মাঝখানে সামনা সামনি দুদিকে দুটো দরজা। তার দুপাশে স্টেজের সাইড উইংসের মত দুপাশে দুটো ঘর। একটার মালিক ও বাসিন্দা বাবা। অপরটায় অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র আশ্রিত আর বাবার কথায় 'বুড়ো বয়সের ছেলে' আমি। এ ভাবেই একাধিক্রমে সাতটা বসন্ত কাটিয়েছি মৈহারে। তাই বাবার নামে কোন উৎসব হলে সেটা আমার কাছে মনে হয় শুভ দিনে পিতার ভবনে আনন্দ সদনে যাচ্ছি। তাই আপনাদের আজকের উৎসব যদিও আপনাদেরই তবুও আমি অনুমতি প্রার্থনা করছি—আজকের দিনের উৎসবের কিছু পুণ্য ফল আমি আমার সাথে মাথায় করে নিয়ে যাব।

আমি প্রবাসী বাঙ্গালী। সেইজন্য আপনাদের বঙ্গভূমির বহু সাহিত্যিক লীলাবিলাস থেকে আমি বঞ্চিত থাকি। তবুও দূরত্ব ও কালের সীমা পার করে যে কয়েকটা বই প্রবাসের দরজায় পৌঁছেছে তার অন্যতম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'চরিত্রপূজা'। তার সাহায্যে বলতে চাই যে তানসেনের জন্মবিবস পালন করলেই তাঁর স্মৃতিচারণ হয় না। সঙ্গীতচর্চাই তাঁর একমাত্র যথার্থ স্মৃতিচারণের মাধ্যম। ঠিক সেই রকমই উস্তাদ বাবা স্মৃতিচারণও সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমেই যথার্থ হবে।

যদি আমরা বিদেহী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি বা আত্মার সর্বব্যাপিতাকে স্বীকার করি, তাহলে বাবা নিশ্চয়ই এখন উপস্থিত আছেন এবং তিনি আমাদের অর্থাৎ সন্তান বা সন্ততিদের কাছে এটাই আশা করতে পারেন যে আমরা তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সঙ্গীত চর্চা করছি।

যদি আমাদের যন্ত্র থেকে একটা 'ডা' 'রা' 'ডারা', 'রাডা' বা ডিরি' অস্পষ্ট বা মুক্তোর মত দানা দানা না বেরোয়, আমাদের মানস চক্ষু থাকলে দেখতে পেতাম ঋজু বাবার মুখটা কেমন করুণ ও মলিন। আমি স্থির বিশ্বাস করি, আরোহীতে ঝিঁঝিট আর অবরোহীতে পাহাড়ী প্রয়োগ করে যাঁরা বাবার সৃষ্ট পাহাড়ী ঝিঁঝিট বাজান তা বাবাকে বেদনার্ত করে।

আমাদের অল্পজ্ঞান নিয়ে যখন রাগ হেমন্ত ও হেমবেহাগের অবরোহীতে শুদ্ধ 'র' আন্দোলন না করে বাজাই তখন বাবা ম্লান হন। বিলাসখানী তোড়ীর অবরোহীতে যখন কোমল নি লাগান হয় তখন বাবার মন থেকে হতাশার দীর্ঘশ্বাস বের হয়। একথা জেনেও অনেকে সেই অপরাধ করেন। আমরা যখন বিদ্যার্থীদের যন্ত্রে হস্তসাধন না করিয়েই রাগ শেখাই, তিনি অন্তরীক্ষে শোকাকুল হন। আর সর্বোপরি যখন তিনি আমাদের যশের কাঙ্গাল দেখেন, মিছে কথা বলে করতালি নিতে দেখেন, তিনি বেদনাহত হন। সুতরাং আমার মনে হয় অতীতে গুরুজনেরা যে কথা বলতেন তা যথার্থ ছিল। "সদা সত্য কথা বলিবে" এবং এই আপ্তবাক্যটি প্রত্যহ বলিবে। উদ্দেশ্য ছিল—সত্যের শপথ রোজ নেওয়া। ঠিক সেই রকমই আমাদের উচিত বাবার কিছু কথা রোজ আপ্তবাক্যের মত পাঠ অনুধাবন করা।

"গুনন কা-চর্চা কিজিয়ে
অবগুণ দূর কর ধীরজ ধরিয়ে।
প্রথম সুরন তাল কো সাধে,
ফির গুরুসে রাগ ভেদ শিখে—
জনম জনম করে সো ফল পাওয়ে।।"

আমরা বক্তব্য শেষ করার আগে একটা কথা বলতে চাই যে, সঙ্গীতের ইতিহাস আছে কিন্তু তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হওয়াই ভাল। অন্যথায় আপাত সম্মান বাঁচলেও ইতিহাস ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব 'বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।'

শেষ করার আগে মা এবং আলিদাকে অভিবাদন ও প্রণাম জানাই যাঁদের অকৃপণ কৃপা না থাকলে হয়তো বাবা সামীপ্য লাভই হ'তো না। তাঁদের স্নেহ ও অন্নের ঋণ অপ্রতিশোধ্য। সকলকে আমার নমস্কার!

ইতি করেই চলে এলাম। কারণ এখানে যা পরিবেশ তাতে আমি নিতান্তই বেখাপ্পা। পথে আসতে আসতে ভাবছিলাম ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক প্রবাদ। তাহোল ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না। না হলে বাবার জন্ম সন ১৮৮১ সকলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বীকার করলেও কাজের বেলায় গতানুগতিকতারই আঁচল ধরি। আসলে ভুল স্বীকার করতে গেলে মনে সাহস চাই। এটা মনুষ্য চরিত্র মহত্বের লক্ষণ। কিন্তু ভুলের পুনরাবৃত্তি অমার্জনীয় অপরাধ।

সংবাদপত্রে কয়েক দিন পর দেখি, 'নিখিল ব্যানার্জি স্মৃতি সংসদ' বিশ্বভারতীতে বাবার ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করছে। তাতে বাজাচ্ছেন আমাদের ঘরের অর্থাৎ বাবার কৃপাধন্য এক বাদক। ভদ্রলোক এমনি প্রচার পিপাসু যে বাজনার পর সংবাদ পত্রগুলোতে নিজের আর নিজের রোজনামচার জয়গান ছাপিয়ে নিলেন। মাঝখান থেকে বাবা উধাও। উধাও যাঁর স্মৃতিতে হোল! অবজ্ঞাতা হলেন প্রয়াত নিখিল ব্যানার্জির স্ত্রীও। সত্যিই তো কয়লা ধুলে কি আর সাদা হয়?

আজকাল কে আর অতীত নিয়ে মাথা ঘামায়? আমরা আছি, এটাই চরম সত্য। আমাদের আগেও যে কেউ ছিল বা আমাদের পরেও যে কেউ আসবে এ কথা ভাবতে

কারো ভাল লাগে না। এখন সকলের মনের ভাবনা এই যে আমরাই বিধাতা। কিন্তু ইতিহাসের দেবতা বড়ই নিষ্ঠুর। আজকের রাজা কালের চাকার চাপে আগামীকাল দীন দরিদ্র। আজকের আপাত সত্যই তো কালকের মিথ্যা। আজকের উজ্জ্বল যৌবনই তো আস্তে আস্তে ম্রিয়মান হয়ে যায় কালের বার্ধক্যে।

আমরা একটা কথা ভুলে যাই যে জীবন যাত্রার পথ শেষে একজন টিকিট-পরীক্ষক আছেন। সেই টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার যো নাই। আমরা যে যাঁর কৃতকর্মের মূল্য দিয়ে ভবিতব্যের স্টেশনের টিকিট কিনেছি। সেখানেই আমাদের নামতে হবে। ফাঁকি দিয়ে আগে যাওয়া যায় না। আমাদের অহঙ্কার, আমাদের লোভ, আমাদের স্বার্থপরতা সেই সত্যটাকে বারবার ভুলিয়ে রাখে। তাই আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলটাকে নেবার চেষ্টা করি। ফুলের সৌন্দর্যে যতই মুগ্ধ হই না কেন গাছকে ও তার ডালকে উচ্চতার জন্য গালাগালি করি। দূরারোহ বলে গাছটাকে উৎপাটন করে ফুলটাকে পেড়ে নিতে চাই। তাতে হয়তো তৎক্ষণাৎ ফুল পাওয়া যায় কিন্তু ভবিষ্যতের অসংখ্য ফুলের সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় এটা আমাদের মগজে ঢোকে না।

আমাদের বাবা ছিলেন সেই গাছ। আমরা নিজেদের ফুলটুকু পেড়ে নিয়েছি। গাছ নিয়ে আর ভাবনা কি? সকলেই নিজের নামের ফুলের গন্ধ বিকীর্ণ করার জন্য আত্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছি নিজেদের নামে। স্বমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ আর পদ্মবিভূষণ উপাধি লাভের চেষ্টায় প্রাণপাত করছি।

নিজের মত প্রকাশ না করে সরকারী-উপাধি পাওয়া সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য সর্দার খুশবন্ত সিং-এর একটা বক্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। "আমি এমন একজন পুরস্কার বিজয়ীকে দেখতে চাই যিনি বিনা ধরাধরিতে পুরস্কার লাভ করেছেন।" বলাই বাহুল্য কেউ এগিয়ে আসেন নি। হয়তো এর এক বা দুজন ব্যতিক্রম আছেন। প্রসঙ্গটা যদিও সাহিত্য আকাডেমি সম্পর্কে ছিল কিন্তু সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

টাকার জন্য, খ্যাতির জন্য, আমরা গুরুর প্রতি যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তা অমার্জনীয় অপরাধ। তার শাস্তি আমাদের পেতেই হবে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাবার ১০৬ বছরের উৎসবকে আমরা ১৯৮৭ সনে ১২৫ এ রূপান্তরিত করেছি।

বাবার এক কৃপাধন্য করুণাপাত্রকে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে নিজের এক সহচরীকে বলতে শুনেছিলাম, 'বাবা আমাকে 'কাফের' বলেছিলেন, তাই বদলা নিলাম। জন্ম সন নিয়ে এত ঝামেলা বাঁধিয়ে দেব যে ভারত সরকার একটা ডাক টিকিটও ছাপাবে না। আর পরবর্তীকালে জন্ম সনের গোলমালে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যে লোকে ওঁকে বাস্তব চরিত্র না ভেবে ভাববে গল্পকথা বা রূপকথা।' বা' রে ঋণ শোধ! কি দম্ভ! সত্যই তো সাপকে দুধ কলা খাওয়ালে কি তার বিষ কমে?

আমার মনে যখন জন্ম সন নিয়ে টানা পোড়েনের দ্বন্দ্ব চলছে, ঠিক সেই সময়

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক সঙ্গীত পত্রিকা 'সুরছন্দা' অগ্রাণ ১৩৯৪ এর সংখ্যা হাতে এসে পৌঁছল। তার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। প্রকাশিত হয়েছে "বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্যের প্রতি খোলা চিঠি।" পাঠকদের জ্ঞাতার্থে হুবহু তুলে দিলাম—মাননীয় মহাশয়, "বিষয় ঃ শান্তিনিকেতনে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকী"।

শেষকালে আপনারাও মিথ্যাবাদের খপ্পরে পড়লেন? ১৯৬২ সালে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জীবিতকালে মধ্যপ্রদেশে যখন তাঁর জন্ম শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত হয়েছিল, তখনই সুরছন্দা (১৯৬২ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর), অমৃতবাজার পত্রিকা (১৭.১১.৬২), যুগান্তর (২৫.১১.৬২) এবং যুগবাণী সাপ্তাহিক প্রভৃতি ঐ মিথ্যা জন্মতিথির প্রতিবাদ করেছিল। যে সময়ে ওই বিভ্রান্তিকর তথ্য-বিকৃত জন্মসনের প্রতিবাদে যে তথ্য ও প্রমাণ উক্ত পত্রিকাগুলোতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তার খণ্ডনে খাঁ সাহেবের খ্যাতিমান পুত্র, জামাতা বা শিষ্যরা কেউই এগিয়ে আসেন নি।

কোলকাতার গাঙ্গুলি কলেজ অফ মিউজিকের অধ্যক্ষ তথা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের পট্ট শিষ্য শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলি ১৯৮১ সালে গুরুর জন্ম শতবার্ষিকীর উৎসব করে গুরুর নামের সাথে জড়ানো একটা বিরাট মিথ্যাকলঙ্ক দূর করলেন। ঐ সময়ে বারাণসীর উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন মিউজিক সার্কল ও যাঁর অধ্যক্ষ খাঁন সাহেবের অন্যতম শিষ্য তথা প্রায় সাত বছরের একান্ত সচিব সরোদবাদক পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য উস্তাদ সাহেবের জন্ম শতবর্ষ পালন করেন। ১৯৭৯ খৃঃ প্রকাশিত পণ্ডিত ভট্টাচার্যের গ্রন্থেও (উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁন এ্যাণ্ড হিজ মিউজিক পৃ ১১১-১১৪) আমাদের মত স্বীকৃত হয়েছে।

১৯৮২ সালের মার্চ সংখ্যায় "সুরছন্দা"র সম্পাদকীয়তে পণ্ডিত রবিশঙ্করের একটা চাঞ্চল্যকর জবানবন্দী প্রকাশিত হয়েছিল। এই জবানবন্দী মুদ্রিত হয়েছিল বারাণসীর একটি সংবাদপত্রে (দৈনিক জনবার্তা-ভাষা হিন্দি তাং ১.১.১৯৮২)। তাতে রবিশঙ্কর কবুল করেছিলেন "১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বাবা আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম শতবর্ষ পড়া উচিত।" এর পরেও শান্তিনিকেতনে বাবা উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেখানে সেতার বাজাতে যাচ্ছেন জেনে আমরা বিস্ময়বোধ করছি। তিনি কেন্দ্রের বিশিষ্ট এম. পি. এবং বিশ্বভারতী—কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়—বলেই কি অসঙ্কোচে এই মিথ্যাবাদ সংঘটিত হতে চলেছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল উপাচার্যকে এই ইতিহাস বিকৃত বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হচ্ছে? কারণ কোন বিশ্ববিদ্যালয় জেনে শুনে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করবে এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তাহলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে চাপ পড়লে বিশ্ববিদ্যালয়স্তরীয় শিক্ষাতেও ভেজাল দেওয়া সম্ভব? এই কি কেন্দ্রীয় সরকারের 'সত্যমেব জয়তে'র নিদর্শন?"

ঠিক এর কিছুদিন পরেই খবরের কাগজে পড়লাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর বাবার ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম মরুকগে যাক। তারপর বিভাগীয় মন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখলাম। জানি না তা মন্ত্রীর হাতে পৌঁছেছিল কিনা,

বা কোন শ্রীমান আমলার হাতে রয়ে গিয়েছিল, কারণ কোন প্রত্যুত্তর পাই নি। যাক এ জাতীয় প্রশাসনিক ভদ্রতায় আমিই শুধু নয় ভারতের বেশীর ভাগ নাগরিকই অভ্যস্ত। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে আমার চিঠির প্রভাবেই হোক বা সুমতিবশে হোক ওঁরা উৎসব পালন করেন নি।

সম্পূর্ণ ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তভাবে লিখে অন্নপূর্ণাদেবীকে জানালাম। যদিও জানি ওঁর পক্ষে করা কিছু সম্ভব নয়। তথাপি ওঁকে জানালে অনেকটা সান্ত্বনা পাই। কয়েক দিন পর ওঁনার কাছ থেকে চিঠি এলো। পত্রটি উদ্ধৃত করে দিলাম।

25th 1988

স্নেহের যতীনবাবু,

আমার বিজয়ার স্নেহ আশির্ব্বাদ নেবেন। আশা করি খুব রেগে আছেন? যাই হোক ক্ষমা চাইছি। কি করি বলুন সময় এক, আলস্য এক, বয়েস হয়েছে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, যখন সময় পাই তখন আর চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না।

আপনার বই লেখা শেষ হয়েছে না আরো বাকি আছে? আমি বুঝতে পারি না সবার রাগের কারণ আপনার হবার কি দরকার? যার যা ইচ্ছে ভাবুক বলুক তারা যদি এতে আনন্দ পায় তাদের পেতে দিন না। এখন এই বই ছাপানো এর জন্য আপনার অনেক খাটতে হবে, আমি জানি আপনি বারণ শুনবেন না তবে অনুরোধ লোকের কাছে আর অপ্রিয় হবেন না। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আজ এখানেই শেষ করছি আমার স্নেহ আশির্ব্বাদ নেবেন।

ইতি

বৌদি

সত্যিই উনি শান্তি চান। আর তাই বারবার প্রবোধ দেন। কিন্তু উনি গেলিলিও "ক্রুসেডের" বোঝেন না। আমি জানি অন্নপূর্ণাদেবী আমার মঙ্গলাকাঙ্খী কিন্তু জীবন যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে আর নট সেজে বিনোদ করতে ভালো লাগে না। তাই এই বইতে বহু অনুত্তরিতের উত্তর দিতে চাই।

৮৬

আমার লেকার ব্যাপারে একটা শুচিবাই আছে, আর তা হোল আর্ট ফিল্ম স্টাইল সমাপ্তিতে আমি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ছাড়ি না। যতক্ষণ না একটা নিশ্চিন্ত পরিণামে আমি পৌঁছে যাই, বিরাম চিহ্নের প্রায়াগ করলেও পূর্ণ বিরাম টানার রুচি হয় না। যেমন বইটা লেখার সময় বা আরম্ভ করার আগে বেশ কয়েকটা পাতা গণেশ বন্দনায় ব্যয় করতে হয়েছিল। তেমনি শুধু বাবার জীবনের চক্রব্যূহের প্রবেশ দ্বার খোঁজার জন্য শেষের সময় নিকাশদ্বার খুঁজে পাচ্ছিলাম না অভিমন্যুর মত। মহাভারতের চক্রব্যূহ থেকেও তো শবই মাত্র বের হয়েছিল। এখন প্রশ্ন কার শব বের হবে। বাবার স্বপ্নের, আমার আস্থার না কৃতঘ্নদের?

উর্দু সাহিত্যের একটা লাইন হঠাৎ আমাকে সমাপ্তির পথ দেখিয়ে দিল—"জিন্দগী কো বফা কী রাহমে, মৌৎ খুদ রোশনী দিখাতী হ্যায়' অর্থাৎ বিশ্বাসের যাত্রায় জীবনকে মৃত্যুই স্বয়ং পথ নির্দেশ করে। আমার জীবনের বিশ্বাসের যাত্রায় মৃত্যুই স্বয়ং পথ নির্দেশ করছে।

মৃত্যু তো ঘটেছিলই, আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করলাম। আর সে মৃত্যুকে দেখামাত্র আমার সত্যবোধ হোল, তাই আমার কথাটি ফুরোলো।

অথচ এই মৃত্যু আমার জীবনে নেমে আসলে, সেটা কত প্রশান্তির হ'তো, কিন্তু তা তো হোল না। এলো অন্নপূর্ণাদেবীর জীবনে। প্রতিভার মৃত্যুরূপে। এলো তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীর জীবনে মনুষ্য চরিত্রের মৃত্যুরূপে। আর এলো সমাজের বুকে সঙ্গীতে চরিত্রের সার্বিক মৃত্যুরূপে। আর তাছাড়া সব মৃত্যুই প্রশান্তি দেয় না। কিছু মৃত্যু হয় অতৃপ্তিজনিত কারণে। টলস্টয় তাঁর গল্পে প্রশ্ন তুলেছিলেন কতটা জমি একটা মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন। এই আর্য শব্দে লেখা গল্পটি যথেষ্ট মাত্রায় বার্তাবহই, ঠিক এই রকমেরই ইঙ্গিত এবং নিহিতার্থক কথা আমরা বাবার কাছ থেকে শুনেছি। বাবা একই সঙ্গে একাধিক লোককে একই কথা ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের আধারের সীমাবদ্ধতাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিবন্ধক।

নচিকেতার উপাখ্যান আছে—ব্রহ্মার কাছে দেবতা, মানব ও দানব একই সঙ্গে যায় শিক্ষা করতে। ব্রহ্মবাণী মাত্র একটি বর্ণে স্ফুট হল 'দ'। দেবতারা বুঝলেন 'দ' ইতি দয়া। মানব বুঝল 'দ' ইতি দান আর দানবেরা বুঝলো 'দ' ইতি দমন। ঠিক সেইরকমই বাবার "দ" ছিল সুরমন্ত্র "সুর সাধো গুণী"। এর 'স' এর ওপর জোর দিতেন কয়েকটা সুর মিলিয়ে মীড়ের অঙ্গে। বাবার 'স' ছিল "সু"। আদ্যবর্ণতে মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

এই সুর থেকে 'সু' শিখলেন অন্নপূর্ণাদেবী। তাই তাঁর সমস্ত বৃত্তি ধাবিত হোল সুর, সত্য, শিব আর সুন্দরের দিকে। আবার অপর দিকে বাবার কিছু ছাত্রের মন গেল দানবের "দ" শিক্ষার মত। সুর দিয়ে সুরু করেও কপালদোষে 'স' ভ্রষ্ট হয়ে সুরা আর সুন্দরীর পথে হাঁটলো তারা। বাবা বলতেন, "দিয়ে ধন, বুঝি মন, কেড়ে নিতে কতক্ষণ"। যেই বাবা ভ্রষ্টতাদোষ দেখলেন তৎক্ষণাৎ অমলিন পরিবেশে যাতে নৈসর্গিক সঙ্গীত প্রকাশিত না হয় তার জন্য বিধিনিষেধ টানলেন।

নিজের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিলে লোকে তাতে অনন্যাশ্রিত দোষ দেখে। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন। কে বলে? বেদ। বেদের প্রামাণিকতা কি? কেন? ঈশ্ বাক্য। ঠিক সেইজন্যই নিজের জানার উদ্ধৃতি না দিয়ে বাবার ভাইপো মোবারক হুসেন ভায়ের রচনা থেকে সোজাসুজি উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

".....গুরুজীর আশীর্বাদ নিয়ে গুরুকন্যা অন্নপূর্ণাকে বিয়ে করলেন তিনি। সুযোগ্য শিষ্যের হাতে কন্যাকে তুলে দিতে পেরে আলাউদ্দিন খাঁ মহা খুশী। রবিশঙ্করের শিক্ষা জীবন শেষ হোল। বছরের পর বছর গভীর নিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম, গুরু তিরস্কার এবং অপরিসীম স্নেহের প্রাচুর্যে রবিশঙ্করের শিল্পীজীবন গড়ে উঠল। এবারে সঙ্গীত জগতে রবিশঙ্করের প্রকাশের পালা। রবিশঙ্কর গুরুর অনুমতি চাইলেন। আলাউদ্দিন খাঁ কন্যা অন্নপূর্ণাকে ডাকলেন। রবিশঙ্করকে আশীর্বাদ করে সঙ্গীত জগতে আত্মপ্রকাশের অনুমতি দিলেন। রবিশঙ্কর আনন্দে আত্মহারা। শিষ্যকে অনুমতি দিয়ে কন্যার দিকে ফিরলেন আলাউদ্দিন খাঁ। কন্যাকে কোলের কাছে টেনে আনলেন। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "রবিকে অনুমতি দিলাম, মা।

কিন্তু আমি জানি, তুমি তার চেয়ে অনেক ভাল বাজাও। তোমার সুরের কাছে রবি কিছুই নয়। কিন্তু তোমাকে প্রকাশের অনুমতি দিলাম না, মা। তাহলে রবির কিরণ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তার কিরণ চতুর্দিক আলোকিত করে তুলুক। তারপর মা, তোমার ইচ্ছা হলে নিজেকে প্রকাশ কোরো।" নিজের কন্যার চেয়েও শিষ্যের মঙ্গল কামনার এই নজির বিরল। কন্যা অন্নপূর্ণা নীরবে পিতার আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন।

এই শিরোধার্যের পরিণাম হোল, বিশ্বজন যে কি থেকে বঞ্চিত হলেন, তা তাঁরা না জানুন আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। এ যেন নাগাধিরাজ হিমালয় তাঁর দুহিতা গোমুখকে অন্তর্মুখী করে নিলেন। এ এক বিশাল গঙ্গার সম্ভাবনা ফল্গুতে পর্যবসিত হোল। গোমুখের তাতে কি আসে যায়? কিন্তু যে রাগ রাগিনী কপিল অভিশাপের মত লোভী ও অজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞদের পাল্লায় পড়ে রূপ হারিয়ে ভস্মীভূত হয়েছে, তাঁদের মুক্তি হোল না জনসমক্ষে। অন্নপূর্ণাদেবীর সঙ্গীত-গঙ্গার পূত জলধারায় শ্রোতারা পুণ্য স্নান করতে পারলেন না।

যদিও সেই প্রথম যুগে আর্থিক অভাবগ্রস্থ স্বামীর পাশে দাঁড়াতে, কয়েকবার অন্নপূর্ণাদেবীকে যন্ত্র হাতে নিতে হয়েছে, কিন্তু তখনও তাঁর মনে যশস্বী হবার সামান্যতম বাসনা ছিল না। সেই সময়ও তাঁর কানে বাবার সেই কথাই বাজতো "তা হলে রবির কিরণ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।"

যেমন না বাজিয়ে কাল ছিল, তেমনি বাজিয়েও কাল হোল। ঘরে বাইরে টেকা দায়। নির্মম শ্রোতারা কখন আড়ালে, আবার কখনও সামনেই বলে ফেলতে লাগলো, 'এতো পরিণতর সাথে শিক্ষানবিশের যুগলবন্দী।" সব সহ্য হয় কিন্তু স্বামীর তুলনায় স্ত্রী বরেণ্যা! এ যেন গলার নীচে নামে না। হাজার হোক পুরুষ শাসিত সমাজ বলে কথা। তাই বাজনার পর অন্নপূর্ণাদেবীর ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাব ফুটে উঠতে লাগলো। ক্ষতটা কত গভীর এবং দূষিত হয়েছিল, তা প্রকাশ পেল প্রায় দু'দশক পরে। পৌরুষে ঘা খাওয়া পুরুষের রচিত বাংলা বই প্রকাশিত হোল আশির দশকে। তার পৃষ্ঠা ১৬৩র কয়েকটি পংক্তি প্রণিধান যোগ্য।

"তুমি জানতে চেয়েছ, আমি গান টান জানা থাকলে, মেয়েদের বেশী পছন্দ করি কিনা? এবার আমার মতটা শোনো। আমি মনে করি, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একই প্রফেশনের লোক হলে, তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে তা একটা অন্তরায় গোছের হয়। খুবই স্বাভাবিক, সেটা না হয়েও উপায় নেই। ডাক্তার, টাক্তারদের ক্ষেত্রে এরকম ম্যাচিং হলেও হতে পারে। শিল্পীদের জীবনে হওয়া বড় কঠিন। প্রায়ই একটা অহমিকার সংঘর্ষ হতে পারে। আর বিশেষ করে যে জিনিষটার ওপর স্বামী এবং স্ত্রীর উভয়ের সম্মান নির্ভর করে। অর্থাৎ এডমিরেশন। সেটা ক্রমশঃ কমে যেতে বাধ্য। যদি স্বামী স্ত্রী একই শিল্প চর্চা করেন। গান, বাজনা, ছবি আঁকা, এগুলো জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনে এর প্রভাব পড়ে। আর মানুষ সবচেয়ে বেশী চায় প্রেয়সীর পূজা, তাঁর এডমিরেশন। ভালবাসার সম্বন্ধের মধ্যে এডমিরেশনের গুরুত্ব অসীম। অথচ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের শিল্পের এবং ক্ষমতার পুরোটাই বিচার করে দেখতে পারেন। তাতে এই এডমিরেশন জিনিষটা মার খায়। ক্ষতিটা তাই ভালবাসার।"

যদিও একপক্ষ এই ব্যাপারটা নিয়ে এত হৈ চৈ করছে অপর পক্ষ ছিলেন নির্বাক বা হতবাক্। কারণ তাঁর তো যশ বা অর্থের দুটোরই কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাঁর কাম্য ছিল শান্তি আর এক চরিত্রবান পরিবেশ। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বাড়ীটা হোক দেবালয় যেখানে তাঁর সুরগুলি পাবে শরণ, গানের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা স্রষ্টার চরণে। তাই এখন সময় যথেষ্ট পরিপক্ব হয়েছে, সেই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার যা গত চারদশকে উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গিয়েছি। যেমন অন্নপূর্ণাদেবী বাজান না কেন? প্রথম কারণ বাবার নিষেধ। দ্বিতীয়, মানসিকভাবে জনসমক্ষে অবতীর্ণ হওয়ার অনীহা। তৃতীয়, পূর্বস্বামীর হীনমন্যতার দোষ। এ ছাড়াও হয়তো আরো কিছু গৌণ কারণ আছে।

সারা ভারত থেকে এখনো দিনের পর দিন আর্তি পৌঁছচ্ছে তাঁর কাছে একবার বাজাবার জন্য। অতীতে দেখেছি তাঁর কাছে আবেদন করতে, এমন একটা অঙ্কের অফার নিয়ে যা তৎকালীন যে কোন রথী মহারথী পণ্ডিত বা উস্তাদের প্রাপ্ত অঙ্কের থেকে পঞ্চাশগুণ বেশী। কিন্তু এই লক্ষ টাকার প্রলোভনও ব্যর্থ মাথা কুটে ফিরে গিয়েছে অন্নপূর্ণাদেবীর রুদ্ধ কপাট থেকে। তিনি টলেন নি, আজও টলেন না, আর কালও টলবেন না।

আর বাজাবেনই বা কেন? যে বস্তির মলিন পরিবেশ সৃষ্টি করে, ছেঁড়া কাঁথার ঝোলা কাঁধে করে রব্বু উস্তাদদের "মাদারির খেল" চলছে, এবং যাঁরা তা দেখতেই অভ্যস্ত, সেখানে যদি যোগীরাজ বিশুদ্ধানন্দের যৌগিক ক্রিয়ার প্রকাশ হয়, লোকে আদৌ বুঝবে কি? হয়তো বা পারবে, কিন্তু তার শতাংশ কত? যেখানে ঝুটো কাঁচের বাজার বসেছে, সেখানে হীরের দোকানে ভীড় হয় না। সস্তার চমকে এমনি মজা!

হিন্দিতে একটা কথা আছে নিন্নানবে কা চক্কর অর্থাৎ নিরানব্বই-এর ফাঁদ। ঘটনাটা হোল যাঁর এক পয়সাও নেই, সে এক পয়সার জন্যই ব্যাকুল। কিন্তু যেই জমা হতে থাকে আর পৌঁছয় নয়ের কোঠায়, ব্যস শুরু হয় 'নিন্নানবে কা চক্কর'। আর কটা হলেই তো একশ হবে। এতে একশ পাওয়ার চিন্তায় নিরানব্বই পাওয়ার সুখ চলে যায়। আমার অবস্থাও তাই।

প্রথমে তো বই লেখাই আরম্ভ হচ্ছিল না। আর এখন শেষ করতেই পারছি না। সেই শেষ করতে চেষ্টা করি অমনি একটা না একটা ঘটনা ঘটে। আবার শুরু হয় নিরানব্বই-এর ধাক্কা। লোভে পড়ি যোগ করে নেবার। যতই ঘটনা যোগে ঘটনা বাড়ে সমসংখ্যায় স্বজন বিয়োগের ঘটনা ঘটে। যেমন আমার ধারণা ছিল বাবার স্বজনেরা যদিও বাবাকে অনেক 'ক্যাশ' করেছে, তবুও কৃতজ্ঞতা বোধ নিশ্চয় আছে। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর দু'দশকের ইতিহাস দেখে মনে হোল, বাবা, অবায়বিক শরীরের দৃষ্টিতে মৃত আর তৎ জনেরা সাবসায়িক মৃত। কারণ তাঁরা বাবার স্মৃতিতে তো কিছুই করেন না, উল্টে যদি কোন প্রতিষ্ঠান করে তাতে মোটা অঙ্ক না নিয়ে বাজান না। তাঁদের মত হোল আহারে ব্যবহারে চৈব ত্যক্তং লজ্জা, যাবৎ জীবনম্ সুখী ভবেৎ। তাই এ জাতীয় লোকেরা আমার কাছে স্বজনবিয়োগের সামিল।

নিজের ঘরে বিয়োগের হিসাব মেলাতে মেলাতে অপ্রত্যাশিতভাবে একজন যোগ হোল। হঠাৎ আমজাদ আলি খাঁর এক ছাত্র আমার বাড়ী হাজির। তাঁর কাছে শুনলাম, আমজাদ তাঁর বাবার স্মৃতিতে 'উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ স্মৃতি পূর্ণাঙ্গ সরোদ মহোৎসব' আয়োজন করছে

দিল্লীতে। সব ঘরের প্রাচীন ও নবীন শিল্পীরা আমন্ত্রিত। যদিও এটা জানতাম যে আমজাদ পিতৃঋণ ও গুরু ঋণ পরিশোধার্থে, যোগ্য পুত্রের মত গত কয়েক বছর ধরে সাংবাৎসরিক সঙ্গীত সমারোহের আয়োজন করে আসছে। কিন্তু ১৯৮৮র সমারোহ অভিনব! কারণ এবার বাজবে শুধু সরোদ।

ছাত্রটি যখন আমার কাছে "টার্মস" অর্থাৎ কি পেলে আমি যাব জিজ্ঞেস করল, তখন বললাম, "আমজাদ ভাই-এর সাথে আমার টার্মস-এর ব্যাপার নেই। কারণ আমজাদ ভাই নিজেই টার্মস নামক শব্দটিকে বিরাশি সনে বাবার 'শতবর্ষ সমাপন উৎসবে' উপস্থিত হয়ে লুপ্ত করে দিয়েছে। তাই বোধহয় আমরা অপরের কাছে এ জীবনে কখনো ব্যবসায়িক হতে পারবো না। আমাদের মিলনে কোন আর্থিক গণ্ডী নেই। আর কামনা করি, যদি আগামী জন্ম হয়, তাতেও যেন আমাদের দুই পরিবারের প্রীতি ও সৌহার্দ্য এই রকম ভাবেই বজায় থাকে।'

দিল্লী হাজির হলাম ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। যদিও আমার বাজনা ছিল সমাপন দিবসে প্রভাতী আসরের শেষ যন্ত্র। তথাপি উদ্‌ঘাটনের ভব্যতা ও রমণীয়তাকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে সন্ধ্যাবেলায় কামায়নী হলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বক্তৃতা পর্ব শেষ হবার পরেই উঠে আসতাম কিন্তু পারলাম কৈ? দুটি দেব শিশু অর্থাৎ আমজাদের পুত্রদ্বয় যাদের বিরাশি সনের পর আজ দেখছি তাঁরা বাবা আমজাদের শিক্ষায় ও মা শুভলক্ষ্মীর স্নেহচ্ছায়ায় কৈশোরের পাদপ্রদীপে এসে সরোদ নিয়ে বসছে পিতামহের বন্দনায়। তাই বসতে হোল। বাবা বলতেন, 'নাতি হোল সুদ।' এখানে দেখলাম উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ সাহেব সুদের ডিভিডেণ্ড পাচ্ছেন। আমান আর অয়ন বসেছে দাদুর স্মরণে। বাজনা শেষ হবার পর, আবেগের বশীভূত হয়ে উঠতে হোল। ভীড় এড়িয়ে পেছনে একান্তে বসেছিলাম, সেই একান্তের প্রীতি পরিত্যাগ করে মঞ্চে হাজির হলাম। ইচ্ছা ছিল সবার চোখ বাঁচিয়ে ওঁদের অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাব। কিন্তু তা হোল না। পড়বি তো পড় আমজাদের সামনেই।

প্রবল উচ্ছাসের অভিব্যক্তি দেখলাম আমজাদের মধ্যে। আমজাদ জায়া শুভলক্ষ্মী ও ছাত্রবৃন্দের মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধ হলাম। কারণ সাধারণতঃ যেখানে আজকের দিনে নিজের ভাই বা গুরুভাইদের কাছ থেকে "হিমশীতল" অভ্যর্থনাই জোটে যদি এক পথের পথিক হয়। সেখানে আমি তো ভিন্ন ঘরের প্রতিনিধি। নিজেকে আরো আড়ষ্ট মনে হোল যখন দেখলাম আমজাদ তাঁর পুত্রদ্বয় ও ছাত্রদের আমাকে অভিবাদন করতে বলছে। এই শ্রদ্ধায় কোন মেকী ভাব ছিল না, কারণ কোন স্বার্থ নেই। অজান্তেই আত্মীয় হয়ে গেলাম।

এ প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করার আগে অনুজ জায়া আমজাদ পত্নী কল্যাণীয়া শুভলক্ষ্মীর বিষয়ে একটা কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে, কারণ এই বিশাল সুর-যজ্ঞে নীরব কর্মী হিসাবে তাঁর অবদান বর্ণনাতীত। যে মমত্ব নিয়ে ওকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি, তা প্রায় 'রামের সুমতি'র নারায়ণীর সমতুল্য।

যদি এই মিলন-যোগ দিয়ে বইটাকে শেষ করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমার পাঠক্রমের বই পড়ার শেষে মনে একটা তৃপ্তির আমেজ থাকতো। কিন্তু লেখার ফাঁকে কখন

যে মিলনের সূর্য টুপ করে পশ্চিম আকাশে ডুবে পড়েছে, খেয়াল করিনি। যখন চোখ তুললাম দেখলাম পশ্চিম আকাশের পট বিবর্ণ। বিষাদযোগের বাঁশী বাজছে। যোগ শেষ হতে না হতেই বিয়োগের পালা।

বাবার সুর মন্ত্রের "সু" থেকে একজন বুঝেছে 'সু' মানে সুর নয়, সুন্দরী। তাই সে বাংলার কুলীন প্রথার ফসিলে প্রাণ সঞ্চার করছে। আগেকার কালে যেমন শেষ খেয়া চাপার আগে সন্তান বা নাতনি তুল্য বা কন্যাদের বিয়ে করে কুলীনেরা তাঁদের ধন্য করতেন, তেমনি দানবের 'দ' অর্থবোধক বাবার এক শিষ্য সেই রকম করছেন। আমার মাথা ব্যথার কারণ লোকে বলবে, বাবার শিষ্য।

অবাক হয়ে ভাবি সৎগুণ কি এ যুগে লুপ্ত হয়ে গেছে? মহাভারতে পাই, বিরাটরাজা অর্জুনের পরিচয় পাওয়ার পর কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু উত্তরে অর্জুন বলেছিলেন, 'আমি আপনার কন্যার সঙ্গীতাচার্য ছিলাম। শিক্ষক পিতাই হয়। আর অজ্ঞাতবাসকালে, অন্তঃপুরে আমি উত্তরার সাথে বসবাস করেছি, অতএব আমি বিবাহ করলে লোকে আমাকে সন্দেহ করবে, সুতরাং আপনার কন্যাকে আমি পুত্রবধূ হিসাবে স্বীকার করছি।'

সে যুগের আর এ যুগের পার্থক্য কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? কত অবাস্তব জিনিষই না দেখলাম! আমার মাথায়ই আসে না যে সেই সব লোক কি করে সমাজে সম্মান পায় যাঁদের আসন্নপ্রসবা পুত্রবধূ আর স্ত্রী একই সঙ্গে মাতৃত্বমণ্ডিত হচ্ছেন। কি লজ্জা যখন দেখি পুত্রের প্রণয়িনীকে পিতা বিবাহ করে নিচ্ছেন অথবা রক্ষিতা করে রাখছেন। ছেলের সামনে এঁরা কিভাবে চোখ তুলে কথা বলে বুঝতে পারি না।

তা বলে এ কথা অস্বীকার করি না যে পরিণত বয়সে প্রণয় হয় না। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই সব প্রেম হয় 'প্লেটনিক্লাভ' অর্থাৎ নৈসর্গিক ভালবাসা, যেখানে শৃঙ্গারের আলম্বন দৈহিক নয়। তাই প্রেম গঙ্গায় বন্যা এলেও কাদা পড়ে না জল নেমে যাওয়ার পর। এর অন্যথায় বহু জায়গায় বন্যার জল তো আসেই না। সেখানে দেহ সরোবরের বাঁধা প্রণয়ের জল মিথ্যাচারের গরমে এক সময় শুকিয়ে যায়। শুধু বেঁচে থাকে কিছু পূতিগন্ধময় পাঁক। যা অতীতের বিরক্তিকর কাম প্রমোদের পরিণাম মাত্র। মান অভিমান সব মানুষেরই থাকে, কিন্তু একটা বয়সের পরে তা আর মানায় না। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বাড়ে কিন্তু এঁদের যত বয়স বাড়ছে ততই এঁরা ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে।

যাকে নিয়ে এ প্রসঙ্গ, তাঁর আছে জৈবিক লাম্পট্য দোষ। কিছু লোক আছে যাঁদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এ দোষটা 'স্রিঙ্ক' করে। আবার কিছু থাকে 'সাংফ্রোআইজড' গোত্রের লম্পট। যাঁদের সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তি আছে—'বোনাফাইড' লম্পট। যাঁদের প্রেমবৃক্ষের বীজরোপন হয় দৈহিক মিলনের বসন্তে।

কবি সুকান্তের একটি মোরগের কাহিনীতে আমরা পাই, মোরগ গিয়েছিল খাবার খেতে নয়, খাবার হয়ে। ১৯৮৯ র জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের এক সকালে ঠিক সেইরকমই আমার অবস্থা হোল। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখি আমাদের এক সতীর্থেরই খবর।

ছোট্ট একটা বক্সে এক চমকপ্রদ খবর বের হয়েছে। এক জনের 'ওয়েডিং বেল' বেজেছে। ভীষণ ভাবে চমকালাম। কারণ যাঁর অন্য 'বেল' বাজার সময় হয়েছে তাঁর ওয়েডিং বেল!

অবাক হয়ে ভাবি এতদিন জানা ছিল যে মানুষ মরার আগে বিকারগ্রস্ত হয় বা তাঁর ভীমরতি ধরে। কিন্তু জ্ঞানতঃ লোকে বিকারগ্রস্ত হয় এই প্রথম দেখলাম। নিয়তির কি বিষম ফল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত! এই জগতের মানবচক্ষু যা দেখা যায় তাই দেখল, শুনল আর বুঝল!

ভাবলাম এঁর তো অনেক প্রিয়জন আছে কেউ একে কিছু বোঝাল না? অনেক শিষ্য সামন্তও আছে। একটাও মুখর হয়নি প্রতিবাদে? এঁরা কি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ 'চরিত্রপূজা' পড়েনি? পড়েনি বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্টের সেই অসাধারণ ঘটনাটি? "তাঁর এক বৃদ্ধ অধ্যাপক আসন্ন সময়ে নাতনি সমতুল্য একটি কন্যাকে বিবাহ করলেন। খবর পাওয়া মাত্র বিদ্যাসাগর মশাই উপস্থিত হলেন এবং কন্যা সমতুল্যা গুরুপত্নীর আসন্ন বৈধব্যকে অনুভব করে কাঁদতে লাগলেন। পরিশেষে গুরুপত্নীকে প্রণাম করে এবং গুরুর দ্বিতীয়বার মুখদর্শন করবেন না বলে স্থান পরিত্যাগ করলেন।"

এ যুগে মায়েরা বিদ্যাসাগর-সন্তান গর্ভে ধারণই করেন না। না হলে গুরুঠাকুরটি অবলীলাক্রমে গুরুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছেন আর কেউ প্রতিবাদ করেন না? হিটলারের যুগেও ফ্যাসীবাদকে নিন্দা করার লোক জার্মানীতে ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে কি তাও লোপ পেয়েছে? তাছাড়া কাগজগুলোও কোন নিন্দাবাদ করল না! বাড়ী থেকে না বেরোনোর ফলে কয়েক দিন নিশ্চিন্তে কাটলো। তার পর এলেন বিশ্বনাথ মুখার্জী।

প্রায় তিরিশ বছর আগে কাশীর বিখ্যাত ঠলুয়া ক্লাবের প্রতিনিধি আর সঙ্গীত পরিষদের সচিব হিসাবে বিশ্বনাথ মুখার্জীকে যে রূপে চিনতাম, তাঁর থেকে বেশীই এখন চিনতে পারি। মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও হিন্দি সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং রচনার সংখ্যা শতাধিক। এ এক মূর্তিমান 'রূপচাঁদ পক্ষী'। সাক্ষাৎ শনি ঠাকুর। ঠোঁট কাটা বললে ভুল হবে, এ একেবারে ঠোঁট দুফালা। ভুল দেখলে সে যেই হোক না কেন ঝেড়ে কাপড় পরায়। নিজের বিষয়ে অমায়িক উক্তি, 'আমি খেজুরের পাতা, আমাকে শৌচকার্যে ব্যবহার করবেন না। টিসু পেপারের মত নরম নই যে পেলব আনন্দ পাবেন।'

এসেই একগাদা প্রশ্ন করলেন। বুঝলাম আজ তাঁর তূণে অনেক বাণ রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন প্রকাশেই বিষম খেলাম। এতো প্রশ্ন নয়, এ গল্পচ্ছলে সোজাসুজি চরিত্র হনন। এমন চাঁছাছোলা কথা বলার ধরণ যে ধাত ছেড়ে যায়।

'আরে মশাই, কিছু মনে করবেন না, মিউজিশিয়ানরা বড়ই দুশ্চরিত্র।

যে পর্যায়ে আপনারা নামছেন তাতে ভবিষ্যতে হয়তো আপনাদের কোন যুবতীর শব পাহারা দিতেও বলতে ভরসা পাবে না।' কথাটা শুনে শরীরটা রিরি করে উঠলো। কি জঘন্ন খেউর শৈলী! বললাম, 'দোল অর্থাৎ হোলির তো এখন অনেক দেরী। এখন থেকেই মুখ খারাপ কেন করছেন?' কাশীতে দোলের সময় আবালবৃদ্ধবনিতার গালাগালি দেওয়ার প্রচলন আছে। তাই বলি শীতে বসন্ত কেন?

আমার কথা গায়ে না মেখে বিশ্বনাথের কথার নৌকো তখন তরতর করে এগিয়ে

চলেছে। বললেন, 'আপনার বাড়ী আসার পথে আর এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম সকালে। সেখানে দেখি তুমুল হট্টগোল। বন্ধুবর নিজের পনের বছরের কিশোরী কন্যার চল্লিশ বছরের সঙ্গীত শিক্ষককে হাত জোড় করে দরজা থেকেই বিদায় করেছেন। খালি এক কথা। আমার মেয়ের আর সঙ্গীত শিখে কাজ নেই। ঘাট হয়েছে।' কাঁচুমাচু মুখ করে শিক্ষকটি বলছে, 'আমি কি খারাপ শেখাই? পুরোটা সময় তো যত্ন করে শেখাই। এমন একটা কিছু পয়সাও নিই না। মেয়েটাও কয়েকটা পরীক্ষা ভালভাবে পাস করেছে।'

বন্ধুবরের বাঁশ ফাটা জবাব, 'তোমার সব ভাল, কিন্তু তোমাদের চরিত্র ভাল না।' অপমানিত শিক্ষক চটে মটে বলল, 'কি যা তা বলছেন? আমি শুধু বিবাহিতই নই, আপনার মেয়ের বয়সী আমার একটা মেয়েও আছে।' এবারে আর কথা নয়, বন্ধুবর হুঙ্কার ছাড়ল, 'ঢের দেখেছি বিয়েওয়ালা, তোমার তো একটা বৌ আর দুটো বাচ্চা। যার একগাদা বৌ আর অগুন্তি বাচ্চা এমন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞও যদি পতিত হয়ে নিজের সন্তানের থেকে ছোটো অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে ভোগে লাগাতে পারে, তো তুমি কোন ছার? চুলোর দোরে যাক সঙ্গীত শিক্ষা! না আমার মেয়ের শিখে কাজ নেই। জগৎ দুনিয়ার মেয়েদের এই সব দেখে শিখে রাখা দরকার।'

মাষ্টারটি ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন, 'অন্য কে কি করলো, তার সাথে আমার কি মতলব?' বন্ধুবর তড়াক করে উঠে খপাৎ করে শিক্ষকের কলার চেপে ধরল। হাতাহাতি হবার প্রবল সম্ভাবনা দেখে যখন সন্ত্রস্ত হবার চেষ্টা করছি তখন দেখি রাগে গরগর করতে করতে বন্ধুবর বলে চলেছেন, 'কল্কা করা পাঞ্জাবী নকল করার বেলায় তাঁর ভক্ত।' তাঁর এক খামচা বাবরী চুল ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'বাবরি চুল রাখার বেলায় যদি তাঁর ভক্ত হও, তাহলে মেয়েদের সর্বনাশ করার বিদ্যায় যে তাঁর ভক্ত নও, তার প্রমাণ কি?' সত্যিই মাষ্টারের কাছে এ প্যারাডক্সের কোন জবাব নেই। তাই মুখ কালি করে মাষ্টার চলে গেল। বুঝলাম, 'চিরকালের মত কল্কাকরা পাঞ্জাবী ছেড়ে আর সঙ্গীত দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য বাবরি বিদায় করে মাথা কামাবে।'

এক নাগাড়ে এতক্ষণ বিশ্বনাথ বক্তা আর আমি শ্রোতা। ঘটনা হোক আর গল্পই হোক, গুছিয়ে বলতে বিশ্বনাথের জুড়ি পাওয়া ভার। রুষ্টদেবকে তুষ্ট করার জন্য চা জলখাবারের ব্যবস্থা করলাম তাড়াতাড়ি। উদ্দেশ্য ছিল প্রসঙ্গান্তর করা। কিন্তু ফল হোল বিপরীত। জল কয়লা পড়ার পর প্রশ্নের স্টীম আরো প্রবল হয়ে বের হতে লাগলো।

সাধারণ লোকের জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর শেষ হয় কাশীতে বা কাশী পাওয়াতে, কিন্তু বিশ্বনাথের যতক্ষণ কোন ঘটনার গয়া প্রাপ্তি না ঘটে ততক্ষণ শান্তি হয় না। জলখাবারের সদগতি করতে করতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে আবার বিয়ে করছেন?' মুখে খাবার নিয়ে কথা বলার জন্য কোথায় বিশ্বনাথ বিষম খাবেন, তা নয় খেতে খেতে হোল আমাকে, যদিও খালি মুখেই ছিলাম। এ আবার কি বিচ্ছিরি ধরনের কথা বার্তা! বললাম, 'আমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে যে এই চৌষট্টি বছর বয়সে বিয়ে করতে যাব? এখন তো রোজই শুনতে পাই—নাবিকের হাঁক—বন্দরের কাল হোল শেষ।'

বিশ্বনাথ ধমক দিয়ে বললেন, 'পুরো কথাটা না শুনেই ফিলজফি ঝাড়েন কেন? যা জিজ্ঞাসা করছি একটা একটা করে জবাব দিন। আপনি কি শঙ্করাচার্যের আমন্ত্রণে এলাহাবাদ যাচ্ছেন কল্পবাস করতে? মহাকুম্ভ বলে কথা!' বললাম, 'হ্যাঁ যাচ্ছি।' বিশ্বনাথ বললেন, 'একজন শিল্পী ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনই দেবস্থান কাশীতে বসে খবরের কাগজে ছাপালেন—এবার মহাকুম্ভ উপলক্ষে কল্পবাস করবো স্থির করেছি। তিন সপ্তাহ ঘুরলো না বধূবরণ করে সহবাসে ছুটলেন।' নতুন বৌটিও তেমন। দিল্লীর এক হিন্দি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার দিয়ে কল্পবাসের মিথ্যা সঙ্কল্পের হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিল। বলে বসল, "চার মাস আগেই উনি আমাকে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে ভোগের ওপর স্বীকৃতির জল ছিটিয়েছেন এবং সেই সময়েই এই সাত পাকে বাঁধার দিন স্থির হয়। ওঁর আমার নৈকট্যজাত আট বছরের কন্যা এবার বিধিগতভাবে বাবা ডাকতে পারবে।"

তাই বলছি, 'আপনার কল্পবাসের পেছনে এ জাতীয় কোন লটর-পটর নেই তো? ও যদি যাব বলে একটা করতে পারে তাহলে আপনি ফিরে এসে দুটো করতে পারেন। এবার দাঁও ফসকালে আবার বারো বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

আজকের বিশ্বনাথকে কল্যাণকারী শিব বলে মনে হচ্ছিল না। এ যেন সংহারক রুদ্র। তাই নীরব থাকাই ভাল। হঠাৎ বিশ্বনাথ বললেন, 'প্রতি প্রশ্ন পিছু উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। এক ঝুড়ি প্রশ্ন করছি, 'এ্যাটেণ্ড এনি ফাইভ।'

কথার মোড় ঘোরানোর জন্য বললাম, 'থাক না এ সব কথা। অকারণে অন্যের পার্সোনাল লাইফ নিয়ে আমাদের কি হবে? কি দরকার—অন্যের ময়লা কাপড় নিজের বাড়ীতে কেচে? তাতে হাতও ময়লা হয় বাড়ীও,' খেঁকিয়ে উঠলেন বিশ্বনাথ, 'তাহলে এই ছাতার বই লিখছেন কেন? এটাও তো আগাগোড়া পার্সোনাল।' বোঝানোর জন্য বললাম 'বাবার জীবনী লিখছি এই জন্য যে এতে শিক্ষণীয় তত্ত্ব আছে। আর মহাপুরুষের জীবনী অনুকরণ করা উচিত।' বিশ্বনাথ বললেন, 'আমার তো সেটাই বক্তব্য, 'মহাপুরুষদের অনুকরণ হওয়া উচিত। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই বরং সমর্থনই আছে, কিন্তু মহাপুরুষ চর্মাবৃতকে 'তথাকথিত' মহাপুরুষ যদি কোন কুকর্ম করে আর সাধারণ লোকে যদি মহাপুরুষ কৃত কর্ম-ইতি-সুকর্ম ভেবে সৎ-অসৎ নির্বিচারে অনুকরণ করতে থাকে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? কারণ 'কমন' লোকেদের 'কমনসেন্স'টা একটা 'আনকমন' ব্যাপার।'

বুঝলাম তর্কে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তবুও ক্ষীণ আপত্তি করে বললাম, 'বই-এর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। এখন গোছগাছের জন্য একটু ব্যস্ত থাকব কয়েকদিন। তারপর না হয় একদিন বসে এ ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।' ভেবেছিলাম যে রকম অসভ্যের মত যাবার ইঙ্গিত করেছি তাতে শুধু মনঃক্ষুণ্ণই নয়, রুষ্ট হবেন বিশ্বনাথ।

কিছুই হোল না বরং ক্ষেপে গিয়ে জিদ ধরে বসলেন, 'না, আজকেই শুনতে হবে। নেপোলিয়নের প্রেম নিয়ে গল্প লেখা হয় না? ইংল্যাণ্ডে রাজা প্রেম করে গদী হারালে মুখরোচক গল্প লেখা হয় না? ব্রিটিশ মন্ত্রীর প্রেমের জোয়ারে চেয়ার খোয়ানোর সরস গল্প লেখা হয় না? আর যদি তা হয়, তাহলে কোন সত্তর বছরের বুড়ো যদি অন্যের বিবাহিতা

চৌত্রিশ বছরের ঘরণীকে ভাগিয়ে নিয়ে মেকগুড করে, আলোচনা তো করবোই। বিশেষতঃ নাম ডাকে ভদ্রলোক ভারতীয় সঙ্গীতের বা আপনাদের ঘরাণার এক বিশিষ্ট কেষ্ট বিষ্টু। এ দেশ তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে। যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, সামাজিক স্বীকৃতি, সরকারী তকমা, উপরন্তু গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ভবনের মানদ সদস্যপদ। তাই তিনি যদি এমন একটা ব্যাপার করেন, আলোচনা তো হবেই। ওঁর বেলায় লীলা এবং অপরের ক্ষেত্রে বিলা। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা চলতে পারে না।

—বা রে নারীপ্রাপ্তি ভাগ্য! আত্মজীবনীতে নিজেই লিখেছে, 'ছ'বছর থেকে শুরু করেছি (আর উনসত্তরেও) ক্ষান্তি নেই। সমান তালে গাছের খেয়ে চলেছে আর তলারটা কুড়িয়ে চলেছে। এ কথা ঠিক যে পৃথিবীতে হিটলারের মত ওঁছা লোককে নকল করে যদি লোকে হিটলারী ছাট গোঁফ রাখতে পারে, সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ লোকটা তো দেখতে ভাল, গান বাজনাতেও হাত যশ আছে। সমাজ যদি এঁর যৌন-স্বভাবকে নকল করে? তাহলে কি হবে? আকাশে ওড়া ভ্রমর ভাল। কিন্তু ভ্রমর স্বভাবের মানুষ হলে আবার লোকে যদি তাঁকে অনুসরণ করা আরম্ভ করে, তাহলে সার্বজনিক জাহান্নম যাত্রার পথ প্রশস্ত হবে মাত্র। এটা যদি বারাঙ্গনা-গমন হ'তো, তাহলে হয়তো কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু এ তো পলিগামি। একের পর এক অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে মনজের জামা পরিয়ে, কামজের হাতে ধরে, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর উপস্থিতিতেই বিপথগামী করেছে, আর আপনি বলছেন ব্যক্তিগত ব্যাপার?'

হিপ্নোটাইজ করলে যেমন হতচেতন হয়ে যায় মানুষ, ঠিক সেই রকম আমার অবস্থা। তবুও বললাম শেষ চেষ্টার মত, 'থাক্ না। ব্যাপারটা বড়ই ভাল্‌গার।' কথাটা লুফে নিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, 'ঠিক বলেছেন। না হলে ভাবতে পারেন ১৯৮৯ সালে বিয়ে হচ্ছে আর বিয়ের পরই কনে বলছে বাচ্চাটা 'ওঁর'। বয়স আট। জন্মের অঙ্কশাস্ত্র কি বলে? জন্ম তাহলে ১৯৮১ তে? অর্থাৎ পুংসবন সময় ১৯৮০র কোন এক সময়? কোন ১৯৮০? যখন তাঁর অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহিতা স্ত্রী অবিচ্ছেদ্য ভাবে অবস্থিতা। আর এক ভারতীয় নর্মসহচরীও রয়েছেন যিনি এক পরিচালকের খাঁচা থেকে ওড়া পাখী। এঁকেও উপকার করে স্বপথে (বিপথে) পরিচালিত করা হয়েছিল। এতে বৈধতার ছাপ এই জন্য মারেন নি কেননা তথাকথিত প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির ওপর ওঁর বিশ্বাসই উঠে গিয়েছিল। ঠিক সমসাময়িক, অঘোষিত কুলশীল এক আমেরিকান বালা ওঁর স্মৃতির বোঝা বইছিল। একযোগে এই অপরের স্ত্রীটি লণ্ডনে স্বামীর ঘর করতে করতে এই আধুনিক কালিদাসের আদি রসাত্মক সাক্ষরকে ধারণ করে দুহিতাসম্ভবা হলেন।

হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে—'নাদান দোস্ত' অর্থাৎ বুদ্ধিহীন বন্ধু। বুদ্ধিমান বন্ধু যেখানে বন্ধুর মূর্খতাকে চাপা দেয় সেখানে মূর্খ বন্ধু ওটাকেই ফলাও করে চাউর করে। ভাবে বন্ধুত্বের কর্তব্য নির্বাহ করছি। তাই মূর্খ চাটুকারেরা কলঙ্কের মলের রঙ্গীন ছবি ছেপে সারা গায়ে মাখিয়ে দিল। ছাপলেই কি সব ব্যাপার মহত্তম হয়? বলুন তো, দেশে কি আইন বলে কিছু নেই? বড় বলে কি সাত খুন মাফ? কে এই ভদ্রলোককে অধিকার দিয়েছে যে তাঁর

ব্যভিচারজনিত পাপের পরিণামে জাত একটি অবোধ শিশু, বাল্যের আট বছর অবৈধ জীবন ধারণ করে যাবে। তার থেকেও মজার কথা হোল এই শিশুটির যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁর বৈধাবৈধ পিতাটি কাশীর গঙ্গার বুকে বসে বলেছে, "আই এ্যম্ ফিলিং লোনলি"। এই সেই ভদ্রলোক যিনি নিজের বইতে, বাল্যকালে নিজের মায়ের সঙ্গে ভালবাসা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড সাহেবের নাম উল্লেখ করতে লজ্জিত বোধ করেন নি। এই লোকটাই প্রেস পাব্লিসিটি পাবার লোভে এই অর্বাচীন বিয়েটার এক পক্ষ কাল আগে মিথ্যা প্রচারের বেসাতি করেছে, মহাকুম্ভে কল্পবাস করবো।'

বিশ্বনাথ বোধহয় আরো প্রশ্ন করতেন, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা মধ্যাহ্ন পার করে সায়াহ্ন মুখী। তাই থামলাম। বলাম, 'এঁর একটারও উত্তর আমার জানা নেই। এরকম কাজ কোনো সঙ্গীতজ্ঞ করলে, তাঁর কি সাজা হওয়া উচিত সে বিষয়েও কোন ধারণা নেই।' যদিও মনে মনে ইচ্ছা হচ্ছিল চিৎকার করে বলি আই হ্যাভ এ্যাটেন্ডড্ অল কোশ্চেন্স, সী এনি ফাইভ। কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। বিশ্বনাথ চলে গেলেন।

চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম, শুভকে হারালে অশুভই হয়। অন্নপূর্ণাকে হারালে লক্ষ্মীছাড়াই হয়। কে জানে এখনো আরো কত অবৈধ সন্তান রয়েছে যাঁদের অদ্যাপি পিতৃপরিচয় জুটলো না। এককে পরিচর্যা করেও যে সত্যকাম জন্মায়, এ বিরল সত্য জানা ছিল না। বায়োস্কোপের মত এ শঙ্করস্কোপ। আর দেখে কাজ নেই।

এবার ধীরে ধীরে সমাপ্তির পথে যাত্রা শুরু। বিরাট পরিসরে আর পরিপ্রেক্ষিতে বাবা ও তাঁর ভবিষ্যতের কথাগুলো নিয়ে বিচার করলাম। নিষ্কর্ষ কি পেলাম তা আজ বুঝতে পারবো না। কারণ একটা বিশাল আর সুদূরপ্রসারী পরিণামের অংশমাত্র দেখতে পাচ্ছি। সেই রূপটা পূর্ণায়বর নয়।

যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, দেবতার মধ্যে বিষ্ণু, তীর্থের মধ্যে কাশী, ধর্মশাস্ত্রে শ্রীমৎ ভাগবৎ সর্বোপরি, তেমনি সঙ্গীতে সেনিয়া ঘরাণা। ভারতীয় সঙ্গীতের অস্তিত্বে সেনিয়া ঘরাণা একক, অনন্য। আর তাই তানসেনের বংশধরেরা অমর হয়েছেন। বাবা উজির খাঁ সাহেবের কাছ থেকে সেই অমৃত পেয়েছিলেন, অমৃতস্যপুত্র! বাবা নিশ্চয়ই তাঁর গুরুর কাছ থেকে "অমৃতস্যপুত্রাঃ"র আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, কিন্তু আশীর্বাদ কি বহুবচনে ফলপ্রসূ হয়েছে? আগামীকাল বলবে 'বাবা' নামক বৃক্ষের কটা শাখা বা প্রশাখা জীবন্ত বা ফলপ্রসূ।

বাবা ভুঁইভোড় ছিলেন না। তাঁর ছিল গৌরবোজ্জ্বল অতীত। আর সেটার মূল্য সম্পর্কে বাবা সচেতন ছিলেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় বাবার বৃক্ষকে আশ্রয় করে যে আগাছা আর পরগাছারা নিজেদের পাদপ ভাবে তাঁদের রয়েছে শুধু বর্তমান, তাৎকালিক লাভ। অতীত শূন্য। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, অনদ্যতন।

এতক্ষণ বাবার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নের কথা লিখলাম। এই তিনটে কালই সময়ের আবর্তে অনাদিকাল থেকে পাক খাচ্ছে। আর চিরকালই পাক খেয়ে চলবে, এই বোধহয় পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তের আসল তাৎপর্য। এই বই লিখতে গিয়ে কত ঘটনা, লোক আর পরিস্থিতির সম্মুখীনই না হয়েছি! বই শেষ করার সাথে সাথে এসে পৌঁছেছি

জীবনেরও শেষ প্রান্তে। যাত্রা শেষের কালে আমার মনে হয়েছে পৃথিবী আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জীবন প্রতারণা করেছে। কিন্তু কার ওপর আমি প্রতিশোধ নেব? কাকেই বা ক্ষমা করব? নিজের পা দুটো কপাল পর্যন্ত ওঠে না, নইলে সবার আগে ওটাকেই থেঁতলে দিতাম। এই কপালের ওপর এককালে অনেক আস্থা ছিল। তখন প্রেম, নীতি, ভালবাসার কোন এক দুর্জয় শক্তির ওপর নির্ভর ছিল। কিন্তু এখন মনে হয়, সেই আস্থাগুলোর জন্য জীবনটাকে উজাড় করে ঢেলে দেওয়াটা হয়েছে—'ইডিয়সি অফ ফার্স্ট অর্ডার'। এ সবের কোন অর্থই নেই।

তাই আমি স্বজনদের বিরোধ, অপরিতের সাহচর্য, প্রিয়জনের শত্রুতা, ঘাত প্রতিঘাত সব ভুলতে চাই। বিধির অমোঘ বিধান বলেই সব মেনে নিয়েছি। অন্যথায় আমার দুঃখ সেই অরক্ষণীয়া বোনের মত, যে ভায়ের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক ঘুমোচ্ছিল, এবং ভাই অর্থের স্বার্থে ঘরে লম্পট ঢুকিয়ে দিয়েছে। ভায়ের হাতে সম্ভ্রম হারালে একটা সান্ত্বনা থাকে, আর তা হোল, মানসিক সাম্য হারান বিকৃতিজনিত অপরাধ। কিন্তু গ্রাহক তোলাতে সচৈতন্য বিকৃতি? কারণ অর্থলোভও যে জড়িত রয়েছে জানোয়ার প্রবৃত্তির সাথে।

৮৭

এখন আমার নিজের লোককেই সব থেকে বেশী অবিশ্বাসী বলে মনে হয়। এঁরা হোল পিরহানা মাছের জাত। নিজেরা নিজেদেরকে খেয়ে বেঁচে থাকে। একজন ওপরে উঠলেই তার পা কামড়ে তাকে টেনে নামায়। এঁদের ইকুয়ালাইজেশন পলিসিটিটা সত্যই বিচিত্র। পরিণামে দেখছি শুধুই অসন্তোষ। এ এক সর্বগ্রাসী অসন্তোষ।

জীবনের পাঠশালায় মহাকাল গুরুমশাই, বেত মেরে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। মিত্রবোধ, মিত্র সম্প্রাপ্তি অহংবোধ আর তাঁর করুণ পরিণতি। বাবা বলতেন পরীক্ষা! আজ আমি পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত। ছুটি চাই। মন ভরে গেছে। নিরপেক্ষ থাকতেই তো চেয়েছিলাম, কিন্তু সকারাত্মকভাবে। যথাস্থিতিকে মৌনভাবে স্বীকার করে নেওয়াটা আমার মনে হয় ন্যাক্কারজনক নকারাত্মক। তখন কি ছাই জানতাম, সকারাত্মক নিরপেক্ষতা মানে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম! তবুও নিজের আদলে চলেছি। গত চার দশকে এই পথ চলায় প্রশংসা, কটুক্তি, শ্রদ্ধা, আশীর্বাদ, সম্মান-নিন্দা, সব মিশিয়ে যা পেয়েছি সমস্তই আমি নত মস্তকে গ্রহণ করেছি। যা প্রাপ্য বা যা অপ্রাপ্য উভয়ই স্বীকার করেছি। বই লেখার সময় সকারাত্মক হবার ফলে আমার অনেক এককালীন ও বর্তমান প্রিয়জনদের আঘাত করেছি। যতটা করেছি তার থেকে অনেক বেশি নিজে পেয়েছি। তবুও লিখেছি বংশধরদের স্বার্থে। সেনিয়া ঘরাণার যাত্রাপথে কি কি ঘটেছে বা ঘটছে তা আগামী যুগে সেনিয়ারা জানলে শিক্ষা নেবে। কটু সত্য লিখেছি এ কথা ভেবে যে আগামী প্রজন্ম এগুলোকে 'ন ইতি ন ইতি'র নেগেশনের মাধ্যমে ত্যাগ করে সঙ্গীতের পরমসত্য ব্রহ্মস্বরূপকেই গ্রহণ করবে।

যাঁদের চেতন মন থেকে বহুদিন আগেই মুছে ফেলেছি তাঁরা এখনও অবচেতন মনে রয়ে গেছে। তাই প্রত্যক্ষ বলে যাঁদের সাথে কথা বলার বা মুখ দেখারও বালাই নেই, তাঁদের একদিন অবচেতনের তন্দ্রায় পেলাম। চেতনায় মুখ যা না বলতে পারে অবচেতনায় তা মুখর

হয়। অনেক না বলা বাণী বেরিয়ে আসে। বই শেষের পরিশ্রমের অবসাদে রাত্রে দেখলাম, বাবার প্রসাদপুষ্ট ও ধন্য মনুষ্য সংজ্ঞাধারী এক মনুষ্যেতরকে বিধি বিচারকের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করছি।

বেদনার আচ্ছন্নতায় প্রশ্ন করেছিলাম, 'আমার জীবনে যা ক্ষতি করেছ, তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে? আমি তোমার চামচাগিরি করিনি বলে তুমি কোমর বেঁধে আমার সর্বনাশ করেছ? অপরের গৃহবধূর ওপরে নজর কেন? খুব খারাপ কথা বলেছিলাম, তাই না? নাহলে আমার প্রোগ্রাম কাটানোর জন্য গত তিন দশকে অত নীচতা কেন করতে? তুমি চেয়েছিলে যে কেউ তোমার নর্মসহচরী হোক তাকেই বৌদি বলতে হবে? আমি বলিনি তাই আমি খারাপ? তোমার রাগ যে আমি তোমাকে কুর্ণিশ করি না। কিন্তু তোমার তো জানা উচিত যে তুমি যে শাহেনশাহের হাজারি মনসবদার, আমি তাঁরই খাস তালুকের প্রজা। তুমি মাত্র কুশল বিনিময়ের যোগ্য। তায় আবার যে দিন থেকে জানতে পেরেছি যে প্রভু ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কি করে আশা কর যে তোমায় পুজো করবো? এ কথা ঠিক যে শয়তানের হাত ধরে জাহান্নমের পথে হাঁটলে অর্থ আসে কিন্তু সবাই কি তোমার মত শয়তানকে পিতৃসুখ দিতে পারে? তোমার বিষয়ে এক খাঁ সাহেবের উক্তি এখনো আমার কানে ভাসে, "জিস দিন নক্সে জহাঁ পে হুয়া ওহ পৈদা, ইবলিস্ নে সোচা হম সাহিবে ঔলাদ হোগয়ে।" অর্থাৎ যেদিন ধরাধামে তুমি পদার্পণ করলে, শয়তান প্রথমবার পিতৃত্বের সুখানুভূতি অনুভব করল।

নিজের যশের ক্ষুধার তাড়নায় হায়নার মত নিজের সন্তানকে খেয়েছ? আমি এ হত্যার বিরোধিতা করেছিলাম বলে আমি খুব খারাপ? তোমার অবস্থা সেই দাম্ভিক মূর্খের মতো যে সগর্বে বলেছিল, 'জুতোর বাড়ী খেয়েছি বহু জায়গায় কিন্তু অপমানিত হই নি কখনো।' না হলে তোমারই জন্মদিনে তোমারই ডাকা এক শিল্পী মঞ্চে বসে তোমাকেই মাইকের মাধ্যমে বলল, "দেখবেন যেন এ বয়সে নতুন করে আবার বিয়ে না করেন!' এ কথাটা যদি আমি বলতাম, তাহলেই খুব খারাপ হ'তো? জেরার পর জেরা করতে করতে মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছে। কত কথা বলেছি, আচমকা একটা আওয়াজে ধড়মড়িয়ে উঠে বেডল্যাম্প জ্বালালাম। দেখলাম জ্বলজ্বল করে জ্বলছে দুটি চোখ। দেখলাম একটা বড় ইঁদুর টেবিলের উপর। আমার এলার্ম ঘড়িটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। বুঝলাম ঘড়িটা পড়ে যাওয়ায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে। আমি কি তাহলে এতক্ষণ স্বপ্নে আবোল তাবোল বলেছিলাম? অনুশোচনায় মনটা ভরে উঠলো। ছিঃ ছিঃ আমি কতটা অহঙ্কারী? বাবার মূর্তিটা স্মরণ করে ক্ষমা চাইলাম। বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন। ওগুলো আমার মনের কথা নয়, মতিভ্রম। আপনার কাছেই শিখেছি পরের দোষ দেখো না নিজের দোষ দেখ। পরনিন্দা, পরচর্চা অপরাধ। নিজের চর্চা করো। নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করো। পরকে অতিক্রমণ করার চেষ্টা না করে নিজেকে অতিক্রমণ করার চেষ্টা করো।' বাবার সেই অমর আপ্ত বাক্য—

মন তুমি বুঝ বড়
নিজের ছিদ্রের নাই পারাবার
পরের ছিদ্র তালাশ করো।

বাবার উজ্জ্বল জীবনীর প্রচ্ছদপটের অভ্যন্তরে মা'র ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আছে। কী ঐকান্তিক অপ্রকাশিত থাকার ইচ্ছা! কথায় বলে বঞ্চনা যাঁর কপালে থাকে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিছু ছাড়ে না। মা'র জীবনটাই তাই। জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত বাল্যের দিনগুলো কি রকম ছিল জানি না। কিন্তু তারপর সুদীর্ঘ তিরানববই বছর শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর ঘর, আর পুত্রবধূর ঘরে ছেলের অন্নে দেখতে পাই সেই বঞ্চনারই প্রতিফলন। হয়তো ক্ষীণ একটা স্বীকৃতির ঝিলিক আছে, বাকিটা ঢাকা রয়েছে বঞ্চনার কালো মেঘে।

মা'র জীবনের নিঃস্বার্থ সেবার নিরানববই ভাগই হোল মরুভূমির ওপর বর্ষা, যাতে সবুজ ধানের শীষের মাথা নীচু করে স্বীকৃতির অভিবাদনের বাধ্যতা নেই। যদি জীবন ভর মাথা নীচু করে, মা এই ভূতের বেগার না খাটতেন এবং তার ফলে স্বামীর সাথে বোঝাপড়ায় যে অমিল ঘটতো, যে পরিমাণ ঘটতো তা চিন্তা করার বিষয়। কিন্তু মা স্বার্থ বা সম্মান সচেতন হন নি এবং তাই বাবা একাধারে বহির্বিশ্বকে সঙ্গীত দিতে পেরেছেন এবং তাঁর অবদান জনসমক্ষে স্বীকৃত হতে পেরেছে। ফলদাতা বৃক্ষ হিসাবে যদি বাবার যশ হয় তাহলে মা মালি হিসাবে, বাবার থেকে কোন অংশে কম অভিনন্দিত হবেন না। বাবা যদি গোবিন্দ হন তাহলে মা হলেন গুরু। গোবিন্দ কৃপা ধন্যদের মধ্যে উভয়েই সম্যক ভাবে প্রণম্য।

কিন্তু এ সত্য বুঝলো কে? বাবার প্রয়াণের পর মা'র চোখে ছানি পড়েছে, কেউ কাটানোর ব্যবস্থা করলো না। ফলে মা জীবিত অবস্থায় থেকেও আলো থেকে বঞ্চিতা। যে চিরটা কাল নিঃশেষে দিয়েছে, সে কি চাইবে? মাও চান নি। কেউ কি মাতৃঋণ স্বীকার করে ১৯৮৮তে মা'র জীবিত অবস্থায় শতবর্ষ পালন করলো?

কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুলতে পারেন মা'র শতবর্ষ কি হিসাবে বা কি ভাবে পালন করা যেতে পারতো? তিনি তো সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না যে তাঁর নামে সঙ্গীত সমারোহ, আলোচনা চক্র প্রভৃতির ব্যবস্থা হ'তো।

এঁদের কি ভাবে বোঝাব ইষ্ট দেবতার মন্দিরের আকারের ওপর তাঁর পূজা স্থির ও নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। পুজো মন্দিরের হয় না। পূজিত হন ইষ্ট দেবী বা দেব। তাই আড়ম্বর না করেও, যদি সকলে মিলে সমবেত কণ্ঠে শুধু একবার বলতেন, 'সার্থক জন্ম আমাদের যে আমরা মদনমঞ্জরী দেবীর মত মা পেয়েছি।' যদিও মা আমাদের কাছে কিছুই আশা করেন না, কারণ যিনি স্বামীর কাছেই কোন আবদার বা আকাঙ্খা করেন নি, তিনি কি আমাদের মত অকিঞ্চন সন্তানদের কাছে আশা করবেন এটা ভাবাই ভুল। কিন্তু, তা বলে কি আমাদের কিছু করার নেই?

বাবার সন্ন্যাসীর গৈরিক জীবন পরিচ্ছেদে, মা ছিলেন একটা লাল রং। গার্হস্থ্যের চন্দন। এ চন্দন বাবার জীবন বন্ধন ছিল না, বোঝা ছিল না। তাঁর কাছে মা উপলখণ্ড ছিলেন না, ছিলেন নবরসের উন্মেষস্থল। আর তাই বাবা যেখানে যৎ সামান্যই আত্মজীবনী লিখেছেন, তার ভেতরে মা'র বিষয়ে স্বল্প পরিসরে বলিষ্ঠ উল্লেখ করতে কার্পণ্য করেন নি। মা'কে প্রকাশ করার পেছনে যে সদ্‌কারণ ছিল তা হোল আমরা যেন তার মহিমান্বিত রূপকে ভুলে না যাই।

আগেকার যুগে নিজের জন্ম দিন বা ক্ষণ নিয়েই কেউ বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। তায় স্ত্রীর বয়সের দিনপঞ্জী লেখার ব্যাপারটা ছিল নিতান্তই নিয়ম বহির্ভূত। তবুও বাবা মার বয়স বিসয়ে একটু ঘুরিয়ে লিখলেন "আমার জীবনীতে"। মদনমঞ্জরীর যখন জন্ম হয়, তখন আমার বয়স সাত বৎসর।

আমি নিজেই নিজের প্রমাণিত তথ্য অর্থাৎ বাবার জন্ম ১৮৮১ কে অস্বীকার করে, অর্বাচীনদের প্রগলভ্ তত্ত্ব স্বীকার করি যে বাবার জন্ম ১৮৬২, তাহলে মা'র শতবর্ষপূর্ণ হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। কিন্তু ঘরোয়াভাবেও কি তা পালন হয়েছিল? মা যাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন তাঁদের কি একশোটা মোমবাতি কেনারও সামর্থ ছিল না? যেমন আজকের তারিখেও নেই। মোমবাতি কেনাটা বড় কথা নয়। বড় কথা দাতার ঋণ স্বীকার করা। এঁরা হোল সেই গৃহাভিমুখী গঙ্গাসাগর যাত্রী, যাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য শ্বাপদসঙ্কুল বনে নবকুমার যান কাঠ কাটতে, কিন্তু যেই জীবনের গাঙে স্বার্থের জোয়ার ঢোকে, এরা অচিরাৎ নবকুমারকে বাঘের মুখে ফেলে দিতে দ্বিধা করে না। তথাপি নবকুমার-মানসিকতা চিরকাল অপরের জন্যই কাঠ কাটে। কথায় বলে কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কভুও নয়।

মা'র শতবর্ষ কেউ পালন করুক বা না করুক, আমি উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মিউজিক সারকেলের তরফ থেকে যৎসামান্য ক্ষমতার জোরে পালন করলাম মা'র শতবর্ষ। সেই সময় মা'র কাছে যাবার ইচ্ছা ছিল একবার। কিন্তু যাওয়া হোল কই? ইতিহাসের পাতাগুলো পেছন দিকে ফড়ফড় করে উলটে যেতে থাকে। চোখের সামনে আসে মুগলযুগ। সামনে ভেসে উঠে আগ্রা দুর্গের প্রকোষ্ঠে বন্দী শাজাহান। তাজমহলের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। পূর্ণিমার দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে তাঁকে খুঁজেন। চোখে তাঁর সহযাত্রার আকুতি। তেমনি কোলকাতায় কোন এক বাড়ীর গবাক্ষে, মৈহারের দিকে মুখ করে ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে মা মৈহারে যাবার পথ খুঁজছেন। কিন্তু আমার শ্রবণকুমার হবার সুযোগ তো নেই।

বাবা মা'কে কতটা মর্যাদা দিতেন তা হয়তো জনসমক্ষে প্রকট করতেন না, কিন্তু যাঁরা জানে বা দেখেছে তাঁদের বোঝা উচিত। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, বাবার বেশ কিছু পোষ্য নিজেদের স্ত্রীকে চাকরাণী, বাঁদি, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বা লাঞ্ছনাসিদ্ধা ভাবতেই ভালবাসেন। অন্যের স্ত্রীর কৃপা, করুণা, সহানুভূতি, আর তথাকথিত প্রেম পাবার জন্য তাঁদের সামনেই স্ত্রীকে অপদস্থ করেন। সেখানে বাবা জনসমক্ষে বলতেন, 'তোমাদের মা অনেক কষ্ট করেছেন।'

মা'কে কোলকাতায় দেখতে পাইনি। ১৯৮৮র মহালয়ার দিন কাশীতে ফিরছি পশ্চিম ভারত থেকে বাজিয়ে। পথে পড়বে মৈহার। ভোরবেলা হলেও স্টেশনে এক ছাত্র দেখা করতে এসেছিলো। তার মুখে শুনলাম মা রয়েছেন এখানে। চমক লাগলো। ক্ষণিকের জন্য দোটানায় পড়লাম। কারণ ঠিক ছিল কাশীতে গিয়ে পিতৃপুরুষের পার্বণ শ্রাদ্ধ করব। পরমুহূর্তেই স্থির করলাম, আজকের দিনে যদি বাবার মাজারের সামনে বসে বাজাই ও মা'র দর্শন করি, তাহলেও আমার পূর্বপুরুষেরা তৃপ্তই হবেন। খুশী হবেন যে তাঁদের সন্তান কৃতঘ্ন নয়। হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম।

সূর্য লাল থেকে হলদে হবার আগেই জজ্ মুরারী যায় (যিনি উকিল থাকাকালীন বাবার উইল করেছিলেন) ও আমার মৈহারবাসী এক ছাত্রকে নিয়ে গেলাম বাবার মাজারে।

শিশিরে ভেজা মাটিতে বসে বাজাতে বাজাতে চল্লিশ বছর আগের শরৎকাল মনে পড়ল। আমি শিখতে গিয়েছিলাম আর আজ আমার শিক্ষক পিতা নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাজাচ্ছি।

বাজাবার পর মা'কে দর্শনের ইচ্ছায় বাড়ীর দরজামুখো হলাম। কিন্তু দরজায় তো শমন আছে জানতাম না। আমার ছাত্রটি অন্দর মহল থেকে খবর নিয়ে এল মা'র দর্শন সম্ভব নয়। কারণ মা' কারো আওয়াজ বা ছায়া অনুভব করলেও নাকি চেঁচিয়ে ওঠেন। সেবিকার কোন এক ভাই মাসকয়েক আগে মারা গিয়েছেন তাতে তিনি অদ্যাপি শোকে মূহ্যমান তাই মা'র দর্শন করাতে তিনি অপারগ। ভাবলাম বলি, 'সেবিকা দেবী, আপনি কি অশরীরি যে আপনার আওয়াজে মা চেঁচিয়ে ওঠেন না কিংবা আজও আপনার মুখের ভয়ে মা মূক।'

মা'কে দেখার বাসনা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। সেবারত আত্মীয়রাই বাধ সাধলো। মা'কে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে বললাম, 'এ জীবনে সাধ বোধহয় মিটলো না। কিন্তু আবার যদি জন্মাই, তাহলে যেন আপনার ঘরেই জন্মাই। যাঁরা মুক্তাকাশ, সূর্যের আলো, প্রকৃতির হাওয়া, স্বতঃপ্রবাহিত নির্ঝর আর সন্তানের মাতৃদর্শনে বাধক তাঁদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের জেহাদ হয় জানি, কিন্তু আমার কোন অভিযোগ নেই।'

একাধারে চরিতার্থ ও বিষণ্ণ মনে মৈহার স্টেশনে পৌঁছলাম গাড়ী ধরার জন্য। গাড়ীর প্রতীক্ষার ফাঁকে সারা স্টেশনটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হোল। বাবার যাওয়া আসার সময় কত বার এসেছি। কিন্তু ঘুরে না দেখলেই ভাল হ'তো, কারণ শকুনীর দৃষ্টি গো ভাগাড়ে। স্টেশনে একটা পাথরের ওপর সোনালী রঙে লেখা শিলাপট্ট দেখতে গেলাম। লেখাটা পড়ে অধোবদন অবস্থায় অস্বস্তিতে কাটালাম সারাক্ষণ। অজ্ঞতার কি কোনও শাস্তি আছে? অন্ততঃ আমার তো জানা নাই। সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই। কিন্তু আমাকে প্রতিবাদ করে সত্য কথা বলতে হবেই, কেননা বাবার কাছে আমি বচনবদ্ধ। লেখাটা পড়ার পর মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো। তাড়াতাড়িতে লেখাটার নকল তুলে নেবার আগেই গাড়ী এসে পড়ল।

তাই বেনারস এসেই মৈহারে বাবার সামনের বাড়ীর বাসিন্দা শ্রীরতন সিং সৈনিকে চিঠি লিখলাম। রতন সিং সৈনি ১৯৩৭ সাল থেকে বাবার প্রিয়পাত্র। আমি মৈহারে যাবার আগে বাবার চিঠি পত্র লেখা বা টাইপ করার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। চিঠির জবাবসহ লেখাটার হুবহু নকল পাঠালেন। তিনশো পঁচাত্তর শব্দের মতন লেখা শিলালিপির প্রায় এক দশমাংশ তথ্য ভুল বা বিকৃত। জন্মতিথি, বাবার শিক্ষাগুরুদের নামের সূচী এবং ছাত্রদের নাম জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই হয় ভুল, না হয় অসম্পূর্ণ রয়েছে। একবার ভাবলাম কড়া একটা চিঠি লিখি রেলওয়ে বোর্ডকে। পরে অনেক ভেবে লিখলাম না। কারণ এ ত্রুটি যাঁরা করেছে, তাঁরা করেছে অজ্ঞানতায়, সর্বোপরি তাঁরা আমার প্রজন্মের নয়, পরপ্রজন্মের।

বারোই নভেম্বর ১৯৮৯ দেশের কাছে না হলেও আমার কাছে ঐতিহাসিক দিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক দিন বাবার যুগের সাথে জড়িত হয়েছিলেন মা মদনমঞ্জরী দেবী। আজ মৃত্যু এসে সেই যুগ আর যোগসূত্রটাকে ছিন্ন করল। মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল মৈহারেই যেন ইন্তকাল (মৃত্যু) হয়। বাবার কবরের পাশেই যেন নাতি ধ্যানেশের হাতে মাটি

পান। হোলও তাই। প্রবাসী পুত্র আলিআকবর সময়মত না আসার ফলে মা ধ্যানেশের হাতেই মাটি পেলেন।

ধ্যানেশ আমাকে ঋণী করল। মা'র মৃত্যু সংবাদ আমার বাড়ীতে ফোন করে জানাল। খবর পাওয়ামাত্র আমাকে গোরখপুরে খবর পাঠিয়ে আমার ছেলে অমিত রওনা হোল মৈহারে। আমি পৌঁছলাম দশ দিনের কাজের দিন। মা'র কবরে ধূপ জ্বালাতে জ্বালাতে ভাবছিলাম, একদিন যে জীবনের শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের রায়পুর গ্রাম থেকে, অনেক পথ পরিক্রমা করে আজ সেই যাত্রার শেষ হোল মৈহারের মাটিতে। মা'র জীবন সংগ্রামের, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ইতিহাসের উপসংহার। একদিন মা'র জীবন সংগ্রাম সুরু হয়েছিল ১৮৮৮তে। সেই প্রাথমিক দিনগুলি ছিল শান্ত, সংগ্রাম ছিল লঘু। তারপর দুঃখের মহিমায় মা কখন যে মহাজীবনের সিংহাসনে অভিষিক্তা হয়েছিলেন, নিজেই জানতেন না। সেই মহাজীবনের পূর্ণ বিরাম ১২ই নভেম্বর, ১৯৮৯ রাত একটা বেজে কুড়ি মিনিটে। ধ্যানেশর কাছে শুনলাম চল্লিশ দিনের পারলৌকিক ক্রিয়াতে সকলেই আসবে। মৈহার থেকে কাশী চলে এলাম।

প্রায় এক দশক ও তারো আগে মা'কে শেষ দেখেছিলাম অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে বম্বেতে। কাশীর বেডার (অর্থাৎ কাশীর ব্যাটা-আমি) সামনে সেই কথাগুলো মনে পড়ছিল—

বেডা বিয়োলাম বৌকে দিলাম
ঝি বিয়োলাম জামাইকে দিলাম
আমি হলাম বাঁদি
পা ছড়ায়ে কাঁদি।।

সত্যি মা সারা জীবন কত শোকই না পেয়েছেন। সব শেষে পুত্রবৎ বাহাদুরও ওঁর মারা যাবার মাস দুই আগে অকালমৃত্যুতে কবলিত হয়েছেন। মা'র তো একটাই কামনা ছিল, সবাই মিলেমিশে সুখে থাকুক। কিন্তু অনেকের মিলই নেই, তো মিশে থাকবে কি করে? মা'র এই কামনাটা যে কত প্রবল, সেটা তাঁর চালিসার (অর্থাৎ চল্লিশতম দিনের পারলৌকিক ক্রিয়া) দিনে বুঝলাম। জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যা নাটকীয়তায় আমাদের অবাক করে। আমরা কারণ খুঁজতে গিয়ে হার মানি। কিন্তু সেই টেলিপ্যাথি? থেকে থেকে মনটা চঞ্চল আর অস্থির হয়। কেন জানি মন বলছিলো এবারে একটা অঘটন ঘটবে। কিন্তু ঘটলো না কেননা মৈহারে পৌঁছেই শুনলাম নাটের গুরু মৈহারে আসেনি কিন্তু আলিআকবর এসেছে। দেখা তো হবেই। জানি না ১৯৭২ এর পরে সতেরো বছরের ব্যবধানে দেখা হচ্ছে, এর ফাঁকে কে বা কজনে কত রকমেরই না কান ভরে থাকবে। কিন্তু সামনাসামনি হওয়ামাত্র ভুল ভেঙ্গে গেল। মা'র কামনাই সত্য বলে মনে হোল। যতটা প্রিয় অনুজ অতীতে ছিলাম আজও তাই আছি। 'ভায়ে ভায়ে মিলন বজায় থাকে যদি না ভগ্নীপতি মাঝপথে রাজনীতি করে' এই গ্রাম্য প্রবাদটা সফল বলে মনে হোল। সাথে সাথে একথাও মনে হোল, ভগ্নী বৈধব্যেও ভগ্নীপতি স্মরিত হয় কি? লক্ষ্মীত্যক্ত লক্ষ্মীছাড়াকে কি কেউ মনে রাখে? যাক আলিআকবরকে সেই সরল, নির্মল ও অকৃত্রিম রূপেই পেলাম। মনে জমা সব কথা উজাড় করে বলে

ফেললাম। প্রণাম করতে গিয়ে দ্রব হয়ে গেলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম মা'র দুই সন্তান আলিআকবর ও আমি ছাড়া আর কেউ আসে নি। যদিও বাবার সব শিষ্যরাই মা'র কাছে পুত্রের স্নেহ পেয়েছে। মানুষের স্মৃতি বড়ই ক্ষীণজীবি। যতক্ষণ স্বার্থের সম্পর্ক ততক্ষণ যোগাযোগ। যেই সেটা ফুরোয় সবাই বেমালুম ভুলে যায়। বোধহয় তথাকথিত সভ্য সমাজের এটাই নিয়ম। দীর্ঘ সতেরো বছর আগে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর থেকেই আমাকে একঘরে করে দেওয়া হয়েছে, কেননা আমাকে তো কোন প্রয়োজন ছিলো না। বাবার জীবিতকালীন বেবীর পেরেরার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো। সে খবর আমাকে দেওয়া হয় নি। বাবার মৃত্যুর পর চালিসায় আমাকে খবর দেওয়া হয়নি। যেহেতু বাবার মৃত্যুর পরই অরুণের বদলি হয়ে গিয়েছিল, তাই আমাকে কে আর খবর দেবে। তারপর বাবার মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে আশিসের বিয়ে হয়েছে, সে খবরও আমাকে দেওয়া কেউ প্রয়োজন মনে করে নি।

৮৮

প্রত্যেক সংসারে এক একজন থাকে, যাঁর কথায় সব কাজ হয়। তাঁর মুখের উপর কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। আমার বেলায় তাই হয়েছে।

যাক তার জন্য আমার আর এই পরিণত বয়সে কোন অভিযোগ নেই। হিন্দুদের শ্রাদ্ধে যেমন ক্রিয়া কর্ম হয়, মুসলমানদের চালিশার দিনে সেই রকম ক্রিয়া কর্ম হয়। মৌলবীরা এসেছেন। মৈহারের বহু লোক এসেছে। অনাথ গরীব ছেলেরা এসেছে। পরের পর সকলে খাচ্ছে। সব ক্রিয়া কর্ম যখন শেষ, বাবার ঘরের সামনে আলিআকবর এবং আমি বসে পুরোনো দিনের কথায় মগ্ন, হঠাৎ একটা বাতি জ্বলে উঠল। তাকিয়ে দেখি আশিস আমাদের একটা ফটো উঠিয়ে নিয়েছে। ফটোটা ওঠাবার পরেই আশিস আমাকে একটি পাবলিশিটি ব্রোসার কাম প্রোগ্রাম দিল। তাতে আলিআকবরের বাজনার একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে লণ্ডনের বড়দ্ধ Tagoreens নামে একটি সংস্থা জওহরলাল নেহরুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। সরোদ বাদনের স্থান Royal Festival Hall, কাল Tuesday 14th Nov, 1989, 7.15 P.M, নেহরুর জন্মদিনে প্রোগ্রামের উপস্থাপনা মানে introduction ßÂËõþËåò Sir Richard Attenborough. দু'পাতার ব্রোসারের প্রথম পাতা উল্টাতে দেখলাম মা'র ছবি। তার নিচে লেখা রয়েছে—

Maidan Khan
1886–1989
Age 103 years
Mother of Padma Vishusan
Ali Akbar Khan
Passed away peacefully in India
on November 12th 1989

বাবার লেখা 'আমার জীবনী'তে বাবা লিখেছেন, 'মদনঞ্জরীর যখন জন্ম হয় আর আমার যখন বয়স ৭ বৎসর সেইসময় এই বিয়ে ঠিক হয়েছিল।' এই হিসেব ধরলে মা'র জন্মসন্

হওয়া উচিৎ ১৮৮৮ কিন্তু আলিআকবর ভুলক্রমে মা'র জন্মসাল লিখেছে ১৮৮৬। কিন্তু মৈহার স্টেশনে কিছু হুজুগে লোকেরা যে পাথরের ফলকে বাবার জন্মসন ১৮৬২ বলে উৎকীর্ণ করিয়ে দিল, সেই ভুল জন্মসাল তো পরবর্তী প্রজন্মের লোকেদের কাছে ঠিক বলে মনে হবে। তা কি আর বদলাবে? ভুলটাই নীরব সাক্ষী হয়ে থাকল।

মৈহারে বাবার বাড়ী আমার কাছে তীর্থস্থান। এই বাড়ীর চারদিকে পুরোনো স্মৃতিগুলো উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো। উঠে গেলাম গোশালাতে যেখানে আমি রিয়াজ করতাম। গোশালা ঠিকই আছে কিন্তু বাবার প্রিয় গরু বাছুরের চিহ্নও নেই। বাড়ী পরিক্রমা করতে চোখে পড়লো কোথায় সেই কাশীর নারকুলে কুলের গাছ? দেখলাম গাছটার অস্তিত্বই নেই। তখন কি জানতাম আমাকে অবাক হতে হবে অনেক কিছু দেখে! বাড়ীর পেছনে আতা গাছ ভরা ছিল। টক কুলের গাছ ছি'ল। সেগুলিও অদৃশ্য। ছেলেরা যেখানে খাবার খাচ্ছিল সেখানে গেলাম। বাড়ীর লাগোয়া যেখানে কুঁয়ো তার পাশে কমলালেবু এবং মৌসম্বী গাছের জায়গায় দেখি ফাঁকা মাঠ। ধ্যানেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গাছগুলোর কি হোল?' নির্বিকার হয়ে ধ্যানেশ বলল, 'কে এসব দেখবে? সব কেটে দেওয়া হয়েছে।' বাবার কথা মনে হোল। বাবার কত প্রিয় ছিলো এই গাছগুলো! অপর্যাপ্ত কমলা, মৌসম্বী, আতা, কুল বাড়ীর লোকে খেতো এবং সকলকে বিতরণ করতে হোত। বাবার নিজের হাতে লাগান ফুলগাছের চিহ্নই নেই।

শুনেছি মৎস্যপুরাণে নাকি লেখা অছে যে দশটা কুঁয়োর সমান হোল একটা পুকুর, দশটা পুকুরের সমান একটা দীঘি, দশটা দীঘির সমান একটা পুত্র, আর দশটা পুত্রের সমান নাকি একটা বৃক্ষ।

মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। বাড়ীর বাইরে বহু পরিবর্তন দেখলাম। দেখলাম বাবার ঘর। শুনলাম ওঁর ঘরটা যেমন ছিল তেমনি নাকি রাখা হয়েছে। কিন্তু দেখে অবাক হলাম। ভাবলাম বারান্দার সব দেবদেবীর ছবিগুলো কোথায় গেল? পারিবারিক সব ছবিগুলো নতুন এবং বাইরের আর ঘরের সব আসবাবপত্রও নতুন। সবই আছে কিন্তু বাবার ঘর কৈ? বাবার খাটটা ঠিক আছে। কিন্তু ফিল্পিসের রেডিওটা কোথায়? বাবার বেতের সোফা কোথায়? বাবার তামাক খাবার গড়গড়া? উর্দু কবি গালিব বলতেন—

জীন্দগী তো বীতী ইস্ককে বূতে মেঁ গালিব
মরতে বক্‌খত্‌ ক্যা খাস মুসল্মা হোংগে।।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীবনটাই প্রণয় (সাহিত্য)-এর সাহচর্যে কাটালাম এখন মরণ কালে আর কি মুসলমান হবো। কারণ সাহিত্যই ছিল তাঁর ধর্ম। তেমনি বাবার ইশ্‌ক ছিল সঙ্গীত আর সেটা ছিল ধর্মবিশেষের অনেক অনেক উঁচুতে। বাবার পরমহংসদেব, মা সারদা এবং হনুমানজী বিদায় হয়েছেন, কারণ মৃত্যুর পর তাঁর সেবাইতরা তাঁকে মুসলমান করে তুলেছে।

মনে পড়ল বাবার কথা বলার স্বরগ্রামভেদ। যখন কাউকে সদুপদেশ দিতেন তখন কণ্ঠে উদারা, সাধারণ কথাবার্তায় মুদারা আর উপরোক্ত ধরনের বক্তমিজী দেখলে একেবারে তারায় প্রকাশ। বাবার তারাও ছিল তিন রকমের। তারা, তারাতর আর তারাতম। বাবার

জীবদ্দশায় হলে যে কোন লোক রাস্তার মোড় থেকে শুনতে পেত নিকালো (তারা) নিকালো (তারাতর) নিকালো (তারাতম)।

নম্বরের তালার একটা গুণ এই যে চাবি হারাবার ভয় নেই। কিন্তু একটা ভয়ও আছে। তা হোল যদি নম্বর ভুলে যায় তাহলে আর খোলাই যায় না। তখন শুধু বসে বসে বোকার মত মেলাতে হয় কম্বিনেশন আর পারমুটেশন। ঠিক সেই রকমই আমার মৈহার জীবনের তালার নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম। সুদীর্ঘ দিন পরে আজ যেন নম্বরটা মনে পড়ল। চোখের সামনে ফুটে উঠলো চল্লিশ বছর আগের দিনগুলো। আলিআকবর, আশিস, ধ্যানেশ, বেবী এঁদের সুন্দর সংসার। এবারের চালচিত্রে যোগ হয়েছে আলিআকবরের স্ত্রী মেরী ও পুত্রদ্বয় আলম ও মাণিক। যাদের ছোটো দেখেছিলাম তারা বড় হয়েছে আর আমি বুড়ো। আমার চোখদুটো খুঁজছে বাবা ও মা'কে। নিঃসন্দেহে আশিস ও ধ্যানেশের চেহারার ফাঁকে আর একটা মুখকে খুঁজেছি তা হল শুভ'র। শুনেছি মায়ের হারান মানিক নাকি মায়ের কাছে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই বুঝেছে প্রতিদ্বন্দ্বী পিতার তুলনায় মায়ের স্নেহময় কোল অনেক নিশ্চিন্ত ও সুখকর। মায়ের কাছে শিখেছেও। ভাবলাম অনেক সময় নষ্ট করেছে, তবু আজ থেকে যদি বদলায় তাহলেও অনেক হবে। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ঠিকমত সাধনা করে সে যদি একক বাজায় তাহলে তার দাদুর নাম রাখতে পারবে। কিন্তু বিধির বিধানে সেও আজ নন্দনলোক নিবাসী। মৈহারের রতন সিং সৈনীর কাছে শুনলাম মহারাজার দেওয়া বিশাল জমিটা অন্নপূর্ণাদেবী বিক্রি করে দিয়েছেন। মৈহারে জমিটা ঘিরে নানা পরিকল্পনার কথা পূর্বেই অন্নপূর্ণাদেবীর কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু কেন, কি প্রয়োজনে এত সুন্দর বিরাট জমিটা তিনি বিক্রি করে দিলেন? কারো কাছে এর সদুত্তর না পেয়ে খুবই অবাক হলাম।

এর কিছুদিন পরে যখন বোম্বেতে বাজাতে গেলাম, তখন অন্নপূর্ণদেবীর কাছে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'মৈহারের জমিটা নিয়ে তো অনেক পরিকল্পনা আপনার ছিলো। হঠাৎ কি এমন কারণ ঘটলো যার জন্য আপনি জমিটা বিক্রি করে দিলেন?' তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'সত্যি কথা, ভেবেছিলাম, জমিটা মধ্যপ্রদেশ সরকারকে দিয়ে দেবো এবং তাঁরা ওখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সঙ্গীত শিক্ষা দেবার ও ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যে পরিচিত লোকের উপর জমিটা দেখাশুনার ভার ছিলো, সে আবার অন্য একজনের প্ররোচনায় জমিটার কিছু কিছু অংশ আমাকে লুকিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। সব দেখেশুনে জমিটা বিক্রি করে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম।'

আমার আর অবাক হওয়ার কিছু ছিলো না। কারণ, বেশীরভাগ উপকৃত লোকই এইভাবে ঋণ শোধ করে।

বোম্বে থেকে সোজা কোলকাতায় গেলাম। এক ছাত্র আমাকে একটা বই এনে দিল। বইটার নাম 'আলাউদ্দিন খাঁর জীবনসাধনা ও শিল্প'। প্রকাশকও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী'। সম্পাদনা অরুণ কুমরা বসু ও কঙ্কন ভট্টাচার্য। সুন্দর বই। সরকারী দাক্ষিণ্যে ছাপা, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। প্রকাশক সংস্থার সভাপতি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ নিজেই লেখক সূচী তৈরী করে বিষয় নির্দেশ করে, লেখকদের কাছ থেকে লেখা আনিয়েছেন এবং সেই সব লেখাকে সম্পাদিত করে প্রকাশ করা হয়েছে।

মনে পড়ল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন কাব্য নাটকের একটা ছত্র—"এ জগৎ মহা হত্যাশালা"—। বাবার 'পার্টি বাজি' কথাটা মনে এলো—"এ জগৎ (সঙ্গীত জগৎ) মহা রাজনীতিশালা।" না হলে সম্পাদকদ্বয় ও তাঁদের সভাপতির মাথায় এ কথা ঢুকলো না যে, যতীন ভট্টাচার্যের ইংরাজী বইয়ের উদ্ধৃতি, সম্পাদকের বক্তব্য থেকে নিয়ে অন্যান্য লেখকদের রচনায় দশাধিকবার রয়েছে, অথচ তাঁর কাছ থেকে একটা লেখা চাওয়া হোল না কেন? তাহলে কি ওঁদের ক্ষতমাছিতে খবর দিয়েছিল যে আমি মারা গেছি? আসলে তা নয়। ঘটনা হোল আমি ঠিক গোলে হরিবোল করতে পারি না।

যদি খুঁত ধরার ইচ্ছা থাকতো, তাহলে বইটায় যত ভুল ছিল তাতে আর একটা সমায়তনের বই লিখতে পারতাম। কিন্তু কি হবে শবচ্ছেদ করে? যাঁরা দক্ষরাজকে দিয়ে শিবমন্দিরের শিলান্যাস করান, তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতের লেখা একটা তথ্য এখানে খালি তুলে ধরব, যা তিনি নিজের লেখায় লিখতে পারেন নি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, কারণ সম্পাদকদ্বয় প্রাককথনে অর্থাৎ সম্পাদনা প্রসঙ্গে প্রথম ছত্রেই হেঁচে দিয়েছেন। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বাবার জন্মসন্ প্রসঙ্গে কথায় কথায় তিনি একটি কাগজে যা লিখে দিয়েছিলেন, 'সেটি যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম।

> বাবা আলাউদ্দিন
> ওঁর জন্ম কোন্ সালে?
> আমার মনে হয় ১৮৮৪ অথবা ১৮৮১। কেন বলছি যে, বাবা আমার বাড়ী ১৯৩৪ সালে এসে আমার গুরুর সঙ্গে বাজিয়েছিলেন। তখন আমার মনে হল যে ওঁর বয়স ৫০ বা ৫১ কি খুব বেশী হয় তো ৫৪/৫৫।
>
> হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
> ২/১/৯০.
>
> আমার মনে হয় ১৮৮১ সালটা বোধহয় ঠিক।
>
> হীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
> ২/১/৯০

'আলাউদ্দিন খাঁর জীবনসাধনা ও শিল্প' বইটিতে শুধু দুঃখ পেলাম আলিআকবরের লেখা পড়ে। সোজা গেলাম তাঁর কাছে। এত ভুল তথ্যে ভরা লেখাটা সে কেন ছাপল জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, 'কোন মদ্না এটা লিখেছে?' সরস জবাব পেলাম, 'তোমার সেই মদ্না। বম্বের মদনলাল।' শান্ত হলাম কারণ শুধু আমিই নয়, আলিআকবরও ভুগেছেন ওঁর হাতে। ব্যাপারটা হয়েছে এই যে, আলি আকবরের একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলো মদনলাল ব্যাস। সেটারই বঙ্গানুবাদ করে এখানে ছাপা হয়েছে। হয়তো আলিআকবর কি বলেছেন আর ও কি বুঝেছে।

বেনারসে ফিরে আসবার পরে কাশীর বিখ্যাত রহিস্ বাবু কিশোরী রমনের বাড়ী থেকে ফোন পেলাম বিলায়ৎ খাঁ কাশীতে এসেছেন এবং আমার সাথে দেখা করতে চাইছেন।

আমার লেখা 'Ustad Allauddin Khan and His Music' বইটি সংগ্রহ করবার জন্য তিনি বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একথা শুনে গেলাম দেখা করতে এবং ইংরাজী বইটা উপহার স্বরূপ তাঁকে দিলাম। বহুদিন পরে দেখা হোল। সমবয়সী ষষ্ঠোত্তরীদের কথা তো, তাই শেষই হতে চায় না। কত কথা হয়েছিল তা না লিখে শুধু যে কথাটা সব থেকে বেশী কানে বেজেছিল, সেটাই লিখছি। নিজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আসনে বসা একটা মানুষ কত সৎ ও সরল হলে বলতে পারে, 'আলিআকবর খাঁ, আলিআকবর খাঁই। তিনি তরফের তার মিলিয়ে যদি একটা টোকা দেন, সেই সুরে বহু সরোদ শিল্পী জন্মে যাবেন। কিন্তু সেই সব শিল্পীরা জন্ম জন্মান্তর চেষ্টা করলেও একটা ওরকম সুর জন্ম দিতে পারবেন না।'

যতক্ষণ হোটেলে ছিলাম, কত কথাই না হোল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম, বিলায়ৎও আমার দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন। সঙ্গীতকে বাঁচাতে গেলে গুরু-শিষ্য পরম্পরা ছাড়া যে গত্যন্তর নেই সে বিষয়ে আমরা একমত।

ভাল লাগল যে নিজের ছেলেকে উদ্ধত হতে দেন নি বিলায়ৎ। বেগম সাহেবা, মেয়ে ও ছোট ছেলের সাথে আমার পরিচয় করাতে গিয়ে বললেন এক গাদা প্রশংসাসূচক শব্দ। মেয়ে ও ছেলেকে বললেন অভিবাদন করে দুয়া নিতে। বিনয় ও সহশিল্পীর প্রতি আন্তরিক সম্মানবোধ দেখে মুগ্ধ হলাম। উঠে আসার সময় আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন যদি সুযোগ পাই একবার যেন ওঁর অতিথি হই। ঘরাণার ভিন্নতা সে সম্পর্ককে তিক্ত করে না, তা আজকের সাক্ষাৎ আমাকে আবার বিশ্বাস করিয়ে দিল।

মৈহারের ইতিহাসের পৃষ্ঠা শেষ হবার নয়। আগেও বলেছি, বই লিখতে লিখতে যতবারই ভেবেছি লেখা শেষ করলাম, কিন্তু নূতন নূতন ঘটনা পুনরায় আমার কলমকে সচল করে তুলেছে। অবশেষে, নব্বই সালে আমার লেখা শেষ করে বইয়ের সম্পাদনার কাজ শুরু করলাম। সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে আরও কয়েকটি বছর ব্যস্ত থাকার সময় হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো তিনটি মৃত্যুসংবাদে আমার কলম স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনজনই আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একানব্বই সালের ১১ই অক্টোবর পেলাম ধ্যানেশের মৃত্যুসংবাদ। আগে থেকে অনুমান করতে না পারায়, জণ্ডিসে তাঁর মৃত্যু হোল। এরপর ঠিক একবছর পর ১৫ই সেপ্টেম্বার, ১৯৯২ সালে শুভর মৃত্যু সংবাদ আমাকে ভীষণ আঘাত দিল। ভাবলাম, বাবার বংশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়লো। পরে যখন তার অকালে প্রায় বিনাচিকিৎসায় মারা যাওয়ার ঘটনা শুনলাম তখন মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো। শুনলাম, যে শুভচিন্তক শুভ'র বাৎসরিক মেডিক্যাল ইনসিওরেন্সের টাকা পাঠিয়ে দিতেন, তিনি হঠাৎ সংসারী হওয়ার পর শুভকে জানান যে তিনি আর সেই টাকা পাঠাতে পারবেন না। একথা শুনে শুভ অত্যন্ত আঘাত পায় এবং সেই শুভেচ্ছুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু সময়মতো মেডিক্যাল ইনসিওরেন্সের টাকা না দেওয়াতে প্রায় বিনাচিকিৎসায় নিমোনিয়ায় শুভ মারা গেল। পাঠকরা বুঝবেন প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ কত মর্মান্তিক হতে পারে। মনে মনে চিন্তা করলাম, পিতাদের কোন পাপের ফলে পুত্রশোকের ভাগ্যলিখন তাঁদের কপালে লেখা হয়েছে? পূর্বে অনেকবার আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ আসা সত্ত্বেও যাই নি। কিন্তু তিরানববই সালে অবশেষে

আমেরিকা গেলাম। আলিআকবরের কলেজে এবং বিভিন্ন জায়গায় বাজিয়ে দেখলাম কিভাবে শিল্পীরা অর্থোপার্জনে ব্যস্ত রয়েছে। শোনা ও দেখায় যে কত তফাৎ তা বুঝলাম। চুরানববই সালের শেষদিকে যখন আমার বইয়ের প্রথমভাগ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, ঠিক সেইসময় বম্বে থেকে খবর পেলাম, ববার গুনমুগ্ধ এবং আমার পরম সুহৃদ, সঙ্গীতের অত্যন্ত সমঝ্দার, রাজা লক্ষ্মী প্রসাদ পিত্তি আর ইহলোকে নেই। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ২৪শে সেপ্টেম্বার, ১৯৯৪ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, এমন সঙ্গীতের সমঝ্দার শ্রোতা, যিনি আমার বাজনাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারতেন, তাঁর চলে যাওয়ার পর আসরে বসে আমার বাজনা বাজানোই অর্থহীন, সেইজন্য তারপর থেকে কোনো অনুষ্ঠানে বাজানোই বন্ধ করে দিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রুফ দেখার কাজে যখন ব্যস্ত আছি, সেইসময়ে পঁচানববই সালের প্রথমে শুনতে পেলাম মৈহারে বাবা এবং মায়ের কবর সুন্দরভাবে তৈরী করিয়ে আলিআকবর তাঁর উদ্বোধন করিয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম, যাক্ যোগ্যপুত্রের কাজই সে করেছে।

এখন আর আমার বিবেকের আঁচড়-পাঁচড় কিছু নেই। হাল্কা লাগছে। মনে হচ্ছে বাবার আদেশ বোধহয় কিছুটা পালন করলাম। এতদিনে বাবাকে দেওয়া কথাটা কিছুটা রাখতে পারলাম। মনে ভাবি, ভবিতব্যের পাতায় যা লেখা আছে, তাতো হবেই। তাই কারো প্রতি কোন দ্বেষ পোষণ করি না। কাউকে দোষ না দিয়ে, অভিমান না করে, ভালবাসা দিয়ে জাল গুটোই। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'তোমার ইচ্ছা করহে পূর্ণ, আমার জীবন মাঝে।'

যাই হোক, গ্রন্থ শেষ করার আগে একটা গল্প বলে নিই। ঘটনাটা ব্রিটিশ আমলের।

একদিন সন্ত রামতীর্থ হৃষিকেশ থেকে পদব্রজে ব্রহ্মপুরীতে গেছেন। সেখানে গোরা সৈন্যদলের প্রহরীরা তাঁর পথরোধ করল। বলল, "ওপারে যেতে দেওয়ার নিয়ম নেই।"

স্বামী রামতীর্থ বললেন, 'আমি বেশী দূর যাব না। ওই সামনের গাছটায় যে ফুলটা ফুটে আছে ওই ফুলের সাথে একটু কথা বলব। যাব আর চলে আসব।'

প্রহরী তো অবাক। ভাবল লোকটা নির্ঘাৎ পাগল। বলল 'যান।' রামতীর্থ সেই ফুলের গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দু'মিনিট দাঁড়িয়ে চলে এলেন। প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ফুলের সাথে কি কথা বললেন?' রামতীর্থ বললেন, 'আমি ফুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এত সুগন্ধ পাও কোথা থেকে?' প্রহরী প্রশ্ন করল, 'তা ফুল কি বলল?' রামতীর্থ বললেন, 'ফুল বলল আমার বুকে যে মধু আছে। তাই আমার এত সুগন্ধ।'

আমার মনে হয় উস্তাদ বাবারও বুকে বোধহয় মধু ছিল। নইলে আমাদের এত ভালবাসা, প্রেম, এত সুর দিলেন কি করে? তিনি তো আমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাননি বা পাননি। তিনি শুধু দিয়েই গিয়েছেন। কোন নেওয়ার অপেক্ষা ছিল না তাঁর। তাঁর ছিল অনন্ত দেওয়া। সেটাই তো ব্রহ্মস্বরূপ। কারণ তিনি কিছু নেন না।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসে এক সভায় বলেছিলেন, "কে আমার দলে, কে আমার দলে নয়, সেই বুঝিয়া যেখানে স্তুতি, সম্মানের ভাগ বণ্টন হয়, সেখানকার সম্মান অস্পৃশ্য। সেখানে যদি ঘৃণা করিয়া লোকে গায়ে ধূলা দেয় তবে সেই ধুলাই যথার্থ ভূষণ। যদি রাগ করিয়া গালি দেয় তবে সেই গালিই যথার্থ সম্বর্ধনা।"

তিনি আরো লিখেছিলেন, "যাহা অবহেলায় রচিত, তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই, তাহা কখনো অমোঘ বলিয়া কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।"

আজ জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে আমি অকুণ্ঠ ভাবে বলতে চাই যে আমার জীবনে, শিল্প-সাধনায় অবহেলার কোন অবকাশ ছিল না। চল্লিশ বছর আগে উস্তাদ বাবার কাছে যে সঙ্গীত সাধনা শুরু করি, তা আজো অক্লান্তভাবে অনুসরণ করে চলেছি। সেখানে অবহেলার কোন ফাঁক রাখিনি। বাবাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—তা রক্ষা করে, বাবার জীবন উপাখ্যান শেষ করবার আগে আমার জীবনের ধ্রুব বিশ্বাসকে একবার আবৃত্তি করে নিই।

শেষের আগে যেমন একটা শুরু থাকে তেমনি শেষের পরেও আর একটা জিনিষ আছে যার নাম অশেষ। কিন্তু সেই অশেষের পর? অশেষের পরে কি আর কিছু আছে? যদি কিছু থাকে তো তার নাম আদি। শেষ মানেই আদি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলীলা যদি আমরা পরিক্রমা করি, পরিক্রমা করে যদি শেষের বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছই, তো একদিন আশ্চর্য হয়ে দেখব যে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছেছি সেটাই আদি। আমাদের জীবনযাত্রা আদি থেকে শুরু করে। আবার সেই আদিতে পৌঁছিয়েই শেষ। তাই আদিঅন্তহীন অনন্তের যে আদিম কল্পনা তা মিথ্যা নয়। মানুষের জীবন তাই আদি অন্তহীন এক অনাদি অনন্ত প্রক্রিয়া। তার শুরু নেই, শেষ নেই। তার আদিও নেই, অন্তও নেই। আর সেই আদ্যঅন্তহীন অনাদি অনন্ত যাত্রার এক ভগ্নাংশ নিয়ে আমাদের এই সংসার।

ঠিক সেই রকমই বাবার অনন্ত সঙ্গীত যাত্রার এক ভগ্নাংশ নিয়েই আমার এই রচনা। এর আদি মধ্য অন্তেও তিনি।

মনে পড়ছে একটা ঘটনার কথা। শরৎবাবুকে একদিন এক পাঠক বললেন, 'আপনার লেখা আমাদের খুব ভাল লাগে, রবীন্দ্রনাথের লেখা আমাদের তেমন ভাল লাগে না।' এর উত্তরে শরৎবাবু বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য লেখেন। সেইজন্য তোমাদের ভাল লাগে না। আর আমি তোমাদের জন্য লিখি, তোমরা বুঝতেই পারো না যে আমি রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোই তোমাদের মত করে লিখি তাতেই তোমরা বুঝতে পারো।'

আর একটা ঘটনা শুনেছি। একবার এক পাঠক শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি তো বলছেন রবীন্দ্রনাথ আপনার থেকে বড় লেখক। তা সাহিত্যের ইতিহাসে ওঁর স্থান কত নম্বরে?' শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'উনি দ্বিতীয়।' পাল্টা প্রশ্ন হয়, 'তাহলে প্রথম কে?' শরৎচন্দ্রের উত্তর, 'মহর্ষি বেদব্যাস।'

ঠিক এরকমই আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন আপনাদের ঘরাণায় রবিশঙ্করের স্থান কোথায়?

উত্তরে আমি বলি, 'চতুর্থ'।

পাল্টা প্রশ্ন হয়, তাহলে, 'তৃতীয় কে?'

উত্তর দিই, 'আলিআকবর'।

আবার প্রশ্ন 'দ্বিতীয়'?

বিনয়াবনত হয়ে বলি, 'অন্নপূর্ণাদেবী'।

প্রথম তো প্রশ্নাতীত। বাবা আমাদের বেদব্যাস। বেদে ওঁ এঁর অস্তিত্ব। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় প্রণবঃ ছন্দসামিবঃ।

আজ আমার মনে পড়ছে সেই সব দিনের কথা। মৈহারের সেই উস্তাদ বাবার কথা। স্নেহময়ী মা'র কথা। সেই অন্নপূর্ণাদেবীর কথা। আলিআকবর, রবিশঙ্কর, জুবেদা খাতুন, বাহাদুরের কথা। কৈশোরের আঙ্গিনায় কচি কিশলয় আশিস, ধ্যানেশ, শুভ, প্রাণেশ, অমরেশ আর বেবীর কথা। আমার মনে হয় মঙ্গল কামনার মধ্যেও কেমন যেন একটা প্রয়োজনীয়তার ভাব উহ্য থাকে। অর্থাৎ তাতে জড়িত থাকে কোন একটা ভাল উদ্দেশ্য সাধনের কামনা। জড়িত থাকে এক সুখ বা সুযোগের ভাব। কিন্তু প্রেম? সে সব প্রয়োজনীয়তার ঊর্দ্ধে। কারণ প্রেম স্বতঃই আনন্দ, স্বয়মেব পূর্ণ। পূর্ণই ব্রহ্ম। বাবার কথায়-অনন্ত হরি ওঁ।

— সমাপ্ত —